

Vol-4
1311

বঙ্গদর্শন।

বিজ্ঞাপতির প্রকাশিত-পদাবলী।

23, 201

১৮৮২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্ণগত
বিজ্ঞাপিত মুখোপাধায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ
করা হয়, তাহাতে বিজ্ঞাপতির প্রকৃত ইতিহাস-
নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তৎপূর্বে
এই কবির সম্বন্ধে মোকো বাহা জানিত, তাহা
মৌলিক প্রবন্ধমাত্র। প্রকৃত কথা কেহ
জানিত না, জানিবার তেমন কোন প্রয়াসও
করা হয় নাই। রাজকৃষ্ণবাবু প্রভূত পরিশ্রম
করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা
দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ
করিলেন। প্রচুর প্রমাণ দ্বারা তিনি যে
কিছুকিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন,
তাহারি তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত হইল।
(১) মৈথিলভাষায় রচিত অনেক
কবিতা মিথিলার ওচলিত আছে, এবং ঐ সকল
কবিতার ভণিতায় রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
জমিদারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২)
মিথিলার পত্নীগ্রন্থে বিজ্ঞাপতির পরিচয়

পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথি-
লার রাজা ছিলেন ও লখিমাবতী তাঁহার
বহিবি ছিলেন, ইহা পত্নীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ
দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিজ্ঞাপতির কোন
কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলার
আচার্য্য উপাধ্যান অচলিত আছে, বাংলা-
দেশে নাই। (৫) বিজ্ঞাপতি, শিবসিংহ
রাজার নিকটে বিদ্যুগ্রাম দান পাইয়া
ছিলেন; দানপত্র অতীবধি বর্তমান আছে;
এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারগণ
উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া আসিয়া
করিতেছেন। (৬) বিজ্ঞাপতির দল্লিখিত
শ্রীমন্তাসবত অতাপি তৎকালীন মিথিলার
মিথিলার দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যাই
শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়ের দত্তরা
মিথিলার আছেন। (৭) বিজ্ঞাপতি ha
সুখবন্দীনা, দুর্গাভক্তির দ্বিতীয় collected
অনেক সংস্কৃতপুস্তক যৎসংগ্রহ
ugh ever
collection

* বিজ্ঞাপতি প্রকাশিত-পদাবলী। বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকা।
যে অংশে অতীত অঙ্গকালিক পদাবলী, কৈটভদ্রবঙ্গ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইল।

লেখা যায়, আর কেহনাও । তাই দেখে না ।
(২) এই সকল পুস্তকে ত্রুটিবাক্যে রাজা-
দিগের বৈকল্য পরিচয় আছে, পত্রীগ্রন্থে
বিভিন্নরাজ্যদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া
যায় । (৩) বিজ্ঞাপতিরচিত্র মৈথিল
শিল্পের সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় শিল্পের
সাদৃশ্য পূট হয় ।^১ রাজত্বকবাবুর এই বর্ণটি
দিকান্ত এতাবৎকাল প্রামাণ্য রহিয়াছে,
কোনটিই সন্দেহিত অথবা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়
নাই । দুইটির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে ।
বিজ্ঞাপতির বহুতলিখিত ভ্রমভ্রান্তবত তাঁহার
বংশধরদিগের নিকট আছে, এ কথা আরও
অনেকে বলেন ; তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও
প্রকাশিত হইয়াছে । বিশ্বাসের কথা এই যে,
কবির রচিত অমূল্য পদাবলী ও তাঁহার রচিত
বহুতর সংস্কৃতগ্রন্থের একখানিও পাণ্ডুলিপি
অথবা তালপত্র তাঁহার বংশধরদিগের অথবা
অপর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, অথচ
সম্ভবত সেগুলি তাঁহার বিশেষ আদরের ও
বদনে সান্নিধ্যী ছিল । বিস্ময়গ্রাহ্যের দানপত্র-
সম্বন্ধে নূতন তথ্য নিরূপিত হইয়াছে ।
রাজত্বকবাবুর প্রবন্ধে উক্ত দানপত্রের একাংশ
উদ্ধৃত হইয়াছিল । প্রায় দশবৎসর পরে
ব্রিটানিয়ার দানপত্রের সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাইয়া
Indian Antiquary পত্র-প্রকাশ করেন ।
তিনি মূল দানপত্র দেখিতে
পারেন এবং দানপত্রের তাম্র-
লিপির প্রকৃতি এনিবার্টস
(Proceedings) প্রকাশ করেন ।
তিনি বলেন, তাহা লিপি
যে হই, মূল দানপত্র-

পাশ্চি হারাইয়া না গই হইয়া নাওহায়ে
বিজ্ঞাপতির কোন বংশধরও একখানি নূতন
তালপত্র প্রস্তুত করাইয়া পাঠিবেন, এবং
সেই সময় তাহাতে তারিখের গোল থাকিরা
গায় ।

পূর্বে বিজ্ঞাপতির বীজাবলী পুস্তকপু-
স্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, পদকলিতকর
স্বভাবাক্রম ও ত্রুটিবাক্যকটকাণ্ডের কারণে
মধ্যে নিহিত ছিল । রাজত্বকবাবুর প্রবন্ধ
প্রচারিত হইবার দুইবৎসর পূর্বে অর্থাৎ
১৮৮০ সালে, ত্রিভুজ জগদ্বন্ধু তন্ত্র নিবেদন নাম
অপ্রকাশিত রাখিয়া মহাজনপদাবলী হইয়া
বিজ্ঞাপতি ও চৌদাসের পদাবলী স্বতঃ
প্রত্যাকারে সংকলন করিয়া প্রথমে প্রকাশ
করেন । তাঁহার এই উদ্ভব ও অধ্যবসায়ের
যোগ্যতা প্রশংসা হয় নাই । পরবর্তী
সংকলনকারগণ তাঁহার নিকট অনেক
ত্রুটি, এমনকি, তাঁহার কৃত অনেক টীকা গ্রহণ
করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা মৌলিক স্বীকার
করেন নাই, ইহা স্ফোভের বিষয় । তাঁহার
সংগৃহীত পাঠ ও সংস্কৃত টীকা প্রামাণ্য
হয় নাই, এবং বিজ্ঞাপতির অমূল্যদানসম্বন্ধে
তাঁহারও ভ্রান্ত ধারণা ছিল, কিন্তু তাঁহার
ব্যর্থত্ব উদ্ভব ও পরিশ্রমে সাহিত্যের কল্যাণ
পূট ও সাহিত্যোচ্চারণ ব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি
হয় । রাজত্বকবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়া
অব্যবহিত পরেই ত্রিভুজ জগদ্বন্ধু তাঁহার
ও ত্রিভুজ সচিবচরণ দ্বারা প্রণীত
সংগ্রহ সংকলনে ব্রতী হইলেন । বিজ্ঞাপতি
পদাবলী সংকলন ও টীকা প্রকৃতির
সামান্যত্ব লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ
অক্ষয়বাবু সম্পাদন করেন । পরে বিজ্ঞা-

এর পদাবলী সারদাবাবু প্রত্যয়পুস্তকাক্ষরে
প্রকাশ করেন। অক্ষরবান্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিশেষ পক্ষদর্শী ছাত্র, ক্রমে সাহিত্যসমাজে ও
উচ্চ আসনে প্রাপ্ত হইলেন। সারদাবাবু
সহোদরী, সহপাঠ্যদিগের অগ্রণী, কর্তৃক
বিশেষ বশবী-হইয়া একে উচ্চতম ধর্মাবি-
কাশ বিচারপতির আসনে গ্রহণ করিয়াছেন।
একটিকে রামকৃষ্ণবাবুর ভাষা, পণ্ডিতাশ্রম,
কৃষ্ণাবিশারদ, তিষ্ঠাশিল, মন্দিরী লেখকের
কৃষ্ণাবিশারদ, অপরটিকে সমগ্রবাক্যোক্তি বিখ-
্যাত সাহিত্যকরণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহ
কর্তৃক সমাজে বিভাগ্যতির আদর হইবার
প্রসঙ্গ হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি
এক বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কবীর আলমের
একটি ছিলেন, বটলার জীবন মগ্নবিশেষ
করণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহার ভ্রম-
ভঙ্গ হইল। ভ্রমসমাজে স্থান হইল। গাঙ্গুলী
বটলার ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বঙ্গ-
ভাষার প্রেতকবি বলিয়া ভানিতেন, তাহা-
র পুত্রগণ এই বৈষ্ণবকবির সমাদর
কর্তৃক শিখিলেন। সৌভাগ্য কবির নয়,
এই বৈষ্ণবকবির ঘরে ও রামপ্রসাদে
কর্তৃক তুল্য জীতি। বঙ্গভাষার অপ্রকাশিত
কর্তৃক পদে তিনি নয় বলিয়াছেন—

মনি কবির লগটায় রে ।

ওইকি তনিক ডগ দায় রে ।

কর্মলিঙ্গ হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ
কিমপেতি রমোভিরোপিতের বাক্য
হইবে? যে মনি চিনে, সেই
সাহিত্যসমাজী। যে শিবসিংহ রাজা বিভাগ্য-
তির প্রামদান করিয়াছিলেন, কবির
কর্তৃকই আজ তাহার পরিচয়। কবির

পদাবলীতে তাহার নাম পুনঃপুনঃ অমুদ্রিত
না থাকিলে রাজা শিবসিংহকে আজ কে
চিনিত? বিভাগ্যতিকে তাহার উপযুক্ত
আদরে বরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে বরণ পরি-
মিত হইয়াছে।

সাহিত্যের ভ্রমপটীতে বিভাগ্যতির পদা-
বলীর সম্ভরণ হইল, কিন্তু পাঠের, টীকার,
অর্থের, অসংখ্য ভ্রম রহিয়া গেল। কারণ
নানা ভাষার মধ্যে দুইটি নির্দেশ করিতেছি।
প্রথম, ভাষা। বিভাগ্যতির ভাষা প্রাচীন
বঙ্গভাষা কি না, পাঁচশত বৎসর পূর্বে
মিথিলায় ও বঙ্গদেশের কবিতা ও লিখিত
ভাষার কতক সাফল্য ও পার্থক্য ছিল, সে
কথার বিচার বা আলোচনা না করিয়াও
স্বীকার করিতে হইবে যে, চণ্ডীদাস বিদ্যা-
পতির সমসাময়িক কবি, কিন্তু হইকনের
ভাষায় কোন সাফল্য নাই। বীরভূম ও
মিথিলায় যত ব্যবধান, কনিকাতা ও চট্ট-
গ্রামের পরস্পর দূরত্ব তাহার অপেক্ষা
অধিক, কিন্তু উভয় স্থানের লিখিত ভাষায়
বড় প্রভেদ নাই। বাহাকে বঙ্গভাষা ও
ভ্রমবুলি বলা যায়, তাহাও ঠিক কোন দেশের
ভাষা নয়, পুথির ও গানের ভাষা, এবং
বিভাগ্যতিই তাহার স্রষ্টা। বঙ্গদেশে 'বিত্ত'
বৈষ্ণবকবি সেই ভাষার লালিতে; কবির
মাধুর্য্যে, তরলতার ও মধুময়ী ভাষায়
পুঙ্খ হইয়া তাহার অমুকরণে হি-
রন্ময় করিয়া গিয়াছেন। কবির
হর্ষোৎসাহ চৈতন্যদেবের পুঙ্খ
বিভাগ্যতির পদাবলীর বহুল প্রা-
সেই সমগ্র বৈষ্ণবদাস মলিয়া গিয়াছে।
গোপতে, যতন করি পদ মো

Collected
ugh ever
lection.

দেব), অগতে করণ পদার্থ।' সেখানে
 বিভাপতির ভাষা বৈষ্ণব ভাবুল ও কবি-
 মিগের নিকট তেমন গ্রহণ ছিৎ না। বৈষ্ণব-
 ধর্মপ্রচারের পর সাম্প্রদায়িকতার কারণে
 পদাবলীর চর্চা সঙ্গীত হইয়া পড়িল। সম্ভ-
 দায় বক্তৃতা হইত, জাতির অপেক্ষা ছোট।
 বৈষ্ণব বাহা ভক্তিপূরক পড়ে, শক্তি হইত
 তাহাতে উদাহরণ। ক্রমে লোকে বিভা-
 পতির ভাষা হুলিল। পদাবলী দিনদিন
 হ্রাস হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় কারণ,
 ১. লিপিকরের উৎপাত। বগীর দৌরায়া দেশের
 লোককে ছাড়িয়া দেশের পুথিকে আক্রমণ
 করিয়াছিল। কোন লিপিন নাই। কোন নিয়ম
 নাই, বাহুর যেমন ইচ্ছা, সে তেমন লিখে।
 জ, ন, শ, ইকার, উকার কখন যে কোন
 আকার ধারণ করে, তাহার কিছুই গুরুত্ব
 নাই। পরাধীন জাতি এই এক পুথি লিখি-
 য়ার সময় মনের সাধ মিটাইয়া রাখীনতা
 ন প্রকাশ করিয়া তইল। এখন, পুথি নকল
 য়ে কল্যাণ ও ছাপান অক্ষরে বই তৈয়ারি করা
 য় অনেক ভদ্র। মূল্যবোধে যে অক্ষর সাজায়,
 তা সে গীতুলিপির অক্ষরই ধোঁবে, শব্দের প্রতি
 উচ্চারণ করে না, শব্দের অর্থ বুঝিবার বিভারও
 কিছুই অভাব। ধর্ম সাজাইতে তাহার
 কোন সমস্যা হয়, অপর লোকে বাহবার তাহা
 ন কুরিয়া গেল। কিন্তু যে পুথি
 বিগত বিভার তাহার একই অভি-
 প্রায় নকল করিবার সময় মন পাঠ
 লিখে, কেবল একএকটি অক্ষর
 ন। কোন বর্ণ না বুঝিতে
 কিংবা কোন শব্দ তাহার বিবেচনার
 সাধ্য হইলে আর একটি শব্দ বসাইয়া

দেওয়া তাহার পক্ষে বিচল্য নহে। অত-
 সে বাহা লিখিবে, তাহা সংশোধন
 কোন উপায় নাই। ছাপা অক্ষরের
 দশবার কাটায়া দেওয়া যায়, কিন্তু হ্রস্বলিখিত
 পুথিতে হ্রস্বক্ষেপ করিয়া পাঠপরিবর্তনরূপ
 মহাপাতকের ভাগী কে হইবে? বিভাপতির
 পদাবলী একে গীত, তাহার উপর লিপিকরের
 গুলপনা, পরিবর্তন যে অনেক বহিঃপ্রাণ, তাহা
 সহজেই অসম্মান করিতে পারা যায়। পাঠ-
 পরিবর্তনে পদগুলি অত্যন্ত চটপট ও হ্রস্ব
 হইয়া উঠিয়াছে, অনেকসময় ভিন্ন ভিন্ন পাঠ
 'মিলাইয়াও সমর্থ করা যায় না। বক্তৃ-
 মঙ্গলন প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বিভা-
 পতির পদাবলীর আরও অনেকগুলি সটাক
 সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ-
 বোধের কিছু আত্মকৃত্য হইয়াছে, কিন্তু
 এখনও বহুতর ভ্রম রহিয়াছে। সে কথা
 পরে বলিতেছি।

রাজকৃষ্ণবাবুর প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত
 এই যে, মৈথিলভাষায় রচিত বিভাপতির
 অনেক গীত মিথিলার প্রচলিত আছে এবং
 তাহাদের ভণিতা এদেশে প্রচলিত ভণিতার
 অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি
 গীতের পাঠান্তর ও একটি নূতন গীত উদ্ধৃত
 করেন। পরবর্তী মঙ্গলনকারিগণের পক্ষে
 ইহা একটি বিশেষ সংস্কার। নূতন পদ এক
 আর কত আছে এবং এদেশে প্রচলিত কত-
 গুলি পদের পাঠান্তর মিথিলার পাওয়া যায়,
 এই দুইটি বিষয়ের সীমাংসা হওয়া অত্যন্ত
 আবশ্যিক, কিন্তু এ পর্যন্ত আর সাতটিমাত্র
 মৈথিল পদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে
 বুঝিতে হইবে যে, মৈথিলভাষায় পদ

নাই, অথবা যাহা আছে তাহা প্রকাশযোগ্য নহে, কিংবা পুস্তকসমূহ হইতে ভগ্নিতা-সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলি বাহিরা সরলন করিয়া আমাদের কর্তব্যজ্ঞান কৃতার্থ ও অধ্যবসায় পর্যাবসিত হইয়াছে ।

শেখের অনুমানই সত্য মনে হয় । মহা-জনপদাবলী ও প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে যে সকল প্রকাশিত হয়, মোটের উপর তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট । তাহার পরের সকলগুলি অরি ও বিকৃত ও সম্পূর্ণ হইবে, একরূপ আশা করা যায়, কিন্তু ভগ্নরূপ হয় নাই । বহু কাল কাল সংস্করণে পদগুলি সাজাইবার প্রণালী বিকৃত হইয়াছে । বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি; তিনি মিথিলাবাসী হইলেও বঙ্গভাষার আদিকবি বলিয়া এদেশে উচ্চ সমাদর ও সম্মান । তাহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবলী সকল, তাহার যুদ্ধে জাতব্য সকল কথা নিরূপণ করা বাঙালীর কর্তব্য, কিন্তু রাজস্বকথা অধ্যবসায়ের পথ প্রশ্রয় করেন, তাহা আর কেহ অনুসরণ করেন নাই । বাঙালী দ্বন্দ্ব হইল বটে, কিন্তু যে জাতির অসীম অধ্যবসায়, স্বাভাবিক ও সাহিত্য সংগ্রহে বাহাদুরিগের স্বাভাবিকতা নাই, সেইজাতীয় একজন পণ্ডিত বাঙালীর অসমাপিত কর্তব্য সমাপনে যত্নবান হইলেন । যে সময় সারদাবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সকলনে ও গ্রন্থের উপ-নিয়মিকা লিখনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গ্রন্থসমূহ মিথিলায় তৎপ্রদেশপ্রচলিত বিদ্যাপতির গীতাবলী প্রাপ্ত পরিপ্রসঙ্গ ও যত্ন সহকারে সঞ্চয় করিয়া মৈথিল পণ্ডিতদের সাহায্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন । সারদাবাবু

সকল প্রকাশ হইবার নানাবিধ ছয়-বৎসর পরে, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮১-৮২ সালে গ্রন্থসমূহ এমিরাটিক্ সোসাইটি হইতে মৈথিলভাষার ব্যাকরণ, রচনাসংগ্রহ ও পদার্থ প্রকাশ করেন (An Introduction to the Maithili language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy, and Vocabulary) । এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি-বিরচিত ৮২টি পদ সাংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, অবশিষ্ট ৬টি অপরাপর প্রসঙ্গে । এই পদগুলির অধিক সংখ্যাই বঙ্গভাষার অজ্ঞাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে । বিদ্যাপতিসম্বন্ধে গ্রন্থসমূহ আরও কয়েকটি তথ্য নির্ণয় করেন । দানপত্রের কথা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৭ সালের *Indian Antiquary* পত্রে তিনি সারদাবাবুর লিখিত উপক্রমণিকার প্রশংসা করিয়া আদ্যন্ত অনুবাদ, শিবসিংহের সম্পূর্ণ বংশবলী প্রকাশ এবং অপর প্রথমে বিদ্যাপতিসম্বন্ধে তাহার অভিমত ব্যক্ত করেন । তাহার সঙ্কলিত পদাবলীর পূর্ণভাবে বলেন যে, তাহার বিশ্বাস, গ্রন্থে প্রচলিত সমুদায় পদ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন । প্রথমক্রমে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি কিছু কঠোর কৃতান্তপাত করেন । নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) আখ্যা দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, উদ্ধৃত করিতেছি । "The spurious songs of Vidyapati have been more than once collected. I have gone carefully through every poem in both these collections."

(প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ এবং সারদাবাবুর সংকলন), and am in a position to state that not more than five or six of them altogether show even a resemblance to songs admitted up here (ত্রিহস্ত) to be the work of Vidyapati. Even these are so distorted, both in language and in rhythm, that identification is by no means easy. The songs in the Bengali recension will not even scan according to Maithili rules of prosody, much less can they be brought within the bounds of any rules of Maithili Grammar. The fact is that both these Bengali collections are most interesting as showing the influence of Vidyapati over the Bengali mind, but in no way can they be considered as containing more than a few lines really written by himself." খৃষ্টাব্দ ১৮৮২ সালে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন; ১৮৮৫ সালে তাঁহার মন্তব্য কিছু পরিবর্তন হয়। "দে বংসর" *Indian Antiquary* পত্রে লেখেন—"Owing to the influence of Chaitanya, Vidyapati's poems obtained an immense popularity in Bengal, and were speedily compiled into written manuals of devotion, an honour to which they did not attain in their native country of Bihar." প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ-সমিতি-

পদাবলী-সম্বন্ধেও তাঁহার কিঞ্চিৎ মন্তব্য হয়। "While containing a number of hymns undoubtedly written by Vidyapati it also contains a great number certainly not written by him and the bulk is of very doubtful origin." আটবংসর পরে, ইংরাজি ১৮৯৩ সালে, এমিহাটিক্ পোসাইটির পক্ষে প্রসঙ্গক্রমে আর এক মত প্রচার করেন। "Vidyapati Thakur, who lived in 1400 A. C. has only left us a few songs which have come down to us through five centuries of oral transmission, and which now cannot be in the form in which they were written." বিজ্ঞাপতির মৈবিল-পদাবলীর প্রধান সংকলনকর্তা বলিয়া গ্রাহ্যমান। চিরকাল আনন্দের কুতুহল ও মন্তব্যমতের, হইয়া থাকিবেন; বিজ্ঞাপতিসম্বন্ধে তাঁহা-কোন মত খণ্ডন করিতে সম্মত হয়, শির তাঁহার এই মতগুলি সমীচীন বোধ হয়। মিথিলার বিজ্ঞাপতির সর্বমুদ্র ৮০টি মাত্র তা আছে এবং তাহাতেই তাঁহার এত বশ, ধর্ম-অনুমানই কিছু বিস্ময়জনক। পাঠ্যকাল সম্বন্ধেও তিনি কিছু অসাবধানতার সচিব মত প্রকাশ করিয়াছেন, উত্তররূপে দেখিলে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় মৈবিলব্যাকরণ সংকলন করিয়া ছন্দ ত ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রতি তাঁহার লক্ষ হইবারই কথা, কিন্তু শুধু সেই কারণে দেশে প্রচলিত পদগুলিকে ভুলিয়া অথ জ্ঞান হ্রাস করিয়া অবহেলা করা স্বাভাবিক

রসগ্রাহী স্বাক্ষর উচিত হয় না। তাহদের সংগৃহীত পদগুলি ও অন্যান্যের সংগ্রহের কাব্যায়ণ কল্পনা করিয়া বিচার করা তাচার কর্তব্য ছিল। যদি বিজ্ঞাপতি হইত স্বাক্ষর নাম হয়, একজন নিখিলাবাসী ও আর একজন বঙ্গবাসী, একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাল, এবং তিনি আসল বিজ্ঞাপতি, তিনি গ্রিয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত ৮২টি এই পদ রচনা করেন নাই, তাহা হইলে যে বঙ্গবাসী ছাড়া বিজ্ঞাপতি নিখিলাবাসী আসল বিজ্ঞাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিব, তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না। এদেশে চলিত মোহর যদি মেকি হয়, আর গ্রিয়ার্সন যদি খাঁটি মোহর আদিকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী। তাহার দ্বিতীয় কথা কতক প্রামাণিক। বিজ্ঞাপতির পদ বলিয়া যাহা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি যে তাহার রচিত নহে, সে বিষয়ে ন সন্দেহ নাই, এবং পাঠের যে অনেক ত্রুটি আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু অপরগুলি কিছু সন্দেহিত হইলেও যে বিজ্ঞাপতির রচনা, বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে গ্রিয়ার্সনের তৃতীয় কথা কোনমতেই নয়। লওয়া যায় না। বিজ্ঞাপতির বলা যেমন গীত হইয়া আসিতেছে, মনি পরম্পরাক্রমে পুথিতেও লিখিত বা আসিতেছে। এই ভারতে লিপ্যার কটি হইবার পূর্বে বহুতর মহাগ্রন্থ যথেষ্ট হুতি হইয়াছিল, সহস্রবৎসর যাবৎ কেবল কঠে কঠে ফিরিতেছিল, সে জন্য গ্রন্থ কি লুপ্ত অথবা অতিবিকৃত

হইয়াছে? গ্রন্থ ছাড়িয়া গনি কেবল গীতের উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে বিজ্ঞান্য করি জানেন, শেরী মিঞার গীত কত কালের? তাহাদের পান যেমন রচিত হইয়াছিল, তেমন হইয়াছে। গ্রিয়ার্সনের এই মত অগ্রাধাণ, এরূপ বৃত্তিতে বিজ্ঞাপতির কোন পদ ত্যাগ বা গ্রহণ করা যায় না।

এদেশে বিজ্ঞাপতির পদাবলীর যে কথখানি স্বতন্ত্র সম্বলন আছে, সকলগুলিই প্রাচীনত পদকল্পতরু হইতে নির্মীচিত। প্রথম তৎকালব্যবহার সারবাবা যে সম্বলনখানি প্রকাশ করেন, তাহাতে পাঠে ও টীকায় অনেক ভ্রম আছে জানিয়া তিনি সেই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সমস্ত ভাগ করিয়াছেন। অক্ষরবাবুর প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে 'বিজ্ঞাপতির পরিশিষ্ট' বলিয়া যে পদগুলি আছে, তাহাতে নির্মীচনের কোন প্রণালী নাই, কয়েকটি পদ বিজ্ঞাপতির, অবশিষ্ট অপর কৃতিবিশেষের। পরবর্তী সম্বলনকারগণ এ বিষয়ে অক্ষরবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া ভাল করিয়াছেন। কিন্তু পরনির্মীচনে কোন সম্বলনকার কোনরূপ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দেন নাই। ভগিনী থাকিলেই বিজ্ঞাপতি, না থাকিলে নয়। বিজ্ঞাপতির নামযুক্ত পদ কবির না হইতে পারে এবং অপরভণিতাযুক্ত বা একবারে ভণিতাপূর্ণ পদও তাহার হইতে পারে, এই সকল সম্ভাবনা সযত্নে তাহার কিছুমাত্র ভিত্তির পরিচয় দেন নাই। তাহা ও ভাবগত প্রমাণ, শব্দযোজনা ও ছন্দোবদ্ধি কবির যে বিবেচন আছে, সে সকলের প্রতি কোন সম্বলনকার লক্ষ্য করেন নাই। কলে পাড়াইয়াছে এই যে, একই সম্বলনে এক ভিন্ন

যুক্ত
যখন
গ

পদের ভাষা ও ভঙ্গীতে ষণ্ণ ও মজ্জাগত এত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় যে, তৎসমুদায় একই কবির রচনা বলিয়া কোনমতে বিবাক করিতে পারা যায় না। বিভাপতি নাম অথবা উপাধিধারী অপর কোন কবি এদেশে ছিলেন কি না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বিভাপতির নামসংবলিত কোন পদ পরিভাগ করিতে না পারিলেও সঙ্কলনকারের কর্তব্য সম্ভব-অসম্ভব-সম্বন্ধে প্রমাণাদি ও সূক্তি প্ররোপে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া, এবং বিভাপতির বাস্তব্য কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে, তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া। ব্রটলক্য সঙ্কলন-কারগণ নানাবিধ অবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।

কবির অহুকরণের প্রাচুর্য্যে সঙ্কলনকার কিছু সংশয়ে পড়িতে পারেন। বিভাপতির বৈষ্ণব অসুর্করণ হইতাজিল, বোধ হয় কোন দেশে কোন কবির তজ্জপ হয় নাই। বঙ্গের পশ্চিমদ্বারে বিদ্যাপতি ও অস্তঃপুরমধ্যে চণ্ডীদাস যে সজ্জিত মধুরবাস্তব্যে আবগম্যরী রাগিণীতে গকমহুরে গান গাহিয়াছিলেন, তাহার দিগন্তপ্রসারী পূর্ণবিকাস হইল বৈষ্ণব কবিদিগের শত শত কোকিলকণ্ঠ স্বরূপে। জয়দেবের আলাপসমুদ্রনা বিভাপতির গানে সুউজ্জ্বল বেদন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগমনীসঙ্গীত বিভাপতির গলিত রসিগীতে। তাহার পর সতীত্বক্ষেত্রে বধন গৌরঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, তখন সুরদরিৎ জাহ্নবী বধন উবরতুনিকে উর্ধ্বর করিয়া, বিপুল প্রবাহপুণিসরে, পুনঃকৃত কলকলনাগে, গদগদকণ্ঠে ভণ্ডিতের, পদ্যপদ্য-অমুদারিণী

হইয়াছিলেন, সেইরূপ চৈতন্যের হরিহরিনারির অমুগামিনী অমৃতনিধানিনী উজ্জ্বলিত কাব্যধারা শতসংস্রবী হইয়া, তরল, স্রুতিশীতল, মধুর তরঙ্গতলে তরঙ্গতরবে জারবারাগরগদগদনদয় বঙ্গদেশকে সরস, সিক্ত, প্রাবলিত করিয়া প্রবাহিত হইল। আটীন কবির মধুরসাস্রিত পদ ছিল একবেণী-স্রোতস্বিনীতুল্য, শান্ত, দান্ত, বাৎসল্য, সখা প্রভৃতি বহুতর্য্য ভাবপ্রবাহিণীর মিলনে নানা সঙ্গমতীর্থ হইয়া উঠিল। তাব চৈতন্যদেবের, ভাষা বিভাপতি ও চণ্ডীদাসের—বৈষ্ণব কবিতার ইহাই উপাদান। চণ্ডীদাসের অপেক্ষা বিভাপতির অহুকরণ অনেক অধিক। তাঁহারই ভাষা ভাণ্ডিয়া-চুরিয়া, গড়িয়া-গঠিয়া, রূপরস, ছন্দোবন্ধ, ঠামভঙ্গী, শব্দ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা তাঁহারই পদাবলী হইতে লইয়া মনোমোহন বৈষ্ণবকাব্যসমূহ সৃজিত হইল। মিথিলাবাসী বিভাপতি বাঙালীর কবি নহ, এমন কথা কে বলিবে? যে বলে, সে কাকপ্রেরণক্ গলাগে নিয়া বৈষ্ণবকাব্যের অমৃতসাগরে ডুবিয়া মরুক।

বাহ্য্য বিভাপতির অহুকরণে কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন, তাঁহাদিগের স্বাধা গোবিন্দকবিরাজ প্রধান। গোবিন্দদাস স্বয়ং প্রতিভাবিত ক্ষমতামালী কবি, কিন্তু বিভাপতির আশ্রয় তিনি কোনমতেই পরিভাগ করিতে পারেন নাই। বিভাপতির শিষ্য তিনি অপূর্ণ কৌশল ও কবিত্বের সমিত স্বীকার করিয়াছেন—

বিদ্যাপতিপদ মোহে উপবেশল
রোগে রমণক ঘণা ।

গোবিন্দদাস কহ কৈসন হেরল

এমো ভাবি লগায়ে দশা ।

বন্দনার বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি-পদগুণলক্ষ্যাক্ষ-নির্দেশিত মন্তব্যে।

তৎসং মানসু নাতল মধুর পিবইতে কঃ অমুবক্তঃ।

সেই অমুবক্তের বশবর্তী হইয়া গোবিন্দ-
দাস কেবল বন্দনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই,
পূর্বকবির অনেক কথা, এমন কি অনেক
পদের অংশ নিম্নরচিত ক্রিতে এপিভ করিয়া
লইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, স্থানে স্থানে
বিদ্যাপতির তথিতা ভাটিয়া অথবা অসম্পূর্ণ
পদ-পাইয়া তাহার নামের সহিত আপনার
নাম গোথিয়া দেন। যেমন—

নিজাপতি তৎ মিঃ নত ভানি।

গোবিন্দদাস কঃ চিত্ত এহি দানি।

গীতান্তরে—

এত করি বিশদ ভাবি বঁচি মগন

অনন্তে তনু ভাবি।

অপর

গোবিন্দদাস

পূর্বক কঃ কঃ কঃ

অপর পদে—

পাপ পরণে হাম ভরি কনিত

কঃ কঃ কঃ করি কুহ।

[বিদ্যাপতি কঃ নিতকণ মাধব

গোবিন্দদাস কঃ পর।

উদ্দেশ্য অসাধু নয়, কারণ তাহা হইলে
গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির নাম একেবারেই
লোপ করিতে পারিতেন। সাধারণসময়ে
স্রোতধিনীরূপে আনন্দ, সহকার অবলম্বনে
চূতলুপ্তিকায় যে আনন্দ, বিদ্যাপতির গীতে
আপনার নাম মিশাইলে গোবিন্দদাসেরও
সেই আনন্দ, কিন্তু বিদ্যাপতির গীতসঙ্কলন-
কারের পক্ষে যে কটক রোপণ করিয়া যাইতে-
ছেন, গোবিন্দদাস সে কথা ভাবেন নাই।
কটক দৈবদ্বিগ্ন সঙ্কলনকারও সে পক্ষে অগ্রসর
হন নাই, একপ পদগুলি প্রায় পবিত্র

করিয়াছেন। কিন্তু এই পদগুলি যে বিদ্যা-
পতির,—রচনা, ভাষা ও ভাষ্যগোর এবং বৃত্ত
ভগিতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই সকল
পদ বিদ্যাপতির সঙ্কলনেই সন্নিবিষ্ট হওয়া
উচিত। গোবিন্দদাসের দৃষ্টিতে অজ্ঞ বৈক্য-
কবিও অমূল্যরূপে করিয়াছেন, যথা—

বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি পূর্ব।

রাধাবোধন রাস রসপুর।

রাধাবোধন ঠাহর ঈনিবাগ আচার্যের পৌত্র,
তিনি পদামৃতসমুদ্রের সংগ্রহীতা ও চীকার্ত্তা।

গোবিন্দদাস ও অপর কবিগণ বিদ্যা-
পতির ভগিতায় নিজ নিজ নাম সংযুক্ত
করিয়াছেন বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এমন
পদও আছে, যাহার সম্বন্ধে কিছুই নিরূপণ
করিতে পারা যায় না। পদকলত্রকর্ত্তে
নিম্নোক্ত পদটি আছে

অমন অধি তুমি নাহি কিশল।

চিত্ত তারক গোব পিনে বনে রেখ।

তারি যেই কাটই ন তনারেণী

বদন মেতঃ কঃ রল রেই ধারে।

কি কঃ ব নাখন কটলদুহী।

মতনে চীঘ্রল সকল মতী।

কাতক মলিনী কাতক চন্দনা।

কোই কঃরে আঙল মল্লমলনা।

ময়ল সুখাল হরষ ধরি কৌই।

চাপকিরণে কেহো রাগয়ে গোই।

কেহ মুগ্ধানিল বাইই চীরে।

কোই করম নব কিশলয় ঘুরে।

মধুকরখনি তনি কৌই মুখে কাস।

করতলতালে কোই কোকিল খোদ।

কাঙ্গ-বিগমহি কোন কোন মায়া।

কেহো কেহো হরি তুমি ওৎপারবার।

এননাসাথ্য কুটিত জাপ।

নিচুমেইনাথ ইত রস গান।

এ পদটি কাচার্য্যচিহ্নিত মনে চন্দ্র দি।

‘পতির পদ, বলিরা’ কোন সঙ্গলনকারের মনে হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগের অপরাধ কি? ‘বিদ্যাপতির পরিশিষ্টে’ও নরনারায়ণ অথবা বিজয়নারায়ণের নামগন্ধ নাই। অথচ বিদ্যাপতির পদার্থলীল মৈথিল পুঁথিতে এই পদ প্রায় অবিকল এই আকারে পাইয়াছি। প্রথম শ্লোক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ‘বিশেষ’ (বিশেষ) ও ‘ব্রেশ’ মিলিয়াছে। ‘ব’য়ের উচ্চারণ ‘ব্র’য়ের মত আমাদের দেশে হয় না, মিথিলার হয়; যখন মৈথিল উচ্চারণ প্রণালীতে মিল সাধিত হইয়াছে, তখন ব্রিজেতে পারা যায় যে, পদের ভাবও মৈথিল। মৈথিল পুঁথি না পাইলে ত এ পদ কখনই বিদ্যাপতির সঙ্কলনে স্থান পাইত না! এরকম কত খটয়াছে, কে বলিতে পারে? কত ভিত্তক, কত তত্ত্ব, বিদ্যাপতির রচনাত্মক হইতে যাজ্ঞ বা লুপ্তন করিয়া ধনবান্ হইয়াছে, কে তাহার সুখ্যা করিবে? কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির—কি কতি হইয়াছে? লক্ষ্যের ভাঙা অকাতরে দান করিলে কিংবা লুপ্ত করিলে হুয়াইয়া যায়, কিন্তু সরসভীর ভাঙার কে লুপ্ত করিতে পারে? বিদ্যাপতির এখানে অনেক কবি বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি এই বৈজবকবিকুলচূড়ামণির যশোরশিঙ্গুর হইয়াছে?

যে বক্তার মুখে বিদ্যাপতি পড়িয়াছিলেন, ক্ষুদ্র কবি হইলে তাহাতে ভাসিয়া যাইত। শ্রেষ্ঠ কবি সেই, অঙ্গুরণে-বিক্রান্তিত তাহার সৌরভ মনে হয় না, কালের তরঙ্গাঘাতে তাহার স্মৃতিও ভুতভঙ্গ হয় না। একটি প্রকাশিত কবিতার ভিত্তায় বিদ্যাপতি পদ্যপন্যকে কবিরাজ বলিয়াছেন—কবির রাজ্য

বাগ্মির রাজ্য—বাগ্মিরাজ্য, কল্পা কল্প। বাগ্মি তাহার মস্তকে রাজমুকুট পশ্চাইয়া দেন, তিনি নিম্নটিকে চিরকাল রাজ্যভোগ করেন। কবিতাই কবির সম্পত্তি, কবিতাই তাহার পরোয়ানা। বিদ্যাপতি রাজ্যের পরোয়ানায় হয় তাহার নামাঙ্কিত মোহর, না হয় তাহার প্রাকার ছাপ আছে, তাহাতে নাই, তাহা তাহার সামগ্রী নয়। তথু ভণিতায় যদি বিদ্যাপতি হইত, তাহা হইলে ত বিদ্যাপতির পদের ভাবনা থাকিত না! কোন্ পদ বিদ্যাপতির, কোন্ পদ আংশিক বিকৃত হইয়াছে, কোন্ পদ একেবারেই তাহার নয়, তাহা এই দেশের পদাবলী হইতেই নিদেশ করিতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনটি পদ উদ্ধৃত করিতোছ। প্রথম পদে দুই একটি শব্দের সামান্ত রূপান্তর ঘটিয়াছে—

সখি হে হামারি দুখের নারি ওপরে ।

এ তর বাদর মায় ভাদর

নুন নখির বোর রে ।

যথা খন পরমতি সখাতি

দুখল তরি বরিষতিয়া ।

কাত পাহন কান দাহন

সদনে পর পর হস্তিয়া ॥

হুল্লি কত নত পাত বোদিত

নয়ুত বাচত মাতিয়া ।

মত দাঙ্গারী ঢকে ডাহকা

ফটি বাওরত ছাতিয়া ।

তিবির লিপ তরি সের ঘামিবি

অখির বিলুপ্তি,—পাতিয়া ।

বিদ্যাপতি কহ কইল গোপালি

হরি বিহু দিনহাতিয়া ॥

ইহাতে প্রাকার পুরা ছাপ রহিয়াছে, একটি অঙ্গুলিচিহ্নও অস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া
আয়োজন নাই—

কি কল্পিবে কোথা যাব সোভাগ না হয় ।
না যাব কতিন গ্রীণ কিম্বা লাগি রহ ।
শিয়ার লাগিতা হাম কোনে সেনে যাব ।
রহনী অজ্ঞাত বুটলে কার দুখ চাব ॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ পান ।
হুজা শিবসিংহ লিখি নবমান ॥

ভণিতায় কবির, রাজা শিবসিংহ ও লছিম-
দেবীর নাম থাকিলেও, কলিঙাতায় টাকার
ছয় সের হিসাবে যেমন খাঁটি দ্রুপ পাওয়া
যায়, এই পদ সে হিসাবেও বিদ্যাপতির খাঁটি
পদ নহে । কোন কোন পদে চণ্ডীদাস ও
অপর কবিদিগের পদাংশের সংযোজন
আছে । চণ্ডীদাসের রচনা বিদ্যাপতির প্রতি
আরোপ করা শুধু ভ্রমতর অপরাধ নহে,
অজ্ঞতার প্রমাণ, কারণ উভয় কবির ভাষায়
কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই ।

আর একটি পদের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত
করিতেছি

আজি কেন তোমার এমন সেধি ।
সখনে চলিছে অকণ মাধি ।
অর মোড়া দিগা করিছ কথ্য ।
না জানি কল্পে কি তেল বাধ্য ।

আঁচরে কাকর কলকে সেধি ।
হেম তুলেবর নিগড়ে মাধি ।
বিদ্যাপতি কহ এ কথা বড় ।
যোগত শিরীতি বিদ্য বড় ।

এই পদটিকে মনে কোন বিদ্যা না করিয়া,
বিনা আপত্তিতে যদি কেহ বিদ্যাপতির পদ
বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে
বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব বুঝাইবার
চেষ্টা করা বুঝা । যে কয়েকটি মঙ্গলনে এই পদ

দেখিয়াছি, তাহার কোন-কোনটিতে ইহার
সদৃশে কোনপ্রকার অভিযত প্রকাশিত হয়
নাই । কিন্তু অথবা অবিশুদ্ধ বাংলায়
এখন যদি কেহ পদ রচনা করিয়া তাহাতে
বিদ্যাপতির নাম জুড়িয়া দেয়, তাহা হইলেও
হয় ত মঙ্গলনকার তাহাকে সংশ্লিষ্ট
করেন !

“পঞ্চাশত্রে, ভণিতা না থাকিলেও যে
বিদ্যাপতির পদ হইতে পারে, এককনি-কারগণ
সে সম্ভাবনার পূর কল্পনাও” করিতে পারেন
নাই, কিন্তু এরূপ অনেকগুলি পদ আছে,
এবং ভণিতা না থাকিবার কারণ নির্ণয়
করাও কতিন নহে । পদকল্পতরুতে এই
পদটি পাইয়াছি—

মনমণ তোর কি কহব অনেক ।
কিটি অনরণে পরাণ পর শীড়নি
এ তুয়া কোনে বিবেক ।
চাহিন নখনে শি ভবগণ বারণ
পরিগন বামহি মাধ ।
আম নখনকোণে ঘব হরি পেখনু
তোর তেল এত পরমান ।
পূরনাহির গুণ করত পতাপত
কো নাহি হেরত কান ।
তোহারি কুহুমশর কতিতু না মলক
হামরি কলরে পাঁচ বাণ ।

পদকল্পতরু হইতে আরও একটি পদ
উদ্ধৃত করিতেছি—

মলনি তেরনু মৌবনক আশ ।
নাগন বরিষ ষ্টীত তেল অশ্বত
নাহ রহল পরবাস ।
রাসর বদন নাহি বিন অবসর
পঙ্কজ গরজে গনগটা ।
অবিল চিত্তে যন মেঘ ছেদ
শর্মিলী কলস ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ।

যন বঙ্গ দিগর
চাতক চিত্রাঙ্গি
চাতক চিত্রাঙ্গি
নিখওনগ
বিরলত নবন করে।

তপিতা নাই, ইতিহাস সঙ্কলনকারে নিরপেক্ষ-
ভাবে এইরূপ পদ পরিচায্য করিয়াছেন,
কিছু এ দুইটি যে বিদ্যাপতির অবিকৃত
বিভক্ত পদ, তাহাতে অণুমান প্রবন্ধ নাই।
রচনাক্ষেত্রে, ভাষার গঠনে ও ভাষার
সঙ্কেতে বিদ্যাপতির চৈতন্য পূর্ণের সহিত
এই পদবয়ের সম্মুখ সম্মুখ একত হয়।
তপিতা নাই বলিয়া কোন সংগ্রহকার সঙ্ক-
লন করেন নাই, একই দেহ কারণে পাঠ-
পরিবর্তন অথবা অর্থবিকৃতির সুযোগ হয়
নাই। রামপুরহাটের পক্ষে বেশের অঙ্ক-
ছেন যেমন সহস্রাধা, পাঠের ও টীকা-
কারের পক্ষে কবি ও কাব্যের মুক্তকণ্ঠে বৈষ্ণব
অন্যায়সাধা। বিশেষ এই উভয়বিধ ছেদন-
কার্যে অঙ্গির প্রয়োগন হয় না, নসি ও শাবি-
তায় লেখনী হইলেই অটোই সিক হয়।

সঙ্কলনের পর টীকা ও অর্থ। বিদ্যাপতির
পদ জুঁজু হইবার প্রথম কারণ ভাষা,
দ্বিতীয় পাঠের বিকৃতি। তাহার রচনার
বড় বড় আভিধানিক শব্দ অধিক নাই, কিন্তু
পাঁচশত বৎসরে শব্দের অর্থও কিছু পরিবর্তন
হইয়াছে; অনেক শব্দ এখন যে অর্থে আনয়া
বাবহার করি, বিদ্যাপতি সে অর্থে প্রয়োগ
করেন নাই। তাহার শব্দটির বড় হস্ত,
তিনি শব্দকার। ভাষা আমাদের পক্ষে
অগরিজাত ও অনভ্যস্ত, অষ্টশৈলিয়া ও
অর্থব্রহ্ম হইবার সত্য সত্য সত্য। কিয়,
অব্যয়শব্দ প্রকৃতি গইয়া স্বনৈকগন্য গ্রন

হয়। একে পদকল্পতরু। প্রকৃতিস্থানি
প্রকৃতি প্রাণে কোনরূপ টীকা-পাওয়া যায়
না। পাঠপরিবর্তন হইবারও প্রমাণ কারণ
ভাষা এবং শব্দের জটিলতা, এবং তাহাতে
স্থানে স্থানে অর্থনির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন
হইয়া উঠিয়াছে। পদ্যভূতসমূহের প্রধান
দোষ সঙ্কলনকার রাখানোহন ঠাকুর স্বরচিত
পদ অধিক সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,
বৈষ্ণবকবিত্ত্বের অঙ্গসংখ্যাক পদ দিয়া-
ছেন। বিদ্যাপতির কতিপয় পদ আছে।
যে পদটি তাহার নিজের ভ্রমের মনে হই-
য়াছে, রাখানোহন ঠাকুর সত্য সত্য তাহার
তাহারই ভাষা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠ-
কের যথেষ্ট সহায়তা হয় না। যাহা ভ্রমোপ,
তাহা সুবাদে করাই যে টীকার ও অর্থের
প্রধান উদ্দেশ্য, আধুনিক টীকাকারেরা তাহা
বিস্তৃত হইয়া, টীকাভূতের উপর কাঁড়িলা
উড্ডারমান করিয়াছেন। কাজটা নিত্য
কঠিন নয়। কোষ, দর্পণ, দাঁড়িকা, মঞ্জরী,
ব্যাকরণসহ প্রকৃতির অক্ষরভাষার পদ্ধতি
রহিয়াছে, কিছু উদ্ধার, কিছু আহরণ করিয়া
অগাধপাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকারাশি সংগ্রহ করা
যায়। তথাপি কাব্যের প্রতি কৃপা করিয়া
টীকার ভাষা কিছু লম্বু করিলে হইত ভাল।
স্রীলোকের বেশবিশ্রাসের বোড়স প্রকার ও
তাহার তালিকা, বিরহের দশ দশায় নাম-
কখন, কন্দর্পের পক্ষ কুহুমণের নাম,
দশাবতারের নাম ইত্যাদি ইত্যাদি কতক-
গুলি অত্যন্ত জাতব্য বিষয় অতি প্রাচীন
বয়োবৃদ্ধ টীকাকারদিগের উপর বরাত দিলেও
হইত। কিন্তু এই এত টীকা পড়িয়াও অর্থ-
ভ্রমভাষার ভ্রমস্থিতি হয় না। তখন

স্বাক্ষরপে* নিঠাইবিক্রেতার একটা ছড়া নমন
পড়ে। তাহার পরমার্থ—দীর্ঘায় লাভ,
কি না, বলিতে পারি না। খি আছে, চিনি
আছে, বাবাম-কিস্মিস-পেত্রা প্রকৃতি নানা-
বিধ উপদেশ পদার্থ আছে জল নেই!
ভেমনি আদ্যেশ* এই সকল টাকার টিকা
আছে, টিপ্তনী আছে, অলকার আছে, ব্যাক-
রণ আছে—অর্থ নাই! হানে হানে
টিকাকারমহোদয়গণ অর্থ পুতুইতে পারেন
নাই, এবং* শপাওও অনেকসময় গোল
বাঁধাইয়াছেন। এমন কথা প্রমাণভাবে
বলা যায় না, অতএব কথেকটি প্রমাণ
দিতেছি।

প্রাচীন বেঙ্গলপুত্রির মত, মিথিলার
প্রচলিত প্রণালীতে ও গ্রন্থাদ্যের সহজনে
স্বাক্ষর বয়ঃসন্ধিবর্ণনে পদ্যবর্ণার আরম্ভ,
কারণ তাহাই উৎসপক্ষে পূরণার্থের হুতনা।
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থিত আলোচনার
বহির্ভূত, কিন্তু কে কোন্ পণের পলিক হইবে,
অঙ্কুরাগ অথবা উদাসীনতার পথ অবলম্বন
করিবে, তাহাও সন্ধিবর্ণে স্থির করিতে হয়।
বয়ঃসন্ধির প্রথম পদ “শৈশব যৌবন দুই
মিলি গেল, অরণ্যক পথ দুই লোচন
গেল” ইত্যাদি সকলের স্বরণ আছে। সেই
পদের শেষের দুইটি শ্লোক এই—

মাধব শৈশব অপরূপ বালা ।

শৈশব যৌবন দুই এক ভেলা ॥

বিদ্যাপতি কহে দুই অগোস্তানী ।

দুই একগোল চক্কো কহে দেওয়ানী ॥

চাবুপাঁচ বয়ঃসন্ধির প্রকাশিত কোন
সহজনে এইরূপ টিকা ও অর্থ দেখিতে
পাওয়া যায় “আগোস্তানী—অজানী, অজানী
দেওয়ানী—দান বা চক্কো পদার্থ চক্কো

লোকে ইহাকে দুইএর একত্র বেগে কহে
অর্থাৎ শৈশব-যৌবনের সম্মিলন বলে। ‘কে।
কহে দেওয়ানী’ এইরূপ পাঠ ধরিলে—কে
ইহাকে বুঝি বলে, ইহাতে শৈশব ও যৌব-
নের সম্মিলন বটায়ছে—এইরূপ অর্থ হইবে।
অর্থ ত হইল, কিন্তু বুঝিতে ত পারি সেল
না! শব্দ একটিও চক্কো নাই, ভাবার্থ লই-
য়াই “গোল। দেওয়ানী অর্থ চক্কর ও বুঝী,
অর্থাৎ উভয়বিধ বিশেষণ; চক্কর-লোককে কি
কহে, তাহা বুঝিলাম। আবার ‘ইহকো-
লনের অর্থ ‘ইহাকে’ না হইয়া যদি ‘কে
ইহাকে’ হয়, তাহা হইলে কি অর্থ হইবে,
তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু সংশয় ত
ঘুটিল না। আগোস্তানী কে? টাকার অর্থে
পুলিঙ্গ বিশেষণ মর্মে হয়। গ্রন্থক বিদ্যাপতি
রাগ করিয়া কাহাকে অজানী বলিতেছেন, ও
কেন বলিতেছেন? যে বলিয়াছিলেন, মাধব
পেথলু অপরূপ বালা, শৈশব যৌবন দুই এক
ভেলা, কবি যে তাহাকেই ভিন্নরূপ করিতে-
ছেন, ইহা ত স্পষ্টই দেখা বাইতেছে, আর
তাহার অপরাধ এই যে, সে বলিয়াছিল,
শৈশব যৌবন দুই এক ভেলা। চক্কর লোক
বলে দুই একগোল, সে বলিয়াছিল দুই এক
ভেলা, তবে সে অজানী হইল কেন?—অর্থা-
তঃ কে ইহাকে বুঝি বলে, ইহাতে শৈশব
ও যৌবনের সম্মিলন বটায়ছে, ইহাও ত সেই
অজানীর কথা, কবি তাহাকে বামথ্য একটা
চক্কো বলিলেন কেন? একটি শব্দের
অর্থের গোল করিয়া টাকাকার এই মৌক-
দুইটির অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। যে ভাষার
বিদ্যাপতি রচনা করিয়াছিলেন, সে ভাষার
দেওয়ানীশব্দ উচ্চারণ হয় না, ইত্যাদি এই
শব্দের অর্থ চক্কর হইতে ॥

সেহান অথবা সেহানী—স্রীলিঙ্গ, সেহানী ।
 আবার সেহানী অর্থে যুবতীও নহে । শব্দের
 নিখিল প্রয়োগে সেহানীশব্দের অর্থ যুবতী
 হইতে পারে, কিন্তু অধিতীর্থ শব্দকল্পণী বিদ্যা-
 পতি সেক্ষেপ প্রয়োগ করিবার লোক নহেন ।
 সেহানী অর্থে চকুরা অথবা কিশোরী, এখানে
 কিশোরী । আপেহানী স্রীলিঙ্গ বিশেষণ, দ্বিতীয়
 অতি প্রযুক্ত । দ্বিতী প্রোচা, রসিকা, বাগ-
 বিনয়ী মন্তঃ, বালা গোপকল্পা, শব্দনির্মাণে
 অন্তিষ্ঠা । অসক্ৰপ বালা দেখিয়া আসিয়াছে
 বটে, কিন্তু কেমন করিয়া বর্ণন করিবে, স্থির
 করিয়া উদ্ভিত্তে পারে না । তরুণী বলিলে
 বার্থ বর্ণনা হয় না, আবার শুদিকে
 বালিকাও নহে । ত্রিক শব্দটি খুঁজিয়া না
 পাইয়া সেই গোপকুমারী বলিয়া উঠিল, শৈশব
 যৌবন দুই এক ভেল। তাহাকেই অতি
 মধুর সংসদা করিয়া কথ কহিতেছেন,
 শৈশব যৌবন দুই এক হয় না, দুইয়ের এক-
 গোপে একটি অপূর্ণ তৃতীয় পদার্থ সৃষ্ট হয় ।
 ছে-গোপকল্পে, ছে অজ্ঞানতিমিরাত্তমরনে,
 বাহাকে দেখিচ্ছ, সে কিশোরী, শৈশব-
 যৌবনের সন্ধিরেখাফলে কমলারূপলাভিত
 চরণপাতে শঙ্কারমানা । আবার শৈশবের,
 কিন্তু-যৌবনস্পর্শে ঢকিডকক !

প্রথম মিলনের একটি পদে নারিকায়
 সফোচ, আশঙ্কা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।
 ভণিতা এই—

বিদ্যাপতি অতিশয় গুণ তেলি ।

পুণ্ডিতে তরসি করি কর তেলি ॥

টীকাকার 'তরসি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,
 "তরসি—বলে, বলপূর্ণক । অথবা তরসী—
 বলবান, বলিষ্ঠ ।" অর্থ হটলু কি ? পরশিতে

বলপূর্ণক হস্তধারা চক্রে তেলিয়া দেয়, অথবা
 বলবান স্পর্শ করিতে হাক দিয়া হাত তেলিয়া
 দেয়, না বলপূর্ণক স্পর্শ করিতে হাত তেলিচ্ছ
 দেখ ? যে অর্থ করা যায়, তাহাতেই কিছু
 বিন্দিত হইতে হয় । 'সেহানী' শব্দের মত
 'তরসি' যে উত্তরলিঙ্গ বিশেষণ প্রতিপাদিত
 হয় নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ বল-
 পূর্ণক হস্ত তেলিয়া দেওয়া নারিকার পক্ষেই
 প্রযোজ্য মনে হয় । অনেক বিবেচনা করিয়া
 এই স্থির করিতে হয় যে, তরসী আর কেহ
 নহে, টীকাকার 'নিজে, কারণ তিনি পারের
 ঘোরে এই অর্থ করিয়াছেন । বিদ্যাপতির
 সম্বলনকার ও টীকাকারগণ যদি যন্ত্রপূর্ণক
 প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা পাঠ করেন,
 তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে বিদ্যাপতির রচনা
 বুদ্ধিবার ও বুঝাবান অনেক আশ্চর্য্য হয়,
 কিন্তু তাহারা কোব, বর্ণন, ব্যাকরণ লইয়া
 বাস্ত, অস্ত্র নিক বড়-একটা দৃষ্টিপাত করেন
 না । বিদ্যাপতির এই পাংক্তিটি-পরশিতে
 তরসি করি কর তেলি গোবিন্দদাস অক্লিষ্ট
 এট আকারে গ্রহণ করিয়াছেন । গোবিন্দ-
 দাসের পদে রহিয়াছে

পুণ্ডল মাখ দুগধিনী নারী :

ও অতি বিদগ্ধ এ অতি গোড়াঙ্গী ॥

পরশিতে তরসি করি কর তেলি ।

হেরিতে কন নয়ন ভল পুই ৷

তরসি—তরাসে, জাসে । স্পর্শ করিলে জাসে
 করে কর তেলিয়া দেয়—এই সহজ অর্থ
 পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার উপর তরসিতা
 প্রকার করিবার কোন কারণ নাই ।

বিরহস্তির নারিকার তনিমাবর্ণনে কবি
 কহিতেছেন,—

সকলকে সাহসে চাই না পাঠই

তত্ত্বক লোকের হেতা ।

তত্ত্ব টীকা । “তত্ত্বক লোকের—দ্বিতীয়তত্ত্ব-
বৎ, তাঁদের সদৃশ । এত রূপ যে, তাঁদের
দ্বিতীয় বলিলেই হয় ।” ভাল কথা, কিন্তু
তাঁদের সদৃশ বেহু—হইলে সখীগণ সাহস
করিয়া ছুঁইতে পারে না কেন ? পাছে বেহা-
লার ভারের মত পিড়িপিড়ি করিয়া উঠে,
সেই ভয়ে ? তাঁত যে এত স্পর্শকাতর, সে
কথা ত কেহ জানিত না ! ধূহরিঘরের
ওণ তাঁদের, কিন্তু তাহা কিন্তু স্পর্শসহিষ্ণু,
নীতকালে বোধ করি সকলে দেখিয়া
থাকিবেন । অভিধানে তত্ত্বের অর্থ তাঁত
ছাড়া হুতাগ লেখে, এবং মাকড়সার ঝালকে
লুতাত্ত্ব বলে । তত্ত্ববাগ, তাঁতি ও মাকড়সা ।
তত্ত্বক লোকের দেখা—দ্বিতীয় হুতার
ভায়—দেহ, সখীগণ সাহসে ছুঁইতে পারে
না, ছুঁইলে পাছে চিড়িয়া যায়, সেই

ভয়ে । একরূপ অর্থ করিলে কি অসম্ভব
হইত ?

এমন কত দেখাইব ? সঙ্কলনকারণ
পরিভ্রম স্বীকার করিয়া টীকা ও অর্থ করেন,
তাঁহারা হই যদি অর্থ করিতে অনবরত এইরূপে
ব্রহ্মে পতিত হন, তাহা হইলে সাধারণ পাঠকের
অবস্থা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় ।
একজন সঙ্কলনকার বৈজ্ঞানিক কবি ও ভক্ত-
দিগের ঐতিহাসিকচিত্রিত মধুর শব্দ, ভাবো-
ন্নাস ও ভাবসম্মিলন পুরাতন বিবেচনার
ভাগ করিয়া মাথুরের পর পুনর্নির্মাণ আখ্যা
দিয়াছেন, এবং অতৃপ্তি ও অনুভবের চরম-
অভিভাবিক-রূপ সেই নিত্য নূতন পদে—
জনম অবধি চাম রূপ নেগারলু নহিন না
তিরপিত তেল গ্রন্থ সমাপ্ত না করিয়া
গ্রেমবৈচিত্র্যের একটি গাঢ়রসঘটিত পদে সমাপ্ত
করিয়াছেন । সঙ্কলনকার কি ভাবসম্মিলনের
অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন ?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।

গীতার কালনির্ণয় ।

ভগবদগীতার ঐতিহাসিকভাসম্বন্ধে কতক
গুলি প্রশ্ন আমাদের মনে খতই উন্নয়ন হয় ;
যথা, গীতার প্রণেতা কে ? তাহার প্রণয়ন-
কালই বা কি ? এই সকল প্রশ্নের সম্ভাব্য-
জনক উত্তর দেওয়া কঠিন ; তবে, আনু-

মানিক প্রমাণে সম্ভব-অসম্ভব-বিবেচনার,
যাহা সম্ভব বোধ হয়, তাহা পাঠকের সুস্থখে
ধারণ করাই আমার অভিপ্রেত । ভগবদগীতা
মহাভারতের ত্রয়োদশসর্গের অন্তর্গত । শ্রীসদেব
মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, হুতরা-

পাশ্চাত্যের গীতার - প্রণেতা বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা। কিন্তু বহিরাঃ যত্না ভিন্ন সভ্যতার নাই, কেন না। গীতাকারের নামধাম ভারতমাহিত্যে কোথাপি দৃষ্ট হয় না। গীতার রচনাকোশে একাশ পাও যে, উহাতে ভগবৎ-প্রচারিত ধর্ম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গীতা-গ্রন্থখানিকে কি ভগবৎপ্রচারিত বলা যাইতে পারে? ইহাতে অবশ্য অনেক পরমাখ্যত্ব সম্বিষ্ট আছে, অনেক সাধবান্ ধর্মোপদেশ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার সকল কথাই যে অত্রায়ুগে গ্রহণ করা নাটতে পারে, তাহা নহে। ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থের যে সকল লক্ষণ প্রত্যক্ষিত, তাহা ইহাতে সন্নিবিষ্ট বিস্তারিত আছে, আমি এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বিতীর্ণত, যদি ঈশ্বর সত্যই গীতার রচনাকর্তা হন, তবে গীতাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক বলিতে হয়। কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যে গীতারচনার বহুকাল পূর্বে সমাপ্তি, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেদসময়ানের সমকালীন ঘটনা, যুদ্ধপূর্ব সচরাধিক বংশের পূর্ববর্তী, তাহা নীকশেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এবং গীতার জন্ম বৈদিক সময়ের অনেক পরে, বোধ করি ইহাও কেহ স্বীকার করিবেন না। গীতা স্মৃতি নহে, স্মৃতির মধ্যে গণ্য।

গীতার ঈশ্বর ঈশ্বরবতায় বলিয়া আশ্রমের পরিচয় দিতেছেন। যদি ঈশ্বর তাঁহার আবির্ভাবকালে ঈশ্বরবতায়রূপে আশ্রম সমাবে গৃহীত হইতেন, তাহা হইলে যে সময়ে অথবা তাঁহার ভিরোচিত্যের পরে ধর্মরাজ্যে যোজিত বিদগ্ধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা,

কেন গৃহীত আবির্ভাবকালে হইয়াছিল; যদি তাহা হইত, তবে পশ্চাত্তী শত শত বংশের সাহিত্যে তাহার কোন-না-কোন নিদর্শন পাকা দৃষ্টব্য, কিন্তু তাহা কোথায়? ব্রাহ্মণ বণ, আমিষ উপনিষদ্ বলা, কোথাও এ কথার কোন প্রসঙ্গ নাই। শতপথব্রাহ্মণ, যাহা কুরুপাকালপ্রদেশে বিরচিত, যাহাতে মহাতারতের অনেক বীরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঈশ্বর ঈশ্বরবতার বলিয়া তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনি যোর আদিরসের শিষ্য, দেবকাম্য বলিয়া কথিত, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচিত নহেন। এই সকল গ্রন্থের পর অনেককাল পর্যান্ত কুরু মহাপুরুষ বলিয়া পাত, কিন্তু দেবতা বলিয়া অর্জিত নহেন। পার্শ্বনিত "বাহু-দেবাজ্ঞানাত্মা দুর্ন" বলিয়া একটি হুজ আছে, তাহা হইতে এইটুকু পাওয়া যায় যে, তখনকার কালে কুরুজ্ঞানভক্ত কোন উপাসক-সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু গীতাতে দেবমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের বৈরূপ একাদিপতা স্মৃতি, তদন্ত-বায়ী বিশ্বাস জি হুজ হইতে প্রমাণিত হয় না। পার্শ্বনিত "মহাতাযোঃ কুরু ঈশ্বরত্বের কোন নিদর্শন নাই।

এই ত একপ্রকার প্রশ্ন। এখন দেখা যাউক, গীতাকর্তা ঘটনাটি কতদূর সম্ভব? দুই পুরুষ সেনা ব্যাহিত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে উদ্ভূত, এমন সময়ে যে একপক্ষের সেনাপতি উত্তর সৈন্তের মধ্যে রণতাপনপূর্বক অষ্টাদশ অধ্যক্ষ যোগদান করিতে বসিবে, একপাটা বড় মস্তবপর বলিয়া বোধ হয় না। এই যুগে কোরবসেনাপতিগণ কুরুজ্ঞান

প্রতি অল্প বাণনিকেরূপ করিতে কেনট বা কান্ত থাকিলেন ? উত্তরে বলা গাইতে পারে যে, অর্জুনের দ্বায় প্রতিভাশালী পুরুষ এক ইমারায় সমস্তটা বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল, অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। আমি ত গীতা হইতেই দেখিতে পাই যে, অনেক সময়ে কৃষ্ণোপদেশের আবর্জনাগ্রহণে অর্জুন নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে বাক্য আবার একরূপ বুদ্ধি ও অনিচ্ছা ছি যে, আরম্ভে হইত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ছিল না, অপেক্ষাকৃত কুত্র আয়তন ছিল, শেষের কয়েক অধ্যায় উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এ কথাই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি এক ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে অল্প ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইবার বিচিত্র কি ? কলে, এ কথা স্বীকার করিলে, সমগ্র গ্রন্থখানি অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। যাহারা প্রচলিত বিশ্বাস সমর্থন করিবার জন্য এইরূপ ওকালতী করিতে তৎপর, আমি তাহাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে প্রস্তুত নহি।

আর এক কথা। ধর, রণক্ষেত্রে সত্যসত্যই এইরূপ ধর্ম্মালাচনা চলিয়াছিল, কিন্তু ব্যাসদেব .তো আর সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কেমন করিয়া সমস্তটা শুনিলেন ? ইহার উত্তর এই যে, ব্যাসদেবভূষা মহর্ষি যোগবলে দূর হইতে সকলি জানিতে পারিয়াছিলেন। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর নাই। বুদ্ধি-ক্ষেত্রে ঐশী শক্তির অবতারণা করিলে, অসম্ভবকে সম্ভব করা কিছুই কষ্টসাধ্য নহে। “শিলা বলে ভেসে যায়, বানরে সসীর্ষ গার” —সকলি সম্ভবে। ঐশ্বর্য্যপ্রয়োগের কাছে কোন বুদ্ধিই টিকিতে পারে না।

যাহারা গীতার প্রচলিত-ইরকার মন্ত সমুৎস্রুত হইয়া এইরূপ একদেশদশী বুদ্ধি অবলম্বন করেন, আমি তাহাদের দোষ দিতেছি না—শাস্ত্র দত্ত প্রাচীন হয়, সেই পরিমাণে তাহা আমাদের প্রাণ আকর্ষণ করে। আমি কেবল সত্যের উপরোধে এই স্থানে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। দু পক্ষেরই বুদ্ধি তুলনা করিয়া আমার বিচারে গীতার এই যে, অসংলগ্ধবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা প্রণয়ন করেন নাই, অল্প কোন ব্যক্তি গীতার প্রণেতা। বৃক্সকসমর্থন উপলক্ষ্য করিয়া লোকসমাজে বিভ্রান্ত জ্ঞানধারণ প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি উপস্থানের মুখ হইতে কথা প্রসঙ্গে বাহির করিতেছেন, ইহাই সম্ভব। ৬ বক্রিমচন্দ্রের সহিত এ বিষয়ে আমার এক মত।

গীতার ভাষা, তাব ও মতান্তর আলোচনা করিয়া দেখিলে ঐ গ্রন্থ কোনলম্বিকার নয়, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ ধারণা হয়। কোন সময়কার নয়, তাহা আগে স্থির হইলে, সাহিত্যক্ষেত্রে গীতার স্থান ও তাহার প্রণয়ন-কাল আপনা-আপনি একটা গাড়াইয়া যায়।

প্রথম, ‘সংখ্যেদসংহিতা।’ যে সময়ে বৈদিক ঋষিগণ প্রাকৃতিক দেবতাদের স্তব-স্ততিপূর্ণ স্তোত্রাবলী রচনা করিতেছিলেন, সে কাল গীতার বহুশতাব্দীপূর্ববর্তী, ইহা সূর্য্যবাদিসম্মত।

বৈদিক সূক্তসকল সম্বলিত হইয়া ‘ঋক্’, ‘যজু’, ‘সাম’, এই সংহিতাজন্মে বিতরিত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সময়ে আমরা আর এক রাজ্যে প্রবেশ করি। তখন ঋষিদের যে

কবিত্বের উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ আর নাট্য। তখন এদেশে পৌরোহিত্যের প্রভাব বিধিবিধি-প্রদর্শিত হইতেছে। সাহিত্যও পৌরোহিত্যের আভাস্তিকণিত। সে সময়ে যে সাহিত্যভাণ্ডার প্রস্তুত হয়, তাহার কেন্দ্র রক্ষণবর্ত্ত—পশ্চিমে শতক্ৰ হইতে পূর্বে গঙ্গা-দুনার সঙ্গম প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ও গীতার আবির্ভাবকাল নহে। গীতার অঙ্গ ইহারও অনেক পরে।

গীতার অনেকস্থলে ত্রিবেদেরই উল্লেখ দেখা যায়, চতুর্থ যে অথর্ষবেদ, তাহার কোন উল্লেখ নহি। ভগবান্ একস্থানে অক্, দহু, সাম রূপে আত্মবর্ণন করিয়াছেন (১৭); বিহুতিদোষাধ্যায়ে বেদের মধ্যে আপনাকে সামবেদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; (২২); কিন্তু কোথাও অথর্ষবেদের কোন কথাই নাই। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, অথর্ষবেদ ব্রাহ্মণ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে গীতার প্রণয়নকাল সাব্যস্ত হয় এবং এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত গীতার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করেন, কিন্তু এ অস্বীকার যুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না। অথর্ষবেদ বহুকাল পর্য্যন্ত সাহিত্যসমাজে বেদ বলিয়া লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উহাতে বাহুবীজী (বাহু), ভৈষজ্য প্রভৃতি নানা বিষয় আছে, বাহ্য বাস্তবিক ক্রিয়াধর্মের উপযোগী নহে। কর্মকাণ্ডে ব্যবহারযোগ্য বিষয় উহাতে অতি অল্পই আছে এবং বাহ্য আছে, তাহা শৈবভাণ্ডে অক্ষিপ্ত। এই হেতু শ্রোতা-গ্রন্থাবলীর মধ্যে অথর্ষবেদের কোন মাহাত্ম্য

নহি। অথর্ষবেদ ব্রাহ্মণ্যে উহার কোন উল্লেখ নাই। শতপথব্রাহ্মণও বৈদিক গ্রন্থবিভাগ বলিয়াই জ্ঞানেন—বৌদ্ধধর্মেরও উহা গ্রন্থ-বিভাগে পত্রিচিত। কৌশীতকীভাষ্যে—ছানোগ্য উপনিষদে অথর্ষবেদের উল্লেখ নাই। অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত—অধিক কি, অমরকোষেও * অথর্ষবেদ বেদের মধ্যে ধর্মবাই নহে। যদিও পাতঞ্জলভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদে অথর্ষবেদের উল্লেখ আছে, তথাপি মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে আদিয়া না পৌছিতে উহার বৈদিক প্রতিপত্তি অস্বীকার হইত না। বিহুপুত্রাণে অথর্ষবেদের একজন বত্সর পুরোহিত নির্দিষ্ট হইয়াছে। গোপথব্রাহ্মণে অথর্ষবেদ ব্রহ্মবেদ বলিয়া কীর্ণিত। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণের পূর্বে ব্রাহ্মণ, বহু প্রভৃতি অজ্ঞাত প্রাচীন শাস্ত্রে উহার বেদাসন নির্দিষ্ট হয় নাই। অতএব দেখা যায় যে, অথর্ষবেদ বেদের মধ্যে গণ্য হইবার পূর্বে বহুকাল অতিজ্ঞাত হয়! এখনো পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের অনেকানেক অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণেরা ঐ বেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই সকল কারণে, অথর্ষবেদের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া গীতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয় না।

উপনিষৎসকল বেদের শেষভাগ, এই মত উপনিষৎকে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশ ব্রাহ্মণ্যনামে অভিহিত, তাহা উপনিষৎ অপেক্ষাও প্রাচীনতর, সন্দেহ নাই।

উপনিষৎ আবার একসময়কার রচনা নহে। উহাদের রচনা ও বিষয় ভেদে কাল-

বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি উপ-নিষদ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি আধুনিক, কতক বা এই দুই কালের মধ্যবর্তী। উপনিষৎসমগ্র চারপ্রশ্লোকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের ঈর্ষান্বিত আদিম উপনিষৎগুলি গণ্ডে শ্রেণীত; সে গণ্ড আধুনিক সংস্কৃতগণ্ডের অনুরূপ নহে, ত্রাক্ষণগণ্ডের আদর্শে রচিত। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কোশীতলী এইশ্রেণীভুক্ত, কেনোপনিষৎ গণ্ডপক্ষে বিরচিত। কেনোপনিষৎ হইতে আমরা ছন্দোব্রহ্ম পঞ্চোপনিষদে আদিয়া পড়ি—কঠোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, মেতাখতর, মুণ্ডক, মহানারায়ণী—এই সমস্ত দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়শ্রেণীর উপনিষৎগুলি স্বাবার গণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই গণ্ড আধুনিক সংস্কৃতগণ্ডের ধরণে রচিত। মৈত্রায়ণীয় ও অপর কয়েকটি উপনিষৎ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থশ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত উপনিষৎ পরিগণিত, তাহা অপর-উপনিষৎ, পুস্ত্রপক্ষে বিরচিত। যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, সর্বদ্বন্দে প্রায় সম্বন্ধিত-সংখ্যক হইবে। ইহাদের অনেকগুলি আধুনিক, এমন কি, আল্লোপনিষৎ নামক ঐচ্ছবিশেষ ইহার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। ঐশ্বর, মুণ্ডক, মাণ্ডূকা এই উপনিষৎত্রয় অথর্বোপনিষদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের দার্শনিক তত্ত্ব বোদ্ধ।

এই শ্রেণীকৃত শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত ভবের উপদেশ সন্নিবেশিত, তাহা চার-প্রকার—

১। আদ্যতত্ত্ব।

২। যোগসাধন।

৩। মন্ত্রাদি।

৪। অবতারবোধ ও কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিবের দেবত্ব প্রতিষ্ঠা।

গীতার কালনির্ণয় করিতে হইলে ইহাকে কঠমি দ্বিতীয়শ্রেণীর পদ্যবর্তী বলিয়া অবতীর্ণ করা করিতে হইবে। এই শ্রেণীর উপনিষদের উপদেশ ও তাবধি গীতার অনুরূপ; এমন কি, ইহাদের কতিপয় শ্লোক গীতার মধ্যে মন্ত্ররূপে সমানীত দেখা যায়।

অথর্বোপনিষদের সহিত গীতাক্ত উপদেশের সমাদিক সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। অপরাপর তত্ত্ব ছাড়িয়া অবতারবোধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কিম্বৎপরিমাণে গীতার কালনির্ণয়ের সন্ধান পাইতে পারি। গীতার যে অবতারবোধের কথা আছে, তাহা বেদে নাই, ত্রাক্ষণে নাই, আল্লোপনিষৎগুলিতেও নাই। ঈশ্বরের অবতারকল্পনা—কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিবের ঈশ্বরত্বস্থাপন—সাংসারিক ভাবে আধ্যাত্মিক এইরূপ পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পরিচায়ক। এই হিসাবে গীতাকে অথর্বোপনিষদের সমকালবর্তী বলিয়া নির্দেশ করা অসঙ্গতবোধ হয় না।

গীতার পূর্বে যে আমাদের দর্শনশাস্ত্র-সকল প্রণীত হইয়াছিল—দ্যাবাদর্শন, যোগ ও বেদান্তদর্শন—ওধু মুখে মুখে অসম্পূর্ণ কথায় নয়, কিন্তু শাস্ত্র বা স্বজ্ঞাকারে গীতার সমরসে সমস্ত প্রচলিত ছিল, গীতার মধ্যে হইতেই তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। গীতার সাংখ্যতত্ত্ববদল বিস্তারিতরূপে উপদিষ্ট—

সাংখ্যদর্শনকে গীতার দার্শনিক ভিত্তি বলিলেও অত্যাধিক হয় না। গীতার সময় সাংখ্যশাস্ত্র যুজ্জ্বলভাবে গঠিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবারও কারণ আছে। তাহার সাক্ষী অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৩শ, ১৮শ শ্লোক দেখ। ১৩শ শ্লোকের “সাংখ্য কৃতান্ত” অর্থাৎ সাংখ্য-সিদ্ধান্ত এবং ১৮শ শ্লোকোক্ত “গুণসংখ্যান” অর্থাৎ গুণের সংখ্যাকরণ,—ভাষ্যকারের এই বাক্যগুলি—সাংখ্যশাস্ত্র অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে, তখনকার কালে সাংখ্যদর্শন কাব্যাবধি শাস্ত্রাকারে পরিণত হইয়াছে।

যোগদর্শনও গীতার আদরের বস্তু। ইহার এক নামই যোগশাস্ত্র। জ্ঞানযোগে সাংখ্য, কর্মযোগে যোগশাস্ত্র—গীতার অবলম্বন। আমরা দেখিতে পাই যে, পাতঞ্জলদর্শনের যোগসাধনপ্রণালী গীতাপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত; ভগবানে দ্বিভুতসংযোগ প্রকৃতি ভগবৎকৃতি-মূঢ়ক কতকগুলি কথা, বাহ্য কিছু নূতন, তাহাই গীতার নিম্নস্থ সম্পত্তি। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রায়শ্চেষ্টে যোগশাস্ত্রসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, “পুরাতন যোগশাস্ত্র কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়াছে—হে পরব্রহ্ম! তুমি আমার উক্ত ও নবা, সেই পুরাতন যোগ—উত্তম রহস্য—আমি অভ্যস্ত তোমাকে বলিলাম।”

বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই—সে সম্বন্ধ পদে পদে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের একস্থানে ভগবান্ ‘বেদান্ত-কৃত’ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। শ্রীধরস্বামী তাহার এই স্মরণ করেন “আমি তৎসম্প্রদায়প্রবর্তক জ্ঞানদাতা হইলাম।” যদি

শ্রীকৃষ্ণকে বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে গীতার সময় বেদান্তদর্শনের অস্তিত্ব ও লোকসম্মুখে প্রকাশ সহজেই প্রতিপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, ১৩শ অধ্যায়ের এমশ্লোকোক্ত ‘ব্রহ্মসুত্রগম্যগীতং’ কথাগুলি এই প্রশ্নকে বিচারযোগ্য, উহা পরে আলোচিত হইবে।

উল্লিখিত দর্শনত্রয়ের মধ্যে সাংখ্যই প্রাচীনতম। কপিলমুনি সাংখ্যশাস্ত্রের আদি-গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি বৌদ্ধযুগেরও পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিষ্ঠ ধারণা হয়, কেন না, বৌদ্ধধর্মে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আর বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবাদ এই যে, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিল-বাস্ত, কপিলের নাম হইতেই তাহার নামকরণ হয়। সে বাহ্য হউক, কপিলের স্মরণিত কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। আমরা এ পর্যন্ত যে সমস্ত সাংখ্যগ্রন্থ পাঠ্যচাছি, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গীতার সময় দর্শনশাস্ত্র-সকল কি আকারে প্রচলিত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। যদি এমন মনে করা যায় যে, সে সময় পাতঞ্জলদর্শন বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে গীতার প্রণয়নকাল খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দীরও উত্তরকাল হইরা পড়ে।

কিন্তু যদিও এ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত করা আমাদের সাধ্যাত্ত নহে, তথাপি সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রাচীনত্ব-বাদে বিশেষ সন্দেহ জন্মে। যখন দেখা যায় যে, গীতাক্ত দর্শনতত্ত্ব তাহার পূর্বগামী দর্শন হইতে সংগৃহীত—সেই সমস্ত দর্শনের সমন্বয়-সাধনেই গীতার প্রণয়ন হয়, তখন গীতার কাল

নিদানপক্ষে দর্শনদ্বয়লক্ষণের পরবর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বর্ণাশ্রমধর্মের কণ্ঠের প্রতি গীতার বিশেষ লক্ষ্য। বর্ণাসম্বন্ধের উৎপত্তি হইতে সমাজ-বিপ্লবের আশঙ্কা উহাতে পদে পদে সূচিত হইতেছে। পরধর্মের তুলনার স্বার্থের প্রেরিত্য, পরধর্মাবলম্বন বিনাশের মূল— এইরূপ উপদেশ আর্ধ্যসমাজের আদিম অবস্থার কথা নহে। বৌদ্ধধর্মের অনুদ্বয়ে ঐ সমাজে যে ধর্মোত্তর-জাতিবিশিষ্ট উপস্থিত হয়, সেই বিশিষ্ট নিবারণ করা ঐ সমস্ত উপদেশের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এ অসুখান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গীতাকে বুদ্ধের আবির্ভাবের পরবর্তী বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এতদ্বিধ ভূতপাদনা, স্বীকারবাদ ও ভক্তিনোপের কথাসকল আধুনিক কালের অসুখল সাধ্য প্রদান করে।

সূত্রসাহিত্যের পর মহাভারত ও মনু-সংহিতার উল্লেখ করিতে হয়। ইহাদের ঐক্যবৎ গীতার স্থানে স্থানে উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টিপ্রকরণ, বর্ণাশ্রমের কর্তব্যবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে মনুর সহিত গীতার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কমলাদনহ ব্রহ্মা, গদাচক্রধারী বিষ্ণু, সেনাপতি রত্ন, সমুদ্রমন্দ্রপ্রস্থত উল্লেখ্য ও ঐরাবত, নাগরাজ বাহুকি, পঞ্চড, নকরাতির কথা হইতে মহাভারত ও পৌরাণিক অধ্যয়নসকল স্রবণপথে উদ্ভূত হয়। মহাভারতে আছে, ভীষ্মদেব দেহভ্যাগের পূর্বে সঙ্গতিগাভার্য শ্রবণব্যায় উত্তরাংশ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। গীতাও উপদেশ দিতেছেন যে, যোগীর উত্তরাংশে মূঢ়া হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও দক্ষিণাংশে প্রাণত্যাগ হইলে

সংসারে পুনরাবর্তন হয়। মোক্ষ অর্থে নির্লাপস্বের প্রয়োগ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়। মহাভারতের সাদৃশ্য হইতে গীতার কাল-নির্ণয়ের বিশেষ কোন সাহায্য হয় কি না, দেখা যাউক।

মহাভারত যদি একসময়কার রচনা হইত ও তাহার রচনাকাল অকাট্য প্রমাণদ্বারা নিরূপণ করা সুসাধ্য হইত, তাহা হইলে গীতা মহাভারতের অন্তর্গত ব্রহ্ম-তাহার কালনির্ণয়ে আমরা অনেকটা কৃতকার্য হইতে পারিতাম, কিন্তু সে পথ বন্ধ। বিভিন্নবাবু তাহার কৃষ্ণচরিত্রে মহাভারতের মুখা হইতেই দেখাইয়াছেন যে, মহাভারতের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথমটি আদিম কাল, তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আশ্রম-যঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা চতুর্বিংশতিশোকাধিক ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। প্রথম-শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেই অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয়-শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাউতে পারে। প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ দৈবরাষ্ট্রের বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনায় দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন ঐশ্বর্যশক্তি দ্বারা কোন ক্রমে সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অচ্ছিত; 'নরোত্তম' নিজে

ঈশ্বরকে ঘোষণা করেন কবিও তাঁহার ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষপ্রকারে বশীকরণ। ইহা ভিন্ন মহাত্মারতে আরো এক স্তর আছে, তাহা তৃতীয় স্তর। এই তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথ: ইহার ভিত্তির আসিয়া পড়িয়াছে।

পাক্কাটা পণ্ডিতেরাও মহাত্মারতকে স্তরে স্তরে বিভক্ত করেন—

১। আদিম কবাল (কাব্য)।

২। চতুর্বিংশতিশতাব্দী সংহিতা (মহা-কাব্য)।

৩। কৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের আকার।

৪। পরবর্ত্তী প্রকৃতিপ্রাণ।

তাঁহাদের মতে য: পু: পক্ষম শতাব্দী হইতে তৃতীয় বা চতুর্থ পট্টে পর্যন্ত মহাত্মারতের ব্যাপ্তিকাল। প্রায় সহস্র বৎসরে সহস্র শ্লোক লক্ষাধিক শ্লোকে, পুণ্ডিত্য করিয়াছে—বীররামচন্দ্র কাব্য তাহার এই বর্ত্তমান ধর্মশাস্ত্রের আকারে পরিণত হইয়াছে। এই-কালমধ্যে কত সাম্রাজ্য নর, নরোত্তম, নারায়ণ—সমুদ্র হইতে ক্রমে দেবতার পদে সমাক্রম হইয়াছেন।

এই সংযোগ্যতার মধ্যে গীতা কোন্ স্তরে স্থাপিত হইতে পারে? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তদ্বাক্যবীজী ভাষ্যপণ্ডের অন্তর্গত, কিন্তু গীতা মহাত্মারতের প্রকৃতিপ্রাণ কি না এবং কোন্ সময়েই বা প্রকৃতি, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিভিন্ন বাদালাপ চলিতেছে। অতএব ভাষ্যপণ্ডের অন্তর্গত বলিলেও গীতার কালনির্ণয় অধিকদূর অগ্রসর হয় না। মহাত্মারতের একটি শ্লোক এত

প্রশ্নকে উদ্ভাপিত হইতে পারে—তাহা এই—

যদাহোম্যে কামেনেভ্যস্তপসে
সংযোগে সীমবনেহস্তমৈর্দৈ।
কৃৎস্নলোকান্ বর্জনান: পরিত্যজ্য
তদা নান্দ্যসে বিত্তহাংসস্তথ।

বৃত্তরাগবিলাপ। আদি, ১ম, ১১০

“যখন তনিলান, অর্জুন, হুঃখাভিত্ত হইয়া সংযোগে অবগত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কত তাঁহাকে ধীর শরীরে বিকল্প বর্জন করাইয়াছিলেন, তখন, হে সজ্জ, আমি বিশ্বের আশী পরিত্যাগ করিলাম।” কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? ইহাতে ত খাঁড়ার নামোল্লেখ নাই। এমন হইতে পারে যে, এইশ্লোকাক্রমে ঘটনা অবগতন করিয়া পরবর্ত্তী কোনকালে গীতার রচিত হইয়াছিল, যেমন মহাত্মারতের শকুন্তলাখ্যান অবলম্বন করিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল বিরচিত। তাহা ছাড়া, উক্ত শ্লোক কোন্ স্তরের অন্তর্গত, তাহা নিরূপণ করাও সহজ নহে। মহাত্মা কালীনাথ ত্রাঘক তেলঙ্গ বাহাভাষ্যর নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গীতাহবানের উপক্রমণিকায় গীতার জয়কাল অন্তত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী অনুমান করেন। গীতার ভাবা, ছন্দ, রচনাপ্রণালী, বর্জন, বেদ-যজ্ঞ-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে উহার মতামত ইত্যাদি বিষয় লইয়া আভ্যন্তরিক প্রমাণ। গীতার কালনির্ণয়ের উপযোগী বাহ্যপ্রমাণ বাহা পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তির সারাংশ এই :—

তিনি বলেন, শকরাচার্য্য গীতার ভাষ্যকার—শকরাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর লোক, যেতএব গীতাগ্রন্থখানি অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে ছিল, ইহা নিশ্চিত।

‘কালিদাসী’ প্রণেতা বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাবয়রীতে ভগবদগীতার উল্লেখ আছে। তাহার একস্থানে রাজবাটী-বর্ণনার মহাভারতের সহিত রাজার প্রাসাদের উপমা দেওয়া হইয়াছে এবং “মনস্তগীতাকর্ণনান্বিতনর” এই শব্দগুলি সেই প্রাসাদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। এই বিশেষণ প্রাসাদের প্রতি প্রয়োগ এবং মহাভারতে প্রয়োগ করা বাইতে পারে এবং তদনুসারে তার দুই ভিন্নার্থ হয়। প্রাসাদে প্রবৃত্ত হইলে এই অর্থ হয় যে, সেখানকার লোকেরা অনন্ত গীত-শ্রবণে আনন্দিত। মহাভারতের সম্বন্ধে এই যে, লোকেরা সেখানে অনন্তগীতা অর্থাৎ ভগবদগীতা শ্রবণে আনন্দিত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাবয়রীচন্দ্রের সময় মহাভারত ও গীতা পাঠ জনসাধারণে প্রচলিত ছিল।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে কবি কালিদাসের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং বাণভট্টের পূর্বে কালিদাসের জন্মকাল বলা বাইতে পারে। কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত, ইহা একপ্রকার দ্বিধা দিকান্ত। কালিদাসের কাব্যে গীতার বচন হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মহাত্মা তেলঙ্গ রঘুবংশ হইতে একটি দিয়াছেন, তাহা দশম সর্গে দেবতাদের বিজ্ঞত্বের ৩১তম শ্লোক—

অনবাস্তবমবাণবাঃ কতে কিলন বিদ্যাতে ।

লোকসুহৃৎ এবৈকো হতুশ্চৈকত্বকর্ণণীঃ ॥

কি অসহ অসক কিং অত্রাপা তোমার,

নিভু পরিপূর্ণ, এতু বিবেক স্বপদ

চন্দ্র-করম তসু কথিত গীতঃ ।

কেবল লোকের হৃদিত করিতে সাধন ॥

নবীনচন্দ্র দাস ।

ইহা হইতে গীতার অনেক স্থানের শ্লোক ও ভাবার্থ স্মরণ হয়। ভগবানের যে কোন কর্তব্য নাই, লোকসুহৃৎ হইয়া লুপ্তই তিনি কর্ণে নিযুক্ত, তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ২০শ হইতে ২৪শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের “দিব্য জ্ঞান কর্তব্য” এই বাক্যগুলি-শব্দই অন্ততঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিজ্ঞত্বের আর একটি শ্লোক আবার মনে হইতেছে

(২৭) বজ্রবেশিতচিত্তান্যং বৎসনর্পিতকর্ণধাম ।

গতিঞ্চ বীতরাগাণাম্ অহুঃসসিহৃদয়ে ॥

বিষমবিরাগমতি সেই হৃদিগণ

যোগফলে বিহ চিত্ত নির্বেশ তোমার ।

সর্বকর্ণ তোমার পরে করে সমর্পণ

লোকপতি পারে তাহা তোমারই কৃপায় ॥

নবীনচন্দ্র দাস ।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে—

যে তু সন্ধানি কন্দানি মরি সন্নত মংগলাঃ ।

অনন্তৈবেষ বোষণে মাং ধ্যাচ্ছ উপাসতে ॥

তোমারঃ সন্মুখতঃ কৃত্যসংসারনাশনাং ।

তবামি ন চিরং পার্থ মন্যাত্মনিতত্বত্বত্ব ॥

এ গ্রন্থের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সাধুত্ব, তাহা বিনা কণগ্রহণে উৎপন্ন হইতে পারে না ।

আবার, কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গে ৬৭তম শ্লোকে সুপর্ণিধের মূষেহিমালয় স্থাবর বলিয়া কর্ণিত। গীতার বিজ্ঞতিবোধ্যার্থেও ভগবান্ “স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ” বলিয়া আশ্ব-বর্ণন করিতেছেন। মন্নিমার্গ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যথার্থেই লিখিয়াছেন—“‘স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ’ ইতি গীতাবচনাৎ ॥”

এই কয়েকটি উদাহরণ হইতে কালিদাসের কাব্যে গীতার আভাস সহজেই উপলব্ধ হয়, সুতরাং গীতা পঞ্চমণ্ডিতাপীরও পূর্ববর্তী, ইহা নিশ্চয় হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত গীতাহাবাদের সহিত আমরা দেখে এক মত। অতঃপর তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, গীতা বেদান্তহস্ত অপেক্ষাও প্রাচীন। এই মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা তাহা অঙ্গুলি সন্ধান করিতে পারিলাম না। বাদরায়ণের বেদান্তহস্ত প্রাচীনতায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে গীতার কোন নামোদ্যম নাই। কোন কোন হস্তে প্রমত্তবাক্যে স্বতন্ত্র কথা আছে বটে, কিন্তু সে কোন্ হস্তি, তাহার নির্দেশ নাই। ভাষ্যকারেরা বলেন, সে হস্তি গীতা, কিন্তু সে তাহারের নিজের মত, তাহার গৃহপোষকপ্রমাণাভাব। অজ্ঞাত পণ্ডিতেরা ইহাতে মতভেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। “বেদান্তহস্তের অপর নাম ব্রহ্মহস্ত—গীতা স্বয়ং একস্থানে সেই নাম কীর্তন করিয়াছেন,—

বিস্তৃতিবহা গীতঃশোভনবিশেষঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মহস্তমসৌন্দর্য্যং হেতুমতিবিশিষ্টতঃ ॥ ১৩

“কবিগণকর্তৃক বিবিধ ছন্দে এবং হেতু-বিশিষ্ট হুনিশ্চিত ‘ব্রহ্মহস্ত’পদ দ্বারা উহা (কেজল তব) পৃথকরূপে বহু গীত হইয়াছে।”

তত্ত্ব বোদ্ধমূল্য তাহার প্রাণীত বর্দ্ধমান এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই দ্বোকে ‘ব্রহ্মহস্ত’পদে ‘বেদান্তহস্ত’ ব্রহ্মহস্ত হইবে। “হেতুমতিবিশিষ্টতঃ” এই দুই বিশেষণ ব্রহ্মহস্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্যব-

হৃত হওয়া সম্ভব। বেদান্তহস্তে যে স্বতন্ত্র প্রমাণ লিপিত আছে, তাহা গীতাতির অন্ত কোন স্বতন্ত্র হইতে পারে—স্বতন্ত্র মূল বেদান্ত, তাহার বচনও হইতে পারে; এ বিষয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যেও মতভেদ; কিন্তু, তাহার বাহাই বলুন, গীতাত্ত ব্রহ্মহস্ত বেদান্তহস্ত অর্থে গৃহীত হওয়া বস্তুতঃ সম্ভব, তাহার বিপরীতপক্ষে তাহারের ব্যাখ্যা তেমন প্রতীতিজনক নহে।

অতএব গীতার কালনির্ণয়সম্বন্ধে তেলঙ্গ-মহোদয় যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ ধরিবার নাই, এমন নহে। সে বাহা হউক, তিনি গীতার যে সময়কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও উহাকে দূরে কেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না—বরং আরো উত্তরকালীন বলিলেও বলা দাইতে পারে। অনেকানেক সমীচীন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পক্ষপাতী। গীতার সময় প্রাচীন যোগশাস্ত্র মূলপ্রায়, ইহাতে তাহার পুঙ্ক-কজীবনের চেষ্টা হইতেছে। কাশিল সাংখ্যও এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, কশিলহুনি সিদ্ধযোগীর পক্ষে সমাকর্ষ হইয়াছেন। ১৩ ব্যাসদেবও অসিত-দেবলের সঙ্গে দেবর্ষি-মধ্যে পরিগণিত। ১৩ তাহা ছাড়া, গীতার ভাষাও বৈবিক নহে, সামান্ত ব্যতিক্রম বাদে আধুনিক সংস্কৃত, ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রণয়নকাল বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যায় না। উপনিষদের অধ্যক্ষভাগ, মহাভারতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্কন্ধের গঠনকাল যাহা, গীতার রচনাকাল মোটের উপর তাহাই ধরা দাইতে

পারে—বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্তী সকলই অস্থান্যের উপর নির্ভর, আদি এ
—খৃষ্টাব্দ-প্রবর্তনের কিছুকাল অগ্রপটাত বিবরে কোন অত্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই-
উহার জন্য বলাই সম্ভব। যাহা হউক, এ রাছি, এ কথা বলিতে সাহস করি না।

ত্রিসত্যোজ্ঞনাথ ঠাকুর ।

আজি ।

আজি পূর্ণ হ'ত যদি আজিকারি মাঝে !
তপনখচিত এই নভ চক্ৰাতপ,
স্বপ্নভীর নীল ছটা মাথার বিরাজে,
বাকবহিটপী যত পল্লব-সৌষ্ঠব
বিকাশে কবির মত সুন্দর প্রচুর,—
সহকারে বাড়ে কল নিটোল কটিন
সরস কৈশোরসম ! তপ্ত স্নমধুর
সোমরসসম আলো ! জরালসহীন
সারাদিন চলে যায়—কণে কর্মপর,
কণে নেত্রবারিমোছা, ব্যথিত অন্তর,—
কতু তীত্র রোজালোকে বহুমর পথে
চলে যাওয়া বহুদূর বাধাহীন পথে,
কতু স্থির বসে থাকা ক্ষান্ত দিবা কাজে !
আজি পূর্ণ হয়ে থাক আজিকার মাঝে ।

সতীশচন্দ্র রায় ।

স্মৃতিমন্দির ।

পৃথিবীপতি বাদশাহ তাঁহার মধ্যবেদনার ছবি
বেতমন্দিরে রচনা করিয়া রাজধানী আগ্রার
উপাভ্যাসে যমুনাতীরে রাখিয়া গিয়াছেন।
আগ্রার তীর্থস্থলে শাজাহান বাদশাহের
তুহারখল পার্বণময় শোকাঙ্গ। আজ
সার্বজনিনত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে,
সে বাদশাহ নাই এবং তাঁহার অবশেষের
উপর এই শোকমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
তাঁহার অস্ত শোক করিবার ইচ্ছা পৃথিবীতে আর
কৈহই নাই। কিন্তু এই বিয়োগবিধুর প্রেমিকের
কদয়োচ্ছ্বাসের ছবি দেখিয়া আজ পণ্ডিত
কতনত মুতাপীড়িত মননারাজ কদরতন
হইতে ক্রুদ্ধশোকবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,
কে তাহার অহলকান করে। আসমুত্র-
হিমচলবিধৃত সারাজোর একাধীশ্বর,
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ময়ূরতক্ত বাহার সিংহাসন,
কেশবকোবিলম্বিত-কোমলভিন্দিত কোহিমুর
বাহার নিরোদ্ধ্বগ্ন জিহ্বাংকটি মানব বাহার
স্বাক্ষাপালনে সর্বল স্নোভহত, সেই সাধুন-
সাহা বাহশাহ শতচোটেও একটমাত্র
নারীকে রাখিয়া রাখিতে পারিলেন না।
হায়! মানব, তোমার ক্ষমতা এতই তুচ্ছ,
তুমি এতই দুর্বল!

শোকের সাধনা, সুপের সহ-
চরী, যোগের সেবা, অবসরের চিত্ত-
বিনোদন, সংসারমকতুমির কৃষ্ণতলচ্ছায়া-
কুপিতা মহিলাকে বাতবেষ্টনয় মগে

রাখিতে শাজাহান কি না করিতে পারিতেন।
কিন্তু কৈ, তাঁহার কদরলিঙ্গের পক্ষি
আরুহনম্ বাহু কৈ রহিল? সুখে-দুখে,
সম্পদে-বিপদে, বছরব্য ধরিয়া যে পার্শ্বচরী
ছিল, হঠাৎ তাহাকে হারািয়া এক নিমিষে
বিশাল বিষে নির্জন, নিঃসঙ্গ, আশ্রয়হীন,
একাকী হওয়া কি কঠিন, তাহা বাহার সে
হুংস ঘটনাতে, সেই জানে। স্বর্ঘ্যচক্রে
বেখানে গতিরোধ, বায়ুবেখানে ধীরে প্রবাহিত
হয়, সেই মোগলরাজ্যতঃপূরে সবলে প্রবেশ
করিয়া সর্বস্বর কাণ যখন বাদশাহের প্রেমবেষ্টন
হইতে রাজমহিলাকে হরণ করিল, শাজা-
হানের তাত্ক্ষণিক মনোভাব অতীবথোপ্য
মাত্র, বর্ণনাতীত। শোকের প্রথমোচ্ছ্বাস
অতিবাহিত হইলে, মৃত্যুকে যগ্যমন্তব জ্বলন,
রমণীয় ও উচ্ছল করিয়া তুলিতে বাদশাহ ইচ্ছা
করিয়াছিলেন;—এ ইচ্ছা বাতাবিক। জীবিত
থাকিতে বাহার তাবনা আমরা তাবি, বাহার
অন্ত আমরা কাজ করি, বাহার প্রয়োজন
সাধন করিয়া দিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ
করি, মৃত্যুর পরেও তাহারি তাবনা তাধিতে,
তাহারি উদ্দেশে কাজ করিতে আমাদের পন
চাহে—ইহা প্রেমের ধর্ম। আমাদের
প্রেমের পাতা মৃত্যুর অধীন বটে, কিন্তু প্রেম
চিরজীবী। ইহসংসারে আমাদের প্রেম
ব্যর্থ, মর্দ্যাহত হইতে পারে; যম আমাদের
প্রেমের পাতাকে মনহে-মসমানে আমাদের

নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে; কিন্তু সেই বার্ষিক, বর্ষাকাল, বিরোধপূর্ণিত প্রেম সকল বাধা-বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে প্রেমভাঞ্জনকে অহুসরণ করে—তাহাতেই তাহার চরম সার্থকতা। অবরোধসৌন্দর্যের শিবোমনি সম্ভাঙ্ককে বাদশাহ বে ভাদবাসিন্তেন, সেই অনির্ভিন্ন গভীর ভাদবাসিন্ত এই সর্গাঙ্গহৃদয় মৃত্যু-মন্দিরের সৃষ্টিকর্তা। নতঃ অর্থাৎ, অহঙ্কার ও ক্রমতার বাধা দি যে, পাদপদ্মের এমন জ্বলন করিয়া রহিতে পারে, পাদপদ্মে এত কোমলতাপরিবেশ করিতে পারে, প্রত্যন্তকে এমন শোকনয়ন করিয়া কুণিতে পারে।

শশিধ্বজাধিকারিত, নন্দনধ্বজিত, উদার, উজ্জ্বল, নীল নভোমণ্ডলের নিম্নে, ইংগর-লোকবাপী অদীন প্রেমের কি নহিমাগ্নিত ছবি! মৃগসুগন্ধের সাক্ষিকরূপিত, মেহদারপ্রবাহিত শীতলমিলা যমুনার নিকট—আগ্ন কত-কালের কথা শুনিয়াছি একদা বিরোধ-বিধ্বস্ত প্রজবালা তাহার নগ্নবেশে শুনিয়াছি। প্রিয়তার সান্নিধ্য যোগদানবাদশাহ বিশ্ববিজয়ী মৃত্যুর নিকট পরাজিত হইয়া জীবিতরূপিত মহাবীর শব্দেই বৃকে করিয়া সজলনয়নে সমস্তের চিত্রশাস্তি সেই যমুনার কাছে আসিয়াছিলেন। শাজাহান আজ নাই, কিন্তু করুণাময়ী দাশিনী বাদশাহের হৃৎকথার আশ্রয় বৃকে করিয়া বহিতেছে;—স্বর্ষিক প্রভাতে, উত্তম নধ্যাহ্নে, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়, নিবিড়-নিম্নক নিশিথে ভূষাঈশীতল জলধারায় ভূপতির এই মৃত্যুআলি দুইয়ক লইয়া অনন্ত মহাসাগরে ফেলিতেছে। মৃগ-মৃগান্তরীণী প্রেমের অনিবার্য মাহাত্ম্য

অনিবার্যের অনানন্দের চকুনির্ভর মহা-শুভ্র রাজ্যধিরাজের শোকবাদ আশিও কাদিয়া কাদিয়া বুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই হে প্রেমিক, তোমার শোক আজ বিশ্ববাপী—অন্য-অন্য-অন্তরিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমগ্র বিশ্বের মৃত্যুপীড়িত-নয়-নাথী সেই শোক অন্তরে-অন্তরে বুরিয়া তোমার শোকসান্দ্য, যমুনাসৈক্যভিত্ত প্রতীকীকৃত নীর্যবাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ব্যথিত ও মর্দ্যহত হইতেছে।

হে পরলোকগতা রাজরাজেশ্বরী আদাম-বাহু, তুমি ঐশ্বর্য ও বিরহে পরিপূর্ণ মণ্ডী-বহন যোগদানভাঙা-পূরে হৃৎকথিত ছিলে কি হৃৎকথিত ছিলে, তাহা তুমিই জান। করুণার বলে ঐতিহাসিকদুল, গাহার বাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাটশ্রেষ্ঠ বিজয়বরের প্রণয়ে তোমার কি-পরিমার্গ স্থান ছিল, তাহা বোধ হয় তুমি অবগত নাই। কেহট জানিতে না। যে ইং-লোক হইতে চলিয়া গেলে পৃথিবীর সব স্বপ্ন, সব জ্ঞানই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুরাইয়া যায়, জীবন তুচ্ছ ও দুর্লভ বলিয়া মনে হয়, জীবিত থাকিতে যে যে আমাদের কষ্ট আত্মীয়, কষ্ট নিকট ছিল, তাহা তাহাকে জানাইবার আমাদের অবসর হয় না, ইহা সংসারের অতি-বড় প্রাচীন এবং অতি-বড় কঠিন গুণ। শাজাহানের বৃষ্টি সেই হৃৎকথিত পড়িয়াছিল। অক্লেশ-অশনিসম্পাত-তুলা হৃৎকথা প্রতিকা মহাবীর মৃত্যুসংবাদ এখন বাদশাহ পাইলেন, রাজকাধারিত বাদশাহের শাজাহান তখনও বৃষ্টি তোমাকে জানাইবে—পারিষদ বার—তুমি তাহার ক:

প্রিয় ছিলে। তাই তোমার সমাধিমন্দিরে বাদশাহের এত 'ব্যাংকুজ' আমরা দেখিতে পাই। বিপ্লব-বঙ্গের ধরিয়া 'বলি বলি' করিয়া রাজ্যোচ্চর যে কথা বলিবার অবসর পান নাই, তোমার অবসানের পর প্রায় বিপ্লব-বঙ্গের ধরিয়া 'তাজ' নির্মাণ করিতে করিতে, তাহার প্রতি প্রস্তরগলিবেশের মধ্যে কত বয়ে বাদশাহ সে কথা কতবার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'তাহা বাহার চক্ষু আছে, সে-ই দেখিতে পারে।' তাজকোষ পুস্তক হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট জীবিতকাল সমস্তই ঐ কার্যে কেন্দ্রণ করিয়াছেন; তথাপি রাজরাজেশ্বরের তৃপ্তি হইয়াছিল কি না, কে জানে। জরাজীর্ণ বেহে, অকসরমনে, জীবনের সারাত্তে বাদশাহ বধন বীরগুত্রকর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন পুত্রের নিকট প্রাসাদমধ্যত এমন একটি ঘর নির্জনবাসের তত্ত্ব চাহিয়া ছিলেন, যেখানে হইতে বিনাশে একবারও 'তাজ' দেখিতে পান। জীবনের শেষতম নিমেষে বধন কঠবাগ উপস্থিত, তেজোজন চক্ষুতরকার সূতার করাল ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তখনো বাদশাহ ইহপরকাল তুলিয়া প্রাণপণে সূত্রের সমাধিমন্দিরের প্রতি পলকহীন-দৃষ্টি রাখিয়া ইহলোক হট্টতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

মোগলবাদশাহের অবরোধপ্রাণে জীড়া করিয়া, প্রাসাদসংলগ্ন উপবনের গন্ধবাসু সেবন করিয়া, সহস্রদর্পণখচিত মর্থরপুটে উৎসমুখনিঃসৃত স্নগন্ধজলে স্নান করিয়া, পারসিক সূর্যবস্ত্র পান করিয়া, মণিশিখি-খচিত বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া, হস্ততানের বাদশাহের মর্ত্য একপ্র

মকুমসিংহাসনে উপবেশন করিয়া স্নখ পাইয়াছিলে কি না, জানি না। কিন্তু যে পরলোকবাসিনি, তোমার স্মৃতিচিহ্ন লইয়া পৃথিবীর অধিতীয় সম্রাট জীবনের অবশিষ্টাংশ কি ভাবে কাটায়া-ছিলেন, যদি তোমার 'পত্নীলোকে' বসিয়া তাহা একবারও দেখিরা থাক, তবে বোধ করি স্নখ ও গর্জ হুই-ই অশ্রুতব করিয়াছে, এবং শাস্তাহানের জীবনব্যাপী তপস্যাও সার্বক হইয়াছে।

এ পৃথিবী হইতে যে একবার অবসর গ্রহণ করে, সে আর কিরে না, আনানিগকে পরলোকগত প্রিয়পাত্রের স্মৃতি লইয়াই থাকিতে হয়—উহাই আমাদের অবশিষ্ট জীবনব্যতীর সম্বল। কিন্তু নিরাকারত্বক্ষোপাঙ্গনার অধিকারী যেমন সকলে হইতে পারে না, তেমনি নিরবয়ব স্মৃতি সংসারের চাণ-জ্ঞান হইতে বাবজীকন স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল রাখা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই আমরা স্মৃতির উদ্বোধক একজী-কিছু চাই, বাহা আমরা প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে রাখিতে পারি। মপল্পপণালিত্য-পরিপূর্ণা, মহামহিমামিতি, পায়পস্বন্দরী, 'তাজ' ব্যতীত এই রাজদম্পতির প্রেম আজ পর্যন্ত স্নমহান্ মর্ত্যলোকে কে জাগাইয়া রাখিতে পারিত বলিতে পারি না।

রক্তপাষণবেদিকার উপরে খেতপ্রভাসান পাতিয়া, স্পন্দহীন-মহামৌন-পাষণবেগিনী আজ সার্বকিঙ্কর বর্ষ পরিয়া লোকান্তরিত রাজমহিলার পাণ্ডিবেদ্যবিশেষ কোলে করিয়া মহামোহে নিমগ্ন রহিয়াছে। স্মরণ-কৃপণে ভোগমায়াতে পায়পস্বন্দরী দেহ

সর্বপ্রকার-অনাবগতবাহুলা-বর্জিত, তৎ-
প্রভাবে তাহার প্রতি অল্প দিয়া দ্বিধ-কাহ-
অনির্ঘণ নাথান্যোতি পড়াইয়া পড়িতেছে।
সমাধিশায়িতা সাম্রাজীর প্রেমপ্রভাবে,
প্রোক্ষিত পুণ্যযতিমায়, নিষ্কোষ পাবণপ্রতিমা
অপূর্ণগাবণ্যময়ী প্রোচা হৃদয়ীর সর্বপ্রকার
পরিমায় ও মহিমায় মত্তিত হইয়া উঠিয়াছে।
স্ববুৎ তোরণবাহের সমুখে গ্লাড়াইয়া এক-
বার যে এই বাক্যহীনা হৃদয়ী পাবণীকে
চক্ষু তুলিয়া দেখিয়াছে, তাহার চক্ষু সার্থক।

দ্বিচ্ছোচ্ছল প্রামোভাসম্পন্ন উপবনমধ্যে
অমল-দল পাবণহৃদয়ী 'তাজ'—অনন্ত-
নীল চম্পাতপত্নী গগনতলে অমল-দল
পাবণহৃদয়ী 'তাজ'—গোপালনার আনন্দ-
বর্জন নন্দনন্দনের নন্দসংস্কর্তা নীলবসনা
বহুলার উপকূলে পাবণহৃদয়ী 'তাজ'—
অনন্তনীলিমায়ী প্রকৃতির ফোড়ে 'তাজের'
এই অনিন্দনীর ধবল দোলণী শতগুণ বৃদ্ধি
পাইয়াছে। সমাধিমন্দিরের কারুখচিত
অভ্যন্তরশোভা দেখিলে মনে হয়, সম্পদ-
লালিতা রাজমহিষীর দেখনিবাস বর্ধা
তাহার উপযুক্ত করিয়াই বাদশাহ রচিতা
গিয়াছেন। সপতির অদ্ব্যত কোণে ভিত্তি-
গাত্র বিচিত্রবর্ণাঙ্কিত ফুল, পল্লব, পত্র, পক্ষি-
গুলি যেন সজীব বলিয়া মনে হয়, অথচ
সমাধিমধ্যস্থ পীতাত কীর্ণালোকের শোক-
মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দেখিলে মৃত্যুস্রাজের
উন্মাদবিহীন গভীর ছায়া মনের উপরে
আপনি আসিয়া পড়ে। আলোকপ্রবেশ-
পথ প্রশস্ত হইলেও ঐরূপ স্বকোণে স্থাপিত
সে, প্রাণসংকরক দগ্যরশ্মি প্রচুরপরিমাণে
প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমন্দিরকে হৃৎকোণে নিবৃত্ত-

কতা ভাঙিয়া দিতে পারে না। বে কীর্ণা-
লোকটুকু প্রবেশ করে, তাহা নবোদিত
স্বর্ষের রক্তরশ্মি নহে, তাহা সমাধিমধ্যস্থ
অন্ধকারের সহিত নিশিয়া পীতবর্ণ হইয়া
যায়; মনে হয়, যেন সাদীষশতবর্ষ পূর্বে
রাজেন্দ্রাশির জীবমানে যে স্বর্ঘ্যালোক ছিল,
তাহারই কিরণংশ যেন তাহার নববেগের
সঙ্গে সঙ্গে সমাধিমন্দিরে রাখিয়া দেওয়া
হইয়াছে।

রাজরাজেশ্বরের বিচিত্রকাক্যার্থখচিত
সমাধির সম্মুখিত হইয়া মুসলমান ধর্ম-
বাজকগণ যখন ভক্তিপরিপ্লুত গলাধকণ্ঠে
নিবিলস্রব্দাওপতি পরাংপর পরমেশ্বরের
নামকীর্তন করে, তখন কথরচূড়ার অপূর্ণ
নির্মাণকোণে প্রোতার মনে হয়, যেন
ধীরে ধীরে বায়ুস্তরসকল ডেদ করিয়া ক্রমে
অক্ষুটতর হইতে হইতে উল্লম্বখোজারিত
নামকীর্তন অনন্তের মহিমায়, সিংহাসন-
তলে পৌছিতেছে। হে পরলোকপত পৃথী-
নাথ, অনাদিকাল হইতে যে প্রিয়বিরহ এবং
অপ্রিয়সম্মিলনে বিধাতার বিশ্ব অর্জরীকৃত
ও ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে, যে মৃত্যু আসিয়া
নভে-নভে, পলে-পলে বিশ্বসংসারের সকল
সৌন্দর্য, সকল আনন্দ হরণ করিয়া জীবনের
অস্থিকালগুলি আনিয়া অপরতের চকের
সমুখে ধরিতেছে, তাহা হইতে কাহারো
অব্যাহতি নাই। যে মমন্ত উপাদান একত্র
মস্মিলিত হইলে স্বধ মানবের নিকট আপনি
আসিয়া ধরা দেয়, তাহার তাহার একটিয়া
অভাব ছিল না। কিন্তু তাহা সর্বত্র একটি-
মাত্র ঘটনা উপলব্ধ করিয়া, এক অঘাতে কে
তোমাকে উদ্ধৃত্ত এবং কোথা হই

কি হুজ অবশ্যন করিয়া, কোন সময়, কাহার উপরে, কি ভাষাত আসিয়া পড়িবে, বিনি সর্বকর্ম্যাকারণের নিদান, সেই সর্বকর্ম্মের ভিন্ন এ কথাই উত্তর কে দিবে ?

অন্য এবং মৃত্যু, এ দুইটি জীবজগতের অস্তিত্ব-বৃত্ত বৃহৎ ঘটনা। জগতের মধ্যে আমরা ভগবানের অঙ্গরূপ দেখিয়া থাকি, এবং মৃত্যু ঘটিলেই কাতরকণ্ঠে বিধাতার নির্দয়তা ঘোষণা করি ; কিন্তু জানি না, সেই নির্দয়তার মধ্যে কি গভীর কল্যাণ জীব-হিতের নিমিত্ত কল্যাণময় সঞ্চর করিয়া রাখেন। নিদাঘসন্ধ্যার প্রবল ঝটিকা এবং প্রাণসংহারিণী বিদ্রাবণিধাই আমরা দেখি, কিন্তু বিশ্বদেবতার প্রেমধার-স্বরূপ নববারিধাভাষ যে হ্রস্বত কল্যাণ সাধিত হয়, তাৎপ্রতি আমরা সম্পূর্ণ উপাসীন।

যে ইচ্ছাপ্রবাহে আজ তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই বিতীর্ণ জনপদের উপভোগ

শুইয়া প্রতিবন্দী রাজত্ববর্ণের বুকোত্তর বহু অকোহিণী বাহিনীর মধ্যে রথস্থাপন করিয়া, সাময়িক করুণার কর্তব্যবিরত মহাবীরের প্রতি উপদেশজ্বলে, ভগবান বলিয়াছিণেন -- "জাতন্ত হি এবো মৃত্যুঃ এবং অন্য মৃতন্ত চ।" যদি সর্বভাবদানী সর্বময় যোগেশ্বরের কল্যাণকর উপদেশবাক্যে আমা-দের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিত, তবে বোধ করি জীবনের কানন্দটুকু আমরা নিঃশেষে ভোগ করিতে পারিতাম, অপরিহার্য মৃত্যুভয়ে আমরা এত সন্ত্রস্ত ও কাতর হইতাম না ; কিন্তু তাহা হইবার নয় ! তাই হে সম্রাট, ইন্দুমতীর বিরহে স্তব্ধাংগ নরপতি বিশ্রাম করিয়াছেন, তুমি পামাণমর্থা বিশ্রামগীতি রচনা করিয়া গিয়াছ। পরবর্ত্তিগণের সে সাধ থাকিলেও বোধ করি সাধা নাই -- তাহার কেষণ নিঃশব্দনয়নজলে প্রিয়জনের পূণ্য-স্মৃতিটুকু শুইয়া শুইয়া আজীবন অমলিন করিয়া রাখে।

শ্রীজগদীশ্বরনাথ রায় ।

নিশীথিনী ।



* সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকশিত তারা,
দিগন্ত মিলার বর্ন, নভস্তল চক্রে কলাহার।

কালো-অন্ধকার যেন কালো ঐক ভবর বিপুল
আবরিগা বসিয়াছে মধুময় ধরণীর স্থল।

সেই আলো-শ্রুটিত লক্ষদল কুহুম স্কন্দর,

তাপি পূরে বিস্তারিয়া করিবে ডানা, গভীর অতর

‘দিদারি’, অতল মধু বিস্মলিয়া করিতেছে পান,
 ধরণী-গগনে লাগে মধুসূদ-সোহাগের টান !
 রসভরা বহে বায়ু বনস্পতিসাধার সফরি,
 রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছে আবরি !
 আন্তরের ক্ষুদ্রতম ভূগর্ভে লাগিছে শিশির,
 অতল নিস্তার রসে ভূবে গেছে জীব ধরণীর ।
 সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই,
 মনে হুঃ এ আধার একেবারে নাই রস বই !

৩সতীশচন্দ্র রায় ।

হুম্মান্ ।

বৌধ-পরিবারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং
 পতীর তেজস্বান, ভ্রাতা বা সচিবেরও সেই-
 রূপই একটি স্থান ; এই বিচিত্র প্রীতির সম্বন্ধ
 জ্ঞানের ভাবে মহিনাথিত হইয়া গৃহধর্মকে
 কিরণ অথবা সৌন্দর্য প্রদান করিতে পারে,
 —রামায়ণকাব্যে তাহা উৎকৃষ্টভাবে প্রদর্শিত
 হইয়াছে ।

হুম্মান্ প্রথমতঃ স্ত্রীজীবের সচিবরূপে
 রামায়ণের নিকট উপস্থিত হন । ইনি
 সচিবোচিত সদৃশ্যাবলীতে ভূষিত ; ইহার
 প্রথম আশাপ্রার্থনা করিয়াই রাম সুদৃষ্টিতে
 লক্ষ্যণকে বলিয়াছিলেন—“এ ব্যক্তিকে
 ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বোধ
 হয়, ইহার বহুকণার মধ্যে একটিও অক্ষর
 ভ্রষ্ট হইল না”,—

“বচ ব্যাকরণজ্ঞানেন ন কিঞ্চিদপ্যসিদ্ধম্”

“অক্, বক্ ও দামবোদ পাদদর্শী না হইবে।

এভাবে কেহ কথা কহিতে পারে না ।
 ইহার মূগ, চক্ষু ও ক্র দোষমুক্ত এবং কঠো-
 ক্ষারিত বাণী সদয়হর্ষিণী ।” অশোকবনে
 সীতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্কালে ইনি তাঁহার
 সহিত সংস্কৃতভাষার কথোপকথন করিবেন
 কি না—মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন ।

সুতরাং দেখা যাঁহিতেছে, ইনি শাস্ত্রদর্শী ও
 সুপণ্ডিত ছিলেন । কিন্তু তুধু পাণ্ডিত্যই
 সচিবের প্রধান গুণ নহে—অটল প্রভুত্বজ্ঞ ও
 তাহার অভ্যাবশ্যক গুণ ।

স্বর্গীয বালির ভয়ে অগৎ ভ্রমণ করিতে-
 ছিলেন । কোথায় প্রথরদৌরকরমণ্ডিত
 যবদীপে, কোথায় রক্তিমাতঃ দ্রবতীক্ষ্মা
 মোহিতসাগরের বর্ষ্য ও শুবাকতরুপূর্ণ
 বেলাতুমি, কোথায় বা দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্ত-
 বিত দ্বির অদ্রাবণীর জায় পুণ্ডিতকপিরি
 পৃথিবীপ নানা দিপেন্দ্রে চাঁতচিতে স্বর্গীয়

পর্বাটন করিতেছিলেন। তখন যে কয়েকটি বিখ্যাত অমুচর সর্দার তাহার পার্শ্ববর্তী ছিলেন, তন্মধ্যে হুজুমান্ সর্দার প্রধান। হুজুমীর প্রতি অটল ভক্তির তিনি নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‘এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

দম্ভোপকূলে উপস্থিত হইয়া বানরসৈন্য এক সময়ে একান্ত হতাশ হইয়া পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না—হুজুমীর নিদিষ্ট একমাসকাল অতীত হইয়া গিয়াছে—অতঃপর হুজুমীর আদেশে তাহাদের নিরশ্বেষ অন্তস্তাবী, এই শত্রুর বানরবাহিনী আকুল হইয়া উঠিল;—তাহারা পরিশ্রান্ত, ক্লমপিপাত্তর, নিরাশাগ্রস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত। পিপাসার তাড়নায় ইতস্ততঃ পর্বাটন করিতে করিতে তাহারা এককূলে পশ্চাৎপুরুষাক্ষ-চক্রবাক-দশনে এবং তল-ভার্য্য-শীতলবায়ু-স্পর্শে কোন জলাশয় অপর্যবর্তী বিবেচনার অগ্রসর হইতে লাগিল। আগের ভয় বিসর্জন দিয়া তাহারা বহুক্রোশ-বাপী এক গভীর অন্ধকারগহ্বার মধ্যে জলা-সেবণে ঘুরিতে ঘুরিতে সঁহসা পূর্ণিবীনিরে এক সাধুপুণ্ডিত বাপীবল্ল মনোরম রাজ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কৃধাতুকা নিবারণিত হইলে, তাহারা আগের আশঙ্কার পুনরায় বিকল হইয়া পড়িল। তখন সুব-রাজ অঙ্গ ও সেনাপতি তার সমস্ত বানর-বৃন্দকে হুজুমীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তাহারা বলিলেন—‘কিচ্ছিন্না কিরিয়্য গেলে জ্বরপ্রভৃতি হুজুমীরে হতে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিৎ, এস আমরা এষ্ট স্বর-গত হুজুর অধিত্যকার তপে হাম কপি, আর

বসেশে কিরিয়্য যাইবার প্রয়োজন নাই।’ সমস্ত বানরসৈন্য এই প্রস্তাব সুসম্মত করিয়া বলিল—‘হুজুমী উগ্রবৃত্তাব এবং রাম বৈয়। নিদিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন রামের শ্রীতির মন্ত হুজুমী মবন্তই আমাদিগকে হত্যা করিবে।’ হুজুমান্ হুজুমীকে ধর্মজ বলিয়া উল্লেখ করিতে অঙ্গ উত্তেজিতকর্মে বলিলেন—‘যে ব্যক্তি চোঠের জীবদশাতেই জননীদশা তুংপটীকে গ্রহণ করে, সে অতি অবন্ত; বালি এই চর্য্যাকারে শত্রুকর্ত্তে ঘায়ে নিরোণ করিয়া বিলম্বো প্রবেশ করিয়া ছিলেন, কিন্তু ঐ চুট প্রস্তরবারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, স্ততরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্মজ বলিব? হুজুমী পাণী, কৃত্ত ও চপল, সে যঃ আমাকে যৌব-রাজ্য প্রদান করে নাই, বীর রামই আমার যৌবরাজ্যের কাগ। রামের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া সে প্রতিজ্ঞা বিসৃত হইয়াছিল—লক্ষ্যের ভয়ে জানকীর অবেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আবার ধর্মজান কি? সে দৃতিশাস্ত্রের বিধি লখন করিয়াছে—এখন জ্ঞাতিবর্ণের মধ্যে কেহ আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান বা নিষ্ঠুর হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে—আমি শত্রুপুত্র।’

অঙ্গদের এই সকল কথার বানরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহারা ক্রমা-গত বালির প্রশংসা ও হুজুমীর নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

এই উত্তেজিত সৈন্যগুণীর মধ্যে হুজুমান্ অটলমক্কাড়। তিনি দৃঢ়মূর্ধে বলিলেন, “সুবরাজ, আপনি যেন কপিবেন না,

এই বানরমণী লইয়া এই গ্রামে আপনি
রাগ করিতে পারিবেন। বানরগণ চঞ্চল-
বীভাব, তাহারি। এখানে গোপুত্রহীন হইয়া
কখনই আপনার আত্মদান থাকিবে
না। আমি সূর্যকণ্ঠে বলিতেছি, এই আবদান,
সুহোত্র, নীল এবং আমি,—আমাদিগকে
আপনি সামান্যাদি রাজত্বে কিংবা উৎ-
কট পণ্ডিত্য ও সুগ্রীব হইতে তেজ করিতে
পারিবেন না। আপনি তারের বাক্যে এই
গর্ভে অবস্থান নিরাপদ মনে করিতেছেন,
কিন্তু লক্ষণের বাণে ইহার বিদারণ অতি
অকিঞ্চিৎকর।”

বিপৎকালে এই ধৈর্য ও তেজ প্রকাশ
করিয়া হুম্মান বানরমণীকে আশ্রয়লহ
ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

হুম্মান সুগ্রীবের শুভ আত্মপালনকারী
ভৃত্য ছিলেন না, সত্যত তাহাকে হুময়না
এবং তাহার কর্তব্যাবৃত্তি প্রবৃত্ত করিয়া
দিতে। লগ্নদমনরাস্ত সুগ্রীবকে ইনিই,
মর্ত্তসমুনির আশ্রমসমীপে ভবামুকপর্কতে
প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, টহা বসাইয়া দিয়া-
ছিলেন। বালিবধের পরে যখন বর্ষাকরে
শরৎকালের সূচনায় গিরিনদীসমূহ স্রব-
গতি হইল—তাহাদের পলিনদেশ বীরে বীরে
জানিয়া উঠিল, সেই সিকতাহুমিশোভী ভ্রাম
সপ্তজন্মভরুর তরুণ পরব এবং অমন ও
কোবিদারবৃক্ষের সুসমিত দৌলধ্য গগনা-
লম্বিত হইয়া গিরিসাহস্রদেশে চিত্রপটের দ্বার
অঙ্কিত হইল, সেই সুখশরৎকালে কিত্তিকা-
পুরী রমণীগণের সমতাপদ্যাকর তরঙ্গীণিতে
বিলাসের পর্যায়ে সুখস্রমে বিভোর ছিল,—
সুগ্রীবের তরু প্রাণদমনের কক্ষীর নিষেধ

এবং খলিত হেমন্তের “ভিলোনে স্রাবিষ্ট
হইয়া পড়িয়াছিল।” তখন শিক্কার গিরি-
গুহার একটি গানে প্রবনকজের দ্বার কর্ত-
ব্যের স্থিরচকু জাগ্রত ছিল—তাহা বিলাসের
মোহে কণেকের ভক্ত ও আচ্ছন্ন হয় নাই,
তাহা সত্য প্রবৃত্তি হিতপথের প্রতি স্থিরলক্ষ্য
ছিল। লক্ষণের কিত্তিকাপ্রবেশের বহু-
পূর্বে, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হুম্মান
সুগ্রীবকে রামের সঙ্গে তাহার ঐতিজ্ঞতির
কথা শ্রবণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত বানর-
বাহিনীকে রামকাণ্ডে সমবেত করিবার
অন্ত আদেশ বাহির ত্রিগা হইয়াছিলেন।
সে আদেশ এই—

“ত্রিপদরাজস্বয়ং যঃ প্রাপ্য বাহিহ বানরঃ।

তত প্রণামিকো যঃ সো নার কথো বিচারণা।”

‘যে বানর পঞ্চদশ দিবসের পরে
কিত্তিকায় উপস্থিত হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড
হইবে—ঐহাতে আর বিচারবিবেচনা নাই।’

ইহার পরে রোহিণীসুত্রসাধরে লক্ষণ কিত্তি-
কায় প্রবেশ করিলেন। বিলাসী সুগ্রীব
বিপৎ সমাকুলে—উপনাস্তি না করিয়া ক্রুর-
কটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়া বলিয়া-
ছিলেন—

“ন মে দুর্ভাগ্যতঃ কিত্তিকায়ি মে দ্রুমস্থিতঃ।

লক্ষণো রামব্রজাত ক্রুদ্ধঃ কিসিতি চিত্তয়ে।

ন যথসি মম আসো লক্ষণাশাপি রামবাং।

মিত্রঃ দুঃখানুগৃহীতঃ জননীত্যেব সমনয়ঃ।

“দর্শনা স্বকঃ মিত্রঃ দ্রুমস্তঃ প্রতিপালনং।”

“আমি কেনরূপ অস্তায় আচরণ বা
সুখস্রব করি নাই; রামচন্দ্রের ভাই লক্ষণ
কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি-
বাম না। লক্ষণ উইতেই ‘ক. রাম হইতেই কি,

আমার ত ভয় করিবার কিছু নাই; তবে বিনা কারণে নিজ ক্রুর ইচ্ছাছেন, এইমাত্র আশঙ্কা । নিরুদ্যত অতিশূলভ, কিং মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন ।

তখন বড় বিরাটে দেখিয়া হুম্বানু কাম-বশীকৃত সূত্রীবকে অদূরত্ব পুন্ডিত-সংগৃহ্যন-বৃক্ষ দেখাইয়া পরৎকাণের আবির্ভাব বুঝাইয়া দিলেন—“হামচন্দ্র ও লক্ষণ আর্ন্ত, তাঁহার কষ্ট পাইতেছেন, আপনি প্রতিজ্ঞতিপালনে তৎপর হন নাই তাঁহার। হুখে পড়িয়া ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণ-নীয় নহে । * আপনি পরিবারবর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষণের পদে পতিত হইয়া তাঁহাকে এসম কখন, নতুবা তাঁহার পরে কিছুকি বিনষ্ট হইবে।” হুম্বানুর বাক্যে আতঙ্কিত হইয়া সূত্রীব বীর-কর্ত-বিগমিত ক্রীড়ামাণ্য ছেদন করিয়া কেনি-লেন এবং লক্ষণকে এসম করিতে যত্নবান হইলেন । *

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হুম্বানু সূত্রীবকে শুভমন্ত্রণাধারা অস্তায়পথ হইতে দাবাবান্নে রক্ষা করিতেন,—ওধু আদেশ প্রবণ ও অহুমোদন করিয়া বাহিতেন না । এদিকে সূত্রীবের বিরুদ্ধে কোন বড় ব্যক্তি হুইলে একাকী তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়া পাড়াইয়া তাহা নিবারণ করিতেন—সূত্রীবের বিপৎ-কালে তাঁহার সমস্ত ক্রেশের সমমিকতাপ নিজে বহন করিতেন,—কিছুকির বিলাসবিহীন্যুল তাঁহার চক্ষুর সমুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, তিনি বীর কর্তব্যে বহুলক্ষ্য চক্ষু-কণেকের অস্ত ও বিলাসমোহাজ্জর হইতে দিতেন না ।

* সূত্রীবের এই কণ্ঠনানিষ্ঠ ভৃত্য, শাস্ত্রদর্শী শুভাকাঙ্ক্ষী সচিব, রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম লক্ষ্যভেদের পরেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ও একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন ।

রামলক্ষণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাঁহার যে রূপরোঙ্কাল হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে—

“বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে সম্প্রীতিরহীতী বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন—আপনারা কে? আপনাদের বীহ আশ্রিত, সুবৃত্ত ও পরিবোধন;—আপনারা ছুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ । আপনাদের অলক্ষণ বেহ সর্বভূষণধারণযোগ্য—আপনারা ভূষণহীন কেন ?”

রাম-সূত্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল । সূত্রীব যখন সমস্ত সৈন্য সীতার অবস্থানে প্রেরণ করেন, তখন রাম হুম্বানুকে বীর-নানান্ত্রিত অসুগ্রীরকটি অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার অস্ত্র দিয়াছিলেন, তাঁহার মন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—এ কার্যে হুম্বানুই সক্ষমতা লাভ করিবেন ।

নানাদিবেশ ঘুরিয়া সৈন্তবৃন্দ সীতার কোন খোঁজই পাইল না; বহুর পর্ণপুলহীন এক গিরিশুভা অভিক্রম করিয়া তাহার সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল । এই সময়ে তাহার অনশনে প্রাণত্যাগ-সম্বল করিয়া অবসর হইয়া পড়িয়াছিল,—সহসা অটীতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্প্রতি তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিল—সীতা দূর সমুদ্রের পারে লক্ষপুত্রীতে আছেন, বীনরগণের মধ্যে কেহ সেইখানে না গেলে সীতার সংবাদ পাওয়া অসম্ভব ।

সমুদ্রের তীরে পাড়াইয়া তাহার বিষয়ে, ভয়বিহীনচক্ষে, স্তম্ভার জনরাশি দেখিতে লাগিল। যেষের সঙ্গে চূর্ণতরঙ্গ মিশিয়া গিয়াছে—সীমাহীন বিশাল সরিৎপতির তাত্ত্ব-নর্ভন দূর-পাটল-আকাশম্পন্দী, উদ্ভাদনময় ফেনিল আবর্তরাশি। তাহার ভয়বানিত হইয়া পড়িল,—কে এই অবশিষ্ট বহাঙ্গগর উত্তীর্ণ হইবে ? শরত, যৈশ্ব, দ্বিবিদ প্রভৃতি সেনা-পতিগণ একে একে পাড়াইয়া উঠিলেন এবং অক্ষুটবাক্যে “অনন্ত জনরাশির কলকলোল শুনিয়া ভীত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অকস্মৎ পাড়াইয়া বলিলেন—“পরপারে গাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আনিতে পারিব কি না, সন্দেহ।” নৈরাশ্রবিস্মল ভয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকূলে সমবেত হইয়া যে তাহার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই অনিশোধিত ভ্রান্ত উৎসাহচূর্ণ বিপুল জনাশয় উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য কাহারও নাই—ইহাই বিদিত হইল। বানরসৈন্যের মধ্যে হুম্মান সৈন্যভাবে এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,—বানরগণের নানা আশঙ্কা ও বিরূপশব্দক আলাপ তিনি নিঃশব্দে শুনিতেছিলেন—নিজে কোন কথাই বলেন নাই ; জীবন তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

“হীর বানরলোকান্ত সর্বপাশ্রয়িকা বর।

ভূকীয়েকান্তমালিতা হুম্মান কিং ন বরসি।”

“বানরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্বশাস্ত্র-বেত্তার বরদী হুম্মান, তুমি একান্ত মৌনভাবে অবলম্বন করিয়াছ কেন ? এই বিষয় সৈন্যদিগকে আর ঠিক উৎসাহ দিয়া কথা বলিবে—তুমি ভিন্ন এ কাণ্ডের ভায় আর কে লইতে পারে ?”

হুম্মান শুধু আত্মানের ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ কার্ণা যে তাহারই,—তিনি তাহা জানিতেন। জীবনের কথার উত্তর না দিয়া তিনি সচল হিমাতলের ভায় হৃদয়-ভাবে সমুখান করিয়া গাড়ীর ভক্ত প্রবেশ হইলেন। অসীম সাহস ও বীর্যবৃত্তিতে বিপুল আশা তাহার লগাটে একটি শ্রীশিখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনার ভিত্তি হইয়া আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বহুকোণ-বাপী সমুদ্র তিনি বহু ক্রুদ্ধ ও বিপদ সহ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—তিনি পথে বিশ্রামের ভক্ত মৈনাকপর্কতের রম্ম একটি শূন্য সমুদ্রে প্রসারিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতুকার্য সম্পাদন না করিয়া বিশ্রাম করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই ; তিনি বলিয়াছিলেন—

“গদা রামবনিদুঃখঃ পরঃ বসনবিক্রমঃ ?

গাঙ্কঃ তবঃ গমিগামি লভাঃ রামপালিতান্।”

প্রকৃতই তিনি রামকরনিদুঃখ শব্দের ভায় লভাতিমুখে ছুটিয়াছিলেন। রামের ইচ্ছার মুগ্ধমান বিগ্রহের ভায় তাণ্ডগতি হুম্মান লক্ষাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

লক্ষার পৌছিয়া হুম্মান সরল, বর্কর ও কদিকারবৃক্ষপূর্ণ বেলাত্মির অদূরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উর্ধ্বে মণ্ডতল, হর্ষ্যরাশির উজ্জ্বল দেখিতে পাইলেন। পর্কতলীর্ঘবিত্ত হর্ষম লক্ষ-পুরীর অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং হর্ষামির সংগোল দেখিয়া হুম্মান ভীত হইলেন। যে উৎসাহে তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়া ছিলেন, সে উৎসাহ যেন সহসা দমিয়া গেল,

প্রকার অস্বভাবিক কন চতুর্দিকে প্রকিপ্ত
রহিয়াছে ; সুতরাং তুচ্ছ। অঙ্গনাগণের অঙ্গ-
লুলিত বেহুইতে বসন আলিত হইয়া পড়ি-
য়াছে ; নানাধ্বনি হইতে আচ্ছাদিত রমণীমূল্য
পরম্পরের ভূষণহস্তে এখিত হইয়া বিচিত্র-
কুম্ভধতিত মাগের জাগ পুষ্ট হইতেছে ;
একই দূরে স্বন্দরীশ্রেষ্ঠা লক্ষ্যপূরীশ্বরী
প্রমুখা ষোলোদরীর বর্ণপ্রতিভার জাগ কান্তি
ধেখিয়া মনে করিলেন, এটী সীতা । তাঁহার
চোখী কৃতান্ত হইল ভাবিয়া তিনি আক্সাদে
সাক্ষ্যে হইলেন ।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রানবিরহিতা
সীতা এভাবে স্থপা থাকিতে পারেন না,
একপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, একপ সোমা
শাস্তির ভাব পতিপরায়ণা সীতার পক্ষে
অসম্ভব । আবার হুমায়ূন বিমর্ষ হইয়া
খুঁজিতে লাগিলেন । কোনস্থানেই তিনি
নাই । হায়, সীতা কি রাবণকর্তৃক হত্যা
হইবার সময় পর্বের একটি আলিত মুক্তাহারের
জ্বর সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা পঙ্কজ-
বন্ধ শাস্তিকার জাগ অনশনে প্রাণ-
ত্যাগ করিয়াছেন ? রাবণের উৎপীড়নে
হয় ত বা তিনি আত্মহত্যা করিয়া
থাকিবেন । যে রানচন্দ্র তাঁহার শোকে
উদ্বত হইয়া অশোকপুষ্পগন্ধকে আলিঙ্গন
দিতে ধাবিত হুন, তাজিদিন বাহার চক্ষে নিজা
নাই, অগ্নেও বাহার মুখ হইতে ‘সীতা’ এই
মধুরবাক্য নিঃসৃত হয়, সেই বিরহবিধুর
প্রভুর নিকট হুমায়ূন কি বলিয়া উপস্থিত হই-
বেন ? উগ্রিময় ক্রীড়ামন্ত মহাঅরিধির
বেলাতুনিতে যে বিপুল বানরবাহিনী তাঁহার
মুখ হইতে সীতার সন্বাদ পাইবার জন্য উৎ-

কণ্ঠিত হইয়া আকাশপানে “তাকাইয়া আছে
—তাঁহাদের নিকট তিনি যাইয়া কি বলিবেন ?
অহুমঙ্গানজার হুমায়ূনের মনের উপর নৈরা-
শ্যের একটা প্রবল আঘাত আসিয়া পড়িল,
কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আশা আশিয়া তাঁহার
হস্ত ধরিয়া উঠাইল ; হুমায়ূন লক্ষ্যে বিচিত্র
হর্দাসমূহ ও বিচিত্র কাননরাজি পুনরায় পর্য্য-
টন করিয়া অধেষণ করিতে লাগিলেন,
আশার মুহুর্তে যেন তিনি পুনরায় উজ্জীবিত
হইয়া উঠিলেন । রক্ষা পাসাদের সমস্ত স্থান
তিনি তন্নতন্ন করিয়া পূজিলেন, কিন্তু
সীতাকে দেখিতে পাইলেন না । রক্ষা পুরীর
বিশালতা তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ
হইল । কোথায়ও সীতা নাই—সীতা জীবিত
নাই,—হুমায়ূন গভীর-নৈরাশ্র-মগ হইয়া ক্লাস্ত-
পাদক্ষেপে কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে
পারিলেন না । “রাক্ষসজীব এবং বানর-
বাহিনী আমার প্রতীক্ষা আছে, আমি তাহা-
দের উত্তত আশামরুরী ছিন্ন করিতে পারি
না । রানচন্দ্র নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করি-
বেন, লক্ষ্য সীম অগ্রিভূলা শরবারা নিজে
ভস্মীভূত হইবেন—সুগ্রীবের মৈত্রী-বিফল
হইবে ;—আমার সত্যাগমনে এই সকল বিজ্ঞাট
অবশ্যস্বাভাবী ।” এই ভাবিয়া হুমায়ূন অবসর
হইয়া পড়িলেন ; কখনও বা রাবণকে বধ
করিবার জন্য কোণে উদ্বত হইয়া উঠিলেন,
—কখনও বা স্থির করিলেন—

“চিঁতা কুমা প্রবেক্ষামি ।”

‘প্রজলিত চিত্তাং পাণ্ডবসিদ্ধিন দিব’ ; ‘কিং বা
সংগতোপকর্ণে অনশনে দেহত্যাগ করিব,’—

“লক্ষ্যে ভরসি—নি বাহনঃ আপবসি চ ।”

‘আমার শরণ্য ত্রাক ও আপদমগ্ন ভয় করি

কেনিবে।" কখনও বা ভাবিনেন, "আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ধনে ধনে জীবন কাটাইব।"

এতর কার্য্য অথবা কর্তব্যাহুগানের যে ব্যগ্রতা হুহমানের চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অল্প কোথাকিত তাহা দেখা যায় না। রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

‘যদি কৃত্য নিবৃত্ত: সন্ তর্ককর্ম্মনি প্রমথঃ ।’

কুর্বাং তবদুরাগেণ তমাত: পুলকাত্মকঃ ॥”

‘যিনি প্রভুকর্ত্ত্বক হুহর কার্য্যে নিবৃত্ত হইয়া অহুরাগেণ সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করেন, —তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। হুহমান প্রাণপণে এবং অহুরাগেণ সহিত রামের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রভুসেবায় এই উন্নত আদর্শ ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়া থাকে। হুহমান বিপুল পারীক্ষিক শ্রম গত হইল দেখিয়া অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন।

“আমি নৈরাশ্রময় হইলে বহু ব্যক্তির আশা বিফল হইবে। বহু ব্যক্তির শান্তিহুখ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং চিত্তাশ্রবণ বা বানপ্রস্থ-অবলম্বন আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমার উপর যে হুহমান জ্ঞান অর্পিত, তাহার সাধনে যেন আমার কোন ত্রুটি না হয়।” “সুতরাং,

“ইহঁকে নিচতাহারো বংতামি নিচুতপ্রিহঃ ।”

‘এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক সংবতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।’ তখন কয়েকোড়ে হুহমান ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাহার মুখ বৃহৎ বিকল্লিত হইয়া এই নৌক উদ্ধার করিল—

“নমোহস্ত রম্যেণ সত্যপাতক

কৈবো চ তৈস্ত জনকাত্মকায়।

নমোহস্ত রম্যেণ সত্যপাতকায়।

নমোহস্ত চন্দ্রাশ্রমিকবর্ণপুত্রায়।”

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, ধর্ম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন এবং—“নমস্কৃত্য স্ত্রী-বার চ”—স্ত্রীকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবৎ স্থিত হইয়া ব্রহ্মিলেন। তখন হুহমান স্বীয় সময়ে এক অপূর্ব্ব আশাস-বাণী শুনিতে পাইলেন। এবার তিনি দৃষ্টমনে সীতাকে ধুজিতে অশোকবনে প্রবেশ করিলেন।

এখানে হুহমান সাধারণ ভূতা নৃহেন—সাধারণ সচিব নহেন, এখানে তিনি প্রভু-ভক্তির সিদ্ধতপস্বী, তপ:প্রভাব তাহার পূর্ণমাজার ছিল। রামের অন্ত:পুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন, অলিতহারা কোন রমণী অন্ধনয়নেহে অপর একটি স্ত্রমরীকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, কোন স্ত্রলক্ষণা রমণীর দেহাঙ্গী হইতে চেলাকল উড়িয়া গিয়াছে—নিজ্জীবনব্যয়র স্বাসবেগে কাহারও স্মৃতি বক্ষোঃবৃগণ আবেলিত হইতেছে, আবার কোন রমণী কৃষ্ণান্তরঙ্গের বীণাকে পাচুঃপে পরিবৃত্ত করিয়া অনংবৃত্ত কেশপাশে প্রমুগ্ধা হইয়া আছে—তখন,

“রম্যেণ বহতী: শব্দাঃ ধর্ম্মসাম্পদগতিভ: ।

পরদারাবরোধস্য প্রহতস্ত নিরীকণম্।”

অন্ত:পুরের প্রমুগ্ধপরাঙ্গী দর্শনে ধর্ম্ম লুপ্ত হইল, এই চিন্তায় হুহমান অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

“ইমং বহু যমাতার্য: ধর্ম্মলোপ: করিষ্যতি।”

আজ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল—এই আশঙ্কায় হুহমান বিকল হইলেন; কিন্তু তিনি তরতর করিয়া স্বজনগণ অধেবণ করিয়া দেখিলেন—তপায় কোন কলঙ্কের রেখা ঘড়ে নাট।

"ন তু মে মনঃ ক্রিচ্ছ বৈষ্ণুভ্যদুপপাদ্যতে ।"
"মনো হি হেতুঃ সঙ্কল্যসিদ্ধিমাণাঃ প্রবর্তনঃ ।"
"ভাণ্ডভাণ্ডবৃদ্ধাঃ ততঃ মে সখ্যবহিঃ ।"

'জানার চিত্তে বিকটের গেশ নাই; মনট ইন্দ্রিয়গণের পাপপুণ্যের প্রবর্তক,—কিন্তু আমার মন শুভমকরে হুটু।'—আর বৈদেহীকে অঙ্গসন্ধান করিতে হইলে, রমণী-রন্ধের মধ্যেই করিতে হইবে—তাহার উপারান্তর নাই।"

এই তাৎপর্যবাহী রামকাণ্ডে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছি। তাহার কার্যাদিচ্ছিত ইহাই প্রাক-স্থচনাশি হুম্মান্ অশোকবনে সীতার রান, উপবাসদীর্ঘ, ক্রিয়াকাষারবাসিনী বৃষ্টি বেধিরাই বৃষ্টিগাছিনেন—রাবণ সহস্র-রূপে শক্তিগম্পর হউক—তাহার রক্ষা নাই। ইনি লভার পক্ষে কালরজন্যরূপপী—রামের অমোঘ বাণ যদি প্রভাবশূন্য হয়, এই সাধ্বীর তপশ্বেদ তাহাতে তীক্ষ্ণতা প্রদান করিবে। সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ।—শুণের সহায় উপলক্ষ্যমাত্র, সীতা—"রক্ষিতা যেন নীলেন।" ধ্বনিট হুম্মান্ ধর্মবল কি, তাহা জানিতেন; এইজন্যই সীতাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত আপকা দূরীভূত হইল,—আয়তনের বলের উপর প্রবল আস্থা অস্থির।

এই নৈতিক পবিত্রতা আমরা কিচ্ছা হইতে প্রত্যাশা করি নাই। যেখানে বালির ভাষ মহিমামণ্ডিত রাজা বীর কনিষ্ঠ-বধূকে হরণ এবং স্রোদিত কলহে লিপ্ত হইয়া দুগুণ্ডিকে হত্যা করেন, যেখানে রামসখা নহা-প্রাক্ত স্বর্গীণ ছোড়ের জীবিতকালেই সেই ছোড়ের পক্ষকে প্রায় প্রমোদনকার্য

আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে পাতিত্রস্তোর অপূর্ণ অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পানে নৃত্যলক্ষ্য। তারা স্বর্গীণের অধনারিনী হইতে কিছুমাত্র বিধাবোধ করেন নাই—সেই কিচ্ছাপুরীতে উগ্রতাপা, তীক্ষ্ণনৈতিকবুদ্ধি-গম্পর, কর্তব্যকার্যে সতত আশ্রিতচক্ৰ, কলুষহীন, বিলাসলেশবঞ্চিত ও বিপদে অকু-প্তিত দ্বাত্তভক্তির অবতার হুম্মান্কে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানা-প্রকারে সীতার অঙ্গসন্ধান করিয়াও যখন হুম্মান্ বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্ম-শক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন। দৈহিক ভ্রম পণ্ড হইয়াছিল। তখন উন্নত-কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তিনি তাপস-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই বৃত্তির উদ্দেশ্য করিবার উপযোগী সাধনা ও পবিত্র জীবন তাঁহার ছিল।

তিনি এবার প্রচুর, তাঁহার ভ্রম এবার সার্থক হইবে,—সংকল্যের পূর্কভরসা তিনি মনে মনে পাইলেন। অশোকবনে বাইরা তিনি শিশুপার্বক হইতে সীতাকে "প্রথম দেখিতে পাইলেন,—সীতা সুখারী অথচ দুঃখমস্তপা, ব্রহ্মনারী—অমৃতিক্তা, তিনি উপবাসক্লশা, পক্ষদ্বিধ পদ্বিনীর ভাষ— "বিভাতি ন বিভাতি চ"—প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন না;—তাঁহার ছটি চক্ৰ অঙ্গপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কোবেরবাস,— তাঁহার চতুর্দিকে উৎকট শব্দের জড় একাকী, শব্দকর্ণা, লবিতগুনো, ধ্বজকেশী, বিকট রাক্ষসীমূর্তি,—নারকীর পদ্বিবার যেন একটি বর্গীয় প্রথমাকে পরিবেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে—কিন্তু সেই দীনা তাণ্ডীমুখিতে
অপূর্ণ ধৈর্য হারিত ।

“বাতর্ঘ্যে কৃতান্তে দেহী গগনবৎ ভ্রমণমগ্নে ।”

‘জলদাগমে গঙ্গার তীর ইনি কোতরহিত ।’
যখন স্নানার্থী আসিয়া কেহ শূন্য দ্বারা তাহার
দ্রোণা উপাটন করিতে চাহিল,—হরিভট্টা,
বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপ চোড়ীধ্বজের মধ্যে
কেহ বা তাহাকে “মুষ্টিমুখা তর্জ্জতি”, কেহ
বা “ভ্রামরমুখি মহৎ শূন্যঃ”—কেহ কেহ বা মাংস-
লোলুপ ভ্রমণকারী তায় তাহার প্রতি উদ্বিগ্ন
হইয়া ভাঙবদীনা প্রকট করিতে লাগিল,
তখন একজনের সীতার সেই সুগভীর ধৈর্যের
বাঁধ ছুটিয়া পড়াছিল,—তিনি “ধৈর্যামুৎসহ্য
রোদিতিক্ত”—ধৈর্যাতাগ করিয়া কাদিতে
লাগিলেন । আবার বর্ষা রাবণ নানাপ্রকার
লোভপ্রদর্শনেও তাহাকে বশীভূত করিতে
অসমর্থ হইয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে অগ্রসর হইল—
পাতমালিনী, আসিয়া রাবণকে ফিরাইয়া লইয়া
যাইতে চেষ্টা করিল তখনও সীতার ধৈর্য
অপগত হইল, যক্ষোহস্তে অপমানিতা সীতা
দুর্লভমুখিতা হইয়া কাদিতে লাগিলেন । কিন্তু
এই উৎকট বিপদত্যাগির মধ্যেও তিনি পবিত্র
যজ্ঞায়িত্র স্ত্রীর পূণ্যপ্রভায় দীপ্ত ছিলেন,
তাঁহার অক্ষয়িক মুখে বর্ণের তেজ ফুটিত
হইতেছিল । হুম্মান্ এই বিপদা সাধীর
প্রতি পুঙ্ককের স্ত্রীর ভক্তির চক্রে দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন, তাঁহার ছই চক্ষু অক্ষপূর্ণ
হইয়া উঠিল ।

‘হুম্মান্ শিখিপাবুকীকৃত ছিলেন, কি উপায়ে
সীতার সহিত কথাবার্তা করিবেন, প্রথমত
তাহা তাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না ।
হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীতা তাঁহাকে দেখিয়া

ভীত হইবেন, প্রাক্ষয়ণ তাহাকে ধরিয়া
ফেলিবে—তাঁহার সীতার পক্ষপাত্যকারের
পুঙ্কেই গন্ধ গোলাবোণ উৎপন্ন হইবে ।
চেড়ীপল যখন ভিড়টার বস্তুভাঙ ভনিবার
জন্ত সীতাকে ছাড়িয়া একটু দূরে গিয়াছে, শেষ
রজনীতে বিশিষ্ট সীতা অশোকতরুর শাখা
অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সুকেশীর
বক্ষ কেশভঞ্জন তাহার কণাস্রভাগে বিলম্বিত
হইয়া পড়িয়াছে, তখন হুম্মান্ শিখিপা-
বুক হইতে মুহুরের স্রোতের ইতিহাস কীকটন
করিতে লাগিলেন ; সহসা অনিচ্ছিত স্থান
হইতে আশাতীতরূপে প্রিয় রামকণা শুনিয়া
সীতার গণ্ড বাহিয়া অবিরলধারে জল পড়িতে
লাগিল । তিনি স্রোত স্রবের মুখমণ্ডল স্রবৎ
উন্নতি করিয়া অক্ষপূর্ণরূপে শিখিপাবুকের
উচ্ছ্বসিত দৃষ্টি করিলেন—তাঁহার তক্ষ ও
বক্ষ কেনাও নিবিড়ভাবে তাহার মুখপদ্ম
ধরিয়া পড়িল ।

হুম্মান্ এই সুযোগে করলোড়ে বলিতে
লাগিলেন—

“ক। সু পদ্মপলাশাকি তিরকোবেববাসিনি ।

ক্রমত শাখামাল্য তিরসি বহনিন্মিতে ।

কিম্বৎ তল বেতাত্যঃ গরি প্রবতি লোকজন্ম ।

পুত্রীকপলাশাত্যঃ বিপ্রকীর্ণিবোধকম্ ।”

‘হে পুণ্ড্রপলাশাকি, তিরকোবেববাসিনি,
অনিম্মিতে, আপনি কে, অনোকেব শাখা
ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ? পদ্মপলাশবনের
স্তায় আপনার ছইটি স্রবের চক্ষু অক্ষবর্ণ
করিতেছে কেন ?’

সীতা নিজের পরিচয়দিয়া হুম্মান্কে নিজে
অবতরণ করিতে ইঙ্গিত করিলে, হুম্মান্ তাহার
দ্রোণতার কথা সীতাকে দাপন করিলেন ।

কিন্তু হুম্মান্কে নিকটবর্তী দেখিয়া রাবণভ্রমে সীতা অতর্কিত হইলেন; তাহার ক্রমশঃ অশ্লিষ্টলি অশোকের শাখা ছাড়িয়া দিল; তিনি পীড়াইয়া ছিলেন, তবে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; সেই ভয়ের মধ্যেও তিনি একটু আনন্দ পাইয়াছিলেন, এক একবার মনে করিতেছিলেন, ইহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত দৃষ্ট হইতেছে কেন?

হুম্মান্ তখন তাহার প্রতীতির ভ্রম রামের সমস্ত ইতিহাস তাহাকে শুনাইলেন— স্ত্রীমণ্ডল রাম এবং “স্ববর্ণজিবি” লক্ষণের দেহ-সৌন্দর্য সমস্ত বর্ণন করিলেন—তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হুম্মান্ রামের দূত। বিপৎ-সমুদ্রে পতিতা সীতা সেই শেষরাত্রে বেন কুল পাইলেন,—আশার নক্ষত্র কালরজনী ভেদ করিয়া কিরণদান করিল। কাদিতে কাদিতে সীতা হুম্মান্কে শতশত প্রশ্ন করিলেন, রামের কাণ্ডকলাপ, তাহার অভিশ্রু—সমস্ত জানিয়া সীতা পুনরায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হুম্মানের নিকট রামের নামান্বিত অস্বরীয়ক ছিল—তাহা তিনি অভিজ্ঞানবন্ধন আনিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি তাহা দেন নাই। সাধারণ দূত সেই অস্বরীয়ক দ্বারাই কথোপকথনের সুবন্ধ করিত, কিন্তু হুম্মান্ সেই বাহ্যিকের উপর ততটা মূল্য আরোপ করেন নাই। তাহার পরিত্যে সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া শেষে অস্বরীয়কটি দিয়া-ছিলেন।

সীতাকে তিনি পৃষ্ঠে জুলিয়া লইয়া বাইবেন, এই প্রস্তাব করিলে সীতা স্বীকৃতা হইলেন না,—কিন্তু এ সময়ে তিনি যাহা

বলিলেন, তাহাতে তাহার প্রতি হুম্মানের প্রগাঢ় তক্তির উদয় হইল।

সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানবন্ধন চূড়ামণি লইয়া তিনি বিদায় হইলেন, কিন্তু রাবণের দৈত্যবল, সভা ও মন্ত্রণাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সমস্ত তথ্য অবগত না হইয়া প্রত্যাবর্তন করা তিনি উচিত মনে করিলেন না। এ সম্বন্ধে স্ত্রীমণ্ডল কি রাম তাহাকে কোন উপদেশই দেন নাই—তথাপি তাহার দোতা সম্পূর্ণরূপে সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক মনে করিলেন। তিনি যদি তররের মত ফিরিয়া আসেন, তবে তাহার অগচ্ছদ্য মহাপ্রতাপশালী প্রভু রাম-চক্রে ভূতোর যোগ্য কার্য করা হয় না, এই ভাবিয়া তিনি অশোকবনের তরুলতা উৎপাটন করিয়া লঙ্কাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারাই বাইরা রাবণকে সংবাদ দিল, “কে এক লঙ্কাশক্তির বীর অশোকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষসগণকে ভয় দেখাইতেছে—সীতার সঙ্গে সে বহুক্ষণ কথাবার্তা করিয়াছে।” রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল,—বহু রাক্ষসসৈন্য নষ্ট করিয়া হুম্মান্ ধরা দিলেন। রাবণের সভায় আনীত হইলে সীতাকে প্রশ্ন করা হইল—তিনি বিজুঃ ইন্দ্র, কিংবা কুবের, ইহাদের মধ্যে কাহার দূত?

হুম্মান্ বলিলেন—

“এমনদেখ ন মে মধ্য বিক না নামি চোদিতঃ।”

“কেনচিত্রায়কারণে আশ্রিতঃস্মি ত্যাত্তিকম্।”

‘কুবেরের সঙ্গে আমার সখা নাই, বিজুঃ আমাকে পাঠান নাই, আমি রামের কোন কাণের দূত এখন উপস্থিত হইয়াছি।’

এই সভার রাবণের অতুল ঐশ্বর্য ও বিপুল প্রতাপ দেখিয়া হুঁহুমান্ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বেঙ্গল নৃসিংগরূপে তিনি রাবণকে ধর্ম-মন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা করিলে লঙ্কার ভাষী বিনাশ অবশ্যস্তাযী, ইহা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া রাবণপ্রমত্ত যুহানদের মস্ত বেঙ্গল অবিচলিত সাহসে তিনি পাড়াইয়া ছিলেন—তাহাতে আমরা তাঁহার কর্তব্য-কর্তার মতলবসম্মত হৃদির আভাস পাইয়া চমৎকৃত হই। তিনি ত্রিলোকবিজয়ী সম্রাটের সম্মুখে বর্ণের কথা ধর্মবাচকের মত কহিয়াছিলেন,—পরিণামদর্শী বিজ্ঞের স্তায় তব্বিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং কলিকল তুচ্ছ করিয়া কর্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়-ভিত্তিতে বীরের স্তায় পাড়াইয়া ছিলেন, তুচ্ছ রাবণ যখন তাঁহার উপর যুহানদের আদেশ প্রদান করিল, তখনও তাঁহার উজ্জল উপগ্রন্থণ অবিচলিত ছিল,—তাঁহার প্রশস্ত লগাট ঐকটুও তরফ্কিত হয় নাই। বিতীষণের উপদেশে তাঁহার অপরপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

হুহুমান্ যখন সাগর অতিক্রম করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ বানরমণ্ডলীর নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখনসেই নিরাশাখিনির্গত হৃদয় কপিফুল এক বিশাল আনন্দকলসরূপে জ্বলিয়া উঠিল, তাহার নাচিরা-গাহিরা তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

হুহুমান্ বহুকষ্ট সহ করিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। আজ একদিনের মত বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিলেন,—সেই আনন্দোজ্জ্বল সমুদ্র উপকূল টুন্মল করিতে

লাগিল। প্রতীনের অশ্রু-রক্তিত সমুদ্রেরে ঘাইয়া তাহার। একটি প্রাচীন বী ঘণ্টাবর্ষের স্তায় পতিত হইল, সমুদ্র-প্রহরী দীর্ঘমুখ বানরী ভাষাদিগকে বাধা দিতে ঘাইয়া প্রহরী-অধ্বনিতবেগে লগাধন করিল।

তখন হুহুমান্ একদিনের মত বন্ধুগণের সঙ্গে সমুদ্র খাইয়া উন্মত্ত হইলেন। সকলে মিলিয়া তাহার। উৎসবের দিন কিতাবে কাটাইয়াছিল, বাস্তবিক তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

“সাগরিতে কেতিং প্রহসতি কেতিং

সুভাস্তি কেতিং প্রহসতি কেতিং।”—

‘কেহ স্থান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল।’

হুহুমান্ লঙ্কার শুণু সীতাকে দেখিয়া আইগেন নাই; তিনি রামকে লঙ্কার যে সকল অবস্থা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ইন্দ্রদৃষ্টি স্ফুটিত হইয়াছে। হুহুমান্ বিজ্ঞাসিত হইয়া রামকে লঙ্কাসংকে বর্ণিতা-ছিলেন,—

“লঙ্কাস্থী হতী, অব ও রথে পূর্ণ, উহার কণাট চূড়বন্ধ ও অর্গলবদ্ধ, উহার চতুর্দিকে লোকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। এই দ্বারে কুহুৎ প্রস্তর, শর ও বস্ত্রলবণ সংগৃহীত রাখিয়াছে। উপস্থিত হইয়াবাক্যে অতিশয়দৈনন্দ তদ্বাক্য নিবাহিত হইয়া থাকে। এই দ্বারে বস্ত্রলবণিত লোহবর লত লত লতরী আছে। লঙ্কার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা গিরিরম্বাতিত ও দুর্গম্ভা। উহার পরই একটি তর-ভর পরিখা আছে। উহা অগাধ ও নক্স-কুদ্রীতপূর্ণ। পাত্যাক দ্বারে একএকটি

বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যত্ন-
বশিত, শতশেষ উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্রদ্বারা
সেতু রক্ষিত হয় এবং ঐ যন্ত্রবলেই তাহার
পরিষ্কার নিশ্চিত হইয়া থাকে। গছার
নবীহর্গ, পর্কতহর্গ ও চতুর্দিক কৃত্রিম হর্গ
আছে। ঐ গুলী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের
পারে। সমুদ্রে নৌকার পদ নাই, উহার
চতুর্দিক নিরক্ষণ।

হুমায়ূ গুপ্তি সমান জানিছেন। তাবৎকে
বেশিয়া হুমায়ূনের মনে প্রগাঢ় শঙ্কার উদ্ভেদ
হইয়াছিল। তাহার ধর্মপুস্তকানুসারে তিনি
চঃবিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লচল-হিনা-
জির ভার সমুদ্রতীরে রাক্ষসস্রাজের প্রতাপ
বেশিয়া হুমায়ূ বলিয়া উদ্ভিগ্নাছিলেন—

“আহো অপমহো! বৈদ্যনরঃ সমনয়ো ভ্রাতঃ ।

আহো রাক্ষসস্রাজস্ত সর্বলক্ষণবৃদ্ধা ।

কামোর্থো ন বসমান্ তানহঃ তাক্ষসবরঃ

তানহঃ হতলোকস্ত সপতন্তাপি রক্ষিতা ॥”

‘ইহার কি অপূর্ণ রূপ, কি ধৈর্য, কি শক্তি,
কি ক্রান্তি, সর্বক্ষেত্রে কি সুলক্ষণ। যদি ইনি
অধর্মশীল না হইতেন, তবে সমস্ত দেবতার,
এমন কি ইন্দ্রও, ইহার আশ্রয়িত্ব করিতে
সম্মত হইতেন।’ রামচন্দ্রকে হুমায়ূ বলিয়া-
ছিলেন—

“রাবণ দ্ব্যধী, কিন্তু ধীরবতার ও সাব-
ধান, তিনি বহুই সত্ত্ব সৈন্ত পর্যবেক্ষণ
করিয়া থাকেন।”

রামায়ণের সর্বত্র হুমায়ূ আপা ও
শান্তির কথা বহন করিয়া আনিয়াছেন।
অন্যোকবনে সীতা-দমন চৌকীপণীড়িত।
হইয়া দুঃখের চরমদামার উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন,—যখন লক্ষ্মণকে কালরঞ্জনীর মত

তাঁহাকে গ্রাস করিয়া অঙ্গসং করিয়া ফেলিয়া-
ছিল, তখন শুভ অমৃতীয়কের “অজিতান হুইয়া
হুমায়ূ তাঁহাকে নৈরাশ্রমদূর হইতে আশ্রয়
ভ্রমণে উত্তোলন করিয়াছিলেন। রক্ত
বধন বিরহিণী হইয়া চতুর্দিক উত্তর-
দিক পীড়িত পাথের দ্বারা সীতার সম্মুখে
উদ্ভূত হইয়াছিলেন—বানরসৈন্যগণ যখন
মুগ্ধবৈকুণ্ঠ প্রাণসংকটের ভয়ে প্রকম্পে
কাতর নৈরাশ্রে সমুদ্রের উচ্চর দাক্ষিণ্য ও
উদ্ভিগ্নতাকীর গতিতে কোন সুসংযোজ
প্রত্যাশা করিয়া আশ্রয়প্রার্থিত হইয়াছিল—
তখন হুমায়ূ অমৃতোষধির দ্বারা সুস্বাদু বহন
করিয়া আনিয়া নৈরাশ্রের রাক্ষস আশ্রয় কল-
কোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন। আর
যেদিন চতুর্দশবৎসরান্তে কলম্বাহারী ও
অনশনরূপ রাজর্ষি ভরত নমিগ্রামের আশ্রমে
ভ্রাতৃপাত্ৰকবিভূষিত মৃতকে রামের প্রত্যা-
গমনের প্রতীকার আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন,
চতুর্দশবৎসরান্তে রাম কিরিয়া না জানিলে—
“প্রবেক্ষ্যামি হতাপনম্”—অর্থাৎ প্রাণ
বিসর্জন দিতে যিনি রতসঙ্কল্প ছিলেন—সেই
আদর্শভ্রাতা রাজর্ষির বোর আপা ও আশ্রয়
দিনে তাঁহাকে সাগরে সমাধাৎ করিয়া দৃঢ়-
ব্রাহ্মণবেশী হুমায়ূ বলিয়াছিলেন—

“বসন্তঃ পতকালগা যঃ যঃ রীক্ষতাপদম্ ॥”

অমূলোচসি কাকুৎঃ নহাঃ কুলময়বীহী ॥”

‘রাজন, আপনি পতকপ্রণাবাসী চীরজটায়ুর
মুখোচ্ছিন্নতার মত অমূলোচনা করিতেছেন,
তিনি আপনাকে কখন বিজ্ঞাসা করিয়াছেন।’

রামচন্দ্র সুযোগ্য প্রত্যাগমন করিয়া
মুগ্ধ ও অন্ধবৃত্তে মগ্নমগ্ন হার এবং অস্ত্র
অভিরণ প্রদান করিলেন। সীতাদেবী তখন

বীরকণ্ঠলবিত উচ্চল যুদ্ধাহার খুলিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাম বলিলেন, “তুমি এই হার বাহাকে দিয়া হুখী হও, তাহাকেই উদ্ধার দান কর।” সেই বহুমুখা হার উপহার পাইয়া হুম্যান্ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন ।

হুম্যানের এই কথেকটি শুণের কথা বাস্তবিক লিখিয়াছেন—ধৈর্যামিত্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্থ্য ও বিনয়,—বশ, শৌর্য ও বুদ্ধি ; পরম্পরবিরোধী গুণরাশি তাহার চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের * সকলগুলিকেই কর্তব্যাহুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন । এইজন্য কবি লিখিয়াছেন, সীতাদেবীর হারের তিনি সম্পূর্ণ বোকা ছিলেন ।

ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্য, সীতা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি অতুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়,—ইহারা রামের অগণ ; কিন্তু কোথাকরি এক বর্ষরবেশের অহর্ষের মুণ্ডিকার এই তক্তিকুল্লম অশাধনে উৎপন্ন হইল—তাহা আমরা আশাতীতরূপে পাটরা সবিধয়ে মশন করি । বিতীৰণ ও সুগ্রীবের মৈত্রী হুম্যানের প্রচুতক্তির ভূগ্না পতীর নহে এবং তাহাদের * সোধোদ্যো আদানপ্রদানের ঐ স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হুম্যানের তক্তি সম্পূর্ণ অহে-

তুতী । হুম্যান্ আদর্শপ্রজা, আদর্শভূতা, আদর্শপতিব ও আদর্শযৌবন । রাম এবং সুগ্রীবের প্রতি তাহার তুষ্টি অবিকল । পরী বর্তী হিন্দুগণ তাহার এই প্রতুপরাধুপতার প্রতিই বিশেষরূপে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু আমার বোধ হয়, তঁক্তি অপেক্ষা উন্নত-কর্তব্যের প্রেরণাই তাহাকে অধিকতররূপে কার্যে প্রবৃত্তি করিয়াছে । তিনি কোন কার্যই শুধু চক্ষুরের উচ্ছ্বাসে করেন নাই, তিনি প্রতি লক্ষ্যক্ষেপে বীর চরিত্রের নিভৃতে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন * দেখিতে পাই—তিনি আত্মদেবী সন্ন্যাসীর মত নিজে নিলিপ্ত থাকিয়া অতিশয় কঠোর কর্তব্যের পথে বিচরণ করিয়াছেন । বিষমচুল অব-তার, নৈরাশ্রের যোগ অরুকারে, কর্তব্যাবুদ্ধির বরজ্যোতি পড়িয়া তাহাকে পথ চিনাইয়া দিয়াছে । সেই কর্তব্যাবুদ্ধিই ভগবদাত-তাব,—বৈকুণ্ঠের এইজগৎ তাহাকে আপনার করিয়া গইয়াছেন । আজ এই হিন্দুস্থানে বহুসংখ্য লোক হুম্যানের উপাসক—এই উন্নত কর্তব্যাবুদ্ধির আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে পারিলে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কক্ষ যে নবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুষাপথে প্রধাবিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

নৌকাডুবি ।

৩৩

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কিরে! তুই কোথায় চলিয়াছিস?”

উমেশ কহিল, “আমি মাঠাকরুণের সঙ্গে গাইতেছি।”

রমেশ। আমি যে তোমার কানী পূর্ণ্যন্ত টিকিট করিয়া দিয়াছি। এ যে গান্ধিস্বরের ঘাট। আমরা ত কানী নাইব না।

উমেশ। আমিও গাইব না।

উমেশ যে তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা রমেশের মনে ছিল না—কিন্তু ছোঁড়াটার অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইল। কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কমলা, উমেশকেও লইতে হইবে নাকি?”

কমলা কহিল, “না লইলে ও কোথায় গাইবে?”

রমেশ। কেন, কানীতে ওর আশীর্বাদ আছে।

কমলা। না, ও আমাদের সঙ্গে গাইবে বলিয়াছে। উমেশ, দেখিস, তুই বুড়ো-মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিস, নহিলে বিদেশে তিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গাইবি।

কোন দেশে ঘটিতে হইবে, কাছাকাছি সবে গঠিত হইবে। সমস্ত বীমা-মার ভাগ কমলা একলাই পাইবে।

অনিচ্ছায় বন্ধন পূর্বে কমলা সম্ভ্রান্তবে স্বীকার করিত, কিন্তু হঠাৎ এই শব্দ করমিনের মতো তাহা যেন সে কাটাইয়া উঠিয়াছে।

অতএব উমেশও তাহার ক্ষুদ্র একটি কাপড়ের খুঁটিলি কক্ষে লইয়া চলিল, এ সবকে আর অধিক আলোচনা হইল না।

সহর এবং সাহেবপাড়ার মাঝামাঝি একটা জায়গার পুড়োমশায়ের একটি ছোট বাংলা। তাহার পক্ষাতে আমবাগান, সমুখে বাঁধানো কূপ—সামনের দিকে অল্পট প্রাচীরের বেটন—কূপের দিকিত জলে কপি-কড়াই-হাঁটির কেত শ্রীবৃক্ষলাভ করিয়াছে।

প্রথমদিনে কমলা ও রমেশ এই বাংলাতে গিয়াই উঠিল।

চক্রবর্ত্তি-বুড়ার স্ত্রী হরিভাবিনীর শরীর কাঁহিল বলিয়া গুড়া লোকসমাজে প্রচার করেন, কিন্তু তাহার দৌর্য্যলোক বাহুল্য-কণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার বয়স নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু শক্তি-সমর্থ চেগার। সামনের কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, কিন্তু কাঁড়ার অংশই বেশি। তাহার সবকে জ্বা যেন কেবলমাত্র ভিত্তি পাইয়াছে, কিন্তু দখল পাইতেছে না।

আসিল কথা, এই দম্পতিটি এখনও ভিলেন, তখনও বিমানিনীকে মালেকেরিয়ার দূর লোক কাঁহিত হইবে।

স্বাধ-কোনো উপায় না দেখিয়া চক্রবর্তী গামিপুর-ইঞ্চলের মাঠাতি বোগাড় করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন । ভ্রী সম্পূর্ণ হুই হইলেও তাহার বাহ্যের প্রতি চক্রবর্তীর কিছুমাত্র আস্থা আছে নাই ।

অতিথিদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া চক্রবর্তী অন্তরপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—“সেব বো !”

সেববো তখন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে স্বাক্ষকৌলিকে দিয়া গম ভাড়াইতেছিলেন এবং ছোটবড় নানা প্রকার ভাঁড়ে ও ঝাড়িতে নানা জাতীয় চাটনি, রোস্ত্রে সাজাইতে ছিলেন ।

চক্রবর্তী আসিয়াই কহিলেন—“এই বুঝি ! ঠাণ্ডা পড়িয়াছে গারে একখানা ব্যাপার দিতে নাই ?”

হরিভাবিনী । তোমার সকল অনাসুহি ! ঠাণ্ডা আঁকর কোথায়—রোস্ত্রে পিঠ পুড়িতেছে !

চক্রবর্তী । সেটাই কি ভাল ? ছায়া-জিনিষটা ত চুপ্‌চাপ নর !

হরিভাবিনী । আচ্ছা সে হবে—তুমি আসিতে এক ঘুরি করিলে কেন ?

চক্রবর্তী । সে অনেক কথা । জাগা-তত বয়ে অতিথি উপস্থিত । সেবার আয়োজন করিতে হইবে ।

এই বলিয়া চক্রবর্তী অভ্যাগতদের পরিচয় দিলেন । চক্রবর্তীর ঘরে হঠাৎ এরূপ বিশেষ অতিথির সমাগম প্রায় ঘটিল, থাকে, কিন্তু সমস্ত অতিথির এক হরিভাবিনী প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি কহিলেন—“ওমা, তোমার এখানে ঘর কোথায় ?”

• চক্রবর্তী কহিলেন, “আগে ত পরিচয় হোক, তাঁর পরে ঘরের কথা পরে হইবে । আমাদের শৈল কোথায় ?”

হরিভাবিনী । সে তাহার ছেলেকে দান করাইতেছে !

চক্রবর্তী “ভাড়াভাড়ি” কমলারের অন্তর-পুরে ডাকিয়া আনিলেন । কমলা হরিভাবিনীকে প্রণাম করিয়া ভাড়াইতেই তিনি দক্ষিণ করপুটে কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি চুখন করিলেন এবং স্বামীকে কহিলেন, “দেখিয়াছ, মুখখানি অনেকটা আমাদের বিধুর মত !”

বিধু ইহাদের বড় মেয়ে—কানপুরে গামিগৃহে থাকে । চক্রবর্তী মনে মনে হাসিলেন, তিনি জানিতেন, কমলার সহিত বিধুর কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু হরিভাবিনী রূপগুণে বাহিরের মেয়ের অর স্বীকার করিতে পারেন না । শৈলজা তাহার ঘরেই থাকে, পাছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ তুলনার বিচারে হার হয়, এইজন্য অল্পপন্থিতকে উপমাভাবে রাখিয়া জরপতাকা গৃহিণী আপন গৃহের মধ্যেই অচল করিলেন ।

হরিভাবিনী । ইহারা আসিয়াছেন, তা বৈশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নতুন বাড়ীর ত মেসামত শেষ হয় নাই—এখানে আমরা কোনোরূপে দ্বাধা জড়িয়া আছি—ইহাদের যে কষ্ট হইবে ।

বাগারে চক্রবর্তীর একটা ছোট বাড়ী মেরামত হইতেছে বটে, কিন্তু সেটা একটা দোকান-সেখানে বাস করিবার কোনো সুবিধাও নাই, সঙ্গরও নাই ।

চক্রবর্তী এষ্ট মিশ্রণের কোনো প্রতিবাদ

না করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, “মা যদি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিবেন, তবে কি উঁহাকে এ ঘরে আনি! যেখানে সম্রাটের চলিয়া যার, সেখানে মাও যেন চলে। কি বল মা! সত্য কথা বলিতেছি—একটু কষ্ট দিতে ভাল লাগে, নহিলে ঘোঁহের পরিচর পাওয়া যায় না। (দ্বীপ প্রতি) গাই হোক, তুমি আর বাহিরে গাঁড়াইয়ো না। পরংবাক্যের রোহটা বন্ধ রাখাপ!”

এই বলিয়া চক্রবর্তী রমেশের নিকট বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরিভাবিনী কমলার বিস্তারিত পরিচর লইতে লাগিলেন। “তোমার স্বামী বুঝি উকিল? তিনি কতদিন কাজ করিতেছেন? তিনি কত রোজগার করেন? এখনো বুঝি ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই? তবে চলে কি করিয়া? তোমার স্বামীর বুঝি সম্পত্তি আছে? জান না? ওমা কেমন ঘরে গো? স্বামীর বাড়ীর খবর রাখ না? সংসারখরচের জরুরাখী তোমাকে মাসে কত করিয়া দেন? শাকড়ি খবন নাই, তখন ত সংসারের তার নিজের হাতেই লইতে হইবে! তুমি ত নেহাৎ কচি মেয়েটি নও—আমার বড়-জামাই মা-কিছু রোজগার করে, সমস্তই বিধুর হাতে পনিয়া দেয়”—ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্যের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই কমলাকে অর্ধাচীন প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। কমলাও যে রমেশের অবস্থা ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কত অল্প জানে এবং তাহাও সন্দেহ বিচার করিলে এই অল্পজ্ঞান যে কত অল্পমাত্র ও পোকসমভায়ে লক্ষ্যকর, হরিভাবিনীও প্রমথানায় তাহা গ্রহণ করেন নাই।

উদয় হইল। সে তারিখা দেখিল, আর পর্যন্ত রমেশের সঙ্গে ভাল করিয়া কোনো কথা আলোচনা করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই—সে রমেশের দ্বীপ হইয়া রমেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না! আজি ইহা তাহার নিজের কাছে অস্বস্তি বোধ হইল এবং নিজের এই অকিঞ্চিৎকরকে লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধিত করিয়া তুলিল।

হরিভাবিনী আবার হুক করিলেন—“বোমা, দেখি তোমার বালা? এ লোনা-ত তেমন ভাল নয়? বাপের বাড়ী হইতে কিছু গহনা আন নাই? বাপ নাই? তাহা বলিয়া কি এমন করিয়া গা খালি রাখে? তোমার স্বামী বুঝি কিছু দেন নাই? আমার বড়-জামাই দুইমাস-অন্তর আমার বিধুকে একখানা করিয়া গহনা গড়াইয়া দেয়।”

এই সমস্ত সওয়াল-জবাবের মধ্যে শৈলজা তাহার দুইবৎসর বয়সের কন্তার হাত ধরিয় আঁসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলজা ভ্রামর, তাহার মুখখানি ছোটখাট,—মুঠিমে, চোখ দুটি উজ্জল, ওগাট প্রশস্ত—মুখ বেশিবেই স্নিগ্ধ, বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিকল্পিত ভাব চোখে পড়ে।

শৈলজার হৈচৈ মেয়েটি কমলার সম্মুখে গাঁড়াইয়া বৃহৎকাল পর্য্যবেক্ষণের পর বলিয়া উঠিল—“মাদী” বিধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিচার করিয়া যে বলিল, তাহা নহে—একটা বিশেষ-বয়সের যে-কোন মেয়েকে তাহার অগ্রিম বোধ না হইলেই তাহাকেই সে মিস্টারের মাদীনীয়ে অভিহিত করে। “কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হরিভাবিনী—শৈলজা নিকট কমলা

পরিচয় দিয়া कहিলেন—“ইহার নামা উকিল, নতুন আমগার কঠিতে বাহির হইয়াছেন। পথে কর্তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি ইহাদের গাড়িপুরে আনিয়াছেন।”

শৈলজা কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলাও শৈলজার মুখের দিকে চাহিল, এবং সেই দুটিপাতেই একমুহূর্তে উভয়ের সমা-বন্ধন বাঁধিয়া গেল। হরিভাবিনী আত্মধার আধোজনে চলিয়া গেলেন—শৈলজা কমলার হাত ধরিয়া কহিল, “এস তাই, আমার ঘরে এস।”

অরক্ষণের মধ্যেই দুজনে খনিষ্ঠভাবে কথা আরম্ভ হইল। শৈলজার সঙ্গে কমলার বয়সের প্রভেদ ছিল, তাহা চোখে দেখিয়া মহলা বোঝা যায় না। শৈলজার সবসুদু একটু ছোটখাট সংক্ষিপ্তরকমের ভাব—কমলার ঠিক তাহার উল্টা—আয়তনে ও ভাব-ভঙ্গিতে সে আপনার বয়সকে অনেকটা ছাড়িয়া গিয়াছে। বিবাহের পর হইতে তাহার মাথার উপরে খণ্ডরবাড়ীর কোন-রকমের চাপ না থাকতেই হোক বা যে কারণেই হোক, বেশিতে বেশিতে সে অসকোচে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের ভাবের মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ-ছিল। তাহার সমুখে লজা-কিছু উপস্থিত হয়, তাহাকে অত্যন্ত মনে মনেও সে প্রের না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। “চুপ কর”, “যাহা বলি তাহাই করিয়া যাও”, “বৌরাহুকের অভ ‘নেই’ করা শৌভা পায় না”—এ সব কথা তাহাকে আজ পর্যন্ত শুনিতো হয় নাই। তাই সে যেনু-মাথা তুলিয়া লোভা হইয়া উঠিয়াছে—তাহার সমস্ততার মধ্যে সবলতা আছে।

শৈলজার মেখে উমি উভয়ের মনোযোগ নিজের প্রতি সম্পূর্ণ একট্রেতে করিয়া লইবার বিধিযত চেষ্টা করিলেও, দুই মৃত্তন সমীর মধ্যে কথাবার্তা ভবিয়া উঠিল। এই কথোপ-কথনব্যাপারে কমলা নিজের তরফের দৈন্ত সহজেই বুঝিতে পারিল। শৈলজার বলিবার চেষ্টা কণা আছে, কিন্তু কমলার বলিবার কিছুই নাই। কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে একটা ছবি উঠিয়াছে, তাহা একটি পেন্সিলের কণ রেখামাত্র—তাঁহার সকল জাযগা পরিফুট স্ফলয় নহে, তাহাতে আজও একটুও রং কলানো হয় নাই। কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই। হৃদয়ের মধ্যে অভাব অসুভব করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ-ভাবও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেষ্টা-রাটা তাহার চোখে স্কটরা ওঠে নাই। বহু-য়ের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বর্ণিতে আরম্ভ করিল যে সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাঁধা বুঝি-যাছে, আতুল পড়িযামাত্র যখন সেই সুর বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ সুরের কোনো স্বভাব দিবার নাই—স্বামীর কথা সে কি বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কি আছে! বলিবার আগ্রহই বা কোথায়! সুরের বোঝাই হইয়া শৈলজার ইতিহাস দেখা হই করিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কমলার শূন্য নৌকাটা দেখানে নাড়িতে চেকিয়া অচল হইয়া আছে।

শৈলজার স্বামী বিপিন গাড়িপুরে অহির্কেনবিভাগে কাজ করে। চক্রবর্তীর গুটিমাত্র মেয়ে। ৭৩ মধ্যে ৩ গুণরবাড়ী

গেছে । ছোটটিকে প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিতে না পারিয়া চক্রবর্তী একটি নিঃশ্বাস জামাই ব্যুহিয়া আনিলেন এবং সাহেবগুণ্যকে ধরিয়া এইখানেই তাহার একটা কাণ ছুটাইয়া দিলেন । বিপিন ইহাদের বাড়ীতেই থাকে ।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ একদময় শৈল বলিল, “তুমি একটু বোস তাই, আমি এখনি আসিতেছি ।”—পরক্ষণেই একটু হাসিয়া কারণ দর্শাইয়া কহিল—“উনি স্থান করিয়া তিতরে আসিয়াছেন বাইয়া আপিসে বাইবেন ।”

কমলা সরল বিশ্বাসের সহিত প্রশ্ন করিল, “তিনি আসিয়াছেন, তুমি কেনন করিয়া জানিতে পারিলে ?”

শৈলজা । আর ঠাট্টা করিতে হইবে না ! সকলেই যেমন করিয়া জানিতে পারে, আমিও তেমনি করিয়া জানি । তুমি নাকি তোমার কর্তাটির পারেন শব্দ চেন না !

এই বলিয়া হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া আঁচলে-বন্ধ চাবির গোছা বনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া মেয়ে কোলে লইয়া শৈলজা চলিয়া গেল । পর-শব্দের ভাবা যে এতই সহজ, তাহা কমলা আজও জানিতে পারে নাই । সে চূপ করিয়া বসিয়া জান্নার বাহিরে চোখ রাখিয়া তাই ভাবিতে লাগিল । জান্নার বাহিরে একটা পেয়ারা-গাছে ডাল ছাইয়া পেয়ারার ফুল ধরিয়াছে, সেই সমস্ত ফুলের কেশরের মধ্যে মৌমাছির দল তখন বুটোপুটি করিতেছিল ।

৩৪

একটু ফাঁকি জায়গায় গন্ধার ধারে একটা আলোবা বাড়ী মটপান চেষ্টা চইতেছে ।

রমেশ গান্ধিপুৰ-আদালতে বিধি অনুসারে প্রবেশলাভ করিবার জন্য এ জিনিষপত্র জানিতে একবার কলিকাতার বাইতে হইবে, হির করিয়াছে—কিন্তু কলিকাতার বাইতে তাহার সাহস হইতেছে না । কলিকাতার একটা বিশেষ গলির চিত্র মনে উঠিলেই রমেশের বুকের তিতরটা এপনো থেম-কিলে চাপিয়াধরে । এপনো জাগ হেঁড়ো নাই—অথচ কমলার সহিত স্থানীয়ের মধ্য সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাকার করিয়া লইতে শ্বলম্ব করিলে আর চলে না । এই সমস্ত বিধায় কলিকাতায় বাজার দিন পিছাইয়া বাইতে গাশিল ।

কমলা চক্রবর্তীর অন্তঃপুরেই থাকে । এ বাংলায় ধর নিতান্ত কম বলিয়া রমেশকে বাহিরের ধরেই পাকিতে হয়—কমলার সহিত তাহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় না ।

এই অনিবার্য বিচ্ছেদব্যাপ্তর লইয়া শৈলজা কেবলি কমলার কাছে হৃৎপ্রকাশ করিতে লাগিল । কমলা কহিল, “কেন তাই তুমি এত হাহতাশ করিতেছ ? এমন কি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটয়াছে ?”

শৈলজা হাসিয়া কহিল, “ইস, তাই ত ! একেবারে যে পাষাণের মত কঠিন মন ! ও সব ছলনার আমাকে ভুলাইতে পারিবে না ! তোমার মনের মধ্যে যে কি হইতেছে, সে কি আর আমি জানি না ?”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞা তাই, সত্যি করিয়া বল, হুইদিন যদি বিপিনবাবু তোমাকে দেখা না দেন, তা হইলে কি ‘অমনি—’

শৈলজা সগলো কহিল “ইস, হুইদিন

দেখা না দিয়া তাঁর নাকি থাকিবার ভেদ আছে !”

এই বলিয়া বিপিনবাবুর অধৈর্য্যাসবকে শৈলজা গম্বীর করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম বিবাহের পরাম্বলক বিপিন ও কন্যার বৃহৎকরণ করিল তাহার খালিকা বধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অল্প কবে কতপ্রকার কোণাল উদ্ভাবন করিয়াছিল, কবে বাধ হইয়াছিল, কবে ধরা পড়িয়াছিল, দিবাসাধ্যাক্ষারের নিবেদ্যুৎখলাবের জন্ত বিপিনের মধ্যাহ্ন-ভোজনকালে একটা অস্থান্য নথো ওষ্ঠ-জননের মুক্তাতে উত্তরের ক্রিয় দৃষ্টিবিনময় চলিত, তাহা বলিতে বলিতে পুরাতন স্মৃতির আনন্দকোষকে শৈলজার মুখখানি হাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে যখন আপিসে বাইবার পাল্লা আরম্ভ হইল, তখন উত্তরের বেদনা এবং বিপিনের যখন-তখন আপিস-পল্ল্যাদন, সেও অনেক কথা ! তাহার পরে একবার যন্ত্রের ব্যবসায়ের খাতিরে কিছুদিনের অল্প বিপিনের পাটিনাথ বাইবার কথা হয়, তখন শৈলজা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “তুঁরি পাটিনার গিয়া থাকিতে পারিবে ?” বিপিন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল, “কেন পারিব না, খুব পারিব।” সেই স্পষ্টবাক্যে শৈলজার মনে খুব অভিমান হইয়াছিল—সে প্রাপ্যপণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদ্যারের স্পর্শরাজ্যে সে কোনমতে লেণমাত্র শোকপ্রকাশ করিবে না; ক্রমেন করিয়া সে প্রতিজ্ঞা হঠাৎ চোখের জলের দ্রাবনে ভাসিয়া গেল এবং পরদিন যখন বাতাস আধোজন সমস্তই স্থির, তখন বিপিনের অকস্মাৎ এমনি দাড়া দাঁড়া বি একরকমের

অস্থির করিতে লাগিল যে, খাড়া নক করিতে হইল, তাহার পরে তাক্কার যখন ওষুধ দিয়া গেল, তখন সে ওষুধের নিশি গোপনে নন্দ্যমার মধ্যে শূত্র করিয়া অপরূপ উপায়ে কি করিয়া ব্যাধির অবসান হইল—এ সমস্ত কাহিনী বলিতে বলিতে কখন যে বেলা অবসান হইয়া আসে, শৈলজার তাহাতে চম্পাকে না—অন্য এমনসময় হঠাৎ ঘুরে বাহির-দরজার একটা কিসের শব্দ হর-কিনা-হয়, অমনি শৈল বাস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে। বিপিনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়াছেন। সমস্ত গল্পহাসির অস্থরালে একটা উৎকণ্ঠিত হৃদয় সেই পথের দারের বাহির দরজার দিকেই কান পাতিয়া বসিয়া ছিল।

কমলার কাছে এ সমস্ত কথা যে একেবারেই আকাশকব্জের মত, তাহা নয়—ইহার আভাস সে কিছু কিছু পাইয়াছে। প্রথম কয়েকমাস রমেশের সহিত প্রথম পরিচয়ের রহস্যের মধ্যে যেন এইরকমেরই একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার ঐরেও ইঙ্গুল হইতে উদ্ধারগাত করিয়া কমলা যখন রমেশের কাছে কিরিয়া আসিল, তখনো মাঝে মাঝে এমন-সকল চেষ্টে অপরূপ সঙ্গীতে ও অপকল্প নৃত্যে তাহার হৃদয়কে আঁতাত করিয়াছে—যাহার ঠিক অর্থটি সে আজ শৈলজার এই সমস্ত গল্পের কথা হইতে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু তাহার এ সমস্তই ভাঙাচোরা, ইহার ধারাবাহিকতা কিছুই নাই। তাহাকে যেন কোন-একটা পরিণাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে দেওয়া হই নাই। শৈলজা ও বিপিনের মধ্যে যে একটা অগ্রাহের টান, সেটা রমেশ ও তাহার মধ্যে কোথায় ? এই

বে কয়েকদিন তাহারে বোম্বোশোনা বন্ধ
হইয়া আছে, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে
এমন কি অস্বস্তি উপস্থিত হইয়াছে—
এবং রমেশও যে তাঁহাকে দেখিবার চক্ৰ
বাহিরে বসিয়া-বসিয়া কোনপ্রকার কৌশল
উদ্ভাবন করিতেছে, তাহা কোনমতেই
বিবাসযোগ্য নহে ।

ইতিমধ্যে যেদিন রবিবার আসিল, সে-
দিন শৈলজা কিছু সুস্থির পড়িল। তাহার
নুতন সখীকে দীর্ঘকাল একেবারে একলা
পরিচ্যাগ করিতে তাহার লজ্জা করিতে
লাগিল—অথচ আজ ছুটির দিন একেবারে
বার্ষ করিবে, এত-বড় অাগশীলতাও তাহার
নাই । এদিকে রমেশবাবু নিকটে থাকিতেও
কমলা যখন নিগনে বসিত হইয়া
আছে, তখন ছুটির উৎসবে নিজের বয়স
পুরা ভোগ করিতে তাহার বাপও বোধ
হইল। আচ্ছা, যদি কোনোমতে রমেশের
সহিত কমলার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়া
যায় ?

এ সকল বিষয় গইয়া ওরফন্দসকলসহিত
পরামর্শ হলে না—কিন্তু চক্রবর্তী পরামর্শের
কত অপেক্ষা করিবার লোক নহেন। তিনি
বাড়ীকে প্রচার করিয়া দিলেন, আজ তিনি
বিশেষ কাজে সহরের বাহিরে বাইতেছেন।
রমেশকে বুঝাইয়া গেলেন যে, বাহিরের লোক
আজ কেহ তাহার বাড়ীতে আসিতেছে না
—সময়দরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া
যাইতেছেন। এ খবর তাহার কস্তাকও
বিশেষ করিয়া শোনিয়া দিলেন—নিশ্চয়
জানিতেন, নকানু ইন্দিরের কি অর্থ, তাহা
বৃদ্ধিতে শৈলজার নিগম হয় না ।

যানের পর শৈলজা কমলাকে বলিল, “এস
ভাই, তোনার চুল শুকাইয়া দিই !”

কমলা কহিল—“কেন, আর এত ভাড়া-
ভাড়ি কিম্বের ?”

শৈলজা । “সে কথা পরে হইবে—
তোনার চুলটা আগে বাঁধিয়া দিই ।”—বলিয়া
কমলার বাথা গইয়া পড়িল। আজ বিনামির
সংখ্যা অনেক বেশি—গোপা একটা বৃহৎ
বাপার হইয়া উঠিল ।

তাহার পরে কাপড় গইয়া উঠরের মধ্যে
একটা বিঘন তর্ক বাধিয়া গেল। শৈলজা
তাহাকে যে রঙীন কাপড় পরাইতে চায়,
কমলা তাহা পরিবার কোনো কারণ প্রত্যা
পাইল না। অবশেষে শৈলজাকে সন্তুষ্ট
করিবার চক্ৰ পরিতে হইল !

মধ্যাহ্নে আহারের পর শৈলজা তাহার
এম্বীকে কানে-কানে কি-একটা বলিয়া
কমলাকে চক্ৰ ছুটি গইয়া আসিল। তাহার
পরে কমলাকে বাহিরের ঘরে পাঠাইবার
কত পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল ।

রমেশের কাছে কমলা ইতিপূর্বে অনেক-
বার অসকোচে গিয়াছে। এ সবকে সমাজে
লক্ষ্যপ্রকাশের যে কোনো বিধান আছে,
তাহা জানিবার পৈ কোনো অবসর পায় নাই ।
পরিচয়ের আরম্ভেই রমেশ সন্ধ্যা ভাঙিয়া
দিয়াছিল। নির্লক্ষতার অপবাদ দিয়া বিচার
দিবার সম্মুখীও তাহার কাছে কেহ ছিল না ।

কিন্তু আজ শৈলজার অনুরোধ পাশ
করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল ।
স্বামীর কাছে শৈলজা যে অধিকারে যায়,
তাহা সে জানিয়াছে—কমলা সেই অধিকারের
গৌরব গণন করিতেছে না, তখন

দীনভাবে সে আজ কেমন করিয়া
বাইবে।

কমলাকে যখন কিছুতেই রান্না করা
গেল না, তখন শৈল মনে করিল, রমেশের
‘পরে সে অভিমান করিয়াছে। অভিমান
করিবার কথাই বটে! কয়টা দিন কাটিয়া
গেল, অথচ রমেশবাবু কোনো ছুটা করিয়া
একবার দেখানাকাতের চেষ্টাও করিলেন না।

বাড়ীর গৃহিণী তখন আগাগোড়া ঘরে
দুয়ার দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শৈলজা
বিপিনকে আসিয়া কহিল, “রমেশবাবুকে
তুমি আজ কমলার নাম করিয়া বাড়ীর
মধ্যেই ডাকিয়া আন। বাবা কিছু মনে
করিবেন না, না কিছু জানিতেই পারিবেন
না।” বিপিনের মত চুপচাপ মুখচোরা
লোকের পক্ষে একপ দোহা কোনমতেই
কটিকর নহে, তথাপি হৃতির সিনে এই
অনুরোধ স্বাক্ষর করিতে সে বাহস করিল না।

রমেশ তখন বাহিরের ঘরের আরিম-পাতা
ঘেঁষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া এক পারের
উজ্জ্বল হাঁচির উপরে আর-এক পা তুলিয়া-
দিয়া পারোনিয়া পড়িতেছিল। পাঠ্য
অংশ শেষ করিয়া যখন কালের অভাবে
তাহার বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগ দ্বিবার
উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় বিপিনকে
ঘরে আসিতে দেখিয়া সে উৎক্লম হইয়া
উঠিল। সজিহ্নাশ্রম বিপিন যে খুব প্রথম-
শ্রেণীর পদার্থ, তাহা না হইলেও বিশেষে
মহাত্ম্যবাপনের পক্ষে রমেশ তাহাকে পয়স-
লাভ বলিয়া গণ্য করিল এবং বলিয়া উঠিল,
“আহুন বিপিনবাবু, আহুন, বহুন।”

বিপিন না বসিয়াই একটুখানি মাথা

চুলকাইয়া বলিল, “আপনাকে একবার ইনি
ভিতরে ডাকিতেছেন।”

রমেশ বিজ্ঞাপা করিল, “কে, কমলা?”
বিপিন কহিল—“হাঁ।”

রমেশ কিছু অন্তর্য্য হইল। রমেশ
পূর্বেই স্থির করিয়াছে, কমলাকে সে জী
বলিয়াই গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার
প্রাভাবিক-দ্বিধাও মন তৎপূর্বে এই কয়দিন
অব্যর্থ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। কল্পনার
কমলাকে গৃহিণীপদে অভিষিক্ত করিয়া
সে মনকে নানা-প্রকার ভাবোত্তেজের আশ্রমে
উত্তেজিত করিয়াও তুলিয়াছে—কিন্তু প্রথম
আরম্ভটাই দ্রুত। কিছুদিন হইতে কমলার
প্রতি যেটুকু দৃষ্টি রক্ষা করা তাহার
অভ্যন্ত হইয়া গেছে, হঠাৎ একদিন কেমন
করিয়া সেটা ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহা সে
ভাবিয়া পাইতেছিল না, এইজন্যই বাড়ীত্যাগ
করিবার দিকে তাহার তেমন সঙ্কল্প
ছিল না।

কমলা ডাকিয়াছে শুনিয়া রমেশের মনে
হইল, নিশ্চয় বিশেষ কোন-একটা প্রয়োজন
পড়িয়াছে। তবু প্রয়োজনের ডাক হইলেও
তাহার মনের মধ্যে একটা হিন্দোল উঠিল।
বিপিনের অসুস্থতা হইয়া পারোনিয়া
ফেলিয়া-রাখিয়া যখন সে অন্তঃপুরে যাত্রা
করিল, তখন এই মধুর-গুঞ্জনিত কাণ্ডিকের
আলতহীর্ষ জনহীন মধ্যাহ্নে একটা অভি-
সারের আভাস তাহার চিত্তকে একটুখানি
চঞ্চল করিল।

বিপিন কিছুদূর হইতে ঘর দেখাইয়া
দিয়া চলিয়া গেল। কমলা মনে করিয়া-
ছিল, শৈলজা তাহার সখকে ভাল ছাড়িয়া-

দিয়া বিপিনের কাছে চণিয়া গেছে। তাই সে খোলা-দরবার-চৌকাঠের উপর বসিয়া লাম্বনের বাসানের দিকে চাহিয়া ছিল। শৈল কেমন করিয়া কনলার অন্তরে-বাহিরে একটা ভালবাসার সুর বাঁধিয়া দিয়াছিল। স্নেহপূর্ণ বাতাসে বাহিরে গাছের পল্লবগুলি যেমন মূর্খরশ্মে কাঁপিয়া উঠিতেছিল—কনলার বুকের ভিতরেও মাঝে মাঝে তেমনি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়া উঠিয়া অবাস্তবের নায় একটি অপক্লপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছিল। শৈল যে তাহাকে আজ একটু বিশেষ করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, সেই সাজ তাহাকে স্তরে-স্তরে বেঁটন করিয়া তাহাকে যেন নীরবে পরিপূর্ণ আয়নিবেদনের একটি অপূর্ণ কাব্য তুলাইতেছিল। সে যেন আপনাকে স্বর্ণধানে সজ্জিত সুগন্ধ-বিহীন নৈবেদ্যের সজ্জাবিকশিত পুষ্পাশির মত অসুভব করিতেছিল—চারিদিকে শরতের মধ্যাহ্ন নির্জন পোনার নন্দিতটির মত নির্মল নীলাকাশে চূড়া তুলিয়া ঝাঁড়াইয়া ছিল—কিন্তু হার, দেবতা কোথায়!

এমন সময়ে রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—“কমলা”, তখন সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তাহার স্বপ্নিগের মধ্যে রক্ত তরঙ্গিত হইতে লাগিল। যে “কমলা” ইতিপূর্বে কখনো রমেশের কাছে বিশেষ লক্ষ্য অসুভব করে নাই, সে আজ ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

আজিকার সাজসজ্জা ও ভাবে-আভাসে রমেশ কমলাকে নূতন মণ্ডিত দেখিল। ২৪১২.

কনলার এই বিকাশ তাহাকে আশ্চর্য্য এবং অভিভূত করিল। সে আগে আগে কনলার কাছে আসিয়া দ্রুতগতির জল চূপ করিয়া ঝাঁড়াইয়া মুহুরেরে কহিল, “কমলা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?”

কমলা চমকিতা-উদ্ভিগা অনাবত্তক উত্তর-জনার সহিত বলিয়া উঠিল—“না, না, না, আঁর্ষি ডাকি নাই—আমি কেন ডাকিতে বাইব!”

রমেশ কহিল, “ডাকিলেই বা দোষ কি কমলা?”

কমলা দিগুণ প্রবলতার সহিত বলিল—“না, আমি ডাকি নাই!”

রমেশ কহিল, “তা বেশ কথা! তুমি না ডাকিতেই আমি আসিয়াছি! তাই বলিয়াই কি অন্যদের কিরিয়া বাইতে হইবে?”

কমলা। তুমি এখানে আছি! সন্ধ্যা জামিতে পারিলে গাঢ় করিবে—তুমি যাও! আমি তোমাকে ডাকি নাই।

রমেশ কনলার হাত চাপিয়া-বলিয়া কহিল, “আচ্ছা, তুমি আমার ঘরে এস—সেখানে বাহিরের পুণ্যক কেহ নাই!”

কমলা কল্পিতকলেবরে তাকাতাড়ি রমেশের হাত ছাড়াইয়া-নইয়া পানের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

রমেশ বুকিল, এ সমস্তই বাড়ীর কোনো মেয়ের বড়-বড়—এই বুকিয়া পুলকিতমেহে বাহিরের ঘরে গেল। চিৎ হইয়া পড়িয়া আর-একবার প্রায়োনিয়রটা টানিয়া-নইয়া তাহার বিভ্রাটমণ্ডল উপরে চোব বুলাইতে

নাগিল, কিন্তু কিছুই অর্থগ্রহ হইল না। তাহার দ্বন্দ্বাকীর্ণ নানারঙের ডাঙের মেঘ উকো-বাতাসে ভাগিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শৈল ক্রুদ্ধবস্ত্রে বা দিল—কেহ দরজা খুলিয়া নী। তখন সে দরজার খড়খড়ি খুলিয়া বাহির হইতে হাত গলাইয়া-দিয়া ছিটকিনি খুলিয়া কেলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, কমলা মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাঁড়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে।

শৈল আশ্চর্য হইয়া গেল। এমনি কি ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহার চিত্ত কমলা এত অধীত পার! তাড়াতাড়ি তাহার পাশে বসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া শ্রদ্ধাভাবে বলিতে লাগিল, “কেন তাই, তোমার কী হইয়াছে—তুমি কেন কাঁদিতেছ!?”

কমলা কহিল, “তুমি কেন উৎসাহকে ডাকিয়া আনিলে? তোমার ভারি অজ্ঞান!”

কমলার এই সকল আকস্মিক আবেগের প্রবলতা তাহার নিজের পক্ষে এবং অজ্ঞান পক্ষে বোকা ভাবি শক্ত। ইহার মধ্যে যে তাহার কল্পদিনের শুভবেদনার সঙ্গ অটুট, তাহা কেহই জানে না!

কমলা আজ একটা কমলা-লোক অধিকার করিয়া বেশ শুদ্ধইয়া বসিয়া ছিল! রমেশ যদি বেশ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, তবে সূর্যেরই হইত। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত চলেবার কঠিন ফেলা হইল। কমলাকে ছুটি সন্ধ্যায় ইঙ্গুল কণী করিয়া রাখিবার চেষ্টা করার রমেশের

উল্লসিত, এ সমস্তই মনের তলদেশে আশো-ভিত হইয়া উঠিল। কহে—“পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আনিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে—আমল জিনিষটি যে কি, তাহা গাঙ্গিপুরে আলার পরে কলঙ্ক অতি মনদিনেই যেন স্পষ্ট হুজিতে পারিয়াছে।

কিন্তু শৈলর পক্ষে এ সব কথা বোকা শক্ত। কলঙ্ক এবং রমেশের মাঝখানে যে কোনো প্রকারের সত্যকার ব্যবধান থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে বহুদূরে কমলার মাথা নিম্নের কোলের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা তাই, রমেশবাবু কি তোমাকে কোনো কঠিন কথা বলিয়াছেন? হয় ত ইনি তাহাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাগ করিয়াছেন। তুমি বলিলে না কেন যে, এ সমস্ত আমার কাজ!”

কমলা কহিল, “না না, তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কেন তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে?”

শৈল ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, “আচ্ছা তাই দোষ হইয়াছে, নাপ কর!”

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া-বসিয়া শৈলর গলা জড়াইয়া ধরিল—কহিল—“যাও তাই, যাও তুমি, বিপিনবাবু রাগ করিতেছেন!”

বাহিরে নির্জনঘরে রমেশ পাগোনিয়রের উপর অনেকক্ষণ গুণা চোখ বুলাইয়া এক-সময় সবলে সেটা ছুড়িয়া কেলিয়া দিল। তার পর উঠিয়া-বসিয়া কহিল—“না, আর না। কলঙ্ক কলিকাতায় গিয়া প্রায় ৩ চইয়া

আদিব। কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া মনেনের কর্তব্যাবদ্ধি চ্যায় আজ পূর্ণ-
এখন করিতে রত দিনগণ্য চইতেছে, ততই তাবে ব্যগ্র হইয়া সমস্ত শিখা-সংসার এক-
আবার সম্ভার বাড়িতেছে ।” লক্ষ্যে অতিক্রম করিল ।

ক্রমশ ।

সার মতের আলোচনা ।

কাণ্ট ঘরের লোক ।

আমরা এক্ষণে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে, ভেদজ্ঞান হইতে অভেদ-
জ্ঞানে যাত্রা করিবার উল্লাস করিতেছি ।
পথের মাঝে বিশেষ বিশেষ ঘাট-স্থানে
দুর্ভেদ প্রাচীর সমুখিত রহিয়াছে । সে
প্রাচীরগুলির প্রতিষ্ঠাকর্ত্তী হ'লেন ভেদবুদ্ধি ।
সেগুলি ভাঙিয়া-কেলিয়া সমুখের পথ পরি-
ষ্কার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক । একটা
প্রাচীর হ'লে ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয়
তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে গাঢ় করাইয়া-তোলা কাল্পনিক
প্রভেদ । আমি দেখাইতে চাই—প্রভেদ
কেবল উপরে-উপরে, ভিতরে-ভিতরে হ্রদের
মধ্যে খুবই মিল রহিয়াছে । দেখাইতে চাই
যে, ১-২-৩ এবং ১-২-৩'র মধ্যে বৈরুপ
প্রভেদ, মা-রে-গা-মা এবং Do-re-mi-fa'র
মধ্যে বৈরুপ প্রভেদ, দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং
ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে অনেকটা সেই
ধাঁচ'র প্রভেদ । যাঁহারা বলেন যে, “সোপা-
ধিক,” “নিরুপাধিক,” “আভাসচৈতন্ত,”
“কূটস্থচৈতন্ত,” একপ-দ্বয়ের কোনো
কথার উল্লেখ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে পুঙ্খিলে

পাওয়া যায় না, তাঁহারা যদি একবার একই
কটে খাঁকার করিয়া কাণ্টের দুর্শনপ্রাধানি
প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলেই
তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে । তাহা হইলে তাঁহারা
দেখিতে পাইবেন যে, Transcendental
apperception-এর নামই কূটস্থচৈতন্ত ;
Empirical apperception-এর নামই
আভাসচৈতন্ত ; Transcendent-এর নামই
নিরুপাধিক ; Immanent-এর নামই সোপা-
ধিক । তা ছাড়া, কাণ্টের দর্শনে সোপাধিক
এবং নিরুপাধিকের সন্ধিস্থলে বৈশ্বীয় ভাগ
আর-একটি কথা দেখিতে পাইবেন—সেটি
হ'লে Transcendental । Transcendent
স্থান-রকমের নিরুপাধিক, Transcendental
গৌণরকমের নিরুপাধিক, অর্থাৎ কিনা—
সোপাধিকের কিনারা-খোদা নিরুপাধিক ।

কাণ্টের অল্প আশ্রয় কেন এত মাথা-
ব্যথা ? অবশ্যই তাহার বিশেষ একটি
কারণ আছে । সে কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান-
সংক্ষেপে কাণ্ট তাহা-নাহা বলিয়াছেন, তাহার
ভিতরে অনেকগুলি খাঁচা-সভা চাপাচূর্ণি দেওয়া
আছে । কাণ্টের দর্শন সমস্ত ভুল দিয়া সেই

গুলি উদ্ধৃত করিয়া আনিয়া যদি দেখীর পণ্ডিত-
গণের চক্ষের সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে
তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে,
তাঁহার একটিও নূতন নহে—সমস্তই আমাদের
দেশের বহুপ্রাচীন গৈরুক-সম্পত্তি। হুংথের
বিষয় এই যে, কান্টের নিম্নের ভাবদেবগণের
সেই প্রকৃষ্ট কলগুলি তাঁহার নিম্নের ভোগে
আসিল না—তৎকালে ইউরোপীয় ধর্ম-
যাজকদিগের প্রচলিত মতামতের সঙ্গে সেগুলির
মিল না-হওয়া-পতিকে। তেলে-জলে কেমন
করিয়াই বা মিশ খাইবে। আমাদের দেশের
তত্ত্বজ্ঞানীরা সার সত্যের দৃঢ় ডাঙাছিমিতে
হই পাবে ভর দিয়া ধাঁড়ীইয়া আছেন; কান্ট-
এক পাড়াডাইয়া সার সত্যের ডাঙার ভর
হাপন করিয়াছেন, আর, তাঁহার আর-এক
পা রহিয়াছে সংশয়ের তরঙ্গ-দোলায় নোহুলা-
মান পিছনের নৌকার ভর দিয়া—ইতাবসরে
তিনি তাঁহার চারিদিকের ধর্মযাজকদিগের
ত্রুটী-কুটিল মুখতরী দেখিয়া পিছনের পা
ডাঙার উঠাইতে সাহস পাইলেন না। কান্টের
এক পা সংশয়-দোলায় নোহুলামান—আর-এক
পা ঐক্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা দেখিয়া আমার
মনে এইরূপ প্রতীতি করিয়াছে যে, কান্ট অর্ধ
সংশয়বাদী—অর্ধ হিরবাদী। তা বই, ধাঁড়ীরা
বলেন যে, কান্ট প্রকৃতপক্ষেই সংশয়বাদী,
তাঁহাদের কথার আমি কোনোক্রমেই সার
দিতে পারি না। ফলে, এটা আমি মানি
যে, আধুনিক ইউরোপের (বিশেষত
ইংলণ্ডের) আর-অরি খ্যাতিমান পণ্ডিতগণ
কান্টের দর্শনের উপরিস্তরের তরঙ্গ-দোলায়
হুলিয়া বেড়ানো একটা খেলা পাইয়াছেন
মন না; তাঁহাদের মস্তিষ্ক-চালনার পক্ষে

তাঁহা একপ্রকার স্টুটগার্ট বা গন-টেনিস
বা পোলো। এতদ্ব্যতীত, কান্টের দর্শ-
নের অন্তর্ভূলে যে অগাধ নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি,
অল রহিয়াছে, তাহার তাঁহারা বড়-একটা
বোঝ-ধবর রাখেন না। কান্টের এই-
প্রণীর বহির্ভুক্ত চোলায় গাংগনাদের গোহ-
মৃৎখলকেই আপনাদের কানের হার করিয়া-
ছেন, এ কথা পুইই সত্য—কিন্তু সে ঘোষ
কান্টের নহে। হুংথের বিষয় এই যে,
ইউরোপের দেবাদেপি নব্য ভারতবাসীরা
তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের আবিষ্কৃত তত্ত্ব-
জ্ঞানের পথকে ব্যাঘ্রের মতো ডরাইতে
শিখিয়াছেন। ইউরোপীয় ধর্মযাজকদিগের
সাম্প্রদায়িক মূলমূল্যে তত্ত্বজ্ঞানের পথ
যে অধঃপতনের পথ বলিয়া প্রতীয়মান
হইবে—তাঁহা তো হইবারই কথা! তত্ত্ব-
জ্ঞানের আলোক যদি তাঁহাদের অন্ধকারা-
চ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক কোঠের প্রবেশ করিয়া
তাঁহাদের সাধের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া ভাঙ,
তবে তাঁহাদের আর থাকিবে কি? কিন্তু
আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের
তো আর সেরূপ মর্গান্তিক বিরোধ নাই।
উপ্তা বরং বলা ঘাইতে পারে যে, আমাদের
দেশের ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিমূল যদি কিছু থাকে,
তবে তাহা তত্ত্বজ্ঞান। আমাদের দেশের
সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, অবিতর্কিত
সমস্ত অনর্থের মূল; কেবল তত্ত্বজ্ঞানই পরম-
পুরুষার্থের সোপান। কিন্তু বিধির কি
বিড়ম্বনা—নব্যভারতের বিদ্যামণ্ডলীর মধ্যে
প্রায়শই এইরূপ একটা ইউরোপীয় বান্ধি-পং
থখন-তখন শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানের
আলোচনাতে সত্যকে পাওয়া যায় না—

জ্ঞানের মধ্যে কেবল সংশয়ই সার হয়।
বেন—তবজ্ঞান অবিজ্ঞানট নানাতর। জ্ঞান-
শাস্ত্রীয় চৈকীর কচ্চটিকেই তাঁহার জ্ঞানের
একবার তবজ্ঞান। * এ বোধ তাঁহাদের
নাই যে, তবজ্ঞান চৈকীর কচ্চটিও নহে,
আর, সংশয়ের বিভ্রান্তিও নহে; পরন্তু তব-
জ্ঞান সেই অবস্থার জ্ঞান, বাহার সংশ্লেশে—
“ভিত্তিতে ‘জ্ঞানগ্রন্থিহিহিত্তে সর্বসংসারঃ
কীর্ত্তে চাত কর্ণানি,’—অবস্থের গুণি পুলিয়া
যায়, সর্বসংসার ছিন্ন হইয়া যায়, কর্ণবকন
কর পাইয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে কাণ্ট সংশয়-
বাদের সন্ধার বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা কাহারো
অবিস্মিত নাই; ইহাও কাহারো অবি-
স্মিত নাই যে, আমাদের দেশের তবজ্ঞানী
পণ্ডিতগণ সংশয়ের দিক্ দিয়াও গান নাই,
পরন্তু তাঁহাদের গন্তব্যপথে তাঁহারা প্রক-
তক্তি এবং নিষ্ঠার সহিত প্রতিপদে অগ্রসর
হইয়াছেন; তবুও যে আমি কাণ্টকে আমা-
দের দেশের তবজ্ঞানপণ্ডিতগণের দলভুক্ত করিতে
কুণ্ঠিত হইতেছি না কেন, তাহার কারণ ঐ
যাহা আমি একই পূর্বে ইঙ্গিত করিয়াছি;—
কি? না, কাণ্ট নিভান্তই দ্বারে পড়িয়া সংশয়-
বাদে অক্রান্ত হইয়াছেন; তা বই, সংশয়বাদ
তাঁহার প্রকৃত মনের কথা নহে। তাঁহার
আবিষ্কৃত পথ নিভান্তই একটা নূতন পার্শ্বতা-
পথ, বহির্ভূত তাহা ইউরোপের কাছেই
নূতন—ভারতের কাছে বহুপ্রাচীন; অমন
একটা নূতন পথের উল্লিখণ্ডে বৃহত্তার সহিত
ভর দিয়া দাঁড়ানো প্রথম আবিষ্কারীকে
কিরূপ অসমসাহসিক কাণ্ড, তাহা বিবেচনা
করিয়া দেখিলে, কাণ্ট যে তাহা করিতে

ইতস্তত করিয়াছেন, দেখত তাঁহাকে আমরা
একটুও দোষ দিতে পারি না। একা হাতে
তিনি বাহ্য করিয়াছেন—গণ্যেই করিয়াছেন।
তাঁহার সংশয়বাদের জটিল জ্বলের মধ্যে
হইতে প্রকৃত তথ্যের আলোক বর্ণ-মর্ত্য-
পাতাল আলোকিত করিয়া উদ্ভাসিত হই-
তেছে—ইহা অনেকের হয় তো জানেন না,
কিন্তু তাঁহাদের চক্ষ আছে, তাঁহারা দেখিতে
পান।

কাণ্টের মর্মান্বিত গোপন কথা বেশী
নহে—হুই-তিনটি। একটি হচ্ছে—পূর্বে
যাহা বলিয়াছি, কি? না,—Thoughts with-
out contents are empty, intuitions
without concepts are blind—
সাক্ষ্য উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা ফাঁকা,
ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষ্য উপলব্ধি
অন্ধ। কাণ্টের এ কথাটি বড় একটা নূতন
কথা হইত, যদি সাংখ্যদর্শনের দোড়াতেই
না থাকিত যে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষ
থল, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতি অন্ধ। ভাবনা
তো ফাঁকা হইবেই; ভাবনা ভোগাইতেছেন
কে? না, সংবিশুদ্ধ বা চৈতন্যরূপী পুরুষ,
ইনি যে থল অর্থাৎ চৈতন্যকিরিত। সাক্ষ্য
উপলব্ধি তো অন্ধ হইবেই—সাক্ষ্য উপলব্ধি
ভোগাইতেছেন কে? না, প্রকৃতি; ইনি যে
অন্ধ। সাংখ্য বলেন যে, পুরুষ থল হইয়াও—
থল নহেন কেবল প্রকৃতির গুণে; প্রকৃতি
অন্ধ হইয়াও—অন্ধ নহেন কেবল পুরুষের
গুণে। কাণ্ট বলেন, ভাবনী ফাঁকা হইয়াও—
ফাঁকা নহে কেবল সাক্ষ্য উপলব্ধির গুণে,
সাক্ষ্য উপলব্ধি অন্ধ হইয়াও অন্ধ নহে
কেবল ভাবনার গুণে।

কান্টের আর-একটি গোড়ার কথা হচ্ছে—
 Synthetic unity of apperception—
 সংবিত্তের যোগাত্মক ঐক্য । কান্ট বলেন—
 The synthetic unity of consciousness is an objective condition of all knowledge; a condition, not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each intuition must be subject in order to become an object for me.
 ইহার অর্থ :—

সংবিত্তের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বিষয়বস্তুতঃ (অর্থাৎ বস্তুবস্তুতঃ)-মূল-নিবন্ধন ।
 এমি-একটা মূল-নিবন্ধন—অর্থাৎ যাহা নহিলে নয় এমি-একটা গোড়ার কথা—যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞানপোষণে উপনীত হইবার জন্য জ্ঞেয়বস্তুর পক্ষেও তাহা আবশ্যক । কান্ট এ যাহা বলিয়াছেন, এটা একটা ষটি মূল দার্শনিক তত্ত্ব বটে, কিন্তু বস্তুটা ষটি মনে হইতেছে, ততটা নহে ।
 উহার সুখ হইতে দার্শনিক-ভাষার মুখোস্ত খুলিয়া লইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহা সত্যও নহে, সৈত্যাও নহে, অসত্যও নহে, পরন্তু উহা আমাদের একটি চিরপরিচিত বস্তুর লোক । অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হোক ।

লৌকিক-ব্যবসায়ের পক্ষে এ কথা সুবসত্য যে, আগে কাঁচা-মাল (raw material), পরে তৈয়ারি-জিনিষ (manufactured articles) । কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়াইবো যে, যাহাকে আমরা কাঁচা-মাল

ঠাণ্ডাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাঁচা-মাল নহে; তাহাও তৈয়ারি-জিনিষ । কাঁচা-মাল, ইত্যাদি তৈয়ারি-জিনিষ; তাঁতির নিকটে ইত্যাদি কাঁচা-মাল, বস্ত্র তৈয়ারি-জিনিষ; নাক্তির নিকটে বস্ত্র কাঁচা-মাল, পোষাক তৈয়ারি-জিনিষ । তেমনি আবার, ইষ্টকনিষ্ঠাতার নিকটে মৃত্তিকা কাঁচা-মাল ইত্যাদি তৈয়ারি-জিনিষ, স্নানসজ্জার নিকটে ইষ্টক কাঁচা-মাল, দেয়াল তৈয়ারি-জিনিষ । প্রকৃতিমাতার কাছে তুলাও তৈয়ারি-জিনিষ, মৃত্তিকাও তৈয়ারি-জিনিষ । বস্ত্রবস্ত্রন করিবার পূর্বে যেমন স্বত্র সংগ্রহ করা চাই, তেমনি বৃক্ষ ভাষিবার পূর্বে বৃক্ষ যে কিরূপ, তাহা চক্ষে দেখা চাই; এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, বৃক্ষের মূর্তি যাহা আমরা চক্ষে দেখি, তাহা কাঁচা-মাল এবং বৃক্ষের ভাব যাহা আমরা মনে ভাবি, তাহা তৈয়ারি-জিনিষ । এই গেল একদিকের কথা; আর-এক দিকের কথা এই যে, বুজাই যে কেবল তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—ইত্যাদি তৈয়ারি-জিনিষ । ইত্যাদি যে কেবল তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—তুলাও তৈয়ারি-জিনিষ । মনে-ভাবা বৃক্ষই যে তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—চক্ষে-দেখা বৃক্ষও তৈয়ারি-জিনিষ । তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, মনে-ভাবা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্তা আমরা আপনারা; চক্ষে-দেখা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্তা হ'লেন প্রকৃতি । অতঃপর উল্লেখ্য এই যে, চক্ষে-দেখা বৃক্ষই হো'ক, আর মনে-ভাবা বৃক্ষই হো'ক, তাহা পড়িয়া তুলিবার মূল একরূপ-পদ্ধতি একইপ্রকার—সে একরূপ-পদ্ধতি হ'ছে সংযোজনা synthesis । পাঠ্য-পত্র-

কল-কলের সংযোগের বাতিরেকে মনে-ভাব্য বৃক্ষেরও গঠনকার্য সমাধা হইতে পারে না, চক্ষু-দেখা বৃক্ষেরও গঠনকার্য সমাধা হইতে পারে না। গঠনকার্যের মূল প্রকরণ-পদ্ধতি উভয়ই সমান—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; এখন স্নিগ্ধ এই যে, গঠনকার্যের নির্বাহকর্তা কি হই হলে হই বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা হই হলেই একই অভিন্ন ব্যক্তি। এক ব্যক্তিকে আমি ইষ্টক তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি, আর-এক ব্যক্তিকে খাম তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি তাই আমি বলি যে, ইষ্টকের গঠন-কর্তা সত্য, আর, শুষ্কের গঠন-কর্তা সত্য। পক্ষান্তরে, প্রকৃতি-মাতাকে আমি বৃক্ষ তৈয়ারি করিতে দেখি নাই; অগতঃ যখনই আমি বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই একেবারেই একটা তৈয়ারি বৃক্ষ আমার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। ইহাতে দর্শকের মনোমধ্যে এই-রূপ একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে বৃক্ষ প্রকৃতিমাতা বাহিরে বসিয়া কার্য করেন না; তবে বৃক্ষ তিনি প্রতিজ্ঞনের অন্তরের অন্তঃপুরে বসিয়া কার্য করেন? নহিলে তাহাকে কেহ চক্ষে দেখিতে না পার কেন? তবে কি আদ্যমাত্র হই ব্যক্তি একজনে যুগল-বঁধা থাকিয়া—এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের দৃষ্ট-দৃষ্টি, আর-এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের ভাব-বৃত্তি? রূপক-রূপে বলিতে-চাও-বলো হই ব্যক্তি। পরন্তু কাণ্ট ও-আরগার বলেন একই জ্ঞানের দুই পৃষ্ঠ। এক পৃষ্ঠ হ'লে আভ্যন্তরীণ Empirical consciousness; আর এক পৃষ্ঠ হ'লে কূটবৈজ্ঞানিক Transcendental

consciousness; তাহা হ'লে মতো অভ্যন্তরীণ আভ্যন্তরীণ subjective অর্থাৎ ব্যক্তিগত; কূটবৈজ্ঞানিক objective বস্তুগত অর্থাৎ সর্বগত। তার দাবী--কাণ্ট, 'বলিয়াছেন, The synthetic unity of a perception is an objective condition of all knowledge "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বস্তু-ঘটিত-মূল-নিবন্ধন।" এই কথা বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরে বলিয়াছেন যে, a condition not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each intuition must be subject in order to become an object for me. "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য জ্ঞানের এমি-একটা মূল-নিবন্ধন যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞানপোচের উপনীত হইবার জন্য তাহা জ্ঞেয়-বস্তুর পক্ষেও আবশ্যক।" মোটামুটি সহজ ভাষায় বলিলাম জ্ঞেয়-বস্তু কিন্তু কাণ্টের চুল-চেরা ভাষায় জ্ঞেয়-বস্তু হ'লে Intuition অর্থাৎ সাক্ষ্য উপলব্ধির বিষয়; যেমন—প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্টমান বৃক্ষ। কাণ্টের কথায় মর্মান্বিত তাৎপর্য এই যে, সেই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্টমান বৃক্ষমূর্তি, বাহ্যকে আমরা সজাচার বলি প্রকৃতির স্বহস্তবিরচিত, তাহাতেও সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যের কার্যকারিতা রহিয়াছে। একটা তৈয়ারি বৃক্ষ যখন আর্মার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তখন তাহা সেই সাংবিত ঐক্যের যোগসূত্রে বাঁধা হইয়াই আমাদের, চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত

হয়। কাণ্টের এই চরম কথাটি খুব সহজ ভাষায় বোটাঘুটি বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে এইরূপে : একই অভিন্ন ব্যক্তি দর্শন এবং চিন্তন, উভয় কাণ্ডেরই কঠা। বুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের সমগ্র যে ব্যক্তি চোদ্দখ আনোকে শাখাপত্র-কলকুল সংযোজন করিয়া বুদ্ধের মূর্তি সংগঠন করে, বুদ্ধ ভাবিবার সময়েও সেই ব্যক্তি মানসিক আনোকে শাখাপত্র-কলকুল সংযোজন করিয়া বুদ্ধের ভাব সংগঠন করে। সংযোজনা-কার্য্য ভূইপুলেই সমান চলে; ভাবনা-কার্য্যও যেমন চলে—দর্শন-কার্য্যও তেমনি চলে। কাণ্টের বলিতে চরম, সংযোজনা-কার্য্য synthesis জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। সংযোজনঃ মস্ত একটা টানা-ভাল। সেই টানা-কালে কালের এক যুদ্ধের সঙ্গে আর-আর যুদ্ধের এবং আকাশের এক দেশের সঙ্গে আর-আর দেশের ক্ষেত্র বাধা হইয়া পড়িতেছে নিত্য-নিয়ত। সেই মহাবিকীর্ণ যোগ-বিশ্বজালের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছে সাংবিত্র্যের জ্যোতির্গুণ। আর, সাংবিত্র্য একা এই মহাবিকীর্ণ যোগজালের কেন্দ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া কাণ্ট সাংবিত্র্য একের বিশেষণ দিয়াছেন যোগাত্মক। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যোজনাক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাংবিত্র্যের একা আমাদের জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচর হয়। গায়ক যখন পরপর সুরা সংযোজন করিয়া গান করে, তখনই আপনাকে গায়করূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। আমরা যখন আনোকে রসিবোগে শাখাপত্র-কলকুল সংযোজন করিয়া বুদ্ধ দর্শন করি, তখনই আমরা বুদ্ধের ভট্টাক্রমে আপনাকে সারসীং উপলব্ধি করি।

যখন আমরা মনোমধ্যে শাখাপত্র-কলকুল সংযোজন করিয়া বুদ্ধের একটা ভাব দাঁড় করাইতে চেষ্টা করি, তখন আমরা বুদ্ধের মস্তাক্রমে আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। যখন আমরা বুদ্ধের দৃষ্টমূর্তিতে বুদ্ধের মানসিক ভাব সংযোজিত করিয়া বা অধ্যা-রোপিত করিয়া উভয়ের ঐক্য-অবধারণ করি, তখন আমরা আপনাকে বোদ্ধাক্রমে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। হৃদয়িকালে যখন আমরা সংযোজন্যর জাল গুটাইয়া-লইয়া ও-সকল কিছুই করি না—তখন আমরা আপনাকে কোনো-কিছু-রূপেই উপলব্ধি করি না। প্রথমে কাণ্ট সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভাবনার মধ্যে প্রভেদের দৃঢ়তা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা সাক্ষাৎ—ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি অসম্ভব। তাহার পরে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি দুইকে সাংবিত্র্যের যোগাত্মক ঐক্যমুখে বাঁধিয়া অভেদ-জ্ঞানের গোড়া'র কথাটি ইঙ্গিতজলে বাক্য করিয়াছেন। কাণ্টের ভিতরকার কথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তাহা-কেই বলা যাইতে পারে, সাহায্যে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরস্পরের সহিত একীভূত। অর্থাৎ যেখানে ভাবনাও বা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধিও তা, একই। এইরূপ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের নাম দিয়াছেন কাণ্ট Intellectual intuition।

কাণ্ট বলেন “And yet this (অর্থাৎ সাংবিত্র্য সংযোজন) need not be a principle for every possible understanding, but only for what which gives nothing manifold through

its pure apperception in the representation, I am. An understanding which through its self-consciousness could give the manifold of intuition, and by whose representation the object of that representation should at the same time exist, would not require a special act of the synthesis of the manifold for the unity of its consciousness, while the human understanding which possesses the power of thought only, but not of intuition, requires such an act.

ইহার তাৎপর্যার্থ :—

“আমি সব জ্ঞানের সম্বন্ধে বলিতেছি না—কেবল আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধেই বলিতেছি যে, সংযোজন জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। আমাদের জ্ঞানে আমি অদ্ভুতি বলিলেই কিছু আর সব আছে বুঝার না। পরন্তু যে জ্ঞান একরূপ যে, তাহার আয়তনভাঙেই সর্বসত্তা সিদ্ধ হয়, সে জ্ঞানের সাংবিত্ত একা প্রতিপাদনের জন্য বিভিন্ন বিষয়সকলের সংযোজন-রূপিনী

বস্তু একটি প্রক্রিয়া নিস্করোজন। পক্ষান্তরে, মনুস্যের বুদ্ধিতে কেবল ভাবনা-প্রবর্তনেরই শক্তি আছে, তাই এই, সাক্ষাৎ উপলব্ধি-সংঘটনের শক্তি নাই; তাই মনুস্য-বুদ্ধির সাংবিত্ত একের জন্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি-গোচর বিভিন্ন বিষয়সকলের সংযোজন-ক্রিয়া নিত্যস্বই আবশ্যক।” কান্টের এ কথাটির তাৎপর্য এই যে, ভাবনাপ্রক্রিয়া আমাদের নিজের শক্তি; পরন্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটাইবার শক্তি আমাদের ভিতরে নহে;—এ শক্তি ঐশী শক্তি। এইজন্য, সেই ঐশী শক্তির প্রসাদলব্ধ সাক্ষাৎ উপলব্ধি-গোচর বিষয়সকল আয়তন করিবার জন্য, সংযোজন-ক্রিয়ার বা ভাবনার পরিচালনা আমাদের জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক। পক্ষান্তরে, উপনিষদে আছে—“স্বাভাবিক জ্ঞানধনক্রিয়াঃ চ” ইত্যরের জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবমিষ্ট। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐশ্বরিক জ্ঞান সংযোজনরূপিনী প্রক্রিয়ার বশবর্তী নহে। কান্টের এই ভাবগণ্য কথাটি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; অন্যত্র বারম্বার তাহার স্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীবিভেক্সনাথ ঠাকুর ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

কর্শ্বক্ষেত্র ।—শ্রীমদ্রামায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত । ১০ মূল্য ১১০ দেড় টাকা ।

আমাদিগকে দায়ে পড়িয়া অনেক বাসনা

উপভোগ পড়িতে হয়। তাহার অধিকাংশই পড়িতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, সময়ে-অসময়ে স্বীকার করিতে হয়, এবং

পরিচয় দিতে 'বঙ্গবন্দন'ের খানিকটা স্থান
নষ্ট করিতে হয়। 'কষ্টব্য বিবেচনা করিয়াই
এই কষ্টও বিড়ম্বনা আশ্রয় পোষণ করি;
ইচ্ছাধীন হইলে অনেক ব্যক্তি উপভোগই
হইত। পড়িয়া পড়িয়া কেলিয়া দিতাম।
সেইজন্য, কদাচিৎ এক আধখানি স্থপাঠ্য
উপভোগ বন্দন হাতে আসে, তখন আমাদের
বড়ই আশ্চর্য হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ
উপেক্ষা করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে
ইচ্ছা করে। এই উপভোগখানি পড়িয়া
আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।

এছাড়া যে মানবচরিত্র এবং রস-
বতারণার সুনিপুণ, তদ্বার পরিচয় এই উপ-
ভোগসেব সর্বত্রই বিস্তৃত। যেখানে যে রসের
অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে
সেই রসই বেশ সুটির উত্তরাংশে। যেখানে
হাস্যরসের চেষ্টা আছে, সেখানে না হাসিয়া
থাকা যায় না; যেখানে ক্রন্দরসের উত্তম,
সেখানে চন্দ্র আত্ম হইয়া আইসে। যেখানে
মহাচরিত্রের পার্শ্ববর্ত্তার অবতারণা,
সেখানে ভীত হুগার উত্তেক হয়। ইহাই ত
সাহিত্যিক স্বকৃতি।

চরিত্রচিত্রণেও এছাড়া বিশেষ নিপুণতার
পরিচয় দিয়াছেন। 'বিবাহমোহিনী', 'তরঙ্গিণী',
'অদ্বৈত ঘোষ' এবং 'তাঁহার পত্নী অনঙ্গমঞ্জরী',
এই কয়েকটি চরিত্র বেশ সুটির আছে—নিজ নিজ
প্রকৃতি অনুসারেই সুটির আছে। ইহার মধ্যে
অনঙ্গমঞ্জরী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।
এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ স্মৃতিময়, মৌলিক, অশক

বতাবাহুবলী। এই চরিত্রের কল্পনা ও
পরিণতির ক্ষমতা মোদরবাহুর বিশেষ প্রশংসা
করিতে হয়। সনাতন সুবোধাদ্য এই উপা-
খ্যানের প্রণবরণ সঙ্গীত অলঙ্কারের, সঙ্গীত
ঘটনার, সকল পরিণতির তিনিই মূলভূত—
অশক তাঁহার চরিত্র এই উপভোগে সম্যক
পরিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহাকে ভাল করিয়া
বুঝিতে হইলে, কতকটা পুত্রকথান্ত্রি পড়িয়া
জানিতে হয়, কতকটা ভবিষ্য লইতে হয়;
তবে, ভবিষ্য লইতে পারা যায়, এরূপ উপ-
করণ পুত্রকেই আছে। সনাতন-চরিত্রের
এই অপরিষ্কৃততা, প্রকারের নির্ধারণ কথা
নহে; বরং তাঁহার প্রশংসার কথা। কার্য্যত
তিনি ত সংসারক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবেই বিচরণ
করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চরিত্র কতকটা
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রকার ভালই করিয়াছেন।
আর, তিনিই উপভোগের প্রাণ বিনিয়াই হর
ত পরিষ্কৃত নহেন। প্রাণত চিরকালই এবং
সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন—অস্ত্রাঙ্গে অবস্থিত।

এই পুত্রকের 'বিজ্ঞাপনে' এছাড়া
লিখিয়াছেন—“সাধামতে পার্থসিদ্ধির বাগিনী
বিসর্জন দিয়া বৎসসত্ত্ব পরহিত-সাধন-
ত্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, মানব স্বকীয়
আত্মার এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সংসা-
দিত করিতে পারেন, এই তৎকথা বর্তমান
সামাজ্য এতদ্বারা প্রতিপাদ্য।”

আমরা অকৃত্তিকচিত্রে বলিতে পারি যে, এতদ-
কার ইহা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। উপভোগ-
খানি সর্বভোভাবে সমাপ্ত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য ।

যাপান ।

১৪ প্রস্তাব]

মূলমানবরশ্মি এশিয়াখণ্ডের অঙ্গে-হলে
প্রবলপ্রভাবে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার
পূর্বকালপর্যন্ত ভারত ও প্রান্ত মহা-
সাগরের বাণিজ্যব্যাপারে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের
নৌবিশ্রাবিশারদ অধিবাসিবর্গের একাধিপত্য
অক্ষুণ্ণ থাকিবার কথা নানাবিধের ইতিহাসে
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশাসনমহাসাগরের
বহুসংখ্যক দ্বীপ-উপরীপে অস্ত্রাঙ্গি তাহার
নানা নিদর্শন বর্তমান আছে।

কোন পুরাকালে এই বাণিজ্যপথ আবি-
ষ্কৃত হইয়া ভারতবর্ষের প্রভুত্ববিস্তারের
স্বত্রপাত করে, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া
গিয়াছে। বর্তমানের ইতিহাস সঙ্কলিত
হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারও বহুপূর্বে
ভারতবাসীর সমুদ্রপথে বিবিধ দবী
দীপ-পারিত হওয়া সম্ভব। ইহা সমুদ্রোপ-
কূলের মানবসমাজের সাধারণ কাহিনী।
স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য
অথবা জীবিকাার্জনের অভিনব-উপায়-উদ্ভাবন-
কামনায় সমুদ্রতীরবর্তী মানবসমাজ যে-
কোন উপায়ে সমুদ্রপথে বিচরণ করিবার

চেষ্টা করে; প্রথমে নিকটে-নিকটে ক্রমে
দূরে-দূরে গমনাগমন করিতে করিতে অর্ধ-
পোতের গঠন ও চাকনকৌশল আবিষ্কার
করিয়া মানবসমাজ বাণিজ্যের সঙ্গে রাজ্য
ও জ্ঞান বিস্তারের ক্ষমতা করিয়া পাকে।
সকল দেশেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায়; ভারতবর্ষেও এইভাবেই অতি পুরা-
কালে সমুদ্রপথে গমনাগমন প্রচলিত হইয়া
পাকিবে।

বিশ্বব্রহ্মবৎসর পুরোও যে ভারতবর্ষের
অধিবাসিবর্গের পক্ষে সমুদ্রপথে বেশবিদেশে
বাণিজ্যব্যাপার প্রথা পূর্ণপ্রত্যয়ে প্রচলিত
ছিল, তাহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
তৎপক্ষে ভারত ও প্রান্ত মহাসাগরের
দ্বীপ-উপরীপে কতদূর পর্যন্ত ভারতীয় জ্ঞান-
সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার
ঐতিহাসিক তথ্যমূলকান্তর অন্য জায়গা-
এ পর্যন্ত বখাত্তি চেষ্টা না করিলেও,
পাশ্চাত্য লেখকবর্গের গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে
কমপক্ষে নানা উপায়ে প্রকাশিত হইয়া
পড়িতেছে। প্রশাসনমহাসাগরের অঙ্গ-বঙ্গ

দীপপুত্রে ভারতীয় সাহিত্য, বর্ণমালা ও উপাসনা-প্রণালী প্রভৃতি হইবার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া এশিয়াখণ্ডের জলে-পলে ভারতীয়-জ্ঞানসাম্রাজ্য-বিস্তারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাহাদের অকুতোভয় অধ্যবসারে অতি পুরাকালে এই জ্ঞানসাম্রাজ্য বৃদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের কথা শ্রবণ করিলে বিশ্বের অভিজ্ঞ হইতে হয়।

সেকালের লোকের নিকট বাসস্থানে জলবান পরিচালনা করিবার কৌশল অপরিচিত ছিল; অর্ধবাপোতের নির্মাণকৌশলও পরাকাষ্ঠা লাভ কুরিতে পারে নাট। বাহারা সেই অসম্পূর্ণ গঠন ও চালনকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া তুরঙ্গসহুগ অপরিজ্ঞাত সমুদ্রপথে দূরদেশে গমনাগমন করিত, তাহাদের সাহস ও অধ্যবসার কাহার না বিশ্বস্ত উৎপাদন করিবে?

ভারতবর্ষের লোকে অতি পুরাকালেই প্রাকৃতিক নির্যাসবর্ণার পর্যাবেক্ষণকার্যে নিমুক্ত হইয়াছিল। সমুদ্রপথে নৈসর্গিক নিয়মে যে বায়ুপ্রবাহ প্রচলিত আছে, তাহা পুরাকাল হইতে এক নিয়মে এক পথে এক ভাবেই চলিতে করিয়া আসিতেছে। ইহাকে আধুনিক সভ্যমান্য “বার্জিয়াবায়ু” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বায়ুপ্রবাহ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সঞ্চর সংস্থাপিত করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তরপূর্বাতিমুখে প্রবাহিত হয়।

বার্জিয়াবায়ু কিঞ্চৎকাল পরে উত্তরপূর্ব হইতে পুনরায় দক্ষিণপশ্চিমাতিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তক্ষক সিংহল, সুমাত্রা ও প্রশান্ত মহাসাগরের দীপপুত্রে নৈসর্গিক বায়ুপ্রবাহের সহায়তার পোতাচালনা করা যাইতে পারে। এই পথেই ভারতীয় বারিজ্যপ্রান্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। বঙ্গোপকূল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে গমন করিতে হইলে প্রথমে দক্ষিণাবর্তে সিংহলে উপনীত হইয়া তথা হইতে সুমাত্রাবীপের ত্রিজোভনামক প্রসিদ্ধ বন্দরে ও তথা হইতে প্রশান্তমহাসাগরের দীপপুত্রে অর্ধবাপোত চালনা করিতে হইত। তক্ষক সিংহল ও সুমাত্রা ভারতীয় সমুদ্রযাত্রার প্রধান আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই পথে ভারতবর্ষের বারিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের জ্ঞানগৌরব বহুদূরদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচ্যশিলাদর্শনের ইতিহাসলেখক বাপান-নিবাসী স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত কাকাহু ও কাকুয়া ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,— মূলমানের সিংহলবর্ষের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের নাবিকগণ পুরাতন বারিজ্যপথে অগ্রসর হইত। সিংহল, যবদীপ ও সুমাত্রার উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্বক চীনা-সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের আদান-প্রদানের সঞ্চর স্থাপন করে এবং তৎপক্ষে ব্রহ্ম ও শ্রামদেশের সমুদ্রোপকূলে বর্ষদর জাতির অকুণ্ঠ সাধিত হয়।

• Down to the days of the Mahomedan conquest went, by the ancient highways of the sea, the intrepid mariners of the Bengal coast, founding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra, leaving Aryan blood to mingle with that of the seaborde races of Burma and Siam, and finding Cathay and India fast in mutual intercourse. *Ideals of the East*.

যে শক্তি এইরূপে নিকট হইতে দূরে—বীপ হইতে—দীপান্তরে,—ভারতবর্ষের প্রভাববিস্তারের সহায়তাদান করিয়াছিল, তাহা চীনরাজ্যে বাণিজ্য হইবার পর যাপান-বীপপুঞ্জ ও বাণিজ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে যাপান বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও আমাদের সহিত একত্রে আবদ্ধ। তাহার যাপানের নবজীবনদাতা ভূবনবিখ্যাত কণ্ঠবীর, তাহার কেহই যাপানের আদিমনিবাসী বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহার বলেন,—তাঁহার স্বর্ঘ্যবংশসমূহ। তাহার জাপানের আদিমনিবাসী, তাহাদের বংশধরগণ অজ্ঞাপি উত্তরাংশে বাস করিতেছে। স্বর্ঘ্যবংশোদ্ভূত নবাগত বীরবৃন্দের আক্রমণ পরাকৃত হইয়া তাহার ক্রমে উত্তরাংশে পলায়ন করায় যাপানবীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশে দিগ্বিজয়গণের উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। এই স্বর্ঘ্যবংশোদ্ভূত বীরবৃন্দ কোন্ দেশ হইতে যাপানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও তাহার উত্তরসীমাসংলগ্ন মাল-ভূমির ক্রিয়গণই স্বর্ঘ্যবংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। সে হিসাবে যাপানের সহিত ভারতবর্ষের কোন সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাহার এমন আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা নাই। রক্তসংক্রমে যাপাননিবাসী স্বর্ঘ্যবংশীয়গণ ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত না হইলেও, জ্ঞানসংক্রমে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা অজ্ঞাপি বর্তমান থাকা ঘোষণা পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে কি হুজ্জে কোন্ পথে যাপানের জাহাজ হ্রদ্বয় সমুদ্রবেষ্টিত বীপ-

পুঞ্জে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এখনও প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

একদিকে আমেরিকা, অপরদিকে রূষ ও চীনসাম্রাজ্য, তাহার মধ্যস্থলে যাপানবীপপুঞ্জ এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের সন্ধিক্ষেত্ররূপে দণ্ডায়মান। তথায় চীনসাম্রাজ্যের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক থাকায় ভাষা ও সাহিত্যে তাহার প্রভাব পূর্ণবাহ্যে বর্তমান। চীনসাম্রাজ্যের তিতর দিগ্ধি যাপানবীপপুঞ্জে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার হ্রদ্ব্যপাত হইয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাজ্য অপেক্ষা আরতনে কিঞ্চিৎ বড় অথচ ক্ষুদ্র-বৃহৎ তিনসমুদ্রে বীপে বিভক্ত যাপানরাজ্য কিরূপে ভারতবর্ষের প্রভাবে পুরাকালে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস নিরন্তর কোতুলকের আকর। এশিয়াবর্ষের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একদা স্মৃতিবুদ্ধিতে এত ভিন্ন ভিন্ন বীপে ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব বাণীর বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক এশিয়া ছিন্নবিছিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। কাছারও সহিত কাছারও আন্তরিক আকর্ষণ অস্বত্ব করিবার উপায় নাই। তাহার উপর ভাষা, ধর্ম ও আচারসম্বন্ধ পার্থক্যে এশিয়ার আধুনিক অধিবাসিগণ পরস্পরের সহিত একতাহুতে আবদ্ধ হইতে অসমর্থ। এই অসহায় অবস্থার সন্ধানলাভ করিয়া পাশ্চাত্য প্রবলপুরুষগণ এশিয়ার নানাবিভাগে অধিকার স্থাপন করিয়া এশিয়ার পূর্বাগোরব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

এখন সমগ্র এশিয়াতে ইউরোপের জীভা-
কক্ষ ।

পুরাকালে এশিয়ার অবস্থা এক্ষণে নোচ-
নীয় ছিল না । নদ নদী-পঙ্কজ-প্রান্তর এশি-
য়ার মধ্যে ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করিয়া
এশিয়াকে নানা দেশে বিভক্ত করিলেও,
সমগ্র এশিয়াতে এক অখণ্ড জ্ঞানসাম্রাজ্য
প্রতিষ্ঠিত ছিল । চানের শিক্ষা ও ভারত-
বর্ষের জ্ঞান সেই মহাদেশকে সমুন্নত করিয়া
এশিয়া হইতে আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমে-
রিকা পর্যন্ত জ্ঞানবিস্তার করিয়াছিল ।
অজ্ঞাত প্রমাণ অস্বাভাবিকপরিমাণে বিপুল
হইয়াছে ; কিন্তু অজ্ঞাপি এশিয়ার ধর্ম প্রবর্তক-
পণের স্বর্গই সমগ্র সভ্যসমাজের ধর্ম বলিয়া
পরিচিত রহিয়াছে ।

অতি পুরাকাল হইতেই এশিয়ার গৌকে
জ্ঞানের সমাধর করিতে শিক্ষা করিয়াছিল ।
বাণিজ্যপথে এক দেশের লোক অন্তদেশে
গমনাগমন করিয়া এক দেশের জ্ঞান অন্তদেশে
বিস্তৃত করিয়া দিত । কোন্ জ্ঞান প্রথমে
কোন্ দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল, এতকাল পরে
তাঁহার তথ্যনির্ণয় করা অসম্ভব । পুরাকালে
এশিয়াতে যে জ্ঞানালোক অগ্নি উঠে
তাহা সকল বিভাগকেই আলোকিত
করিয়াছিল । তাহা এশিয়াবাসীর সাধারণ
সম্পত্তি । বঙ্গের এশিয়া অন্তদেশের নিকট
ও নীকার করে না ।

অধিবাসিগণ দুই ভাবে জীবনঅপন
করিত বলিয়া দুই শ্রেণীর শিক্ষা এশিয়া-
বাসীকে সমুন্নত করিয়াছিল । ঐকশ্রেণী
ভ্রমণশীল, অপরশ্রেণী গৃহস্থাসী । বাহারা
নিয়ত দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া

জ্ঞানাদেশে বাস করিত, তাহারা -কালক্রমে
চীনদেশে আসিয়া গৃহস্থাসী হইল ; বাহারা
ভ্রমণবিমুখ, তাহারা পূর্ণ হইতেই ভারতবর্ষে
আশ্রয়স্থাপন করিয়াছিল । বাহারা মধ্য-
এশিয়ার বিচরণ করিত, তাহারা হুণ চীন
না হই ভারতবর্ষের প্রভাবে অল্পপ্রাণিত হইত ।
তৎকাল মধ্য-এশিয়ায় চীন ও পূর্ণপন্ডিত্যাদেশে
ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার আদর্শরূপে পরিণত
হইয়াছিল । এই উত্তর পুরাতন রাজ্যেই
বিবিধ বিজ্ঞান সমুন্নত হইয়া মানবসমাজের
গৌরববর্দ্ধন করে । ভারতবর্ষে মানবসমাজ-
বিকাশের ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে সুপরি-
চিত । চীনদেশে মানবসমাজবিকাশের
ইতিহাস সেরূপ সুপরিচিত নহে । তৎকাল
তাহার আলোচনা আবশ্যক ।

কাকাস ও কাকুরা চীনদেশের ইতিহাসের
দশটি ভিন্ন ভিন্ন সুবার করনা করিয়াছেন ।
তদনুসারে খৃষ্টাব্দভাবের সহস্রবৎসর পূর্বে হইতে
চীনদেশের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে ।
চীন তদপেক্ষা বহুপুরাতন সভ্যদেশ । কোন্
সময়ে সে দেশে সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত
হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই ।
কিন্তু ভিনসহস্র বৎসরের বহুপূর্বেও যে চীন-
সাম্রাজ্য বিবিধ বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া সভ্যতা-
সোপানে সমুন্নত হইয়াছিল, তাহা নীকার
করিবার উপযুক্ত কারণের অভাব নাই ।

ভাষাতত্ত্বের চিরভ্রমণলোভু উচ্চ-
সত্য মানবসমাজ চীনদেশে উপনীত হইয়া
কৃত্তিকার্যে নিযুক্ত হইবার সময় হইতেই সে
দেশে সভ্যতাবিকাশের সুত্রপাত হয় । বাহারা
নিযত ভ্রমণবিমুখ নানাখানে পরিভ্রমণ
করিত, তাহারা একস্থানে দমাবধান করিয়া

হলকর্ষণে-নিগূঢ় এইগেও, তাহাদের মধ্যে পুরাতন সংস্কার-সংস্কার তিরোহিত হয় নাই। কমরে সময়ে-তাভার হইতে নূতন নূতন মানবপ্রবাহ চীনদেশের জনসমুদ্রে মিশিত হইয়া পূর্ণসংস্কার নিরন্তর আগ্রহক সাধিত। তজ্জন্ত চীনদেশে ব্যক্তিগত অপেক্ষা জাতিগত ভাব বিশেষভাবে বিকশিত হয়। ভারত-বর্ষের অধিবাসিবর্গের মধ্যে কুলগত ভাব প্রবাহিত হইয়া কালে ব্যক্তিগত-ভাব পরি-ক্ষুণ্ট করিয়াছিল। দুইটি বিভিন্ন কারণের উত্তেজনায় এই দুই পুরাতন মানবসমাজে দুই পথে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর আন্দোলনভিত্তিসাধনের জন্য ধর্মপ্রবণ হইয়া নানা ধর্মাত্মানে নিযুক্ত হয়; চীন কম্বনিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর সমাজোন্নতিসাধনের জন্য কথ-প্রবণ হইয়া নানা কথাত্মানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভারতের চৈতন্য, ভারতের জ্ঞান প্রত্যেক মহাব্যক্তিকে সমুদ্রিত করিয়া সমগ্র সমা-জের সমুদ্রতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে; চীনের চৈতন্য, চীনের জ্ঞান সমগ্র সমাজকে সমুদ্রিত করিয়া প্রত্যেক মহাব্যক্তির সমুদ্রতি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছে। তজ্জন্ত উত্তর দেশের চৈতন্য বিভিন্নপথে প্রবাহিত হইলেও, মানবহিতৈষণা উত্তর দেশেরই মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টাব্দিভাবের পাঁচশত বৎসর পূর্বে পঞ্চম চীন ও ভারতবর্ষ এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে মানবহিতৈষণা সাধন করি-বার চেষ্টা করিতে করিতে সহসা মতপার্থক্য বিদূরিত হইয়া উভয় সাম্রাজ্যের জ্ঞানসম্মিলন সাধিত হইয়া যায়। তাহার কণে এশিয়া-বশে কনফুসিয়াস ও শাক্যসিংহের প্রচারিত

ধর্মমতের ঐক্য স্থাপিত হইয়া এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

'জ'ম্বাজ চীনদেশের স্থিতিবাহ্য রাক-বংশের আদিপতা প্রবল ধর্মিকতার সময়ে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে কনফুসিয়াসের সমাজহিতৈষণার সুপ্রতিষ্ঠিত মূলমন্ত্র বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হয়। পুরাকাল হইতে নানাভাবে চীনদেশে সে কথা সুজ্ঞানপূর্ণে পুনঃপুন বাধ্যত হইয়া মানবসমাজকে সমাজোন্নতির জন্য কম্বনিষ্ঠ করিতেছিল, কনফুসিয়াসের বিদ্যুত ব্যাখ্যায় তাহাই জন-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চীনের ধর্মমত বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাকে ধর্মমত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহার সহিত পরকালের সংশ্লিষ্ট নাই; মানবাত্মার সংশ্লিষ্ট নাই, সকল কথাই ইহ-কালের কথা, জনসমাজের কথা, প্রত্যেক সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতির কথা। সে কথা লোকে বুঝিত, লোকজন্মের তাহার জন্য অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকিয়া মানবসমাজকে পুরাকাল হইতেই লোক-হিতৈষণার উদ্দীপিত করিত। তাহাই অভিনব উৎসাহে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া চীনের নরনারীর নিকট ধর্মের সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিল। কনফুসিয়াসের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি সমাজোন্নতির কামনায় আত্মত্যাগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য অর্জনোকে ছাড়বন্ধ করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্ত জনসাধারণ ব্যাকুল হইল না; তাহার কেবল আত্মত্যাগের দ্বাধ্যতাই শিক্ষা করিতে লাগিল।

প্রত্যেক মনুষ্যকে সমুদ্রত করিয়া সমগ্র মানবসমাজের, সমুদ্রত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য অল্পলোকেই দৃষ্টব্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল; জনসমাজ তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কেবল আনুভূতিকের মাধ্যমেই শিক্ষা করিতে লাগিল। সর্বত্র এশিয়াতেও আনুভূতিকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞান ও চীনদেশের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করিয়া সর্বত্র নবযুগের প্রবর্তন করিতে লাগিল। খৃষ্টাব্দিভাবের পূর্বেই এই অভিনব ধর্মমত নব্য-এশিয়ার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমাতিমুখে প্রাবৃত হইয়া ভূমধ্যসাগরতীর ও পূর্বাতিমুখে প্রাবৃত হইয়া প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপ-উপদ্বীপে ভারতীয় জ্ঞানস্রোতা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। খৃষ্টাব্দিভাবের দশমদশে তাহা চীন-রাষ্ট্রোপ-প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। চীন তাহাকে নূতন মত বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সুতরাং কনফুসিয়াস ও শাক্যসিংহ তুল্যভাবে পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময় সাধিত হইবার পূর্বে চীনদেশের পশ্চিমাংশে ও ভারতবর্ষের উত্তরাংশে এশিয়ার সমুদ্রত মধ্যদেশে যে আতি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের জ্ঞানের প্রভাব বিশেষরূপে অমূল্য হইত। তাহারা সভ্যসমাজের ইতিহাসে নানা নামে অভিহিত; তাহাদের কোন শাখা ভারতে ও কোন শাখা চীনদেশে আপতিত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সাধিত করিত। 'ইন্দ্র' নামক রাজবংশের শাসন-সময়ে মধ্যএশিয়ার এই সকল উচ্চতর বীরপুরুষ চীনদেশে সারথির কার্যে নিযুক্ত হইত। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহারা চীনদেশে

রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া সিন্ধুনামক রাজবংশের অধিকার স্থাপন করে এবং কিছুকালের মধ্যে তাহাদের অল্পশাখা কান্দীয় ও মধ্যভারতে তুরুকজবংশের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেয়। কথিতনামক ইতিহাস-বিখ্যাত নরপতি ভারতভিধানের নেতা হইলেও, তিনি বৌদ্ধধর্মের অমুরক্ত ছিলেন। মহারাজক্রেবর্তী প্রিয়দর্শী অশোকের অমুশাসনে যে ধর্ম নান্যদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কথিতের কল্যাণে তাহা আরও সুদূরদেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালীন ও যাপানসাম্রাজ্যে কথিতের নাম সর্বত্র সুপরিচিত।

বৌদ্ধধর্ম বহুদেশে ব্যাপ্ত হইয়া বহুপ্রকারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এক দেশে একরূপ, অন্যদেশে অন্যরূপ আচারব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিয়াছে। নদীর উপত্যকায় নদীর আরতন, পতি ও বিনল চলরাশি যেমন নিরাতিমুখে প্রাবৃত হইবার সময়ে ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রবাহের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে প্রাবৃত হইবার পূর্বেই মতপার্থক্যে বৌদ্ধধর্ম বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল; এমন তাহার শাখা গণনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। উত্তীর্ণ-হাসিকগণ উত্তর ও দক্ষিণ নামক দুইটি প্রধান বিভাগ করিয়া মহাবান ও হীনবান নামক দুইটি প্রধান শাখায় বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই উভয় শাখাই নানারূপ মতপার্থক্যে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। জনসমাজের পূর্বসময়

ও অজ্ঞানতার সহিত সমগ্র সাধন করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম আনান্যে নানাভাবে অবশেষে প্রকাশিত করিয়া গানে গানে তাহার মূলমন্ত্র পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করিতে ক্রটি করে নাই । চীনসাম্রাজ্যে যে বৌদ্ধধর্ম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার সহিত নানা মতভেদ ও মলিনতা সংযুক্ত হইয়াছিল । তৎকাল বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য চীনদেশ হইতে ধর্মপিপাসু সন্ন্যাসিগণ নানা সময়ে ও রূপে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন । বানিজ্যের সংস্রব অপেক্ষা ধর্মের সংস্রব একসময়ে ভারতবর্ষের দিকে চীনদেশের গোকচিৎ অধিকতর আগ্রহে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল ।

বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীর সর্বপ্রধান প্রচারের ধর্ম । তাহা যেখানে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া পুনরায় তথা হইতে অন্তর্য্যানে প্রচারিত হইয়াছে । প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র বাগদাদীয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম আর্গ্যা-বর্ত্তে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে কাস্মীর ও গান্ধারের পথে পশ্চিমাঞ্চলে এবং অন্ধারের পথে পূর্বাঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল । কাস্মীর হইতে উত্তরাঞ্চলে এবং পটলিপুত্র হইতে দক্ষিণাঞ্চলে প্রচারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম অলং-বুলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল । একদা কাস্মীর ও গান্ধার বৌদ্ধধর্মের প্রধান আশ্রয়-স্থান হইয়া বহুসংখ্যক বিখ্যাত বৌদ্ধসন্ন্যাসীর জন্মভূমি বলিয়া ইতিহাসে গৌরবলাভ করে । তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে বৌদ্ধধর্ম বহুগ্রন্থে লিখিত ও প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে দিগ্-

দিশেতে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে । চীনসাম্রাজ্যে অজ্ঞানতাহার প্রভাব বর্ত্তমান । চীনদেশ হইতে বৌদ্ধমত ব্যাপ্তিঃ ও কোরিয়ার পথে বাপানবীপপুঞ্জে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । সেই দ্বারা বাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পরিচয় সংস্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের অজ্ঞান জ্ঞান ও বাপানবীপপুঞ্জে ধীরে ধীরে অবশেষে প্রকাশিত করিয়াছিল ।

বাপানে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়ার শক-চন প্রভৃতি প্রবলজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের দিবিজয়ের সঙ্গে নানা নূতনরূপে অবশেষে প্রকাশিত করে । ভারতবর্ষ হইতে বিস্তৃত বৌদ্ধমত চীনদেশে প্রচারিত হইলেও চীনদেশের দ্বারা নানা ভ্রান্তসংস্কারও প্রচারিত হইয়াছিল । চীন-জাতি চীনসাম্রাজ্যে অধিকারবিস্তার করিয়াই সে দেশে বৌদ্ধধর্ম পৃষ্ঠপোষিত করে । তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসিগণ চীন-দেশে আধিপত্যবিস্তার করিয়া তৎদেশে ধর্মব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভারতবর্ষের বৌদ্ধসন্ন্যাসী চীনদেশে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যে বিস্তৃত করিয়াছিলেন । তাহারা কোন্ পথে আগ্রসর হইয়াছিলেন, কাকার ও কাকুরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নানাভ্রম তথ্যসমূহকানের পর লিখিয়া-ছেন,—বগোপকুল হইতে সমুদ্রপথে ও মধ্যভারতের মরুভূমি পথে প্রচারকগণ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন ।

• This history of the long succession of important teachers, implying the constant flow of a stream of wandering Ufflers from India to

এই উত্তর পথই নিরন্তর চর্গম। সে পথে বাহার গমনাগমন করিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে মধ্যপথে জীবনবিসম্বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। অথচ এই চর্গমপথে ভারত-বর্ষের ও চীনদেশের বৌদ্ধপ্রমণগণ কি অক্লান্তঅধ্যবসারে অকুতোভয় পদবিক্ষেপে ধর্মপ্রচার ও ধর্মশিক্ষার অজুরাগে নিরন্তর ধাবিত হইতেন! বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়া ভারতবর্ষের যে প্রদেশ চীন ও যাপান-মাত্রাজ্ঞার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিল, তদ্বাধ্য বাঙালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রপথ বাঙালীর অধিকৃত বলিয়া তাহার প্রশান্তমহাসাগরের সর্বস্থলে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্মবিত্তার করিত। যাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর তৎকালে ভারতবর্ষের প্রমণগণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞানবিত্তান্ত্রের সহায়তালাভন করে।

পৃথিবীতে বাঙালীর নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে সে কলঙ্ক কখনাবলে ক্রমে ধনীভূত করিয়া লেখকবর্গ তাহাকে দূরপীনের করিয়া তুলিতেছেন। বাঙালী আদি অধঃপতিত হইলেও, চিরদিন একপ অধঃপতিতভাবে জীবনধারণ করে নাই। তাহার জীবনেও একদা গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেদিন বাঙালীর বীরবাহু দিগ্বিজয়ে বিশ্ব বন্দীভূত করিয়া রাজসিংহাসন অর্পণ করিতে সমর্থ না হইলেও, জ্ঞানবিত্তারে ভারতবর্ষের মুখ সম্বন্ধন করিয়া অগতে কীর্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার চিত্র প্রশান্তমহাসাগরের দীপপুঞ্জের গুহ্য-মন্দিরে বা গিরিকোটরে অতাপি পর্যটকবর্গের বিষয় উৎপাদন করিয়া থাকে। যাপানেও তাহার চিত্র লুপ্ত হয় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

China throughout the period, raises the interesting question of the means of intercourse. It appears that besides the searoute from the Bengal Coast by Ceylon to the mouth of the Yang-tse-kiang, there were two great landways, which both began at Tonko in China, at the mouth of the Gobi Desert, divided before reaching the Oxus, into the northern and southern passes of Tensan, and so on to the Indus. *Islands of the East*.

নৌকাডুবি ।

৩৫

সন্দেশ টিক করিয়াছিল কলিকাতায় সে কেবল কাজ সারিয়া চলিয়া আসিবে, কুসুটোণার সে গলির দ্বার দিয়া ও ঘাইবে না । সেদিনকার শরৎ-মধ্যাহ্নে স্নানকার, সন্ধ্যার অভিমানে বিজড়িত কুমলার সেই মুক্তিখানি রমণের জগৎয়ের মধ্যে মুক্তি হইয়া গিয়াছিল । গাঙ্গিপুত্র হইতে রেলগাড়ি করিয়া যখন সে চলিয়াছিল ছই ধারে হেমন্তের পরিপূর্ণ শতক্ষেত্র অগ্রাহ্যপূর্ণের সোনার রোদ্রে বলকিয়া উঠিতেছিল— তখন সেদিনকার সেই আরক্তিম মুখছবিটুকু এই হিরোনিড জামলতায়, এই দিগন্তব্যাপ্ত স্বপ্নাবধানে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল । শ্রবৎ-ঋতুনাথুর ঘোষাকম্পণ রমণের শরীরে-মনে গভীরতর একটি স্পন্দনের সঞ্চার করিয়া দিল । রেলওয়ে-স্টেশনের গোলমাল, লোক-জনের ভিড়, সমস্ত তাহার কাছে স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল ।

রমণ দক্ষিণপাড়ার বাসায় আসিয়া উঠিল । দিনের-মধ্যে অতি অল্প সময়ই কাজ-কর্মে কাটে, বাকি সময়টা ছুটাইতে চায় না । রমণ কলিকাতায় যে দলের সহিত মিলিত, এবারে আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারিল না । পাছে পথে কাহারো সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে ঘণাসাধা সাবধানে থাকিত ।

কিন্তু রমণ কলিকাতায় আসিতেই একটা পরিবর্তন অনুভব করিল । যে নির্জন অবকাশের মাত্রখানে, যে নির্মল শান্তির পরিবেষ্টনে কল্যাণ তাহার মন কৈশোরের প্রথম আবির্ভাব লইয়া রমণের কাছে রমণীয় হইয়া দেখা দিয়াছিল, কলিকাতার তাহার মোহ অনেকটা ছুটিয়া গেল । দক্ষিণপাড়ার বাসায় রমণ কখনো কখনো কলিকাতার ভালবাসার মুহূর্তেই দেখিবার চেষ্টা করিল— কিন্তু এখানে তাহার মন কোনমতে সাড়া দিল না— আজ কল্যাণ তাহার কাছে অপরিণতা অশিক্ষিতা বালিকার রূপে প্রতিভাত হইল । কেমন করিয়া যে সে তাহাকে কোনোদিন প্রেমদীর ভাবে দেখিয়াছিল, আজ তাহা রমণ ভাগ মুক্তিভেই পারিল না । যে বালিকা পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া সবে-মাত্র শিখিয়াছে এবং এখনো আশ্চর্য্য করিতে পারে নাই— যে বালিকা স্বপ্নেও জানে না এখন চাল-সের কি কারণে মুণ্ডপাত হইয়াছিল, সে-ও যে শিক্ষিত স্বামীর সহস্রশ্রী হইয়া উঠিতে পারে, তাহারো কল্যাণময় সেবাক্ষণলতা যে ছন্দুলা, তাহারো পরিপূর্ণ হৃদয়োৎসর্গ যে বহুশৃঙ্খলার পূরকার, কলিকাতার হাওয়ার রমণের মন তাহা স্বীকার করিতে পারিল না । যাহা সরল, যাহা অযাচিত, তাহা-ও-চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায়

না,—যাহা বসন্তে দক্ষিণের বাতাসের মত
আগনার বিজ্জি অগ্নির সম্পূর্ণতার বহন
করিয়া অকৃত্যং পূর্ণপরিণতভাবে প্রবাহিত
হইয়া যায়—চৌতালিরত জনতার অবিভ্রাম
চাকল্যের মধ্যে তাহার গুণভতা ভাগ করিয়া
বুঝা যায় না। তা ছাড়া, কলিকাতার হাওয়ার
রমেশের পুরাতন যে স্বত্বিকর তরে তরে
মেঘত্বের মত ভয়িরাছিল, তাহা বৃহত্তর
মধ্যে রমেশের মনকে চারিদিক হইতে ঘনাইয়া-
ধরিয়া আর-সর্বস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল।

তবু রমেশ নিজের সহিত বুদ্ধ করিতে
হাঙ্কিল না। যেদিন হুটক, কমলাকে রমেশ
মনে মনে পরিণীত-স্রোত-রূপে বরণ করিয়া
লইয়াছিল। বেক্রপ ঘটনা ঘটয়াছে, তাহাতে
কমলাকে অবিশেষে গী বনিয়া গ্রহণ না
করিলে অস্ত্রার হয়, অথচ চর। হেমলিনীর
সম্বন্ধে অস্ত্রার কিছু যে থা না, তাহা মনে
কিন্তু তুলনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত
এযুতর এবং সম্ভবতঃ এতদিনে হেমলিনী
রমেশের প্রতি বিরক্ত ও নিম্ন হইয়া সেই
অস্ত্রার দারিদ্ৰ্য্যভার হইতে রমেশকে নিষ্কৃতি
দিয়াছে। এই ভাবিয়া সে দক্ষিণাঙ্গার পুত্র
বাসা আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল—কোনমতেই
কলুটোলার দিকে বেসিল না।

যোর বতাই অতিরিক্তমাত্রায় প্রয়োগ
করা যায়, যোর ততই কমিয়া আসিতে
থাকে। হেমলিনীকে কোনোমতেই মনের
মধ্যে আমল দিতে না, এই পণ করিতে
করিতেই অহোয়াজ হেমলিনীর কথা
রমেশের মনে আগন্তুক থাকে। “তুলিবার
কঠিন সমস্যাই স্বরূপে রাখিলার প্রবল সহায়
হইয়া উঠিল।

রমেশের যদি কিছুমাত্র ভাড়া থাকিত,
তবে বহুপূর্বেই কলিকাতার কাজ শেষ
করিয়া সে কিরিতে পারিত। “কিন্তু সামান্য
কাজ গড়াইতে গড়াইতে বাড়িয়া চলিল।
অবশেষে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল।

কাল রমেশ প্রথমে কাঁচাঘরোমে এলাহা-
বাসে বাজা করিয়া সেখান হইতে পাণ্ডিগুরে
কিরিবে। এতদিন সে বৈধারক্ষা করিয়া
আসিয়াছে, কিন্তু সে বৈধারের কি কোনো
পুরস্কার নাই? বিদায়ের আগে গোপনে
একবার কলুটোলার খবর লইয়া আসিলে
কতি কি?

সেইদিন হুপুরবেলায় তাহার বাসার
একটি ডেপের দেয়াল খুঁটিতেই হঠাৎ এক-
খানি কাগজ তাহার হাতে উড়িয়া আসিল।
সেই কাগজখানিতে যাহা লেখা ছিল, তাহা
কোনো অর্থখানিতে ভাষা নহে তাহা একটি
হার্শোনিয়মের গানের বর্ণনা, হেমলিনীর
হাতে লেখা।

রমেশ হঠাৎ এই কাগজখানি হাতে তুলিয়া
লইবামাত্র একটি নিঃস্বনিঃস্ব গীতসমূহ
ভৈরবাত্তে, বেহাগে, মুলতানে দিক হইতে
দিগন্তরে জাগিয়া উঠিল; আকাশের
আবেগে, বিচ্ছেদের বেদনায়, মিলনের
আশ্বাসে এক কুল হইতে আর-এক অধুর
অদূর উপকূল পর্য্যন্ত বরষাগর তরঙ্গিত হইতে
লাগিল। বৃকের ভিতরে একটি হার্পোনিয়ম
বাজিয়া-বাজিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার
প্রকাশ্যতঃ কোমল করুণধ্বনিতে এই মধ্যাহ্ন-
কালীন রাজধানীর প্রবল কর্ণালোড়ন একে-
বারে প্রাণিত ও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রমেশ
এই কাগজখানিকে গার্মেন্ট-কম্পেনে স্থান

করিল, প্রাথমপণে ইহার স্রাণ লইল, ডেবের উপরে প্রসারিত, কত্রিয়া ইহার 'শরে মাথা রাখিয়া ক্ষণকাল পড়িয়া রহিল ।

আজ কলুটোলার* সেই গলিতে বাওয়া স্থির করিয়া সে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল । তাহাতে কমলার সহিত তাহার সবন্ধ আত্মোপাত্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিল । 'এবারে গাঙ্গিপুর্বে ফিরিয়া-গিয়া সে অগত্যা হস্তাগিনী কমলাকে নিজের পত্নীগীত-পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাও জ্ঞাপন করিল । এইরূপে হেমনলিনীর সহিত তাহার সর্কটো-ভাবে বিচ্ছেদ ঘটবার পূর্বে সত্যঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানাইয়া এই পত্রদ্বারা সে বিদায়গ্রহণ করিল ।

চিঠি লিখিয়া লেফাকার মধ্যে পুত্রিয়া উপরে কাহারো নাম লিখিল না, ভিতরেও কাহাকেও সংবাদন করিল না । অন্নদাবাবুর ভৃত্যের রমেশের প্রতি অধুরক্ত ছিল কারণ রমেশ হেমনলিনীর সম্পর্কার স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত । এইরূপ সেই বাড়ীর চাকর-বাকরেরা রমেশের নিকট হইতে নানা উপলক্ষ্যে কাপড়চোপড়পাক্ষণী হইতে বঞ্চিত হইত না । রমেশ ঠিক করিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে কলুটোলার বাড়ীতে গিয়া একবার সে ঘুর হইতে হেমনলিনীকে দেখিয়া আসিবে এবং কোনো একজন চাকরকে দিয়া এই চিঠি গোপনে হেমনলিনীর হাতে পৌছাইয়া দিয়া সে চিরকালের মত তাহার পূর্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে ।

সন্ধ্যার সময় রমেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া সেই চিরপরিচিত গলির মধ্যে স্পন্দিতবক্ষে

কম্পিতপদে প্রবেশ করিল । ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল—দার ক্রুড, উপরে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত জানালা বন্ধ, বাড়ী শূন্য, অন্ধকার ।

তবু রমেশ দ্বারে থা দিল । "হুইচারবার আঘাত করিতে করিতে ভিতর হইতে একজন বেহারী দার পুত্রিয়া বাহির হইল । রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেও স্বপ্ন না কি ?" বেহারী কহিল, "হাঁ বাবু, আমি স্বপ্ন ।" রমেশ । বাবু কোথায় গেছেন । বেহারী । দিদিঠাকরুণকে লইয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন ।

রমেশ । কোথায় গেছেন ?
বেহারী । তাহা ত বলিতে পারি না ।
রমেশ । আর কে সঙ্গে গেছেন ?
বেহারী । নলিনীবাবু সঙ্গে গেছেন ।
রমেশ । নলিনীবাবুটি কে ?
বেহারী । তাহা ত বলিতে পারি না ।

রমেশ প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিল, নলিনীবাবু বুঝাপুরুষ, কিছুকাল হইতে এই বাড়ীতে বাতায়ত করিতেছেন । যদিও রমেশ হেমনলিনীর আশা ত্যাগ করিয়াই যাইতেছিল, তথাপি নলিনীবাবুটির প্রতি তাহার সত্য আকৃষ্ট হইল না ।

রমেশ । তোর দিদিঠাকরুণের শরীর কেমন আছে ?

বেহারী কহিল, "ভাঁড়র শরীর ত ভালই আছে ।"

স্বপ্ন-বেহারীটা ভাবিয়াছিল, এই সুসংবাদে রমেশবাবু নিশ্চিত ও সুখী হইবেন । অন্তর্দ্বারী জানেন, স্বপ্ন-বেহারী কুল বুঝিগা-ছিল ।

রমেশ কহিল, “আমি একবার উপরে ঘরে বাইব।”

বেহারী তাহার ধুমোচ্ছ্বসিত কেরোসিনের ডিপা লইয়া রমেশকে উপরে লইয়া গেল। রমেশ ভূতের মত ঘরে ঘরে একবার ঘুরিয়া বেড়াইল—হুই-একটা চৌকি ও সোকা বাজিরা-লইয়া তাহার উপরে বসিল। জিনিষ-পত্র, গৃহসজ্জা, সমস্তই ঠিক পূর্বের মতই আছে, মাঝে হইতেনলিন্‌বাবুটিকে আসিল। পৃথিবীতে কাঁহারো অভাবে অধিকদিন কিছুই শূন্য থাকে না। যে বাতায়নে রমেশ একদিন হেমললিনীর পাশে দাঁড়াইয়া কান্ত-বর্ষ শ্রাবণদিনের সূর্যাস্ত-আঁটার ছুটি রুমরের নিঃশব্দমিলনকে মগ্নিত করিয়া লইয়াছিল—সেই বাতায়নে আর কি সূর্যাস্তের আভা পড়ে না? সেই বাতায়নে আর কেহ আসিয়া আর একদিন বধন ঝুলন্ত রচনা করিতে চাহিবে, তখন পূর্ব ইতিহাস আসিয়া কি তাহাদের স্থানরোধ করিয়া দাঁড়াইবে, নিঃশব্দে তরুণী তুলিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে? ক্রমশঃ অতিমানে রমেশের হৃদয় কীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিনে ব্রহ্মেশ এলাহাবাদে না গিয়া একেবারে পাণিপুরে চলিয়া গেল।

৩৬

কলিকাতার রমেশ প্রায় নাস্থানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। এই একমাস কমলার পক্ষে স্নানদিন নহে। কমলার জীবনে একটা পরিণতির স্রোত হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহিতেছে। উষার আলো, বেরন-মেখিতে দেখিতে প্রভাতের রোদ্রে, কুটিয়া পড়ে—কমলার নারীপ্রকৃতি তেমন অতি অল্প

কালের মধ্যেই স্থিতি হইতে ভ্রামরধের মধ্যে সন্বেদন হইয়া উঠিল। শৈলজার সহিত যদি তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইত, শৈলজার জীবন হইতে প্রেমালোকের ছটা ও উজাপ যদি প্রতিফলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের উপরে না পড়িত, তবে কতকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইত বলা যায় না।

এখন বাহিরের দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ তাহাকে মাঝে মাঝে অনির্বচনীয় ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের সিংহবারটি বেন খুলিয়া গেছে, তাই বিশ্বজগৎ সেখানে প্রবেশ করিবার পথ পাইয়াছে। এখন প্রতিদিন প্রভাত তাহার কাছে নতন হইয়া কোটে। মধ্যাহ্নে শীতের রৌদ্র স্নানালার উপর দিয়া বাকিয়া তাহার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়ে, সেই রোদ্রে পা বেলিরা-দিয়া বাহিরের বনফুলের মর্মরশব্দনের সহিত তাহার হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে কিসকল অব্যক্ত কথা গুঞ্জনিত গুঞ্জনিত উঠে। শৈলজার প্রকৃতমুখ, তাহার শ্রিতহাস্ত, তাহার শাসনজ্ঞা, তাহার আসা-যাওয়া, সমস্ত তাহার কাছে একটি কাব্যের মত, সঙ্গীতের মত, কাহিনীর মত লাগে। পূর্বে বেশভূষার কমলার নিত্য অনাবর ছিল, চুল বাধিতে, ভাল করিয়া সাজিতে তাহার অত্যন্ত বিরক্তি-বোধ হইত। এখন আর সে ভাব নাই। এখন সে বিশেষ অহরোধ করিয়া শৈলজার কাছ হইতে বিচিত্র-রকমের চুল-বাধা শিখিয়া লইয়াছে। এখন সে আপনিই একটু নৈপুণ্যের সহিত কাপড়টি পরে, আঁচলটি পরিপাটি করিয়া বিভ্রাস করে—দাঁথাটি সোজা করিয়া, দর করিয়া কাটিতে যথেষ্ট যত্ন করে এবং

পাঁখায় নির্দুরের রেপাটি যেমন-তেমন করিয়া লাগায় না। খুড়ার বাগান হঠাৎ ঠিক কাণের নানারঙের বিলাতীফুল সংগ্রহ করিয়া কমলা অনেককণ বসিয়া একটি কাঁচের পাত্রে উপরে নানারকম করিয়া সাঝাইতে চেষ্টা করে—মনের মত সাঝানটি হইলে তাহার উপরে জলের ছিটা দিয়া দেখালে একটি শেলকের উপরে রাখিয়া দেয়। কমলা পশম-বোনা এবং সেলাই কিছু-কিছু শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহা তাহার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল—এখন সে অবকাশের সময় সেলাইয়ের বাস খুলিয়া নানা রঙের পশম মিলাইয়া নানা ছাঁদের অনাবশ্যক কারুকার্য রচনা করিবার চেষ্টা করে। কমলা কোনোকালে গাহিতে শেখে নাই, সেজন্য কোনো অভাবও অহতব করে নাই। আদ্যকাল শৈলজার বাংলা বইগুলি হইতে গান বাছিয়া একটি ছোট খাতার কাপি করিয়া গান গাহিবার সাধ মিটাইতেছে।

ঋতুভেদে রমণের আশিবার দেরি দেখিয়া শৈলজার বিশেষ অহুরোধে খুড়া কমলাদের বাগের দল সহরের বাহিরে গুলার ধারে একটি বাংলা ঠিক করিয়াছেন। অল্পস্বল্প আস্বাষ সংগ্রহ করিয়া বাড়ীটি বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন এবং নূতন ঘরকন্নার দল আবশ্যকমত চাকরদাসীও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেকদিন দেরি করিয়া রমণ এখন গাধাপুরে ফিরিয়া আসিল, তখন খুড়ার বাড়ীতে পড়িয়া থাকিবার আর কোনো ছুতা থাকিল না। এতদিন পরে কমলা

নিজের স্বাধীন ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাংলাটির চারিদিকে বাগান করিবার মত জমি যথেষ্ট আছে। হই-সারি সুদীর্ঘ শিক-পাছের তিতর দিয়া একটি জায়গার রাস্তা গিয়াছে। ষ্টেডের পার্শ্বগদা বহুদূরে চুরিয়া-গিয়া বাড়ী এবং সন্টার নাথখানে একটি নীচু চতুর্ভুজ পড়িয়াছে—সেই চরে চাবারা স্থানে স্থানে গোং চাব করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও ধরমুজ লাগাইতেছে। বাড়ীর দক্ষিণদীর্ঘমান্য গলার দিকে একটি বৃহৎ বৃক নিমগাছ আছে, তাহার তলা বাধানো।

বহুদিন ভাড়াটের অভাবে বাড়ী ও জমি অনাদৃত অবস্থায় দাকাতে বাগানে গাছপালা প্রায় কিছুই ছিল না এবং বরগুলিও অপরিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু কমলার কাছে এ সমস্তই অত্যন্ত ভাল লাগিল। গৃহীণীদল-নাভে আনন্দ আভার তাহার চক্ষু সমস্তই স্নান হইয়া উঠিল। কোন্ ঘর কি কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, ভবির কোথায় কিরূপ গাছপালা লাগাইতে হইবে, তাহা সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইল। খুড়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কমলা সমস্ত জমিতে চাব দিয়া লইবার ব্যবস্থা করিল। নিজে উপস্থিত থাকিয়া রাস্তার চুলা বানাইয়া লইল এবং তাহার পার্শ্ববর্তী ভাঁড়ার ঘরে, বেখানে বৈরূপ পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা সাধন করিল। সমস্তদিন ঘোয়া-ঝাড়া, মোছানো-গাছানো, —কাছকর্ষের আর অন্ত নাই। চারিদিকেই কমলার মনস্ব আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সমস্তই আমার, আমার

হাতেই গড়িয়া উঠিলে—এই ভবির বাগান, এই ঘরের পারিপার্শ্ব, এট বরকরার আরাম, সমস্তই আমার ইচ্ছা ও চেষ্টার অপেক্ষার অন্য-গত ভবিষ্যৎ এইতে আমার দিকে তাকাইয়া আছে—এই কথা মরণ করিয়া এবং তাহার নিজরচিত সুগঠিত সেই ভাবী গার্হস্থ্যটিকে কর্মনার প্রত্যক্ষ করিয়া কমলা নীড়রচনারত বিবিধীয় মত কর্মপরায়ণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

রমেশ হেমলিনীর প্রতি অভিমানের আক্ষেপ জ্বরের মধ্যে লইয়া গালিপুরে আসিয়াছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল, “হেম-লিনী যদি আমাকে এত সহজে এত দীর্ঘ তুলিয়া মাইতে পারে, তবে আমিও তাহার কৃত্ত বুদ্ধি খেদ করিয়া আত্ম-পুড়িয়া মরিব না।” এই বলিয়া হেমলিনীর সহিত তুলনার কমলাকে সে জোর করিয়া বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। রূপে কমলা যে হেমলিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা কাহারো অস্বীকার করিবার জো নাই। অবশ্য কমলা গাহিত্ত-বাগাইতে, ইংরাজি লিখিতে-পড়িতে জানে না, কিন্তু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সঘিবেচনার সে কাহারো চেয়ে নূন নহে; তাহার বোধশক্তিও একটা অসম্ভবমাত্রতা আছে—বোধ করি বেশি বানান মুখস্থ ও পড়া মুখস্থ করিতে হই নাই বলিয়াই তাহার বুদ্ধি একদম আশ্চর্য্য ভালা রহিয়াছে ।

এইরূপে রমেশ নানা তর্ক দ্বারা কমলাকেই জয়রাজে। জয়ী করিয়া হেমলিনীর উপল বাবুজানের সমুচিত প্রতিশোধ লইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল। এ সম্বন্ধে মনে মনে নিজের প্রতি এতই বল-

প্রয়োগ করিতেছিল, যেন বাপারটো তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ।

কিন্তু হুজুহতা অধিকরণ রহিল না। গৃহকর্মের মধ্যে রমণীর স্বেচ্ছা যেমন বিচ্ছিন্ন, যেমন মধুর, এমন আর কোথাও নহে—এইজন্য আলস্য বরক পুরুষকে শোভা পায়, কিন্তু নারীকে সাজে না;—শ্রোতের অবি-জ্ঞান প্রবাহ যেমন নদীর শোভা এবং স্বাস্থ্য-করতাকে জাগাইয়া রাখে—তেমনি কর্মের দ্বারা রমণীর বেহমেনের সমস্ত কাস্তিকে নানা-ভাবে নানানভাবে খেলাইয়া ভরলিভু করিয়া রাখে ।

রমেশ আজ কমলাকে কর্মের মাঝখানে দেখিল—সে যেন পার্থীকে বাঁচার বাহিরে আকাশে উড়িতে দেখিল। তাহার প্রকৃত মুখ, তাহার হৃদয়পূর্ণ পটুতা, তাহার কর্মো-চ্ছমের লীলালহরী রমেশের মনে এক নূতন বিশ্বাস ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিল ।

এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাব তাহার মনের মধ্যে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল,—রমেশ চিরকাল একলা ছিল, বিচ্ছিন্ন ছিল—আজ সে ঐ কমলাকে কেন্দ্রস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজেকে একটি সংসারপরিধির অন্তর্ভুক্ত দেখিল। নিজের একটা স্ত্রী, একটা গৌরব বুঝিল,—একটা বিশেষ অধিকার লাভ করিল। এই স্ত্রীর, এই কিশোরী, এই কল্যাণী রমেশের সংসারকে গড়িয়া তুলিবার, বাঁধিয়া রাখিবার জন্য আপনাকে কেমন পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত উৎসর্গ করিয়াছে। ইহার মধ্যেই সে আপনার সমস্ত সার্থকতা অসুস্থত করিতেছে—আপ-নার সমস্ত লাভাণা, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত প্রীতি এই

সংসারস্থলনের মধ্যে নিঃশেষে নিমুক্ত হই-
রাছে ;—কমলার অস্ত চরণের গতি, তাহার
জ্ঞপ্তর হস্তের কর্ণ প্রতি-মুহূর্তে রমেশের
কাছে কবিতার চন্দ্র ও সঙ্গীতের পদের মত
বোধ হইতে লাগিল। রমেশ মনে মনে
একটি গর্ল অমৃতভ করিল। সে বুঝিল,
সে এবং তাহার সংসার কমলার দ্বারা
মহাবল্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন কমলাকে
রমেশ তাহার স্বস্থানে দেখে নাই—আজ
তাহাকে আশন নূতন সংসারের শিখরদেশে
বসন দেখিল, তখন তাহার সৌন্দর্যের সঙ্গে
একটা মহিমা দেখিতে পাইল।

কমলার কাছে আসিয়া রমেশ কহিল—
“কমলা, করিতেছ কি ? শ্রান্ত হইয়া পড়িবে
যে !”

কমলা তাহার কাজের নাকথানে একটুখানি
খামিয়া রমেশের নিকটে মুখ তুলিয়া তাহার
মিষ্টমুখের হাসি হাসিল—কহিল, “না, আমার
কিছু হইবে না।”

“রমেশ যে তাহার তত্ত্ব লইতে আসিল,
এইকু সে পুত্রদারবরণ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ
আবার কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মুগ্ধ রমেশ ছুতা করিয়া আবার তাহার
কাছে গিয়া কহিল—“তোমার খাওয়া হইয়াছে
ত কমলা ?”

কমলা কহিল, “বেশ, খাওয়া হয় নাই ত
কি ! কৈনিকালে খাইয়াছি !”

রমেশ এ খবর জানিভ—তবু এই প্রশ্নের
ফলে কমলাকে একটুখানি আশ্রয় না জ্ঞানিয়া
পাকিতে পারিল না—কমলাও রমেশের
এই অনাবৃত্তক প্রশ্নে একটুখানি মুগ্ধ
ও নাই, তাই নাই

রমেশ আবার একটুখানি কথাবার্তার
স্বল্পপাত করিবার জন্ত কহিল, “কমলা, তুমি
নিজের হাতে কত করিবে—আমাকে একটু
খাটাইয়া লও না !”

কর্ণিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অস্ত্র শোকের
কর্ণপটুতার উপরে তাহাদের বক্—একটা
বিশ্বাস থাকে না। তাহাদের তত্ত্ব হয়, যে
কাজ তাহারা নিজে না করিবে, সেই কাজ
অস্ত্রে করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়।
কমলা হাসিয়া কহিল, “না, এ সমস্ত কাজ
তোমাদের নয়।”

রমেশ কহিল, “পুরুষেরা নিতান্তই মহিমা
বলিয়া পুরুষজাতির প্রতি তোমাদের এত
অবজ্ঞা আমরা সহ করিয়া থাকি, বিদ্রোহ
করি না—তোমাদের মত যদি স্ত্রীলোক
হইতাম, তবে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিতাম।
আজ্ঞা, পুড়াক ত তুমি খাটাইতে ক্রটি কর
না—আমি এতটুকি অকস্মাৎ।”

কমলা কহিল, “তা জানি না, কিন্তু তুমি
রাগাবরের কুল কাড়াইতেছ, তাহা মনে
করিলেই আমার হাসি পায়। তুমি এখান
থেকে সর—এখানে ভারি ধূলা উড়াইয়াছে।”

রমেশ কমলার সহিত কুলা চালাইবার
জন্ত রুগিল “ধূলা ত লোকবিচার করে না,
ধূলা আমাকেও যে ঢেকে দেখে, তোমাকেও
সেই ঢেকে দেখে।”

কমলা। আমার কাজ আছে বলিয়া
ধূলা সহিতেছি, তোমার কাজ নাই, তুমি কেন
ধূলা সহিবে ?

রমেশ কৃত্যদের কান বাচাইয়া মুহূর্তে
কহিল, “কাজ শুদ্ধ বা না থাক, তুমি বাচঃ
সহ করবে। তাহান অংশ লইবে

কমলার কর্ণবুল একটুখানি পাণ হইয়া উঠিল—রমেশের কথা কখন উত্তর না দিয়া কমলা একটু সরিষা-গিরা কহিল—“উম্মে, এইখানটার আর-এক-ঘড়া জল ঢালনা— দেখছি নুনে কত কাদা জমিয়া আছে! কাঁটাটা আমার হাতে দে দেখি।”—বলিয়া কাঁটা লইয়া খুব বেগে মার্কিনকাফো নিহুত হইল।

রমেশ কমলাকে কাঁটা দিতে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, “আচ্ছা, কমলা, ও কি করিতেছ?”

পিছন হইতে তিনিতে পাইন, “কেন রমেশবাবু, সত্যি কীকট: কি চইতেছে? এমিলক ইংরাজি পাড়িয়া আপনারা মুখে মাঝা এঁচার করেন; কাঁটা দেওয়ার কাজটা যদি এতই সহ্য মনে হয়, তবে চাকরের হাতেই বা কাঁটা দেন কেন? আমি মূর্খ, আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, সতী মারের হাতের ঐ কাঁটার প্রত্যেক কাঠি ঘরোয় বস্ত্রিচ্ছটার মত আমার কাছে উজ্জল ঠেকে। না, তোমার প্রবল আমি একরকম প্রারম্ভ করিয়া আসিনাম, কোনখানে তরকারীর কেং করিবে, আনাকে একবার দেখাইয়া দিতে হইবে।”

কমলা কহিল, “খুঁড়ানায়, একটুখানি সবুজ কর, আমার এ ঘর সাদা হইল বলিয়া!”

এই বলিয়া কমলা ঘর-পরিষ্কার শেষ করিয়া কোমরে-জড়ানো আঁচল মাথার তুলিয়া বাহিরে আসিয়া খুঁড়ার সহিত তরকারীর কেং লইয়া গভীর আলোচনার প্রস্তুত হইল। তরকারীর কেংসমূহকে কোনো-প্রকারে অনুপিকার প্রবেশ চইতে পারে না,

উম্মের এইরূপ ধারণা ছিল, স্বতন্ত্রাং এই প্রসঙ্গের মাঝখানে বিশেষ উৎসাহকসহকারে সে-ও আসিয়া প্রবেশ করিল। রমেশও কাছে আসিয়া দাড়াইল—কিন্তু কপি-বীট-শালগমের আবাসসম্বন্ধে অনতিজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য বশত আলোচনার গভীর মাঝখানে তাহার স্থান হইল না। সে বা হুইএকটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল, তাহা প্রাথমিক না হওয়াতে আলোচনাসমিতি তাহাতে বিশেষ কর্ণপাত করিল না! =

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল, কিন্তু ঘরগোছানো এখনো ঠিকমত হইয়া উঠিল না। বাংলাঘর অনেক-দিন অব্যবহৃত ও রুদ্ধ ছিল, আরো দুই-চারিদিন বরং গুলি ধোয়া-মাজা করিয়া জান্লাম-নরকী খুলিয়া না রাখিলে তাহা বাসযোগ্য হইবে না দেখা গেল।

কাজেই আবার আজ সন্ধ্যার পরে খুঁড়ার বাড়ীতেই আশ্রয় লইতে হইল। আজ তাহাতে রমেশের মনটা কিছু ঘমিয়া গেল। আজ তাহাদের নিজের নিবৃত্ত ঘরটিতে সন্ধ্যা-প্রদীপটি জলিবে এবং কমলার সলজ্জ স্নিত-হাস্যটির সম্মুখে রমেশ আপনার পরিপূর্ণ ছবির নিবেদন করিয়া দিবে, ইহা সে সমস্ত দিন থাকিয়া-পাকিয়া কল্পনা করিতেছিল। আরো দুইচারিদিন কিলবের সম্ভাবনা দেখিয়া রমেশ তাহার আদালত-প্রবেশ সম্বন্ধীয় কাজে পরদিন এলাহাবাদে চলিয়া যেন্নে।

৩৭

কাজের উৎসাহে, এবং সেদিন রমেশের কাছ হইতে যেটুকু আদানের স্পন্দই চামকা পাইয়া-

“ছিল তাহাতে, কমলার কণ্ঠ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে খুড়ার বাড়ীতে ফিরিয়া অকারণে শৈলজার গলা জড়াইয়া ধরিল, শৈলর ঘেঁষে উমিকে কোলে তুলিয়া বন্ধের উপর সবোপে পীড়ন করিয়া শিশুর ভাষায় তাহার সহিত যা-তা বকিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলাকার রাস্তার কাজে যোগ দিবারি ক্ষণ সে রাস্তাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। হরিভাবিনী কহিলেন, “আজ সমস্ত দিন ষাটরাছাড়া খাত একটু বিশ্রাম করগে।”

কমলা কহিল, “না, আমার কিছুই শ্রান্তিবোধ হইতেছে না- খুড়ামশায় আমার হাতের কপির-ডালনা খাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি আজ রাঁধিব।”

পরদিন কমলার নূতন বাসার শৈলর চড়িতাতির নিমন্ত্রণ হইল। বিপিন আহারান্তে আপিসে গেলে পর শৈল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গেল। কমলার অহুরোধে খুড়া সেদিন সোমবারের ইফুল কামাই করিয়া ছিলেন। ছইজনে মিলিয়া নিমগাছতলার রাস্তা চড়াইয়া দিরাছেন, উমেশ সহ্যাকাণ্ডে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

রাস্তা ও আহার হইয়া গেলে পর খুড়া ঘরের মধ্যে গিয়া মধ্যাহ্ননিদ্রার প্রবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে সবীতে মিমগাছের ছায়ার বসিয়া তাহারের সেই তির্য্যকিনের আলোচনার দিবিষ্ট হইল। এই গমস্তলির সহিত মিলিয়া কমলার কাছে এই নদীর তীর, এই শীতের সৌন্দর্য্য, এই গাছের ছায়া বড় অপূর্ণ হইয়া উঠিল,—ঐ মেঘশ্রুত নীলাকাশের বড় সুদূর উড়ে রেখার মত হইয়া চিল ভাসিতেছে, কমলার বন্ধাবাসী একটা উদ্বেগহারা

আকাক্ষা ততদূরেই উদাও হইয়া উড়িয়া গেল।

বেলা যাইতে না যাইতেই শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বানী আপিস হইতে আসিবে। কমলা কহিল, “অকস্মিনো কি তাই তোমার নিয়ম ভাঙিবার জো নাই?”

শৈল তাহার কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিল—এবং বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইয়া কহিল, “নাবা, আমি বাড়ী যাইতেছি।”

কমলাকে খুড়া কহিলেন, “মা, তুমিও চল।”

কমলা কহিল, “না, আমার কাজ থাকি আছে, আমি সন্ধ্যার পরে যাইব।”

খুড়া তাহার পুরাতন চাকরকে ও উমেশকে কমলার কাছে রাখিয়া শৈলকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে গেলেন, সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল—কহিলেন, “আমার ফিরিতে বেশি বিলম্ব হইবে না।”

কমলা যখন তাহার ঘর-গোছানোর কাজ শেষ করিল, তখনো সূর্য্য অস্ত যাব নাই। সে মাঝার-পায়ে একটা রূপার জড়াইয়া নিম্ন-গাছের তলার আসিয়া বসিল। দূরে ওপারে বেধানে বড়-বড় পোটা-ছই-তিন নৌকার দাঙ্গল অগ্নিবর্ণ আকাশের গারে কালো ঝাঁড় কাটিয়া ঠাড়াইয়া ছিল, তাহারই পশ্চাতের উঁচু পাড়ির আঁড়ালে সূর্য্য নামিয়া গেল। সন্ধ্যের সুস্ববিস্তৃত উদার নৃত্যের উপর দিনান্তের বেঁকরণ অম্ভাতি মুছিতে হইয়া পড়িল, তাহা কমলার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত মনের ভাবকে ঠাড়াইয়া তুলিল।

কমলা আরক্তাঙ্গ আপনার মনের ভিতর-
কার একটি রক্তমা, একটি পতঙ্গনি, একটি
গন্ধোজ্জ্বল বেশ স্পষ্ট অহুতব করিতে আরম্ভ
করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাী শৈলর সঙ্গে সে
আপনার ভাব সমস্তটা মিলাইয়া পাইতেছে
না । • বিপিন শৈলজ্ঞার অন্তরে-বাহিরে যেমন
স্থিতিস্থিতি, স্থাপ্তি, স্থব্ধ হইয়া আছে—
শৈল যেমন কোনো মুহূর্তেই তাহাকে-তোলে
না, সকল অবস্থাতেই বিপিনের অন্ত তাহার
মন সচেতন হইয়া থাকে— রমেশের সম্বন্ধে
কমলার মনের মধ্যে সেরূপ পরিপূর্ণতাব
এখনো ত জন্মার নাই । ঔদ্যাদ্য পরিচায়
করিয়া রমেশ কমলার প্রতি মনোযোগ দিলে
সে খুসি হয় বটে, কিন্তু কমলার চিত্ত ত দিন-
রাত্রি রমেশের অন্ত প্রবর্তিত হইয়া নাই, উৎ-
কণ্ঠিত হইয়া নাই, রমেশের কথা লইয়া নাড়া-
চাড়া করিতে সে ত বিশেষ কোনো রস
অহুতব করে না ।

নিশেষ ছদরের এই অভাব লইয়া, শৈল-
জ্ঞার সহিত তুলনায় নিজের এই লাঘবতা লইয়া
কমলা আপনাকে আজ পীড়িত করিতে লাগিল ।
তাহার গৃহ ত প্রবৃত্ত হইয়া উঠিল, এইবার
তাহার ভালবাসিবার পাল। সে ভাল-
বাসিবেই ! ভালবাসার সে তাহার বর, তাহার
মন ভরিয়া ফেলিবে, কোথাও কিছু জাঁক
থাকিবে না । এই স্থির করিয়া, এখনি এই
সন্ধ্যা-বেলায়, এই নিরুদ্ধিত ভরতলে সে তাহার
সমস্ত মন প্রয়োগ করিয়া রমেশের কথা চিন্তা
করিতে চেষ্টা করিল, সে রমেশের অন্ত একটা
আগ্রহ, একটা বেদনা বোধ করিতে চাহিল ।
ইমারের রমেশ তাহার সহিত অকারণে
অধুত আচরণ করিয়াছিল, সে সব কথা মনে

আসিয়া পড়ে, তৎকথায় কমলা তাহা বুঝে-
ঠেলিয়া দেয় ; রমেশ তাহাকে দুটির সময়
অনাবশ্যক ইচ্ছায় ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়া-
ছিল, সে কথাও সে জোর করিয়া কোনো-
মতে সরাইয়া ফেলে—সে সম্পূর্ণভাবে, একান্ত-
ভাবে ভালবাসিতে চাহে । অনেকদিন পরে
আজ সে আপনাকে একলা পাইয়াছে, আজ সে
বসিয়া-বসিয়া ভালবাসার আপনাকে যেন
ভরিয়া লইতে লাগিল । মনে মনে রমেশকে
ভাষিয়া কহিল, “আমার স্বামী !” স্বামী বলিবা-
মাত্র কমলার চন্দর উদেল হইয়া উঠিয়া
রমেশের মানসী মৃত্তিকে অতিথিত করিয়া
দিল । স্বামিতন্ত্রির হ্র শৈল কমলার মনে
বাধিয়া দিয়াছিল ।

এমন-সময় উমেশটা একটা ছুতা করিয়া
তাহার কাছে আসিয়া গাঁড়াইল । কহিল,
“মা, অনেকক্ষণ ভূমি পান খাও নাই—
’৭ বাড়ী হইতে আগিবার সময় আমি পান
ঝোগাড় করিয়া আনিয়াছি ।” বলিয়া একটা
কাগজে মোড়া করে কটা পান কমলার হাতে
দিল ।

কমলার তখন চৈতন্য হইল—সন্ধ্যা
হইয়া আসিয়াছে । তাড়াতাড়ি উঠিয়া
পড়িল । উমেশ কহিল, “কেবলমাত্র
গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন ।”

কমলা গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বাগানের
যথো যথালি আর একবার দেখিয়া লইয়া
অন্ত প্রবেশ করিল ।

বড় ঘরে শীতের সময় আশ্রয় আসিয়া
অন্ত বিলাসী হাঁপের একটি চুম্বী ছিল ।
তাহারি সংলগ্ন থাকের উপরে কেবোসিনের
আলো আলিতেছিল । সেই থাকের উপর

কমলা পানের মোড়ক রাখিয়া কি-একটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গাইতেছিল। এমন-কমর হঠাৎ কাগজের মোড়কে রমেশের হস্তাকরে তাহার নিজের নাম কমলার চোখে পড়িল।

উমেশকে কমলা সিজ্ঞাসা করিল, “এ কাগজ তুমি কোথায় পেলি ?”

উমেশ কহিল—“বাবুর ঘরের কোণে পড়িয়াছিল, ক’টি দিবস সন্ধ্যা জুলিয়া আনিয়াছি।”

কমলা সেই কাগজখানা মেলিয়া-ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

হেমলিনীকে রমেশ সেদিন যে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছিল, এটা সেই চিঠি।

স্বভাবনিখিল রমেশের হাত হইতে কখন সেটা কোথায় পড়িয়া গড়াইতেছিল, তাহা তাহার হ’ল ছিল না।

কমলার পড়া হইয়া গেল। উমেশ কহিল, “না, অমন করিয়া চূপ করিয়া পাড়াইয়া রহিলে যে রাত হইয়া যাইতেছে।”

যদি নিশ্চয় হইয়া রহিল। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া উমেশ ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, “না, আমার কথা শুনিতেছ না ? ঘরে চল, রাত হইল।”

কিছুক্ষণ পরে খুড়ার চাকর আসিয়া কহিল, “মারোজি, গাড়ি অনেকক্ষণ পাড়াইয়া আছে। চল আনরা যাই।”

ক্রমশঃ ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

বঙ্গ-বিভাগ ।

বঙ্গ-বিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্ভ্রুতি যে আলোচন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্ণত্ব বিদ্যে নৌকোয়াও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজ-ভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ কথাও কোনো কোনো ঈশ্বরাজকাগজে দেখিয়াছি

যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,—এমনতর নৈরাত্তের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কনগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভায় আমাদের বরাবর দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অমল পোরচক্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোবর মনোহরব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালাল ভরফের কথা জুলিয়াছি।

হতভাগা হতবল স্রাস্ত্রব্রতের এইরূপ নানা-প্রকার নিষেধ-কণ-কৌণল বেধিয়া নির্ভর অদৃষ্ট অনেকদিন হইতে হান্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিঁহ দুর্জয় ভীকর বতাবসিদ্ধ হলুকী বিশেষ দেখা যায় নাই—গ্রাজ প্রবীণব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোকা-সোকা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে-ছুটো ব্যাপার লইয়া আলেচিনা উপস্থিত হইয়াছে, সে ছুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিবাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ ছুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিবাস।

এই অবিবাসের বপার্থ হেতু আছে কি না আছে, তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ চাপকা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, প্রাণেক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে হুজুর। এবং বাহা হুজুর, আশ্চর্যকার জনা দুর্জয় লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিবাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, দুনিবিসিটি-বিলের দ্বারা তোমরা এদেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও এবং বাংলাকে বিধ্বস্ত করিয়া তোমরা বাঙালী-জাতিকে দুর্জয় করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং স্বাধীনতা, এই দুটোই জাতি-জাতীরই আত্মপ্রতি ও আশ্চর্যকার চরম দাবী। এই দুটার প্রতি যা পড়িয়াছে, এখন যদি সম্মেলন মনে জন্মায়, তবে বাতুল হইয়া উঠিবার কথা। বিচলিত দমন মনে আমি অপর পক্ষ বলিষ্ঠ; আমাদের হাতে

কোনো উপায় নাই, এবং বাহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্বত হইয়াছেন, তাহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে!

কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিবাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিবাসের বন্ধন ছেদন করিতে সক্ষম নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল—এটোয়ানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। যুরোপ কারমনোবাক্যে অবিবাস করিতে জানে। আমরা কণ-কালের অন্তর রাগ করি আর বাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পূরাপূরি অবিবাস করিতে পারি না। ঘোল-আনা অবিবাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা কুলিতে চাই, আমরা বিবাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালী বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা বখান প্রমাণ হইয়া গেল, তখন ঠাহাকে তাহার এক ইংরাজ জুজু বলিয়াছিলেন, "Spare him not, crush him like a worm!" কিন্তু বাঙালী সে হুণোম সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন এবং তাহার ফল" এখনো ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দমন করিতে, নিঃশেষে অবিবাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চির-স্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদের দ্বারা দেহ—এক ঘরগার আমাদের। মন বলিয়া উঠে—"মাতা, আর কেন, আর কাজ

“নাই, আর থাক্।” পরিপূর্ণ অবিবাহের মধ্যে যে একটা কাঁটক, যে একটা নির্দিষ্টতা আছে, আমাদের পক্ষে প্রধান, আমাদের মিলন-মূলক সভ্যতা তাহা আমাদেরকে চর্চা করিতে দেয় নাই—সবকিছুর করিবার ক্ষমতা আমাদের সর্বতোভাবে কটের দিন প্রস্তুত হইয়াছে, সবকিছুর করিবার ক্ষমতা নহে। বাহা অনাবৃত্ত তাহাকেও রক্ষা করিবার, বাহা প্রতি তাহাকেও অস্বীকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো কিনিবকেই ছাড়েন-মূল উপভোগ্য একবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আমরা পক্ষে, বাহ্য-রক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

‘‘রোপ বাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিব্রোহ করিয়া পাইয়াছে; আমাদের বাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিব্রোহের ধন। এখন, বিব্রোহের কারণে জাতির সহিত বিশ্বাসের কারণে জাতির বোঝাপড়া মুক্তি হইয়াছে।’’ সভ্য-বিব্রোহী সভ্যবিশ্বাসকে প্রভা করে না।

‘‘চাপকাপড়ের ‘‘স্বাধীন রাজকুলের চ’’ স্রোত বাঙালীর কণ্ঠ—কিন্তু বাঙালীর তদ-পেক্ষা কণ্ঠের তাহার জ্ঞান। সেজন্য তাহাকে বোঝা দেওয়া যায় না কারণ, শুধু পুঁথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের প্রমাণের বেশি আদরবীর। কিন্তু রাজকুলসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখ :—

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালীজাতিকে হুঁসল করিবার উদ্দেশ্যেই বাঙালীসম্প্রদায়কে বিভক্ত করা হইতেছে, যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, বাঙালীজাতির মধ্যে একত্ব আছে, তাহা হইলেই তোমার বিশ্বাস হইবে, বাঙালীজাতির মধ্যে একত্ব আছে।

যদিও প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্ণনা করা হইতেছে, তবে সে করার উদ্দেশ্য করিয়া, তুমি তাহার করণা স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করিতেছ? উদাত্ত কৃষ্ণকে গাছ যদি কটনবস্ত্রে এই কথা বলে যে, ‘‘তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব’’, তবে সেটা কি নিত্য-বাহ্য হইবে না? গাছের মক্ষার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে?

আর, মনের মধ্যে যদি অবিবাহ না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিবাহ প্রকাশ করিতেছে কেন—অমন চড়াবস্ত্রে কথা করিতেছে কেন—কেন বলিতেছে, ‘‘তোমাদের মঙ্গল আমাদের সুখিয়ারি, তোমাদের আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও!’’ এবং তাহার পরক্ষণেই কাদিয়া বলিতেছে, ‘‘তোমরা যাহা সফল করিয়াছ, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও!’’ বলিবার এই ‘‘অতএব’’!

আমাদের প্রকৃত এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যুগে অবিবাহ দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিবাহ করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্মও বথানিরবে পানিত হয় না—বাতব্রা অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিবাহ জন্মিয়া থাকে, তবে অবিবাহের মধ্য হইতে যেইকুণ্ডলভের বিষয়, তাহা গ্রহণ না করি কেন? আমাদের শায়ে এবং সমাজে রাজ্য-প্রভাব মিলনের, না? জাতিসম্প্রদায় হইবে-

কাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সেইটাই আমরা বুঝি-ভাল, সেইটাই আমাদের পক্ষে সহজ । সেজন্য খনিষ্ঠ মতকের দ্বারা আমরা কি লাভ করিতে পারিলাম, তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোন কল নাই

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাণাপ্রকার মাঝখানে খুব যে একটা মনকষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিঙ্গ উপলক্ষ্যেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা নৃপা এবং নস্কাকর । আমরা যদি-বা কপটভাষ্য তাহা ঢাকিতে চেষ্টা করি, কর্তৃপক্ষের কাছে তুচ্ছ ঢাকা পড়ে না । কারণ, ইংরাজ ও দেশে কোনোপক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাণার-ঘাটে, আপিস-আদালতে, রেল-স্টামে, কাগজে-পাঠে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মনজানাজানি হইয়া থাকে ।

আমরা বর-বরে বলিয়া থাকি, বাঙালী-জাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালীজাতকে দমন করিতে উৎসুক । ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে বাঙালীজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রমাত্রা প্রয়োগ করিয়া আত্ম-নিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে ।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরি-বাক্ষি, সাংসারিক* হযোগ প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুখিধ ঘটনার কথা । তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে গেটুকু সুবিধা সভাব্য-প্রত্যাশা করা বাইতে পারি। তাহাযেও কোনো লক্ষণ দৃষ্টিতে পাই না কেন? গাঙ্গেও চড়

পড়িবে, মশাও মরিবে না, আমদের কি এমন কপাল !

পরের কাছে হুস্পট আঘাত পাইলে পত-ভয়তা শিথিল হইয়া নিভেসে যাবে একা হুচুচ হয় । সংঘাত বাতীত বড় কোনো জিনিষ গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে ।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশাস হইয়া কি স্ত্রিলাম ? বাহিরে তাক্সা খাইয়া ঘরে কষ্ট আসিলাম ? আবারও সেই রান-দরবারেই ছুটিতেছি । এ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য, তাহার মামোমার ভিত্তি নির্দেশের চেষ্টাওপে আসিয়া স্ত্রিলাম না ?

আন্দোলন এখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই, এখন বলিবার সময় আসিয়াছে ।

মেঘের প্রতি আমাদের কথা এই—
আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না ! কেন এই কলুষারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন ! মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিহাৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে ! আম-দের ঘরের কাছে নদী বহিয়া বাইতেছে না—সে নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা বুঁকিয়া কিছু জল পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করিবার না ।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ কিরীক্স পাড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না । বাহিরের কিছুতে আম-দিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা

কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের একাত্মত্বিত বিগ্ন করিয়া তুলিলে। পূর্বে অড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি ভাঙত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টার প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন যাক্যখানে আসিয়া পড়িতেছে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা স্বার্থভাবে অগ্রভব করিব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাদুখী তাঁহার বহু বাহপানে গাধিরাছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত কোড়ে ধারণ করিয়াছেন, এই পূর্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের দ্বারা একই সনাতন রক্ত-প্রবাহে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরাই প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমা-বিগ্নকে কিছুতে পৃথক্ করিতে পারে, এ ভয় যদি আমাদের ভয়ে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সঙ্কতোভাবে সেই শক্তির কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, একাক্ষেপে দূর করিতে হইবে, হৃৎ-হৃৎ-নিষেধের মধ্যেই মিলনপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ হইল প্রাণের কথা,—ইহার মধ্যে স্থবিধা-অস্থবিধার কথা, লাভ-ক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে, যদি এমন সম্ভব মনে করিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগহুই ক্রমে চির-দায়ী বন্দোবস্ত হোপ পাঠতে পারে, আমা-

দের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্র সীমিত হইতে পারে, তবে সে সবকে আমাদের কল্পনা এই যে, পারে বটে। কিন্তু কি করিবে? কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পশিগ আঁটিয়া থাকেন, তবে আর হোক, কাণ হোক, নোপনে হোক, প্রকৃষ্ট হোক, সেটা তাহার সাধন করিবেনই—আমাদের তক তিনটা তাহার ক্ষান্ত হইবেন কেন? মনে কর না কেন, কথামাণার বাঘ যখন মেঘশাবকে বাহিতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, “তুই আমার মল খোলা করিতেছিল, তাকে মারিব”—তখন মেঘশাবক বাঘকে তর্কে পরাভ করিল, কহিল, “আমি বরণার নীচের দিকের মল খাইতেছি, তোমার উপরের মল খোলা হইল কি করিয়া?” তর্কে বাঘ পরাভ হইল, কিন্তু মেঘশাবক কি তাহাতে কোনো স্থবিধা হইয়াছিল?

অগ্রহই যেখানে অধিকারের নিষ্ঠুর, সেখানে মমতা বা ডুতে দেওয়া কিছু নয়। মুখানিষ্পালটির দায়ত্বশাসন এক রাজপ্রতি-নিধি আমাদেরকে দয়াছিলেন, আর এক রাজপ্রতিনিধি তাহা বহুদৈ কাড়িয়া গইলেন। উপরন্তু গাণ দিগেন, বলিলেন, ‘তোমরা কোনো কন্দের নও!’ আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, ‘আমাদের অধিকার বেশ!’ অধিকার কিসের! এ মোহ কেন! মহারাষ্ট্র একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়া-ছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব—কালো চামড়ার অপরাধ নদা হইবে না। আজ যদি কনশালি হইতে আমরা ক্রমে বহিষ্কৃত হইতে থাকি, তবে সেই পুরাতন শিল্পউদ্যোগ মোহাই পাড়ি।

লাভ কি ? সেই দৃষ্টান্তের কথা কি রাজ-
পুরুষের অপেক্ষা আছে ? মহাশয় মহারাজার
প্রশংসামূলক কি তাহাতে বিচিনিত হইবে ? চিত্র-
হারী বন্দোবস্ত আজও হারী আছে, সে কি
আমাদের অধিকারের জোরে, না রাজার
অগ্রগৃহে ! যদি পরে এমন কথা উঠে যে,
কোনো বন্দোবস্তই হারী হইতে পারে না,
শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই সারিগের
নির্ভর, তবে সত্যাকার অস্ত্র লড়, কর্ত্তব্য-
শাসনের প্রোতসাহকে কলিকাতা টাউনহল্
হইতে উদ্বেজিত করিয়া লাভ কি হইবে !
এ সমস্ত মোহ আমাদের গিরি করিতে
হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব । নতুবা
প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত
থাকিবে না ।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর
আছে, সেখানে আমরা দৃঢ় হইব । যেখানে
কর্ত্তব্য আমাদেরই, সেখানে আমরা সচেতন
থাকিব । " যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে,
সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব ।
আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ, নিরাশাস
হইব না । এ কথা কোনোমতেই বলিব না যে,
গবর্নেন্ট একটুকু কি করিলেন বা না করিলেন
বলিয়াই অমনি আমাদের সকলদিকে সর্ব-
নাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভব-
পর হইতে পারে, তবে কোনো কৌশলময়
সুযোগে, কোনো ভিকালক অগ্রগৃহে আমা-
দিগকে বেশিদিন দৃষ্ট করিতে পারিবে না ।
কিঞ্চিৎ আমাদের নিজের হাতে বাহ্য দিয়াছেন,
তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে
বেশি, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ ।
মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের অস্ত্র

সুপ্রদান না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের
মাটির মধ্যে সেই শক্তিতুকু দিয়াছেন, যাহাকে
বিধিমত কর্ণ করিলে ফললাভ হইতে কখনই
বঞ্চিত হইবে না ।

ব্রিটিশ গবর্নেন্ট নানাবিধ অগ্রগৃহের দ্বারা
শালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদের গিরিকে
মাজুর করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—
অগ্রগৃহভিত্তিকগকে যখন পদে পদে হতাশ
করিয়া তাহাদের দ্বার হইতে দূর
করিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিজের
ভাগ্যের কি আছে, তাহা আশঙ্কিত করিবার
অবসর হইবে,—আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা
কি সাধা, তাহা আনিবার সমর হইবে,—
আমাদের নিজের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত,
তাহাই বিখণ্ডক বুঝাইয়া দিবেন । যাচিয়া
মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই ছুটিবে
না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন
ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে
মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু
শ্রেম লক্ষীছাড়াগের গৃহপ্রত্যাবর্তনের অন্ত
গোষ্ঠির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে,
তাহার মূল্য বুঝিব—তখন মাতৃভাষার ভ্রাতৃ-
পণের সহিত স্বপ্ন-স্বপ্ন লাভ-কতি আলোচনায়
প্রোভাজনীয়তা অগ্রভব করিতে পারিব,
প্রোভিন্শাল কনফারেন্সে দেশের লোকের
কাছে বিশেষের ভাষার স্বকোণ বক্তৃতা
করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান
করিব না—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে,
ইংরাজ যখন ঘাড়ো বরিয়া আমাদের গিরিকে
আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চোঁটার
দিকে জোর করিয়া কিরাইয়া দ্রুত পারিবে,
তখন ব্রিটিশ গবর্নেন্টকে বলিব যত—তখন

অনুভব করিব, বিশেষরূপে এতদ্রাষ্টব্য বিধাতারই
মঙ্গলবিধান ! হে যুগল, আমাদিগকে বাহা
ব্যুচিত ও অব্যুচিত মান করিরাছ, তাহা একে
একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন
করিতে দাও ! আমরা প্রায় চাহি না,
প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির
উদ্বোধন হইবে ! আমাদের নিজের সহায়তা

করিলে না, আমরা আত্মপের ভর নহে,
পরবশতার অহিফেনের মাজা প্রতিদিন
আর বাড়িতে দিবে না—তোমাদের ক্ল-
মুর্তিই আমাদের পরিজ্ঞাণ ! জগতে জড়কে
সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায়
আছে,—আঘাত, অপমান ও একান্ত অত্যাচার ;
সম্মান নহে, সম্বাদতা নহে, সুভিক্ষা নহে !

বিজ্ঞাপতির অপ্রকাশিত-পদাবলী ।

অন্তঃপুর বিজ্ঞাপতির অপ্রকাশিত-পদাবলী ।
গ্রিয়ার্সনকর্তৃক সংগৃহীত ৮২টি পদ ও সে-
গুলির ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত
ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এতদেন্দীয়
কোন মঙ্গলনে সেগুলি সংবলিত হয় নাই ।
এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে করেকটি
বিজ্ঞাপতির স্মরণ, এ কথা গ্রিয়ার্সন প্রকার
করিয়াছেন । রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাঁহার
সংলগ্ন কবিতা ৭৬টি । বিজ্ঞাপতি দীর্ঘ-
জীবী ছিলেন । দীর্ঘ জীবনে রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধে
ষোটে ৭৬টি পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা
সহজে বিশ্বাস করা যায় না । গ্রিয়ার্সন বাহা
পাইয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।
কিহি প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ করেন নাই,
গায়কবিশ্বের মুখে বিজ্ঞাপতির গান সংগ্রহ
করেন । তাঁহার মঙ্গলনে ভাবসম্মিলনের
একটিও পদ নাই ; বিজ্ঞাপতির গম্ভীর স্তোত্র
—“কত চতুর্ভুজান মরি মরি যাওয়ার ন তুয়া
আদি-অবসান । তোহে জনমি পুন তোহে

সমাগত সাগর-লহর-সমান ॥”—অথবা আর
কোন স্তোত্র নাই, মাধবের পূর্করাগের
একটিও পদ নাই । উৎকৃষ্ট পদ অনেকগুলি
আছে, কিন্তু সমুদায় একত্র করিয়া কাব্য-
সৌন্দর্যে বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর সহিত
তুলনা হয় না । গ্রিয়ার্সনের সংকলনপ্রসঙ্গে
একটি কথা বলিবার আছে । বিজ্ঞাপতির
কতকগুলি অঙ্গুল পদ আছে শুনিতে পাওয়া
যায় । লেখকগণ সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ পদ
উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন । এ
কথার বিষয় আলোচনার এ অবসর নহে ।
একটি বৃহৎ ও ধর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজ্ঞা-
পতির পদাবলী ধর্মগ্রন্থতুল্য, সর্কার্তনে চৈতন্ত-
দেব স্বয়ং এই সকল গীত শুনিয়া মুগ্ধ, বুদ্ধিত
হইতেন, স্থানে স্থানে পদাবলীর পুঁথি অজ্ঞা-
বধি তুলসী-পুষ্পে পূজিত হয় ; কাব্যে
কাহাকে অঙ্গুল-বলা দাইতে পারে, কাহাকে
পারে না, সে সকল কথার বিচারে এখন
প্রবৃত্ত হইব না । “যে দেশের শিক্ষার ভ্রমে

আমাদের রচি বিজ্ঞ ও সমুদ্র হৃদয়কে, আর কেবল সেইকালের দাকী ডাকিরা কান্ড হইব। অতিশয় অরীণ ও নিমিত্ত পদ গ্রিয়ার্সনের এরে অনেকগুলি আছে এবং তিনি তাহাদের করিতে কিছুমাত্র স্কুতিত্ব হন নাই। তিনি বলেন, "I have grouped the songs into classes, according to the subjects of which they treat; one class, for instance, treating of the first yearnings of the soul after God, another of the full possession of the soul by love for God, another for the estrangement of the soul, and so on. To understand the allegory, it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the messenger or *duti* the evangelist or else the mediator, and Krishna of course the deity." হানাতরে, The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest। অতঃ, "They (Vidyapati's poems) became great favourites of the more modern Vaishnava reformer of Bengal—Chaitanya, and through him, songs purporting to be by Vidyapati have become as well known in Bengali households as the Bible is

in an English one। বীন্দ্র-বিশেষ কিছু বৃত্তিভেদ না, কিন্তু তিনিও *Indian Antiquary* পত্রে বিজ্ঞাপতি ও বৈকবকাবা এবং চৈতন্তের ভক্তিধর্মী পারভমেশের দক্ষী কাব্য ও ভক্তির সহিত উপমিত করেন। বাহারা গণবিখ্যাত সিওয়ান-ই-হাকিমের গজল ও কলাসুখীন কুমার মসুনবী মূল কিংবা অহুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা এই তুলনার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। বিচিত্রভাবী বিশ্বশ্রেয়িক আমেরিকান কবি Walt Whitman। মুক্ত-বকন কবির সর্বতোমুখী স্বামী তুর্ধানাদে ঘোষণা করিয়াছেন-

"No more modest than immodest."

Through me forbidden voices,
Voices of sexes and lusts, voices
veiled and I remove the veil,
Voices indecent by me clarified
and transfigured."

গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহ অতি সামান্য, মিথিলার বিজ্ঞাপতির আরও অনেক পদ আছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় চিরকাল বিজ্ঞাপতির ভক্ত, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া সম্ভ্রুতি মিথিলা হইতে বিজ্ঞাপতির পদাবলী আনিয়াছেন। বারভাঙার মহারাজা উৎসাহের সহিত এই উদ্দেশ্যে যোগদান করিয়াছেন এবং প্রধানত তাঁহারই যত্নে এই পদগুলি পাওয়া গিয়াছে। সারদাবাবুর নিকট হইতে পদগুলি আমি পাইয়াছি। এই পদগুলিই এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গান ও পুঁথি হইতে

সংগৃহীত হইতেছে বলিয়া পুঁথির কাগজনির্ঘর করা কিছু সময়সাপেক্ষ এবং অনেক পদ মুখে মুখে সংগৃহীত। এ পদ্যও আনন্দ্রা ১৪১টি পদ পাইয়াছি, ইহাতে গ্রিয়ার্সনের প্রকাশিত ৩০টি, পদ আছে, অপর সকলনে প্রকাশিত ৭টি এবং এদেশে প্রচলিত ৭টি পদের পাঠ্যকর আছে। ইহাও মধ্যে ১০টি অপ্রকাশিত শিবগীত। আমাদের পক্ষে প্রায় সকল-গুলিই একেবারে নূতন। এখন নূতন, কিন্তু চিরকাল কি নূতন ছিল? এখন বঙ্গদেশীয় ও মৈথিল, দুইরূপ পদবিভাগ করিতে পারা যায়, কিন্তু চিরকাল কি এইরূপ প্রভেদ ছিল? এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিভাপতির দুইচারিটি পদ ব্যতীত এ দেশে আর পাওয়া যায় না, অপর ভাল কেবল অন্ধকরণ কিংবা ভাগ, গ্রিয়ার্সনের এই মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। তিনি মিথিলার সমস্ত পুঁথি দেখেন নাই, পদকল্পতরুও উত্তম-রূপে দেখিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দেশের সকলমীকারগণ এক ভণিতা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নাই। পদকল্পতরুতেই ভণিতাপূত্র অথবা অপরভণিতাপূত্র বিভাপতির বহু-সংখ্যক পদ আছে। ভণিতাবিশুদ্ধ যে পদ পদকল্পতরুতে, পদানুতসমুদ্রে, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পাইয়াছি, এবং যে কারণে কোন সকলমীকার বিভাপতির পদ বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই, ভণিতাপূত্র সেই পদ মৈথিল পুঁথিতে পাইতেছি। গোবিন্দদাসের একরূপ পদ পাইয়াছি, তাহাতে বিভাপতির মৈথিল পদের ভাব অবলম্বন গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু পূর্বকবির সে পদ এখন এ দেশে প্রচলিত নাই। চণ্ডীদাস বাভানী, তাহার পুঁথি দ্রু-

পূর্বক রাক্ত হইবার কক্ষ, এইরূপ অধিক-সংখ্যক পদের ভণিতা পাওয়া যায়। বিভাপতি বিদেশী, তাহার পদ হুন্দোথ, পুঁথির অক্ষরে কিছু প্রভেদ, হয় ত তাহার পদাবলী অধিকতর গীত হইত, ভণিতা সময়ে সময়ে লুপ্ত বা বিকৃত হওয়া বিচিৎ নহে। এ দেশে বিভাপতির সকলনে যতগুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক পদ এ দেশে যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নহে। পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈকুণ্ঠদাস অনেক পদ সম্পূর্ণ পান নাই, কিন্তু তিনি গ্রন্থাও পাইয়াছিলেন, সে সকলগুলিও কোন সকলনে প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের সময় ও তাহার কিছু কাল পরেও বিভাপতির সমগ্র পদাবলী এ দেশে প্রচলিত ছিল, এও অসম্ভব নহে সমস্ত বিবেচনা হয়।

মৈথিল পদাবলী ও এদেশের পদাবলীতে ভাষাগত পার্থক্য অনেক, কিন্তু ভাষাগত সাবুজ আরও অধিক। বঙ্গদেশের অপেক্ষা মিথিলার গীত ও রচনা পরিবর্তন অল্প। বিভাপতির পর তাহার স্বমকক বৈকুণ্ঠকবি মিথিলায় জয়গ্রহণ করেন নাই। চৈতন্যদেবের ভক্তিস্রোত উজ্জ্বল বহিরা মিথিলা ভাসাইতে পারে নাই, এবং বৈকুণ্ঠদাস সে দেশে কখনও প্রবল হইল নাই। সে দেশে মৈথিলী জানকী ও তাহার পুত্র রঘুকুলভিনক রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি এখনও অচল। গ্রিয়ার্সনের সকলনে একটি পদে 'হরি' শব্দের পরবর্তে 'রঘুপতি', এবং কয়েকটি পদের ভাষাত্মক 'জয় বাদ' প্রসংগ হইয়াছে। 'দশ-

রথহস্ত অক্ষ জনকমণিনী' মিথিলায় উপাত্ত
দেব-দেবী, বিজ্ঞাপতির পদাবলী বৈকবধংশে
অনুপ্রাণিত । হারভাঙা মঙ্গলফলপুত্রেয় শিক্ত
সম্ভাব্যের লোকেরা বিজ্ঞাপতির প্রায় কিছুই
জানেন না । 'বিজ্ঞাপতির রচিত সংকৃত পুঁথি
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ মৈথিল-
ভাষায় রচিত পদাবলী এ পর্য্যন্ত সে আকারে
প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতেই তাঁহার বৈকব
গীতাবলীর কল্পন সমান, তাহা বুঝিতে
পারা যায় ।- সমান নাই বলিয়াই
পার্থক্যতিরও বাহুলা নাই । বিজ্ঞাপতির
রচনা আধুনিক মৈথিল ব্যাকরণের অনুযায়ী
করিবার চেষ্টা হওয়াতে স্থানে স্থানে আধু-
নিক মৈথিল ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া
যায়, কিন্তু ইহার অধিক পরিবর্তন হয় নাই ।
যেখানে শব্দপরিবর্তন, সেখানেই প্রতিপদকথা-
দোষ ঘটিবে । দিতে ও কাব্যে প্রভেদ এই
বে, দিতে রাগিণী ও গানের অবলম্বনে নিষ্ট,
তাঁহার ত্রিচ্ছন্দে শব্দযোগ্যনামাত্র ; যে শব্দ-
মালা রাগরাগিণীর সুবিশ্রেণী নহে, যাহার
ছন্দে ছন্দে কল্পিত হিমোলিত রাগিণী সঙ্গরণ
করে, স্রোতের বক্রনীতে বক্রনীতে সম রক্ষিত
হয়, তাহাই কাব্য । বিজ্ঞাপতির রচনা উৎকৃষ্ট
শৈলিকাব্য, সুরেও সঙ্গীত, শব্দেও সঙ্গীত, শব্দ-
পরিবর্তনের প্রয়াস হইলেই রসতঙ্গ হইবে ।
এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর ভুলনাথ মৈথিল
পদগুলিতে ভাষার ও ভঙ্গীর সর্বত্র সামঞ্জস্য
আছে । শব্দগালিত্যে ও ছন্দের তরল
স্নেহিতে করকর 'নির্ভরপাতভূলা প্রবণাতি-
রাম । অপ্রকাশিত পদগুলির মধ্যে এমন
অনেক পদ আছে, যাঁহা পাঠ করিতে বিশ্ব
ও পুণ্যকে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ।

করেকটি মৈথিল পদ উদ্ধৃত করিতেছি ।
প্রত্যেক পদের সংক্ষিপ্ত-অর্থার্থ করিয়াছি ।
প্রথম তিন পদ আমাদের পুঁথিতে এক
গ্রন্থার্সনের সকলনেও আছে ।—

কানন কাহ কান হম, গুনল
ভই গেল আনক'আনে ।
হেরইত শররগিণু মোহি হয়লনি
কি কহব তনিক গোয়াব ।
চান চান আঙ্গ হম লেপনি
ওঁই বাফল অতি মাপে ।
অধরক লোভনৌ বিষধর মগরল
খই চাহ কেরি মাপে ।
ভগি বিয়াপতি হুহু মুখিত মন
মধুকর লোভিত কেলি ।
অনহ সহিত কত কোমল কামিনী
শামিনী ভাব মত গেলি ।

কাননে কানাই (আসিয়াছে) গুণিণী
আমি অন্তমনা হইলাম । (যখন কানাইকে)
দর্শন করিলাম, (তখন) শররগিণু মদন
আমাকে হরণ করিলেন (আমার চৈতন্য হরণ
করিলেন), তাঁহার (মদনের) বিবেচনার (ক্ষণ)
কি বলিব ? (প্রথম বিকার প্রবণজনিত,
দ্বিতীয় বিকার দর্শনে ।) চন্দন (এবং) চন্দ্র
আমি অঙ্গে লেপন করিলাম (অঙ্গে চন্দ্র
লেপন করিয়া শীতল হইবার আশায় ঘোংড়া-
শোকে বসিলাম), তাহাতে (অণু ও দর্শন
জনিত বিকার) অত্যন্ত দর্পের সহিত বাড়িল ।
অধরের লোভে বিষধর সর্প নীচে নামিল
(বেগী মুক্ত হইয়া মুখের উপর পড়িল),
সর্পকে ফিরাই ধরিতে চাহিলাম (মুক্ত বেগী
মুক্ত করিতে চাহিলাম) । বিজ্ঞাপতি
কহিতেছে, হই জনের প্রীত মন, মধুকর
কেলিযুক্ত । কোমল কামিনী অমত কত

সহ্য করিবে? যামিনী জীবন দিয়া পেল
(রজনীতে উভয়ের মিলন হইল) ।

দ্বিতীয় পদটি নূতন ধরণের। পূর্বরূপ,
মিলন, মান প্রকৃতি যে সকল পদের বিভাগ
আছে, মিথিলার তাহার অতিরিক্ত 'লাব'-
স্বীকৃত একটি বিভাগ দেখা যায়। লাবের অর্থ
ছলনা, অপরাধগোপনমানসে কৌশলবাক্য-
প্রয়োগ। 'বিজ্ঞাপতির প্রকাশিত পদেও
এই শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি—'ভূপই বিজ্ঞা-
পতি ন করহ-লাব'। অভিনায় হইতে সত্ত
প্রত্যাপ্ত রাধা নন্দনের নিকট অপরাধ
গোপন করিতেছেন। কবিতার কৌশল এই
যে, ছল প্রত্যাক, অথচ গুঢ় রূপকের ভাব্য
অভিনায়িকা সত্য বর্ণন করিতেছেন।—

ননদিসে রসরসি পদাভব

বিনু বিচার অভিচার বুঝইবহ

শান্ত করইবহ রেবে ।

কৌতুক কমল মাল হম ভোড়লি

করই চাহনি অবতালে ।

রোব কোবসে মধুকর ধাওল

হেই অধর কক ধাওল ।

সরোবরবাটবাট লকটতক

হেই নহি শকলহ আণ ।

সে। কর বাট উবট হম চললত

তেই কুচ কটক লাগ ।

সরস কুচ শির শির নহি থাকত

তেই উবল কেশপালে ।

সবীষকসে হম পাচু পডলত

তেই তেল লীষ বিনালে ।

পথ অপরাধ পিণ্ডন পরচারণ

তখি হ' উত্তর হম দেলা ।

অমরথতাই থেরত নহি হরলে

তেই পদপত পত তেল

অপতি বিজ্ঞাপতি পত বকসেদতি

স লক হাধহ পোত

ননদিসে রসরসি পদাভব

গুপ্ত বেকত নহি হোই ।

নন্দ, (আমার) অবস্থার দেখিয়া মোর নির-
পণ করিতেছ। বিনা বিচারে (মোর নির-
পণ করিলে) বিষের বুকাইবে (ও) শান্তকী
রাগ করিবেন। কৌতুক করিয়া সুপাল
হইতে পদ ছিড়িয়া আমি শিরোভূষণ করিতে
চাহিলাম, কমলকোব হইতে কুচ বধুকর
ধাবিত হইয়া আমার অধরে ধারণ করিল।
সরোবরবাটের পথে তরলকট পূর্বে দেখিতে
পাই নাই, কিরিয়া অস্ত্র পথে বাইতে কুচে
কটক লাগিল। গুপ্ততার পূর্ণকৃত শিরে
শির থাকে না, সেই কারণে কেশপান আশু-
লিত হইয়াছে। সবীষনের পদাভবে
পড়িয়াছিলাম, (দোড়িয়া আসিতে) নিদ্রাস
দীর্ঘ হইয়াছে। পথে হঠাৎলোকে আমাকে
বিজ্ঞপ করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম,
ক্রোধে বৈধা রহিল না, সেইজন্য কর্তব্য
গণনা হইয়াছে। বিজ্ঞাপতি কহিতেছে,
তুমি বুঝীশ্রেষ্ঠ, এ সকল গোপন করিয়া
রাখ। নন্দী হইতে রসরসি রক্ষা করিবে,
(তাহা হইলে) গুপ্ত ব্যক্ত হইবে
না।

বিজ্ঞাপিত্যর একটি পদ। এটিও
রাধার উক্তি।—

মাধব কোহে জনি বাহ বিবেশে ।

হমরো রস-রসন এই থরহ

লবহ কোম লকলে ।

বনহি বনন কক হোয়তি মোসরমতি

বিসরি মাধব পতি মোর ।

দীরা মণি মানিক একো নহি মাধব

কেরি মাধব পর ভোরা ।

ঘন ঘন কুক নচন মোর ভক

তখিও পত পত পত

একটি অপরূপ নিম্ন প্রান্ত পর্বত

কইলে পূর্বত মনু মার

গমসর কামিনী বসন্ত সোভাগিনী

চৈত্রিকট বইলে তারা ।

তবহি নির্দিষ্টপতি ওহ বরকোষিত

অগন রত্নর বর সারা ।

নাথব, তুমি বিশেষে বাইও না ; আমার রত্ন-
রত্ন (আনন্দ) লইয়া বাইবে, (পরে কি)
কোন সংবাদ লইবে ? বনে (ত্রুপ্তরী ও
মধুরার মধ্যস্থিত বন) গমন করিয়া অন্তমতি
হইবে, হে প্রাপতি, আমাকে তুলিয়া বাইবে ।
হীরা, মণি, মাগিকা একটিও চাহিব না,
এতু তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব । এখন
গমনকর, (আমার) চক্ৰ অগ্রপূর্ণ হয়, প্রভু,
দর্শনেরও সীমা হয় না : (চক্ৰ ভরিয়া তোমাকে
সেবিতো পাউ ন : । এক নগরে বাস
করিয়া এতু পর্বত হইল । অপর রমণীর
প্রেমপ্রার্থী হইল), আমার মনস্কামনা
কিভাবে পূর্ণ হইবে ? প্রভুর সঙ্গে (থাকিলে)
কামিনী অত্যন্ত ভাগ্যবতী হয়, যেমন চন্দ্রের
নিকটে তারা । বিভাগতি কহিতেছে, গুন
সুবতীশ্রেষ্ঠ, আপনায় কণের সার ধর (আত্ম-
নির্ভর কর) ।

প্রিয়ানন্দ বেক্স পরিভ্রম করিয়াছিলেন,
পদাবলীর অর্থগ্রহণে তদনুরূপ কৃতকার্য
হইতে পারেন নাই, ও অনেকস্থলে ভ্রমে
পতিত হইয়াছেন । ইহার একটি কৌতুকাবহ
কারণ আছে । মৈথিল পণ্ডিতেরা লক্ষণাব
ধরিয়া বংশের গণনা করেন, কিন্তু বিভাগতির
পদের অর্থ করিবার সময় ‘প্রাচীন’ কিংবা
আধুনিক বাংলাভাষার ও সহিত প্রাচীন
মৈথিলভাষার যে কোন পার্থক্য আছে,

কোনমতেই তাহা স্বাক্ষর করিতে চান না ।
প্রিয়ানন্দ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলেন । আধু-
নিক মৈথিলভাষায় ‘পারা’ (করিবার শক্তি)
অর্থে ‘পার’ শব্দের ব্যবহার নাই, কিন্তু বিভা-
গতির পদে যে সে অর্থে প্রয়োগ আছে,
তাহাতে কোন সংশয় নাই । বলা, “লুব্ধ
নয়ন হটর কে পার,” লুব্ধনয়নকে কে হটাইতে
(নিবারণ করিতে) পারে ? মৈথিল
পণ্ডিতেরা এ অর্থ কিছুতেই গ্রহণ
করিবেন না । সংস্কৃতে বিশেষ্য ‘পার’-
শব্দের যে অর্থ, তাহার তাহাই গ্রহণ
করিবেন । তাহাদের অর্থ—পরপারগামী
(অর্থাৎ বাহিতপ্রাণ) লুব্ধনয়নকে কে
ফিরাইতে পারে ? প্রিয়ানন্দ এই কষ্টকরিত
অর্থ গ্রহণ করিতে অসম্মত প্রকাশ করেন,
কিন্তু পণ্ডিতেরা বাণ্যভাষার অনুরূপ অধু-
বাদ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা-
দের সে প্রতিজ্ঞা ‘হটর কে পার’ ? বিভাগতির
আর এক স্থলে আছে—“কহিব ন পারির পঙ্ক-
মুখ-ভাষা”, প্রভুর মুখের ভাষা (তিনিই তাহা
কহিয়াছিলেন), কহিতে পারি না । পণ্ডিতের
অর্থ—প্রভুর মুখের ভাষার কণ (পুন-
রাবৃত্তি) পারপ্রাপ্ত হইল না । গোণার্থে বক
এতেন নাই, তবে পণ্ডিতের অর্থ মুণ্ডপরি-
ভ্রমণ করিয়া নানিকায়ারের ব্যাখ্যক
কোণ আছে । আরও এক স্থানে বিভা-
গতি লিখিয়াছেন, “আকম্প কঠিন সহর কে
পার”, কঠিন আলিঙ্গন কে সহিতে পারে ?
পণ্ডিতদিগের অর্থ—কঠিন আলিঙ্গনের চরক-
সীমা কে সহ্য করিতে পারে ? এমন
পণ্ডিতমণ্ডলীকে পারিয়া উঠা যায় । কিন্তু
গীতাদিগকে প্রিয়ানন্দ দেখিয়াছিলেন, তাহারা

ছাড়া মিথিলায় অপর উত্তম পণ্ডিত আছেন,
ও তাঁহার্য পদাবলীর স্থানর সদর্থ করিয়া
থাকেন ।

* যে সকল পদ ইতিপূর্বে একেবারেই
প্রকাশিত হয় নাই, অথবা ছই একটি পদ-
কল্পতরুর অতি মনোরমা অথচ অতি দুর্গম
অংশে অজ্ঞাতবাসে থাকিলেও আমাদের
অপরচিত, এমন করেকটি শ্রবণ করুন ।
এই কবিতা-করেকটি আমার বিবেচনার
বিজ্ঞাপতির মূল রচনা, কোনতরপ পরিবর্তন
বা বিকৃতি ঘটে নাই ।—

নন্দক নন্দ করখেরি তরু তরুই

ধীরই ধীরই মুরলী বোলায় ।

সমর সঙ্কেতনিকেতন বইসল

বেরি বেরি বোলি পাঠায় ।

জামারি, তোরা লাগি

অহুধনে বিকল মুরারি ।

বদুনাক তীরই উপবন উপবেগল

কিরি কিরি তওচি নিহারি ।

গোরগ বিকই অবহিত যাইতে

জনি জনি পুত বনমারী ।

তৌহই মতিমান হুমতি মধুহবন

বচন শুনহ কিছু মোরা ।

জাই বিজ্ঞাপতি শুধু বরখোদতি

বন্দহ নন্দকিশোর ।

নন্দোর নন্দন কদম্বতরুতলে ধীরে ধীরে মুরলী
বাঝায় । সঙ্কেতনিকেতনে বসিয়া (মিলন-)
সমর (আগন্ত জনিয়া) বারবার আঙ্গান-
খনি পাঠায় । জামরি, তোরা লাগিয়া মুরারি
অহুধন বিকল । বদুনাক তীরে উপবনে
উষ্মি হইয়া কিরিয়া কিরিয়া সেই দিকেই
(সঙ্কেতনিকেতনের অভিমুখে) দেখিতেছে ।
(যে সকল গোপী) ছুড়বিকর করিতে

আসিতেছে (বা) বাইতেছে, (তাহাদিগের)
প্রত্যেককে বনমাগ : ('তোরা কথা ।
দ্বিজ্ঞান্য করিতেছে ' হুমতি, আমার কথা
কিছু শোন, মধুহবন তোরা প্রুতি অহুধন
(হইয়াছে) । বিজ্ঞাপতি হুইতেছে, শুন
মুখতীশ্রেষ্ঠ, নন্দকিশোরকে বন্দনা কর ।
নাথবকে দেখিয়া রাধা সর্বাঙ্গে
কহিতেছেন

হয়ে হসি তেরলা খোয়ারে ।

সকল তেল সখি কোতুক মোয়ারে ।

এ মোহ ।

হেরিতরি হরি তেল আনে রে ।

জনি মনমথ মন বেধল বাণে রে ॥

লখল ললিত তন্তু গাতে রে ।

মন তেল পরলিহ সরসিগশাতে রে ।

তমু পদবল লিনু রে

সেইছি নচাওল সনখত ইলু রে ।

জাপল পরন বসালে

জনি মনলিত গরই কপেপু তমালে রে ।

বিজ্ঞাপতি কবি ভাগ্যেরে ।

করত কমলমুরী হরি সাবধানে রে ॥

আমাকে অল্প হাসিয়া দেখিল ; সখি,
আমার কোতুক, সকল হইল । সেই
(আমাকে) দেখিয়া হরি অন্তমনা হইল, যেন
মনমথ তাহার চিত্তে বাণ বিদ্ধ করিল । তাহার
ললিত গাত লক্ষ্য করিলাম, মনে হইল সর-
সিজগৎ স্পর্শ করিতেছি । (তাহার)
অঙ্গে শ্বেদবিন্দু প্রসারিত হইল, (সেই রূপ
দেখিয়া) তারাসনাথ চত্রে কিরিয়া পলায়ন
করিল (অহুধন-অভিশয্যে) রসান্ত
হইয়া (তাহার কলেবর) কম্পিত হইল ।
যেন তমাল কলপের নামকীর্জন করিতে
করিতে গলিয়া গেল । বিজ্ঞাপতি কবি

কহিতেছে, হরি কমলমুখীকে সচেতন
করিতেছেন, অর্থাৎ তাহার মনে অনঙ্গ আগ্রহ
করিতেছে ।

একটি কবিতায় রাধার সহস্র-সুন্দর রূপ
বর্ণিত হইয়াছে। অগ্রে দুইটিমাত্র অলঙ্কারের
উল্লেখ আছে—কর্ণে কুণ্ডল ও কণ্ঠে বৈদূর্য্য-
মণি । এই মঙ্গলভূত রূপ কবি তাঁহার
অতুল শব্দবর্ণ্যে ভূষিত করিয়াছেন ।—

সহস্র সুন্দর চিকুর চামর

সজল-জল-সবুজ-শাবর

সিটখি সরণি হুতার

শিল্প-দুর্লাভ আঁকুর রে ।

অতি শোহাগুন বদনমণ্ডল

নিরঃ চকল কনককুণ্ডল

নয়ন বাণ কমান চনি দূর

আন নহি দূর রে ।

রূপই রতি অতি অমূল্য বেশলি

ললিত কনকলতা বিশেষলি

বিধি জনি বিম্ব পরশই সিন্ধুভলি

মদনই অরজলি রে ।

কুঁতিল ঠাকেশ্বরবিধর

বদনসুখমা অতি মনোহর

কনকলতিকা যেহন সঙ্গর

মোঘবরজলি রে ॥

দুসন্ত মৌরী গহন বীমা

শেখল গুহ মিলি ভগদীনা

জল পরোধরজার নিরংরি

সে ন হোর কহিরে ॥

বাহু বন্ধুর বিশুল ধরল

চাহ স্নানবৎ প্রহরল

বলয়মূল সন আন কিছু

নহি লাগি গহীরি রে ॥

বঁধ পিত্তলক নেহসন বীণ

হুজুর্নেহ নিতম্বই জনি ধিন

চরণ চটুল মঙ্গলসম গতি

কৃন্দনধ ততি রে ॥ *

সবকলামর গুণক আগাই

নখলি বিধিবশই নগর নাগদী

হুকবি বিলাপতি ভনির রস

বুকই বহুপতিরে ॥

চামর- (জুলা) বেশ সজল জলদসমুহের

ভায় কুকর্ণ (ও) বভাবত সুন্দর, শিল্প-
রাগের সুন্দর আঁকুর সৌম্যপ্রসারী । অতি

শোভন বদনমণ্ডলের নিকট চকল কনক-

কুণ্ডল নয়নধূকের বাণভূম্য বোলারমান,

আর কিছু অনে হয় না । রতিরূপ ললিত

কনকলতাশ্রেষ্ঠ অতি অমূল্য বেশলি ;

বিধি বেন বিনা স্পর্শে (স্পর্শমলিন নী করিয়া)

মদনের অর্জুনালি সৃজন করিঃছেন । অতি

মনোহর বদনসুখমা ভূমিতলে পূর্ণচন্দ্রবি

ধারণ করিয়াছে, যেন শেষবর্জিতা অনিন্দা

কনকলতিকা সঙ্গরঃ করিতেছে । ঐরা হলুত

বৈদূর্য্যমণি ধারণ করিয়াছে, (কণ্ঠ ও মণি) উত্তরে

মিলিয়া ভ্রূণের সীমা দেখাইতেছে ; (তাহার)

সমীপেই গুরু পরোধরভার, তাহা কথা বার

না (বর্ণনাহীন) । বিশুল হর্ষিত (পুলকা-

কিত) বন্ধুর বাহুতে বলয়মূলভূলা চাক

চন্দনবৎ বর্ষিত, আর কিছু লাগিয়া নাই

(হস্তে আর কোন অলঙ্কার নাই) । কটি

পিত্তনের ঘেহের ভায় কীর্ণ (জ্বর ব্যক্তির

গ্রেম বেক্রপ অশ্রুদীর্ণ, কটি সেইরূপ কীর্ণ) ;

নিতম্ব সুখনের ঘেহকে বেন অর করিয়াছে

(সুখনের গ্রেম বেক্রপ চিত্রহীন, নিতম্ব যেন

ভগপেকা বিশুল) ; গমন মঙ্গলভূম্য, চরণ

চটুল, তাহাতে কৃন্দনধ- (জুলা) নখ-

পঞ্জি । সবকলামর গুণের অঙ্গগণ্য

নাগদী বিধির ভূপার নগরে দর্শন করিয়ায় ।

হুকবি বিভাপতি- (কৃত) কথিত রস বহুপতি

বুঝেন ।

একটি স্পন্দক প্রবণ করুন—

সাক্ষি নিম্নস্থপ্রেম শিরাট ।
কমলিনী ভ্রমর স্বপন চিত্রাই ॥
শেষ তেল পরিমিত কুল তেল বাসে ।
কতর ভ্রমর ঘোর শরল উপাসে ॥
ভবি ভবি ভ্রমরী বাসতু নিম্ন খোজে ।
মধু শিবি মধুকর শুভল সরাজে ॥
নহি কুল কহেন নহি উপই ন হুরে ।
দিবনো নহি যায় চৌধ দৌ ঘোরে ।
কেও নহি কহই মনি বাসতু বাতটে ।
হইন সমাগম ভট পেল প্রাতটে ।
তবুহি বিভাগ্যপতি ননি এ ভ্রমরী ।
বাসতু হরি হোর অপনতি নগরী ॥

নিম্নস্থপ্রেমমুখ্য পান করাইয়া কমলিনী
মস্তাকালেই ভ্রমরকে গোপন করিয়া রাখিল ।
কুল বাসস্থান ও পরিমল শয্যা হইল । ভ্রমরী
ভ্রমিরা ভ্রমিরা আপনার পতিকে অন্বেষণ
করে, (ও কহে), কোথায় আমার ভ্রমর উপ-
বাসী রহিল । ওদিকে) মধুকর মধু পান
করিয়া কমলের মধো শয়ন করিল । কুলও
কিছু কহে না, স্বর্গও উদয় হয় না । (ভ্রমরী
কহিতেছে) বেহে, অর্থাৎ বেহাগনিতি বিজ্ঞে-
ষাতনার আমার প্রাণও যায় না । সখি,
বরষের কথা (সংবাদ) কহে কহে না, রাজে
সমাগম (হইবার কথা), প্রত্যন্ত হইয়া
পেল । বিভাগ্যপতি কহিতেছে, গুন ভ্রমরি,
তোর বরষ নিজেই নগরীতে আছে ।

বিরহের প্রথম অবস্থার রাধা কহিতেছেন—

গমনই গমতি নহি
অনমনী কলসেই ।
দিনই দিনই ভয় অবসন জেন
হিমকমলিনীম বেহ ॥
অবন ন হুমিত মধুরি
কি করতি হৃদয়ান ।

বিধু দোষ ঘোচি বিনয়ল
কহিনী রহতি বহ ঠান ॥
এক নিশ কাহ্ন ঐকানিশ
হুবিহিত বংশ বিশালা ।
হুই পথ চরনি নিতম্বিনী
সংলয় পড়ু কুলখালা ॥
পাচরণ মতি আতম
ধৈর্য কহ মন পিরে ।
বিদ্যাপতি কবির ভণ
কাঁথ নয়ন বহ নীরে ।

গমনে (অভিমানে) গমিনী হারাইলাম, না
থাইনে জীবনসংসার । দিনে দিনে তবু অব-
সন্ন হইল, কমলিনীর সহিত ভূষারের বেমন
বেহ । মধুরি, মধুৎসব) এখনও আমাকে
স্মরণ করেন না, হুল্লরীনারে (আমার)
কি করিবে ? বিনা দোষে আনাকে বিবৃত
হইলেন, (এই) কাহিনী বহ স্থানে থাকিবে ।
একদিকে কানাই, আর একদিকে হুবিহিত
বিশাল বংশ ; হুই পথে নিতম্বিনী আরোহণ
করিলেন, কুলবাণী সংলয়ে পড়িল । মদন
অত্যন্ত মদন করিতেছে, ধৈর্য ধারণ করিয়া
মন পির কর । বিভাগ্যপতি কবির কহে,
শোক (আমার মদনে) অপ্র বহিতেছে ।

অমৃতবিলসনের একটি পদ—

সপনে আদল সখি মধু প্রিয়ালো ।
ওষধুক কি কহব মধুসলো ॥ ১
ন দেখি বধুগুণ ম দেখু সন্ধান ।
চৌধি পদয়ে কুমমলবাসে ॥
বহু বিলোচন বিকসিত ঘোরা ।
চান উপল জনি মধুহিলোরা ॥
উঠলি চেহার আলিঙ্গন বৈরি ।
রহলি সন্ধ্যা পুনি শের হেরি ॥
ভনই বিভাগ্যপতি গুনই সপনে ।
অত দেখনহু ওত পুংতোহ মধে ।

দাখি, সপ্তে পিথ আমার নিকটে আসিল ;
তখনকার সন্মুখের আনন্দ ক'হিব ! ধর-
ত গ অথবা সন্ধান (কিছুই) দেখি না,
(মাত্র বর্ণধাম) চক্রেদকে মদনের বাণ
নিকিষ্ট হইতেছে । অরবিকশিত বহ্নিম
নয়ন, বেন সন্মুখহিনোলে চন্দ্রোদয় হইল
(সন্মুখতরঙ্গে আনোণিত ভয়-চকল চন্দ্র-
বিষের স্রাব ঈষৎস্থানিত বহ্নিম নয়ন) ।
আলিঙ্গনের সময় চমকিত হইয়া উঠিলাম,
পূজা শব্দা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম ।
বিদ্যাপতি কহিতেছে, তুমি, সপ্তে বাহা
দেখিয়াছ, তাহা মনে পুণ হইবে ।

ছুইটি অপ্রকাশিত পদের ভণিতার বিশেষ
ঐতিহাসিক মূল্য আছে । প্রথমটি
এই—

দশ অবধান তপ পূজ্য পেন ধাণ

প্রথম সন্ধান ভেলা ।

আলমশাহ পদ ভাবিনি তজি রহ

কমলিনী ভবর তুলিয়া ॥

দশ অবধান কে ? এই উপাধি অথবা নাম
পূর্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই ।
পুঁথিতে বৈধগভাবায় একটি টীকা আছে—
বিদ্যাপতিকী উপাধি দশাবধান ছিল যে
দিল্লীদরবারেতে ভেটল ছিল ।

পদটি ভণিতারূপে অর্থে স্নাতককবিব্রজে
নহে, কিন্তু রচনার একই প্রণালী । অতি-
সার হইতে প্রত্যাপনত কোন রমণীকে কবি
পথে কহিতেছেন—

সেয়ে পদোদয়নকরেন হুমর

হুমর পকে সেপলা ।

অনি হরেক লখিও উকিত তেল

এনবর জালই বশল্য ॥

অভিনায়াণি তে ওপটু করহ কা লাবি ।

কোন পূজ্য তপই পুণ্য ভোবর মুন

রজনী গমটলহ আণি ॥

ভণিতার অর্থ—দশ বঁধান কহিতেছে, তপ-
বান্ পূজ্যের সহিত প্রভুর প্রেমসমাপন হইল ।
কমলিনী যেমন ভবরে তুলিয়া থাকে, যে
ভাবিনি, আলমশাহ প্রভুকে ভজনা করিয়া
তাহাতে সেইরূপ অতুরক্ত হও । বৈধিল
টীকার রহিয়াছে, বিদ্যাপতির উপাধি দশা-
বধান ছিল, যাহা দিল্লীদরবার হইতে প্রাপ্ত
হইয়াছিল । প্রবাদ আছে, শিবসিংহকে যখন
দিল্লীতে ধরিয়া গইয়া যায়, সেই সময়
বাদশাহ বিদ্যাপতির রচিত গীত শুনিয়া,
শ্রীত হইয়া, শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া দেন ।
গ্রিয়ার্সন্ অহুমান করেন—“কামিনী করু অস-
নানে, হেরইতে হিঁদর হনল পচনানে”—এই
পদটি বিদ্যাপতি বাদশাহের সাক্ষাতে রচনা
করেন । মিথিলার এইরূপ বিশ্বাস আছে ।
যত এই পদটিও সেই সময়ের রচনা ।
যে উপাধি দিল্লীদরবার হইতে প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, ভণিতার তাহাই প্রয়োগ
করিয়া অপরা রমণীর বর্ণনা করিয়া বাদ-
শাহের চিত্তবিনোদন করা কবির পক্ষে অধিক-
তর সম্ভব মনে হয় । দশাবধান-উপাধি-
মুক্ত আর কোন পদ দেখিতে পাই নাই ।

দ্বিতীয় পদটির বিষয় ও অর্থ অবিকল
প্রথম পদের অহরূপ, কেবল ভণিতা
ভিন্ন ।—

যেকতেও জারী ভপত কর বক্তব্য

বিদ্যাপতি কবি ভাণ ।

মহলম দুপতি চিরইকৌব জীবদ্

গাসয়েব হুলতান ॥

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, প্রকান্ত চুরী
কতক্ষণ গোপন করিবে ? দুপতি হুলতান

গ্যাসদেব (এই চরিত্রের বার্তা) বিবিত আছেন,
(তিনি) চিরজীবী হইয়া জীবিত হউন। বোধ
হয়, এই গ্যাসদেব গ্যাসউদীন, বঙ্গদেশের
পাঠানবংশীয় রাজা। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্যাস-
উদীনের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের দানপত্রের
কাল প্রচলিত বিবাসনতে খৃষ্টাব্দ ১৪০০।
প্রিয়ারসনের বিবাস, খৃষ্ট-চতুর্দশ-শতাব্দীর
বিভীষাকে বিভাগপতি লক্ষগ্রহণ করেন। ১৩৭৩
শালের পূর্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,
ইহাতে সংসরের কোন কারণ নাই। মহলম
(মালুম) ওম্মুতান, এই দুই শব্দের সরিবেশনে
অনুমান হয় যে, পদটি গ্যাসউদীনের মনস্তত্ত্বের
লক্ষ্য রচিত ও সম্ভবত তাহার মাকাত্তে গীত।

আর এক শ্রেণীর কবিতা প্রিয়ারসনের সকলনে
ও মৈথিল পুথিতে পাওয়া যায় এবং এদেশেও
ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত
আছে। সেগুলি প্রাহেলিকা অথবা হেয়ালি
কবিতা। যখন মৈথিল ও এদেশে প্রচলিত
একরূপ পদে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন
যেগুলি বিভাগপতির রচিত নয়, এমন কথা
বলা যায় না। এগুলি যে রাজসভায় অথবা
রাজ্যদেশে রচিত, অথবা ক্ষণে-তুষ্টি ক্ষণে-
কষ্ট অব্যবস্থিত রাজচিহ্ন প্রদাননের নিমিত্ত
বিরচিত, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়।
এই কঠিন সমস্যাগুলি কোন পণ্ডিত
পূরণ করিয়া দিতেন, অথবা পণ্ডিতেরা অক্ষম
হইলে কবি নিজে অর্থ করিয়া দিতেন ও
সাদৃশ্যনিতে রাজসভা স্তব্ধ হইয়া উঠিত, এরূপ
অনুমান অসম্ভব বনে হয় না। পুথিতে
এই শ্রেণীর একটি পদের ভগিতা এইরূপ—

তব দিয়ারপতি পদ হুমাশ্রিত

সকল পদাধিকার ন।

যে ই পদক অর্থ ল্যাপশ্রিত

সে জন বড় সৈয়দান ॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান
উদ্যাপতি ওন, যে এই পদের অর্থ লাগাইবে
(করিবে), সে জন বড় চতুর। বিভাগপতির
সমকালীন উদ্যাপতিনামক আর একজন
কবি ছিলেন। কবি ভগিতার তাঁহাকে
সম্বোধন করিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণপদাবলী বাজীত বিভাগপতি
নিববিবরক পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা
এখন সকলেই জানেন ও মিথিলার সেগুলি
বিশেষ প্রচলিত। একটি অপ্রকাশিত পদ
উদ্ধৃত করি।—

যে যত তোর অত্ম হিহুমনয়ে।

তব নিরলস বঁধনে

করম দমন তপ হীনে।

পড়ন্ত পাপ অধীনে।

বেড় ভাসল নৌক ধারে।

তৈরব ধর কক আরে

লাগলম দুখগারে।

অবধ করিও প্রতিকারে,

তবহি বিদ্যাপতি ভাগে,

সংকট করিও তবগারে।

পদের ভাষা নিত্য সঙ্গ, কেবল একটি
পদ ত্রিছ দ্বৈতীধ “বেড় ভাসল নৌক
ধারে, তৈরব ধর কক আরে”; অর্থ, (আবার)
নৌকা জোতের মধ্যে ভাসিল, যে তৈরব,
ধরিয়া কিনারায় কর।

আমাদের দেশে বিভাগপতির পদাবলী
বাহ্য প্রচলিত আছে, সেগুলি নিত্য
অসম্পূর্ণ। মিথিলার পদগুলি ছাড়িয়া দিয়াও
এক পদকল্পিতকতে, যতগুলি পদ পাওয়া যায়,
তাঁহাও এখন সংগৃহীত হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে

অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তবিত্য নানাবিধ
বিপদ্যর ঘটনাছে, কিন্তু কোন সহনকার সৈ-
নিকে লক্ষ্য করেন নাই। তবিত্য তির
তাহারা আর কিছু দেখেন নাই, যে সকল
রচনা কোনমতেই বিদ্যাপতির হইতে পারে
না, সংশয়শ্রুতিতে তাহা গ্রহণ করিয়া-
ছেন। আবার রচনাগোরবে বাহা নিঃসন্দেহ
বিদ্যাপতির, তবিত্য নাই বলিয়া তাহা
অসত্যোক্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক-
গুলি মৈথিল পদ একজন ইংরাজের অধ্যবসায়,
বহু, শুণগ্রাহিতা, উদারতা ও ভাবুকের, বিশ
বৎসরের উপর হইল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত
হইয়াছে। আরও বহুসংখ্যক অত্যাংকষ্ট
কবিতা বর্তমান রহিয়াছে। দাম্ভ্যো, লাগিতো,
লিখিকোণে, ভাবসোঁকসোঁ, কাবাসোরবে
অপ্রকাশিত-পদাবলী প্রকাশিত-পদাবলী
অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। এগুলি কি
হবে? বিদ্যাপতি ও আমাদের কবি,
তাহাতে ত ভক কিংবা আপতির অবগরমাত্র
নাই। চারশত বৎসর পূর্বে ঐক্যকটোভক্তের
ক্রীড়ানিঃসৃত বাণীর সহিত এই কবির
অমৃতবদী গীতি বিমুক্তিত—বৈষ্ণবকাব্যকল-
তকর গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম প্রধানত এই কবির
প্রতিভাসৌরভে সুরভিত! এই সকল নূতন
পদ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য, কতক
কর্ণমালা ও ভাব্যর বিভাবিকার তীত হইয়া,
কিন্তু প্রধানত অধ্যাপিতের নিজের আলস্ত-
ভদ্যোক্তে আবদ্ধ। এই কর্তব্যপালনে বিরত
রহিয়াছি। নাতিদ্রবহণা জননীর সুখের
দিকে চাহিয়া, আলস্ত পরিত্যাগ করিয়া,
যতকবির অথওকৌতুক সর্গভাসন্ধিরে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

এবং সমাপ্তিতে বিদ্যাপতিবিরচিত একটি
অপ্রকাশিত ত্তোত্র অগুনতুদিকে উপহার
দিতেছি। শিবসমীত অবৎ করিয়াছেন,
এই ত্তোত্র শক্তির। তবিত্য শিবলিহের নাম
নাই, তাহার পিতা দেবসিংহ ও মাতা হালিনী-
দেবীর (হালিনী) নাম আছে। রাজপণ্ডিত
হইয়া বিদ্যাপতির যে সম্মান ও প্রতিপত্তি
হইয়াছিল, বোধ হয় এই ত্তোত্ররচনাকালে
সেজন্য হয় নাই, কারণ ব্যাক্তাকারী ত্তোত্রের মত
তিনি দেবসিংহকে 'বাচককনের গতি' বলিয়া
সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মূল ত্তোত্র
অতুলনীয়। পরিজ্ঞান অথবা যুক্তির কোন
প্রার্থনা নাই, আছে কেবল বিশ্বাসভিক্ষুত
জ্ঞানলিপ্সুর অজ্ঞানাত্মকারে জ্ঞানালোকের
প্রার্থনা। ঘনকৃষ্ণিতকেশশোভনে, শিখিল
বিশে ধন্দ্যমাত্রাঙ্গদারিণি, এক অনেক,
সহস্রধারিণি, ত্রিপুরবহলপূর্বকারিণি, সিতা-
দিতবরণি, কালি পুঞ্জীকৃততিমিরমধ্য-
বর্তিনি, বাণি বিমলবিদ্যাবিধারিণি, গাহতী-
জননি, রবিমণ্ডল-উদ্ভাসিনি, সুকলিৎ-
অলকনন্দাচোরিণি, ত্রিনৃতিগেহিনি, অজাত-
সম্ভবে বেবি, প্রকাশিতা হও, প্রকাশিতা
হও।

শিখি জা দেবি শিখিতা হো
অবিরলকেনি শোহতী।
একনেক সহস্রকো বাহিণী
অবিরদা পূর্ণতী।
কজলরূপ তুর কানী কহিরও
উজ্জল রূপ তুর বাণী।
গবিনওল পরগো করিয়ে
গঙ্গা কহিরে পানী।
প্রাণের প্রকাশ কহিরে
হৃদয় কহিরে পানী।

মুরাওগঘর কমলা কহিরে

কে জানে উঠপতি তোহরি ।

বিদ্যাপতি কবির এহে পাওল

বাচক জনকে পতি ।

হাসিনী-সেই-পতি গরুড় বরাণে

নেহায়ে নরপতি ॥

শ্রীগেহলাল শঙ্কর ।

সাহিত্য প্রসঙ্গ ।

ইসলামের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ।

গত ৩০শে মার্চ অধ্যাপক গোষ্ঠাজিহার হাঙ্গেরির একাডেমি অফ সায়েন্স সভার একটি সাধারণ অধিবেশনে উক্তনামধের একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত জাহুয়ারি মাসের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিকে সেই প্রবন্ধটির সার সঙ্গিত হইয়াছে।

অধ্যাপক গোষ্ঠাজিহার বলেন—পূর্বে আরম্ভেণে বৌদ্ধধর্মের নাম ছিল “আল শামাভিয়া”। এই শব্দ প্রামাণ্যক হইতে উৎপন্ন। মুসলমানধর্মের উন্নতির সময়ে উক্তধর্মাবলম্বী দুই একরকম দার্শনিক প্রকাশ্যভাবে কতকগুলি প্রামাণ্যধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কারয়াছিলেন। “দার্শনিক ব্যক্তি কষ্টতো পুঙ্করেন কেন ?”—এই প্রশ্নের উত্তরে তাহার বলিতেন, পূর্ককালে তিনি অবশ্যই কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্ম হইতে তাহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরব-অভিধানে “বু”-শব্দের অর্থ বৃত্তি, বুদ্ধনের বৃত্তি হইতে এই শব্দ আরব-ভাষায় প্রতিমুদ্রিতব্যক্ত সাধারণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত

হইয়াছিল। আরব-উপভাষে অনেককালে “তাহার কপালে লেখা ছিল” প্রকৃতিরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, এই ভাবের কথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গম্যায়ী। বাণী “হুসল-মানী পুত্রকে এখানে “স্বগারগ্রহে লিখিত আছে” বা তরুণ অপরাধ কোন উক্তি থাকিবার কথা। গো. ১২ অষ্ট বিদ্যাত-পুত্র ললাটে লিখিয়া যান, ইহা ভারতবর্ষীয়-গণেরই ধারণা। আরব-উপভাষে অষ্ট-বাসের যেরূপ প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে অধ্যাপক সাহেব মনে করেন, উহাতে হিন্দু-প্রভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভাষীত ভারতীয় অনেকগ্রাণ পর “সম্ভা-ধিক” এক রমণী”র অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিদ্যাতীয় পরিচ্ছেদে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক ইতিহাসচর্চার দিনে তাহার আর আশ-সৌপন করিতে পারে নাই।

মুসলমানধর্ম ক্রমে পূর্কতিমুখে অগ্রসর হইয়া এশিয়ার সর্বত্র যী। বিজয়পত্যক। উড্ডীন করিয়া। সেই সময়ে এশিয়ার প্রগাম

ধর্ম ছিল বোধধর্ম, বিজয়া মুসলমানের ধর্ম-প্রভাবে উক্ত ধর্ম ক্রমে স্থানচ্যুত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, কিন্তু পুণ্যপ্রায় বোধধর্মের উপস্থানে নানিমেণে প্রাজ্ঞ ইসলাম বিচি-তাবে পুষ্টি হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। খৃষ্টীয় 'একাদশশতাব্দীতে' বোম্বাইনগরে "জিমিকের" দল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল,— এই "জিমিক" দল মুসলমানগণ বিধর্মীদের, (প্রধানত বোধধর্মাবলম্বীদের) প্রতি প্ররোপ করিত। সলিয়া বেন আবদুল কাদাস একজন প্রধান 'জিমিক' ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর বেন মকানগরীকে ধ্বংস করেন।" ৭৮৩ খৃঃ অব্দে তাহার প্রাপদেও দণ্ডিত করা হয়। হারগ আল-রসিদের রাজত্বকালে আবুল অবাইয়া নামক প্রসিদ্ধ যোগদল পণ্ডিত লিখিয়া-ছিলেন, "যদি তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠতম পুরুষকে দেখিতে চাও, তবে তিস্বেদী রাজ-কুমারের প্রতি লক্ষ্য কর—তাহার সাধুত্বই জগতে শ্রেষ্ঠ।" এই লেখক উক্তমত প্রচার করার অপরাধে ৮২৮ খৃঃ অব্দে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পুত্রও এই মতাবলম্বনের জন্য বৃত্যমণ্ড প্রাপ্ত হন। যা' বাইয়া জিমিকের দল ক্রমে বলস্কর করিয়াছিল। ইহার ছই শতাব্দী পরে হুগসিদ্ধ আবুল আল আল'হারি সমগ্র গ্রহণ করেন। তিনি মিরামিহভোজী ছিলেন এবং ইসলামধর্মকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি জানেন বিকাশকেই প্রকৃত ধর্ম মনে করিতেন এবং নির্জাগর শাস্তিই তাহার কামনা ছিল। ১০৫৭ খৃঃ অব্দে ইহার বৃত্য ৫২।

পরবর্তী সুফী-সম্প্রদায়ের মত এই সকল ধর্মমতের পরিপুষ্ট ও সর্বশেষ বিকাশরূপ গৃহীত হইতে পারে। জমশের কোমলবৃত্তির বিকাশপক্ষে খাটি ইসলাম বিশেষ কোন সুযোগ উপস্থিত করে নাই। সুফী-সম্প্রদায়ের মত এই অভাব পূরণ করিতে সক্ষম। ইসলামের ভিতর দিয়া এই সুফীমত বোধধর্মেরই জরপতাকা ধরিয়া ধাঁড়াইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শোপেনহাওয়ার বলেন, এই সুফী-সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্মমতকেই ভিত্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছে। বোধধর্মের "নির্জাগ" এবং সুফীদের "ফণা," বোধধর্মের "পদা" ও সুফীদের "ভারিক", বোধধর্মের "ধান" এবং সুফীদের "সুগাফা", এ সমস্তই এক প্রকারের। সুফী-সম্প্রদায়ের নেতা ইব্রাহিম ইবন এন্বাহানের জীবনসংগ্রহে পরবর্তী কালে যে সকল উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক ঘটনাই তাহার প্রতি আরোপিত। এদহামও অনেক রাজপুত্র, এক ক্ষুদ্র চিত্তশাস্তি লক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগী হন, তিনিও 'অহিংসা পরমধর্ম' মত প্রচার করেন। এই সকল ঘটনার সূত্র সূত্র অনেক কথার সঙ্গেও বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীর আশ্চর্যরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়।

বিজয়া মুসলমানধর্মাবলম্বিগণ যে অনেক-সময় বুদ্ধগৌরব এইভাবে আশ্রয় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার আরও বিবিধ প্রমাণ অধ্যাপকমহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ হারগ আলরসিদের পুত্র আল'সব্দির গৃহত্যাগ এবং সম্রাসগ্রহণ একটি। এই উপাখ্যানটি আরব্য-উপন্যাসেও লিপিবদ্ধ

হইয়াছে—উহা নিঃসরই বৌদ্ধ ইতিহাসের অঙ্গভূতি । সিংহলে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নকে মূলমানগণ আলিঙ্গন পদচিহ্ন বলিয়া নিষেধ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় প্রাচীন ধারণা পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন । বোধবা-শব্দের অর্থ পারস্তভাষায় “ধর্মীশ্রম”, উহা সম্ভবত বৌদ্ধ “বিহার”শব্দের বিকৃতি । এক সময়ে বোধবা বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এই স্থানের সমিহিত বহুসংখ্যক বৌদ্ধভূত্ব এখন মূলমান-উপাখ্যানোক্ত কোন মাধু বা বীরের সমাধিস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । নিজরী ইসলাম জনসাধারণের ভক্তির তীর্থ-স্থানগুলি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এই-ভাবে তাহাদের উপর স্বীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে । আমরা পুরায় লগ্নাধ্যমন্দিরকেও এইভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি—ইহাই বর্তমান ইতিহাসের আবিষ্কার । মুকী-সম্ভবদেবের মত বৌদ্ধমত হইতে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু উহা যে উত্তরকালে বেসান্ত-ধর্মের প্রচুর উপাদান পাইয়া পুষ্টলাভ করে, এবং “সোহং”বাক্যকে নিজের কৃষ্ণগত করিয়া লয়—অধ্যাপক গোল্ডজিহার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । মূলমানগণ বৌদ্ধ-ভিক্ হইতে অপমান্য গ্রহণ করিয়াছিল—ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত ।

অধ্যাপক-গোল্ডজিহার-বর্ণিত বৌদ্ধধর্মের এই প্রভাবের উল্লেখ ইসলামের পৌরব স্মরণ হয় নাই । যে বর্ণ বেগমালী মাবনের মত আসিয়া পড়ে—তাহা স্বীয়পন্থাস্থিত তির মতের কুপ ও সরিংকে আত্মসাৎ করিয়া প্রবল হয় । তাহা বৃহৎ, তাহা সর্ক-প্রাস করিয়া নিজের নিম্নত্বকে আরও উজ্জল

ও ব্যাপক করিয়া দেখায় । কিন্তু তাহার গতি নাই, তাহা নিজের সর্কীয় গভীর মধ্যে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা বাহিরের হাওয়ার স্পর্শে সিংহরিত হইয়া উঠে—পাছে তাহার নিম্নত্বকে কেহ কাড়িয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কা । প্রবল আসিয়া পরের সর্কীয় গ্রহণ করিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিয়া কেসে, দুর্বল নিজের ক্ষুদ্র মঙ্গল লইয়া স্বীয় কৃতীরে স্বারমোখ করিয়া আত্মরক্ষার বস্ত্রবান্ হয় । প্রবলবেগ-শালিনী নদী ধেরূপ বিবৃত ভূখণ্ডের উপর মগর্গে নিজের পদা আবিষ্কার করিয়া লয়—অন্ধে পাছে পত্ন লয় হয়, এই তরে ভীত হইয়া স্বীয় আবর্জ মন্মীকৃত কিংবা উদার পদা সর্কীয় করে না—পক্ষকে পবিত্র এবং মলিনকে নিখল করিয়া লইয়া যায়—ইসলাম স্বীয় প্রভাবের সময় পৃথিবীর উপর সেইরূপ হর্ষের মর্গে নিজের পদা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল—সর্কীয়, সর্কপ্রচলিত বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া উহা স্বীয় চরিতার্থতা ও পুষ্টি সাধন কারিয়াছিল,—সেই সকল উপাদানে ইসলামের বিকৃতি ঘটে নাই, তাহার বিরাট বেহ পুট হইয়াছিল মাত্র ।

ভারতীয় খ্রীশিক্ষা ।

মত বৈশাখমাসের ভারতীয়ে চীনপ্রবাসী খ্রীষ্ট কেদারনাথ বন্যোপাধ্যায় মুহাম্মদ ভারতীয়-খ্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ।

প্রবন্ধলেখক বলেন, আমাদের দেশে গৃহে গৃহে অনেক অনাথা হিন্দুসম্মী আছেন, তাহার সন্ত পুত্রকল্পা লইয়া অর্থাভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন । একপ উদা-

হরণ একটি টাইটি নদ, শত শত । ইহাদিগকে
তপস্বান্ শাক্ত দিহাছেন, ইচ্ছা দিহাছেন
কিন্তু সাংসারিক দ্বর্ষতি ও অভাব নিবারণের
জন্য সেই দক্ষিণ প্রয়োগ করিবার কোন
স্থিতি তাহারা সমাজ হইতে পান না ।
অর্থকরী শিক্ষা প্রদানই তাহাদিগের সম্ব-
ন্ধ ও সৌ বিকাশস্থানের একমাত্র উপায় ।
এককালে বলেন—পঞ্চাব, উত্তরপ্রদেশ
প্রভৃতি প্রদেশে উত্তরপ্রদেশী ব্রীলোকেরা
“সেলী মোটা পুতার মোজা বুনিয়া ও বাজারে
তাহা ভাঙ-মন্ড অম্বুসারে আট হইতে বার
পরমা জোড়া বিক্রয় করিয়া যে স্বাধীনভাবে
জীবিকা অর্জন করে তাহা শতবার প্রশংসনীয় ।”

একতঃ আমাদের মহিলাকুলের এইরূপ
অর্থকরী শিক্ষা একান্ত আবশ্যিক হইয়াছে ।
এ বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে চিন্তা করি-
বার সময় উপস্থিত ।

হিন্দুধর্মীয় ইতিপূর্বে সমাজে যে স্থানটি
ছিল, এখন আর তাহা নাই । যৌথ-পরিবারে
অনাধিনায়কের অন্তত দিনান্তে একমুঠি অন্ন
পাইবার স্থিতি ছিল, বিধবাগণ অনেক
সংসারেই প্রভু করিতেন । কোন কোন
স্থলে তাহারা মানারূপে নিষিদ্ধিত ও লাহিত
হইতেন বটে, কিন্তু নিকটসম্পর্কিত ব্যক্তিরা
তাহাদিগকে গণ্য রাখিয়াহে দিতেন না,—
বুদ্ধদেবেরা রক্ষণ ও উদ্বোধনের দ্বারা গৃহ-
ত্যাগিনী হইলে অধীরগণের নিকট অবস্থি
থাকিত না । যৌথ-পরিবার বীর বিশাল
পঞ্চপুট উন্মোচন করিয়া তত্ত্বমহিলাকুলকে
আশ্রয় দিয়াছে,—কোন কোন স্থলে সেই
আশ্রয় আরামজনক না হইলেও তাহার
উপর সর্বদা নির্ভর করা চলিত ।

এখন যৌথ-পরিবারের সেই আশ্রয়
অভীভূতের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে । এখন
অনেকসময় পুত্র মাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব
স্বীকার করে না, সন্তানদ্বয়গণ জীবিকার
জন্য স্রাস্তায়ে উপর নির্ভর করিতে
পারেন না । হিন্দু বিশাল পরিবার
এখন শুধু ভাণ্ডার নামে রক্ষাভরিত
হইতে বসিয়াছে । ঘরে ঘরে নিরাশ্রয় রক্ষণ-
কুলের দায়িত্ব অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে,
সেই সকল অনাধিনায়ক সাহায্য করিবার
কল্যাণ ভীত আশ্রয়, কথ্য উপস্থিত হইলে,
বীর বাহুর লব্ধা কর্দম বাহির করেন—সমাজও
তাহাদের চর্চানিবারণের কোন উপায়
উদ্ভাবন করেন নাই ।

জীবনসংগ্রামের এই বিধম দৃষ্টান্ত
অবলাগণের মধ্যে চাপাইলে তাহাদের নৈতিক
অযোগ্যতা অনিবার্য,—যুরোপ তাহার উৎ-
কট দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে । হিন্দু গৃহ যদি হিন্দু-
ধর্মকে রক্ষা না করে, তবে তাহারা কোথায়
বাইবে ? এ দেশে এই যে বঙ্গের-বঙ্গের
হতভাগিনীদের সংখ্যা দ্রুতবেগে পুষ্টিলাভ
করিতেছে—একজন কাহার দায়ী ?—হিন্দু-
সমাজের উদাসীনতা এখানে অসহনীয় ।

অর্থকরী শিক্ষার একটা বিধান
করিয়া মহিলাগণের জীবিকা-স্থানের উপায়
করিয়া দেওয়া এখন আশ্রয়ের সর্বপ্রধান
কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে । কি উপায়ে এই
শিক্ষা দেওয়া বাইতে পারে, তাহা
কিঞ্চিৎ । ইহার জন্য হুলস্থাপন করিলে
এখনকার রীতি অম্বুসারে দশবৎসর বয়সের
বেশিকাণ আর তাহারা বিদ্যালয়ে পড়িতে
পারিবে না,—একাদশ বর্ষ অব্যবহৃত

হইয়া তাহারা অন্তঃপুরের গভীরে প্রবেশ করিবে,—এই অঙ্গকানের মধ্যে তাহারা আর কি শিক্ষা লাভ করিব্যর সুযোগ পাইবে? বরং বিধবারা ঘরের বাহিরে কোন শিক্ষা লাভের সুযোগ পান না; —এ অবস্থার ইতি-কর্তব্য কি, নির্ধারণ করা কঠিন।

এবংলেখক বলেন, বিবাহের বয়সের যে নীমা আছে, তাহা আর স্ত্রীলোকের পক্ষে ঠিক রাখা চলে না। যৌবনে পদার্পণ না করিলে তাহাদের বিবাহ বাহাতে না হয়, একরূপ বিধান করা উচিত; অন্তত আট-দশ বৎসর তাহারা শিক্ষা করিতে পারে, একরূপ বন্দোবস্ত আবশ্যক; একটা শেখগরীকা ধাকা বরকার, বাহাতে উত্তীর্ণ হইলে তাহারা সমাজের কাছে বিশেষভাবে বরণীয়া হইতে পারে।

শ্রীশিক্ষার অঙ্গশীলন না হইলে আমাদের বালকবয়সের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না,—আমরা ঘুরোপীয়দের সঙ্গে মহত্ব বুদ্ধিমত্তা সবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিব না, শিশুশিক্ষার শিক্ষার পর আমাদেরকে প্রাইভেট-টিউটর-নামক যন্ত্রের উপর নিঃসহায়ভাবে নির্ভর করিতে হইবে। এই শ্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে এখন নানারূপ উদ্যোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—বালিকাদিগকে কোথাও অমর-কোষের দোকান, কোথাও বা ঘোড়ার পান কর্তার করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িক হস্ত-বিজ্ঞানের আগ্রহ-প্রসূত চেষ্টার মধ্যে পড়িয়া তাহারা যে বৎকিঞ্চিৎ বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেছে, তাহা কার্যত কোন উপকারেই আসিতেছে না,—বর্ণপ্রচারণার আগ্রহে শ্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে না—এবং

যে শিক্ষা এখনকার অতীব পূর্ণ করিয়া প্রকৃতরূপে গৃহিণী ও জননী গড়িয়া তুলিবে,—হৃদিনে হস্তে বল ও গৃহে আশ্রয় প্রদান করিবে—বাহাতে কল্যাণ ও এই দুয়ের সমাবেশে হিন্দুর গৃহ বরণ্য হইয়া উঠিবে, সেদিকে কোনরূপ চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের সমাজ বালিকাদিগকে খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন—অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ দিয়া সর্বপ্রকার দায় হইতে নিরস্তিতা করনা করেন, কিন্তু ধোখ-পরিবারের ছলভঙ্গ হইয়া পড়িবার এই যৌর হৃদিনে তাহাদের ভবিষ্যতের অল্প ভ্রমের চিন্তার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অর্থকরী শিল্পশিক্ষা অন্তঃপুরবাসিনীগণকে কি প্রণালীতে প্রদান করা যায়—তাহা বিবেচ্য। তাহাদের কোমলহৃদয়নির্মিত শিল্পপ্রবৃত্তি ব্যবহার করিয়া সম্পদের দিনে যেন স্বর্ণবর্ণ গৌরবাধিত হইতে পারেন—এবং হৃদিনে তাহাই যেন তাহাদের জীবিত-সংস্থানের উপায় করিয়া হিন্দুর পূর্ণকুটারের পবিত্রতা অক্ষুর রাখিতে পারে—সেইদিকে আমাদের অন্তঃপুরশিক্ষার উত্তম প্রসারিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

অবস্থাপন্ন লোকের গৃহেও স্ত্রীলোকের অল্প কতকগুলি কার্য অবশ্যবিহীন হওয়া উচিত। প্রাচীন অরপূর্ণদের মূল-কর্মণ যুগ হইতে বসিয়াছেন। এখন “রাধুনী বামুনী”র সংখ্যা বেঙ্গল প্রভৃতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই হারে খনীর গৃহে রমণীগণ উপভাস পড়িবার সুবিধা পাইতেছেন, সেবাদায় হইতে সম্পূর্ণ বিদ্যতা স্বকোমলবার

কেবলই নৃতন পাটাতনের ত্র্যাসংগেটের সকল করিতেছে—সপ্তের অন্তর খেন তাঁহাদের কোন কাৰ্য্যই নাই, তাঁহাদের কাৰ্য্যের গভী ক্রমশ স্তম্ভ হইয়া আসিতেছে, এখন তাঁহারা গৃহলোভবশত চিত্তপতলীর শ্রেণিতে আসিয়া ঝাঁড়াইয়াছেন ।

যুগোপের রমণীগণের কাৰ্য্যক্ষেত্র স্তম্ভ নহে, সামাজিক আন্দোলনের উপযোগিনী ক্রিয়ার অন্তর বাল্যকাল হইতে তাহাদের প্রকলাপা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় । আমাদের রমণীগণের অন্তর কৰ্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে—তাহা হইতে তাহাদের মুক্তি নাই, কৃত্রিম মুক্তি ভাবী দৃশ্যের পূর্বাভাস দিতেছে মাত্র । প্রাচীন ধারণা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু পূর্বাভাসের স্থলে সামাজিক অভাবের অসুস্থ নব আশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া ঝাঁড়াইয়াছে ।

শ্রীলোকগণ রাজদ্বারে বা মার্চেন্ট-আফিসে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অর্থ-অর্থনের চেষ্টা পাইবেন, এই উৎকট কল্পনা প্রাচ্যগণের অসহনীয় । সাম্যবাদের নামে শ্রীলোকদিগকে কঠোর জীবনসংগ্রামে উপস্থিত করা অতি অশোভন—তাঁহাদের গণকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সাহায্য কিছু কল্পনা করা যায় না । তাঁহারা অন্তঃপুরে বাস করিয়া যে সকল শিল্পচর্চার দ্বারা সাধুভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারেন, তাহাই শিক্ষা দৈর্ঘ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক । প্রাচীনগণ স্তম্ভ কাটিয়া, স্থলবিশেষে

কাপড়ের উপর রেশমী ছল ও নানাকর্ণ বিচিত্র কারুকার্য সম্পাদন করিয়া পূর্বে অথোপার্জন করিতেন । ভারতীয় প্রকৃতির কোন কোন তত্ত্বপরিবারের মহিলাদের প্রতি ছলের মালা গাথিয়া জীবিকা অর্জন করিবার চেষ্টা উদ্ভেদ করিয়াছেন । শ্রীলোকগণের অনেকসময় হাতে কোন কাজ থাকে না । অবসরকালে যদি নিয়মিতভাবে তাঁহারা ক্রোনক্রপ অর্থকরী শিল্পচর্চা করেন, তবে বহুপরিবারের নানাতরপ অভাবঘোচন হইতে পারে;—অনেকস্থলে অর্ধকৃত শিশুগুলি ভাল থাকিবে। ছটপুট হইতে পারে—অনেক স্থলে পিতা কিংবা স্বামীর দৃষ্টিভ্রান্তিক্রমে লগাট প্রসন্নতার আভা ধারণ করিতে পারে । গৃহলক্ষীগণ এই কাজ কত আন্তরিকতার সহিত সম্পাদন করিবেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি । তাঁহাদের জগতের পবিত্র মেঘ এই সকল উত্তমে তাঁহাদের কোমল বাহকে অধাবসার শিখাইবে । তাঁহাদের রতন-কাঁচা বে বস্ত্র ও আগ্রহ দেখা যায়, তাহার তুলনা নাই,—কারণ তাহা গভীরমেহ-প্রণোদিত । সেই জগতের ঐকান্তিকতার সঙ্গেই শিল্প তাঁহাদের হস্তে উন্নতিলাভ করিবে । তাঁহাদের কঠোর একশেষ বেবিদ্যাও যদি সমাজ কোন প্রতিকারের চেষ্টা না পান, সুবোগ থাকিলে সে সুবোগবধি তাঁহাদিগকে না যেন, তবে হে শরণ, গৃহবর্জিত গৃহলক্ষীগণ তোমাকে আশ্রয় করিবার পূর্বে যেন হিন্দুসমাজের অভিধ না থাকে ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

মাধবী ।

স্মারন্তিগ আবাহন অর্ঘ্যতার বহিরা অটবী

“মাধবি! মাধবি!”

গৃহপদসঙ্করণে সচকিত করি মন হিয়া

এস তুমি প্রিয়া

বিরহী এ বনতল তোমা’ লাগি’ ব্যাকুলহৃদয়

চাছে বিশ্বময় ।

২

জাগাও চরলপাতে ধরণীর স্তম্ভ হিয়াখানি

সকীবতা আনি’

সহসা জাগিয়া উঠি’ মরমে সে র’বে মূরছিয়া

তোমায়ে হেরিয়া

বকুলবাগিত তার অঙ্গে তব নব বাসখানি

দিয়ে তুমি টানি’ ।

৩

বর্ষণের হর্ষে তার স্তম্ভঃখ উঠিবে কাঁপিয়া

তোমায়ে হেরিয়া

বৃথিকার রক্ত বহি’ বাহিরিবে নিখাসে ভাহার

মুক্ত ছদ্মভার

স্বাপত্ত প্রধাবে তোমা’ উদয়-অচলৈ নব-রাধি—

“মাধবি! মাধবি!”

৪

নবগীতি সঙ্কারূপ গগনের তারকাসভায়

পূজিবে তোমার

শিকবধু নিদ্রাজড় নিশীথের ধনি’ কণ্ঠহার

তুলিবে স্বকার

গাহিবে ধরণীতলে তব রূপে বিমোহিত কাব’

“মাধবি মাধবি!”

অশোককাননমাঝে প্রবেশিবে বহি অর্থাভালা

বিরহিণী বালা

একান্তে ডাকিবে তোমা' প্রেমে বিদ্ধ মুগ্ধ সুখজ্জ্বলি

কোথায় মাধবি

নহ আসি পুষ্পবনে অবতরি' প্রেমবিধুরার

পূজা-অর্ঘ্যভার ।

৬

আকুল আস্থান তুলি মর্ষরিধা উঠিবে হলর

সারাবিশ্বময়

অকস্মাৎ শান্তচিত্ত হৃদ্ধ হ'য়ে চাহিবে নিশ্বাসি'

কার সুধাহাসি

হৃৎ বোড়শীর বকে গোপনে করিবে আনানোনা

অপূর্ণ বেদনা ।

৭

সহসা গভীর কণ্ঠে ধ্বনি' মুহ বজ্রসম হাঁক

আসিবে বৈশাখ

ছুটিবে কালাঘনিধি পিঙ্গল নগন হ'তে তার

দহিয়া সংসার

হায় ওই কান্তিটুকু মিশাইবে নিমেষের ভরে

সে বহ্নিভিতরে ।

৮

ভরিয়া উঠিবে বিশ্ব বিরহের আকুল নিশ্বনে

বিলপি' সঘনে

রহিয়া রহিয়া কাঁদি' কিরে ঘাবে দখিনের বার

"কোথায় কোথায় !"

চন্দ্রদীপ্ত বনতলে সহসা কাঁদিবে শিকবধু

"কোথা জুঁহি যধু !"

৯

অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে গাহিয়া উঠিবে মুগ্ধ করি...

"কোথায় মাধবি ?"

সকলকে বহুবিধা উঠিবে সে ব্যর্থ বনজবি—

“মাধবি, মাধবি ।”

ডাকিবে নিবাস কেনি’ সেদিনের অত্যাচলে রবি—

“মাধবি মাধবি ।”

ঈশ্বরেশ্বরীয় তত্ত্বাচার্য ।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ।

হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত সমস্ত দর্শনের উদ্দেশ্যই যোক্ষ । বাহ্যতে জীবের হুঃখনিবৃত্তি হইয়া অখণ্ডিক হুঃ, তাহা উপদেশ করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয় । জীবের যত-প্রকার হুঃখ আছে, তন্মধ্যে জন্ম-মরণ-মরণের চিরপ্রবাহ “আত্মাত্মিক-হুঃখ” নামে কথিত হয় । শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহা অনেকাংশে এবং সুদীর্ঘকালের নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে,—অন্তঃ-পত্তির পরিবর্তে তত্ত্বগতি হইতে পারে । কিন্তু সেই তত্ত্বসম্প্রদায়ের ক্ষয় আছে । ভোগান্তে এই পৃথিবীতে বা অন্তলোকে পুনর্জন্ম আছে—পুনর্মৃত্যু আছে । এইরূপে জন্মের পর জন্ম,—বহুলক্লেশময় জীবন এবং মৃত্যুর যোক্ত ধামিবে না । একমাত্র ষাণ্মজ্ঞানই ঐ আত্মাত্মিক-হুঃখের নিঃশেষ-বিনাশদীপ-রূপে উক্ত হইয়াছে । তাহারই নাম কৈবল্য, মুক্তি, অপবর্গ বা যোক্ষ । বেদাঙ্গ-ব্যয়িরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রহান অকলমনে তাহাতে যথাক্রমকারী মানবগণকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত দর্শনশাস্ত্রের উদয় । এই

সকল মহাশাস্ত্র,—বেদ, উপনিষৎ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভের চক্ষুরূপ এবং শাস্ত্র-বিহিত স্বরস্রুপ আয়ত্তানালোক বেধাইবার গুরুস্বরূপ ।

কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষই এখন বিঘ্নে উন্নত । জীবের অস্তিম মহামোক্ষ লক্ষ্য করিয়া কেহ সে সমস্তের আলোচনা করেন না । কিন্তু স্মৃতিতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরিভাষার বিচার, তর্ক, মুক্তি প্রকৃতি, বাহ্য দর্শনের অবাস্তব শিক্ষা এবং যোক্ষাধিকারে বাহ্য সমূলে পরিভাষ্য ও পুরী-ভূত কইরাছে, তাহাই বনুসমাজে এখন আদ্যবর্তী । কেন না, সে সব তত্ত্ব সামাজিক বিচার সম্বন্ধস্বরূপ এবং ছাত্রগণের মুক্তিকে, তীক্ষ্ণ করিবার উপায়বিশেষ ।

এ অবস্থার আমার বিবেচনার দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা বৃথা । কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শাস্ত্রের আলোচনার সুখাকল লাভ হয় না । কেবল অবিজ্ঞা, তর্ক ও কলহ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে । তথাপি লক্ষ্যধারণে যতদূর সম্ভবে, যত শ্রম কর্তব্য ।

ভারতবর্ষীয়, দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ছয়-
খানিমাত্র প্রধান । অর্থাৎ ঐহিক, দুই
সাংখ্য ও দুই মীমাংসা । মহর্ষি পৌতকের
ঐহিক ভাষ্যদর্শন এবং মহর্ষি কপিলের ঐহিক
বৈশেষিকদর্শন, এই উভয়ই ভাষ্যশাস্ত্র নামে
প্রসিদ্ধ । মহর্ষি কপিলের প্রকাশিত সাংখ্য-
দর্শন এবং মহর্ষি পতঞ্জলির রূপ যোগদর্শন
সাধারণত সাংখ্যানামে কথিত হয় । উহার
প্রথমটিতে ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ার তাহার
নাম নিরীশ্বর-সাংখ্য এবং দ্বিতীয়টিতে ঈশ্বর
স্বীকৃত হওয়ার তাহার নাম দেবদর্শন-সাংখ্য ।
মহর্ষি জৈমিনির রূপ মীমাংসা কর্তৃমীমাংসা
নামে খ্যাত, তাহাতে বেদের কর্তৃকাত্তর
প্রতির বিচার আছে । আর মহর্ষি ব্যাসদেবের
রূপ মীমাংসা ব্রহ্মমীমাংসা বলিয়া উক্ত হয়,
তাহাতে বেদের জ্ঞানকাত্তর প্রতির বিচার
আছে । এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র বহুদর্শন
নামে প্রসিদ্ধ । নবদীপ, কানী, মহারাষ্ট্র,
মিথিলা প্রভৃতি স্থানে এই সমস্তের অধ্যয়ন-
অধ্যাপনা হইয়া থাকে । এবং এখনও এই
সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের বিস্তার রূপ বহু অধ্যাপক
ও বিদ্যার্জি বৃষ্ট হইয়া থাকেন ।

এই সকল দর্শন, সমস্তই বেদমূলক ।
তাহা হুতোশীর দর্শনমধুহের ভাষ্য প্রকার-
দিলের স্ব স্ব মত নহে । বেদের মধ্যে সৃষ্টি,
প্রলয়, প্রকৃতি, অদৃষ্ট, কর্ম, পরমাত্ম, ব্রহ্ম,
মোক, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল বিচারবোধ্য
অবস্থার আছে, এত এক দর্শনে তাহার
পরস্পরাধিষ্ঠিত অবস্থাসকল বিস্তারপ্রাপ্ত
হইয়াছে । তত্ত্বিত, দর্শনকারগণ সকলেই
একবাক্যে বেদবিহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি
দ্বয়কে নাস্ত করিয়াছেন । তাহা লজ্জন

করিয়া কোন দর্শনকার পুণ্য-মর্ত্যনা ও
উপাসনা সম্বন্ধে কোনরূপ মতিনব সম্প্রদায়
সংস্থাপন করেন নাই । ভাষ্যবৈশেষিক এক
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন । কিন্তু সে ঈশ্বরের
কোন স্বতন্ত্র উপাসনা প্রবর্তিত হয় নাই ।
তাহার কারণ এই যে, নৈমিত্তিকগণ সকল হিন্দু-
ধর্মাবলম্বীর সহ সমভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
মহাদেবী প্রভৃতিতে উক্ত ঈশ্বরগণে মানিয়া
বেদাগমবিহিতরূপে তাহাদের পূজা করিয়া
থাকেন । বাহ্যারা দেবদর্শন-সাংখ্য অর্থাৎ
যোগদর্শনের পণ্ডিত, তাহারাও এক ঈশ্বর
মানেন, কিন্তু তাহাদেরও উপাসনার স্বতন্ত্র
সম্প্রদায় নাই । অতএব উপরি-উক্ত-রূপে
একমাত্র ঈশ্বরে অধিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও
মহাশক্তিগণের পূজা করিয়া থাকেন । নিরী-
শ্বর-সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না ; এক অচেতন
জড়প্রকৃতি মানেন এবং প্রকৃতির বন্ধন
হইতে আত্মার মোক্ষ বাহ্যতে হয়, তাহার
উপদেশ দেন । কিন্তু তাই বলিয়া তিনি
কোন নিরীশ্বর সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই ;
এবং প্রকৃতি হইতে আত্মার স্বাভাবিকসম্বন্ধে
জ্ঞানসাধন করা উচিত বলিয়াও, বেদবিহিত
ক্রিয়া ত্যাগ করিতে বলেন নাই । বরং
পঞ্চাশতের ঐ সকল দেবদেবীর উদ্দেশে শাস্ত্র-
বিহিত কর্মকাণ্ডের অবশ্যকর্তব্যতার উপ-
দেশ করিয়াছেন । সাংখ্যশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা
এথাৎকাল তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতে-
ছেন । কর্তৃমীমাংসার তো কথাই নাই ।
কেননা, তাহারই মতে সমস্ত দানবজাতি চলিয়া
আসিতেছে । তিনি স্পষ্টবাক্যে ঈশ্বর
স্বীকার না করিলেও, দেবতাদের চৈতন্য ও
পতীর অধীকার করিলেও, ক্রিয়ার প্রধান

যদি যে মন্ত্ৰ, তাহার চৈতন্য মানার, যজ্ঞাধুষ্ঠান-
কালের নিমিত্ত, দেবতার সার্বভৌম ও
ঐশ্বর্য মানিয়াছেন। বেদান্ত একমাত্র
পরমাত্মস্বরূপ সাক্ষীগোপীপুত্র ব্রহ্মচৈতন্য
স্বীকার করেন এবং এই সিদ্ধান্তব্যক্তি
বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে সৰ্বতোভাবে
অবিদ্যানিবৃত্তি হয়। ইহার তাৎপৰ্য্য এই
যে, স্বীকার্য্যের তাঁহাতে আত্মজ্ঞান করিলে,
দেহাদির সমস্তগুণ সাক্ষীগোপীপুত্র ব্রহ্ম
অনাময় ব্রহ্মপদলাভ হয়। এইপ্রকার
জ্ঞানেই মোক্ষস্থাপন করিয়া এবং মোক্ষাভি-
লাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে দেহাদি-উপাধি-পূত্র
উপনিষদ্রূপ পরমাত্মজ্ঞানের অহঙ্কারণ করার
কর্তব্যতা উপদেশ করিয়াও, ব্রহ্মার্পণমন্ত্রে
অথবা লোকশিক্ষার্থে আশ্রমবিহিত নিত্য-
নৈমিত্তিকাবি সমস্ত কথ্য ও যজ্ঞোৎসবাবি
অহঙ্কারণের বিধি দিয়াছেন। মোক্ষাভিলাষী
ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ কর্তব্যতা উপদেশ
করিয়া আত্মপ্রত্যক্ষ অসমর্থ ব্যক্তিগণের
পক্ষে কথ্যকলাভের নিমিত্ত বিধিবিহিত
ধর্মক্ৰিয়া পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

তাহা, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাণ্ডুল
এবং কণ্ঠসীমাংসা, এই পাঁচখানি মতের
মতে তাঁহাদের স্বয়ংসাক্ষ্যাদিত্য-লক্ষণাক্রান্ত
কোন নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসনা
পাওয়া যায় না। এখানে বলিয়া রাখা
উচিত যে, যদ্বিধি কপিলের মতে যে, কোনরূপ
নিরাকার ঈশ্বর বা অবতীর্ণ ঈশ্বর নাই, এমন
নহে। সে কথা পরে বলিব। বেদান্ত-
মতেও ব্রহ্মের ব্যক্তিব্যবহিত মাত্মোপ-
হিত উপাধিক আবির্ভাববিশেষ ঈশ্বর-
নামে কথিত হন। তাঁহার নানা সংজ্ঞা

সাধে। কিন্তু উপাসনার, অধিকারে এই
ভারতবর্ষে একা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-রূপেই তাঁহার
বেদবিহিত অর্চনা হইয়া থাকে। তন্নিয়
বস্তুরূপে তাঁহার পূজার কোন নিয়ম নাই।
বেদান্তের নানাসংজ্ঞিত উক্ত ঈশ্বরোপাধি-
সকল পরব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন বটে এবং
সেইসকল তাঁহাদের বেদবিহিত অর্চনা সম্বন্ধ-
ব্রহ্মোপাসনারূপে উক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা
ঈশ্বরার্চনা চিত্তগুণজনক কর্ণযোগ মাত্র।

উপনিষৎ হইতেই ব্রহ্মোপাসনার
উদ্ভব। বেদান্তদর্শনে তাহার নানা বিভাগ
ও বিচার আছে। কলত, সম্বন্ধ-ব্রহ্মোপা-
সনাই উক্ত-নিয়ম নানা বিভাগে বিভক্ত।
তন্মধ্যে বাহ্য উক্ত, তাহা সাবলম্ব হইলেও
আত্মজ্ঞানে অধিকতর বুদ্ধ এবং আত্মজ্ঞানের
সোপান। বাহ্য নিঃসং-ব্রহ্মোপাসনা, তাহা
নিবলম্ব এবং কেবল আত্মজ্ঞানের অহঙ্কারণ-
মাত্র বলিলেও হয়। সে কথা পরে বলি হইবে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তিপাদক ক্রতিবেদান্তাদিত্য পাঠ ও
আলোচনাব্যাহার তাঁহার সাধন। ইহার মধ্যে
কোনটিই সম্ভাব্যলক্ষণাক্রান্তধর্মকর্ম নহে।
শাক্ত, বৈক্য, শৈব প্রভৃতি হিন্দু-উপাসিক-
সম্প্রদায় যে কোন ব্যক্তির, শাস্ত্রবিহিত
আত্মজ্ঞান উপাধানে ইচ্ছা করে, তিনি যাহা
কুলপরম্পরাগত আশ্রমধর্মের ব্যক্তির। তাহা
সাধন করিতে পারেন। তাহা মতান্তর
পক্ষে আশ্রমধর্মের অহঙ্কারণ কর্ণযোগ বা
লোকশিক্ষার পরিণত হয়। তাহা শাস্ত্র-
সিদ্ধ। আত্মজ্ঞানের অহঙ্কারণ নহে, অথবা
আত্মবিভাগে সংযুক্ত নহে, অথবা সমাধি-
যোগ বা ব্রহ্মোচ্ছিন্ন কর্ণযোগ নহে, এমন-
ভাবে বহিঃক-ঈশ্বরোপাসনা বেদান্তমতে

দৃষ্ট হয় না। সাংখ্য ও জ্ঞানের অস্ত্র-
মোক্ষের এই আশ্রয়। কেহ বা ব্রহ্মকে
আশ্রয়ে গ্রহণ করেন, কেহ বা আত্মাকেই
কৈবল্যরূপে গ্রহণ করেন, এইমাত্র প্রভেদ।
কেহ বা একমাত্র পরমাত্মাকে সকল আশ্রয়
নিরূপাধিক। কৈবল্যরূপে গ্রহণ করেন,
কেহ বা প্রত্যেক আশ্রয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিরূ-
পাধিক মান্য বোধ্যবস্থার সমস্তই বেন
নিরূপাধিক। অনির্কটনীর একত্ব লাভ করে,
এইমাত্র প্রভেদ। নতুবা সংসারাবস্থার,
সকলের মতেই, প্রতিদেহে ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-
বৃত্ত আত্মা পৃথক পৃথক। বোধ্যবস্থায়
আত্মজ্ঞান ও তদবিরোধে সম্যক্ আশ্রয়বিহিত
আচার উচ্ছদিকে; এবং সংসারাবস্থায়
বিবিধবিধিত জিলীবিদ্যাসংকট আশ্রয়বর্জিত
অহুতান নিরতাপে; এই উভয়প্রকার
অহুতান ব্যতীত অন্য ঈশ্বরোপাসনার উপ-
দেশ দৃষ্ট হয় না। তাহাতে সাংখ্য ও কর্ম-
বীমাঙ্গার ঈশ্বর না মানার কোন কতি হয়
নাই। বেদান্ত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়া
সকল কৃতির পূরণ করিয়াছেন।

সর্গবিদগ্ধসম্বন্ধে প্রধান প্রধান দর্শন-
কারবিশেষের অহীনভেদ, ইহার পর ক্রমে
বিবৃত হইবে। 'সর্গ'শব্দে 'সৃষ্টি'। জড় ও
কৈবল্যিক দর্শনে পরমপুণ্ড্র উপাসনাকারণ,
ঈশ্বরকে 'নির্বিদ্যাকারণ এবং জীবের অদৃষ্ট' বা
দায়ীকে 'সংকারিণী' 'সৃষ্টিশক্তি' ধরিয়া সর্গ-
রস্ত করিয়াছেন। পরমাপুণ্ড্র সাংখ্যের
পঞ্চভূতাত্মহানীর; ঈশ্বর বেদান্তের সর্বো-
বর, হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মার হৃদয় এবং মাতা
অবিদ্যাহানীর। সাংখ্যদর্শন পঞ্চভূত বা
পরমাপুণ্ড্র প্রপিতামহী 'মহামাতা'রূপিত

প্রকৃতিস্বরূপ সৃষ্টির মূল উপাসনাকারণ, পুরুষ
অর্থাৎ জীবকে নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতির
সমনা সৃষ্টিবিশেষ কৈবল্যিক-জ্ঞানাদিকর্ম ও
অবিবেকতাকে সহকারিকারণ ধরিয়া সর্গ-
রস্ত করিয়াছেন। প্রকৃতি বেদান্তের মানী-
হানীর, পুরুষ আশ্রয় হানীর, এবং কর্ম
অবিদ্যাহানীর। কর্মমীমাংসা জীবের
অনাদি কর্মবুল ধরিয়া সৃষ্টির অনাদি
মানিয়াছেন। সেজন্য নিমিত্তকারণরূপ
স্বতন্ত্র এক ঈশ্বরের অসম্মানোপভোগ বা অব-
তারণীর প্রয়োজন হয় নাই। অতএব তথ্য
জীবই নিমিত্তকারণ। বেদান্ত ব্রহ্মরূপ
উচ্ছদ হইতে চিরপ্রবৃত্তবৃত্তাব দৃষ্টভূতরূপ
সংসারের সর্গারস্ত করিয়াছেন। তাহার শক্তিই
উপাসন, নিমিত্ত, সহকারী প্রকৃতি সর্বপ্রকার
কারণের একমাত্র অনির্কটনীর বীজ। প্রকৃতি
তাঁহারই শক্তি। সর্বজীবের তিনি পরমাত্ম।
মোক্ষরূপে তিনি পরমাত্মা; এবং সকল
ঈশ্বরোপাধির তিনিই আশ্রয়।

সর্গ-বিসর্গসম্বন্ধে প্রধান প্রধান দর্শনের
মত এখন ক্রমে নিবেদন করিব। ফলে,
আমি ভাববৈশেষিকের পদার্থবিচার, সাংখ্যের
তত্ত্বশ্রেণীর বিচার, বীমাঙ্গার প্রতিবৃদ্ধি-
বিচার এবং বেদান্তের পরিত্যাবিচার
সম্বন্ধে কিছু বলিব না। সে সব বিদ্যা
হস্তক্ষেপ করা আমার ভায় বিদ্যকর্মী
ব্যক্তির সাধ্যাত্ত নহে; বিশেষত সে সর্ব-
তর্কীহুমানভাৱ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে ভাৱ্যক্রান্ত
করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঈশ্বর, কর্মকাত্ত,
উপাসনা, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান এবং আত্ম-
জ্ঞানের অন্তরায়রূপ কর্ম, অদৃষ্ট, মাতা,
অবিদ্যা বা অজ্ঞান—এই সব তত্ত্বসম্বন্ধে

প্রধান প্রধান দর্শনের অতঃপর পরিচয় আলো-
চনা করা আমার উদ্দেশ্য। কেন না, আমি
বিবেচনা করি যে, এই বর্তমান সময়ের বিভিন্ন
মুক্তিপারায়ণ উপাসকবৃন্দ এবং কৃতবিদ্যা
দীক্ষানু মহাপ্রদীপের জন্য উচিত যে, এসকল

দর্শনশাস্ত্রের কোন নতুন সহ তাঁহাদের মত-
সকলের ঐক্য আছে কি না। আমার বক্ষ্য-
মাণ সংক্ষেপবিবরণ হইতে ঐ উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ
পরিমাণে সফল হইলে সুখের বিষয় হইবে।
অতএব আমি তৎসমস্ত প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইব।
শ্রীচন্দ্রশেখর বসু ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

অপূর্ণকাহিনী—উপভাস। শ্রীরাধানাথ
বিশ্ব একাদশক। মূল্য ১ এক টাকা।

‘কতেননা আভ্যেব’ নামক একখানি উর্দু
উপভাস অবলম্বনে ইহা লিখিত। আমাদের
মনে হয় যে, কীরবোপভাস, পারভোপভাস,
তুরকোপভাস, হাতেমতাই, চাগার দরবেশ
প্রভৃতির পর এই উপভাস রচিত হইবার
কিছুমান প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন
থাক্ আর নাই থাক্, যে মনে করে আমি
লিখিতে জানি, সেও লিখিতে ছাড়ি না।
মূল প্রকারের পক্ষে বোধ করি ইহাই সর্বো-
পেক্ষা উৎকৃষ্ট কৈফিয়ৎ।

গ্রন্থের নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা
অপূর্ণই বটে! ইহাতে বাদশাহজাদা ও
বাদশাহজাদি আছে, তাহাদের মিলন আছে,
বিচ্ছেদ আছে, এবং এ প্রেমীর উপভাসিক-
বিশেষ নিরুদ্বাহসারে তাহাদের পুনর্মিলন
অবশ্যই আছে; ভাষাতত্ত্ব গৈভা আছে,
দাসব আছে, ঐন্দ্রজালিক আছে, এবং যাহা

ইন্দ্রজালের বৈশ্ববুদ্ধি আছে। স্বতন্ত্রাৎ
বলা যায় যে, এরূপ উপভাসে বাহা-কিছু থাকি
আবশ্যক, সে সকলই আছে। সবই আছে,
তবু হৃষ্ঠাগাবনত বলিতে হইতেছে যে,
সাহিত্যিক নিপুণতা ইহাতে কিছুমান নাই।
তবে রাধানাগবাবু তাহার ক্ষমতা নষ্ট করেন—
তিনি অসুবাদকমান। তাহার ভাষা সরল,
প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক! কিন্তু মূল কল্পনার
ভাবে ক্রটি, ভাষার লালিত্যে শোধরাইবার
নহে। যে স্বভাবত কুৎসিত, অলঙ্কার
পরিণে তাহাকে আরও কুৎসিত বোঝায়,
এইরূপ আমাদের ভাষণ। তবে ইহা
অসুত গল্প পড়িতে ভালবাসেন, এই উপভাস-
খানি তাহাদের ভাল লাগিতে পারে।

ভাষা-প্রবন্ধ।—শ্রীককহরি ভট্টা-
চার্য প্রণীত। মূল্য ১০ চারি আনা।

ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভালকদিগের বাহাতে
নীতিশিক্ষা হয়, এই উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি
রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সুখ-

শিক হইয়াছে। গ্রন্থের কচি. নাতি ও ভাষা, শকলই ভাল; তবে আমাদের বোধ হচ্চে, বাণকদিগের এক পুত্রকের ভাষা আরও সরল হইলে আরও ভাল হইত। পুত্রক-খানি ধ্বংস হইয়াছে, তাহাতে ইহা 'বোধোদয়ের' পরে এবং 'পীতার বনবাসের' পূর্বে পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিভাগ-লয়ের পাঠ্যপুস্তকের যে নূতন ও অদ্রুত ব্যবস্থা বিভাগিগণেরা করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অবশ্যই বিভাগলয়ের (৭) পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইবে না। কিন্তু বাণকদিগকে ইহা ঘরে পড়াইলেও তাহাদের ভাবাশিকার অক্ষুণ্ণ হইবে, এইরূপ আমাদের ধারণা।

History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full Report of The Nil Durpan Case, Compiled by Lalit Chandra Mitra, M. A. Price Rs. 2.

বাঙ্গলা মাসিকপত্রে ইংরেজি পুত্রকের সমালোচনা হওয়া সম্ভব কি না, এই ভাবিয়া আমরা একটু ইতস্তত করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গলা সাময়িক পত্র বাহারা পড়িয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যখন ইংরেজি জানেন, তখন ইহা অসম্ভবই বা হইবে কেন। বিশেষত 'বঙ্গবর্ননের' পক্ষে ইহার সাবেক নজির আছে।

এই ইতিহাসের সমালোচক শ্রীমান ললিতচন্দ্র মিত্র, ৬ দীনবন্ধু মিত্রের আত্মজ-প্রতিভাশালী পিতার উপযুক্ত পুত্র। এই পুস্তক যে কেবলমাত্র প্রচুত পরিচয় ও আন্তরিক চরিত্রের পরিচয়স্বরূপ, এরূপ নহে,

ইহা পিতৃভক্তিগুণ ও নিদর্শন। সেই ভক্তিই বোধ হয় এই আন্তরিকতার মূল কারণ।

নীলটা আমাদের দেশেরই জিনিষ। আমাদের দেশের নামাঙ্কনায়েই প্রাচীন ইউরোপে ইহার নামকরণ হইয়াছিল—ইন্ডিকাম্ (Indicum)। ইংরেজি কথাটা এই কথারই রূপান্তর। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নীলই ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যবস্তু ছিল। পশ্চিম ইন্ডিয়া উৎকৃষ্টতর নীল হয় বলিয়া একবার তাহারাই এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন; কিন্তু কিছুকাল পরে আবার অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বারলফ টাকার কতিপয় হইয়া তাহারাই এই ব্যবসায় তাহাদের চাকর ও আশ্রিতদিগকে ছাড়িয়া দেন। সেই অবধিই অত্যাচারের আরম্ভ, এবং তাহা ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া শেষে এমন পৈশাচিকতাও উদ্ভূত হইল যে, এ দেশের অভিনায়ে নিরীহ, প্রায় সর্বসমূহ, কৃষিকারীরাও আর সহ্য করিতে পারিল না। এই অবস্থায় বাহা বাহা ঘটনা ছিল, তাহাই 'নীলবিদ্রোহ' বলিয়া পরিচিত। সেই বিদ্রোহের আমূল ও বিস্তারিত বিবরণ অতি বিপদভাবে ও দক্ষতার সহিত এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ শ্রীতিলাভ করিয়াছি। লং-সাহেবের বোকাধমার সম্পূর্ণ বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাহারা ইংরেজি জানেন, তাহারাই এই পুস্তক একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে নীলবিদ্রোহের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই জানিতে পারিবেন। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল।

শ্রীচন্দ্রশেখর মথোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৩৬

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, “তাঁহ, আজ কি
তোমার শরীর ভাল নাহি? মাথা ধরিয়াছে?”

কমলা কহিল, “না। পুড়ামশায়কে
দেখিতেছি না কেন?”

শৈল কহিল, “ইপুণে বড়দিনের ছুটি
আছে—দিকি দেখিবার জন্ত মা তাঁহাকে
এসাহাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছেন—কিছুদিন
হইতে দিদির শরীর ভাল নাহি।”

কমলা কহিল—“তিনি কবে ফিরিবেন?”

শৈল। তাঁর ফিরিতে অন্তত দুপা-
খানেকের দেরি হইবার কথা। কেন ভাই,
তাঁর কাছে কি তোমার কোনো দরকার
আছে?

ঠিক কি দরকার, তাহা কমলার পক্ষে
বলা শক্ত, কিন্তু পুড়ার জন্ত তাহার মনের
মধ্যে একটা ব্যাকুলতাবোধ হইতেছে। এক
মুহূর্তের মধ্যে কমলা নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়
অনুভব করিয়া একটা নির্ভরের জন্ত ব্যগ্র
হইয়া উঠিয়াছে। কি করিবে, কি হইবে,
তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া উঠিবার এখনো
সময় পায় নাই, কেবল ত্রস্ত হৃদয় ভিতরে-
ভিতরে একটা-কিছু পুড়িয়া বেড়াইতেছে।

শৈল কহিল, “তোমাদের বাঙা-সাজানো

এতদূর পূরি সমুদ্রদিন বড় বেশি পরিণাম কর.

আজ তোমাকে বড় খাড়াপ দেখাইতেছে।

আজ সকাল-সকাল খাইয়া শুইতে বাও!”

শৈলকে কমলা যদি সকল কথা বলিতে
পারিত, তবে বাঁচিয়া নাই—কিন্তু বলিবার
কথা নথ। “বাহাকে এতকাল আমার স্বামী
বলিয়া জানিতাম, সেজ্ঞামার স্বামী নয়,”
এ কথা আর বাহাকে ধোঁক, শৈলকে কোনো-
মতেই বলা যায় না।

কমলা শোবার ঘরে আসিয়া যার বক
করিয়া প্রদীপের আলোকে আর একবার
রমেশের সেই চিঠি নইয়া বসিল। চিঠি
যাহাকে উন্মেষ করিয়া লেখা হইতেছে, তাহার
নাম নাই, ঠিকানা নাই—কিন্তু সে যে স্ত্রী-
লোক এবং রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহের
প্রস্তাব হইয়াছিল। ও কমলাকে লইয়াই
তাহার সঙ্গে মরণ ভাঙিয়া গেছে, তাহা চিঠি
হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। বাহাকে চিঠি
লিখিতেছে, রমেশ যে তাহাকেই সমস্ত স্বপ্ন
দিয়া ভাগবাসে এবং দৈবদর্শিনীকে কোথা
হইতে কমলা তাহার বাড়ির উপর আসিয়া
পড়াতেই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া এই
ভাগবাসের বন্ধন সে অগত্যা চিরকালের মত
ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ কথাও চিঠিতে
গোপন নাই।

দেখি নন্দার ঘরে রমেশের সহিত প্রথম

মিলন হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই গাঙ্গিপুরে আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ভক্তি কমলা মনে মনে স্মারিত করিয়া লইল। বাহা সম্পষ্ট ছিল, সমস্ত স্মৃতি হইল।

রুমেন যখন বরাবর তাহাকে পনের ত্রা বলিয়া জানিতেছে এবং ভাবিয়া অস্থির হইতেছে যে, তাহাকে লইয়া কি করিবে, তখন যে কমলা নিশ্চিন্তমনে তাহাকে বামী জানিয়া অস্বস্তিতে তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী বরকদার সম্পর্ক পাতাইতে বসিতেছে, ইহার লক্ষ্য কমলাকে বরাবর করিয়া তত্ত্বপূর্ণে বিবিশিতে থাকিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল! এ প্রজ্ঞা তাহার জীবনে একেবারে মাথা হইয়া গেছে—ইহা হইতে কিছুতেই আর তাহার উদ্ধার নাই!

এখন কমলা কি করিবে? আজও শৈল তাহার প্রাণের বন্ধু, আজও গুড়ার গৃহে তাহার পরম সমাদর, আজও তাহার লক্ষ্য বাংলাঘর ভাড়া লইয়া গৃহসজ্জা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু এ সমস্তই যে একটিমাত্র লক্ষ্যকর মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত—সেই মিথ্যাটুকু সত্যিয়া করিলেই মুহূর্ত্তপরেই সমস্ত লক্ষ্যসংসারে কমলার একেবারেই ক্ষয় বন্ধ নাই, আশ্রয় নাই, আশ্রয় নাই! কমলা কি করিবে!

কলকাতার দরজা খুলিয়া-কেনিয়া কমলা বিচ্ছিন্ন বাগানে, বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার শৈতবের রাতি—কালো আকাশ কালো পাথরের মত কনকনে ঠাণ্ডা। কোথাও বাষ্পের লেশ নাই; তারাগুলি সম্পষ্ট প্রভঞ্জন হইতেছে।

প্রকাণ্ড বিস্তার এই অবিচলিত বৃক্ষত। কমলাকে পাড়া দিতে লাগিল। সমস্ত এত বৃহৎ, এত বিপুল, অগুণ্ট ইঁহার মাঝখানে কোথাও কমলার লক্ষ্য একটিমাত্র উপায়, একটুমাত্র চিন্তা নাই। বাহা হইয়াছে, তাহার একটুও নড়চড় হইবার জো নাই। সমস্ত নিরতিশয় লক্ষ্য, সমস্ত নিরুপায় চেষ্টা লইয়া একলা কমলা কাহার দিকে তাকাইবে। একটা কথা কেহ বলুক, একটিমাত্র ইচ্ছা কেহ করুক—এই বিশ্বব্যাপী অসুখ নিরবতার মধ্যে কমলার মত অনভিন্ন বালিকার উপরে একি নিদারুণ অসাধ্য সমস্তার মীমাংসাতার পড়িয়াছে।

সম্মুখে পক্ষীকার কলমের আশ্রয় বন অন্ধকার বাড়িয়াই পাড়াইয়া রহিল। কমলা কোনমতেই কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে ঠাণ্ডা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল, কাঠের স্তম্ভের মত স্থির হইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া এককোঁটা জল বাহির হইল না।

এমন কতকণ সে বসিয়া থাকিত বলা যায় না—কিন্তু তীব্র শীত তাহার জংগিঙকে ধোলাইয়া দিল—তাহার সমস্ত শরীর ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পড়ীর রাতে কলকাতার চন্দ্রোদয় যখন নিশ্চয় তালবনের অন্ধরালে অন্ধকারের একটি প্রান্তকে ছিন্ন করিয়া দিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গিয়া ঘর বন্ধ করিল।

সকালবেলা কমলা চোখ মেলাইয়া দেখিল, শৈল তাহার বাটের পাশে পাড়াইয়া আছে। অনেক বেলা হইয়া গেছে বুঝিয়া লক্ষিত কমলা ভাড়াভাড়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

শৈল কহিল, “না ভাট, তুমি উঠিয়ো না, আর একটু থুমাও—নিশ্চয় তোমার শরীর ভাল নাই। তোমার মুখ বড় শুকনো দেখাইতেছে, চোখের নীচে কালী পড়িয়া গেছে। কি হইয়াছে তাই আমাকে বল না।”—বলিয়া শৈলজ্য কমলার পাশে বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কমলার বুক তুলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার অশ্রু আর বাধা মানে না! শৈলজ্যার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া তাহার কান্না একেবারে কাটিয়া বাহির হইল! শৈল একটি কথাও না বলিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

একটু পরেই কমলা তাড়াতাড়ি শৈলজ্যার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল—চোখ মুছিয়া-কেলিয়া হোর করিয়া হাসিতে লাগিল। শৈল কহিল, “নাও নাও, আর হাসিতে হইলে না! চেরচের মেয়ে দেখিয়াছি, তোমার মত এমন চাপা মেয়ে আমি দেখি নাই। কিন্তু তুমি মনে করিতেছ আমার কাছে লুকাইবে আমাকে তেমন হা বা পাও নাই! তবে বলি? রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়া অবধি তোমাকে একখানি চিঠি লেখেন নি—তাই রাগ হইয়াছে—অভিমানিনী! কিন্তু তোমারো বোকা উচিত, তিনি দেখানে কাজে পিয়াছেন, দুদিন বাপেই আসিবেন—ইহার মধ্যে যদি সময় করিয়া উঠিতে না পারেন, তাই বলিয়া কি অত রাগ করিতে আছে। হি! তাও বলি তাই, তোমাকে আজ এত উপদেশ দিতেছি—আমি হইলেও ঠিক ঐ কাণ্ডটি করিয়া বসিতাম। তুমি যদি তখন আমারে বুঝাতে আসিতে, আমি কি

বুঝিতাম মনে কর? এমন মিছিমিছি কান্না মেয়েমানুষকে অনেক কাদিতে হয়! আবার এই কান্না পুড়িয়া-গিয়া যখন হাসি ফুটিয়া উঠিলে, তখন কিছুই মনে থাকিলে না!”—এই বলিয়া কমলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া শৈল কহিল—“আজ তুমি মনে করিতেছ, রমেশবাবুকে আর কখনো তুমি মাপ করিবে না—তাই না? আচ্ছা সত্যি বল!”

কমলা কহিল—“হাঁ, সত্যিই বলিতেছি।”

শৈল কমলার গানে করতলের আঘাত করিয়া কহিল—“ইন্দু! তাই বই কি! দেখা দাইবে! আচ্ছা বামি রাখো!”

এই কান্না এবং হাসি, এই রাগ ক্রোধ এবং ক্ষমা করা, দাম্পত্যপ্রেমের এই বে তরঙ্গলীলারিত প্রোতের খেলা—ইহারি একটি ছারালোকখচিত মৃদুরবিষ্মত শাস্ত্রিময় নিভৃত হৃৎকের ছবি, শৈলজ্যার কথার মুহূর্তের মধ্যে কমলার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইল!

শৈল অমন চিবুক ধরিয়া কমলার-মুখ তুলিয়া ধরিল। কহিল, “একেই বলে বাড়াবাড়ি! অতটা ভাল নই তাই—তুমি আমারেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিস! আমার অভিমানের এত জোর নাই। অমন করিয়া কি নিশ্বাস ফেলিতে আছে—তুমি চোখের জলের উপর দিয়া বার, দেই ভাল!”

আজ শৈলজ্যার ঘরে বিশেষ একটা উৎসব ছিল। আজ তাহাদের বিবাহের সাংবৎসরিক পক্ষ। এত পক্ষপালন বিপিনের একটা বিশেষ

খেয়াল। পাছে-পিতাম তা এবং বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারে, এইজন্য এই উৎসবের দিনে শৈল তারি লক্ষ্য রাখকে। ইহার আয়োজন এবং অনুষ্ঠান গোপনেই সম্পন্ন হয়। এককাল পরে বাহিরের ত্যাকের মধ্যে আজ কমলাই কেবল এই উৎসবের সংবাদ জানিরাছে। শৈল তারি কাছে গোপন করিতে পারে নাই। বিপিন যে বর্ষে বর্ষে তাহাদের বিবাহের দিনকে বিশেষ সৌরভের সহিত স্বরণ করিতে চায়, ইহার পক্ষ শৈল সখীর কাছে কথা করিয়া রাখিবে, কি করিয়া? গতকলা মধ্যাহ্নে এই ব্যাপার লটকা উত্তরের মধ্যে অনেক আয়োচনা হইয়া গেছে। কমলা বলিয়াছিল, “এ বেশ ভারী আশার কাছে এ বড় ভাল লাগিতেছে!”—শৈল বলিতেছে, “তোমাদের বিবাহের তারিখে এই-রকম আয়োজ করা যাইবে! কি বল তাই!”—কমলা তাহাতে সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছে। শৈল বলিয়াছে, বরণ না হইলে সমস্ত বড় খালি-খালি ঠেকে—উঁচায় যদি রাখি হন, তবে ইহার পর হইতে আমাদের বিবাহের দিনে, তুমি আমাদের দুজনকে বরণ করিয়া লইবে, আর তোমাদের বিবাহের দিনে আমি তোমাদের দুজনকে বরণ করিয়া লইব! কি বল তাই?”—এ প্রত্যাবও কমলার অত্যন্ত ভাল লাগিতেছে। এমনি করিয়া দুই সখীর দুই দাম্পত্যস্বপ্নের দ্বারা কত পুনঃপুনঃউদিত পূর্ণচন্দ্রের আলোকে, কত বারবার-প্রত্যাহ্বিত আনন্দভরিত উৎসবহিল্লোলে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি বহিয়া চলিয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া কাল মধ্যাহ্নে কমলার মনের

মধ্যে একটা সুখের আগুন রহিয়া-রহিয়া টেউ দিয়া গিয়াছে।

এই উৎসবে আমিহীন মধ্যে যে মাঝ-বদল হয়, সে মাঝা শৈল প্রতিবৎসর নিজের হাতে রাখিয়া থাকে, এইভাবেও তাই রাখিবে। কিন্তু কমলা এবার কেন্দ্র করিয়া ধরিয়া বসিয়াছে—তাহাদের সূক্ষ্মবার সূক্ষ্মের আয়োজন কমলা নিজে প্রস্তুত করিয়া দিবে। এইজন্য কালট তাহার দূত উদ্দেশ্যে কমলা-সংগ্রহের জন্য সে উৎসাহিত করিয়াছে—উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপঙ্কজের গাভ গাভ ঘাইবার পূর্বেই ঐতকম্পিতকণেবরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া গ্রহণীয় চক্ষু এবং জ্ঞান-জ্ঞান-বোধ বর্জন করিয়া পুন্দ্রলুঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গতকলা মধ্যাহ্নে নিভৃতঘরে, বাতায়ন-প্রতিষ্ঠিত রৌদ্রে ঢুল এলো করিয়া, পা মেলিয়া-দিয়া, মুগ্ধভক্তি স্বরকে মাঝে মাঝে কোতুকহাঙে মুখরিত করিয়া দুই সখীতে অত্যন্ত বিস্তারিত-পল্লবিত-ভাবে এই সমস্ত আন্দোলন-আলোচনা চইয়া গেছে। তাহার পরে কাল সন্ধ্যা আসিয়াছে এবং রাজিও কাটা গিয়াছে! দিহুতক্রেণীর গুহপঙ্কজ-গুলিকে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণের দিকে উড়াইয়া-দিয়া শীতের মধ্যাহ্নে নির্জন শরন-ঘরের বাতায়নবারে তেমনি করিয়াই অগ্নিত রৌদ্রের একটা প্রান্ত মেলিয়া দিল—কিন্তু কালিকার বিষমংসার হইতে আজ কমলা একেবারে ব্রত হইয়া গেছে।

তাই বলিয়া কি কমলা কালিকার দিনকে কিরিয়া পাইতে চায়? তাও নহা। কিছু না জানিয়া সে যে বিষম লজ্জার মধ্যে তলাইতে বসিয়াছিল, সেদিকে ফিরাই তাকাইতেও

তাঁহার সমস্ত চন্দ্র দ্বারা বিপন্ন হয়। অস্ত্র-
কার এই কতাবস্থা শুল্কময়তা—এও ভাল !

শৈল কহিল, “আজ আর তোমার কিছুতে
হাত দিয়া কাজ নাই—তুপুরবেলায় একটু-
পানি ঘুমাইয়া লও। তোমাকে বড় প্রাণ
দেখাইতেছে।”

না, আজ কমলা ঘুমাইবে না। সন্ধ্যার
আর ত বেশিদিন চণিবে না, যে দুই একদিন
অবকাশ আছে, প্রগড়ের শেষ কল্লগুলি সে
সারিয়া-দিয়া ঘাইতে চায়—এমন প্রবোধের ঘরে
এমন সুখের কাজ আর তাহার জীবনে
কখনো ঘটবে কি ? নিজের সুখশয্যাও ত
আগুন লাগিল, এবার সন্ধ্যার চুলশয্যার মালা-
গাথা শেষ করিয়া সে এই রক্তভূমি হইতে
নিজান্ত হইবে। সমস্তদিন নিজেকে কমলা
লেশমাত্র বিজ্ঞান দিল না। শৈলর শরনগৃহ
সাজাইল, নানারকম খাবার তৈরি করিল—
ঐতকালের দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া
গেল।

হস্তিভাবিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “শৈল,
তোমের আজ ব্যাপারখানা কি বল দেখি ?”

শৈল কহিল, “কি জানি না, কমলের
মুখের পাগুলামি চাপিয়াছে।”

হস্তিভাবিনী কহিলেন, “আজ বুঝি
তোমের পুতুলের বিয়ে ?”

শৈল কহিল, “হাঁ মা, বিয়েরই ব্যাপার।”
—এই বলিয়া গোপনে কমলাকে মুহু একটু-
পানি চিম্টিঙ্কাটিল।

সন্ধ্যার সময় কমলা শৈলকে গা ধোয়াইয়া
চুল বাঁধিয়া লাগ বেনারসী শাড়ী পরাইল।
তাঁহার সীঁতার বড় করিয়া সিঁদুরের রেখা
কাটিল, কপালে খেতচন্দন দিল। বলিল,

“দিদি, তোমার পায়ে আমি আলতা পরাইয়া
দিব।”

শৈল কহিল, “দূর পাগলি, তোর আর
অন্ত করিতে হইবে না।”

কমলা কিছুতেই ছাড়িল না,—লাইন্
টিক পরিপাটি হইল না, কিন্তু বহুবল্ল সে
কমলার পায়ে আলতা রাঙাইয়া দিল। দিয়া,
হঠাৎ দুই পা দুই হাতে জড় করিয়া তুলিয়া
মাথা নীচু করিয়া চুবন করিল। শৈল চকিত
হইয়া উঠিয়া কহিল, “ও কি ও! এমন কর
যদি, তবে আমি ঘাই।”

এমনি কারখা কমলা তাঁহার পত্নীধর্ম-
ব্রতের অবসানদিনে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই
সতী নারীর, এই ভাগ্যবতী গৃহমন্ত্রীর চরণ-
বন্দনা করিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, “এ
জন্মের আগা ত নাই, আর জন্মে যদি শৈলর
মত এমনি ভাগ্যলাভ করিতে পারি, তবে
কৃতার্থ হইব।”

শৈলর মধ্যে উমিকে এতক্ষণ হিন্দুত্বানী
কি জ্বলাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যা
হইতেই সে “মা কাছে যাব” বলিয়া ভারি
গোলমাল বাধাইয়া দিল। মাতার সুসজ্জিত
বেশভূষা তাহার ভাল লাগিল না—ইহা
মায়ের পরিচিত বেশ নহে। সে তাহার
মাকে জড়াইয়া ধরিতে বাবামাত্র কমলা ব্যস্ত
হইয়া উঠিল—কহিল, “আমি উমি, মাসীর কাছে
আম।”—কিন্তু সে কি হয়, সন্ধ্যাবেলায় আর
কাহাকেও নয়, মাকে চাই। কমলা গল্প
বলিবার লোভ দেখাইয়া অনেক করিয়া
উমিকে আপনার ঘরে গইয়া-গিয়া বেঙ্গমা-
বেঙ্গমীর গল্প ফাঁদিল। তাহাকে জ্বলাইয়া,
গল্প বাঁচিয়া, খাওয়াইয়া, একে চাপিয়া-ধরিয়া,

গোলাইয়া, ঘুম পাড়াইয়া নিজের বিছানায় উপরে শোয়াইয়া দিল;—কিছুক্ষণ তরু হইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া চুপন করিল। কচি মুখটি চুপন করিতেই কমলার চোখ মিথ্যা মল পড়িতে লুপ্তিল। শিশুকে লালন করিবার তুচ্ছা নৃনয় অপরিতৃপ্ত ভবিষ্যতের বেদনাকে একজ করিয়া লইয়া আজ তাহার বুকের মধ্যে আঁপিয়া উঠিল। টঙ্কা করিতে লাগিল, উমির ঘুম ভাঙাইয়া মাঝার তাহাকে কোলের মধ্যে করিয়া তাহাকে বহঁয়া অনেক-ক্ষণ ধরিয়া বকে, তাহার মুখে মাদীসম্বোধন শোনে।

বানিকবাদে শৈলজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“উনি ঘুমাইরাছে ?”

কমলা কহিল, “হাঁ, ঘুমাইরাছে।”

শৈল। তবে এইবেলা ওকে ওর বিছানার শোয়াইয়া দিই গে !

কমলা ভাড়াভাড়ি কহিল, “না মিদি, না, আজ ও আমার বিছানাতেই থাক্।”

শৈল। ছোট বিছানায় তোর বে অল্পবিধা হবে তাই !

কমলা। কিছু অল্পবিধা হইবে না ! ও এখানেই থাক্ !

সন্ধ্যার পদ বিপিন ঈষৎ লজ্জিতভাবে শয়নঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলের ভাড়নার পাশের ঘর হইতে সে লাল বেনারসী জোড় পরিয়া আসিল। শৈল রূপার খালার ধবা চন্দনের বাটি, গোলাপলাশ ও ফুলের মালা আনিয়া প্রথমে বিপিনের গলাট চন্দনে চর্কিত করিল, পরে তাহার চারের উপর গোলাপ ছিটাইয়া দিয়া তাহার গলায় দুইগাছি মালা পড়াইয়া গড় হটয়া

তাহার পাশের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাড়াইতেই বিপিন আপনার গলার একগাছি মালা খুলিয়া শৈলকে পরাইয়া দিল এবং আঁলক্ষ হস্তমুখে শৈলর চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া মাথা নত করিতে বাইতেছিল—কিন্তু শৈল আজ নিয়ম-তল করিল। সে হঠাৎ মুখ সরাইয়া নীরব-মুখেতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—বিপিন বৃক্ষিল, অন্তরাল হইতে তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অমৃতােনের এই অসম্পূর্ণতা সংশোধন করিয়া লইবার যথেষ্ট সময় আছে জানিয়া বিপিন কান্না হইল। শৈলজা কলমুলমিষ্টায়ের বিচিত্র পাজ বহিয়া ঘরের উপর সাঝাইয়া দিল। বিপিন বাইতে বসিল এবং শৈল সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে ধূনার পাজে ধূপধূনা ও চন্দনের গুঁড়া দিয়া ভূষণধরিত বাহতে পাখা করিয়া স্বগন্ধি ধূমরাশি বনাইয়া তুলিতে লাগিল।

কমলা অন্ধকার বারান্দার পাড়াইয়া আনালায় ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ একসময়ে চলিয়া-গিয়া আপনার ঘরে ঘর রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে যেকের উপর লুপ্তিত হইয়া পড়িল। অত্রদিন শৈলজা তাহাকে যথাসময়ে ডাকিয়া-লইয়া একসঙ্গে বাইতে যায়। আজ শৈলর অবকাশ ছিল না। আজ সে বামীর পায়ে প্রসাধন পাইয়া পুস্ত-গনে বসিয়া বিপিনের কাছ হইতে একটা ইংরাজিগরের তর্জিয়া গুলিতেছে। কমলার ঘরের এক কোণে আভিকার প্রস্তুত মিষ্টায় প্রতৃতি ঢাকা দেওয়া ছিল তাহা ঢাকাই রচিয়া গেল। কমলা তাহার অসংকৃত কেন-

রাশি হ্রীর উপরে ছড়াইয়া প্রসারিত বাম-
বাহুর উপর মাথা রাখিয়া বিসৃত বস্মাকলে
কঠিন-শীতল গৃহতলে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া
রহিল।

খানিক রাজে কমলার বিছানার উপর
হইতে ক্রমশঃখনি উঠিল, “মা, মা !”

“কি মা”—বলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি
উঠিয়া-পড়িয়া বিছানার মধ্যে গিয়া শুণ্ড-
শব্দে উমির লগাটে ধুতুহু করাধাত করিতে
লাগিল—উমি তৎকণাৎ কমলাকে মা মনে
করিয়া তাহাকে জড়াইয়া-ধরিয়া ঘুমাইয়া
পড়িল—বুকের কাছে এই শিশুদেহকে
চাপিয়া-ধরিয়া কমলার চরম বিগলিত হইয়া
গেল।

৩৯

কাল সকালে কমলার সঙ্গে কথাবার্তা
হইবার পরেই শৈল এলাহাবাদে তাহার
বাশকে চিঠি পাঠাইল। তাহাতে লিখিল,
“কমলা রমেশবাবুর কোন চিঠিপত্র না
পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছে। একে বেচারা
নূতন বিষয়ে আসিয়াছে, তাহার পরে
রমেশবাবু এখন-তখন তাহাকে ফেলিয়া
চলিয়া যাইতেছেন এবং চিঠিপত্র লিখিতে-
ছেন না, ইহাতে তাহার কি কষ্ট হইতেছে,
একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ! তাহার এলাহা-
বাদের কাজ কি আর শেষ হইবে না নাকি ?
কাজ ত ঢের লোকের থাকে, কিন্তু তাই
বলিয়া দুইছয় চিঠি লিখিবার কি অবদর
পাওয়া যায় না ?”

খুড়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার
কন্টার পত্রের আশ-বিশেষ শুনাইয়া তৎসম
কারণেন।

কমলার দিকে রমেশের মন যথেষ্টপরি-
মাণে আকৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু
আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহার বিধা আরও
বাড়িয়া উঠিল। এলাহাবাদে আসিয়া কম-
লার সেই গৃহরচনার চিত্রটি যখন তাহার
মনের সামনে হইতে কিছুতেই আর সরিতে
চাহিল না, যখন তাহাকে বিভিন্ন স্থানের
কল্পনার প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, তখনই
তাহার মনে হইল, আমার কর্তব্যটা ঠিক
কি, তাহা বুঝি প্রবৃত্তির কোঁকে আর ঠাহর
করিবার শক্তি রহিল না। যাহাকে কর্তব্য
বলিয়া ঠিক করিয়াছিল, তাহা একান্ত মোভ-
নীয় হইয়া ওঠাতেই তাহার মনে সম্বন্ধ
জন্মিতে লাগিল। কেবলি ভাবিতে লাগিল,
কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়া চিরজীবন
একটা বিধাকে বহন করিয়া বেড়াইব কি
করিয়া ? ইহার পরে প্রকৃত ঘটনা আর
কোনোকালেই ত কমলাকে বলা যাইবে না !

এই বিধার মধ্যে পড়িয়া রমেশ কোনো-
মতেই এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে পারিতে
ছিল না। ইতিমধ্যে খুড়ার কাছ হইতে
সে শৈলর চিঠি শুনিল।

চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারিল, কমলা
রমেশের জন্য বিশেষ উৎসেহ প্রকাশ করি-
তেছে—সে কেবল নিজে লজ্জার লিখিতে
পারে নাই।

ইহাতে রমেশের বিধার দুই মাথা
দেখিতে দেখিতে একটাতে আসিয়া মিলিয়া
গেল। এখন ত কেবলমাত্র রমেশের সুখ-
ঃখ লইয়া কথা নয়, কমলাও যে রমেশকে
চাপবাসিয়াছে। বিধাতা যে কেবল নদীর
চরার উপরে তাহারই তইকনকে মিনাচর

দিয়াছেন, তাহা নহে, হৃদয়ের মধ্যেও এক করিয়াছেন ।' যতদিন রামের ভালবাসার গতি অন্তিমিকে ছিল, ততদিন ধর্ম্য মিলনের সমর আসে নাই। আজ যখন রমণ সম্পূর্ণভাবেই কমলার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন আর সংশয় করিবার বিষয় কি আছে! একটা আছে বটে— প্রকৃত ঘটনাটা ক'লাকে খণ্ডা হয় নাই। তা, কোনো একদিন সেটাও বলিবার সুযোগ নিকর আসিবে!

এই তাবিয়া রমণ আর বিগতমাত্র না করিয়া কমলাকে এক চিঠি লিখিয়া বলিল। লিখিল—

‘প্রিয়তমা—

“কমলা, তোমাকে এই যে সন্তানক’র-
লাব, ইহাকে চিঠি লিখবার একটা প্রচলিত
পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিয়া না। যদি
তোমাকে আজ পুণিবীতে সকলের মধ্যে
প্রিয় বলিয়া না মানিতাম, তবে কখনই আজ
‘প্রিয়তমা’ বলিয়া সন্তানক’রতে পারিতাম
না। যদি তোমার মনে কখনো কোনো
সন্দেহ হইয়া পাকে, যদি তোমার কামল
হৃদয়ে কখনো কোনো আঘাত করিয়া থাকি,
তবে এই যে আজ সত্য করিয়া তোমাকে
ডাকিলাম ‘প্রিয়তমা’, ইহাতেই আজ তোমার
সমস্ত সংশয়, সমস্ত বেদনা নিঃশেষে ফালন
করিয়া দিক! ইহাও চেয়ে তোমাকে আর
বেশি বিস্তারিত কহিয়া কি বলিব!
এ পূর্বাভাস আমার অনেক আচরণ তোমার
কাছে নিকর বাখাধনক হইয়াছে। সেজন্য
যদি তুমি মনে মনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ
লাবনা থাক, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিয়া

তাঁহার লেশমাত্র প্রতিবাদ করিব না—আমি
কেবল বলিব, আজ তুমি আমার প্রিয়তমা,
তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেহই নাই
—ইহাতেও যদি আমার সমস্ত অপরাধের,
সমস্ত অসঙ্গত আচরণের শেষ জবাব না হয়,
তবে আর কিছুতেই হইবে না।

“অতএব কমলা, আজ তোমাকে এই
‘প্রিয়তমা’সম্বোধন করিয়া আমাদের পরিচয়-
হীন সংস্রাঙ্কর অতীতকে দূরে সরাইয়া
দিলাম, এই ‘প্রিয়তমা’সম্বোধন করিয়া আমা-
দের সুখ-শান্তি-ভালবাসার ভবিষ্যৎকে আরম্ভ
করিলাম। তোমার কাছে আমার একান্ত
বিনতি, তুমি আজ আমার ‘প্রিয়তমা’ এই
কপাট সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর! ইহা যদি ঠিক
তুমি মনে গ্রহণ করিতে পার, তবে কোনো
সংশয় নইয়া আমাকে আর কোনো প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

“তাহার পরে, আমি তোমার ভালবাসা
পাইয়াছি কি না, সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা
করিতে আমার সাহস হয় না। আমি
জিজ্ঞাসা করিবও না। আমার এই অসু-
চ্চারিত প্রশ্নের অসুস্থ উত্তর একদিন
তোমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া আমার হৃদয়ের
মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া পৌছিতে, ইহাতে
আমি সন্দেহমাত্র করি না। ইহা আমি
আমার ভালবাসার জোরে বলিতেছি,—
আমার যোগাভা দৃষ্টা অস্বাভাবিক করি দা,
কিন্তু আমার সাধনা কেন সার্থক হইবে না?

“আমি বেশ বৃদ্ধিতেছি, আমি বাহা লিখি-
তেছি, তাহা কেমন সঙ্গ হইতেছে না—
তাগ’রূপনার মত শুনাটতেছে—উচ্চা কবি-
তেছে, এ চিঠি ডাক্তার ফাঁদে কিসের চিঠি

মনের মত হইবে। সে চিঠি এখন লেখা সম্ভব হইবে না। কেন না, চিঠি লেখার ভিনিস—কুবল এক পক্ষ এখন চিঠি লেখে, তখন সে চিঠিতে সব কথা ঠিক করিয়া লেখা চলে না—তোমাকে আমাকে যেদিন মন্থান-জানির থাকি থাকিবে না, সেইদিনই চিঠির মত চিঠি লিখিতে পারিব। সামান্য সামান্য হই দরজা খোলা থাকিলে তখন ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে। কমলা, প্রিয়তমা, তোমার জন্ম হবে সম্পূর্ণ উদ্ভাটন করিতে পারিব।

“এ সব কথাই মীমাংসা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে হইবে—ব্যস্ত হইয়া চল নাই। যেদিন আমার চিঠি পাইবে, তাহার পরের দিন সকালবেলাতেই আমি গাজিপুরে পৌছিব। তোমার কাছে আমার অহুরোধ এই, গাজিপুরে পৌঁছিয়া আমাদের বাসভাট ঘন তোমাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন গৃহ-হারার মত কাটিল—আমি আমার ধৈর্য্য নাই

এবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিব—জন্ম-লক্ষ্যিক গৃহলক্ষীর হৃদয়ে দেখিব। সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার আমাদের গুণদৃষ্টি হইবে। মনে আছে—আমাদের প্রথমবার সেই গুণদৃষ্টি? সেই জ্যোৎস্না যাত্রা, সেই নদীর ধারে, জনশূন্য বালুমকর মধ্যে? দেখানে ছায়া ছিল না, প্রাটার ছিল না, পিতামাতাব্রাতা-আত্মীয়-প্রতিবেশীর সন্ধ্যা ছিল না। সে যে গৃহের একে-বারে ব্যক্তি। সে ঘন স্বপ্ন, সে ঘন কিছুই সত্য নহে। সেইজন্য ষাট একদিন সিদ্ধ-নির্ণয় প্রাতঃকালের আলোকে গৃহের মধ্যে, সত্যের মধ্যে সেই গুণদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার অপেক্ষা আছে। পূর্ণাঙ্গীনের প্রাতঃকালে আমাদের গৃহঘরে তোমার সরণ মহাজ

বুদ্ধিমানি চিরজীবনের মত আমার জন্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব, এইজন্য আমি আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া আছি। প্রিয়তমে, আমি তোমার জন্মের ধারে—অতিথি—আমাকে ফিরাইয়ো না।

প্রসাদভিক্ত রমেশ ।”

৪০

শৈল রান কমলাকে একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, “আমি তোমাদের বাংলার বাইরে নাই”

কমলা কহিল—“না, আর দরকার নাই।”

শৈল। আমার ধীরসাজানো শেষ হইয়া গেল ?

কমলা। ঠা তাই, শেষ হইয়া গেছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শৈল আসিয়া কহিল, “একটা ভিনিস যদি দিই ত কি দিবি বল ?”

কমলা কহিল, “জানার কি আছে দিদি ?”

শৈল। একেবারে কিছুই নাই ?

কমলা। কিছুই না।

শৈল কমলার কঁপোলে করাখাত করিয়া কহিল, “ইস, তাই ত,—বা কিছু ছিল, সমস্তই বৃষ্টি একজনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল ? এটা কি বল দেখি ?”—বলিয়া শৈল অকলের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিল।

লোফাকার রমেশের হস্তাকর দেখিয়া কমলার মুখ তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল—সে একটুখানি মুখ ফিরাইল ?

শৈল কহিল—“ওগো, আর অভিমান দেখাইতে হইবে না, তের হইয়াছে। এদিকে চিঠিখানা ছেঁ দুরিয়া গইবার জন্য মনটায়

ভিতরে খড়্‌খড়্‌ কহিতেছে—কিন্তু মুখ ফুটিয়া
নাহিল, আমি দিব না—কখনো দিব না
—দেখি কতক্ষণ পণ রাখিতে পারি !”

এমন সময় উমা একটা সাবানের বাসে
দড়ি বাধিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল “মাসি,
গ-ফা!”

কমলা তাকাতাকি উমিকে কোলে
তুলিয়া বারংবার চুমো খাইতে খাইতে শোবার
ঘরে লইয়া গেল। উনি তাহার শকটচালনার
অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করিতে
লাগিল—কিন্তু কমলা কোনোমতেই ছাড়িল
না—তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া
নানা প্রকারে প্রণামবীক্যে তাহার মনোরঞ্জন-
চেষ্টার প্রব-বৎসে প্রবৃত্ত হইল।

শৈল আনিয়া কহিল—“হার মানিলাম
—তোরাই জিৎ—আমি ত পারিতাম না” ধক্তি
মেয়ে এই নে ভাট—কেন মিছে অভিযাপ
কুড়াইব

এই বলিয়া বিছানার উপরে চিঠিখানা
ফেলিয়া উমিকে কমলার হস্ত হইতে উদ্ধার
করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

লেনকাটা লইয়া একটুখানি নাকচাড়া
করিয়া কমলা চিঠিখানা খুলিল প্রথম ছট-
টারি লাইনের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার
মুখ লাল হইয়া উঠিল। লজ্জার সে চিঠি-
খানা একবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রথম
ধাক্কায় এই প্রবল বিতৃষ্ণার স্বাক্ষর সামলা-
ইয়া-লইয়া আবার সেই চিঠি মাটি চইতে
তুলিয়া সদন্তরাই দে পড়িল। সদন্তটা সে
ভাল করিয়া বুঝিল কি না বুঝিল, জানি না,
কিন্তু তার মনে হইল, যেন সে হাতে করিয়া
‘ক’ এছাড়া পক্ষি পদার্থ নাড়িতেছে। চিঠি-

খানা আবার সে ফেলিয়া দিল। বে ব্যক্তি
তাহার স্বামী নহে, তাহারই ঘর করিতে
হইবে, এইজন্য এই আত্মনাঃ রমেশ জালিয়া-
গুলিয়া এতদিন পরে তাহাকে এই অপমান
করিল। গান্ধিপুরে আসিয়া রমেশের দিকে
কমলা যে তাহার দ্বন্দ্ব অগ্রণয় করিয়া দিয়া-
ছিল, সে কি রমেশ বলিয়া, না তাহার স্বামী
বলিয়া? রমেশ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিল,
সেইজন্যই ‘অনাথার’ প্রতি দর্য করিয়া
তাহাকে আজ এই ভালবাসার চিঠি লিখি-
য়াছে। ব্রজবন্দে রমেশের কাছে যেটুকু
প্রকাশ পাইয়াছিল, সেটুকু কমলা আজ কেমন
করিয়া ফিরাইয়া লইবে—কেমন করিয়া।
এমন লজ্জা, এমন ঘৃণা কমলার অদৃষ্টে কেন
ঘটিল! সে ভয়গ্রহণ করিয়া কাহার কাছে
কি অপসারণ করিয়াছে এবারে ‘ঘর’ বলিয়া
একটা বীভৎস ভিনিষ কমলাকে গ্রাস
করিতে আসিতেছে কমলা কেমন করিয়া
রক্ষা পাইবে! রমেশ যে তাহার কাছে এত-বড়
বিভীষিকা হইয়া উঠিবে, দুইদিন আগে তাহা
কি কমলা স্বপ্নেও করনা করিতে পারিত!

ইতিমধ্যে ঘরের কাছে উমেশ আসিয়া
একটুখানি কানিল। কমলার কাছে কেমনো
সাজা না পাইয়া সে আশ্চর্য আশ্চর্য ডাকিল—
“মা!” কমলা ঘরের কাছে আসিল, উমেশ
মাথা হুলকাইয়া বলিল, “মা, আজ সিধুবাংরার
মেয়ের বিবাহে কলিকাতা হইতে একটা
যাত্রার দল আনা হইয়াছেন।”

কমলা কহিল, “বেশ ত উমেশ, তুই যাঁরা
গুনিতে বাস।”

উমেশ। কান সকলে কি হুল তুলিয়া
আনিয়া পড়ে হইবে?

“কমলা । না না, কুলের সরকার নেই !

উমেশ যখন ছাঁলঘাট বাইতেছিল, হঠাৎ কমল তাকে ক্রিয়মা ডাকিল—কহিল, “ও উমেশ, তুই যাত্রা তিনিতে যাইতেছিস, এই নে, পাঁচটা টাকা নে !”

উমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল । যাত্রা তিনবার সঙ্গে পাঁচটা টাকার কি বোঝ, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না । কহিল—“না, সহ্য হইতে কি তোমার অল্প কিছু কিনিয়া আনিতে হইবে ?”

কমলা । “না না, আমার কিছু চাই নে । তুই রাখিয়া নে, তোর কাছে লাগিবে ।

হতবুদ্ধি উমেশ চলিয়া বাইবার উপক্রম করিলে কমলা আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “উমেশ, তুই এই কাপড় পরিয়া যাত্রা তিনিতে যাইবি নাকি—তোকে লোকে বলিবে কি ?”

লোকে যে উমেশের নিকট সাধুসমাজ-সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি প্রত্যাশা করে এবং ক্রটি দেখিলে লাগোচনা করিয়া থাকে, উমেশের একপ ধারণা ছিল না—এই কারণে ধূতির গুজ্ঞতা ও উত্তরজ্ঞানের একান্ত অভাব-সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল । কমলার প্রশ্ন তিনিয়া উমেশ কিছু না বলিয়া একটু-খানি হাসিল ।

কমলা তাহার হই ঘোড়া শাড়ী বাহির করিয়া উমেশের কাছে কেলিয়া-দিয়া কহিল, “এই নে, যা, পবিস্ ।”

শাড়ীর চওড়া বাহ্যরে পাড় দেখিয়া উমেশ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কমলার পায়েস কাছে পড়িয়া চিন্ত করিয়া প্রণাম করিল, এবং হাতদমনের রথাস্ট্রায় সমস্ত যুগ্মপানাকে

বিহত করিয়া চলিয়া গেল । “উমেশ” চলিয়া গেলে কমলা চইকোটী চোখের দ্বারা মুছিয়া জানুয়ার কাছে চাপ কারয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

শৈল ঘর প্রবেশ করিয়া কহিল, “তাই কমল, আমাকে তোর চিঠি দেখাওনি ?”

কমলার কাছে শৈল ত কিছুই গোপিন ছিল না—তাই শৈল প্রতদিন পরে সুবোধ পাইয়া এই দাবী করিল ।

কমলা কহিল, “ঐ যে দিদি, দেখ না ।”

--বলিয়া, মেজের উপরে চিঠি পাড়িয়া দিল, দেখাইয়া দিল । শৈল আশ্চর্য হইয়া তাবিল,

“বাস্তবে, এখনো রাগ হয়ে নাই ?”

নাটি হইতে শৈল চিঠি তুলিয়া-দইয়া সমস্তটা পড়িল ।

চিঠিতে ভালবাসার কথা যথেষ্ট আছে বটে,

কিন্তু তবুও কেমনতর চিঠি !

মাগুপ আপ-নার ক্রীকে কি এমনি কানিয়া চিঠি দেখে ।

এ যেন কি-এক-রকম !

শৈল জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা তাহ, তোমার বামা কি

নভেল লেখেন ?”

“হাসী” শব্দ তাইয়া ডাকতের মধ্যে

কমলার দেহমন যেন সুচুড়িত হইয়া গেল ।

সে কহিল—“জানি না !”

শৈল কহিল, “তা হ’লে তুমি

বালাগোতেই যাইবে ?”

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, বাইবে ।

শৈল কহিল, “আমিও আজ সকাল পর্যন্ত

তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু জান

ত তাই, আজ নব্বিসংবারের বড় আদিবে ।

যা বরক তোমার সঙ্গে যান্ ।”

কমলা বাস্ত হইয়া কহিল, “না না, যা

গিয়া কি করিবেন ? দেখানেন ত চাকর

আছে ।”

শৈল হাসিয়া কহিল, “আর তোমার বাহন উমেশ আছে, তোমার ভয় কি ?”

উমা তখন কাহার একটা পেলিন সংগ্রহ করিয়া বেখানে-সেখানে আঁচড় কাটিতেছিল এবং চীৎকার করিয়া অব্যক্ত ভাষা উচ্চারণ করিতেছিল, মনে করিতেছিল ‘পড়িতেছি’। শৈল তাহার এই সাহিত্যরচনা হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল—সে যখন প্রবল তারবরে আগন্তিকপ্রকাশ করিল, কমলা বলিল, “একটা মজার জিনিষ বিতেছি আর!”

এই বলিয়া ঘরে পইয়া-গিয়া তাহাকে বিছানার উপর ফেলিয়া আদরের দ্বারা তাহাকে অত্যন্ত উৎখেলিত করিয়া তুলিল। সে যখন প্রতিশ্রুত উপহারের দাবী করিল, তখন কমলা তাহার ব্যাচ তুলিয়া একজোড়া সোনার ব্রেসলেট বাহির করিল। এই দুর্লভ খেলনা পাইয়া উমি ভারি খুসি হইল। মাসী তাহার হাতে পরাইয়া দিতেই সে সেই ঢলঢলে-গহনাজোড়া-নামে দুটি হাত সঙ্গপণে তুলিয়া-ধরিয়া সগর্বে তাহার মাকে দেখাইতে গেল। মা রাত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্রেসলেট কাড়িয়া লইল—কহিল, “কমল, তোমার কিরকম-বুড়ি! এ সব জিনিষ উহার হাতে বাও কেন?”

এই দুর্ব্যবহারে উমির আর্জনাগের নালিশ গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কমল কাছে আসিয়া কহিল, “দিদি, এ ব্রেসলেট-জোড়া আমি উমিকেই দিয়াছি।”

শৈল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—“পাগল নাকি!”

কমলা কহিল—“আমার মাথা খাও দিদি, এ ব্রেসলেট-জোড়া তুমি আমাকে দিয়াহুতে

পারিবে না! ইহা জাতিয়া উমির দ্বার গড়াইয়া দিয়া।”

শৈল কহিল, “না, দুত্যা বলিতেছি, তোর মত জ্ঞাপা মেয়ে আমি দেখি নাই!”

এই বলিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিল। কমলা কহিল, “তোমের এখান হইতে আমি ত আজ চলিলাম দিদি—খুব সুখে ছিলাম—এমন সুখ আমার জীবনে কখনো পাই নাই।”—বলিতে বলিতে স্ব-স্ব করিয়া তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল।

শৈলও উল্লসিত অশ্রু দমন করিয়া বলিল “তোমার প্রকমটা কি বল দেখি কমল, যেন কতদূরেই যাইতেছি! দে সুখে ছিলাম, সে আর আমার বৃত্তিতে থাকি নাই—এখন তোর সব বাধা দূর হইল, সুখে আগন ঘরে একলা রান্না করিবি—আমরা কখনো গিয়া পড়িলে ভাবিবি আপন বিদায় হইলেই বাঁচি!”

বিদায়কালে কমলা শৈলকে প্রণাম করিলে পর শৈল কহিল, “কাল দুপুরবেলা আমি তোদের ওখানে যাইব।”

কমলা তাহার উত্তরে ‘হাঁ-না’ কিছুই বলিল না।

বাংলার গিয়া কমলা দেখিল, উমেশ আসিয়াছে। কমলা কহিল—“তুই যে! বাজা গুলিতে বাধি না?”

উমেশ কহিল, “তুমি বে আজ এখানে থাকিবে, আমি—”

কমলা। আজ! আজ! সে তোর ভাবিতে হইবে না। তুই বাজা গুলিতে যা—“এখানে বিনয় আছে।” না, দেখি। করিস্নে

উমেশ । এখন ত গাত্রার অনেক দেহি !

• কমলা । জা হোক না, বিয়ে-বাড়ীতে কত ধুম হইতেছে, ভাল করিয়া দেখিয়া আর গে বা !

এ সম্বন্ধে উমেশইক অধিক উৎসাহিত করিবার প্রয়োজন ছিল না । সে চলিয়া বাইতে উদ্ভত হইলে কমলা হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল—“দেখ, খুড়োমশের আসিলে তুই—”

এইটুকু বলিয়া কণাটা কি করিয়া শেষ করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না । উমেশ হাঁ করিয়া পাড়াইয়া রাহিল । কমলা খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল—“মনে রাখিস, খুড়ো-মশায় তোকে ভালবাসেন—তোরা যখন বা

দরকার হইবে, আমার প্রাণগ জানাইয়া তুই তার কাছে চান, তিনি দিবেন—তাকে আমার প্রণাম দিতে কখনো ভুলিসনে—জানিস !”

উমেশ এই অশ্রুশাসনের কোনো অর্থ না বুঝিয়া “বে আজে” বলিয়া চলিয়া গেল ।

অপরোহে বিষণ জিজ্ঞাসা করিল, “না-জি, কোথায় বাইতেছে ?”

কমলা কহিল, “গঙ্গার তীর করিতে চলিয়াছি ।”

বিষণ কহিল, “সঙ্গে গাইব ?”

কমলা কহিল—“না, তুই ঘরে পাহারা দে !”—বলিয়া তাহার হাতে অনাবৃত্তক একটা টাকা দিয়া কমলা গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল ।

ক্রমশ ।

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য ।

যাপান ।

[২য় প্রকায়]

খৃষ্টাব্দিকালের পূর্বে ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত এশিয়ার সমগ্র পশ্চিমাংশে ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল । প্রবণ-গণের প্রচারকৌশলে “অহিংসা” পরমো ধর্মের মূলমন্ত্র পুনঃপুন বিধোষিত হইয়া জনসাধারণের ধর্মের প্রীতি-পবিত্রতা বিক-শিত করিয়া; সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষের প্রতি লোকচিত্ত আকর্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল

ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া ধর্মের নামে যে যাহা বলিত, নরনারী, তাহার গুচমর্ম্ব ক্ষয়ক্ষয় করিতে না পারিলেও, ভুক্তি-প্রদর্শনে ক্রটি করিত না । প্রবণগণের সৌম্য-শাস্ত-পবিজ-বেশ ও অলোকসমান্য বিধি-প্রেম সভ্য-অসভ্য সকল শ্রেণীর নরনারীর উপরেই অসামান্য-প্রভাব বিস্তারিত রক্তকার্ষী হইয়া-ছিল । অশোকের মহাশাসন উৎসাহ-

করিয়া, প্রচারপ্রকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, এশিয়াখণ্ডের অধঃস্থানে বৌদ্ধমত-প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিল। তৎকাল কত রাজপুত্র রাজসিংহাসনের আশায় ললাজলি দিয়া, তিকাশাক্ষিতে নরনারীর হারে হারে ভ্রমণ করিয়া, ধর্মসংঘ ও বুদ্ধের মহিমা প্রচারে বতির্পিত হইয়াছিলেন। এই নববর্ণের কথা চীনসাম্রাজ্যে অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু অশোকের প্রচারকবর্ণের সে দেশে ধর্মপ্রচারে লগন করবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চীনদেশের পশ্চিমাংশে,—মধ্য-এশিয়ার সমুদ্রতট জনসমায়ে,—বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞানগৌরবের প্রতি চীনসাম্রাজ্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সকল লাভ করিয়া, চীনাদি-পতি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে সৈয়ান-নামক সুবিখ্যাত অধ্যাপককে অষ্টাদশ সহ-ধারী সমভিব্যাহারে বৌদ্ধধর্মের তথ্যসু-সকানের হস্ত মধ্য-এশিয়ার প্রেরণ করেন। সৈয়ান ও তদীয় সহাধারিবর্গ মধ্য-এশিয়ার উপনীত হইয়া, তৎদেশে বহুসংখ্যক ভারতীয় বৌদ্ধভ্রমণের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার পরে প্রত্যাবর্তনসময়ে মতঙ্গ ও হোরান্ নামধের দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধভ্রমণ তাহার সহিত চীনসাম্রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন। সেই সময় হইতে চীনদেশে ভারতীয় ভ্রমণগণের ধর্মপ্রচারের সুজগাত হয়। তৎকাল মতঙ্গের নাম অত্খাপি চীনদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অন্তত্বনি হইতে তাহাদের নাম-গোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তাহারা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যবিস্তারে কীৰ্ত্তন উৎসর্গ

করিয়া নানা দূরদেশে ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইয়াছিলেন, যদ্যপি তাহাদের নাম-গোত্র বিলুপ্ত হইলেও, পৃথিবী হইতে তাহাদের আত্মত্যাগের পূণ্যপ্রভাপি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। অত্খাপি চীনসাম্রাজ্যের বিবিধ বিভাগে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত থাকিয়া, সেই সকল বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসিনিককের আত্মত্যাগের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মতঙ্গ চিত্তভ্রান্তায় পায়দন্দী ছিলেন; তিনি চিত্তাকন করিয়া চৈতন্য ও সুপু নির্মাণের শিক্ষাপ্রদানে চীনসাম্রাজ্যের শিক্ষাবিস্তার উন্নতিসাধন করেন।

মতঙ্গের প্রচারযাত্রার সময়ে লইয়া-নামক স্থানে চীনসাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় যে রাজপ্রাসাদে ভারতীয় বৌদ্ধভ্রমণ প্রথম আতিথ্যার্থীকার করেন, তাহা রাজ্যদেশে বৌদ্ধবিহারে পরিণত হইয়া ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ অত্খাপি পুণ্যার্থীর্ধরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই ইতিহাসবিখ্যাত বৌদ্ধবিহার কতকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কোন্ সময়ে কি হুজ্জে ধ্বংসরূপে পতিত হয়, তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাহার ও ভারতবর্ষ হইতে উপনীত হইয়া ভ্রমণগণের এই বিহারে জ্ঞান-বিস্তারে নিযুক্ত থাকিবার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পশ্চিমাংশ হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করে তৎকাল চীনদেশের অধিবাসিবর্গের নিকট মধ্য-এশিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের আকর বলিয়া পরিচিত

ছিল। তখনও চীনদেশের লোকের ভারত-বর্ষের দিকে ধর্মবিশ্বস্ত তথ্য নাই। পৃথিবীর দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের সাক্ষাৎসংঘর্ষে পরিচিতি হইবার নূতন সুযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। কোন্‌চিন-বন্দরের পথে পূর্বাঞ্চল হইতেও চীনদেশে ভারতবর্ষীয় লোকের সমাগমের সূত্রপাত হইল। তখন জলদল উত্তর পথে ভারতবর্ষ ও চীন এক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিতি হইয়া উঠিল। ইহার ফল অল্পকালেই প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছিল। পৃথিবীর তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশের ভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদকার্য্য আরম্ভ হইয়া চীনদেশের সাহিত্যে এক অতিনব শক্তিস্রোতের সূত্রপাত করিল। সংস্কৃত-কাব্যাদির অনুবাদকার্য্যও অসম্পন্ন রহিল না। নৃণগ্রন্থানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার টীকা ও ভাষা রচনার প্রথাও প্রচলিত হইতে লাগিল। এইরূপে চীনদেশে যে বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অত্যাধিকারিক হইয়া নাই; বৌদ্ধবিহারের পুত্রকালরে সুপ্রসিক্ত হইয়া, পুনরায় পুরাকীর্তি প্রচার করিবার লক্ষ উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। যেদিন ভারতবর্ষ বা পাক্‌স্তান-সমাজ সেই গ্রন্থরাশির অধ্যয়ন ও মৰ্ণ্যভূ-সন্ধানে কৃতকাৰ্য্য হইবে, সেদিন ভারতবর্ষের বিলুপ্ত ইতিহাসের বহুবিঘ্নরাম্পদ প্রমাণ-পত্রস্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়া ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্যের গৌরব ঘোষণা করিবে। গ্রীস ও রোমের অধ্যয়নের পর দীর্ঘকাল ইউ-রোপের লোকের নিকট গ্রীস ও রোমের পুরাতন জ্ঞানগৌরব অপরিচ্ছাদিত ছিল; কালে

পুরাতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়া অনুদিত হইয়া গ্রীক জ্ঞানসাম্রাজ্যের পূর্ণগৌরবে আধুনিক ইউরোপকে গর্ভাক করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের পূর্ণগৌরব পুন-রায় জনসমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া নাই,—তিস্মত-চীন, যাপানের অসংখ্য পুরাতন গ্রন্থে তাহার পরিচয় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যেদিন তাহা পুনরায় সভ্যসমাজে প্রচারিত হইবে, সেদিন আমরাও আত্মমৰ্যাদার সমুদ্রত হইতে পারিব।

বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার জনসাধারণের প্রকৃতি ও পূর্বসংস্কারের অনুকূল বলিয়া যেখানে প্রচারিত হইয়াছে, সেখানে হইতে পুনরায় অন্তঃসে প্রচারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকাল ভারতবর্ষের ভ্রমণগণকে একাকী পরিভ্রম করিতে হইয়া নাই। পশ্চি-মাংশে ধর্ম প্রচার করিবার সময় মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধগণ বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, চীনসাম্রাজ্যে ধর্ম প্রচার করিবার সময়ও তাহার ভারতবর্ষের ভ্রমণগণের সহচর হইয়া-ছিলেন। কোরিয়া ও যাপানবীপপুত্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সময় চীনদেশের লোকের সেইরূপ সহায়তা করিয়াছিল। বরং কোরিয়া ও যাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান গৌরব চীনদেশের,—ভারতবর্ষীয় ভ্রমণগণ পরোক্ষভাবে তাহার সহায়তাসাধন করেন।

বৌদ্ধ ভ্রমণগণের পূর্ণপ্রচার উপলক্ষে এশিয়াখণ্ডে বিবিধ জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে কবি, শিল্প ও বাণিজ্য,—ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা, ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের অধীন হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বিবিধ বিস্তার

সমর্থ সাধন করে। কাশ্মীর ও কাকুরা এই কথা বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,— ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল চাইট প্রবল সাম্রাজ্যের সুক্ষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া এক মহাবৃক্ষের প্রবর্তন করিয়াছিল। সে বৃক্ষের পর্যটক, ভীষণাজী ও বণিগবর্গ নিরন্তর একদেশ হইতে অন্ত্রদেশে গমনাগমন করিয়া সকল দেশের জ্ঞানগৌরবের সমগ্রসাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন।*

সভ্যতাবিকাশের পথপ্রদর্শক এশিয়ার অধিবাসিবর্গ যে জ্ঞান লইয়া দেশবিদেশে উপনিবেশ-সংস্থাপনোপাধিত হইয়াছিল, তাত্ কালে দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচারসময়ে আসার তাহার সমর্থ সাধিত হইয়াছিল। তৎকালে এশিয়াখণ্ডে যে জ্ঞানসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা এশিয়ার সাধারণ সাম্রাজ্য; তাহাতে সকল দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা একত্রে মিলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ তাহার মূল বলিয়া, তাহা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য নামে অভিহিত। এই সাম্রাজ্যবিশিষ্ট ভারতবর্ষ শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়া ত্রিসংগ হইতে নানা তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, একদিকে বৃত্তান্তে বিতরণ, অত্রদিকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানের আদান প্রদানের সনাতন নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আধুনিক সভ্যসাম্রাজ্য সভ্য সমাজকে শিক্ষা দিবার সময়ে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া নানা

তত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন, তদ্বারা ইউরোপীয় জ্ঞান পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পুরাকালে ভারতবর্ষের জ্ঞানও এইরূপে সমগ্র এশিয়ার জ্ঞানগৌরবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা দান করিবাতি, গ্রহণ করি নাই,—ইতিহাস এক্ষণে আশ্চর্য্যের পক্ষসমর্থন করিতে অসমর্থ।

বিশেষে ধর্ম প্রচার করিবার তত্ত্ব ভারতবর্ষীয় প্রশংসনকে বিদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইত; ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। চীনদেশের ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য অনুদিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গের অকুতাব্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার কথা অস্পষ্ট চীনে প্রচলিত আছে। মুসলমান পলিফাগন যখন আরবীভাষায় সাহিত্যসংলগ্ন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় বহু পণ্ডিতও অকুতাব্য-কার্য্যে নিযুক্ত হন, এ কথা আরবী সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে-চীনে, ফ্রান্সে-সিংহলে,—এশিয়াখণ্ডের নানান স্থানে—ভারতবর্ষের লোক বাসগৃহ লাভ করিয়া, তদদেশের ভাষা ও সাহিত্য গঠনের সহায়তা করিয়াছিলেন, এ কথা সর্বত্র প্রচলিত আছে। কাকুরা ও কাকুরা চীনদেশসম্বন্ধে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন, এক সময়ে লইয়াং-নগরে তিনসংগ ভারতবর্ষীয় প্রশংসন ও যত্ন সহস্র ভারতবর্ষীয় পরিবারের বাস ছিল।

* We have here the clue to a great era, when North-Western India was a central point between two empires, and through a living world of communication, travellers, pilgrims, and traders carried the common culture back and forth.—*Ideals of the East*.

তাইরা চীনদেশের ধর্ম ও শিল্পাদির উপর ভারতীয়ভাব সূচনুপ্রসূত কুঁচিবার ভক্তই চীনদেশে ব্যাপ্ত করিত। তাহাদের প্রভাবে চীনদেশের ভাবব্যঞ্জক বৈয়াকরণ শব্দব্যঞ্জক সামর্থ্য কমিত হইয়া, কাণক্রমেবাপানদেশের অভিনব বর্ণমালা গঠিত হয়।*

এশিয়ার যে সকল জনপদে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্য প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যেই লোকে যে ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থ পাঠে, ব্যাখ্যায় ও অনুবাদে আবৃত্ত হইবে, ইহাও স্বাভাবিক কথা। হিন্দুর এই কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার কথা সভ্যসমাজে সর্বত্র সুপরিচিত। হিন্দুর ভায় ~~বুদ্ধ~~ শত লোকে নানা দেশে এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের জ্ঞান, কখন ভারতবর্ষের মূলগ্রন্থের ভিতর দিয়া, কখন বা ভাষান্তরিত হইয়া, নানাপানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ভাব যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই মানা দার্শনিক তথ্যলোচনার মানব সমাজকে সমুদ্রত করিয়াছে। কলহ-কোলাহল পণ্ডিত; শান্তি ও সত্যবৎকনই প্রকৃত মানবধর্ম। ভারতবর্ষ মানবধর্মপ্রচারে এশিয়ার কলহ-কোলাহল শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার প্রভাবে দেশে দেশে কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের সমুদ্রিত সাবিত

হইয়া সমগ্র এশিয়াতেও কিংবাকালের অন্ত সভ্যতার সমুদ্রিত সাগন করিয়াছিল। এশিয়ার শিল্পদেশের ইতিহাসলেখক কাকান্ন ও কাকান্না নানা প্রমাণের আলোচনা করিয়া, এশিয়ার এই জ্ঞানগৌরবের চিত্রাকনে ভারতবর্ষের বিজয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য এই অভিনব গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনার অগ্রসর হয় নাই।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ইতিহাস সকলনের অন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ যে সকল প্রমাণের আলোচনার আবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অপ্রচুর হইলেও, তদ্বারা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশে ইহাতে বিজ্ঞাপিকা বা তীর্থদর্শনের রক্ত যাহারা নামে দেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কত লোকে এই ভাবে ভারতজনন করিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতবর্ষের জ্ঞাননিষ্ঠার পদোক্তভাবে সহানুভূতি করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যানির্ণয় করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই চীনদেশের লোকের ভারতভ্রমণের চেষ্টায় বহির্গত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জৈংসিং-নামক সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণে এই নিষিদ্ধ করিবার সময়ে ইহার উল্লেখ

* * There were at one time in Loyang itself, to impress their national religion and art on Chinese soil, more than three thousand Indian Monks and ten thousand Indian families; their great influence may be judged from their having given phonetic values to the Chinese ideographs, a development which, in the eighth century, resulted in the creation of the present Japanese alphabet.—*Ibid.*—*ibid.*

করিয়া গিয়াছেন । * সে সময়ে তাহার চীনদেশে হইতে বৃৎগয়ার উপনাত হইয়াছিল, তাহাদের মন্ত্র প্রাপ্যনামধেয় নরপতি একটি স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন ;— ইংসিং তজ্জহার ধর্মসাধনেষ দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন । তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য-এশিয়ার খোটাননগরের বৌদ্ধবিভাগের চীনদেশের চু-সিহিং নামক তীর্থযাত্রীর উপনীত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাহার পর ফা-লিঙ্গ-নামক তীর্থযাত্রী মধ্য-ভারতে উপনীত হন । বৃৎগয়ার নিকট চীনদেশের ভাষায় খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া, ইহার সঁতাতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে । চইখানি খোদিতলিপিতে চি-আই এবং হো-য়ুন নামক চীনদেশের তীর্থযাত্রীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; এবং চি-আই যে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । † এই সকল তীর্থযাত্রীর ভারতজয়কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তাহাদের লিখিত গ্রন্থাদি চীনদেশে বর্তমান আছে কি না, এ পর্য্যন্ত তাহাও নির্ণীত হয় নাই । ফা-হিয়ান্

ও হিঙ্গ-থসানের লিখিত ভারতজয়কাহিনী খটনাক্রমে পাণ্ডিত্য সভাভাতির হস্তগত ও অমুদ্রিত হইয়া, ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বসন্ধানের পক্ষে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে । অতাপি তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই নানা বিষয়ের তথ্যসম্বন্ধনের চেষ্টা প্রচলিত রহিয়াছে । এই সকল ভারতবিবরণী পাঠে জানা যায়,—মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে ভারতবর্ষের স্মৃতিত্যা ও বর্ণমালাও প্রচলিত হইয়াছিল । ‡

চীনদেশে গমনাগমন করিবার সহজ পথ আবিষ্কারের মন্ত্র চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল । স্থলপথে গোবি-মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করা নিরতিশয় আশঙ্কাজনক হইলেও, সে পথে বহুগোকে বিচরণ করিত ; মলপথে ভারত ও প্রান্ত মহাসাগরের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া চীনদেশে গমনাগমন করা কষ্টসাধ্য হইলেও, লোকে তাহা হইতে বিরত হইত না । তিব্বতের তুষারচ্ছন্ন পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া গমনাগমনের পথ আবিষ্কৃত হইলে, দুর্ব্বলের ভ্রাস হইলেও, গমনাগমনের ক্রেশ বা আশঙ্কার ভ্রাস হইতে প্যরিল না । তথাপি লোকে এই সকল পথের

* We are told by I-tsing who lived about 670 A.D. that 500 years before his time 20 men, or about that number had found their way to the *Mahabodhi* tree in India, and for them and their fellow countrymen a Maharaja called Srigupta built a temple. The establishment was called the "Tchina temple". In I-tsing's days it was in ruins..... *Buddhistic Records of the Western World, Introduction.*

† J. R. A. S. (New Series) Vol. XIII. 552—572.

‡ The customs and spoken language are like those of the people of Khotan, but the written character in use is that of the Brahmins.— *Buddhistic Records of the Western World, Vol. I.*

আবিষ্কারে ও ব্যবহারে প্রস্তুত হইয়াছিল। কেবল কৌতূহলচরিত্রাথতা ইহার ফল বণিয়া বীকান্ত করা যায় না। চাঁদার প্রভাব চীন-দেশের সমগ্র শিক্ষাদীক্ষার উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই শিক্ষা চীন হইতে কোরিয়া এবং কোরিয়া হইতে যাপানবীপ-পুঙ্খ ব্যাপ্ত হইবার সময়ে, সে সকল দূর-দেশেও ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে ভারতবর্ষের প্রভাব-বিস্তার করে। যাপানে তাহার নিদর্শন অজস্র বিলুপ্ত হয় নাই।

যাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, সে দেশের অরল পুরুষদিগের মধ্যে কনফু-শনের শিক্ষার প্রভাব ছিল। তৎপূর্বে যাপানের ধর্ম পিতৃলোকপূজার সরল ও স্বাভাবিক ধর্মরূপে দীর্ঘকাল শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের উপর প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। সাগরবেষ্টিত যাপানবীপপুঙ্খ এশিয়ার বিস্তৃত জনপদ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকিয়া, নানা দ্বিবে এশিয়ার অঙ্গগামী হইয়াও, অনেক বিষয়ে স্বাধীনচিত্তের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছে। তজ্জন্ত যাপানসাম্রাজ্য আদিমকাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ধর্ম, নীতি ও লোকশিক্ষার কোন প্রধাউ একে-বারে লুপ্ত হইবার অবসর প্রদান করে নাই। সে দেশে আদিযুগের পিতৃলোকপূজা, পর-বর্তী কনফুশস ও শাক্যসিংহের শিক্ষা অঙ্গাঙ্গি ভূলাভাবে সমাধর লাভ করিতেছে। যাপানবাসীর স্বাধীনচিত্তপ্রিয় সরল স্বভাব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নানা উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়া, কাব্য, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, হস্তশিল্প, বিবিধ সৌন্দর্য্যের বিকাশসাধনে রূতকার্য্য

হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইবার পূর্বে যাপানবাসীর প্রতিভা যে পথে ধাবিত হইত, উত্তরকালে তাহার গতি ভারতবর্ষীয়-ভাবাজুরূপ হইয়া, অভিনব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপায় উদ্ভাবনে ধাবিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম চীন ও কোরিয়ারাজ্যে প্রতি-ষ্ঠিত হইলেও, যাপানবীপপুঙ্খে সহস্রা প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে যাপানের শাসনপ্রণালী পৃথক ছিল। মহারাজী জিম্মো যাপানের প্রাতঃস্বর্গীয়া রমণী। তিনি সিংহা-সনে আরোহণ করিয়া, কোরিয়ারাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান মন্ত্রীর বংশ “সোগাবংশ” নামে পরিচিতি। এই বংশের সম্রাট বাজিবর্গই মহারাজী জিম্মোর সম্রাট হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যাপানের শাসনকার্য্যে আধিপত্য করিতেন। “সোগাবংশীয়” মন্ত্রি-বর্গ শাসনকার্য্যে সক্ষম কর্তৃব পরিচালনা করিলেও, “মনোনোববংশীয়গণ” সেনাবিভাগ-গের কর্তৃব পরিচালনা করিতেন। “মুকো-চৌমোবংশীয়গণ” নৌসেনার অধিপতি থাকিয়া “মনোনোববংশের” দলভূক্ত ছিলেন। “সোগাবংশীয়গণ” উন্নতিশীল, উদারস্বভাব ও জ্ঞানলিপ্সু বণিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। “মনোনোববংশীয়গণ” বিতিশীল, সংস্কার-বিরোধী, বদেশজাত-সর্বপ্রকার-পুণ্যভন-সংস্কাররক্ষার্থ নিয়ত বদ্ধপরিকর। এই উভয় দলে প্রাধান্যলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, এক সময়ে নানা বিদ্বেষে সমগ্র দেশ বিপদাপ্ত করিয়া নরহত্যা ও রাজ-হত্যায় যাপানের হাতহাস কলঙ্কিত করেন। সেই সময়ে কোরিয়া হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি যাপান দেশে প্রেরিত হয়। যাপানসম্রাট তখন

উত্তর দলের মনোমোহিত বিপর্যাস ; দাবী-
ভাবে কোন কার্যে অগ্রসর হইবার উপায়
ছিল না । তিনি বুদ্ধমতি প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে মত-
দ্বিচ্ছাস্থ হইলে, উত্তর দলে মতভেদ উপস্থিত
হইল ।

• “সম্রাট স্বয়ং বুদ্ধমতির সমাদর করিবার
অন্ত উৎসুক হইয়াও, “মনোনোব” ও “নাকো-
চৌনিংখীর” রাজপুরুষগণের প্রতিবাদে
কর্ণপাত করিতে বাধ্য হইলেন । “সোগা-
বংগীদ” মন্ত্রী আপন উদ্ভানবাসিতে মূর্তি-
প্রতিষ্ঠা করিয়া, শাকাসিংহের সম্মানরক্ষা
করিলেন । পরবৎসর দেশে তড়িক ও মারী-
তর উপস্থিত হইবামাত্র, অত্রান্য জনসাধা-
রী বুদ্ধমতি প্রতিষ্ঠাকে তাহর কাগধ বনে
করিয়া, বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত মূর্তি ধ্বংসের জলে
বিসর্জন দিল । কিন্তু চীন ও কোরিয়া হইতে
যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ক্রমে বাপান-
বাসে আসিবার চেষ্টা উপনীত হইতে
লাগিলেন, তাহাদের সঙ্গে বুদ্ধমতি পুনঃপুনঃ
আনীত হইতে লাগিল । বহু শতাব্দীর শেষ
ভাগে রাজকুমার উমাদানো বৌদ্ধধর্মের
অতুল্য এবং নাগার্জুনের মতামত প্রণয়ন করিয়া
বৌদ্ধশাস্ত্রে ভাব্যরচনায় নিযুক্ত হইয়া,
বাপানবীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্মপ্রতিষ্ঠার স্বরূপাত
করিলেন ।

বৌদ্ধশাস্ত্রে “অতিদ্বন্দ্ব মৌকশাত্র” নামক
এক সর্বজন প্রচলিত । এই এক চীন, বাপান
প্রভৃতি বহু দূরদেশের ভাব্যর অন্বিত ও
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তদন্ত এই গ্রন্থের
রচয়িতা বহুবদ্ধর নাম বহুবদ্ধর “চিরমরগীর
হইয়া রহিয়াছে । তিনি গাঙ্গারদেশে জন্ম-
গ্রহণ করেন । উপায় প্রচার বাসস্থান উত্তর

কালে পূণ্যার্থীত্বরূপে পরিগণিত হইয়াছিল ;
তীর্থযাত্রিগণ তথায় উপনীত হইয়া বহুবদ্ধর
মতামতের রক্ষা করিতেন । স্থাননিষ্ঠত্বের
অন্ত একখানি কলকলিও রক্ষিত হইয়া-
ছিল । হিরণ-প্লাব তাহার উল্লেখ
করিয়া গিয়াছেন । বহুবদ্ধ একজন বোধি-
সম্বন্ধে বৌদ্ধমতের প্রচলিত । এই
পূণ্যস্থ সকল দেশের বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে নাম-
কৃত বর্তমান । কিন্তু বহুবদ্ধমতের অস্তিত্ব
বিষয়ে নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ।
কাহারও মতে তিনি বিংশ বা একবিংশ মহা-
বীর বা বৌদ্ধধর্মভেদ । মোক্ষমূলর বলেন,
—বহুবদ্ধ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে আ-
ত্মত্ব হইয়াছিলেন । তাহা সত্য হইলে, চীন-
দেশের বৌদ্ধগ্রন্থের অনেক উক্তি নিতান্ত
অলৌকিক হইয়া পড়ে । কিন্তু এ বিষয়ে মোক্ষ-
মূলরের অসম্মান অপেক্ষা চীনদেশের বৌদ্ধ-
সাহিত্যের উক্তি সঙ্গতিপূর্ণ বিবাসযোগ্য
বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত । কাকাস
ও কাকুরা বলেন, বহুবদ্ধর প্রভাব বাপান
পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল । তিনি
লিখিয়াছেন, —বহুবদ্ধর শিষ্য মিজসেনের
নিকট শিক্ষাগত করিয়া, হিরণ-প্লাব চীন-
দেশে প্রভাগমন করিলে, তদন্থে ধর্মসংস্কা-
রের স্বরূপাত হইয়া “হোমো” নামক অভি-
নব সম্ভাব্যের সৃষ্টি হয় । এই সম্ভাব্য
বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক জ্ঞানকাণ্ডের আলো-
চনায় ব্যাপৃত ছিলেন । হিরণ-প্লাবের
নিকট জ্ঞানশিক্ষার জন্য বাপান হইতেও ছাত্র-
গণ অধ্যয়নার্থ উপনীত হইতেন । বাপানী
শিষ্যগণের মধ্যে দোমো-নামক প্রথম হির-
বুদ্ধের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, ৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে

বশেষে প্রত্যাবর্তন করিয়া, ধর্মসংস্কারে প্রযুক্ত হন। সুতরাং কেউরিয়া হইতে যাপানদ্বীপ-দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইলেও, কালে ভারতবর্ষের বহুবছর শিক্ষাই সে রাজ্যে ধর্ম-সংস্কারসাধনের হ্রতপাত করিয়াছিল। তজ্জন্ত কাকুহু ও কাকুহা ভারত-

বর্ষকে “ভাবের নাকুহু” বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—অতীতের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যাপান পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে পূর্বাশ্রয়কে অধিক ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট হইতেছে।

প্রার্থনা ।



সকলেই জানেন একটা গর আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়া ছিলেন। এত-বড় সুযোগটাতে হতভাগ্য কি সে চাহিবে, ভাবিদা বিস্ময় হইল—শেষ-কালে উদ্ভ্রান্তচিত্তে যে তিনটে প্রার্থনা জানাইল, তাহা এনি অকিকিংকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অশুভাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপৰ্য্য এই যে, আমরা মনে করি, পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব চেয়ে জাগ্রাম্যমান আমি সব চেয়ে কি চাই, তাহাই বুঝি সব চেয়ে আমার কাছে সম্পূর্ণ—কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার বথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে—সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অশুভ ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলি-

বার তার লইয়াছে। • যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্দেশ্যী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে,—নতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে সঙ্গাৎ তাহার অশুভ করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদের কাছে ধরা দেয় না।

আমার সব চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোনটা? যে ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিয়ত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহত, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয় কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে করজন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? আমি কি, আমার মধ্যে যে

• And now, in spite of the separation of ages, Japan is drawn closer to the motherland of thought. *Ideals of the East.*

একটা প্রকাশচেষ্টা চানিতেছে তাহার পরিণাম কি, তাহার গতি কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে ?

অন্তএব ধর্মবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ ধর্ম, প্রার্থনা জানাইবার জন্তও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার বধ্যার্থ প্রার্থনা কি, তাহা জানিবার জন্ত আঁতাকে স্বর্গীয় সময় দাও। মহিলে উপস্থিতমত হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয় ত ভয়ানক ঝঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি—আমাদের জীবনটা এই কক্ষেই আছে। আমরা কি প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরশ দরিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম নব্বন করিতেছি,—আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্ত ? আমি বধ্যার্থ কি চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্ত। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বহু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাধানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার প্রার্থনা কি, তাহাই জানি না।

বাহার্য আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন,—শোনা গিয়াছে তাহার কি বলেন। তাহার দ্বারা বলেন, একটামাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—

অসত্য বা মদ্যমদ, তমসা বা ভোতির্ঘন,

বৃত্তান্তমুতঃ পথঃ ।

সাব্যবহিক এমি কত্র গতে পক্ষিণঃ দুঃ

তন মাং পতি নিত্যং ।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত্যু লইয়া যাও! হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। কত্র, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা কর।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরো বৃথা। আমরা যখন সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে বধ্যার্থ চাহিব, সৰ্বশ্রম জীবনে তাহার পরিচর্য্য দিব, তখন এ প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণপোচের হইল—কিন্তু তবু এখনো প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শক্তাংশের মধ্যে সংহতভাবে, নিষ্কৃতভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু বতকণ তাহা অমূরিত হইয়া আকাশে, আলোকে যথা না ভুলিয়াছে, ততকণ তাহা না থাকারই, তুলা হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততকণ আমরা তাহাকে জানিই না,—বতকণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া স্তম্ভ আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই বধ্যার্থ প্রার্থনাটি কি, তাহা অনেকসময় অস্তের ভিতর দিয়া জ্ঞানাদিকপরে জানিতে হয়। গগনতরঙ্গ নগপুংগেরা আমা

‘মিগকে নিজের অন্তর্গত ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করুন ।’ আমরা চিরকাল মনে কুরিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাই-তেই চাই, আরাম করিতেই চাই—কিন্তু যখন দেখি, কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তখন হঠাৎ এক-রকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের-মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন । আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্তও জানিতে পারি—কিসের প্রতি আমার বপার্ণ তত্ত্ব, কি আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা :

তখন আরো একটা কথা বোঝা যায় । ইহা বুঝিতে পারি যে, যে সনত্ত ইচ্ছা প্রতি-ক্ষণে আমার অগোচরে, বাহ্যিক কেবলি আমাকে ত্যাগনা করে, তাহারাই আমার অক্লান্ত ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বার্ষা দিতেছে, ক্ষুষ্টি দিতেছে না, তাহাকে কেবলি আমার চেতনার অন্তরালবর্তী, আমার চোটার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে ।

আর, বাহ্যিক কথা বলিতেছি, তাঁহারি পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত । যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাবস্তু, বাহ্যিক মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে—অসত্যো যা সদগময়, তদসত্যো যা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা-মৃতং গময়—এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বা-পেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর সনত্ত ইচ্ছা ছায়ার মত

তাহার পশ্চাদ্বর্তী, তাহার পদতলপত । তিনি জানেন—সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের ইহা না হইলেই নয়—অন্যবস্ত্তনমানকে তিনি কণিক ও মাংশিক আবৃত্তক বলিয়াই জানেন । বিশ্বমানবের ঐক্যনিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া ভগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্ত মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন । আর আমরা খাই-পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—মানবের চিরস্থান সত্য ইচ্ছাকে আমা-দের যে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে জীবনের কণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায় ।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে । মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধা, প্রতিভাসাধা কৰ্মের ধারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতাসম্ভবানের পরিচয় দেয় ।*

তাহা কোনোমতেই নহে । তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশ্রয় করিতে পারিত না । বাহ্যিক সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, বপার্ণভাবে ইচ্ছার কৰ্ম্ম । ইহা আত্ম-কিছু নয়—বাহ্যিক কাছেরই আছে, তাহাকেই পাওয়া ।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদের কাছে বাহ্যিক-কিছু দিবার, তাহা আমাদের প্রার্থন্য

অন্ত এ কথাটা স্পষ্ট স্বীকৃতিতে পারে যে, মন্ত-
তার অবাধ স্বাধীনতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ নহে ।
যে দ্বিবিজ হতভাগা, ধনী বাতালের পক্ষে

দাঁড়াইয়া, তাহার মনের বোভলটাকেই লোভী
করিতে শিখিতেছে, ঈশ্বর, তাহাকে বলা
করুন !

বেদান্তের প্রথম কথা ।

বেদান্ত শুদ্ধ যে একটা দার্শনিক বাহ্যবাদ,
তাহা নহে । সমগ্র হিন্দুজাতি বেদান্তের
দ্বারা পরিচালিত । হিন্দুর যোগ-ভক্তি-কর্ম,
হিন্দুর সাধন-ভজন-ধর্ম, হিন্দুর রাজনীতি,
সমাজনীতি, চতুঃশ্রম ও চতুঃবর্ণবিধি—সমস্তই
বেদান্তপ্রতিপাদিত শুদ্ধাঐতজ্ঞানের উপরে
সংস্থাপিত । সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি
অঐতাসুতরসে পরিপুষ্ট হইয়াছে । সম্পদে-
বিপদে প্রতিষ্ঠা ও বিপদে অঐতমূলীন-
নিকাষধর্ম-পালনে হিন্দু নরকে অতিক্রম
করিয়াছে । কত-না সভ্যজাতি কালপুর্বে
বিলীন হইল, কিন্তু হিন্দু অরব কেন না,
বেদান্তরূপ তাহার অগ্নিবল্লভকে সন্ততই
স্মিত করিতেছে । হিন্দুর দর্শনে ও ধর্মে,
সাহিত্যে ও বিধিব্যবস্থায় বেদান্ত কিরূপে
ক্ষুণ্ণীকৃত করিয়াছে, তাহার সম্যক বোধ
আবশ্যক । বেদান্তবিজ্ঞানের এই ধারা-
বাহিক ব্যবহারসুদৃঢ়িত জদয়কম না হইলে
কোন কল হয় না—কেবল “বাধিততার
সৃষ্টি হয় মাত্র । আমি এই প্রবন্ধে বেদান্তের
মূলকথা মূলত ব্যাখ্যা করিব । এই ব্যাখ্যা
পরে বাহাতে ব্যবহারোপযোগী হয়, সেট
দ্বিতীয় আবার লক্ষ্য রাখিব ।

বেদান্তবিজ্ঞানের আরম্ভ অজ্ঞানে ও পর্যা-
বসান জ্ঞানে ।

নৈসর্গিকেরা অজ্ঞানকে অভাবাত্মক
“negative” বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।
কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত একটি ঘোর প্রবাদ ।
অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী । কিন্তু জ্ঞান
তাবরণাথ (positive) । আত্যন্তিক
অভাব কি কখন ভাবের বিরোধী হইতে
পারে । বাহ্য একাত্মই নাই, তাহা আবার
কি করিয়া বিরোধ ঘটাইবে । বৈদান্তিকেরা
অজ্ঞানকে অভাবাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন
না । সদানন্দ বোগীক্ৰ বেদান্তসারগ্রন্থে
অজ্ঞানকে—“জ্ঞানানুরোধিতাবরণম্”—বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন । অজ্ঞান আংশিক-
জ্ঞানরূপেই গৃহীত হয় । যখন কেহ বলে,
‘আমি অজ্ঞান, আমি জানি না’, তখন সে
তাহার আংশিক জ্ঞানেরই পরিচয় দেয় ।
‘কিঞ্চিৎ জানি, কিঞ্চিৎ জানি না’—ইহা সংক্ষেপে
প্রকাশ করিতে গেলে, ‘আমি অজ্ঞান’—
এইরূপ বলিতে হয় । মৃত ব্যক্তিকে অজ্ঞান
বলা যায় না, কিন্তু মূর্ছিত ব্যক্তি অজ্ঞান
হইয়াছে—এইরূপ বলা হইয়া পাকে ।
তাহার কারণ এই যে, মূর্ছাকালে জ্ঞান

একাত্ত নষ্ট হয় না, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ হস্তাকারে থাকে। অজ্ঞান জ্ঞানের অত্যন্তিক অভাব নহে। উহা বস্তুসম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান উৎপন্ন করে। পক্ষে দর্শিত হইবে যে, আংশিক জ্ঞান বিপরীতবুদ্ধি বা ভ্রম উৎপন্ন করে। তজ্জন্মই আংশিক জ্ঞান অজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানের বিরোধী।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিরোধকে এক্ষেপণ্যবাসিত করা। তজ্জন্ম বিরোধকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র সৃষ্টিত হয়। বিরুদ্ধ-ধর্মীর বিরোধের অপবাদ করিয়া অভেদতাবের প্রতিষ্ঠাকে অপবাদস্বায় (dialectic) বলে। এই অপবাদব্রীতি অবলম্বনে বৈরাগ্যবিজ্ঞান তেজবহুলতাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর একস্তায় লইয়া যায়—অবশেষে ভূমার অনন্ত অধিকারে সমস্ত বৈতবিরোধের তিরোধান নিম্পন্ন করে।

পাশ্চাত্য নবান ভাষের আরম্ভ সদসৎ-বিরোধের উপর প্রাতিষ্ঠিত, সৎ (being) অসত্তের (non-being-এর) বিরোধী—এই সিদ্ধান্তটি উহার মূলে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই সদসত্তের বিরোধ কালনিক। প্রথমত সৎ কিংবদন্ত, তাহা আমার জানা প্রয়োজন। আমার জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যদি অস্তিকে ধরিতে বাই, তাহা হইলে শূন্যে লক্ষ্যপ্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত অসৎ—তাহা সম্পূর্ণ অভাবময়—জ্ঞানের তরুণ্যবিশিষ্টতার একটি কালনিক উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। একপ্রকার শূন্যতা বিরোধ জুলিতে পারে না। তজ্জন্ম জ্ঞান-বিরোধী ধন্যমূল অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান (experience) অধৈতদিক্টিব উপযোগী দোষান।

পূর্ণেই বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞান আংশিক-জ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়। আবার জ্ঞানশিক জ্ঞান বিপরীতবুদ্ধি উৎপন্ন করে। “অতঃপর বুদ্ধিঃ”—যে বস্তু বাহ্য নহ, উহাকে তাহাই মনে করা বিপরীতবুদ্ধি। ইহার অপপর সংজ্ঞা ভ্রম বা অধ্যাস। আমাদের সমস্ত ধারণা এই ভ্রমাস্বক-অধ্যাস-রচিত। তবে আমি যে লেখনীর দ্বারা লিখিতেছি, তাহা লেখনী নহে, কিন্তু সর্প—এতরূপ ভ্রম নহে। জ্ঞানে-স্ত্রিরসকল আমাদিগকে কল্পন প্রবর্তিত করে না। অন্ধকারে রজ্জু সর্পবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। ইস্ত্রিরগণ কি এখানে আমাদিগকে প্রতারণিত করিয়া ভ্রমে নিক্ষেপ করে?—কথাটা নহে। রজ্জুতে শব্দস্পর্শরূপসমুদয় পক্ষবিধরই বর্তমান। যদি আমি নেত্রধনাদি পক্ষেস্ত্রিরের দ্বারা রজ্জুকে পক্ষীকা করিতাম, তাহা হইলে রজ্জু রজ্জুরূপেই প্রতীত হইত, সর্পরূপে প্রকাশ পাইত না। অন্ধকারে চক্ষুর বতনুর কাঁচা করা সাধ্য, ততনুর করি-য়াছে;—অজ্ঞাত ইস্ত্রিরের সাহায্য না পাইয়া রজ্জুর সর্পসাদৃশ্যকে সর্পদৃশ্যে পরিণত করি-য়াছে। বাহ্য পক্ষেস্ত্রিরের দ্বারা নির্ণয়, তাহাকে একটিনাত্র ইস্ত্রিরের দ্বারা পরীক্ষা করিলে প্রতারণিত হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি কেহ বলে যে, সকল ইস্ত্রিরগুলি মিলিয়া প্রতারণা করিতে পারে, সে বলার কোন অর্থ নাই। নিখিল মানবকুল যদি প্রবঞ্চক হয়, তাহা হইলে বক্তনাকেই সাধুতা বলিতে হইবে। অধ্যাসের অর্থ “ইচ্ছা নয় যে, বধন একটি অর্থ দৃষ্ট হয়, সেটি অর্থ নহে, কিন্তু গন্ধিত বা অস্ত কোন বস্তু, অথবা তাহা বস্তু-পরিণতিত নহে, কেবল ভ্রম। কোন

বস্তু আমার ইন্দ্রিয়গোচর হইলে জানের প্রক্রিয়া বা-বিষয়বিষয়ীর সামঞ্জস্যে কোন ত্রুটি বা প্রত্যাহার ঘটে না। কিন্তু বৈকল্যে আমি ঐ বস্তুকে কোন এক ব্যক্তিরূপে আত্মসম্বন্ধ পদার্থ বলিয়া ধারণা করি, তৎকালেই আমার অধ্যাসভ্রম হয়। বাহ্য অসঙ্গত (contradictory), তাহাকে সঙ্গত (consistent) মনে করা—বাহ্য অনাস্ব ও অপ্রতিষ্ঠ, তাহাকে আনস্ব ও প্রপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ধারণা করা—বাহ্য প্রাতিভাসিক (appearance), তাহাকে পারমার্থিক (real) বিবেচনা করা—এতরূপ বিপরীতবুদ্ধিকে অধ্যাস কহে। অরুচীকে রজ্জু স্পর্শও প্রতিষ্ঠাত হয়। প্রতিষ্ঠাত সর্পের নিম্নের কোন সঙ্গতি বা প্রতিষ্ঠা নাই। তথাপি রজ্জুর আনস্বঙ্গতি বা আনস্বপ্রতিষ্ঠা অনাস্ব সর্পে আরোপিত হয়।

অনেক হস্তিদর্শনকথার অধ্যাসের লক্ষণ অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। একদা সাতজন অন্ধ হস্তিতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়াছিল। কোন বন্ধুকর্ষক হস্তিসন্ধিধানে নীত হইলে তাহাদের মধ্যে একজন হস্তীর কর্ণস্পর্শ করিয়া বলিল—“অহো, হস্তী স্পর্শকার।” দ্বিতীয় অপর একজন ও স্পর্শ করিয়া উচ্চৈশ্বরে বলিল—“স্পর্শকার নহে, সর্পাকার।” তৃতীয় পাদস্পর্শ করিয়া সমর্পে ঘোষণা করিল—“স্পর্শও নহে, সর্পও নহে, শুভ্র”—ইত্যাদি। অনেকে তাহাদের ইন্দ্রিয়কর্ষক প্রত্যাহারিত হয় নাই। তাহারা কর্ণাদি অবয়বসকলের বাহ্য পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। তবে ভ্রম কি প্রকারে আসিল। আংশিক জ্ঞানই এই প্রমাদ

ঘটাইয়াছে। অবয়বসকলের আনস্বহিতি নাই, অবয়বী হস্তীই তাহা জ্ঞাচ্ছে। স্পর্শরূপ কর্ণ নিম্নেতেই স্থিত, আধারের অপেক্ষা করে না—এইরূপ ধারণাই ভ্রম। কর্ণেতে হস্তিত্ব আরোপ, আর অনাস্ব আনস্ব-আরোপ, একই কথা। যদি অনেকে দৃষ্টিশক্তি পাইত, তাহা হইলে দেখিত যে, তাহারা তাহাদের স্পর্শ বা সর্পের আকার প্রকারগুণক্রিয়াদির সম্বন্ধে ভ্রান্ত হয় নাই, কিন্তু বস্তুধারণার তাহাদের অধ্যাসভ্রম হইয়াছে।

বিশেষরূপ পর্যাণোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, আমাদের সমস্ত ধারণা (logical judgment) এই অধ্যাসরূপ-ভ্রম-বিষয়িত। আমি সূর্য দেখিলাম, আর আমার ধারণা হইল যে, সূর্য সত্য,—প্রপ্রতিষ্ঠ,—আপনাতে আপনি থাকিতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমার অজ্ঞানকে সংশোধিত করিয়া বলিলেন যে, সূর্য সত্য নহে, কিন্তু সৌরজগতের কেন্দ্র। যদ্রূপ গ্রহতারকাসকল তাহাদের স্থিতির জন্য সূর্যের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ সূর্যও স্বকীয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের অপেক্ষা করে। এই তত্ত্ব শিথিয়া ও জানিয়াও সূর্যের স্বাতন্ত্র্যের সংস্কার যায় না। জ্যোতিষকে অগ্রাহ্য করিয়া নির্জিহ্নে মনে করা যায় যে, সূর্য চিরদিন আকাশে একাকী সঙ্কলনরূপে হইয়া দোদুল্যমান থাকিতে পারে। বিজ্ঞানের দ্বারা সংস্কার যদি বিশেষরূপ পরিমার্জিত হয়, তাহা হইলে সৌর-জগৎকে ছাড়িয়া সূর্যের ধারণা না হইতে পারে, কিন্তু সৌরজগতে আনস্বপ্রতিষ্ঠা আরোপ না করিয়া সূর্যের ধারণা হইবে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি অনাস্ব সূর্যে

আত্মরূপ আরোপ করে। শিক্ষিত ব্যক্তি সৌরভগতে আত্মবৃত্তি আরোপ করিয়া স্বর্ষ্যের ধারণা করে।

সকল ধারণার মূলে দেশ ও কাল বর্তমান। দেশ ও কালের দ্বারা ব্রহ্মস্বক আর কিছুই নাই। আমি একটি ত্রিকূল মনে করিলাম। ত্রিকূলটিকে আত্মসঙ্গতি দিয়া কতই চিত্তবিচিত্র করিলাম। অবশেষে দেখিলাম যে, ত্রিকূলটির কোন ভ্রাতৃপ্রতিষ্ঠা নাই। উহা এক বৃহত্তর ত্রিকূল বা বহুকূলের অংশরূপে গৃহীত না হইলে একে-বারেই তিষ্ঠিতে পারে না। বৃহত্তর ত্রিকূলের দশাও সেইরূপ। কাহারও আত্মবৃত্তি নাই। তবে প্রতিষ্ঠা কোথায়? গতাত্তর না দেখিয়া আমরা এক স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ বা মহাদেশের করুনা করি ও সমস্ত আংশিক বেশ তাহারই অন্তর্গত করিয়া দেখি। এইরূপ অসঙ্গতির আশ্রয়গ্রহণ না করিলে আমরা কোনপ্রকার ধারণা করিতে অক্ষম। আন্দ্রিবে, দেশই হউক আর মহাদেশই হউক, বাহ্য অংশী, তাহা নিজে একটি অংশ—বস্তুর বা স্বরূপ হইতে পারে না। ইহা জানিয়া-তিনিরা আমরা ভ্রমের পূজা করি, কেন না, আমরা নিরূপায়। আমাদের কালসম্বন্ধে ধারণাও এইরূপ ভ্রমমূলক। অধ্যাসমূলক সংস্কারের এত প্রবলতা যে, আমরা ইত্যন্ত-রাসিত পদার্থসমূহকে বিচারের দ্বারা অনাস্ব ও স্বপ্রতিষ্ঠ জানিয়াও তাহাদিগকে আত্মরূপ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ব্যবহার করি। এই কার্য-কারণশৃঙ্খলাহিত বিবে কোন বস্তু ব্যতিরিক্ত (in itself) আত্মবস্তু নহে। আর অন্যভাবেই সমস্ত আত্মবৃত্তি গঠিত হইতে

পারে না, তবে আমরা মহান্ অনবস্থাগর্ভে ভবিষ্যৎ হাইবার ভাবে অংশে পূর্ণতা আরোপ করিয়া ব্যবহারোপলক্ষ্যে বস্তুসকলের আত্ম-সঙ্গতি স্থাপ্তি করি।

অজ্ঞানের কণ্ডক পরিচয় পাওয়া গেল। এখন জ্ঞানের পরিচয় আবশ্যক। জ্ঞানবস্তু পূর্ণ ও সর্বময়। কিছুই জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান আংশিক জ্ঞান হইয়া যাইবে। জ্ঞানবস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একাকার। জ্ঞান শুদ্ধ জ্ঞান নয়, কিন্তু জ্ঞানাজ্ঞানির জ্ঞানময়।

পাশ্চাত্য নবীন দার্শনিকেরা জ্ঞানসম্বন্ধে এক ঘোর প্রমাণে পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞেয় (object) ও জ্ঞাতার (subject-এর) মুখামুখি স্থিতি (opposition) হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু ইহা আংশিক জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান নহে। ঘট-পটাদি অনাস্ববস্তু বস্তুতা আত্মরূপ হয়, ততটা জ্ঞেয়; বস্তুতা আত্মরূপ না হয়, ততটা অজ্ঞেয়। এইরূপ বৈতজ্ঞান আংশিক জ্ঞান। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানে বৈতজ্ঞান সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান-বস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মুখামুখি স্থিতি হইতে পারে না। যদি হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যতিরিক্ততা ঘটিবে ও জ্ঞান আংশিক জ্ঞানে পরিণত হইবে। আংশিক জ্ঞান (experience) ও জ্ঞানের (knowledge-এর) তেজ বৃত্তিতে ন্যূনতার পাশ্চাত্য-দেশে অবৈতজ্ঞান দৃষ্টি হইতেছে না। এক-প্রকার প্রতীচা অবৈতজ্ঞান আছে, তাহা জ্ঞানে ক্ষেত আশঙ্ক্য করে এবং আত্মা চিদানন্দের অতীত কোন অজ্ঞেয় বস্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত করে। জ্ঞানের শুদ্ধবৈতজ্ঞান ন্যূনতার

এই প্রশ্নের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র বেদান্তের ইহাই নিশ্চিন্তি যে, চিদানন্দই চরম-বস্তু। আচার্যদিগেরও এই দিকান্ত। গোড়-পাদ আচার্য জ্ঞানকে তুরীয় অবস্থা বলিয়া-ছেন। শঙ্করাচার্যেরও ত কথাই নাই। সন্যাস-বোধোক্ত বেদান্তসারে ঐক্য বলিয়াছেন। পঞ্চদশীকার বলেন যে, ব্রহ্মপ্রভা সংবিৎই পরমাত্মা।

জ্ঞানাতীত বা জ্ঞানাতিরিক কোন বস্তু থাকিতে পারে না। জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ত্বের পূর্ণ সমন্বয়ই জ্ঞান। জ্ঞান বৈভেদেদের (differentiation-এর) অপেক্ষা রাখে না। তাহার অন্তরেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আদান-প্রদান। জ্ঞান আত্মস্থিত, বস্তুপ্রতিষ্ঠ, আত্ম-সম্বৃত। জ্ঞান পূর্ণ, নিষ্কিয়, অসঙ্গ, আত্মব্রত।

জ্ঞানবস্তুর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আংশিক জ্ঞান অসম্ভব। আংশিক জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ণতার নিকটেই ধাবিত হয়। জ্ঞানস্বরূপ আমাদের সকল ধারণাতেই জ্ঞানময় আত্মত্বকে বরণ করি। অন্যথায় আত্মসদৃশি আরোপ না করিলে কোন পদার্থের বোধ হইতে পারে না। অংশের আরম্ভ পূর্ণত্বে ও শেষ পূর্ণত্বে। সর্বময় জ্ঞান না থাকিলে অংশময় ভ্রম বা অধ্যাস করনার আসে না। বৈভববিশিষ্ট আংশিক জ্ঞান অবশিষ্ট অস্বৈতজ্ঞানকে অকাত্যরূপে প্রতিপন্ন করে।

এই বিষয়সমূহ জ্ঞানেরই ব্রহ্মভূমি—জ্ঞানাজানির এক বৃহৎ আড়ম্বর। ঐ যে শিশু অর্ধজন্মিতলোচনে স্তম্ভপান করিতেছে, আর জননীকে মুখস্পর্শে বিহ্বল করিতেছে—ঐ যে পেটুক পায়সসিক্ত স্তূপী লেহন করি-

তেছে—ঐ ঘেবিগানী শ্রব্ধলসাদি-সন্তোষণ লালসায় আকুল হইয়াছে—ঐ যে কঙ্কালসার সমাধিময় ধোঁয়া ভূমানন্দে আত্মহারা হইতে প্রয়াস করিতেছে—এইসমস্ত ব্যাপার জ্ঞান-সাগরের তরঙ্গতল ভিন্ন আর কিছুই নহে। হর্ষ-শোক, প্রীতি-দেহ, ধর্ম-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা, শিল-সভ্যতা—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এক স্থানিত মিলনচৌম্বাচ। অচেতন জড়ও জ্ঞানের অন্তর্গত। বেদান্ত বলেন যে, জড় অস্তিত্ব নহে, উহা ভাতি অর্থাৎ জ্ঞেয় হইয়া জ্ঞাতাকে সদাঃ আহ্বান করিতেছে। জড় জ্ঞানপক্ষে একেবারে নিষ্ক্রিয় নহে। জ্ঞানই নিজবলে জড়কে জানে, কিন্তু জড় জ্ঞানপ্রক্রিয়ার কোনরূপ কর্তব্য করে না—এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্র। ঐ যে দৃগাক্রান্তারা দ্যোতি বিকীরণ করিতেছে, উহা কেবল রক্তময় ক্রিয়া নহে—উহা পূর্ণজ্ঞান, জ্ঞেয়রূপে স্মৃতিত হইয়া জ্ঞাতৃপক্ষকে আমন্ত্রণ করিতেছে। যদি আম-ন্ত্রণ না করিয়া জ্ঞাতৃত্বের প্রতিকূল আচরণ করিত, সাধা কি যে, কেহ তাহাদিগকে জ্ঞানের অধিকারভুক্ত করে। তরঙ্গিত নদী বা মলয়সীমার বা ভ্রামল উপবন প্রিয়জনের জ্ঞান আবৃত, গৃহীত ও অধিকৃত হইতে দীর্ঘে দীর্ঘে ইচ্ছিততত্ত্ব প্রদর্শন করে বলিয়াই আমি উহাদের মাধুরী সন্তোষণ করিতে পারি। আমি একটি বস্তু জানি, অথচ উহা আমার জ্ঞানাতিকার স্বীকার করে না—ইহা অস-ম্ভব। চেতন হটক বা অচেতন-হটক, সকল পদার্থই ভাতিরূপ—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়রূপে জ্ঞানবস্তুর প্রকাশ। জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে আত্ম-র্ষণ করে, জ্ঞেয় জ্ঞাতাকে আত্মসমর্পণ করে ও তাহার বস্তুতা স্বীকার করে—অন্যথা এক

পক্ষ সম্পূর্ণ উদারীন হইলে জ্ঞানের ক্ষুদ্র হইত না। কেহ বলিতে পারেন যে, তত্ত্ব বাস্তবতার পুষ্টিগত জ্ঞাতাকে আশ্রয় করিবার পরিবর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াই থাকে। তবে সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার কিম্বদন্তি হয়? এখানেও জ্ঞাতৃক্ষেত্রের আশ্রয় ও আদানপ্রদান আছে। জ্ঞানের নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে পর অজ্ঞাত কারণে প্রত্যাখ্যান ঘটে। জ্ঞানক্রিয়ার সমাধান না হইলে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মিলন না হইলে, বিরক্তি বা প্রীতির ক্ষুদ্র হইতে পারে না।

এই যে বৃহৎ জগৎপাশ, ইহা জ্ঞান-বস্তুরই উদ্দেশন—তানাতানির বিচিত্র লীলা—জ্ঞানজ্ঞাতৃক্ষেত্রের পূর্ণসমগ্র। এই পূর্ণতাই বিবরবিবররূপ-বৈততেন-ক্রমে প্রতিভাত হয়। অন্ধকারে রজ্জুতে যেকোন সর্প বা ঘটির ভ্রম হয়, তদ্রূপ অন্ধৈত জ্ঞানবস্তুরে অজ্ঞান-প্রভাবে জ্ঞাতৃক্ষেত্রভেদবিলসিত বহুত্বের ভ্রাণ হয়। বাবহারিক রজ্জু কেবল ছায়া-ময় সর্প বা ঘটি প্রসব করে। কিন্তু পার-অর্থিক জ্ঞানরজ্জু—সাহিত্যে বিশ্ব আলমিত—অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হইয়া ঈশ্বর-বেদ বক্ষ-বক্ষ, স্বর্গাচন্দ্র-গ্রহ-ভারকা, গিরি-নদী-সাগর-বন, মন-বুদ্ধি-চেতনা-বেদনা, ধর্ম-অধর্ম-পাপ-পুণ্য, অহংপ্রভা—ইত্যোবস্ত্রকার অনন্দ-বৃন্দবৈতভাবে (duality of subject and object) প্রতিভাত হয়। এই বৈতপ্রকাশে যে স্বীকৃতকল্পধ্বংসাদির বন্দ্যবোধ, তাহা বন্দকল্পনা নহে, কিন্তু বধ্যার্থই বস্তুরনি-নিষ্ঠিত। তথাপি সর্বের সহিত রজ্জুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক সৃষ্টির সহিত পরম-জ্ঞানের সেই সম্বন্ধ। রজ্জু দ্রুতপ পরিণাম-

প্রাপ্ত না হইয়াও ঘটি বা সর্পরূপে ঘুট হয়, তদ্রূপ অন্ধৈতজ্ঞান অবিকারী পাকিয়াও বহু-রূপে ব্যাক্ত হয়। উদাহারহীনা বর-অজ্ঞান সংবিৎ অথও সর্পময়ী, ফিঁদ আংশিক জ্ঞানের দ্বারা ধতরূপে গৃহীত হইলে ঈশ্বর-রূপে সৃষ্টিবিত্তি প্রলয় করেন, অমররূপে স্বর্গভোগ করেন, মররূপে মর্ত্যে বিচরণ করেন, স্বর্বা হইয়া উত্তাপ দেন, চন্দ্র হইয়া মনোহরণ করেন। "সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম"—নিশ্চয়ই এই সমস্ত ই "ব্রহ্ম।" "এক-মেবাধিতীয়ম্"—এক ভিন্ন বিতীয় বস্ত্র নাই। সেই একই বিভিন্নরূপে অল্পভূত হয়। পূর্ণজ্ঞানময় আত্মা ভিন্ন আত্মার অল্পভূতির অস্ত কোন বিষয় নাই। তজ্জ-বতপদার্থে পূর্ণতা আরোপ না করিয়া আত্মা-দেব কোন প্রকার ধারণা হইতে পারে না। উচ্চ হইতে নিরে দেখিলে পূর্ণে অংশের অধ্যারোপ হয়, আর নিম্নদেশ হইতে উচ্চে দেখিলে অংশ পূর্ণের অধ্যাস হয়।

আহো কি বহুদন্ত! বাহা অংশত উপলব্ধ হইলে কোটিকোটি ব্রহ্মাওরূপ-ধারণ করে, তাহার মন্তের কে পরিমাণ করিবে? অজ্ঞানপ্রহত ঘটি বা সর্পের বোজনায় রজ্জু হয় না! কিন্তু রজ্জুতে ঘটি ও সর্পভূক্তের কোন এক সাদৃশ্যসমগ্র আছে, তাহা না হইলে রজ্জুতে ঘটি বা সর্পভ্রম হইত না। চিন্ময় আত্মা সকল যোগব্রিয়োগের অতীত, কিন্তু বাহারি গর্ভে এই অনন্তলোকবাসী বিরোধবিশাণতা সমগ্রলীলা করে, তাহার স্বরূপজ্ঞান মনবুদ্ধি নিশ্চয়ই বিলীন হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উদ্ভিত পারে যে, অজ্ঞান—

যাহা আংশিকজ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়—তাহা কোথা হইতে আসিল ?

যথায় গভীরতা, যথায় আনন্দ আছে, তথায় উপচয় আছে, উজ্জ্বল আছে। লৌকিক ব্যবহারে ইহা বহুলপরমাণে দৃষ্ট হয়। প্রেমিকের দ্বন্দ্ব প্রিয়বস্তুর দ্বারা পূর্ণ। সে মিলনানন্দে মত্ত, তাহার অপর সুখসন্তোষের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে যদি তাহার প্রিয়জনের একটি ছবি পায়, নিশ্চয়ই তাহার প্রীতি ও পুলকের সঞ্চার হয়। তাহার ঐ ছবির কোন প্রয়োজন ছিল না। দশসহস্র ঐ প্রকার ছবি আনীত ও অগণিত হইতে পারে, তথাপি তাহার প্রিয়জনমিলনজনিত সুখের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এই প্রকার অপ্রয়োজনসত্ত্বেও ঐ ছবি তাহার প্রীতি ও আনন্দের বস্তু। প্রতিরূপে প্রীতি বরূপানন্দের উপচয়মাত্র। তাহা আংশিক ভাবে পূর্ণপ্রেমকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই অংশকে কোটিগুণ করিলে পূর্ণতালাভ করা যায় না। অগণন প্রতিরূপের প্রতি অজস্র উজ্জ্বল বরূপপ্রেমের গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া যায়, কারণ খণ্ডপ্রীতি প্রেমের পূর্ণতাপক্ষে থাকা না থাকা দুইই সমান। এই লৌকিক দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, গভীরতার উপচয় কাহাকে বলে। আনন্দের উপচয় অনেক-বলে দৃষ্ট হয়। সচরাচর আমরা প্রয়োজনানুসারে সাবধানে ব্যয় করি। কিন্তু উৎসবের দিনে আমরা প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া বাহ্যাসন্তোষে প্রীত হই। অন্নব্যঞ্জন, পিষ্টকপায়স ও সুবাস কলের কলোক্ষেদিত ছড়াছড়ি। এই প্রচুর আয়োজন হইতে দুইএকটা লেহণের রূপসঞ্চারিত করিলে

উৎসবের কোন অগ্রহানি হয় না। এই পৃথিবীতে আমাদের উদয়পুষ্টি ও বাসনার তৃপ্তির মন্ত্র এত প্রয়োজন যে, প্রয়োজনের তালিকা তাহা গণনা করা চলে না। যদি কণাটভাঙা আম বা লিচুকল বহুদেশে না থাকিত, বঙ্গবাসীর সুখভোগের বোধ হয় বিশেষ কোন বিষ হইত না। আমরা প্রবৃত্তির দাস, তজ্জন্ত এই বাহ্যাদীলার মর্মে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।

চিৎস্বর জাতৃজ্ঞেয়ভেদরূপে যে আংশিক প্রকাশ হয়, তাহা অনন্ত গভীরতার উপচয়। কিন্তু ঐ উপচিৎ আংশিক প্রকাশ বিপরীত-বুদ্ধি বা অধ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না। হস্তীর জ্ঞান না থাকিলে শুণ্ডকে শুণ্ড বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ঐ অনাস্ত্র আংশিক অবয়বটিকে আচ্ছাদিত সর্পতুল্য কোন পদার্থ বলিয়া ধারণা হয়। বরূপের ভেদবহুল প্রতিভাতি অজ্ঞানপ্রভাবেই ঘটিতে পারে, সুতরাং উপচয় বা আংশিক প্রকাশ স্বীকার করিলে অজ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়। পূর্ববস্তুর সন্নিবেশে যদি পূর্ণজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার বিকাশবহুর সম্ভাবনা থাকে না। অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানই কেবল অদৈতকে ঐক্যবিসঙ্গিত করিয়া প্রতিভাতি করে। এই অজ্ঞান জ্ঞানের আনুযায়িক। অংশ বেরূপ পূর্ণতার মধ্যে বাস করে, ঘটাকাশ বেরূপ মহাকাশে অবস্থিত, তজ্জপ অজ্ঞান জ্ঞানের সঙ্গী। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণতা অংশনিরপেক্ষ—দোষনা করিয়া পাওয়া যায় না। আমি একটি বৃক্ষকে অংশ করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে পূর্ণতা আরোপ করিয়া আমি বৃক্ষ-

বস্ত্র ধারণা করি, তাহা অংশগোচনায় প্রতি-
ষ্ঠিত নহে। জ্ঞানবস্ত্র আয় প্রতিষ্ঠা, আচারাম,
আচারীড়। তাহার কোন প্রয়োজন বা
আকারিকা বা অভাব নাই। এই নিশ্চয়ো-
জন নিরাকার পূর্ণতা আছে বলিয়াই
উপচরবাহিন্য সম্ভবে। বাহার প্রয়োজন
আছে—অভাব আছে, তাহা অপূর্ণ, তাহার
আবার উপচর কি। প্রাচী ও প্রতীচী
বিশিষ্টাবৈত্তবাসের সিদ্ধান্ত প্রমাণপূর্ণ। তাহা

অবৈত্তকে বস্ত্রগত বৈত্তভেদের অপেক্ষী
বলিয়া নির্ণয় করে ও ভগবাপার যে অজ্ঞান-
প্রবৃত্ত, এই প্রোত রাক্তর অগ্রাহ করে।

সংক্ষেপে বেদান্তের প্রথম কথা বলিলাম।
কিন্তু জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক-অজ্ঞান-প্রভাবে
ত্রিগুণে বিভক্ত হয় ও কিন্তু জ্ঞানাত্মনের
বিরোধসোপান অপবাদজালে আরোহণ করিয়া
তুরীয়ানন্দের একবে উপনীত হওয়া যায়,
তাহা দ্বিতীয় কথায় বর্ণনামত্রে দেখাইব।

শ্রীভক্তবাক্য উপাধায় ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

হুনিভাসিটি বিল্ ।

হুনিভাসিটি বিল্ পাস্ হইয়া গেছে, আমরাও
নিভুক্ত হইয়াছি। যতক্ষণ পাস্ হয় নাই,
ততক্ষণ আমরা এমন ভাব ধারণ করিয়া-
ছিলাম, যেন আমাদের মহা অনর্থপাতের
সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। যদি বস্ত্রই আমাদের
সেইরূপ বিধাসই হয়, তবে বিল্ পাস্ হইয়া
পের্ণ বলিয়াই অমনি, হুনিভাসিটি আরোহণ
করিতে হইবে, ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া
যায় না।

দেশের সম্ভাব্য যদি কোনো ধারুণ অনিষ্ট
ঘটিবার কারণ থাকে, তবে গবর্মেণ্ট্ আবা-
মের ঘোড়াই মানিলেন না বলিয়াই আমরা
নিজেরাও বধাসাধা প্রতিকারচেষ্টা করিব
না, ইহার অর্থ কি? আন্দোলনসভার আমরা
যে পরিমাণে স্মর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম,

রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ভবি আঁকিয়া-
ছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি
আমাদের সেইপরিমাণ লক্ষ্য বিবর নহে!
বেধনা যদি অকপট হয়, পক্ষা যদি ভাগ না
হয়, তবে আজ আমরা চূর্ণচাপ করিয়া বলিয়া
নিজের ছই গালে চূর্ণকালী লেপিতেছি!

দেশহিতৈষীরা বলেন—আমাদের কি
সাধ্য আছে, আমরা কি করিতে পারি!

আমরা যদি কিছুই না করিতে পারি,
তবে আমরা যেন কাহারো কাছে কিছুই
প্রত্যাশা না করি! এত বড় অক্ষয় বাহারী,
তাহাদের সুখে কাহারো কাছে কোনো
দাবীই শোভা পায় না!

এতকাল ধরিয়া হুনিভাসিটি বিলের বিধি-
বিধান লইয়া তত্ত্ব করিয়া অনেক আলো-

চনা হইয়া গেছে, সেগুলির পুনরুজ্জীবিত
বিরক্তিকর হইবে। নোটামুটি দুইএকটা
কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমস্ত
অবস্থা অল্পকাল্যেই বন্দোবস্ত কর
বাইতে পারে, সে কথা সকলেই জানে।
কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া চরমশায়ে
বসি করিতেই হয়। এত তাকান্ তিক
লিখাছেন, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ
খুব ভাল—কিন্তু ভারতবর্ষে নাটুসাংগে ত
বিলাতের সব ভাল আমাদের দিবার
কোন বন্দোবস্ত করেন নাই, মাঝে
হইতে কেবল একটি ভালই নানাইবে
কেন?

প্রত্যেকের সাধনমত যে ভালো, সেই
তাহার সর্বোত্তম ভালো—তাহার চেয়ে
ভালো আর হইতেই পারে না—অন্তের
ভালোর প্রতি লোভ করা যথা।

বিলাতী যুনিভার্সিটিওলাও একেবারেই
আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো স্বর্গদূত
শাসনকর্তার আইনের জোরে একরায়ে পূর্ণ-
পরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা
ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষম-
তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বদলিত বাড়িয়া
উঠিয়াছে।

ইহার প্রতিবাদে বলা বাইতে পারে,
আমাদের যুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিশেষের
নকল—স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার
সঙ্গে বাটতে পারি না।

সে কথা ঠিক। ভারতবর্ষের যুনিভার্সিটি
দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে,
আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গ হইয়া

গেছে, তাহা বলিতে পারি না—অথনো ইহা
আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে আমরা ক্রমশ আশ্রিত
করিয়া নইতেছি—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির
পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরাজের কাছ হইতে আমরা কি পাই-
গাছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেখে
কি আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের
লোকের হাতে কি আছে, তাহাই দেখিতে
হইবে।

রেশোরে, টেলিগ্রাফ অনেক দেখিতেছি,
কিন্তু তাহা আমাদের নহে—বাণিজ্য-
ব্যবসায়ও কম নহে, কিন্তু তাহারো যৎসামান্য
আমাদের! রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও
বিশুদ্ধ, কিন্তু তাহার যথার্থ কর্তৃত্বভার
আমাদের নাই বলিলেই হয়, তাহার মন্ত্রের
কাণাই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর
সমুচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা বাইতেছে।

বে তিনি যথার্থ আমাদের, তাহা কম
ভাল হইলেও, তাহার কটি থাকিলেও, তাহা
ভাণ্ডারকর-বহানার সম্পূর্ণ মনোনীত না
হইলেও তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য
করিব।

যে বিজ্ঞা পুথিগত,—বাহার প্রয়োগ জানি
নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেমনি যে শিক্ষাদান-
প্রণালী আমাদের আরম্ভের অতীত, তাহাও
আমাদের পক্ষে প্রায় তেমনি নিষ্ফল।
দেশের বিজ্ঞাপ্রদান দেশের লোকের
হাতে আসিতেছিল, বস্তুত ইহাই বিজ্ঞাপ্রদান
কল। সেও যদি সম্পূর্ণ গবর্নমেন্টের হাতে
গিয়া পড়ে, তবে খুব ভাল যুনিভার্সিটিও
আমাদের পক্ষে দারিদ্র্যের লক্ষণ।

* আমাদের দেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত বাধা-
সাধ্য করা কোনূন্যতঃ সঙ্গত নহে । আমা-
দের সমস্ত শিক্ষাকে স্থলত করিয়া রাখিয়া-
ছিল—দেশের উচ্চনীচী সকল স্তরেই শিক্ষা
নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল ।
সেই সমস্ত স্বাভাবিক প্রণালী ইংরাজি শিক্ষার
কলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল—
এমন কি, দেশে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ,
কথকতা-ব্যাখ্যান প্রতিদিন বিদ্যারোমস্থ হইয়া
আসিতেছে । এমন সময়ে ইংরাজি শিক্ষাকেও
যদি চূর্ণ করিয়া তোলা হয়, তবে
গাছে তুলিয়া-দিয়া নষ্ট কাড়িয়া লওয়া
হয় ।

বিলাতী সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই
অনেক টাকার ধন । অধোদ হইতে লড়াই
পর্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার । ইহাতে
টাকা একটা প্রকাণ্ড পতি হইয়া উঠিয়াছে
এবং টাকার পূজা আর-সমস্ত পূজাকে
ছাড়াইয়া চলিয়াছে ।

এই হঃসাব্যাসা, ঘৃণিততা, অটলতা যুরোপীয়
সভ্যতার সর্বপ্রধান ঘূর্ণলতা । সাতার দিতে
গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা-ছোড়া অপটু-
তারই প্রমাণ দেয়, কোনো সভ্যতার মধ্যে
যখন সর্ববিধেই প্রাঙ্গণের একান্ত আভিযা
দেখা যায়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে, তাহার
যতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে, তাহার
অনেকটাই ঐতিমূহুর্তে অপব্যয় হইতেছে ।
বিপুল মালমসলা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিক-
মত রাখা যায়, তবে দেখা যাইবে, মজুরি
পোষাইতেছে না । প্রকৃতির দাতার হৃদে-
আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে
ভাগিদের পেরাদাও যে আসিতেছে না,

তাহাও নহে—কিন্তু সে লুইয়া আমাদের
চিত্তা করিবার দরকার নাই । *

আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে
বিচার চূর্ণা, অর চূর্ণা, শিক্ষাও যদি
চূর্ণা হয়, তবে ধনি-দরিদ্রের মধ্যে
নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও
অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে । বিলাতে
দরিদ্র কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা
মহুয্যেবেরও অভাব—কারণ, সেখানে মহুয্য-
য়ের সমস্ত উপকরণই চড়াবদে বিক্রয় হয় ।
আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মহুয্য ছিল,
কারণ আমাদের সমাজে স্ব-স্বাধ্য-শিক্ষা-
আনন্দ মোটের উপরে সকলে ভাগ্যান্ধ
করিয়া লইয়াছে । ধনীর চৌমস্তপে যে
পাঠশালা বসিয়াছে, গরিবের ছেলেরা বিনা
বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে—রাহ্যার
সভার যে উৎসব চাইয়াছে, দরিদ্র প্রজা বিনা
আহ্বানে তাহাতে প্রবেশপাত করিয়াছে ।
ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রভাহ পুষ্পের ফুল
তুলিয়াছে, কেহ তাহাকে পূর্ণিমে দেয় নাই,
সম্পন্নবাস্তি দাবি-বিল কাটাইয়া গ্রাহার
চারদিকে পাহারা বসাইয়া রাখে নাই ।
ইহাতে দরিদ্রের আশ্বাসন ছিল—ধনীর
ঐর্ষ্যে তাহার স্বাভাবিক দাবী ছিল, এইজন্য,
তাহার অবস্থা যেমনই হোক, সে পানবজা
প্রাপ্ত হয় নাই—বাহারা আভিভেদ ও মহুয্য-
য়ের উচ্চ অধিকার লইয়া যুধ্য বুলি আওড়ান,
তাহারা এসব কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া
দেখেন না ।

বিলাতী লাট আজকাল বলিতেছেন,
বাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যা-
শিক্ষার পতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার

কি? অধ্যাপকের কামে এ কথাটা অত্যন্ত বিশেষ, অত্যন্ত নিদ্রার বলিয়া দেখে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বসিয়া-বসিয়া আক্ষেপ করিলে চালাবে না।

আমরা নিজেরা ধায়া করিতে পারি, তাহারই জন্য আমাদেরকে কোমর বাধিতে হইবে। বিদ্যালয়িকার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল। রাজার উপরে, বাহিরের সাহায্যের উপরে ইতার নির্ভর ছিল না। সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিদ্যালয়িক: রাজার কাজ পাইবার সহায়বস্থাপ হইয়াছে, তখন বিদ্যালয়িক: সমাজের হিতসাধনের উপযোগ ছিল। এখন সমাজের সহিত বিদ্যার পরস্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এককাল পরে শিক্ষা-সাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, তাহাদের রাজপালিসির অস্থূল করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজতন্ত্রি হাঁচে চলিয়া ইতিহাস রচিত হইবে, বিজ্ঞান-শিক্ষাটিকে পাকেপ্রকারে বর্জ্য করিতে হইবে, ভারতবর্ষীর ছাত্রের সর্বপ্রকার আত্ম-সৌরবোধকে সঙ্কচিত করিতে হইবে, তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না—কর্তার ইচ্ছা কর্তৃ—আমরা সে কর্তার কল-তোগ করিব, কিন্তু সে কর্তার উপরে কর্তৃত্ব করিবার আশা করিব কিসের জোরে?

তা ছাড়া, বিদ্যালয়িক: কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাটসাহেব তাহার

অকস্মিক-কেবলিঙ্গের আদেশ হইয়া কেবলি আদেশন করিয়াছেন; এ কথা ভুলিয়াছেন যে, সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই। সুতরাং সেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক সেখানে বিদ্যালয়িক: দানের 'অন্ত উৎসব' ছাত্রেরাও বিদ্যালয়িক: লাভের জন্য প্রস্তুত পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই, অপ্রভার কটক-প্রাচীর নাই, কাজেই সেখানে মনের জিনিষ মনে গিয়া পৌছায়। পেড্‌লারের মত লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ, তিনি আমাদেরকে কি দিতে পারেন, আমাদের বা তাহার কাজ হইতে কি লইতে পারি? জুড়য়ে জুড়য়ে যেখানে স্পর্শ নাই, সেখানে স্পর্শ বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে; সেখানে দৈববিড়ম্বনা যদি দানপ্রতিদানের সন্ধি স্থাপিত হয়, তবে সে সন্ধি হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, ফলপ্রসূতা প্রত্যাশা করা যায়।

সর্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিদগ্ধমানের ব্যবস্থার ভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যালয়িক: কেবলিঙ্গ-অকস্মিক: প্রকৃত পক্ষে প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম পরিচয়ের উপযুক্ত হইবে, ধর্মীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে, কিন্তু আগ্রহ সুরক্ষী প্রভা-শতমলে আসীন হইবেন, তিনি অনর্থক মত করিয়া সম্মানদিককে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধনবদগর্জিতা বণিকগৃহীণীর মত উচ্চ বাতায়নে পাড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।

পরের কাছে হইতে দ্রুতগতিবাহীন দান লইবার একটা দ্রুত ধাক্কা। এট.বে, গর্জিত ঘন্টা খুব বড় করিয়া পরের হিসাব রাখে, তাহার পরে তইবেলা গোটা দেয়—‘এত দিলাম তত দিলাম, কিন্তু ফলে কি হইল?’ না স্তব্ধ-মান করেন, খাতা তাহার কোনো হিসাব রাখেন না, ভেলে ও বেশ পুটে হয়—সেই-বিগীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া যৌকুম্মান মুখের মধ্যে তুলিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ খিটখিট করিতে থাকে—‘এত পেলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিনদিন কেবল কাঠি হইয়া বাইতেছে!’

আমাদের হিংস্র কষ্টপূরকরা সেই বুলি ধরিয়াছেন। পেড়লার সেদিন বলিয়াছেন, আমরা বিজ্ঞানচর্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আহুতুল্য করিলাম, বৃত্তির টাকার এত অপব্যয় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না!

অহুগ্রহজীবীবাগিক এই সব কথাই গুনিচ্ছ হর—অথচ আমাদের বলিবার খুব নাই। বন্দোবস্ত-সমস্ত তোমাদেরই হাতে, এবং সে বন্দোবস্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয়, তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই। এদিকে খাতার টাকার অষ্টটাও গ্রেটগ্রাইমার মক্কে দেখান হইতেছে—যেন এত বিপুল টাকা এক-বড় প্রকাণ্ড অযোগ্যদের অস্ত্র অগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না—অত-এব ইহার “moral” এই—হে অক্ষম, হে অকর্ণশী, তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তোমরা রাজ-কৃত্ত হও, তোমরা ভিত্তোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে অপোল্লগ্ন পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না!

ইহাতে বিখ্যাত = কতটুকু হয় জানি না,

কিন্তু আশ্চর্যান্বিত থাকে না। আশ্চর্যান্বিত ব্যক্তি কোন জাত কোনো লক্ষ্যতা লাভ করিতে পারে না—পরের ঘরে জল-তোলা এবং কাঠ-কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কৃত্তিগ-বৈজ্ঞানিক বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদেরিগকে বর্ধদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদেরিগকে যে গোটা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অবূলক। এবং তাহার গোটা দেন, তাহারও যে মনে মনে তাহা জানেন না, তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, পাঁচের তাহারদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায়, একত্র তাহার দ্রুত আছেন।

এ কথা আমাদেরিগকে মনে রাখিতে হইবে। বিলাতী সভ্যতা বস্তুত হুহু ও দুর্গত নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশবৎসরে এই সভ্যতা আলায় করিয়া গইয়া শুকুমার। বিদ্যার প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা মনেকটা ইকুলের ত্রিনিব, পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মত সম্পূর্ণ হুযোগ ও আহুতুল্য পাইলে এই ইকুলপাঠ আমরা পেড়লার-সম্মুদায় আসিবার বহুকাল পূর্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাগ্য সভ্যতা ধর্মগত—তাহার পথ নির্ণিত সুরধারের দ্বার দুর্গম—তাহা ইকুলের পড়া নহে, তাহা জীবনের সাধন।

এ কথা আমাদেরিগকে মনে রাখিতে হইবে, এককাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কলেজের পরীক্ষাশালায় বস্তুত লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহার কেহই স্বাধীন-বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন না।

বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রকৃতিচক্র
সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল
দেখাইয়াছেন । পরের সহিত তাঁকের ভ্রমই
এগুলি স্বরস্বর, তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ
ও আত্মসম্মতির জন্ত । পরের কথায়
নিজেদের প্রতি যেন অবিশ্বাস না
করে !

বাহ্যতে আমাদের বর্থাৎ আত্মসম্মানবোধের
উল্লেখ হয়, বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিবে
না এবং সেজন্য আমরা যেন কোত্ত অহুত্ব না
করি । যেখানে বাহা স্বভাবতই আশা করা
হইতে পারে না, সেখানে তাহা আশা করিতে
বাওয়া সূচতা—এবং সেখানে বার্ষমনোরখ
কইরা পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে
বাওয়া যে কি, তাহার তাহার কোনো শঙ্ক
নাই । এখানে আমাদের একমাত্র কর্তব্য,
নিজেরা সচেত হওয়া ; আমাদের দেশে
ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মত যে সকল
প্রতিভাসম্পন্ন মনসী প্রতিকূলতার মধ্যে
বাঁকিয়াও বাধা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে
সুজ্ঞি দিয়া তাঁহাদের হৃদে দেশের ছেলের
মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ
দেওয়া ;—অবৃত্তা-অপ্রভা-অনাদরের হাত
হইতে বিধাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সুরস্বতীর
প্রাপপ্রতিষ্ঠা করা ; জ্ঞানশিকাকে স্বদেশের

জিনিষ করিয়া গাড় করানো । আমাদেরই
শক্তির সহিত, সাধন্যের সহিত, প্রকৃতির
সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া
তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া
তোলা ; বাহিরে আপাতত তাহার ধীন-
বেশ, তাহার কৃপতা দেখিয়া ধৈর্য্যভ্রষ্ট না হইয়া
আশার সহিত, আনন্দের সহিত দৃঢ়তার সমস্ত
প্রীতি দিয়া, জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া
তাহাকে মুক্ত ও সফল করা ।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র
আলোচ্য, একমাত্র কর্তব্য । ইহাকে যদি
চুয়াশা বল, তবে কি পরের কল্পনারে মোড়-
হস্তে বসিয়া থাকাই আশা পূর্ণ হইবার এক-
মাত্র সহজ প্রণালী ? তবে কলার্জেট্‌ব্
গবর্নেন্ট্‌ গিয়া লিবারেল্‌ গবর্নেন্ট্‌র অভ্যা-
দয় হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুকচকু
বিস্তারপূর্ব্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে
তাকাইয়া থাকাই কি হতবুদ্ধি হতভাগ্যের
একমাত্র সচপার ?

ইহাই যদি হয়, তবে আমাদের স্মৃটে
এখনো অনেক ছঃখ, অনেক অপমান আছে—
এখনো আমাদের কঠিন শিক্ষা শেষ হয়
নাই ! তবে আমাদের অবনত পৃষ্ঠের উপর
বিধাতার উদাত কশা যেন বিপ্রাণ না
করে !

সাহিত্যপ্রদঙ্গ ।

বঙ্গভাষা বনাম-আসামীভাষা ।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে আসামপ্রবাসী মাকিন্ পাণ্ডী ব্রহ্মসন্দাহেব ও আসামের তাৎকালিক কুল-ইন্স্পেক্টর মিঃ রবিন্দ্রসন্দাহেবের সঙ্গে—আসামের কুলসমূহে বাংলা এবং আসামী ভাষা ইহাদের কোনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই লইয়া গুরুতর তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বাদামুবাদের বিবরণ বঙ্গীয় পত্রমর্মেন্টের ১৮৫৫ পৃষ্ঠাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্বেই আসামের কুলসমূহে বাংলা-ভাষা প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; পাণ্ডীদল তদ্বিক্রমে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন না করিলে বাংলাভাষার অধিকার কখনই বিচ্যুত হইত না,—আসামে এতদিন বঙ্গসাহিত্য ঘরে ঘরে পঠিত হইত এবং এই চই শতাব্দির সহিত পরস্পরের সম্পর্ক বনীভূত হইয়া দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইত।

মাকিন্ পাণ্ডীদলের একটা স্বার্থ ছিল। তাঁহারা আসামবাসীদিগের মধ্যে বাইবেল প্রচার করিবার জন্য প্রাদেশিকভাষার কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া দুইটি ছাপাখানার ব্যবস্থা করিয়া বসিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা আসামী-ভাষা শিখাইবার জন্য যে কয়েকটি কুল গুলিয়াছিলেন, গভর্মেন্টের স্থাপিত বিদ্যালয়-

সমূহে ও আফিসে বঙ্গভাষার প্রচলন থাকিতে প্রাদেশিকভাষাচর্চা নিরর্থ বুরিয়া, আসাম-বাসিগণ স্বতই সেই সকল বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে পাঠাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আরোহনপত্র সমস্ত পণ্ড হইয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিপদে পড়িয়া তাঁহারা বঙ্গবেশের তাৎকালিক ছোটলাট ফ্রান্সিসেসাহেবের নিকট আসামে বঙ্গভাষার স্থলে আসামীভাষার প্রতিষ্ঠা আবেদন প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন।

পাণ্ডী ব্রহ্মসন্দাহেব প্রাণিত বিষয়ের আহুৎ্যে বতপ্রকার বৃষ্টি স্বায় কল্পনার আসিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু, স্বায় উদ্বেগ বিশেষরূপে পুষ্ট করিবার জন্য স্বদলস্থ ভজন-পাত্রীর মন্তব্য আবেদনপত্রে জুড়িয়া দেন। এই পক্ষ সম্বন্ধে তার-দ্বয়ে তাঁহারই বক্তব্য-এই প্রতিধ্বনি তুলিয়া-ছিলেন। আমরা নিজে ইহাদের প্রবেশিত বক্তৃতাগুলির সার মঙ্গলন করিয়া দিলাম।

(১) আসামীভাষা ও বাংলাভাষা, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা। বাংলাভাষা লিখিত পুস্তক আসামের সাধারণ লোকেরা বুদ্ধিতে পারে না, এমন কি, একজন বাঙালী ও একজন আসামবাদীকে পরস্পরের সহিত কথোপকথনে নিবৃত্ত করিলে তাঁহারা একের কথা অপর বুদ্ধি উদ্ভিত্তে পারে না।

(২) সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণ বাংলার লিখিত পুস্তক আশামীভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ভৎপরে স্বগ্রন্থে সমর্থ হয়।

(৩) শিক্ষকগণ একবাক্যে সাফা নিতেছেন যে, আমাদের মাকিনের গৃহীত প্রচার-সমিতি হইতে যে সকল আশামীভাষার রচিত পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা একদেশের অধিবাসিগণ অতি সহজেই বুঝিতে পারে, কিন্তু হুইতিনবৎসর স্মৃতিমত না পড়িলে তাহারা বাংলাপুস্তক কৃষিগা উচিত্তে পারে না।

(৪) ইংরেজেরা বেকশ করাঙ্গী বাংলাটিন পড়ে, আসামের ছাত্রগণও ঠিক সেইভাবে বাংলা পড়িয়া থাকে।

(৫) বিদ্যালয়ে বাহিরে ছাত্রগণ আশামীভাষার কথোপকথন এবং চিন্তা করে,— তাহারা মোটেই বা গাভার কোন ধার ধারে না। তাহারা গৃহে আশামীভাষার কথোপকথন করে,—ধর্মপুস্তকের ব্যাখ্যা শুনিয়া থাকে। নৌকা বাহিবার সময় মাকিরা আশামীভাষার গান গাহিয়া যায় এবং কৃষকেরা ফসল কাটিয়া গৃহে কিরিবার সময় আনন্দে এই ভাষার গানে সাক্ষাগণ প্রাবিত করে। মোট কথা, আশামীভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা—বঙ্গভাষা নহে।

(৬) পরের ভাষায় তাহাদের শিক্ষা-নীতি হইলে তাহারা কখনই জাতীয়জীবনের উন্নতিসাধন করিবার জন্য সমুচিত্ত অর্থ-প্রাপনা পাইবে না, কৃষিগণ তাহার দ্বারা পুষ্টিগিত করিলে তাহাদের সমস্ত উত্তম কৃতিত্ব হইয়া থাকিবে।

(৭) পাতীগণের মধ্যে সকলেই এবং আনন্দর কোকন প্রভৃতি শিক্ষিত আসাম-

বাসিগণের অধিকাংশ মনে করেন যে, বাংলা এবং আশামী ভাষা এক ভাষা নহে।

(৮) আশামীভাষা কোমল এবং ক্রটিভূষকর, ইহা উচ্চশাহিতাগঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

(৯) আসামের প্রাক্তবর্তী যে সকল পার্কতাপ্রবেশ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির ভাষাকে লিখিতভাষায় প্রণালীতে প্রবর্তন করা অসম্ভব। ভূটিয়া, মিসনি, মিরি, খুম্টি সিংফো এবং নাগা প্রভৃতি জাতিকে হুস্তা করিতে হইলে আশামীভাষার সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহারা আসামের সঙ্গে নানা-প্রকারে সংশ্লিষ্ট, এবং পার্কতা জাতিগণের মধ্যে অনেক লোকের আশামীভাষা জানা আছে। আশামীভাষা অবলম্বন করিলে এই সকল জাতিগণের সঙ্গে সভা জাতিগণের চিন্তার আদান প্রদানের পথ সুগম হইবে।

আসামের দৃশ্যসমূহের ইন্স্পেক্টর মিঃ উইলিয়াম্ রবিন্সনমহাশয়ের এই সকল বক্তির অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাহার বক্তিগুলিও আমরা নিয়ে অতি সংক্ষেপে সন্নিহিত করিলাম।

(১) আসামের ভাষা ও বঙ্গদেশের ভাষা, দুই ভিন্ন ভাষা নহে। আশামীভাষা বঙ্গভাষারই একটি প্রাদেশিক অবয়বমাত্র।

(২) উভয় ভাষার প্রায় সমস্ত শব্দগুলি এক প্রকারের—তাহাদের মধ্যে শুধু উচ্চারণ-গত প্রভেদ বিদ্যমান। এইরূপ প্রভেদ নিজ বাংলার ভেদ্য ভেদ্য লক্ষিত হয়,— বিতক্তি এবং ক্রিয়ার প্রভেদের জন্য এক ভাষার শাখাগুলিকে কখনই বিভিন্ন মনে করা উচিত নহে। বাংলার প্রদেশে প্রদেশে।

এইরূপ প্রভেদবোধও তথাকার সর্বত্র এক বসভাষাপ্রচলনে কোনপ্রকার উন্নতির ব্যাঘাত হয় নাই, বরং এক বিস্তৃত ক্ষুণ্ণের সম্মিলিত চেষ্টার সুবিধা পাইয়া উন্নতির পথ বিভিন্মতরূপে সুপ্রসার লাভ করিয়াছে ।

(৩) চট্টগ্রামের লোকের সঙ্গে কক্ষনগরের লোক য য প্রাদেশিক ভাষার কথোপকথনের চেষ্টা করিলেও পরস্পরের ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না,— চট্টগ্রামের সঙ্গে কক্ষনগরের কথার মত প্রভেদ, আসামীভাষার সঙ্গে কক্ষনগরের কথার তদপেক্ষা বেশী প্রভেদ নাই । প্রাদেশিক চলিতকথার ভাষা (dialect) এবং লিখিতভাষার প্রভেদ সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, এইজন্য কথিত প্রয়োগের উপর অতিরিক্তরূপ লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানভাষার দাবী অগ্রাহ্য করা উচিত নহে । লিঙ্গলক্ষ্যাদিয়ারের কৃষক যে ভাষার কথাবার্তা বলিয়া থাকে, তাহার অর্থ ইংরেজী কোন অভিধানে এবং তাহার কোন কৃত্ত ইংরেজী কোন ব্যাকরণে পাওয়া যাইবে না—অথচ ব্রহ্মলক্ষ্যাদিয়ারবাসী বিস্তারিত ইংরেজী ভাষা পড়িয়া থাকে । তাহাদের কথিতভাষা এইরূপ, যথা—

"Th' okcawut uth Eggshee.
bechun. Theyme sum uth granddist
karpits has avur an clapt mee een
on, an ondur heawfoke cud fo inde
ethur harto fur to cet thur shune
on um."

ওয়েল্‌স্‌ এবং বটলগেজের অনেক
স্থানের লোকের কথিতভাষা ইঠাং তনিলে
ইংরেজীভাষার সঙ্গে যে তাহাদের কোনরূপ

সাদৃশ্য আছে, তাহাই বোধ হইবে না,—
অথচ ইংরেজীভাষা সেই সেই দেশের বিস্তা-
রণে প্রচলিত আছে ।

(৪) বাংলাভাষার সঙ্গে আসামী-
ভাষার মততা প্রভেদ পাদ্রীগণ কল্পনা করিয়া-
ছেন, প্রকৃতপক্ষে ততটা প্রভেদ নাই ।
বঙ্গীয় লেখকগণ অনেকসময় পৌরীয়া সাধু-
ভাষার পুস্তক লিখিয়া থাকেন—তাহা ঠিক
সেই দেশের লোকেরাই অনেকস্থলে বুঝিয়া
উঠেন না । এতৎসম্বন্ধে ডাক্তার বুকনন্
লিখিয়াছেন—“বাংলা-সাধুভাষার
রচিত পুস্তকের ভাষা বাংলার সাধারণ লোকের
এক সহস্রের মধ্যে একজন বুঝিতে পারে
কি না, সন্দেহ ।” এরূপ অবস্থায় য়েই ভাষায়
সঙ্গে কথিত আসামীভাষার তুলনা করিয়া
প্রভেদনির্ণয় করা সম্ভব নহে ।

(৫) নাকিন পাদ্রী এডিন্‌সাহেব উচ্চা-
রণপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসামী-
শব্দের যেরূপ বর্ণবিভাজন করিয়াছেন, তাহা
কতকপরিমাণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনু-
যায়ী হইলেও দেশের চিরাগত প্রণালী
হইতে স্বতন্ত্র । পাদ্রীদিগের তালিকা হইতে
কয়েকটি বাংলাশব্দ ও আসামীশব্দ উদ্ধৃত
করিয়া তুলনার জন্য পাশাপাশি রাখিতেছি ।

বাংলা ।	আসামী ।
কিছু	কিহা ।
কমা	গুমা ।
বুড়া	বুহা ।
ধন্য	ধরম ।
পরীক্ষা	পরিখা ।
মৰ্ঘদাণ	মর্ঘদা ।
স্থির	গির ।

(৬) বাংলাভাষা ক্রমেই ঐশ্ব্য-
শালিনী হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত বহু-
লোকের প্রযত্নে ইহা ক্রমশ নানাবিধে
ঊনম্পন্ন হইয়া সভ্যজগতের ভাষাগুলির
সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে প্রয়াসী। আসামী-
ভাষার কোন পুস্তকই নাই, বলিলে অজ্ঞান
হইবে না;—সুতরাং এই উন্নতিশীল অগ্রসর
বঙ্গভাষা শিখিবার সুবিধা হইতে আসামবাসী-
দিগকে বঞ্চিত করিলে তাহারা অক্ষমতাস্বর
জন পশ্চাৎপন্ন হইয়া পড়িবে, এবং আর
কোনকালে তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম
হইবে কি না, বিশেষ সম্বোধের স্থল।

(৭) বাংলাভাষা বিভাগের সমূহে প্রচ-
লিত আছে। আমি নিজে বতবার পরিদর্শন
করিয়া দেখিয়াছি, আসামবাসী ছাত্রগণ ইহা
পাঠ করিতে অগ্রমাত্র ও অসুবিধা বোধ
করে না। যে সকল অসুবিধার কথা লিখিত
হইয়াছে, তাহা পাদ্রীরহস্যগ্রন্থের কল্পনাতেই
বিশেষরূপে বিদ্রাভিত। আকস্মে বাংলা-
ভাষা প্রচলিত আছে, সে স্থানেও অতি সহ-
জেই সমস্ত কার্য সুনির্ভর হইয়া থাকে,
—এবং এক আনন্দরাম কোকন ভিন্ন বঙ্গ-
ভাষার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষিত আসামবাসী
অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আমার জ্ঞান নাই।
বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বেঙ্গল চলিত-
কথার প্রভেদসত্ত্বেও বঙ্গভাষাশিক্ষার
স্থানীয় লোক কোনই অসুবিধাবোধ করে
না, এখানেও ঠিক তাহাই। কারণ,
আসামীভাষা বঙ্গভাষারই একটি প্রাদেশিক
শাখামাত্র, এ সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই।
বঙ্গদেশের বিভাগের সমূহেও ছাত্রগণ বাংলা-
পুস্তক পড়িবার সময় ব ব প্রাদেশিক

ভাষার তাহার ব্যাখ্যা করে। এখানেও ঠিক
তাহাই করিয়া থাকে।

(৮) সমগ্র আদায় ১১,৭০,০০০
লোকের বাস। নিরপ্রদর্শনের জনসংখ্যা
বেশী,—অপরাজের (শিবসাগর ও লক্ষীপুর
জেলায়) লোকসংখ্যা সমগ্রের ১/৩ অংশের
অধিক হইবে না। পূর্ব বেশী ধরিয়া লইলেও
ঐ দুই জেলার লোকসংখ্যা ৩,৭০,০০০ এর
বেশী কোনক্রমেই হইতে পারে না।
ইহার মধ্যে অনুমান ১,৫০,০০০ ছাছাড়ী এবং
অপরাজের পার্শ্বতা অধিবাসী আছে। তাহা-
দিগকে বাদ দিলে মাত্র ২,৩০,০০০ লোক
বাকি থাকে। যে ভাষার মার্কিনের গাত্রী-
গণ পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তাহা এই
২,৩০,০০০ লোকের মাতৃভাষা। অবশিষ্ট
৮,২০,০০০ লোকের ইহা মাতৃভাষা নহে।
এই বঙ্গসংখ্যক লোকের মাতৃভাষাকে
প্রাধান্য দিয়া অধিকাংশ আসামবাসীদিগকে
উচ্চরূপ অধিকার হইতে বঞ্চিত কেন করা
হইবে? এই বঙ্গসংখ্যক আসামবাসীদেরও
তাহা হইলে বঙ্গদেশীয়-ভাষাশিক্ষার অভাবে
সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

২। ভাষার কথা, আসামভাষা বঙ্গভাষা
হইতে যত্ন করিয়া কথা অন্তর। বাংলা
ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে নূতনরূপে গঠিত
হইতেছে,—ইহাতে উচ্চনাহিতের উপযোগী
মার্জিত ও ললিত শব্দসমূহ প্রবেশশীল
করিয়া ইহাকে বিভিন্নরূপে শক্তিশালী
করিয়া তুলিয়াছে। এই তাহাই আসাম-
বাসিনদের স্বাভাবিকনিয়মামুসারে মাতৃ-
ভাষা,—এবং ইহা শিক্ষা করিলে তাহার
সমগ্র জাতীয় উন্নতির সমবেতচেষ্টার ফল-

লাভ করিয়া উন্নত হইয়া উঠিবে
অন্তথা হইলে ইহাদের উন্নতির পথ চিরকাল
হইয়া পড়িবে ।

পাঞ্জীপণের আবেগনপত্র ও রবিন্দ্ৰ-
নাথের প্রতিবাদ তাৎকালিক আসামের
য়েভেনিউ কমিশনর মিঃ ক্রাপিন্স বেন্ডিন্‌স্
সাহেব বকের ছোটলাট হালিডেনসাহেবের
মিকট পাঠাইয়া দেন । উদারচরিত্র বেন্ডিন্‌স্-
সাহেব বিস্তারিতভাবে স্বীয় মন্তব্য
লিখিয়া রবিন্দ্ৰনাথের মতের সমর্থন
করেন । তিনি প্রতিপন্ন করেন, আসামের
শিক্ষাদীক্ষায় এ পর্য্যন্ত বাঙালীরাই নেতৃত্ব
করিয়া আসিয়াছেন । আসামের অধিকাংশ
হিন্দু অধিবাসী বঙ্গদেশ হইতে সমাগত এবং
তাহাদের ভাষা বঙ্গভাষা হইতে অভিন্ন,—
আদালতে বাংলাভাষায় কাজ চলিতেছে,
তাহাতে কোনই অসুবিধা হইতেছে না ।
তিনি প্রাচীন এবং বর্তমান ইতিহাস আলো-
চনা করিয়া আসামের সঙ্গে বঙ্গদেশের ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধ দেখাইতে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি প্রদ-
র্শন করিয়াছিলেন।

(১) যোগলোয়া যখন আসাম দখল
করেন, তখন যোগলবিচারালয় বকের
সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল । আসামবাসিগণ
সর্বদা রাজকাৰ্য্যের জন্য সেখানে যাতায়াত
করিয়া বাংলাভাষায় সমস্ত কাজ নির্বাহ
করিত । যোগলদিগের পূর্বে কুচবিহারের
কোটগণ আসামে আধিপত্য বিস্তার করিয়া-
ছিল । তাহারাও রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি
অঞ্চলের প্রচলিত বাংলাই ব্যবহার করিত,—
ইহাদের আধিপত্যকালেও বাংলাই আসামে
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ।

(২) আসামের আকোমি রাজ্যদিগের
দ্বারা অনীত বহুসংখ্য কানৌজী এবং শাক্তি-
পুরী ব্রাহ্মণের উপর আসামের অধিবাসিগণের
শিক্ষার ভার স্তম্ভ ছিল । আসামের ৭০০ সাত
শত দেবালয়ের পোরাহিত্যে তাঁহারা ই নিযুক্ত
ছিলেন । এই বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা
বঙ্গভাষা আসামের সর্বত্র প্রাধান্যলাভ
করিয়াছিল ।

(৩) ইংরেজগণকর্তৃক আসামবিজয়ের
পর তদদেশীয় প্রধান প্রধান কৃষকের সম্মান-
গণকে রীতিমত বাংলা শিক্ষা দেওয়া
হইয়াছিল । আদালতে বাঙালী কৰ্মচারিগণের
সংখ্যাই অধিক, কারণ আসামী লোক ততদূর
শিক্ষিত নহে ; এখন কিন্তু সর্বত্রই তাহারা
বাংলা শিখিয়া উন্নতির চেষ্টা পাইতেছে ও
বঙ্গের বঙ্গের বহুসংখ্যক আসামীলোক রাজ-
কাৰ্য্যে অবৈশলাভ করিতেছে ।

(৪) আসামের পুলাংশেরও বহুসংখ্যক
সম্রাট পরিবার দাঘকাল বাংলাদেশে নিৰ্জী-
বিত ছিলেন, সুতরাং বাংলা তাহাদের পক্ষেও
অনার্য্যসাধ্য হইয়াছে ।

কেকিঙ্গসাহেব প্রমাণিত করেন—
বাংলা আসামবাসিগণের নিত্যব্যবহৃত
ভাষা,—ইহা শিক্ষা করিতে তাহারা যখন
কোন অসুবিধাবোধ করে নাই । বাংলাভাষায়
বক্তিত করিলে তাহাদিগের সমস্ত উন্নতির
পথ অবরুদ্ধ হইয়া বাইবে ।

ওয়েল্‌সের বিজ্ঞানরসমূহে একবার
পঞ্চমর্শে ইংরেজীভাষার পরিবর্তে ওয়েল্‌সের
ভাষা প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতে
তদদেশবাসীরা স্থলে স্বীয় শিশুদিগকে পাঠা-
ইতে অস্বীকার করিয়াছিল । কেহ কেহ

অস্থান করেন, প্রচাচার মধ্যে একপ একটি আবেগ ও শক্তি নিহিত আছে, যাতে ইহা প্রাক্তাচার সঙ্গে সনককতা করিতে পারে; তাহাদের কবি বারন্দু সেই ভাষাতেই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন—
তথাপি ভবেন্দ্রবাসীরা ইংরেজীভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে ।

এই প্রাথমিক বিভিন্নতা সাধারণ ভাষা-
টিকে বহু বিভিন্ন উপকরণ হইতে বনসকর করিতে সুবিধা দেয়—সেই ভাষা ক্রমে সমাজের অদ্বন্দ্ব স্তর পর্যন্ত বীথ প্রভাব বিস্তার করিয়া কথিতভাষাগুলিকে ধীরে ধীরে মার্জিত করিয়া তোলে এবং বচসংখ্যক লোকের স্ববেতচেতনার ফল স্বতঃ স্বতঃ প্রদেয়কে প্রদান করিয়া এক বৃহৎ জনপদের চিন্তা-শক্তিকে উন্নত করিয়া প্রবাহিত হয় ।

জ্যেষ্ঠ ও রবার্টসন্ সাহেবের এই সকল অকাট্যবৃত্তি সবেও আসান হইতে বঙ্গভাষা বিতাক্ত হইয়াছে। ঐ আবেদনপত্র প্রেরণের কিছুকাল পরে আসামের চিক্ কবিশ্রমের পদ স্বেচ্ছ হইয়া উক্ত প্রদেশে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পাদ্রীগণের নবোদয় ও স্বার্থ সিদ্ধ হইবার নানারূপ সুবিধা উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠসাহেব আসানীভাষার পুত্ৰকে অজ্ঞাবের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—
“আসানবাসীগণ যদি বাংলাপুস্তক পড়িতে না পার, তবে এই পাদ্রীগণ-প্রচারিত কয়েকখণ্ড পুস্তিকা তাহাদের সম্বল হইবে—তাহাদের ধর্মকথা পোকেয়া অভিনয় তিষ্ঠ বলিয়া মনে করে, এবং ধর্মকথা ভাড়া তাহাদের সুদ্রাঘর হইতে অপর্যাপক করখানি সামান্য সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকেও

গ্রীষ্টানী মনে করিয়া লোকেয়া সম্মেলের চক্ষে দেখিয়া থাকে।”

কিন্তু পরিণামে তাহাদের সম্বল, তাহাদ্বাই প্রকৃত জরী,—পাদ্রীগণের চোটেই সার্থক হইয়াছে। আসানবাসী ব্রাহ্মণও লী বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের ততটা পর হইয়া যান নাই,—বাংলাভাষা হইতে বিচ্যুত হইয়া বতটা হইয়াছেন। আসানীভাষা ও বাংলাভাষা এক। তাহারা প্রাচীনসাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন, আসামের শব্দ ও চট্টগ্রামের শ্রীকরনন্দীর কাব্য দুইই আধুনিক বাংলা হইতে তুল্যদূরে অবস্থিত, অথচ শ্রীকরনন্দীকে আমরা বাংলা কবিতার নির্মাণ-কর্তাদের আসনে বসাইয়াছি, শব্দকে পারি নাই। এখনও চট্টগ্রাম, ঐহট, আসান প্রভৃতি অঞ্চলের কথিতভাষার সঙ্গে লিখিত বঙ্গভাষার তুল্যরূপই প্রভেদ, অথচ আসান আসানিগণের ভাষার পত্তী হইতে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চাকনিবাসী নাবারীদের কথা বোধ হয় কলিকাতার লোক কোনক্রমেই বুঝিবেন না,—একপ প্রাথমিক শব্দ-উচ্চারণ-প্রভেদ বঙ্গের জেলায় জেলায় বিদ্যমান,—কিন্তু বাংলা লিপিবার সময় সমস্ত প্রভেদ কোথায় চলিয়া যায়—আমাদের প্রতি জেলার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন বিনষ্টরূপে অস্থানিত হয়। আসান চট্টগ্রাম হইতে কবির নবীনচন্দ্র সেন, ঢাকা হইতে শ্যামলালা কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং ঐহট হইতে বাগ্দিবর বিপিনচন্দ্র পালকে পাইয়াছি। বঙ্গভাষা দূর—সুদূর হইতে ব্রাহ্মণও লীকে আসান করিয়া এক-সুখ

সম্মিলনের সংঘটন করিয়াছে। কিন্তু আসাম হইতে, আমরা কোন কবি বা ঐক্যকারকে খাই নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের সমবেত চেষ্টার সঙ্গে আসাম খাঁর চেষ্টা বিশাইতে পারিলে তাহার উন্নতি যে দ্রুত-তর হইত, তাহার সন্দেহ নাই। বিশাল ষোড়শকের এক তথ্যও বেন স্মৃতি পড়িয়া আছে,—তাহা পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের আধার দূর করিতে পারিতেছে না—ইহা। কি ব্রুজি না অন্ধহানি ?

ব্যক্তিগত বা জাতিগত অভিমানের উল্লেখ হওয়া সহজ। কিন্তু এই অভিমান বিসর্জন দিয়া ঐতিবেদীর সঙ্গে সম্মিলিত না হইতে পারিলে, ঐক্যবল কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। কোন ক্ষুদ্রপ্রদেশের কথিতভাষার স্বতন্ত্রা কল্পনা করিয়া যদি কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে গৌরব প্রদান করিতে বান, তবে ভদেশবাসিগণ মনে করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্মরণ দেওয়া হইল। কিন্তু যদি ভ্রাতা বহু লইয়া সাধিতে আইসেন, তাহাকে বাহিরে রাখিয়া ঘরোয়া করার কি গৌরব আছে ? ইহাতে প্রকৃত পরাধর্য্য কার ?

পৃথিবীতে যে-কোন ভাষা অপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বহুপ্রদেশের বিভিন্নভাষারূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইতে পারিয়াছে। বহুসংখ্যক ঐতিভাবিত ব্যক্তির সমবেতচেষ্টার ফল ভিন্ন ভিন্ন ঐক্যবলকে বিতরণ করিয়া সেই ভাষা নিজেকে, সার্থক করিতে পারিয়াছে। বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা শক্তিশূন্য ; যে পর্য্যন্ত আমরা সংযুক্ত, সেই পর্য্যন্ত আমরা বলশালী।

বাংলাভাষা এখন চারিদিক্ হইতে শক্তি-সংগ্রহ করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ইহাকে যে শক্তি প্রদান করিতেছে, তাহার ফল ইহা সমস্ত বাংলাদেশের গৃহে গৃহে ব্যটিয়া দিতেছে—ইহার নবদৃশ্য গর্ব পৃথিবীর সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিবার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা এখনও বিচ্ছিন্ন হই নাই,—ভাবী বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কার আমরা প্রীতির বন্ধন বিশ্বপিত্তরূপে উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের ইতিপূর্বে ভ্রমেও মনে হয় নাই যে, ছদ্মরূপে বাহাদের প্রীতি পুষ্ট হইয়াছে, বাহাদের সঙ্গে মিলিয়া এক ঘরে কোলাহল করিয়াছি, একত্র এক ভাষার আরাধনা করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আমাদের বিরহ ঘটিবে—আমাদের বহুতপস্তাপ্রসূত বঙ্গভাষার পুনশ্চ খণ্ডবিখণ্ড হইবার আশঙ্কা হইবে। আসাম সিদ্ধাছে,—আসামবাসীর সঙ্গে আমা-দের এখন কতটা প্রভেদ থাকাইয়াছে, চট্টগ্রাম ও ত্রিহট্টের সঙ্গে তুলনা করিলে সেই অনৈক্য আমরা গাঢ়রূপে ছদ্মরূপ করিতে পারিব।

সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হওয়ার সুযোগ পাইয়া সংকুত এরূপ অপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—ইহার সেবক নেপাল ও ময়ীপুর হইতে, কামরূপ ও পাক্ষা হইতে বিশাল ভারত-বর্ষের সর্বত্র এই ভাব্যক্রীড়ানে তৎপর ছিল। ভাষার গভী সর্পিণ করিলে তাহার সমস্ত ভবিষ্যতের উন্নতির মূলে কুঠারঘাত করা হয়। আমাদের ভাগ্যে বেকরপ পাত্রী-বহাণগণ অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, কালে পূর্ববঙ্গের দূরেক হুজুগ কোন হিতৈষী বক্ত

আরু না হটলে, যাঁচা যাবে। পূর্ববঙ্গ যদি সত্যি এদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে আসামের উপহরণে ভাষাচ্ছেদ না ঘটে—ইহাই বিশেষরূপে প্রার্থনীয় হইবে।

মল্লুজাতি তাইমুরী ।

মল্লুজাতি তাইমুরী নামক পুস্তকে তাইমুরের আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে তাইমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন,—সেই সময়ের মুসলমান সম্রাট্‌গণ কিরূপ ধর্মের ভাবে ব্যতিত্যা উঠিতেন, ধনলিপ্সা হইতে ধর্মবিস্তারের প্রয়াসই তাঁহাদিগের সমস্ত উদ্ভবে কিরূপে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিত, তাহা তাইমুরের ভাষ্যবিবরণীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচারের উৎসাহ তাঁহাদিগকে পরস্পরাবিধরে প্রণোদিত করিত। যে সকল স্থানে বিপক্ষগণ মস্তক অবনতকরিতেন, সে স্থলে সেই মস্তকের একটি কেন্দ্র ও তাঁহারা স্পর্শ করিতেন না—তাঁহাদের বহুভাঙারের উদ্বাটিত দ্বারও মুসলমান জেতাগণের লুকুটী আরুঠে করিত না। ঘনের এলাতে কোণে দেশজয় করা অপেক্ষা উচ্চ ধর্মত্রেতে দীকিত হইয়া নৃশংসের দ্বার অস্ত্রচালনারও একটা পৌরুষ আছে,—কুলংকার মার্কানীর, যদি সেই সংস্কার অকণ্ট হয়, কিছ্র বার্ষসিছির চেষ্টা কখনই প্রভার উদ্রেক করিতে পারে না।

কুব ও আপানের বৃদ্ধ রুধের সঙ্গে আমাদের কহিন্দি কালেও সহানুভূতি থাকিতে পারে না। মুসলমানগণের দেশজয়ের চেষ্টার মূলে ছিল মূঢ় অকপট ধর্মবিশ্বাস, সেই বিশ্বাস

অঙ্ক হউক এবং তাঁহাদের সমস্ত অল্পষ্ঠান নৃশংস হউক—তথাপি কৌশলে পরের সর্বস্ব অপহরণ করিবার অভিসন্ধিকে ছদ্মবেশে যেদীতে স্থাপন করিয়া হস্তপ্রসারণ অতি হয়। মুসলমানগণের অঙ্কতা ও বর্করতার মধ্যে প্রভা করিবার অনেক সামগ্রী পাওয়া যায়—কিন্তু শুধু অর্থাবেষণরূতির চেষ্টার যে নিষ্ঠুরতা অল্পষ্ঠিত হয়, তাহার কোন উচ্ছল দিক্‌ নাই।

তাইমুরের আত্মকাহিনীতে হিন্দুগণের প্রতি একটিও প্রিয় কথা নাই,—উহার প্রতিপক্ষে হিন্দু পৌরসিকের প্রতি গাঢ় অবজ্ঞা ও ঘৃণার কথা দৃষ্ট হয়; তথাপি উহা পড়িয়া মনে হয়, তাইমুর যে মূঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঠাড়াইয়া ছিলেন—সে স্থানে তাঁহাকে প্রভা করা অসম্ভব নহে। তিনি হিন্দুদিগের ধর্মসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, প্রকৃত ধর্মের মর্মকথাও তাঁহার বিদিত ছিল না, তথাপি যেহেতু বার, তিনি প্রবল ধর্মের বলে বলীয়ান ছিলেন—বিশ্বাসই তাঁহার তরবারিকে শাণিতকরিয়া দিয়াছিল। সেই তরবারির 'আ' পাইয়াও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, তাইমুর সরল অকপট বোদ্ধা—তিনি ভ্রান্ত বা উন্মত্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার একটা উচ্চ তপস্যার ভাব ছিল।

এস্থলে আমরা তাঁহার আত্মবিবরণী হইতে কতকংশ নিয়ে সন্ধান করিলাম।

“এই সময়ে (অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে) কাকেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ‘গাজি’ হইবার জন্য আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। আমি জানিলাম, কাকেরদিগকে যে হত্যা করিতে পারে, সেই ‘গাজি’ নাম পাঠতে পারে এবং

যদি এইরূপ ঘৃণা করিয়া কেনে মূল্যমান হত হয়, তবে সে বেধুস্তে যায়। এই তাহে উত্তেজিত হইয়া জামি কাকেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থির করিলাম, কিন্তু চীনবাসী কাকেরদিগের বিরুদ্ধে অথবা হিন্দুস্থানবাসী কাকেরদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, অনেকদিন তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এই বিষয়টি মীমাংসা করিবার জন্য আমি কোরাণ খুলিয়া খোদাতালার ইচ্ছা জানিতে লক্ষণ খুঁজিলাম। কোরাণের যে বয়েংটি আমার প্রগ্নন চক্ষে পড়িল, তাহা এই—‘হে স্বর্গীয় পুত্র, তুমি নাস্তিক ও কাকেরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস কর।’

“আমার সচিবের মধ্যে অনেকে বলিল—‘হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ নাস্তিক ও কাকের।’

“সর্বশক্তিমান খোদাতালার আদেশানুসারে আমি কাকেরদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করানুস্থির করিলাম। রামায় আদেশ প্রচার করিয়া দিলাম—যেন প্রধান আমিরবর্গ, জ্ঞানবুদ্ধগণ এবং সেনাপতিগণ অগোণে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যখন তাহারা সকলে সমবেত হইলেন, তখন আমি বলিলাম, ‘খোদাতালা ও মহম্মদের আদেশে আমাদিগের কাকেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই ধর্মযুদ্ধের জন্য আমি প্ররম্ভিত,—এখন চীন কিংবা ভারতবর্ষ, এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনটির বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে আপনাদের মত কি?’

“তাহারা অনেক জ্ঞানগর্ভ ধর্মশাস্ত্রের

কথা বলিলেন এবং শেষে জানাইলেন, ‘ভারতবর্ষবিভবের চারিপ্রকার অন্তরায় আছে, তাহা আদৃত না করিলে দেশাধিকারের সম্ভাবনা নাই।’

“প্রথম অন্তরায়—পকনব। এই বাতাধিক বাধা সর্বপ্রথমেই আমাদের পথে বাড়াইবে—উপযুক্তসংখ্যক নৌকা ও সেতুর ব্যবস্থা না করিতে পারিলে নদী অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

“দ্বিতীয় অন্তরায়—ভারতবর্ষের অত্যন্ত ও দুরতিক্রম বনরাজি, অনেকস্থলে পাহাড় ভেদ করিয়া যাতে হইবে—তাহা বড়ই দুষ্কর।

“তৃতীয় অন্তরায়—প্রবলপরাক্রান্ত কাকের রাজা ও জমিদারগণ। তাহারা বন্যপশুর জ্ঞান ভয়ানক ও অগম্য।

“চতুর্থ অন্তরায়—অসংখ্য হস্তী। এই হস্তিবলই ভারতবর্ষীয় লোকের প্রধান সহায়। মেঘের জায় বিরাট হস্তিযুদ্ধকে অগ্রে স্থাপন করিয়া তাহারা যুদ্ধাশা করিয়া থাকে। এই হস্তিগণ একপা হুশিকিত যে, অনেকসময় বিপক্ষদের অধারোহী সৈন্যদিগকে আঁখের সহিত হুওওয়ারা শূন্তমার্গে উত্তোলন করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করে, অথ ও অধারোহী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।’

“কোন কোন সচিব বলিলেন, ‘মূলতান মহম্মদ সবকুগিন ১০,০০০ অধারোহী সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, আর আমাদের আমির (তাইমুরের উপাধি) কি সবকুগিন অপেক্ষা কোন অংশে নূন? ইচ্ছা করিলাম একলক্ষ তাজারের অধারোহী সৈন্য এই মুহূর্ত্তে তাহার জন্য প্রাণ দিত

দাড়াইবে। খোদাতালা এধ ব্যাপারে অব-
শ্যই তাঁহাকে বিজয়ী করিবেন এবং তিনি
অভিয়ে গাফি ও মুহাম্মদের গৌরব প্রাপ্ত
হইবেন।'

"হুমায় প্রাক্ক বলিলেন—'ভারতবর্ষ
অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য,—সেহান অধিকার
করিতে পারিলে আমরা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ
সম্মান পাইব। আমি পারস্তদেশীয় সুলতান-
গণের ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, ভারতবর্ষের
সম্রাটগণ পক্ষিত 'দারাই' উপাধি গ্রহণ
করেন। পারস্তের সুলতানের উপাধি—'কিত্র',
তাতারাদিগণের উপাধি—'খাকন', চীন-
সম্রাটের উপাধি—'কাংকু' এবং ইরান ও
তুরানের অধিপতির উপাধি—'শাহানশাহ'।
ভারতবর্ষীয় সম্রাটগণ সর্বদাই 'শাহানশাহ'র
আলুপত্য স্বাকার করিয়া আসিয়াছেন।
আমরাই খোদাতালায় ইচ্ছায় এখন ইরান ও
তুরানের 'শাহানশাহ'—মুতালার ভারতবর্ষের
রাজ্যগণের উপর আনাদিগের প্রভু না থাকা
বড়ই ক্ষোভের বিষয়।'

"হুমায় মহম্মদ সুলতান বলিলেন—'যে
দেশের অধিবাসিগণের অধিকাংশই কাফের,
পৌত্তলিক এবং হয্যের উপাসক, তাহা-
দিগের মধ্যে সত্যদ্বন্দ্বপ্রচারের চেষ্টা অবজ-
কর্তব্য। আর তবু যাহা যে, ভারতবর্ষে হারা,
স্বর্ণ ও রৌপ্যের ১৫টি খনি আছে, সে দেশের
তুলনায় চিরহরিৎ ও স্বর্ণবর্ণ, হুশ না
থাকিলেও সেখানকার তরুজাতি সুগন্ধি,
সেখানে অপব্যাপ্ত হইছে। এহান
অধিকারহুক প্রাধ প্রয়োজনায়।'

"কিন্তু কোন কোন সাত্বে বলিলেন—
'খোদাতালায় প্রসাদে আমরা ভারতবর্ষ জয়

করিতে পারি, কিন্তু সেখানে বাইতরা যদি বাস-
স্থাপন করি, তবে আমাদের সম্মানগণের
সকল বিষয়ে অবনতি হইবে এবং কয়েক
শতাব্দীর মধ্যেই আমরা তদ্রূপবাসিগণের
জ্ঞায় বলবোধশূন্য ও ভীত হইয়া পড়িব।'
এই কথায় আমিরগণ ও সেনাপতিবর্গ বড়ই
বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন আমি তাঁহা-
দিগকে বলিলাম—'আমার উদ্দেশ্য নয় যে,
সেখানে বাইরা বাস করা হইবে। এই ধর্ম-
যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি তদ্রূপবাসী-
দিগকে পবিত্র ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিব—
সে দেশের স্থণিত পৌত্তলিকতা, বহু ঈশ্বরের
উপাসনা এবং নাত্তিকতার ভিত্তি বিচলিত
করিব—তাহাদের মন্দির ও বিগ্রহগুলি চূর্ণ-
বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং খোদাতালায়
নিকট গাফি ও মুহাম্মদ বলিয়া প্রতিপন্ন
হইব।'

"আমার কথায় সকলে বেন একটু অনিচ্ছা-
সবেও সম্মতি প্রদান করিল, কিন্তু এইসময়
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া বলি-
লেন—'বাহার্য বিশ্বাস করেন, "খোদাতালা
একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং মহম্মদ তাঁহার
দূত", তাহাদের কর্তব্য সমস্ত ইসলামের
শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা এবং যে-কোন স্থানে
সত্যদ্বন্দ্বের স্রষ্টা থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে
সংগ্রাম ঘোষণা করা—ইহা অপেক্ষা
উন্নততর তত ইসলামধর্মাবলম্বীগণের আর
কিছু নাই।' এই উৎসাহপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যায়
সমবেত মুহাম্মদীয় সমস্ত বিদ্যা বুচিয়া গেল,
তাঁহারা বাহু পাতিয়া বাসিয়া খোদাতালায়
স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুস্থানবাসী
উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। 'ওর হজরত

দেশে জৈহাদিন সাহেবের নিকট আমি ধর্ম্মার্থ মুহসকলের কথা* লিখিয়া অহুর্নতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার পত্রের একপার্শ্বে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন—‘এতদ্বারা আবুল গাফি তাইমুরকে’ (ঈশ্বর তাহার সহায় হউন) আনান যাইতেছে যে, এই ধর্ম্মকাণ্ডের লজ্জা ঈশ্বর তাহাকে ইহকালে ও পরকালে বিশেষরূপে পূরিত করিবেন, এবং তিনি নির্ভয়ে বিদ্রোহী হইয়া কিরিয়ান* আসিতে পারিবেন।’ তিনি আমাকে একখানি বৃহৎ তরবারি* পাঠাইলেন, আমি তাহাই আমার রাশন ও খরচ বাবহারে কীরতে লাগিলাম।”

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, তাইমুর রত্নশোভে দিগ্‌দেশ ভ্রম করিয়া বেড়ান নাই,—তিনি প্রচারক ও ধর্ম্মবাজকের বেশে ভারত-বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুত্ব আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বৃহৎ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইরাছিলেন,—তিনি ভারত-

বর্ষের রত্নভাণ্ডারের প্রতি গৃহবৎ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া এই দেশকে গ্রাস করিতে আইসেন নাই। ধর্ম্মবিষয় উদ্বুদ্ধকে প্রত্যা-
পন্ন করে, বর্ষের মস্তকে সন্মুখের উজ্জীব বাধিয়া দেয়। আমাদের নিরীহদেশে অক
ধর্ম্মপ্রচারকগণের হস্তে ব্যঃব্যঃ বিড়ম্বিত
হইরাছে, তথাপি অকপট বিশ্বাসের প্রতি
একটা প্রত্যাশ তাব না হইয়া যায় না।

কৃষকের পরদেশের প্রতি লোলুপদৃষ্টি
দুগার উদ্রেক করে। স্বাধিদিকির চেষ্টায় ক্ষমতায়
উচ্চ ভাবগুলি শুক হয়,—কপটতা জ্ঞানের
ছদ্মবেশ পরিয়া প্রতারণা করিয়া যায়, এবং
কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য হির রাখা
অসম্ভব হয়। ধর্ম্মের অকতা শুধু কলাকলের
‘হিসাবে’ তুলা বা অধিকতর অনিষ্টকর
হইলেও, উহাতে মানুষের উন্নত ভাবগুলিকে
মত্তেজ ও পরিপুষ্ট করিয়া আদর্শকে সমুজ্জ্বল
করে এবং বর্ষেরতাকে ত্যাপের ভাবে
মহিমাবান করিয়া দেখায়।

শ্রীদানেশচন্দ্র সেন ।

স্বীকার ।

—

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার

করিব হে !

সবার মাঝারে তোমারে ক্ষম্যে

বসিব হে ।

তুধু আপনার মনে নয়,

আপন ঘরের কোণে নয়,

তুধু আপনার রচনার মধ্যে নহে !

তোমার মহিমা দেখা উদ্দেশ্য নহে,

দেটে-সরা-মাকে তোমারে স্বীকার
করিব হে !
ঢালোকে ভুলোকে তোমারে ছদয়ে
বরিব হে !

সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার
করিব হে !
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমাধে
বরিব হে !

কেবলি তোমার স্তবে নয়
তুধু সঙ্গীতরবে নয়,
তুধু নিরুজনে ধ্যানের আসনে নহে !
তব সংসার বেধা জাগ্রত রহে
কর্ণে সেধায় তোমারে স্বীকার
করিব হে !
প্রিয়-অপ্রিয়ে তোমারে ছদয়ে
বরিব হে !

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার
করিব হে !
জানি বলে' নাথ তোমারে জীবনে
বরিব হে ।

তুধু জীবনের স্রুখে নয়,
তুধু ক্ষুদ্রস্রুখে নয়,
তুধু স্রুধিনের সহজ স্রুবোগে নহে !
হৃৎশোক বেধা জঁধায় করিয়া রহে
নত হ'রে সেধা তোমারে স্বীকার
করিব হে !
নয়নের জলে তোমারে ছদয়ে
বরিব হে !

বঙ্গদর্শন ।

“গুরুদক্ষিণা ।” *

(সমালোচনা ।)

সতীশ শশন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিকদিনের কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক—কলেজে পড়িতেছে—সন্ধ্যাভে সন্ধ্যায় বিনয় মুখে অন্নই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেবিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিত্তার করিয়া দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সম্বন্ধ অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্তর দেবিলাহি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ট্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে দাবি করিয়া ধরিয়াছিল। বেলাজলে ট্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ট্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় কাশানের খাতিরে, নয় সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অমুরাগবশতই একাজ করে। আমাদের দেশে ট্রাউনিংয়ের কাশান বা

ট্রাউনিংয়ের দল প্রবর্তিত হয় নাই, সুতরাং ট্রাউনিং পড়িতে সে মনোনিবেশের শক্তি, যে অমুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুরপরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুর-টেননে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত “শান্তি-নিকেতন” নামক আশ্রমে আমি একটি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। তারতবর্ষে প্রাচীনকালে বিজয়ংশীর বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মাদ্রাস হইত, এই বিভাগে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্তমানপ্রচলিত পাঠ্য-বিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ত্রুষ্ণার্থ্য পালনপূর্বক গুরু-

চুতি-সংঘেত প্রকলন হইয়া নৃহাযল্যাত করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন, বাহ্যিক অধ্যাপন-কার্যকে যথার্থ ধর্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যভাব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজ সন্ধি হইয়া যায়—ও তাহাতে একজন বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতে-ছিলাম—তখন সত্যীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লীচ্ছার কুস্তি হইয়া বিনীতভাবে কহিল “আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে দ্রাবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য?”

তখনো সত্যীশের কণ্ঠেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুই জ্ঞতই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মদগমণ করিল।

তাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপ বিসর্জন করিতে সত্যীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে, কিন্তু পণ্য বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সত্যীশের জ্বর অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাকল্প হইতে কল্পক্ষেত্রে নারীরা আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খওতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহার: বৃহৎকে, দূরকে,

সমগ্রকে দেখিতে পার না—প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গচোঙ্গ, জোড়াতাড়ি, বিরোধ, বিকার, অগামজ্ঞাত অনিবার্য, তাহাও পরিপূর্ণ পরিণামের নহবজ্ঞবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক, টুকও দেখিবার আশা করা যায় না, বাহ্যিক মানসী মূর্তির সহিত কর্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্ত জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের তুপাকার যোকা কাখে লইয়া পথ ঝুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে—যাহারা- উৎসাহের জন্ত বাহিরের দিকে তাকায়, একজন তাহাদের নহে—কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে—নিজের মধ্যে একজন সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার ঘরে সত্যীশ অকৃত্রিম কল্পনা-সম্পদ লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতরে বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভয়লপটুকুই দেখিতে পার, সে তাহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়—সংসারে শিব তাহার ভক্তদিককে ঐশ্বর্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না—বাহ্যৈশ্বর্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষকের রক্তগিরিগর্ভিত নির্মল ঈশ্বরমূর্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন—ভূজঙ্গবেতনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরম কাণ্ডালের রক্ত-ভিক্ষাপাত্রের আপনার সর্বস্ব দান করিয়া চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের দুলিতনের অন্তরালে, কর্ণচৌর্যের সহস্রদীনতার মধ্যে শিবের নিব-
নুষ্টি দেখিতে পাইতেন, তাহার সেই কৃতীয়
নেত্র ছিল। সেইজন্যই এত অল্প বয়সে, এই
শিশু অহুতানের সমস্ত চর্যলতা-অপূর্ণতা—
সমস্ত দীনতার মধ্যে—তাহার উৎসাহ-উত্তম
অক্ষর ছিল, তাহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যপ্রভ হয়
নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে
গুটিকয়েক বালককে প্রত্যাহ পড়ুইয়া যাও-
বার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না,
লোকচক্ষু বাহিরে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি
ও আত্মনামঘোষণার মদনততা হইতে বহুদূরে
একটি নির্দিষ্ট কর্ণপ্রণালীর সন্ধ্যোঁতর মধ্য
দ্বিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে
সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা
খেণালের ঘোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়,
কণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়—তাহা
তাহার মহানুভাবের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপরিতৃপ্ত
শক্তি।

বোলপুর ব্রহ্মবিজ্ঞানের সম্বন্ধেই
সতীশকে আমি নিকটে পাইয়াছিলাম,
তাহার অন্তরাত্ম্যের সহিত আমার যথার্থ
পরিচয় ঘটিতেছিল। এই বিজ্ঞানের করুণা
আমার মনের মধ্যে যে কি ভাবের ভিত্তি
অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া
না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে।
কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কোনো বন্ধুকে
আমি এই বিজ্ঞানরসবন্ধে যে পত্র লিখিয়া-
ছিলাম, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা
হইতে পারে :—

“যাকে যাকে আমি কল্পনা করি, পূর্ব-
কালে দ্বিগুণা যেনন তপোবনে কুটির রচনা

করিয়া পট্টা, বালকখালিকা ও শিবাসের
লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন,
তেন্মি আমাদের দেশের জ্ঞানশিখার
জানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন
রচনা করেন, তাহারা জীবিকাভূৎ ও নগরের
সংস্কোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন
বিশেষ জ্ঞানচর্চার রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ
কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের ঐয়ো-
জনকে বর্জ্য করিয়া জীবনের ভারকে লঘু
করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে
নির্ভরকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার-বেটনহীন
নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে
কানীকে বলে পূণিবার বাহিরে, তেন্মি সমস্ত
ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান
থাকিবে,—বাহা রাজা ও সমাজের সকল-
প্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা
হউক বা রূপ রাজা হউক, এই তপোবনের
সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না।
এখানে আমরা খণ্ডালের অতীত ;—
আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ-
কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি ; সনা-
তন রাজবন্দ্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের
সমসাময়িক ; কে আমাদের টেটসেক্রেটারি,
কে আমাদের ভাইমুদ্র—কে কোন্ আইন
করিল, এবং কে সে আইন উল্টাইয়া
দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আঁকাল
তাহার গ্রহভারকা-মেঘবরোঁড়ে এবং প্রান্তর
তাহার তুণে-শুণে ও গুর্ভূর্ণ্যশয়ে আমাদের
প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের
তপোবনবাসীদের প্রথমভূখিবাহের অহু-
ষ্টানপদম্পনা এখনকার নিচুতশাস্তি ও

সরল সৌন্দর্যের চিরস্থান সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে । আমাদের বালকেরা হোম-থেহু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গোদোহনকার্য্য সারিয়া কুটীর-প্রান্তে, গৃহীকাণ্ডে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী নাতুদেবীদের সহিত যোগ দেয় ।

“জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্ণোজ্জ্বানেও সুরতানের শুগুণকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্ণের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বৈদিক-কালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে ‘নালন্দা’ অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কপলেই কি সুরতানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই ‘মিলেনিয়া-মে’র ছুরাশা বলিয়া পরিহাসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃত্তে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সঙ্কল-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি । ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা ; ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অব-মাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় । নহিলে আরও আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কি করিয়া? আমাদের মাথা তুলিবার স্থান ত নাই-ই, মাথা রাখিবার স্থানও প্রত্যাহ সঙ্গী হইয়া আসিতেছে । প্রবল যুরোপ বজ্রার মত আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল । এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিকান কণ্ঠ, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমা-দিগকে আশ্রয় লইতে হইবে । সেখানে সৈনিকদের সহিত আনন্দের বিরোধ নাই,

বনিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, শ্রমপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই—সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উক্তে ।”

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি জানি । ঙ্গাহারা বলিবেন, “বর্ত্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা ।”

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এতদপ-প্রশ্নের সহস্তর দেওয়া চলল না । সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কি, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি । এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য !

আর একটিমাত্র কথা আছে । আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে গুরু করিয়া নবের মধ্যে গাঢ় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না—জিসকোটি তপস্বী কোনো ক্ষেপে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে । এ কথা সত্য বটে । কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের ভগ্নাবীর লইয়া রক্ষা করিয়া থাকেন । ইংরাজেরা বাহাকে স্বাধী-নতা বলিয়া জামেন, তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্ত্তে লিপ্ত । অথচ কয়েকজনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি-দান করে । ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের

মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে—কয়েকটি উপোবসন সমস্ত দেশের অস্থিরের দাসত্ববন্ধ মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হোক, আমাদের সমাজটিকে এক-কণ কেবলমাত্র কলনার দিক্ হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, 'কালের দিক্ হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা একদম মনোরম এবং সুসমাধিষ্ঠিত নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল,—কোথায় সার্বিক ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় এক-নিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের সৌম্যানশ্রল জ্যোতিঃপ্রভা ? তবু ভারতবর্ষের আত্মনাকে কেবল বাহ্যিকপে নহে, কর্ণ-আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চৈত্র্যকে আমি গান দিয়াছি। এখনো ইহা রূপান্তরিত বাক্যমাত্র, ইহা আস্পান।

সতীশ, অনাঘাত পুণ্ডরীকিত স্তায়, তাহার তরুণ জনকের সমস্ত প্রভা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে ভ্যাগবীকার করিয়াছিল, তাহা নাই। একদিনের ক্ষণ্ডও সে অহংকার অহুত্ব করে নাই—সে প্রতিদিন নম্রমুখ প্রসূরভাবে আপনার কাজ করিয়া বাইত, সে যে কি করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের চারিদিকে অব্যাহিত স্তরকারিত মাঠ—এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক এক জ্ঞানগর্ভ বর্ষারতন বুনো বেগুন, বুনো জাম, দুইএকটা কাঁটাগুণ্ডা, এবং উয়ের চিহ্নিতে মিলিয়া একএকটা গোপ দাঁধিয়াছে। অদূরে

ভায়াবত কৃষনভাঙা-প্রান্তের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইম্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো তথ্য বৈতাপুরীর তত্ত্বশ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার ঝলধারায় খেলমাটি ফইয়া গিয়া মুক্তি-বিছানো কঙ্করতৃপের মধ্যে বহুতর শুষ্ক-সম্বর ও বর্ষাশ্রোতের বায়ু বর্কণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। অনশ্রুত মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্তী প্রান্তের দিকে চলিয়া গেছে সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুর-সহরে হাট করিতে যার, সাঁওতালনারীহ-উলুখড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভারতবর্ষ গোন্ধর-গাড়ি নিস্তক মধ্যাহ্নের রোদ্রে আর্ন্তগদে দূলা উড়াইয়া বাতায়ানত করে। এই জনহীন তরুণ মাঠের সর্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে গুজুদাঁধ একসারি শাল-বৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশপদ দিয়া একটি শৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে—এইখানেই আম-লকী ও আম্রবনের মধ্যে মধু ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিভাগলের সুন্দরকুটীরে সতীশ আশ্রম লইয়াছিল। সমুখের শালতরুশ্রেণীর তলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন হৃদয়াকালে তাহার সহিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যসম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনোভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং অনশ্রুত পাশ্বরের নিবিড় নিস্তরুতার উদ্দেশে

আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে ।
এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্ত-
পারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার
উদ্ভাটিত উল্লুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ
করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম । এই নবীন
হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত বস্তুপরম্পরার
রসম্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাষামোহনের
অভিঘাতে ও কলাগঙ্গাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ
জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অৱহর স্পন্দিত
হইতেছিল ।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালক-
দের লব্ধ উত্তরের উপাখানি অবলম্বন করিয়া
“গুরুদক্ষিণা” নামক কথাটির রচনা করিয়াছিল ।
এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার
তত্ত্বনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত
আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে—ইহা প্রভার
রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে
সম্মুগ্ধ—ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুসুনার

গুহতা অতি কোমলভাবে অগ্নান রহিয়াছে ।
এই গ্রন্থটুকুকে সে জিহ্বার মত রচনা করে
নাই এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া
ও সতীশের সমস্ত-উদ্বোধিত প্রকুর নবীনহৃদয়ে
মিলিয়া গানের মত করিয়া ইহাকে ধ্বনিত
করিয়া তুলিয়াছে ।

গ্রন্থসমালোচনা করিতে বলিয়া গ্রন্থের
কথা অতি অল্পই বলিলাম, এমন অনেকে
মনে কল্পিতে পারেন । বস্তুত তাহা নহে ।
সতীশের জীবনের যে অংশটুকু আমি জানি,
সেই অংশের পরিচয় এবং এই গ্রন্থের আলো-
চনা, একই কথা । এই বুকিয়া পাঠকগণ
যখন “গুরুদক্ষিণা” পাঠ করিবেন, তখনই
তাহারা এই গদ্যকাব্যটির সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে
ধারণা করিতে পারিবেন । গ্রন্থে বাহা
আছে, গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে, গ্রন্থের
বাহিরে বাহা ছিল, তাহাই আমি বিবৃত
করিলাম ।

সার সত্যের আলোচনা ।

কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার ।

বিগত গ্রন্থে আমরা কাটীর দর্শনের অধি-
সক্তি-প্রবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে
বিষয় এক সঙ্কটস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি ।
এই প্রসঙ্গটির আশপাশের গলিঘূর্ণিতে
ভয়ানক ডাইনামাইট—সর্বসংশয়—নিঃসিদ্ধ
সূক্তি-পরিচ্ছদে চাপাচূপি দেওয়া রহিয়াছে,
তাঁহা আমি জানি ।

তাহাকে আমি ঘাঁটাইতে ভয় পাইতেছি না
—সে কেবল দেশীয়াস্ত্রের মহনসমুত মুক্ত-
সঞ্জীবনী স্রবার বাহ্যিক্যভাণে । পাশ্চাত্য
দর্শনের কিন্তু বড়ই হৃদশা ! কাটের সময়েই
অনতিদূরে ইউরোপীয় তটোচ্চার্য-মহলে
নানা শ্রেণীর নানা দর্শনকার নানা মত-
মতের মনোরাজ্য বাতাসে কাঁদিতা সেই সেই
মনোরাজ্যের প্রকল্পনগর ডগায়ে বাস্তবিক-*

সত্যের চক্ষে সাধাইয়া আসিতেছিলেন সুনির্ভয়ে । কন্ট্ এক কথার তাঁহাদের মূল্যবোধ জয়ের সত্যো ভাঙিয়া দিলেন । সে কথা এই যে, বাস্তবিক-সত্য মহাব্যক্তানের অধিকার-বহির্ভূত ।

গোড়াত্বেই তো ‘আমি বলিয়াছি, “আগে হৃৎ—পরে শান্তি !” হে বাস্তব-ভাষা’রা ! শান্তিসমনে বাইবার জন্ত ব্যাভা করিয়া বাহির হইতেছ বটে, কিন্তু মনে করিও না যে, বিনা হৃৎ অডীট-কল-লাতে কৃতকার্য হইতে পারিবে । কণীয় মন্তক হইতে মণি উৎপাতন করা সোজা কথা নহে ! অতএব হৃৎের জন্ত প্রস্তুত হও ! ধৈর্যের কবচ পরিধান কর ! জ্ঞানের অগ্ন শাণিত কর ! কলে, একটা দিক আছে—যে দিক দিয়া যেখানে মনে হয় যে, কন্টের দর্শন আগাগোড়া একটা কুব্ধকেশ-কাণ্ড ! এ কুব্ধকেশের কুব্ধ-পাণ্ডব হচ্ছেন জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্য । বুদ্ধিষ্টির এবং ব্রহ্মোপদান দৌড়ে দৌহার ভ্রাতা ছিলেন কেবল জ্ঞান-সম্পর্কে ; কিন্তু জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্য দৌড়ে দৌহার স্বর্গাস—শিবদুর্গা বলিলেই হয় ! ত্রীপুরুষের দাম্পত্য-কলহ সবাই জানে খড়ের আগুন ; তা বই, তাহা যে এমনতরো একটা ‘ন ভূতো ন ভবিষ্যতি’ রকমের প্রলয়-মুষ্টি ধারণ করিতে পারে—এ কথা পৃথিবীর জাদিম-বৃগ হইতে একাল পর্যন্ত স্বপ্নেও কাহারো জানা ছিল না । বিবাদানল এত-

দিন পর্যন্ত সুপাকার ভস্মরাশিতে আচ্ছাদিত ছিল, তাই লোকের তাহা চক্ষে পড়ে নাই । ভস্মরাশি আর-কিছু না—বাদ্যবাদের শব্দ-ভর । সেই ভস্মাচ্ছাদিত অঘটিকে মুক্তি-তর্কের শুদ্ধকাঠ দিয়া বিধিমতে বোঁচাইয়া-তুলিয়া কন্ট-মহামুখী কাণ্ড-এক বাদ্যইয়া-ছেন কম না ! এখন সে অঘটিকে লাম্ব-লানো দার ।

কন্টের পৌঁচাখুঁচি ।

কন্ট আপনাত মনকে সামনে ডাকিয়া-আনিয়া শুধাইলেন—“বল দেখি বৎস, কে আগে ? বাস্তবিক-সত্য আগে—না জ্ঞান আগে ?” মন বলিল—“বাস্তবিক-সত্য ।” মনের এ কথায় কন্টের হৃদি সার মিল না । কন্ট সুনি ধ্যানে বসিলেন । তাঁহার মনো-মধ্যে ভাবনা ঢেউ খেলিতে লাগিল এইরূপ :—

“মন তো বলিবেই ‘আগে সত্য—পরে জ্ঞান ।’ এটাও তো সে বলে যে, ‘পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ঘুরিতেছে ।’ বিজ্ঞান তো আর তাহা বলে না । জগৎশুদ্ধ লোক বধন ইঞ্জিয়-মনের কথায় তুলিয়া একবাক্যে বলিতেছিল—‘পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ভ্রাম্যমাণ,’ তখন বিজ্ঞানের অস্রোহ অগ্নীকান্দ মন্ত্রকে ধারণ করিয়া কোপনিকস্ একাকী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—‘না, তাহা নহে ! সূর্য্য স্থির—পৃথিবী ভ্রাম্য-মাণ !’ ইনি আমার গুরু । ইহার পৃষ্ঠান্তের মন্ত্রপুত অন্ধনে চক্ষু বাক্কিত করিয়া আমি

• We have here the same case as with the first thought of Copernicus, who, not being able to get on in the explanation of the movement of the heavenly bodies, as long as he assumed that all the stars turned round the spectator, tried, whether he could not succeed better by as-

দেখিতেছি এই যে, সংবিৎ স্তির রহিয়াছে ; আর, তাহারই সাক্ষিতাওণে জেদবস্ত্র-সকলের সত্তা সংসিদ্ধ হইতেছে ;—আগে জ্ঞান, পরে সত্তা, তাহাতে আর ভুল নাই ।” এ তো পঞ্চদশীর কথা ! পঞ্চদশীতে স্পষ্ট লেখা আছে—

“সাক্ষিকবুদ্ধির গত্যগম্যমেকাধা ।

বোমতি নান্যমেকাধা সংক্ষেপা বহুপ্রভা ।”

মাস, দ্বন্দ্ব, বৃণ, কল্প অনেকধা গতারাভ করিতেছে—তার মাঝে উদয়ও হ'ন না, অস্তও যান না, একা কেবল সংবিৎ যিনি দ্বন্দ্ব-প্রভা ।” তবে তে: কাণ্ট প্রজ্ঞাপ্রবাদী (Idealist) ! কাণ্টের হস্ত হইতে “বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমাগোচনা” প্রথম বহন বাহির হইয়াছিল, তখন তদ্ব্যন্ত পানবর্গী প্রতিভারা তাহাকে ভাবিয়াছিলেনও তাই । দ্বিতীয় সংস্করণে কাণ্ট তাহাদের ভুল ভাঙিয়া দিলেন চক্কে অঙ্গুলি দিয়া ।

সংশয়বাদের গোড়া'র সূত্র ।

“দ্রষ্টার সাক্ষিতাওণে বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়”—এই কথাটি কাণ্ট ইন্দ্রিয়-আভাসে জ্ঞাপন করিয়া অতবড় একটা লোকবিরুদ্ধ কথা'র তালু সামলাইতে না পারিয়া শেষে তিনি এক-পা এক-পা করিয়া পিছাইতে আরম্ভ করিলেন । তিনি অপ্রপঞ্চ্য তাহা দেখিয়া বলিলেন—“কথাটা অবধা নহে—জ্ঞানের সাক্ষিতাওণেই বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর ভুল নাই ; কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, জ্ঞানের

সাক্ষিতাওণে দে বাহ্য সিদ্ধ হয়, তাহা কেবল ভাব-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা, তা বই, তাহা সত্তা-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা নহে—প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে।” কাণ্টের একথা'র ভাব-টা বুঝিতে পারা গিয়াছে ; তাহা এই ;—

ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি (viceroy) সত্যসত্যই কিছু আর ভারতবর্ষের রাধাধিরাজ নহেন ; সত্যসত্যই তাহা তিনি না হউন, কিন্তু তথাপি ভারতবাসীর নিকটে তিনি ভারতবর্ষের রাধাধিরাজ-মহারাজেরই সামিল । তেজি, ভাবরাজ্যের মনোমন্ত্রী বাস্তবিক-সত্তা প্রকৃত-প্রত্যাবে বাস্তবিক-সত্তা না হইলেও মনুষ্যজ্ঞানের নিকটে তাহা বাস্তবিক সত্তারই সামিল ।

কাণ্টের এইপ্রকার বৈধব্ধক কথা তনিয়া লোকের মনে সহজেই এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জ্ঞানের বলে সিদ্ধ-হয়-বলিতেহু সেই যে ভাবরূপী বাস্তবিক-সত্তা, তাহা যদি প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে, তবে তাহা পদার্থটা কি ? কাণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন এই যে, তাহা আর-কিছু না—সংবিতের যোগসাক্ষক ঐক্য synthetic unity of consciousness । তিনি বলেন—

It is clear also that as we can only deal with the manifold in our representations, and as the .r cor

suming the spectator to be turning round and the stars to be at rest. A similar experiment may be tried in metaphysic, so far as the intuition of objects is concerned. ইতি কাণ্ট ।

responding to them (অর্থাৎ বাস্তবিক-সত্তা) is really nothing to us, it is clear, I say, that the unity necessitated by the object cannot be anything but the formal unity of our consciousness in the synthesis of the manifold in our representations.

ইহার বাংলা—

এটা বসন লম্ভে যে, আমরা কেবল আমাদের বহু-বিচিত্র প্রতীতিসমূহের সঙ্গেই কারবার করি, • আর সেই সঙ্গে এটাও বসন লম্ভে যে, সেই প্রতীতি-সমূহের পৃষ্ঠের আড়ালে বস্তু গ্রাহ্য সংগোপিত আছে, তাহার সহিত আমাদের কোনো কারবার চলিতে পারে না। তখন কাকেই ধাঁড়াইতেছে যে, বাহ্যকে আমরা বলি বস্তুর একত্ব (বা বস্তুগত একত্ব objective unity), তাহা প্রকৃতপক্ষে বস্তুর একত্ব নহে; তবে কি?

না, সংহিতের সে একপ্রকার উপাধিক (অর্থাৎ formal কিনা উপাধিসত্তা) একত্ব আমাদের প্রতীতি-বৈচিত্র্যের সংযোগ-ব্যাপারে অধ্যায়োপিত হয় (অর্থাৎ চাপানো হয়)—সে একত্ব সেই একত্ব! এবে একটি কথা কান্ট বলিতেছেন—কি বলিতেছেন, তাহা কি পাঠক ছব্বঙ্গন করিতে পারিয়াছেন? তাহার প্রকৃত বৃত্তান্তটা হচ্ছে এই:—

সংশয়বাদের নিজমুস্তিধারণ।

মহুবার জ্ঞান একপ্রকার 'জেলখানার' কয়েদী। বাহিরে যে-দিকে সে চক্ষু কিরায়, সেই-দিকেই দেখে—সম্মুখে ধাঁড়াইয়া আছে অলসমনীর প্রাচীর—আকাশ; আপনার দিকে যখন চক্ষু কিরায়, তখন-আবার দেখে—হস্তপদ তাহার বাঁধা রহিয়াছে কালের অবিমোচ্য বন্ধন-রজ্জুতে। আকাশ-প্রাচীরের ওপুষ্ঠে রহিয়াছে জেয়বস্ত-সকলের বাস্তবিক-সত্তা; কালরজ্জুর গোড়া বাঁধা

• প্রতীতি-শব্দের দু'খা অর্থ representation : তার সাক্ষী—

- (১) ইতি = re ।
- (২) ইতি = presentation ।
- (৩) প্রতীতি = representation ।

ইতি-শব্দের দ্ব্যর্থক গতি। যাহা গতিপথে সমুপে উপস্থিত হয়, তাহাকেই আমরা 'ইতি' বলিয়া নির্দেশ করি; আবার, তাহাই যখন আমাদের মনে প্রত্যাগমিত হয়, তখন তাহাকে বলি—প্রতীতি; যেদ্ব্যর্থক বিন্যাস-প্রকার সত্তা'র উৎপত্তি আছে—

- (১) পারমার্থিক ।
- (২) বাহ্যহারিক ।
- (৩) প্রাতীতিক ।

প্রাতীতিক সত্তা কি? না, প্রতীতিই (representationই) তাহার সর্বস্ব, তা বই, বাস্তবিক-সত্তা'র সহিত তাহার যে-দাশাক্ষণ্য নাই—সেমন খয়ের সত্তা। লোকমধ্যে প্রতীতি- (বা প্রত্যয়) শব্দ সচরাচর বিবাদ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহা তো হইসারই কথা :-—মনে যাহা প্রতীতমান হয় (comes to be represented), তাহার ইতিবে (সাক্ষ্য objective presence) বিবাদ সহজ-জ্ঞানের পক্ষে অবিস্বাদ্য। এইরকম সহজ-জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ বোকের দ্বারা প্রতীতি- (বা প্রত্যয়) শব্দের অর্থ ভ্রমুই কেবল বিবাদ। পক্ষান্তরে, দার্শনিক গতিতত্ত্বের দ্বারা প্রতীতি-শব্দে বৃত্তান্ত—যেই জ্ঞানাত্ত ভাব বা representation বা Idea

রহিয়াছে জ্ঞাতার বাস্তবিক-সত্তা। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বহিরিক্রিয়র আকাং তেজ করিয়া—আকাশের ওপৃষ্ঠে যেখানে রহিয়াছে জেগবন্ত-সকলের বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌছিতে পারি না; ভবৈব. অন্তরিক্রিয়র (বা অন্তঃকরণ) কালের গন্তাত্রোক্তের উদানে চলিয়া—গোমুখী ছাড়াইয়া মহোচ্চ কৈলাসধামে যেখানে রহিয়াছে জ্ঞাতার বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌছিতে পারি না।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্র ।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে গন্তব্য-পথের নিকানা বাহা পাওয়া যায়, তাহাতে ব্যক্তি-গণের উত্তমত্তম হইবারই কথা; কিন্তু তথাপি তাহা উপেক্ষণীয় নহে; যেহেতু কাণ্ট-পাক্ষাত্য-দর্শনের পনপণাটকদিগের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে মাকপণের প্রধান-প্রধান কতিপয় প্রদেশ-খণ্ড পরিচিহ্নিত হইয়াছে এইরূপে :—

এপারের রহিয়াছে জ্ঞাতার বাস্তবিক-সত্তা। ওপারের রহিয়াছে জেগবন্ত-সকলের বাস্তবিক-সত্তা। দুই পায়ের মাঝখানে রহিয়াছে—

(১) সংবিত্তের একই এপার ঘেঁষিয়া,
(২) বহিরিক্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য ওপার ঘেঁষিয়া, (৩) অন্তরিক্রিয়ের (বা অন্তঃকরণের) সংবোজনাক্রূপী স্বাবর্তের টান দুয়ের মধ্যস্থলে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক-সত্তার ঐ যে দুই-দিকের দুই অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—এপার এবং ওপার, দুই পারাই মধুবা-জ্ঞানের অধিকার-বাহিত্ব অজ্ঞেয়-প্রদেশ। মানচিত্র-এ-বাহা আলেখ্যাপটে লগনৌ টানিয়া আঁকিয়া দেখানো হইয়াছে,

ইহার মাথার ফলে কিরূপ দাঁড়াও, তাহা একবার পদতলে পড়িতা করিয়া দেখা বা'ক্ ।

মানচিত্রের ফলপল্লীক্ষা ।

ওক বলিলেন—“করতলজন্ত-আনলকবৎ ।” ওকর মূখবিনির্গত ঐ তেজোময় বাক্যটি শিষ্যের কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল। শিষ্যের কর্ণকূহরে তাহা প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তত্ৰাচ শিষ্য তাহার একটি অক্ষরও শুনিতে পাইলেন না। শিষ্যের কর্ণকূহরে যে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই; কেন না, একটু পূর্বে ক্রান্তির আত্মভাবে শিষ্যের চক্ষুঃটি বৃদ্ধিমা আদিত-ছিল ক্রমশই অধিকাধিক মাত্রা, ইতিমধ্যে “করতলজন্ত-আনলকবৎ” এই শব্দের ধমকে তাহার তত্ত্বা ভাঙিয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, ওকমুখোচ্চারিত ঐ শব্দটি শিষ্যের কর্ণকূহরে প্রবেশ করিয়াছে;—না যদি প্রবেশ করিবে, তবে শিষ্যকে জাগাইয়া দিল কে? অত-বড় একটা ঘোরালো শব্দ কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের এ-গ্রায়ে আসিল না—এটা হইল ঐ শুককেবল মনো-যোগের অভাবে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, বহিরিক্রিয়ের বিষয় উপস্থিত হওয়া চাই বিশেষ-একটি মেনে (যেমন কর্ণকূহরে), আর, সেই মেনে অন্তরিক্রিয়ের (অর্থাৎ মনের) সংবোজনা-ক্রিয়ের উদ্বেক হওয়া চাই বিশেষ-একটি কালে (যেমন আগরণ-মুহুর্তে); এই দুই ব্যাপারের সমবেত কার্য্য-কারিতা ব্যতিরেকে বিষয়ের উপলব্ধি সম্ভবে না। দুইটি বিষয়ের সম্মান পাওয়া গেল; একটি হচ্ছে বহিরিক্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য (যেমন ক, র, ত, ল, ঙ, স, আ, ম, ন, ক, ”

ব, ২—এতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধনি ১; আর একটি হ'লে অস্থিরপ্রতির সংযোজনা-ক্রিয়া (যেমন, ঐ পৃথক্ পৃথক্ ধনিগুলি একত্রে সংযোজনা করিয়া “করতলন্ত-আমলকবৎ” এই একটি সমগ্র শব্দ গড়িয়া তোলা)। পরে-পরে ঘটিল যাহা, তাহা এই :—

গুরু বলিলেন—“তুনিতেছ ? না, তুনিতেছ না ?” শিষ্য বলিলেন—“তুনিতেছি ! আচ্ছা করুন !” গুরু বলিলেন—“করতলন্ত-আমলকবৎ” শিষ্য এবারে দিবা সমাগ ! কএর পরে যেম্নি তুনিগেন র, অস্ত্রি তিনি পলায়নোত্তত কর-কে স্বরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে র জুড়িয়া দিলেন ; তাহার পরে যেম্নি তুনিগেন ত, অস্ত্রি তিনি পলায়নোত্তত কর-কে স্বরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে ত জুড়িয়া দিলেন ; তাহার পরে যেম্নি তুনিগেন ল, অস্ত্রি তিনি পলায়নোত্তত করত-কে স্বরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে ল জুড়িয়া দিলেন ; ল জুড়িয়া-দিয়া পাইগেন করতল । ইহার নাম সংযোজনা । এইরূপ করিয়া শিষ্যটি ক, র, ত, ল, ঙ, ঞ, আ, য, ল, ক, ব, ২—এতগুলি সুহৃৎপরম্পরাগত, ধনির মোট বাখিয়া একটা বিরোনীসিকে ওজনের শব্দ অন্তঃকরণের মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া পাইলেন—কি ? না, করতলন্ত-আমলকবৎ । এ শব্দটি অনেকের যোগে এক, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । ইহারি নাম যোগাত্মক ঐক্য (synthetic unity) । মোট ঘটনাটি এই :—

শিষ্যের কর্ণ যেমন রহিয়াছে অভ্যা-

গত ধনিপরম্পরা'র প্রতি ধার গুলিয়া, তাহার চক্ষু তেমন রহিয়াছে গুরুমুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া । শিষ্যের কর্ণকূহরে ধনিপরম্পরা যাহা প্রবেশ করিতেছে, তাহা গুরুমুখের সহিত কার্যাকারণহুয়ে সম্বন্ধ । শিষ্য ছই ভাবের ছইতরো সংযোজনা এক সঙ্গে চালাইতেছেন :—একদিকে তিনি সমষ্টি-ভাবে ঐক্যহুয়ে বাখিয়া অনেক ধনিকে এক করিয়া ফেলিতেছেন ; আর-এক দিকে তিনি কার্যাকারণ-ভাবে ঐক্যহুয়ে বাখিয়া উচ্ছিন্নত ধনিপরম্পরাকে গুরুমুখের গঠ-কল্পনের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছেন । গুরুমুখের গঠকল্পন হ'লে প্রবর্তক (active), বায়ুর শাসিক কল্পন হ'লে অস্থি-প্রবৃত্ত (passive) । শিষ্যের কর্ণকূহর হইতে গুরুমুখের গঠকল্পন পর্যন্ত ঐ-যে এক-প্রকার প্রবৃত্ত-প্রবর্তকের তরঙ্গমালা নাচিয়া চলিতেছে—শিষ্য ঐ অনেকাত্মক ব্যাপারটিকে কার্যাকারণহুয়ে গাণিয়া অন্তঃকরণমধ্যে এক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন । এই বে ছই ভাবের ছইতরো ঐক্যহুয়ে দেখিতে পাওয়া গেল—(১) সমষ্টিভাবে ঐক্যহুয়ে এবং (২) কার্যাকারণ-ভাবে ঐক্যহুয়ে, এ ছই ঐক্যহুয়ে একই মৌলিক ঐক্যহুয়ের ছইটি শাখা বই নয় । সে বে মৌলিক ঐক্যহুয়ে, তাহা আর-কিছু না—ক্যাট্ বাহাকে বলেন, সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য । একই সংবিত-দেনাপতি পিছনে ষাড়াইয়া-থাকিয়া গৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক সৈন্তবিভাগের মধ্যে, তথৈব, সমগ্র সৈন্তমণ্ডলীর মধ্যে, একত্রে বন্ধনহুয়ে সফারিত করিতেছেন ।

অতঃপর ভ্রূহুবা এই যে, পানি-পংক্তির পরস্পরের সহিত এবং গুরুমুখের সহিত সেই যে যোগাঙ্কক ঐক্য—সে ঐক্য ভাসিতেছে শিষ্যের মানস-সরোবরে (অর্থাৎ অন্তঃকরণে); আর, সেই মানস-সরোবরের কূলে পাড়াইয়া রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং । স্বয়ং সেই যে শিষ্য, তিনিই সংযোজন-কার্যের মূল্যধার । কূলে পাড়াইয়া দেখিতেছেন তিনি আপনাকে—আপনারই সেই সংযোজন-কার্যের ফলরূপে মনে প্রতিবিম্বিত ; দেখিতেছেন আপনাকে—পানি-পংক্তির যোগাঙ্কক ঐক্যে সমষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত ; আর-দেখিতেছেন আপনাকে—ক্রয়নাশ শব্দের সহিত গুরুমুখের যোগাঙ্কক ঐক্যে কার্যাকরণের বন্ধনগ্রন্থিরূপে প্রতিবিম্বিত । গুরুর মুখমণ্ডলও শিষ্যের মানস-সরোবরে ভাসিতেছে । শিষ্যের মানস-সরোবরের এপারে যেমন রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং ; তেমনি, সেই মানস-সরোবরের যে-স্থানটিতে ভাসিতেছে গুরুর মুখমণ্ডল, সেই-স্থানটির ওপারে রহিয়াছেন গুরু স্বয়ং । মনে কর, মানস-সরোবর বাঁধ ভাঙিয়া স্থপ্তি-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে । এরূপ অবস্থার এপার হইতে ওপারে অন্যায়সে হাঁটিয়া যাওয়া যাইতে পারে—বেহেতু মাঝখানে অপের ব্যবধান নাই । তবেই হইতেছে যে, এপার এবং ওপার, একই ভাঙাভূমির দুই শৃঙ্গ—এক শৃঙ্গে পাড়াইয়া আছেন শিষ্য স্বয়ং, আর-এক শৃঙ্গে পাড়াইয়া আছেন গুরু স্বয়ং । অতএব এটা স্থির যে, এপার এবং ওপার গুলে-ভলে একই ভাঙাভূমি । সেই যে একই ভাঙাভূমি, তাহাই বাস্তবিক-সত্তা । শিষ্য স্বয়ং

এবং গুরু স্বয়ং উভয়েই একই ভাঙাভূমিতে—বাস্তবিক-সত্তাতে—ভর দিয়া পাড়াইয়া আছেন । এ বাস্তবিক-সত্তাকে “পানি না” বলিয়া জ্ঞান হইতে উচ্ছেদ করিলে যে ভালে আমরা বলিয়া আছি, সেই ভালকে উচ্ছেদ করা হয় । কান্ট প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন । লোক দেখিয়া অবাক্ যে, কান্টের দার্শনিক দক্ষদ্বয়ে বাস্তবিক-সত্তা-রূপিনী সত্তার নিমন্ত্রণ হয় নাই । এ যজ্ঞে শিব নাই—মঙ্গল নাই ।

সংশয়বাদে জ্ঞানের অসম্প্রীতি ।

কান্টের কথাটা কি বাস্তবিক সত্য ? আকাশ কি বাস্তবিকই জ্ঞানের পথাবলম্বক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর ? কাল কি বাস্তবিকই জ্ঞানের অবিমোচ্য বন্ধনজড় ? বাস্তবিক-সত্য কি বাস্তবিকই মনুষ্যজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত ? তবে কি এ-ধাবৎকাল মহা-মহা ঋষিগণেরা বামন হইয়া চামে হাত বাড়াইয়া আসিতেছেন ? এ-বৃথা পণ্ডুলম না করিলেই কি নয় ? প্রকৃত কথা এই যে, বামন হইয়া চামে হাত বাড়ান ইহাকে বলে না—ইহাকে বলে আর-এক পদার্থ ; ইহাকে বলে—কৃত্রিম হইয়া মাতার কণ্ঠ আদিবিন করিবার সজ্জ হাত বাড়ানো । মাতাকে দেখিলে কৃত্রিমতাটিও হাত না বাড়াইয়া কান্ধ থাকিতে পারে না ; শিশুটি হাত বাড়াইলে মাতাও তাহাকে জোড়ে না লইয়া কান্ধ থাকিতে পারেন না ; উভয়ত এইরূপ । বাস্তবিক-সত্তার প্রতি মনুষ্যজ্ঞানের যেমন প্রাণের টান—মনুষ্যজ্ঞানের প্রতিও বাস্তবিক-সত্তার তেমনি প্রাণের টান । ইহাতেই বুঝিতে

পারায় ঘাইতেছে যে, শুভ অবসরে ঘোঁহার সম্মিলন ঘটতে পারায় কিছুই বিচিত্র নহে—বরং তাঁহা না ঘটতে পারায় বিচিত্র । কান্ট কোথা হইতে পাইলেন যে, আকাশ অলঙ্কার প্রাচীর—কাল অবিমোচ্য বন্ধনরজ্জ্ব ? হইই শূন্য অবস্থ, তাহা কি তিনি জানেন না ? আমাদের দেশের শাস্ত্রে লেখে আর এক কথা । আমাদের দেশের শাস্ত্রে লেখে এই যে, আকাশও প্রাচীর নহে—কালও বন্ধন নহে । প্রাচীর হ'লেন অবিজ্ঞা (অর্থাৎ

জ্ঞানান্ধিম্যানিনঃ অজ্ঞতা) ; বন্ধনও তিনিই । প্রাচীর ভাঙ্গিবার এবং বন্ধন পূর্ণিবার কর্ত্তা উপরে পরমেশ্বরের সৰ্ব্বশক্তিমত্তী বললেজ্জা, নাচে জীবের প্রাণের ব্যাকুলতা এবং মনের একাগ্রতা, মাঝে তবজ্ঞানের হৃদিশ্রল আলোকের অভিব্যক্তি । কান্টীয় দর্শনের আলোচনা হইতে আমরা বহুদূর সত্য একটি পাইয়াছি—কিন্তু সে সত্য সংশয়বাদ নহে ; তাহা যে কি, তাহা বারম্বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

নৌকাডুবি ।

৮১

হঠাৎ বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়াতে হেমনগিনী তাহাদের সমাজের লোকের কাছে অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল । সে তাহার বন্ধু-অবন্ধু, আত্মীয়-পর সকলেরই প্রেমের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল । প্রকৃত্ততা অনেক ভালও বালে—এমন কি, গুরুতর শোক-ছাণ্ডের উপলক্ষ্যেও নিজেই দশজনের কাছে কেরি করিয়া বেড়াইতে অনেকে কুণ্ঠিত হয় না—কিন্তু আত্মপ্রচারের স্বভাব হেমনগিনীর নহে । বাণ তাহার বৃকের মধ্যে কিরূপ বাজিয়াছে, তাহা অন্তর্ধানই জানেন—কিন্তু তাহার পরে যখন কণ্ঠস্বরাকার জন্ত চারি-

দিক্ হইতে কোতূহলী সম্প্রদায়ের সমাগন হইতে লাগিল, তখন সে কোণায় মুখ লুকাইবে, তাহার স্থান খুঁজিয়া পাইল না । বেচারী স্বভাবত নিতান্তই ঘরের মেয়ে ছিল, বিধাতা যে বাছিয়া বাছিয়া অকস্মাৎ তাহাকে উপজ্ঞানের নারিকা করিয়া তুলিবেন, এমন সে কোনদিন প্রস্তুত ছিল না ।

হেমনগিনী বহুদূর স্বাক্ষর হইতে আশ্বর্য্যকার জন্ত একেবারে ছাড়ে উঠিয়া চিলের কোঠার দ্বার বন্ধ করিয়া দিত । সে নিশ্চয় জানিত, রমণের ব্যবহার লইয়া তাহার সম্মুখে তীর সমালোচনা করিয়া যাওয়ার জন্য সুহৃদ্বা, বিশেষতঃ স্ববন্ধু, অত্যাও

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে—এমন স্থলে পলারন ছাড়া সে কোনো উপায়ে খুঁজিয়া পাইল না।

ছাশের উপরে উঠিলে রমেশের কন্ডহার পরিত্যক্ত বাসা, নূতন অর্ক যেমন করিয়া আকাশের আলোর দিকে তাকাও, তেমনি করিয়া নৃত্যদৃষ্টিতে হেমেনলিনীর দিকে যেন তাকাইয়া থাকিত—অমনি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে সমস্ত আকাশ, সমস্ত আলোক বিবর্ণ হইয়া বাইত—মুখের উপরে অকণ ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িত—বলিত, “হে দেবর, আমি আর পারিতেছি না।”

হৃৎসের কারণ ও ইতিবৃত্ত যদি অস্পষ্ট থাকে, তবে হৃৎসের ভিতরেও যেটুকু আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে, নাহয় তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়। হেমেনলিনী আপন আকস্মিক হৃৎসঘটনার আগাগোড়া কিছুই জানে না—মন নানারকম কল্পনা করিতে যায়, মনকে সে ঘোর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে;—রমেশকে অপরাধী করিবার জন্য তর্ক বাধা তুলিয়া উঠিতে চায়—বারংবার সেই উত্তত তর্ককে সে দলন করিয়া ফেলে। এইরূপে, নিজের হৃৎসের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার অবকাশ সে পাইতেছে না। বাহিরে অদৃষ্টের কাছ হইতে এবং অন্তরে আপন চিন্তার কাছ হইতে কেবলি তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে হইতেছে।

এইরূপে অস্ত হরিণীর স্ত হেমেনলিনী যখন পলারনপরা হইয়া ছিল, তখন অন্নদা-বাবুও তাহার নাগাল পাইতেছিলেন না। হেমেনলিনীর সন্ধ্যাচলীল প্রকৃতি তাহার জানা ছিল—এইজন্য বঙ্গবাসদের সহায়-

ত্বের সুখলধারাবর্ষণ ঠেকাইবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন। এদিক্কা উহার মন কন্ডার ক্ষতবেদনার উপর শ্বেদ্রুধা ঢালিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছে, কিন্তু নিরাণার তাহাকে কাছে পাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না। আত্মীয়ভাভিমানীরা একেবারে হেমেনলিনীর কাছে গিয়া পড়িতে চায়, অন্নদা তাহাঙ্গিকে নানা উপায়ে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছেন। অন্নদা স্বভাবত কৌশলী মানুষ নহেন—তিনি যেটাকে স্রুতের কল্পনা বলিয়া নিজের মনে বাহাদুরী লইতেন, অন্তরে কাছে তাহার কিছুই অস্পষ্ট থাকিত না। সকলেই বুঝিতে পারিল, হেমেনলিনীর সহিত সাক্ষাৎকারে অন্নদা বাধা দিতেছেন—ইহাতে লোকে রাগ করিতে লাগিল এবং রহস্ত বাড়িয়া উঠিয়া নানাবিধ নিচুর অমূলক অপবাধে পল্লবিত হইতে থাকিল।

এইরূপে গোলেনালে কিছুকাল কাটিয়া গেল। যখন হেমেনলিনীর দিকে একটুখানি মনোযোগ দিবার অবকাশ ঘটিল, তখন একদিন অপরাহ্নে, অনেককাল পরে হেমেনলিনীর সহিত একত্রে নিভুতে চা খাইবার প্রত্যাশার অন্নদাবাবু তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য দোতলার আসিলেন—দোতলার বসিবার বরে তাহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, শুইবার বরেও সে নাই। বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হেমেনলিনী বাহিরে কোথাও যায় নাই। তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্নদা ছাদের উপরে উঠিলেন।

তখন কলিকাতা-মহরোণ নানা আকার

ও আশ্রিতদের বহুদূরবিস্তৃত ছাদগুলির উপরে হেমন্তের অবসর হোল্ল প্রান হইয়া আসিয়াছে,—সিনাক্সের লম্বা হাওয়াটি পাকিয়া থাকিয়া যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া-ফিরিয়া গাইতেছে। হেমনলিনী চিলের ছাদের প্রাচীরের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। পাঠশালার অকস্মাৎ ছুটি পাইলে ছেলের দল যেমন হো-হা করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আজ হেমনলিনীর বুকের ভিতরে তাহার ভালবাসার সিনগুলির স্থিতি তেমনি করিয়া ছাড়া পাইয়াছে—কে যে কোথা হইতে কি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই—তাহাদের উজ্জ্বল চকল পদক্ষেপে তাহার বন্ধতল আজ কম্পমান। কঠিন বোড়ের টানে সেতারের তার হেঁড়ে-হেঁড়ে করিয়াও ভীষণধুব শব্দে কাঁদিয়া বাজিয়া উঠে—হেমনলিনীর প্রাণের ভিতরে আজ তেমনি প্রবল পৌড়নে সব তারগুলো ক্রমশঃ হুড়াত লীমায় গিয়াও মধুর হইয়া বাজিয়া উঠিতেছে। রমণের স্থিতি তাহাকে বিরিরা-বিরিরা তাহার মনের ভিতরকার সমস্ত-কিছু একেবারে এলোমেলো উন্টাপাণ্টা করিয়া দিয়া আবৃত্তিত হইতেছে—তাহার হৃদয়কে উদাস এবং সমস্ত জগৎসংসারকে কাপুলা করিয়া দিতেছে। আকাশে কাক ডাকিয়া চাঁদায়ে, গলির প্রান্তে বড়রাস্তা হইতে নানাশব্দগ্ৰস্ত কলধ্বনি অপরাহ্নের ছুটির বেলাকে মুখরিত করিতেছে, রাস্তার ধারে ব্যাঙের দলের এক সুন্দরমান-বৃক্ক কর্ণেট্রব্রে শ্রুত-অভ্যাসের উপলক্ষ্যে একটা করুণশব্দের বহুগুন বাজাইতেছে; এই সমস্ত শব্দ, শ্রু ও দৃষ্টির মাঝখানে নিভৃত ছাদের এক কোণে কৃত্তিক-অপরাহ্নের ঝিকি-

ঝিকি আলোতে হেমনলিনী আপনায় মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছে।

অন্নদাবাবু কখন তাহার পিছনে আসিয়া পাড়াইলেন, তাহা সে টেরও পাইল না। অবশেষে অন্নদাবাবু গবন অঁতে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন, তখন সে চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই লজ্জার তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার পূর্বেই অন্নদাবাবু তাহার পাশে বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “হেম, এই সময়ে তোর মা যদি থাকিতেন! আমি তোর কোনো কাজেই লাগিলাম না।”

বৃদ্ধের মুখে এই করুণ উক্তি শুনিবামাত্র হেমনলিনী যেন একটি অগভীর মূর্ছার ভিতর হইতে তৎকণাৎ জাগিয়া উঠিল। তাহার বাপের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখের উপরে কি বেহ, কি করুণা, কি বেদনা! এই করুণার মধ্যে সে মুখের কি পরিবর্তনই হইয়াছে! সংসারে হেমনলিনীকে লইয়া যে বড় উঠিয়াছে, তাহার সমস্ত বেগ নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা বৃদ্ধিতেছেন—কস্তার সাহিত হৃদয়ের কাছে বারবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আসিতেছেন—সাম্বনা দিব্যার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া আজ হেমনলিনীর মাকে তাহার মনে পড়িতেছে এবং আপন অক্ষম ঘেহের অন্তঃস্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—হঠাৎ হেমনলিনীর কাছে আজ এ সমস্তই যেন বাহুর আলোকে প্রকাশ পাইল। দিকারঙ্গ মাঝে তাহাকে আপন

শোকের পরিস্ফুটন হইতে একমুহূর্তে বাহির করিয়া আনিল। যে পুণিবী তাহার কাছে ছায়ায় মত্ত বিশ্রাম হইয়া আসিয়াছিল, তাহা এতনি সত্য হইয়া হুটিয়া উঠিল। “লজ্জা, লজ্জা, ছিছি, কি লজ্জা! আমি একজন দুর্ব্বলকে ভাগবাসিয়াছি, আমার আজকালকার সমস্ত মিনরাতির ব্যবহারে এই কপাই আমি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিয়াছি! বাপ, ভাই, চাকরবাকর, যে আমাকে দেখিতেছে, সে এই কপাই ভাবিয়া যাইতেছে যে, হেমলিনীকে এখন কোনো কথা বলা বৃথা, উহার কাছে কোনো কাজ প্রত্যাশা করা মিথ্যা, ও একজন সুবাপুত্রকে স্ফালবাসে, তাহার কথা নাইগাই আছে, সংসারে এখন আর কেহ উহার কেহই নহে!” ১৮৮২ এই মুহূর্তে হেমলিনীর মনে অত্যন্ত লজ্জার উদয় হইল। যে সকল স্বস্তির মধ্যে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া বলিয়া ছিল, সে সমস্ত বলাপুরুষ আপন্যার চারিদিক হইতে বাড়িয়া-ফেলিয়া সে আপনাকে মুক্তি দিল। জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, তোমার শরীর এখন কেমন আছে?”

শরীর! শরীরটা যে আলোচ্যবিষয়, তাহা অরল। এ করদিন একেবারে তৃণিদ্গা গিয়া-ছিলেন। তিনি কহিলেন—“আমার শরীর! আমার শরীর ত বেশ আছে মা। তোমার যে-রকম চেহারা হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার শরীরের অঙ্গই আমার ভাবনা। আমাদের শরীর এতবৎসর পর্যন্ত টিকিয়া আছে, আমাদের সহজে কিছু হয় না—তোমার এই দেহটুকু যে মেন্দিনকার, তর হয় পাছে মা সহিতে না পারে।” এত বলিয়া

আন্তে আন্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

হেমলিনী জিজ্ঞাসা করিল—“আজ্ঞা বাবা, মা এখন মারা বান, তখন আমি কত-বড় ছিলাম?”

অরল। তুই তখন তিন বছরের মেয়ে ছিলি, তখন তোর কথা! হুটিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি, ‘মা কোথা?’ আমি বলিলাম, ‘মা তাঁর বাবার কাছে গেছেন।’ তোর জন্মবার পূর্বেই তোর মার বাবার মৃত্যু হইয়াছিল, তুই তাঁকে জানিতিস্ না। আমার কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে গভীর হইয়া চাহিয়া রহিলি। বানিককণ বাবে আমার হাত ধরিয়া তোর মার শূত্র শরনধরের দিকে লইয়া বাইবার লজ্জা টানিতে লাগিলি। তোর বিশ্বাস ছিল, আমি তোকে সেখানকার শূত্রতার ভিতর হইতে একটা সন্ধান বলিয়া দিতে পারিব। তুই জানিতিস্ তোর বাবা মৃত লোক, এ কথা তোর মনেও হয় নাই যে, যেগুলো আসল কথা, সেগুলোর সবকিছু তোর মত বাবা শিক্তরই মত অজ্ঞ ও অক্ষম। আজও সেই কথা মনে হয় যে, আমরা কত অক্ষম—ঈশ্বর বাপের মনে ধৈর্য দিয়াছেন, কিন্তু কত অজ্ঞই কমতা দিয়াছেন!

এই বলিয়া তিনি হেমলিনীর মাথার উপরে একবার তাহার ডান হাত স্পর্শ করিলেন।

হেমলিনী পিতার সেই কল্যাণবর্ষা কম্পিতহস্ত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া-লইয়া তাহার উপরে অঙ্গ হাত

ইলাইতে লাগিল । কহিল, “মাকে আমার খুব অন্ন একটুখানি মনে পড়ে । আমার মনে পড়ে—হুগুরবেলার তিনি বিছানায় শুইয়া বই লইয়া পড়িতেন, আমার তাহা কিছুতেই ভাল লাগিত না, আমি বই কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতাম ।”

ইহা হইতে আবার সেকালের কথা উঠিল । মা কেমন ছিলেন, কি করিতেন, তখন কি হইত, এই আলোচনা হঠাৎ হইতে হুগা অন্তর্মিত এবং আকাশ মলিন তাম্রবর্ণ হইয়া আসিল । চারিদিকে কলিকাতার কর্ণ ও কোলাহল, তাহারি মাথখানে একটি গলির বাড়ীর ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা, দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কস্তার চিরন্তন নিম্ন সৰ্বকটিকে সন্ধ্যাকাশের প্রিয়মাণ-ছায়ার অক্ষয়িত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল ।

এমন-সময় সিঁড়িতে যোগেন্দ্রের পারের পদ শুনিয়া দুইজনের গুঞ্জনলাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং চকিত হইয়া দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন । যোগেন্দ্র আসিয়া উত্তরের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং কহিল, “হেমের সভা বৃদ্ধি আজকাল এই ছাদেই ?”

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল । ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি এই যে একটা শোকের কালিমা লাগিয়াই আছে, ইহাতে তাহাকে প্রায় বাড়াছাড়া করিয়াছে । অথচ বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে গেলে হেমলিনীর বিবাহ লইয়া নানা জবাবদিহির মধ্যে পড়িতে হয় বলিয়া কোপাও বাগড়াও মুকিল । সে কেবলি বলিতেছে—“হেমলিনী অত্যন্ত বাড়ুবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে । মেয়েদের ইংরাজি

গল্পের বই পড়িতে দিলে, এইরূপ দুর্গতি ঘটে । হেম ভাবিতেছে, ‘রমেশ বখশ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আমার কদর তাতিয়া যাওয়া উচিত’,—তাই সে আজ খুব সমারোহ করিয়া কদর তাতিতে বসিয়াছে । নভেল-পড়া করজন মেয়ের ভাগ্যে ভাগ্য-বাসার নৈরাশ্র সন্নিবাস এমন চমৎকার সুযোগ ঘটে !”

যোগেন্দ্রের কঠিন বিজ্ঞপ হইতে কস্তাকে খাচাইবার ভক্ত অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—“আমি হেমকে লইয়া একটুখানি গল্প করিতেছি ।” -বলি তিনিই গল্প করিবার ভক্ত হেমকে ছাদে টানিয়া আনিয়াছেন ।

যোগেন্দ্র কহিল, “কেন, চায়ের টেবিলে কি আর গল্প হয় না ? বাবা, তুমিই—হেমকে ক্যাপাইবার চেষ্টা কর । এমন করিলে ত বাড়ীতে টেকা দায় হয় !”

হেমলিনী চকিত হইয়া কহিল, “বাবা, এখনো কি তোমার চা খাওয়া হয় নাই ?”

যোগেন্দ্র—“চা ত কবিকল্পনা নয় বে, সন্ধ্যাবেলাকার আকাশের সূর্যাস্ত-আভা হইতে আগনি ঝরিয়া পড়িবে । ছাদের কোণে বসিয়া থাকিলে চায়ের পেয়ালা ভরিয়া উঠে না, এ কথাও কি নুতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে ?”

অন্নদা হেমলিনীর লক্ষ্যনিবারণের ভক্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—“আমি যে আজ চা খাইব না বলিয়া ঠিক করিয়াছি ।”

যোগেন্দ্র । কেন বাবা, তৌমরা সকলেই তপস্বী হইয়া উঠিবে নাকি ? তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে ? বাবু-আহারটা আমার সহ হয় না ।

অন্নদা । না না, তৎপরের কথা হইতেছে না। কাল প্রাতে আমার ভাল খুম হয় নাই, তাই ভাবিতেছিলাম আজ চা না খাইয়া দেখা বাক্ কেমন থাকি !

বসন্ত হেমেনলিনীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় পত্রিপূর্ব চায়ের পেয়ালার ধানমুষ্টি অনেকবার অন্নদাবাবুকে প্রসূত করিয়া গেছে, কিন্তু আজ উঠিতে পারেন নাই। অনেকদিন পরে আজ হেম তাঁহার সঙ্গে প্রকৃতভাবে কথা কহিতেছে, এই নিভৃত ছায়ে ছুটিতে অত্যন্ত বসিষ্ঠ আলাপ করিয়া উঠিয়াছে, এমন গভীর-নিবিড়-ভাবে আলাপ পূর্ণ হইতে তাঁহার কখনো মনে পড়ে না।

এ আলাপ এক জারগা হইতে আর এক জারগার তুলিয়া লইয়া বাওয়া সহিবে না—নড়িবার চেষ্টা করিলেই ভীষণ হস্তিগের দত সমস্ত জিনিষ ছুটিয়া পাল্লাইবে। সেইজন্যই অন্নদাবাবু আজ চা-পাঞ্জের মুহমুহ আত্মান উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

অন্নদাবাবু যে চা-পান রহিত করিয়া অনিত্যার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা হেমেনলিনী বিশ্বাস করিল না—সে কহিল, “চল বাবা, চা খাইবে চল।” অন্নদাবাবু সেই মুহূর্ত্তেই অনিত্যার আশপাটা বিস্মৃত হইয়া বাএপসেই টেবিলের অভিমুখে দাবিত হইলেন।

চা খাইবার বৃত্তে প্রবেশ করিয়াই অন্নদাবাবু দেখিলেন, অক্ষয় সেখানে বসিয়া আছে। তাঁহার মনটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, হেমের মন আজ একটুখানি স্থূল হইয়াছে, অক্ষয়কে দেখিলেই আবার বিকল হইয়া উঠিবে, কিন্তু এখন আর কোনো

উপায় নাই। মুহূর্ত্তপরেই হেমেনলিনী যত্নে প্রবেশ করিল। অক্ষয় তাঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া পড়িল, কহিল, “যোগেন্দ্র, আমি আত্ম ভবে আসি!”

হেমেনলিনী কহিল, “কেন অক্ষয়বাবু, আপনার কি কোনো কাল আছে? এক-পেয়ালা চা খাইয়া বান্।”

হেমেনলিনীর এই অত্যাধমার ধরনের সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। অক্ষয় পুনর্বার আসনগ্রহণ করিয়া কহিল, “আপনার অধর্ম্মমানেই আমি ছোয়ালা চা খাইয়াছি—পীড়াপীড়ি করিলে আরো ছোপেয়ালা বে চলে না, তাহা বলিতে পারি না।”

হেমেনলিনী হাসিয়া কহিল, “চায়ের পেয়ালা লইয়া আপনারকে কোনোদিনও পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই।”

অক্ষয় কহিল, “না, ভাল জিনিষকে আমি কখনো প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরিতে দিই না, বিধাতা আমাকে এটুকু বুঝি দিয়াছেন।”

যোগেন্দ্র কহিল—“সেই কথা মরণ করিয়া ভাল জিনিষও যেন তোমাকে কোনোদিন প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরাইয়া না দেয়, আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ করি!”

অনেকদিন পরে অন্নদার চায়ের টেবিলে কথাবার্তা বেশ সহজভাবে জমিয়া উঠিল। সচরাচর হেমেনলিনী শান্তভাবে হাসিয়া থাকে, আজ তাহার হাসির ধ্বনি মাঝেমাঝে কথোপকথনের উপরে ছুটিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নদাবাবুকে সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, “বাবা, অক্ষয়বাবুর অনায়াস দেখ—করদিন তোমার পিন্ না খাইয়াও তাঁনি দিয়া ভাল

‘আছেন! যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকিত, তবে অমৃত মাধাও ধরিত।’

• যোগেন্দ্র । ইহাকেই বলে পিলু-হারারী !

অন্নদাবাবু অভ্যস্ত খুঁদি হইয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেকদিন পরে আবার যে তাঁহার পিলু-হারের উপরে আদ্যৌষধজনের কটাক্ষপাত আরম্ভ হইয়াছে, ইহা তিনি পারি-বারিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিলেন—তাঁহার মন হইতে একটা তাঁর নামিয়া গেল।

তিনি কহিলেন, “এই বৃষ্টি! লোকের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ! আমার পিলাহারী দলের মধ্যে ঐ একটিনাত্র অক্ষর আছে—তাহাকেও তাড়াইয়া লইবার চেষ্টা!”

অক্ষর কহিল, “সে ভয় করিবেন না অন্নদাবাবু! অক্ষরকে তাড়াইয়া লওয়া শক্ত!”

যোগেন্দ্র। মেকিটাকার মত—তাড়াইতে গেলে পুলিশকেই হইবার সম্ভাবনা!

এইরূপে হাস্যালাপে অন্নদাবাবুর চারের টেবিলের উপর হইতে যেন অনেকদিনের এক তুত ছাড়িয়া গেল।

আজিকার এই চারের সভা দ্বীপ ভাঙিত না—কিন্তু আজ বধাসময়ে হেমললিতার চুল-বাঁধা হয় নাই বলিয়া তাহাকে উঠিয়া বাইতে হইল—তখন অক্ষরেরও একটা বিশেষ স্বাদের কথা মনে পড়িল—সেও চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র কহিল—“বাঁবা, আর বিলম্ব নয়—এইবেলা হেমের বিবাহের জোপাড় কর!”

অন্নদাবাবু অধাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র কহিল—“রমেশের সহিত বিবাহ

ভাঙিয়া-খাওয়া লটখা সমাজে যতদূর কান-কানি চলিতেছে ইহা লইয়া কাঁহাতক সকল লোকের সঙ্গে আমি একলা ঝগড়া করিয়া বেড়াইব। সকল কথা যদি খোলসা করিয়া বলিবার জো থাকিত, তাহা হইলে ঝগড়া করিতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু হেমের অন্ত যে মুখ চুটিয়া কিছু বলিতে পারি না—কাছেই হাতাহাতি করিতে হয়। সেদিন অধিলকে চাব্কাইয়া আসিতে হইয়াছিল—তুনিলাম, সে লোকটা বাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়াছিল। শায় যদি হেমের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত কথা চুকিয়া যায় এবং আমাকেও পৃথিবীস্থ লোককে দিনরাত্রি আন্তরিক ভুলিয়া শাসাইয়া বেড়াইতে হয় না! আমার কথা শোন, আর দেরি করিও না।”

অন্নদা। বিবাহ কাহার সঙ্গে হইবে যোগেন্দ্র?

যোগেন্দ্র। একটিনাত্র লোক আছে। যে কাণ্ড হইয়া গেল এবং যে সমস্ত কথাবার্তা উঠিয়াছে, তাহাতে, পাত্র পাওয়া অসম্ভব। কেবল বেচারী অক্ষর রহিয়াছে—তাহাকে কিছুতেই নমাইতে পারে না! তাহাকে পিলু খাইতে বল পিলু খাইবে, বিবাহ করিতে বল বিবাহ করিবে!

অন্নদা। পাগল হইয়াছ যোগেন্দ্র? অক্ষরকে হেম বিবাহ করিবে!

যোগেন্দ্র। তুমি যদি পোল না কর ত আমি তাহাকে রান্না করিতে পারি।

অন্নদা বাস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—“না যোগেন না, তুমি হেমকে কিছুই বোঝ না। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কঠে দিয়া অধি-

করিয়া তুলিবে। এখন তাহাকে কিছুদিন স্থবধ থাকিতে দাঁড়—সে বেচারী অনেক কষ্ট পাইয়াছে। বিবাহের চেষ্টা সমর আছে।”

যোগেন্দ্র কহিল, “আমি তাহাকে কিছুমাত্র শীড়ন করিব না, বতহুর সাবধানে ও সুস্থ-ভাবে কাজ উদ্ধার করিতে হয়, তাহার ক্রটি হইবে না। তোমরা কি মনে কর, আমি ঋগড়া না করিয়া কথা কহিতে পারি না?”

যোগেন্দ্র অধীর-প্রকৃতির লোক। সেই-দিন সন্ধ্যাবেলায় চুলবাধা সারিয়া হেমলিনী বাহির হইবামাত্র যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “হেম, একটা কথা আছে।”

কথা আছে শুনিয়া হেনের হৃৎকম্প হইল। যোগেন্দ্রের অসুখবতী হইয়া আস্তে আস্তে বসিবার ঘরে আসিয়া বলিল। যোগেন্দ্র কহিল, “হেম, বাবার শরীরটা কি-রকম খারাপ হইয়াছে দেখিয়াছ।”

হেমলিনীর মুখে একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাইল; সে কোনো কথা কহিল না।

যোগেন্দ্র। আমি বলিতেছি, ইহার একটা প্রতিকার না করিলে উনি একটা শত ব্যামোর পড়িবেন।

হেমলিনী মুখিল, পিতার এই অবস্থার অল্প অপরাধ তাহারই উপরে পড়িতেছে। সে মাথা নীচু করিয়া স্নানমুখে কাপড়ের পাড় লইয়া টানিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কহিল, “বা হইয়া গেছে, সে ত হইয়াই গেছে, তথা লইয়া বতই আক্ষেপ করিতে থাকিব, ততই আমাদের লজ্জার কথা। এখন বাবার মনকে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চাও, তবে বত শীঘ্র পার, এই সমস্ত অগ্রিয়

বাপারের একবারে গোড়া মারিহ! ফেলিতে হইবে।”

এই বলিয়া উত্তর প্রত্যাশা করিয়া যোগেন্দ্র হেমলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেম সলজ্জমুখে কহিল, “এ সমস্ত কথা লইয়া আমি যে কোনোদিন বাবাকে বিরক্ত করিব, এমন সম্ভাবনা নাই।”

যোগেন্দ্র। তুমি ত করিবে না জানি, কিন্তু তাহাতে ত অন্য লোকের সুখ বন্ধ হইবে না।

হেম কহিল, “তা আমি কি করিতে পারি বল।”

যোগেন্দ্র। চারিদিকে এই যে সব নানা কথা উঠিয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে।

যোগেন্দ্র যে উপায় মনে মনে ঠাণ্ডাইয়াছে, হেমলিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “এখনকার মত কিছুদিন বাবাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে ভাল হয় না? ছুচার মাস কাটাইয়া আসিলে ততদিনে সমস্ত গোল খামিরা বাইবে।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তাহাতেও সম্পূর্ণ কল হইবে না। তোমার মনে কোনো স্ফোভ নাই, বতদিন বাবা এ কথা নিশ্চয় না বুঝিতে পারিবেন, ততদিন তাহার মনে শেল বিধিরা থাকিবে—ততদিন তাহাকে কিছুতেই স্থবধ হইতে দিবে না।”

দেখিতে দেখিতে হেমলিনীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বল মুছিয়া ফেলিল—কহিল, “আমাকে কি করিতে বল?”

• যোগেন্দ্র কহিল, “তোমার কানে কণ্ঠের
গুনাইবে আমি জানি, কিন্তু সকল দিকের
মৰ্ণশ যদি চাও, তোমাকে কালবিলম্ব না
করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।”

হেমললিনী তত্ত্ব হইয়া বসিয়া রহিল।
যোগেন্দ্র অধৈর্য্য সংবরণ করিতে না পারিয়া
বলিয়া উঠিল, “হেম, তোমরা কল্লনাঙ্গারা
ছোট কথাকে বড় করিয়া তুলিতে ভালবাস।
তোমার বিবাহসম্বন্ধে যেমন গোপন্যমণ
ঘটিয়াছে, এমন কত মেয়ের ঘটনা থাকে
—আবার চুকিয়া-বুকিয়া পরিষ্কার হইয়া যায়
—নহিলে, ঘরের মধ্যে কথার কথা নড়ল
তৈরি হইতে থাকিলে ত লোকের আশ্রয় বাচে
না। ‘চিরজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া ছানে বসিয়া
আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিব, সেই
অপমৰ্য্য মিথ্যাচারীদের স্বাতি ছদরমন্দিরে
স্থাপন করিয়া পূজা করিব’—পৃথিবীর
লোকের সামনে এই সমস্ত কাব্য করিতে
তোমার লজ্জা করিবে না,—কিন্তু আমরা যে
লজ্জার সুরিয়া ঘাই! তত্ব গৃহস্থধরে বিবাহ
করিয়া এই সমস্ত লজ্জাছাড়া কাব্য, যত লাভ
পায়, চুকাইয়া ফেল।”

লোকের চোখের সামনে কাব্য হইয়া
উঠিবার লজ্জা যে কতবানি, তাহা হেমললিনী
বিলম্ব জানে, এইজন্য যোগেন্দ্রের বিজ্ঞপ-
ন্য তাহাকে ছুরির মত বিধিল। সে
কহিল, “দাদা, আমি কি বলিতেছি সন্ন্যাসিনী
হইয়া থাকিব, বিবাহ করিব না।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তাহা যদি না বলিতে
চাও ত বিবাহ কর। অবশ্য, তুমি যদি বল,
স্বর্গারোহের ইচ্ছাযেবকে না হইলে তোমার
পছন্দ হইবে না, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসিনী-

ব্রতই গ্রহণ করিতে হইবে। পুণিবাতে মনের
মত কটা জ্বলিবে বা যেনে বাহা পাওয়া
যায়, মনকে তাহারই মত করিয়া গঠিতে হয়।
আমি ত বলি, ইহাতেই সাহসের বখাৰ্থ
মহা।”

হেমললিনী মৰ্ম্মাহত হইয়া কহিল, “দাদা,
তুমি আমাকে এমন করিয়া ষোটা দিয়া
কথা বলিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে
পছন্দ লইয়া কোনো কথা বলিয়াছি?”

যোগেন্দ্র। বল নাই বটে, কিন্তু আমি
দেখিয়াছি—অকারণে এবং অন্যায় কারণে
তোমার কোনো কোনো হিতৈষী বন্ধুর উপরে
তুমি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও না।
কিন্তু এ কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই
হইবে, এ জীবনে যত লোকের সঙ্গে তোমার
আলাপ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন
লোককে দেখা গেছে, যে ব্যক্তি স্নেহ-দুঃস্নেহ
মানে-অপমানে তোমার প্রতি ছদর স্থির
রাখিয়াছে, তোমার সমস্ত দুঃখ-স্বপ্নের নতশিরে
গ্রহণ করিয়াছে এবং যে তোমার অন্ত সমস্ত
ভাগ্য করিতে পারে। এই কারণে আমি
তাহাকে মনে মনে ‘অত্যন্ত প্রজ্ঞা করি।
তোমাকে সুখী করিবার জন্য জীবন দিতে
পারে, এমন স্বামা যদি চাও, তবে সে লোককে
খুঁজিতে হইবে না। আর যদি কাব্য করিতে
চাও, তবে—

হেমললিনী উঠিয়া ধাঁড়াইয়া কহিল, “এমন
করিয়া তুমি আমাকে বলিও না! বাবা
আমাকে বৈরাগ্য আদেশ করিবেন, বাহাকে
বিবাহ করিতে বলিবেন, আমি পালন করিব।
যদি না করি, তখন তোমার কাব্যের কথা
তুলিয়া।”

যোগেন্দ্র তৎক্ষণাতঃ নরম হইয়া কহিল, “হেম, রাগ করিও না বোন। আমার মন খারাপ হইয়া গেলে মাপার ঠিক থাকে না জান ত—তখন যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া বসি। আমি কি ছেলেবেলা হইতে তোমাকে দেখি নাই—আমি কি জানি না, লজ্জা তোমার পক্ষে কত স্বাভাবিক এবং বাবাকে তুমি কত ভালবাস।”

এই বলিয়া যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র তাহার বোনের উপর না জানি কিরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাই কখনা করিয়া অন্নদা তাহার ঘরে উবিয় হইয়া বসিয়া ছিলেন—ভাই-বোনের কথোপকথনের মাঝখানে গিয়া পড়িবার অস্ত্র উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন-সময় যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল—অন্নদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, হেম বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমি বুঝি পূর্ব বেশি জেদ করিয়া তাহাকে রাগি করাইয়াছি—তাহা মোটেই নয়। এখন, তুমি তাহাকে একবার মুখ কুটিয়া বলিলেই সে অক্ষরকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে না।”

অন্নদা কহিলেন—“আমাকে বলিতে হইবে?”

যোগেন্দ্র । তুমি না বলিলে সে কি নিজে আসিয়া বলিবে—‘আমি অক্ষরকে বিবাহ করিব?’ আচ্ছা, নিজের মুখে তোমার বলিতে যদি সন্কেচ হয়, তবে আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার আদেশ তাহাকে জানাই-গে।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “না

না, আমার বাবা বলিবার, আমি নিজেই বলিব। কিন্তু এতু তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে আর কিছুদিন বাইতে দেওয়া উচিত।”

যোগেন্দ্র কহিল, “না বাবা, বিলম্বে নানা বিষ হইতে পারে—এরকম ভাবে বেশিদিন থাকা কিছু নয়।”

যোগেন্দ্রের জেদের কাছে বাড়ীর কাহারো পারিবার জো নাই—সে বাবা থরিয়া যল, তাহা সাধন না করিয়া ছাড়ি না। অন্নদা তাহাকে মনে মনে ভর কুরেন। তিনি আপাততঃ কথাটাকে ঠেকাইয়া রাখিবার অস্ত্র বলিলেন, “আচ্ছা আমি বলিব।”

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, আজই বলিবার উপযুক্ত সময়। সে তোমার আদেশের অস্ত্র অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আজই বা হয় একটা শেব করিয়া ফেল!”

অন্নদা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, তুমি ভাবিলে চলিবে না—হেমের কাছে একবার চল।”

অন্নদা কহিলেন, “যোগেন্দ্র, তুমি থাক, আমি একলা তাহার কাছে গাইব।”

যোগেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা, আমি এইখানেই বসিয়া রহিলাম।”

অন্নদা বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার। তাড়াতাড়ি একটা কোড়ের উপর হইতে কে একজন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পাড়াইল—এবং পরক্ষণেই একই অশ্রু আর্দ্র কণ্ঠ কহিল, “বাবা, আলো নিবিয়া গেছে—বেহারাকে আলিতে বলি।”

আলো নিবিবার কারণ অন্নদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন—তিনি বলিলেন, “থাক না

মা; আগের দরকার কি।”—বলিয়া হাতড়া-
টয়া হেমনলিনীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

তুমি কহিল, “বাবা, তোমার শরীরের ভূমি
ঘর করিতেছ না।”

অন্নলা কহিলেন, “তাহার বিশেষ কারণ
আছে না—শরীরটা বেশ ভাল আছে বলিয়াই
ঘর করি না। তোমার শরীরটার দিকে
ভূমি একটু তাকাইয়ো হেম।”

হেমনলিনী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল,
“তোমরা সকলেই ঐ একই কথা বলিতেছ—
তারি অস্তায় বাবা! আমি ত বেশ সহজ
মানুষেরই মত আছি—শরীরের গণ্ডক করিতে
আমাকে কি দেখিলে বল ত! যদি তোমাদের
মনে হয়, শরীরের লজ্জা আমার কিছু করা
আবশ্যক, আমাকে বল না কেন? আমি কি
কখনো তোমার কোনো কথার ‘না’ বলিয়াছি
বাবা?”—শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা বিগুণ
আর্দ্র শুনাইল।

অন্নলা ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন—
“কখনোনা মা! তোমাকে কখনো কিছু বলি-
তেও হয় নাই—তুমি আমার মা কি না, তাই
তুমি আমার অন্তরের কথা জান—ভূমি
আমার ইচ্ছা বুঝিয়া কাজ করিয়াছ। আমার
একান্ত মনের আশীর্বাদ যদি ব্যর্থ না হয়, তবে
ঈশ্বর তোমাকে চিরস্থখিনী করিবেন।”

হেম কহিল, “বাবা, আমাকে কি
তোমার কাছে রাখিবে না?”

অন্নলা। কেন রাখিব না?

হেম। ততদিন না দাদার বৌ আসে,
অন্তত ততদিন ত থাকিতে পারি। আমি না
থাকিলে তোমাকে কে দেখিবে?

অন্নলা। আমাকে দেখা! ও কথা

বলিস্—নে মা! আমাকে দেখিবার লজ্জা
তোদের লাগিয়া থাকিতে হইবে, আমার সে
মুণা নাই।

হেম কহিল, “বাবা, ঘর বড় অন্ধকার—
আলো আনি।”—বলিয়া পাশের ঘর হইতে
একটা হাতলণ্ঠন আনিয়া ঘরে রাখিল। কহিল,
“করদিন গোলেমাগে সন্ধ্যাবেলার তোমাকে
খবরের কাগজ পড়িয়া শোনানো হয় নাই।
আজকে শোনাইব।”

অন্নলা উঠিয়া কহিলেন, “আজ্ঞা, একটু
বোস্ মা, আমি আসিয়া শুনিতেছি।”—বলিয়া,
যোগেশ্বরের কাছে গেলেন। মনে করিয়া-
ছিলেন বলিবেন, “আজ কথা হইতে পারিল
না, আর একদিন হইবে।” কিন্তু যেই
যোগেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল—“কি হইল বাবা?
বিবাহের কথা বলিলে?”—অমনি ভাড়াভাড়ি
কহিলেন—“হাঁ বলিয়াছি।”—তাঁহার ভয় ছিল,
পাছে যোগেশ্বর নিজে গিয়া হেমনলিনীকে
বাখিত করিয়া তোলে।

যোগেশ্বর কহিল “সে অবস্তা রাজি
হইয়াছে?”

অন্নলা। হাঁ, একরকম রাজি বই কি?
যোগেশ্বর কহিল “তবে আমি অক্ষরকে
বলিয়া আঁসি-গে!”

অন্নলা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “না না,
অক্ষরকে এখন কিছু বলিয়া না। বুঝিয়াছ
যোগেন, অত বেশি ভাড়াভাড়ি করিতে
গেলে সমস্ত কাঁসিয়া যাইবে। এখন কাহাকেও
কিছু বলিবার দরকার নাই—আমরা বরক
একবার পশ্চিমে বেড়াইয়া আসি-গে, তার
পরে সমস্ত ঠিক হইবে।”

যোগেশ্বর সে কথার কোনো উত্তর না

করিয়া চলিয়া গেল। কাঁখে একখানা চাদর ফেলিয়া একেবারে অন্ধরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধর তখন একখানা ইংরাজি মহাঙ্গনী দিলাবের বই লইয়া ‘বুক্‌কোপিড্,’

শিখিতেছিল। যোগেশ্বর তাহার খাতাপত্র তাঁন দিয়া ফেলিয়া কহিল—“ও সব পরে হইবে, এখন তোমার বিবাহের দিন ঠিক কর।” অন্ধর কহিল—“বল কি।”

ক্রমশঃ ।

ভারতীয় জ্ঞানসম্রাজ্য ।

যাপান ।

[প্রথম প্রকাশ ।]

যাপান উত্তরোত্তর অধিক ঘনিষ্ঠভাবে ভারত-বর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। একদা ইউরোপ এইরূপে পুরাতন গ্রীস ও রোমের দিকে আকৃষ্ট হইরাছিল। ভারতবর্ষের পুরাতনসম্রাজ্যে নিযুক্ত হইয়া সভ্যসমাজ যে সকল তথ্য-বিদ্যাকে রুতকার্য্য হইতেছে, তাহাও যাপানকে ভারতবর্ষের দিকে আকর্ষণ করিবার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। আমাদের সাম্রাজ্যে তাহার আলোচনার স্বরূপাত হইলে, তাহা আমাদেরকেও এশিয়াখণ্ডের ন্যূনতমের দিকে পুনরায় ঘনিষ্ঠভাবে আকর্ষণ করিবার কারণ হইয়া উঠিবে।

সমুদ্রযাত্রা পরিভ্রমণ করিবার পর, পৃথক-কোটরনিবন্ধ ক্রমঃস্বারা জ্ঞান ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল কেবল সূত্রতা ও পরাধীনতার আলোচনার নিযুক্ত থাকিয়া, দিনদিন গলিম ও আশাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে ‘বর্তমান’ অরুণসম্রাজ্যের দার্পণজন্যের ভায় নিরতি-

শর অগ্রীভিকর : ‘ভবিষ্যৎ’ কতদূরে,—কোন কুটিল কুণ্ডলিকার হঠাৎভেদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! এরূপ অবস্থার ‘অতীতের’ আলোচনা নিত্যকাল নিফল বলিয়াই প্রতিষ্ঠাত হইবার কথা।

তথাপি অতীতের আলোচনাকে একে-বারে নিফল বলিয়া পরিভ্রমণ করা যায় না। অতীত বর্তমানকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে; বর্তমান আবার ভবিষ্যৎকে গঠন করিয়া তুলিবে। ভূততবিষয়বর্তমান নিরন্তর এক-হত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। অতীতের আলোচনার বর্তমানের, ভূতঃপূর্ব্বগতির কারণ আবিষ্কার করিয়া, মানবসমাজ ভবিষ্যতের দৃষ্ট সাবধান হইতে শিক্ষাগ্রস্ত করে। অতীতের আলোচনা অতীত-গৌরবের আশ্রয়স্থান মানবসমাজকে কিরূপপরিমাণে ক্ষীণ করিবে, এ আশঙ্কা থাকিলেও, সেই আশ্রয়স্থান ভিতর দিয়াই নানা প্রশংসার বাজ বিতরণ

কিভাবে পারে। অতীতের আলোচনা বর্তমান ভারতবর্ষকে সেই স্থানিকার বীজ বিতরণ করিলে, প্রবর্তনালোচনা অবশ্যই সকল হইবে। সেদিন এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে; এখনও তাহার শুভাগমন-জনিত উত্তেজনা অহুত হইয়া নাই। আত্ম-বোধ প্রবৃত্তি না হইলে, সে উত্তেজনা কদাপি অহুত হইবে না। আমাদের আত্মবোধ এখনও নিদ্রানিমগ্ন। অচেতন, অথবা সুত-কম! তত্বেই আমাদের সাহিত্যে ‘প্রবর্তন’ পাঠকসমাজের নিকট বিতীর্ণিকা বলিয়া পরিচিত; কেবল বিদ্যমান কবিতা বা উপজ্ঞানই কণ্ঠস্থ নিদ্রাতুর জনসমাজকে জীবন-বাৎসর্যে নিরত নিদ্রানিমগ্ন করিতেছে।

সেদিন কত দূরে? সে সাহিত্য কোন কণ্ঠস্থ মহাপুঙ্গবের লেখনীধারণের প্রতী-কঃ চিত্রায়মান? যে সাহিত্য এই বিশ্ববিখ্যাত পুরাতন সভ্যসমাজকে পুনরায় আত্মবোধে সমুন্নত করিয়া সাধনার সিংহাসন করিবে, তাহা এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার প্রয়োজন অহুত না হইলে, সে সাহিত্য অদ্রব্ধ করিবে না। তাহার অভাবে আমরা ক্রমশ অতীতবিচ্যুত লক্ষ্য-স্ত্রে কপাপাত্ত জঘত জীবের জায় কালজোতে ভাসিয়া চলিয়াছি।

যাপানের সাহিত্যই যাপানকে নবজীবন দান করিয়া অল্পকালের মধ্যে সভ্যসমাজে যাপানের গৌরববোধবার্ত্তা কৃতকার্য হইয়াছে। সে সাহিত্য যাপানকে আত্মবোধ প্রদান করিয়া, আত্মনির্ভরের মূলমন্ত্রে সজীবিত করিয়া তুলিয়াছে। যাপান বুঝিয়াছে,—

“যাপানের ইতিহাসের মধ্যেই যাপানের অভ্য-

দয়ের আশা! অভ্যাদয়ের আশা সকল আভির পক্ষেই তাহাদের ইতিহাসের মধ্যে সূত্রায়িত। যে পারিয়াছে, সে আবার পারিবে;—ইতি-হাস নিরত এই মহানন্দ প্রদান করিয়া, পতিতজাতির উদ্ধারসাধনের পথ প্রদর্শন করে। কি কারণে পারিয়াছিল; কি কারণে একদিন পারিয়া, অত্রদিন অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল;—ইতিহাস তির কে তাহার রহস্তভেদ করিবে? যাপানের ইতিহাস যাপানের অভ্যাদয়সাধনের স্তম্ভ এই অভ্যাদয়-সাধক ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রচার করিয়াই নতুন আশা, নতুন জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। যাপানের কাব্যের ভিতর দিয়া, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, উপজ্ঞানের ভিতর-^১ দিয়া, সেই এক বর মধুরনিকটে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া যাপান চাহিয়া দেখিয়াছে,—তাহার পুরাতন অভ্যাদয়ের প্রধান কারণ ভারতবর্ষ। তাই ভারতবর্ষকে “ভাষের মাতৃভূমি” বলিয়া যাপানের অভিনব সাহিত্য তাহার প্রতি ক্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে।

যাপান ইতিহাস বুঝিয়া দেখিয়াছে,—স্বরপাতিত পুরাকাল হইতে, নানা দেশের লোকে নানা দম্বে যাপানবীপপুঞ্জে পদার্পণ করিয়া আসিতেছে। যে বধন যাপানে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই বজ্রাত্যন্তরে বর্ধাজ্জাদিত শাপিত অস্ত্র, মুখে শক্তি, শ্রীতি ও সন্তোষকাহিনী! মূলমণি ও ষ্টুটানকে এই কারণে যাপানের ইতিহাস কেবল আক্রমণ-কারিদৃষ্টান্তে প্রতিভাত করিয়াছে। যে যাপান এইরূপে বিশ্বেশের লোকের প্রত্যেক চরণবিক্ষেপে কোননা-কোন সন্দেহ পোষণ

করিয়া, বিদেশের ধর্মপ্রচারকগণকে নির্দয়-
রূপে নিহত করিয়া, বিদেশের লোকের পক্ষে
যাপানের অভ্যন্তরে বিচরণ করিবার স্বাধীন
চেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছে সেই যাপান
তাহার ইতিহাসের ভিতর দিয়া চাহিয়া
দেখিয়াছে,—সমগ্র বিদেশের লোকের মধ্যে
কেবল ভারতবর্ষের লোকেই সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে
যাপানে গুণাপণ করিয়াছিল। সেকালের
বৌদ্ধমতাসার পবিত্র পাতব্ধের অভ্যন্তরে
নিঃবর্ষ সম্ভার্বপূর্ণ সরলপ্রাণ স্পন্দিত হইয়া,
যাপানের অত্যাচারসাধনের ক্ষতি নিহত নিবৃত্ত
হইয়াছিল। ভারতবর্ষ দান করিবার ক্ষমতা
মুক্তহস্তে ধারে ধারে পরিভ্রমণ করিয়া, যাপানের
শিল্প, সাহিত্য ও সামাজিক জীবনের উপর
জ্ঞানসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াই রক্তকৃতার্থ
হইয়াছিল; দানের ছলনা করিয়া অপহরণ
করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে
নাই। প্রবুদ্ধ যাপান চাহিয়া দেখিয়াছে,—
ভারতবর্ষই তাহাদের “ভাবের মাতৃভূমি”—
মাতার জ্ঞান সন্তানদান করিয়া যাপানকে ইহ-
পরকালের গুণাপণে বিচরণ করিবার ক্ষমতা
দান করিয়াছে; ডাকিনীর জ্ঞান ঘেঁষের
ছলনার রক্তশোষণ করে নাই! যাপান এই
“ভাবের মাতৃভূমি”র প্রতি আকৃষ্ট না হইবে
কেন?

মানবসমাজের ইতিহাসে প্রত্যেক
দেশেরই কিছুনা-কিছু প্রভাব লক্ষিত হইয়া

থাকে। কোন দেশের ইতিহাস মানবজাতির
সমুদ্রতিসাধনের কিরূপ চেষ্টার পরিচয়
প্রদান করে, সভ্যসমাজ যেদিন তাহার
আলোচনায় হতক্ষেপ করিবে, সেদিন ভারত-
বর্ষের পূর্বাগোরব পুনরায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত
হইবার সময় উপস্থিত হইবে। ইতিহাসের
এই বিজয়বাহিনী অস্ত্রাঙ্গি সর্বত্র স্পর্শপ্রতি-
ফল হয় নাই। তক্ষক ভারতবর্ষের ইতিহাসের
প্রকৃত মর্যাদা অহুত্ব হইতেছে না। •
পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যেন অবজ্ঞার নাসিকা
কুণ্ঠিত করিয়া, চর্জনোৎসাহে তরারবে চাং-
কার করিয়া কহিতেছেন,—“ভারতবর্ষের
ইতিহাসের আবার গৌরব কি? ভারতবর্ষ
তাহার ক্ষুদ্রসীমার বাহিরে একপাখী ছুঁইও
অপহরণ করিতে পারে নাই! বাহা পাইয়া-
ছিল, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়া ঘীরে
ঘীরে অযোগ্যের জ্ঞান সর্বত্র হারাইয়া
কাণ্ডাল হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের ইতি-
হাসই ইহার অসারতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ!”
মহাদেশের বিচারে দম্ভা ভিন্ন ধর্মভীরুগৃহস্থের
প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই। তাই ভারত-
বর্ষ ভীক ও কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্কিত। এই
কলঙ্কই ভারতবর্ষের গুণলগাটের সমুজ্জল
স্বত্বলক্ষণ!

সেদিন ভারতবর্ষের বাহিরে, অল-স্থলে
ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্যশক্তি-
শালী মানবসমাজ বর্তমান থাকিলে, তাহার

• It might therefore be justly said that India has no place in the political history of the world. • • • • • An expedition like that of Alexander could never have been conceived by an Indian king, and the ambition of native conquerors, in those few cases where it existed, never went beyond the limits of India itself—Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. 31

তবে ভারতবর্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে নিরস্ত থাকিতে পারিত। সেদিন ক্রে ভারতবর্ষের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে পারিত? আজ অসভ্যসমাজ সভ্যসমাজের আক্রমণবেগ সহ করিতে পারে না; সেদিনও অসভ্যসমাজের পক্ষে অসভ্যভারতবর্ষের আক্রমণবেগ সহ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ভারতবর্ষ অসহ্য প্রতিবেশীর রাজ্যহরণের চেষ্টা করে নাই। তত্ত্ববৃত্তি ভারতবর্ষের সমুদ্রত রাজনীতিকে কলঙ্কিত করে নাই বলিয়াই ভারতবর্ষের কলঙ্ক হইতে পারে না। ভারতবর্ষ জ্ঞানসাম্রাজ্যসংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; সে চেষ্টা অসম্পূর্ণ হইয়াছিল; বর্তমানে আবার শিক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যসমাজ ক্রমে সংঘত না হইয়া অসংঘত হইয়া উঠিতেছে। মানব আবার পীড়িতকণ্ঠে শাস্তিলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য পুনরায় বিস্তৃত না হইলে, সে আকুল আর্তনাদ তিরোহিত হইবার আশা নাই।

এশিয়া এক। এশিয়া অথও মহাদেশ। এশিয়া ধর্মে, ভাষায়, আচারব্যবহারে বহুধা বিভক্ত হইলেও, তাহার বিভিন্নতার মধ্যেই একতার গুণস্রোত প্রবাহিত। সে স্রোত একদা ভারতবর্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া, সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে প্রাবৃত্ত করিয়া দিয়াছিল। যাপান সেই পুরাতন স্রোতের সন্ধান লাভ করিয়া, অধঃপতিত এশিয়াখণ্ডের জংগিণ্ডের জায় নবম্পন্দনে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র এশিয়াখণ্ড যেন যাপানের প্রাণের স্পন্দনে যৃতকল্পনায়

পুনরায় চেতনাপ্রকারের স্বরূপ লাভ করিতেছে।

এশিয়ার ধর্ম মানব-ধর্ম। এশিয়ার শাক্য, খৃষ্ট, মহাম্মদ, তাহাই পুনঃপুন প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ শতাব্দীর বহিঃদেশ অগ্রগতিগুলি গ্রহণ করিয়া, মূলসত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ইউরোপ বাহ্যলোভ-পশুধর্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইয়া, এশিয়ার শ্রদ্ধা-আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াও, অশ্রদ্ধা লাভ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্যের তুলনায় শক্তিসাম্রাজ্যের এইরূপ পরাজয় অবশ্যস্বাভাব্য। ইউরোপ বিজয়লাভ করিয়াও পরাজিত; এশিয়া বিজিত হইয়াও, অপরাধিত পূর্বাগোরবে মানবসমাজের অকপট, ইতিহাসলেখকের প্রত্যক্ষ নীরবে মিন-পর্ণনা করিতেছে।

ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য সুদূর যাপান-দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইবার সময়ে, চীন ও কোরিয়া দেশের নানা কুসংস্কারের প্রভাবে যাপানে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশের ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধভ্রমণগণ তাহার পরিচয় পাইবামাত্র, ভারতবর্ষে আসিয়া প্রকৃত জ্ঞান উপার্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গুহাবিগের নিকট হইতে যাপানও সে কুসংস্কৃত ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্ণ হইয়াছিল। প্রথমে কেবল শাক্যসিংহের জীবনকাহিনী ও উপদেশ, নানাভাবে বিকৃত হইয়া, যাপানে শাক্যপুত্রের প্রচলন করিয়াছিল। পরে শাক্যসিংহের ধর্মমতের মূলতত্ত্ব শতৈঃশতৈঃ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যেই যাপান “ভ্রূবের মাতৃভূমি”র প্রকৃত

সকান প্রাপ্ত হইয়াছে। সে শিক্ষা বাপানকে বাহাড়াবরে দীর্ঘকাল করিয়া, মধ্যস্থানে মধুকরের স্তাঃ উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। বহুবছর দার্শনিক শিক্ষাই তাহার মূল বলিয়া বাপানবাসীক নিকট স্থাপরিচিত।

আর্য্যসমাজের নবজীবনলাভের প্রথম প্রভাতে ভারতবর্ষের পুণ্যারণ্যে যে বেদমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই মানবজ্ঞানশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত “হৃত্ত”। অজ্ঞাত যুগের সমুন্নত সাহিত্য সেই সংক্ষিপ্ত হৃত্তের বিস্তৃত “ভাব্য” ভিন্ন আর-কিছু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। বেদমন্ত্র ভারতবর্ষকে যে সরল সত্যের শিক্ষাদান করিয়া মানবধর্মের সমুন্নত করিবার হৃত্তপাত করিয়াছিল, পরবর্তী ধর্ম-প্রচারকগণ তাহাই নানাভাবে লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তানকালপাত্র-ভেদে নানাভাবে ধর্মতত্ত্ব প্রচারিত হইলেও, এশিয়াখণ্ডের সকল ধর্মই আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যকীর্তনে এশিয়ার দৌরব্যবস্থা করিয়াছে। সন্তোষ পণ্ডিত; ত্যাগ ভিন্ন মানবধর্মের অস্ত কোন মূলমন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মত্যাগেই মানব সমাজ সমুন্নতলাভ করিয়াছে;—আত্মত্যাগেই মানবসমাজ ক্রমোন্নতি লাভ করিবে। ত্যাগের মূলে সংযম বিস্তারিত থাকি আবিস্কৃত। মানবসমাজ সুসংযত না হইলে আত্মত্যাগের সরলধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। সংযম মানবসমাজকে বিচারপরায়ণ করে। নী বুদ্ধিলে, মানবসমাজ সংযত হইতে পারে না। বুদ্ধিতে বসিলেই, ইহকালের সমালোচনার দৃষ্টকোণ করিতে হয়। সে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সকল আত্ম-

লম নিরস্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ তাহাতে দৃষ্টকোণ করিয়া, সংযত হইয়া, আত্মত্যাগে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণসাধনের স্তম্ভ জীবন উৎসর্গ করিবার শিক্ষাদান করিয়াছিল। ইহাই ভারতীয়-জ্ঞানশাস্ত্রাধ্য-বিস্তারের প্রধান সহায়। ইহার নিকটশাপিত ধরশাপ পরিত্যক্ত হইয়া যায়। শাক্যসিংহের উপদেশ এই মূলমন্ত্র প্রচার করিবার যে অভিনব কৌশলেচ্ছ-উদ্ভাবনা করিয়াছিল, তাহারই নাম বৌদ্ধধর্ম। তাহা নূতন নহে, চিরপুরাতন। কালে তাহা নানা কুসংস্কারে অচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, পুনরায় বহুবছর তাহার মূলতত্ত্বব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা কিছু বৃহৎ, তাহাই ভারতবর্ষের পুরাতন আদর্শ। বৃহৎ হিমালয় ভারতবর্ষের জনসমাজকে নিরস্ত বৃহত্তের দিকেই আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। নদনদী সেই দিকেই লোকচিত্ত পরিচালিত করিয়া সকল ক্ষুদ্রতা ভাঙাইয়া লইয়া গিয়াছে। পুরাতন ভারতবর্ষ বিশ্ববাদীকে ডাকিয়া কহিয়াছে—

“যো বৈ ভূম্য তং ব্রহ্ম নাকোহসমমতি।”

এই শিক্ষা ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তে, সসীম হইতে অসীমে বহন করিয়া লইয়া, ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া নিরস্ত সেই মহাবিশ্ব-লাভের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহার তুলনার ‘বর্তমান’ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া ‘ভবিষ্যতের’ অপূর্ণত বৃহৎ কলেবরে লুপ্ত হইয়া যাইবে; তাহার তুলনার সংকীর্ণরৈখানিবদ্ধ সসীম স্বল্পপটভূমি হইয়া, ভাবব্যঞ্জক অনন্তসৌন্দর্য্যবিজ্ঞাপক কাল্পনিক চিত্রের অস্পষ্ট বর্ণসমাবেশ-

কৌশল প্রাধান্যলাভ করে; তাহার তুলনায় লোকচিত্ত ধূলি ঝড়ির, ধরা ছাড়ির, নির্মূল নীলগগনের প্রশান্তসৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের জ্ঞানসাত্রাজ্য যে দেশে বিঘ্নভিত্তিক করিয়াছে, সে দেশেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাপানে সে পরিচয় অস্ত্রাশি বিলুপ্ত হর নাই। বাপানের অসুখ স্বাধীনতা, বাপানের ধারাবাহিক রাজবংশের বহুলকিত প্রবাসভার, বাপানের শাসনস্বরূপিত বহুল সরলস্বভাব অতীতের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া অস্ত্রাশি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সে দেশে গৃহ-সম্ভার অনাবশ্যক আড়ম্বর গৃহস্থকে অনর্থক শ্রমগ্রস্ত করে না; আহাৰবিহারের ঘটাবৈচিত্র্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য বেঘাজ্জ করিয়া অনসম্বন্ধে জীড়াপুঞ্জে পরিণত করে না;—তাহার ক্ষুদ্রতার সৰ্ব্বপ্রকার স্তূর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বৃহত্তর বিঘ্নতরাজ্যে বিচরণ করিয়া, মানবজীবনের প্রকৃত* রসাবাদের অন্তই আগ্রহপ্রকাশ করিয়া থাকে। কখন-কখন আধুনিক কুসংসর্গ বাপানকে অভিযাত্রার ইউরোপভ্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; সে চেষ্টা সকল হইতে পারে নাই। বাপান ক্রমেই “ভাষের দাক্তমি”র দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

অন্ধ অশ্রুতরূপে দূরগম্যতিকে বলদান করিতে পারে না। ব্রহ্ম, জ্ঞান, সিংহল বোধধর্মের অন্ধ অশ্রুতরণে লিপ্ত হইয়া, ক্রমে নানা বাহ্যিকভাবে নিমগ্ন হইয়া পড়ি-

রাছে। দীক্ষাগ্রহণের আড়ম্বর আছে, শ্রমগণের পবিত্র পীতবস্ত্র ধারণ করিবার আড়ম্বর আছে; তাহাদের সমুদ্রত সাধু-জীবন ও সর্বস্বত্যাগের সমুদ্রগৌরবের অহু করণ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। বাপানে তাহাই প্রবল; বাহ্যিকবস্ত্র ক্রমে দূরীভূত হইয়া পড়িয়াছে। “জননী জন্মভূমিচি স্বর্গাদপি গরীযসী”—এই মহামন্ত্র সে দেশের গৃহে গৃহে অস্ত্রাশি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আত্ম-সম্মানবোধ বাপানকে তাহার পূর্বগৌরব-রক্ষার্থ অমিতবলে বলদানী করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশ যেন এক হইয়া, এক চিন্তা ও এক কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে!

ইউরোপের ধারণা এইরূপ,—ইউরোপের শিক্ষাই বাপানকে নবজীবন দান করিয়া, এরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। বাপানের বিশ্বাস অন্তরূপ। কাকাস ও কাকুরার গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐতিহাসিকের দ্বারা বিচারনিপুণ অধ্যবসার অবলম্বন করিয়া, প্রমাণপ্রয়োগে ইহার প্রতি-বাদ করিয়া গিয়াছেন। বাপানের পুরাতন ইতিহাসই বাপানকে প্রবৃত্ত করিয়াছে; ইউরোপীয় সংসর্গ তাহাকে কেবল আত্মরক্ষার্থ সতর্ক করিয়া দিয়াছে। তাহা প্রথম কারণ নহে; তাহা দ্বিতীয় কারণ।*

বাপানের নবজীবনলাভের প্রথম কারণ বাপানের ইতিহাস। তাহা প্রথমে অলিখিত অবস্থায় জনশ্রুতিমাত্রে পরিণত হইবার উপ-

* The second cause of the national reawakening was undoubtedly that portentous danger with which Western encroachments on Asiatic soil threatened our national independence.—*Ideals of the East*, p. 211.

ক্রম হইয়াছিল। বিশত বৎসর পূর্বে ইতি-
হাসগত্বলনের প্রথম চেষ্টার সূত্রপাত হয়।
রাজকুমার মিটে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য
ছিলেন। * তাহার উৎসাহে যে ইতিহাস
সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা বাপানের কাব্য,
উপন্যাস ও সঙ্গীতের মধ্যেও পূর্বগৌরবের
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাপানবাসী
তাহাদের পুরাতনের মধ্যে আত্মত্যাগের পূণ্য-
কাহিনী প্রাপ্ত হইয়া, আত্মবিসর্জনকে পরম
পুণ্যব্রত বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে
শিক্ষা বাপানের আত্মবিসর্জনবিন্যাসকে স্বদেশ-
সেবার আত্মোৎসর্গ করিবার মন্ত্র উদ্ভেজিত
করিয়া আসিতেছে।

১. পুরাতন ইতিহাসের মধ্যে বাপানের
বিবিধ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে বাপানের অবস্থা
কিছু ছিল, তাহার সহিত পরবর্তী কালের
সমালোচনা করিলাম, বাপানকে *ভাবের
মাতৃকৃত্তিম"র উদ্দেশে ভক্তিবিষয়ে প্রশিষ্যতা
করিতে হয়। এশিয়া এক এবং অখণ্ড মহা-
দেশ। এশিয়ার ধর্ম, মানব-ধর্ম। এশিয়ার
জ্ঞান ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর দিকে মানবপ্রাণকে
আকর্ষণ করে। এশিয়া সম্রাট অপেক্ষা
ত্যাগের প্রাধান্য কীর্জন করিয়া থাকে। এই
সকল শিক্ষা পুরাতন ইতিহাসের প্রত্যেক
ঘটনার ভিতর দিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।
এই শিক্ষার প্রাধান্য লোকচিত্রে দৃঢ়মুদ্রিত
হইবামাত্র, লোকে ইউরোপীয় শক্তিসাম্রা-
জ্যের অস্তঃসারপুত্র উচ্ছ্বল বর্ষরতার
প্রকৃত মূলানির্ঘের সমর্থ হইয়াছে। এশিয়া
গঠনশীল প্রতিভা লইয়া মানবমাজে শাস্তির
পুণ্যসাম্রাজ্য গঠিত জগৎবাস আয়োজন

করিয়াছিল। ইউরোপ ধ্বংসশীল প্রতিভা
লইয়া বর্ষরের ভার, মানবমাজের শাস্তি-
সৌধশিখরে নিরন্তর শেহদাদের আত্মত্যাগ
করিয়া আসিতেছে। * একদা অগভ্য বর্ষর,
পুরাতন সভ্যতার কীর্তিচিহ্নবস্ত্র সমুদ্রত
সৌধাবলী ধূলিসুষ্টি করিয়া বহুদূর
অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। আবার
স্বসভ্য বর্ষরপণ বর্তমান সভ্যতার অকৃত্রিম
নিখিলময়লাসায় বহুদূর শাস্তিসাম্রাজ্য
চূর্ণবিচূর্ণ করিবার মন্ত্র ব্যাকুল হইয়া উঠি-
য়াছে। বাপান তাহার যে তীব্র প্রতিবাদ
করিবার মন্ত্র দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা ইতি-
হাসের প্রতিবাদ। তাহার প্রকৃত অর্থ—
শান্ত হও; যথেষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষ তর্ক-
বলে যে শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া পৃথি-
বীকে প্রেমপুণ্যে সমুদ্রত করিবার চেষ্টা
করিয়াছিল, সে চেষ্টা বার্থ হইয়াছে দেখিয়া,
বাপান বাহুবলে সেই পুরাতন শিক্ষাই অস্তি-
নব উপায়ে প্রচার করিবার মন্ত্র বহুপন্থিকর
হইয়াছে। এই জ্ঞানবিস্তারে অকুতোভয়
বাপান সম্রাটের ভার, সম্রাটমুখে আত্ম-
বিসর্জন করিয়া এশিয়ার বিজয়যোৎসব করি-
তেছে। ইহার সহিত সাময়িক জরপরাধের
সংশ্রব নাই। সময়ক্ষেপে পরাভূত হইলেও
মানবমাজের ইতিহাস বাপানের বিজয়-
যোৎসব করিতে বাধ্য হইবে। সে বিজয়ের
মূলমন্ত্র ভারতবর্ষ হইতেই দিগ্‌মগ্নে
প্রচারিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পুরাকালের জ্ঞানগৌরব যে
বাপানকে সমুদ্রত করিয়াছে, এ কথা ইউরোপীয়
পণ্ডিতবর্গও অস্বীকার করিতে পারেন না।
ভারতবর্ষের আধুনিক ভূখণ্ডদশা বাপানের

নবজীবনসংস্কারের পক্ষে কতদূর উত্তেজক হইয়াছে, তাহা কিন্তু সভ্যসমাজে অত্যাধিক অশুভ্রিজাত । ওকাকুগ্রা তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—যাপানের নবজীবন-লাভের প্রবলচেট্টা প্রবর্তিত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশার অবস্থাকেও একটি প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে

হইবে ।* যাপান ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া এবং ইউরোপের দিকে চাহিয়া, আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছে । যাপান বুঝিয়াছে,—শান্তি ভিন্ন মানবসমাজের উন্নতি-লাভের আশা নাই ; তাই সে শান্তি-রক্ষার্থ সর্বত্র বিসর্জন করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে ! †

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

* We saw India, the holy land of our most sacred memories, losing her independence through her political apathy, lack of organisation, and the petty jealousies of rival interests,—a sad lesson, which made us keenly alive to the necessity of unity at any cost—*Ideals of the East*, p. 212.

† We await the flashing sword of the lightening which shall cleave the darkness. For the terrible husk must be broken, and the rain-drops of a new vigour must refresh the earth before new flowers can spring up to cover it with their bloom. But it must be from Asia herself, along the ancient roadways of the race, that the Great voice shall be heard, "victory from within, or a mighty death without."—*Ideals of the East*, p. 244.

গৌতমমুনি ও জ্ঞানদর্শন । *

কিছুদিন পূর্বে জনৈক বিজ্ঞ বিবর্তী লোকের সঙ্গে আমার জ্ঞানসংক্রান্ত কতিপয় কথার আলোচনা হয়। সেই আলোচনা লিপিবদ্ধ করায় এই প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাই পাঠ করিতে আমি অল্পকাল সভায় উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে ইহার দ্বারা শ্রোতৃবর্গের বস্তুকিৎ পরিচোষ^১ অন্বিগ্নেই আমি সমস্ত প্রম সকল বোধ করিব।

প্রথম কথা, এতদেন্দ্রিয় বড় দর্শন। তদ্বোধো বে মুনির যে দর্শন, তাহা একটি শ্রোকে গীথা আছে। যথা :—

“কশিলস্ত কণাদন্ত সৌতমন্ত পতঞ্জলো ।

বাসন্ত লৈমিনেচ্চাপি দর্শনানি বড়ং হি ।”

কশিলের দর্শন, কণাদের দর্শন, গৌতমের দর্শন, পতঞ্জলির দর্শন, বাসন্তের দর্শন, ও লৈমিনির দর্শন, এই বড় দর্শন। তদ্বোধো গৌতমের দর্শন—জ্ঞান। জ্ঞান বলিলে আমরা গৌতমের দর্শনই বুঝি সত্য, পরন্তু গৌতমের দর্শন ব্যতীত আরও অনেক জ্ঞাননামের নামী আছে;—ধেমন কাকতালীয়াজ্ঞান, সামান্ত-বিশেষজ্ঞান, বীজাঙ্কুরজ্ঞান, অক্ষপদজ্ঞান, স্থালীপুলাকজ্ঞান, বীচিত্তরজ্ঞান ও কৈমুতিকজ্ঞান ঐহিক। এই সকল জ্ঞানের উল্লেখ ও প্রচার কাব্য-অলঙ্কার, হুতি-পুরাণ ও সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন, সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। এমন

কি, লৌকিক আচারব্যবহাৰাবির মধ্যেও জ্ঞান-অজ্ঞান-শব্দের সম্যগব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, কেবল গৌতমের দর্শনই যে জ্ঞানপদবাচ্য, তাহা নহে। আরও অনেক জ্ঞানপদবাচ্য আছে।

যে সকল জ্ঞানের উল্লেখ করা হইল, ঐ সকলের কতক বতঃসিদ্ধ লৌকিক ঘটনার উদাহরণমাত্র। কতক পানিনি প্রভৃতি ব্যাকরণকর্তাদিগের প্রচারিত পরিভাষা, কতক বা ব্যাসলৈমিনিজ্ঞাদি কথিদিগের অভিহিত সিদ্ধান্তকথা। অতএব ন্যায় বলিলেই যে কেবল গৌতমের ন্যায় বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। তবে যদি ন্যায়শাস্ত্র, ন্যায়-বিজ্ঞা বা ন্যায়দর্শন বলা যায়, তাহা হইলে গৌতমের ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন ন্যায় বুঝাঙ্কত হইবে না। কারণ এই যে, লৌকিক ন্যায়ের কোন শাস্ত্র নাই,—তাহা কোন বিজ্ঞা নহে, এবং ব্যাসলৈমিনিন্যায়ের অতিহিত ন্যায়ও অধিকরণ ও মীমাংসা নামে হ্রস্বসিদ্ধ। লৌকিক ন্যায়ের অনেকগুলি পুস্তক আছে বটে; পরন্তু সে সকল পুস্তক শাস্ত্রলক্ষণবর্জিত। সে সকল কেবল দৃষ্ট-জ্ঞানস্থায়ী সংগ্রহমাত্র। লৈমিনি ও বাসন্তের এক একটি বিচার ন্যায়নামের নামী হইলেও, সমগ্র শাস্ত্র ন্যায়নামের নামী নহে। কাজেই

* পত এই আখ্যায়িকাব্যবহার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আমরা ন্যায়শাস্ত্র বলিলে, গৌতমের দর্শন বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না।

ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়দর্শন গৌতমপ্রণীত, এইটুকুমাত্র সর্ববিদিত; কিন্তু তাহার বিষয় বহুলোকের অবদিত। আজকাল বাঙালীভাষার এত উন্নতি যে, যে স্থানেই বাই, সেটো স্থানেই সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শনের আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু কৃত্তাপি ন্যায়দর্শনের প্রসঙ্গ পড়িবার শুনিতে পাই না।

ভাষাতেই বাধা হয়, ন্যায়দর্শনের বিষয়সকল এখনও সাধারণসমাধে অককবিসমাধে রহিয়াছে। সাংখ্যপাতঞ্জলাদিও এত-রূপ অককবিসমাধে ছিল অরদিন হইল, চলিত-ভাষার তৎসংক্রান্ত পুস্তক প্রবন্ধাদি প্রচারিত হওয়ার আজকাল কিছু প্রকাশপাপ্ত হইয়াছে। সাংখ্যপাতঞ্জলাদিতে বাগ আছে, তাহা আজকাল অনেক জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু নাহে কি আছে, তাহা কোনও বিষয়ী লোক অজ্ঞাপি বিদিত হইতে পারেন নাই।* কেবল শ্রীকৃষ্ণভার বিচার শুনিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, জায়শাস্ত্রে কেবল কতকগুলি কলিক আছে, আর ধর্মবহির কথা আছে, আর কিছুই নাই। তবে কোন কোন বিজ্ঞ বিষয়ী লোক আছেন,—পণ্ডিতমণ্ডলী গাহাদের নিকট সর্বদা গতিবিধি করেন,—গিও তাঁহারা জানেন যে, জায়শাস্ত্র ঈশ্বরাত্মমানের শাস্ত্র, তথাপি সে জানা ঠিক জানা নহে। তাঁহারা নব্যনৈমিষিকদিগের মূখে-মাত্র শুনিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন। ফলত গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বরপ্রতিপাদক কোন বৃত্ত নাই। ঈশ্বর

* উপাত্ত কি বিজ্ঞেয়, তাহা গৌতমের দর্শনেও

বিচারিত হয় নাই। এতদার দৃষ্টান্তের প্রবন্ধেই প্রতিজ্ঞাহৃত, তদাধো প্রমাণ, প্রমের প্রতীতি ধোল পদার্থের উল্লেখ; ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেরবিভাগে যে আচার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাহৃত দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সে কথা জীবাব্যয়। গৌতমের মতে জীবাব্যয়-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই যৌক্তিক প্রমাণ; ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান যৌক্তিক প্রমাণ কি না, তাহা গৌতমের গ্রন্থ-ধারা জানা যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটে, পরন্তু সে উল্লেখ উল্লেখমাত্র। তাই আমার বক্তব্য, নব্যনৈমিষিকগণ যে কিসে জায়দর্শনকে ঈশ্বরাত্মমানের শাস্ত্র বলেন, তাহা আমি বিদিত নহি। বাহ্যেই হউক, জায়শাস্ত্র ঈশ্বরাত্মমানের শাস্ত্র, একথাও বহুলোকে অবদিত। সেই কারণে তাঁহারা জায়শাস্ত্রকে ফলিকার শাস্ত্র বলিয়া জানেন। অনেক বিষয়ী লোকের মনে ঐরূপ একটা কুসংস্কার থাকায়, তাঁহাদিগকে আমি অনেকবার ‘জায়ব্রহ্ম’ ‘জায়বাগীশ’ প্রতীতি ন্যায়শাস্ত্রবিষয়িত উপাধির আঁত অহুত সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি।

একজন ব্যাকরণের পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি ন্যায়বাগীশ, আর একজন কবিতার পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি ন্যায়ব্রহ্ম। যিনি ব্যাকরণের পণ্ডিত, তিনি যে ব্যাকরণগোষ্ঠ অন্তরঙ্গ-বহি-রঙ্গাদি ন্যায় পড়িয়া ন্যায়বাগীশ, এবং যিনি কবিতাপণ্ডিত, তিনি কৈমিষ্যুক্ত সংযোগপৃথক-ত্বাদি ন্যায় পড়িয়া ন্যায়ব্রহ্ম, এ ইহুত বিষয়ী লোকে বিদিত নহে। প্রসিদ্ধি অল্পমাত্রের বিষয়ী লোকে মনে করে, ইনি যখন ন্যায়-ব্রহ্ম তখন ইনি অল্পব্রহ্ম ন্যায় জানেন, অর্থাৎ

কী বুদ্ধিলেন ? ‘ভনো ঘটমোনহতি’ এই কথার নৈরাসিকরূপ অর্থ বুদ্ধিলেন কি ? ইহাশই দ্বারা বুদ্ধিবেন, মহাতৈনহারিকমিগের দ্বারা জায়শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি, বিপ্লুতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ।

কোন এক ধনী লোকের ভবনে একদা এক হস্তশিল্পীর তাঁড়ামি হইতেছিল । হস্ত-বোণা শাদরিসাধেবের বাঙলা বজুতা, জাম্বুরোহিতের উপদেশ, শ্রাহসভার আহুত পণ্ডিতগণের বিচার, সমস্তই একে একে নকল করিল । বসকরণের বিচার ও স্মৃতির বিচার নকল করিয়া, জায়শাস্ত্রের বিচার নকল করিবার সময়, কতকগুলি কড়ি একটা ঘণ্টের ভিতর পুরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিল এবং বলিল, “গুহুন, জায়ের বিচার গুহুন ।” জায়ের বিচারের সহিত বসটেকপূর্ণ ঘণ্টের আন্দোলনের যে কি দোষাদৃষ্ট, তা প্রোভূর্ণ একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুদ্ধিতে পারিবেন ।

জায়শাস্ত্রের ভাষা অত কূট হইল কেন ? এই প্রশ্নেরও দুইপ্রকার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় । কেহ বলেন, পুচ্ছাশুপথ্য বিচারের অহুরোধে বাধা হইয়া একরূপ কূটভাষা স্বজন করিতে হইয়াছে । অজ্ঞে বলেন, কেবল বিচারের অহুরোধে নহে, ঐ বিষয়ে তাহারদের অনেকটা ইচ্ছার অহুরোধও আছে ; অর্থাৎ বিচারের অহুরোধেও বটে, ইচ্ছা করিয়াও বটে । ইচ্ছা করিয়া কূটভাষা স্বজন করিবার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় । ইদানীন্তন কালেরও অনেক পণ্ডিতের একরূপ যতাব দেখা যায় যে, তাহার। অন্যকে বিভাবুদ্ধি-বিষয়ে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে বৎপন্নোক্তি চেষ্টা করিয়া অতি

ওকোথা কূটপ্রোকাপি রচনা করিয়া থাকেন । তাহার। ভাবেন, মরণ ভাবায় কোন কিছু লিখিলে তাহারদের পণ্ডিত্যের হানি হইবে । ঐহর্ষনামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, তিনি ‘খণ্ডনখণ্ডাশ্র’নামক গ্রন্থের প্রণেতা, তিনিও ঐপ্রকার ছুরভিনকিদোষে লিপ্ত ছিলেন । তবে তাহার গুণ এই যে, তিনি নিজের মনোভাব গোপন না করিয়া উক্ত গ্রন্থের শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, আমি উচ্ছা করিয়া এই গ্রন্থক ওকোথা ও দৃশ্যশাঠা করিলাম । যথা—

“এবমহিরিক কচিৎ কচিদগ্ধি জামি লগ্ধাশ্রয় ।

প্রাকলভনামন হঠেন পাইতী মাপিন্ পলঃ খেলতু ।

অজ্ঞারিখাশ্রকঃ স্মণীকুচনুতগাথঃ সমাসোদয-

যে চক্করংসামিষমজ্ঞনম্পেগাশ্রনঃ সজ্ঞনঃ ॥”

আমি ইচ্ছাপূর্বক এই গ্রন্থের অনেকস্থান গ্রন্থিবদ্ধ করিলাম । বাহার। খলস্বভাব, প্রজ্ঞাভিমাত্রী, কাহাকেও গুরু বলিতে চাহে না, আপনা-আপনি পড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহার। এই গ্রন্থে ক্রোড়া করিতে পারিবে না । বাহার। সজ্ঞান, প্রজ্ঞাভিজ্ঞ-সহকারে গুরুসেবা করে, তাহার।ই গুরুভাষা এই গ্রন্থের গ্রন্থিসকল খুলিয়া লইয়া, অজ্ঞ স্বর্করসত্ত্ব ভরসে, মজ্ঞনের স্তম্ভ প্রাপ্ত হইবে । এ সকল কথা শুনিলে, কে না বলিবে যে, ন্যায়চার্যগণ ইচ্ছা করিয়া কূটভাষা স্বজন করিয়াছেন । বাহাই হউক, ন্যায়ের পদার্থগণ দৃক বা হস্ততর্ক্য হউক বা না হউক, তাহার ভাষা য নিত্যক দৃক, সে পক্ষে সংশয় নাই ।

ন্যায়ের ভাষাকর্কশ প্রথমাবধি নহে । বেকপ ভাষায় ন্যায়শাস্ত্রের আবিস্কার, সেই-

রূপ ভাবায় অন্যান্য পন্থেনের আবির্ভাব।
নাথের স্বত্বসকল পুরুষ-পুরুষিত-বৃত্ত, অন্যান্য
দর্শনের স্বত্ব ও নিও তরুণ-পুরুষিত-বৃত্ত।
নাথের ভাবাশ্রুতি ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভাবা-
বেষণ, অতীত দর্শনের ভাবাশ্রুতি ব্যাখ্যা-
গ্রন্থের ভাবাও সেইরূপ। বলিতে কি, ন্যায়
বঙ্গদেশে আদিমাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে,
নচেৎ পূর্বে সর্বদেশে একই রূপে অবস্থিত
ছিল।

ন্যায় কি? এ কথা প্রত্যক্ষ দিতে
হইলে, বোধ হয় আপাতত এইরূপ বলিলে
বলেই হইতে পারে যে, অহুমানপ্রণালীর নাম
ন্যায়, ও তদ্বোধক শাস্ত্রের নাম ন্যায়শাস্ত্র।
'অহু'শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর 'মান'শব্দের
অর্থ জানা। যে স্থলে কোন এক জ্ঞানের
দ্বারা তৎসংস্পর্শে অন্য এক পদার্থ জানা যায়,
সে স্থলের সেই প্রথম জ্ঞান অহুমান ও দ্বিতীয়
জ্ঞান অহুমিতি। যেমন ধূমজ্ঞানের পর
বহ্নির জ্ঞান। প্রাচীন ন্যায়বিং পণ্ডিতেরাও
অহুমানের লক্ষণগ্রন্থে সরল সংস্কৃতভাষায়
বলিয়া গিয়াছেন যে, "জ্ঞানকরণকং জ্ঞান-
বহুমানম্।" আমি অহুমানের নাম ন্যায়,
এ কথা না বলিয়া, অহুমানপ্রণালীর নাম
ন্যায়, এ কথা বলি। কেন, তাহা
বলিতেছি। অহুমান বার্থ-পরার্থ-ভেদে বিবিধ।
তদ্বধ্যে বাহ্য বার্থ, তাহা ন্যায়সংস্কার সংজ্ঞা
নহে; বাহ্য পরার্থ, তাহাই ন্যায়সংস্কার সংজ্ঞা।
স্বার্থাহুমান জীবদেহেরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম,
সেজন্য তাহা পরাপেক্ষী নহে। পরাপেক্ষী
স্বার্থাৎ শাস্ত্রমুখাপেক্ষী। পরাপেক্ষী নহে,
অর্থাৎ আপনা-আপনি জন্মে। আপনা-
আপনি জন্মে বলিয়াই তাদৃশ অহুমানের

নাম স্বার্থাহুমান। যে একবার ধূমস্থলে
বহ্নি দেখিয়াছে, সে সমসাময়িক ধূম
দেখিলেই তদ্বস্থলে বহ্নি থাকি অবধারণ
করিবে। তাহার সেই ধূমজ্ঞানজন্য বহ্নি-
জ্ঞান আপনা-আপনি জন্মে, কাহাকেও
জ্ঞানাইয়া দিতে হয় না, সেইজন্য তাহা
স্বার্থসংস্কার সন্নিবিষ্ট। তাদৃশ স্বার্থাহুমান
শক্তিরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে স্বতঃসিদ্ধ
ভাবে বিদ্যমান থাকে। তাহারই প্রভাবে
জীবগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান পদার্থে, দূর ও
ব্যবহিত পদার্থে, জ্ঞানলাভ করিয়া নিবিধে
সংসারযাত্রা নির্যাস করিতেছে। তাই
বলা হইয়াছে, স্বার্থাহুমান শাস্ত্রশিক্ষার অধীন
নহে। এবং বিধ স্বার্থাহুমানের আদর্শে
পরার্থাহুমান-নামক ন্যায় রচিত হইয়া
থাকে; সেজন্য উক্ত স্বার্থাহুমানকে পরা-
র্থাহুমানের মূল, বীজ, আদর্শ বা অহুবাদ
বলা যায়। যে স্থলে কোন কারণবশত
স্বতঃসিদ্ধ স্বার্থাহুমানশক্তি হ্রাসকর হয়,
সেই স্থলে পরার্থাহুমানের উদয় বা অবির্ভাব
হইয়া থাকে। যেন করুন, আমি ও
আমার ভৃত্য, আমরা উভয়েই দূর হইতে
পরস্পরোপরি ধূমোপগমন হইতে দেখিলাম।
দেখিয়া আমি বুঝিলাম, পরস্পরোপরি বহ্নি
আছে। কিন্তু আমার ভৃত্য তাহা বুঝিল
না, অথবা বহ্নিসত্তাবে অবিশ্বাস বা সন্দেহান-
হইল। কাজেই আমাকে এখন পরার্থা-
হুমানপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইল। তাহা
অন্ত কিছু নহে, তাহা একপ্রকার বাক-
প্রপঞ্চ। সেই বাকপ্রপঞ্চ = একটি পাঁচ-
বিভাগে বিভক্ত মহাবাক্য। প্রথম বিভাগের
নাম প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয় বিভাগের নাম হেতু,

তৃতীয় বিভাগের নাম উদাহরণ, চতুর্থ বিভাগের নাম উপনয়, ও পঞ্চম বিভাগের নাম নিগমন। এই সকল বিভাগের অপর নাম অবয়ব। অবয়বপঞ্চকের ক্রমিক উল্লেখ এইরূপ

১। নিশ্চয়ই পর্ত্তোপরি বহু আছে।

২। কেন না, ধূম দেখা যাইতেছে।

৩। ধূম থাকিলে তদ্বৎলে বহু থাকে, ইহা পাকশালা প্রভৃতি দলে দেখিলাম।

৪। পর্ত্ততেও ধূম দেখা যাইতেছে।

৫। যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, সেই-

হেতু ঐ স্থানে বহুও আছে।

ইহারই নাম পরার্থাভুমানপ্রণালী। ইহারই নাম পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়, এবং ইহারই প্রাপক গৌতমের দর্শন।

পঞ্চাবয়ব জ্ঞায়, এই কথায় আর একটি ভাব্যাকারী কথার মনে পড়িল। ভাব্যাকার বলিয়াছেন, গৌতমের পূর্বে জ্ঞায়ের দশ অবয়ব প্রচলিত ছিল। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচ অবয়বের অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা, সংশয়, পক্ষাপ্রাপ্তি, প্রয়োজন ও সংশয়-নিরাস, এই পাঁচ নামের আর পাঁচটি অবয়ব ব্যবহার করিতেন। এই সংবাদ ষাঁহার জানেন, তাঁহার ইহাও জানেন যে, গৌতমের পূর্বেও জ্ঞায়শাস্ত্র ছিল। কাজেই বলিতে হয়, ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে গৌতমকে আদি-শীমার স্থাপন করিলে অবশ্যই তাহা ভ্রম-কল্পিত হইবে। অপর কথা এই যে, গৌতম যেমন দশাবয়ববাদীর মত মনোনীত করেন নাই, সেইরূপ বেদান্তিগণও, পঞ্চাবয়ববাদী গৌতমের মতও মনোনীত করেন নাই।

বেদান্তীরা বলেন, তিন অবয়বেই অল্পমান-প্রক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয়, সুতরাং আর দুই অবয়বের অঙ্গীকার বুধা। যদি প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, এই তিন, অথবা উদাহরণ, উপনয়, নিগমন, এই তিন^১ অবয়বদ্বারা অল্পমিতিকার্য্য নির্বাহিত হয়, তাহা হইলে অধিক অবয়বের কল্পনা অবশ্যই বুধা হইবে। যাহাই হউক, কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, আমরা গৌতমের শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া, জ্ঞায়বিজ্ঞানে বঞ্চিত আছি; গৌতমের শাস্ত্র না পড়ায় আমরা তৎপ্রকাশক বাক্য-কোশলে যাত্রা বঞ্চিত আছি, ফলাংশে বঞ্চিত নহি। আমরা আবালবৃদ্ধবৃথা সকলেই, অধিক কি, পণ্ডপক্ষীরাও যতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

প্রতিদিনই আমরা নানাপ্রকার ন্যায়ের অবতারণা করিয়া থাকি, অথচ জিজ্ঞাসিত হইলে বলি, “আমরা ন্যায় পড়ি নাই, ন্যায় কি, তাহা আমরা জানি না।” এইমাত্র আমি এখানে আসিবার সময় পথিমধ্যে ক্রীড়মান বালকদিগের মুখ হইতে—“ঝড় উঠিলে; কেন না, ঝোড়োঝোড়ে মেঘ হইয়াছে; ঝোড়ো-ঝোড়ে মেঘ হইলেই ঝড় হয়;”—এইরূপ এই-রূপ ন্যায়বাক্য কহিতে শুনিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বলিতে হয়, মনুষ্য ন্যায় না পড়িলেও নৈয়ায়িক—যতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক। বলিতে পারেন যে, তবে তাহার শাস্ত্র কেন? সে কথায় প্রকৃত্তর এই যে, বুদ্ধিপরিমার্জন, উৎকৃষ্টতার উদ্দীপন, ন্যায়াদর্শের বিস্তৃতি, তাহার ব্যবহার অর্থাৎ শিথিবার ও শিথাইবার পদ্ধতিপ্রচার, এইরূপ এইরূপ প্রয়োজনসাধনের জন্যই শাস্ত্র, ন্যায়শক্তি স্বজন করিবার

জনা নহে। নারায়ণের মূর্ত্যাদি নহে, তাহা প্রকৃতির সৃষ্টি। এইজন্যই বলিতে হয়, শাস্ত্র কেবল সংজ্ঞা, পরিচায্য ও তাহার প্রয়োগকৌশলদিগ উপদেশ করে, অন্য কিছু করে না। ‘আমরা এমন অনেক জিনিষ জানি, তাহার জ্ঞান থাকিতেও, আমরা নাম জানা না থাকায় লোককে বলিতে বা পরিচয় দিতে পারি না, এবং বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দাদি জানা না থাকায় তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। যিনি জিনিষ চেনেন, অথচ নামাদি জানেন না, তিনি তাহা বুঝাইতে বা উপদেশ করিতে অশক্ত। যিনি সংজ্ঞা-পরিচায্যাদি-বর্টিত শাস্ত্র জানেন, অথচ জিনিষ চেনেন না, তিনিও বস্তুর উপদেশের অযোগ্য। কেন না, তাৎপর্য ব্যক্তির উপদেশ অনেক সময়ে বিপরীতই হইয়া থাকে।

একথা এক বেদান্তের ছাত্র “স গুরুম্ অভিসরেৎ প্রোক্তিঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্” এই ক্রত্যাংশ পড়িবার সময় প্রশ্ন করিল—“গুরু বিশেষণে ব্রহ্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ এই দুই কথা কেন? কেবল ব্রহ্মজ্ঞের অথবা কেবল শাস্ত্রজ্ঞের নিকট গেলেই ত শিষ্যের অভিষ্টলাভ হইতে পারে।” গুরু বলিলেন—“তাহা পারে না। কারণ এই যে, বুঝাইবার উপযুক্ত বাস্তবপ্রপঞ্চ জানা না থাকিলে গুরু আপনায় ব্রহ্মজ্ঞান শিষ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন না এবং বাস্তবপ্রপঞ্চ জানা থাকিলেও ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সত্যাবে তিনি হস্ত পিছ্যকে ব্রহ্মের পরিবর্তে অত্রকই বুঝাইবেন।”

কেবল-শাস্ত্রজ্ঞের উপদেশ অনেক সময়ে মরুবাসী অধ্যাপকের উপদেশের অনুরূপ হইয়া থাকে। অনেক মরুবাসী অধ্যাপক

কোষগ্রন্থ পড়াইতেছিলেন। যে অংশে নারিকেলবৃক্ষের নাম-নিবন্ধদি বর্ণিত আছে, সেই অংশ পড়াইবার সময় ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, “নারিকেলগ্রন্থ কিরূপ?” অধ্যাপক শাস্ত্র বাতীত চক্ষে নারিকেলগ্রন্থ দেখেন নাই; কোন লোকের মুখে শুনিয়াছেন, নারিকেলগ্রন্থ পূর্ববাংলার জন্মে। তিনি বলিলেন—“স তু প্রাণেশ্বরগতাবিশেষঃ।” অতএব যে গুরু, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশাস্ত্র, উভয়ই বিদিত থাকেন, সেই গুরুই ব্রহ্ম-উপদেশের যোগ্য-পাত্র। তাই আমার বক্তব্য, কেবল জ্ঞান ব্যবহার বাতীত পরকীর ব্যবহারের অগ্রপণোণী। কানেই বুদ্ধিতে হইতেছে, আমরা স্বতঃসিদ্ধ নৈসর্গিক হইলেও শাস্ত্র-শিক্ষিত নৈসর্গিক নহি। তাহা নহি বলিয়াই আমরা বিভ্রান্ত হইলে বলি - “আমরা নৈসর্গিক নহি, ভ্রান্ত কি, তাহা জানি না।” আমাদের ন্যায় জানি না বলা, আর কোন এক বিশেষবাসী অভিনেতার গল্প জানি না বলা প্রায় সমান। অনেক বিশেষবাসী অভিনেতা রঙ্গস্থলে আসিয়া বলিয়াছিলেন, “কি আশ্চর্য! আমি বিশ্ববাসর পর্য্যন্ত গল্পে কথা কহিরা আসিয়াছি, অথচ গল্প কি, তাহা জানিতাম না।” এই ব্যক্তি যেমন গল্পগল্প-বিভাগের নামলক্ষণাদিশিক্ষার পর আশ্চর্য হইয়াছিল, সেইরূপ আমরাও ন্যায্যশাস্ত্র পড়ার পর আশ্চর্য হইতে পারি।

এ বিষয়ে আর অধিক এসক্তান্ত্রপ্রসক্ত কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের পুনরাগোচনা করা বাউক।

পূর্য্যাহুমানপ্রণালীর নাম ন্যায়। এ কথা আমার কর্মজ্ঞত কথা নহে; ইহা তাত্ত্বিক

কারীর কথার অসূবাদ । ভাষাকার বাস্তবান বলিয়াছেন—“প্রমাতৈগের্ধপত্রীক্ষণঃ ন্যায়ঃ । ঐত্যাক্ষাণমাপ্রিত্তমহ্মানম্ । সা অধীক্ষা ; তদ্বা প্রবর্ত্তত ইতি “আদীক্ষিকী ন্যায়বিজ্ঞা ন্যায়শাস্ত্রম্ ।” কতকগুলি প্রমাণদ্বারা, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচ প্রমাণত্বলা প্রমাণের দ্বারা পদার্থনির্ণয় করার নাম ন্যায় ; তাহাই অহ্মান ও অধীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ ।

বলা বাহুল্য যে, অবিরুদ্ধ অহ্মানই জ্ঞায়, অজ্ঞতা তাহা জ্ঞায়াতাস । বার্তিককার উক্তোক্ত-কর “প্রমাতৈগের্ধপত্রীক্ষণঃ জ্ঞায়ঃ” এই ভাষ্যোক্ত কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রতিজ্ঞা = পদ্যপ্রমাণত্বলা, হেতু = অহ্মানপ্রমাণ-ত্বলা, উদাহরণ = প্রত্যক্ষত্বলা এবং উপনয় = উপমানপ্রমাণের সদৃশ । অবশেষে বলিয়াছেন, নিগমননামক পঞ্চম অবরবে ঐ সকলের একত্র সমাহার বা সমাবেশ দেখান হয় । এবং বিধ জ্ঞায় যথাযথরূপে গ্রহীত হইলে জ্ঞাতব্য-পদার্থের তব সমাক্রুতপে নিগীত ও তদ্বিবয়ক ত্রয়প্রমাণঃসংগাতি । নিবাহিত হয় । কি ঐহিক কুবিবাহিষ্ঠাদি, কি পারলৌকিক স্বর্গ, অপূর্ণ ও দেবতাদি, কি অশবর্ণগ্রন্থ আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি, সমস্ত তবই এই জ্ঞায়বিজ্ঞার বিবয় । অতএব জ্ঞায়বিজ্ঞা বা জ্ঞায়ের শাস্ত্র যে কেবল কটিকার শাস্ত্র, তাহা নহে । যে মহামুনি তাপূষ মহোপকারী শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইহলোকে কল্মষদ্বারিণী কীটপিত্তাকা উজ্জীন করিয়া গিয়াছেন, সেই মহামুনি যে এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের কোন্ অংশের লোক, তাহা ঠিক বিদিত হইবার উপায় নাই । অহ্ম-
• সকল প্রারম্ভ কারণে দেখা যায় বা পাওয়া

যায়, গৌতমের নামে গোত্র, স্মৃতিসংহিতা ও জ্ঞায়দর্শন প্রকৃতি প্রচারিত আছে । রামায়ণাদি-গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, অলম্ব্যাপতি গৌতম । আবার আধুনিক-বহুগ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ গৌতম ছিলেন । এই সকল গৌতম এক ব্যক্তি কি বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা যথাযথ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । কেবল বৌদ্ধ-গৌতমকেই পৃথক্ বলিয়া স্থির করা যায় ; অবশিষ্ট গৌতম সন্দেহদোলায় দোলায়িত হইতে থাকেন । তাহাই হউক, জ্ঞায়দর্শনলেখক গৌতমের বিবয় অহ্মসকানে গাহা পাওয়া যায়, তাহা এতৎস্থলে কথিত হইতেছে ।

জ্ঞায়ভাষ্যকার বাস্তবান ও তথ্যাস্তিক-কার উক্তোক্তকর্মিষ্র ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমকে অক্ষপাদ ও কথি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । যথা—

“গোহক্ষপাদমুণিঃ ন্যায়ঃ প্রত্যভাৎ ববভাৎ ববম্ ।

তত্র বাস্তবান ইনঃ ভাষ্যজাতবস্তবঃ ।”

বাস্তবান ।

‘ববক্ষপাদঃ প্রবক্তাঃ সুনীনাঃ

সম্যক শাস্ত্রঃ ভগতো ভগদান ।

কৃত্যকিকাত্মানিগৃহিতৈঃতোঃ

কল্পিতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ ।”

কোন কোন পুরাণেও ন্যায়দর্শনকার গৌতমকে অক্ষপাদ বলিতে দেখা যায় । যথা—

“অক্ষপাদশ্রুতে চ কাশ্যে সাংখ্যযোগজোঃ ॥” ইত্যাদি ।

এখন বিবেচনা করুন, যেমন দর্শনকার গৌতম অক্ষপাদসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, এক্ষণে গোত্রকার ও স্মৃতিকার গৌতম কুজাপ অক্ষপাদবিশেষণে বিশেষিত হন নাই । তাহা না হওয়ায়, নিম্প্রত্যয়ককে এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, স্মৃতিকার ও গোত্রকার

গৌতম হইতে দর্শনকার গৌতম ভিন্ন ব্যক্তি ।

গৌতমের অক্ষপাদ নাম কেন? এ সম্বন্ধে জনবাদ এই যে, ইনি কোন এক শিবোর প্রতি কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার সমুখ হইতে ঘুর দ—এ চক্ষে আর তোকে দেখিব না।” শিবা গুরুকষ্টক অভিশপ্ত হইয়া গুরুতর মনস্তাপে কষ্ট পাইতে লাগিল। পরে বহু আরাধনার পর তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি বলিলেন, “আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অস্তথা হইবে না; পরন্তু আজ হইতে তোকে আমি পদযাত্রা দর্শন করিব।” এতদুপলক্ষ্যেই তাঁহার পাদপ্রদেলে অক্ষি অর্থাৎ চক্ষু আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি তদবধি অক্ষপাদ আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এ জনবাদের কোন মূল আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। আমাদের বোধ হয়, আমরা এখন যেমন কোন অতিসতর্ক লোক দেখিলে বলি, লোকটার পিছুদিকে ও সাতটা চোখ; বোধ হয়, পূর্বকালের ব্রহ্মবিদ্যা ইহাকে বংগয়োনাতি বুদ্ধিমান দেখিয়া ‘পারেও চক্ষু অর্থাৎ দর্শননাথন ইন্দ্রিয়’, এতদর্থে অক্ষপাদনাম প্রচার করিয়াছিলেন। বাহাই হউক, গোত্রকার, স্মৃতিকার ও দর্শনকার গৌতম যে একই ব্যক্তি, তাহা নহে।

এই অক্ষপাদ যে দেশে বাস করিতেন, সে দেশ নিঃসম্বন্ধরূপে নির্ণীত হয় না। বর্তমান ছাপরাঙ্গেলার মধ্যে গৌতমশ্রম নামে এক অরণ্যকর স্থান আছে। সে দেশের প্রবাস এই যে, মহাবি গৌতম উক্ত স্থানে থাকিয়া জ্ঞানদর্শন রচনা করিয়া-

ছিলেন। ঐ স্থানে বৎসর বৎসর গৌতমের নামে একটি মেলা হইয়া থাকে। অনধিক ৪০ বৎসর হইল, অনেকগুলি ভ্রমশ্যুক একত্র হইয়া উক্ত স্থানে একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে অনৈক নৈসর্গিক ও কতিপয় ছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্তে বাস করিতেছেন। ঐ স্থান যদি সত্যসত্যই অক্ষপাদ-গৌতমের জন্মস্থান বা বাসস্থান হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি, অহল্যাপতি গৌতমই অক্ষপাদ। কেন না, রামায়ণের ও মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে ঐ স্থান অহল্যাপতি গৌতমের বাসস্থান বলিয়া অনুভূত হয়।

গৌতম ও তৎপ্রণীত জ্ঞানদর্শন কত পুরাতন, তাহা অম্বাদির দ্বন্দ্বের। ইহার আবির্ভাবকালসম্বন্ধে বিনা যেরূপকার অনুমান করেন করুন, অযাতিচরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। একদিকে দেখা যায়, যহু যে অত পুরাতন, তাহার গ্রন্থেও আদৌ ক্ষীণ বিস্তার উল্লেখ আছে। আবার অপরদিকে দেখুন, ক্ষণভঙ্গবান প্রভৃতি অধস্তন অনার্যমতেরও আভাস গৌতমের গ্রন্থে রহিয়াছে। অতএব গৌতমের কালনির্ণয়ের স্তম্ভ প্রশাসবাহল্য স্বীকার করা বৃথা। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, কপিলের ও কণাদের দর্শনের পর গৌতমের দর্শন। বোধ হয়, দর্শনগুলির পৌরোপধ্যাক্ষরনিরূপে প্রাপ্ত “কপিলন্ত কণাশ্রম গৌতমন্ত পতঙ্গলোঃ” শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। অতঃপরে বক্তব্য এই যে, কপিলের পর গৌতম, এ কথা অসম্ভব, পরন্তু কণাদের পর গৌতম, এ কথা সম্ভব।

গৌতমদর্শনের ভাষ্যলেখক বাৎস্যরন।
 বাৎস্যরনের পূর্বে আর কেহ জায়ভাষ্য
 লিখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বিদিত
 নহি। যে মহাপুরুষ একদম্পে চাণক্য-
 পণ্ডিত নামে পরিচিত, সেই মহাপুরুষেরই
 অল্প নাম বাৎস্যরন। ইহার আরও সাতটি
 নাম আছে; যথা—

“বাৎস্যরনো মনবাসঃ শৌচিলাচণকাস্বরঃ।

জামিনঃ পক্ষিলাখ্যো বিকৃতগোহুলকৃসঃ॥”

অতএব এই চাণক্যপণ্ডিতই নীতিশাস্ত্রের
 বিকৃণ্ডন বা বিকৃশর্গা, মনশাস্ত্রের কোটীলা
 এবং নায়ভাষ্যের বাৎস্যরন। প্রাচীন
 যুজ্জরাঙ্গস নাটকে চাণক্যের প্রায় সকল
 নামই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পক্ষিলাখ্য
 নামটি নানাপ্রস্তলেখক বাচস্পতিমিশ্রই
 ব্যবহার করিয়াছেন। চাণক্যাপরনামা
 বাৎস্যরন অনান ২৫০০ বৎসর পূর্বে মগধ-
 দেশ অলঙ্কৃত করিয়া জীবিত ছিলেন।

ইনিই প্রাচীন নন্দবংশের ধ্বংসকর্তা ও
 মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই চন্দ্রগুপ্ত-
 নামক মৌর্যপুঙ্জক নন্দবংশীয় সিংহাসনে
 অবিস্রুত করান। ইহার কালনির্ণয়সম্বন্ধে
 হুরোপীয় পণ্ডিতগণ শাহা বলেন বগুন,
 একদম্পের পণ্ডিতদিগের মতে ইনি অনান
 ২৫০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইহার
 কৃত নায়ভাষ্যের বার্তিকলেখক উজ্জৈতকর-
 মিশ্র। উজ্জৈতকর মিথিলাবাসী ছিলেন।
 ইহার বার্তিকপাঠে জানা যায়, তৎপূর্বে
 নায়ভাষ্যের উপর অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ
 বিদ্যমান ছিল। উজ্জৈতকরের বার্তিক-
 আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল ভাষ্যব্যাখ্যাকার
 বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ব্যাখ্যা-

কার দিঙ্‌নাগচাণ্য। মহানহোপাধ্যায়
 বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন “যে, দিঙ্‌নাগের
 দুইব্যাখ্যা প্রচারিত দেখিয়াই উজ্জৈতকর
 তৎসংশোধনার্থ বার্তিক প্রণয়ন করেন। কালি-
 দাসের মেঘদূতকাব্যের টীকার এক দিঙ্‌-
 নাগের উল্লেখ দেখা যায়, সে দিঙ্‌নাগ
 নায়ভাষ্যাব্যাখ্যাকার কি না, আমরা নিশ্চয়
 করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, দিঙ্‌নাগ
 এক বৌদ্ধপণ্ডিত। তিনি বিক্রনামিত্যের সম-
 কালিক। অন্যো বলেন, তিনি ১৭০০ বৎসর
 পূর্বে জীবিত ছিলেন এবং তিনিই নায়-
 ভাষ্যের ব্যাখ্যলেখক। এই শেষোক্ত মত
 সত্য হইলে বলিতে পারা যায়, মৈথিল
 উজ্জৈতকর ১৭০০ বৎসরের কিছুকাল পরে
 মিথিলাজনপদে প্রাহুত হন। দিঙ্‌নাগ
 বৌদ্ধ ছিলেন, সেজন্য তাহার ব্যাখ্যা
 বৌদ্ধমতানুযায়ী হইয়াছিল; কাজেই উজ্জৈত-
 করের নিকট তিনি কৃত্যাকিক ও তাহার
 ব্যাখ্যাও কৃত্যাক্য। তাই তিনি লিখিয়া
 গিয়াছেন—

“কৃত্যাকিকাজননিবৃতিহেতাঃ

করিত্যে তত্র ময়া নিবৃত্তঃ।”

মহানহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র উজ্জৈত-
 করকৃত বার্তিকের উপর তাৎপর্য্যান্বী টীকা
 প্রণয়ন করেন। ইনিও মৈথিল এবং ইহার
 স্থিতিকাল আনুমানিক ৮০০ বৎসর অতীত
 হইয়াছে। ইহার পরে ইহারই কৃত নায়-
 বার্তিক-তাৎপর্য্যটীকার উপর তাৎপর্য্যান্বী
 টীকা মহানহোপাধ্যায় উদক্কাচার্য্যকর্তৃক
 লিখিত হয়। ইহার পরে আর কেহ
 সমগ্র নায়দর্শনের বিবৃতিচেষ্টা করেন
 নাই। মিথিলাবাসী বংশে এবং সমগ্র-

মিশ্র প্রভৃতি এবং বঙ্গবাসী রম্যনাথ, গদাধর, লগনবীণ ও মধুরেশ প্রভৃতি বাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বৈশেষিকদর্শনের সমধিক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। গৌতমদর্শনের উন্নতি হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না, তবে প্রসঙ্গসিদ্ধিনায়ে গৌতমদর্শনেরও কোন কোন অংশ উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছে। বৈশেষিকশাস্ত্রের সহিত গৌতমোক্ত শাস্ত্রের বহু অংশে মিল বা ঐক্য থাকায় বৈশেষিকের দ্বিত্বারে গৌতমোক্ত শাস্ত্রের বিস্তার প্রসঙ্গসিদ্ধ।

গৌতমদর্শন ষোলপ্রকার পদার্থের উপর অবতরিত। সে সকলের নাম এই—প্রমাণ, প্রমের, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল, বিতণ্ডা, হেতুভাঙ্গ, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান। এই সকল পদার্থের আবার অবান্তর বিভাগ আছে। উপরোক্ত মহানহোপাধ্যায়দিগের দ্বারা প্রায় সকল বিভাগই উন্নত হইয়াছে।

কেবল বাদ, জল, জাতি, শরীর, ইঞ্জির ও প্রত্যভাব অর্থাৎ জন্মান্তর, এই কয় বিভাগ কিছু অবিকৃত রহিয়াছে। বাদ, জল, বিতণ্ডা, এই তিন বিভাগের মধ্যে বিতণ্ডা-বিভাগ এক বিবৃদ্ধ হইয়াছে যে, সে বুদ্ধি বোধ হয় চূড়ান্তসীমা অতিক্রম করিয়াছে।

গৌতমের দর্শন অতি গভীর ও সর্বব্যাপী হইলেও সূত্রের দ্বারা প্রণীত হওয়ার, প্রথমতঃ বোধ হয় গৌতমের দর্শন অতি সংক্ষিপ্ত। পরন্তু সে সকল সূত্র সূক্ষ্মাসূক্ষ্মরূপে বৃদ্ধিতে গেলে তখন আর সংক্ষিপ্ততা থাকে না। ততই চিন্তা করা যায়, ততই তাহা বিস্তৃত হইতে থাকে। তাদৃশ ৩২১ সূত্রের দ্বারা

বিশাল জ্ঞানদর্শন প্রস্তুত করিয়া মহাবী অক্ষপাদ যার পর নাই ক্ষমতাসিকার দেখুইয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভাবধি কোথাও তিনচার হুত্রে, কোথাও বা উদধিক হুত্রে এক এক প্রত্যাব সমাপ্ত করিতে দেখা যায়। প্রত্যাবগুলির অপর নাম প্রকরণ। তাদৃশ প্রকরণের কতিপয় কতিপয় প্রকরণে এক এক আদ্রিক। তাদৃশ আদ্রিকের দুই দুই আদ্রিকে এক এক অধ্যায় এবং তাদৃশ অধ্যায়ের পাঁচ অধ্যায়ে গৌতমের দর্শন সমাপ্ত।

উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে অনূন অশীতিসংখ্যক প্রকরণ বা প্রত্যাব আছে। সেগুলি এই—শাস্ত্রের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রমাণলক্ষণ, প্রমেরতত্ত্ব, জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ, জ্ঞানাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তের আকার, জ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞানের উত্তরান, জ্ঞানাহুগত কথা, যেপ্রকার হেতুতে সাধনীয় বিষয় সিদ্ধ হয় না সেই সকল হেতুর বিবরণ (ইহারই শাস্ত্রোক্তনাম হেতুভাঙ্গ), ছল, অশক্তিভূলক দোষ অর্থাৎ আপত্তিবিবাস ও অন্তের উদ্ভাবিত তর্কের দোষ দেখাইতে না পারা, সংশয়, প্রমাণ-সামান্য, প্রত্যক্ষপ্রমাণ, অবয়বী, অল্পমান-প্রমাণ, বর্জমানতাব, উপমানপ্রামাণ্য, শব্দসামান্যপরীক্ষা, চকুরিঞ্জির এক, মন ও বাস্মা বিভিন্ন, বাস্মা অনাদিনিধন, শরীরোৎপত্তি ও ইঞ্জিরপরীক্ষা, ইঞ্জির অনেক, ইঞ্জিরের বিধর বা প্রচারস্থান, বুদ্ধি বা জ্ঞান নিত্যপদার্থ নহে পরন্তু অনিত্য-পদার্থ, ক্ষণভঙ্গবাদ, বুদ্ধি ও বাস্মার ভগ্ন, বুদ্ধি উৎপত্তপ্রকরণসিনী, বুদ্ধি শরীরের ধর্ম নহে, মনঃপরীক্ষা, শরীর অদৃষ্টাভাসারে

উৎপন্ন হয়, প্রবৃত্তি ৩ দোষসামান্য, দোষপত্রীক্ষা, জন্মাজর, শূন্যবাদনিরাপ, ঈশ্বর জগতের মনুষ্যবাদ, জগৎ আকর্ষক নহে, সমস্ত বস্তু অনিত্য নহে, সমস্ত বস্তু নানাস্বক নহে, সর্বশূন্যবাদনিরাপ, কলপপত্রীক্ষা, দ্বৈত-বৃত্তান্ত, মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, অবদ্বয় ও অবদ্বয়ী, নিরবদ্বয় বস্তু, বাহ্যবস্তু, তত্ত্বজ্ঞান-বৃত্তি, তত্ত্বজ্ঞানপালন, কেহ কোন হেতু প্রদর্শন করিলে তবিরুদ্ধে হেতুত্বের উদ্ভাবন করা (ইহার শাস্ত্রীয় নাম সংপ্রতিপক্ষ), ২৪প্রকার জাতি অর্থাৎ বাদীর উক্তিভেদে যে দোষ থাকে

সেই দোষ বাদীকে দেখান, অভিন্নত বাক্য-ধর্মের অপ্রতিপাদক পদার্থ, এবং ২২প্রকার নিগ্রহস্থান অর্থাৎ পরাজয়ের স্থান। গৌতমের গ্রন্থে এই সকল প্রস্তাব আছে এবং প্রস্তাবসকল অতি গ্রন্থবালীভেদে নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

এই সকল প্রকরণে যে যে বিষয় গৌতম-কর্তৃক অভিহিত হইরাছে, সে সকল একপ ব্লককার প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হুঃসাধ্য। সেই-জন্য আমি এইস্থানেই অল্পকয় পাঠ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীকালীদাস বেদান্তবাগীশ ।

পাগল ।

পশ্চিমের একটি ছোট সহর। মগুধে বড়রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ খোবার ইঙ্গিতের মত আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ীর ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লম্বুচঞ্চল ঘন পল্লবভার, সবুজ মেথের মত, জুপে জুপে নড়িত করিয়া রহিয়াছে। চালগলার তাল ডিটার উপরে ছাগলছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত বনশ্রেণীর ভ্রামলতা।

আজ এই ছোট সহরটির মাঝার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবশস্তন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরী লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি,

তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মুষ্টি ধরিয়া হঠাৎ কখন আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা ভাগ্যে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু বধন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধুহাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আঘাতের মাঝখানে এক দিনের জ্যোতির্ময় অবকাশ, তুমিয়ার শুভ-মেঘমালাঘটিত ক্ষণিক অভ্রাদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরী কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করি-

নাম না—আজ আমি বর্তমানের কাছে বিকসিলাম !

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহার কিছুই দাবী করে না ;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিবা গাঁথিরা-গাঁথিরা অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো-একবার না দিবা একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাকপুত্রের স্তায় আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন বৃহত্তর মধ্যে এতদিনকার সমস্ত ‘খেই’ হারাইয়া যায়—তখন বীথানিরম এবং বাধা-কাজের পক্ষে বড়ই মুক্তিলাভে ।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়দিন :—এই অনিরমের দিন, এই ভুলের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অস্তদিন-গুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর, একএকটা দিন পূরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগলমন্ডটা আমাদের কাছে ঘৃণার সম্বন্ধ নহে। ক্যাপা নিমাইকে আমরা ক্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের ক্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা ক্যাপামির এক-প্রকার বিকাশ কি না, এ কথা লইয়া যুরোপে বামাদ্বেবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ কথা গীকার করিতে সূচ্যিত হই না। প্রতিভা ক্যাপামি বই কি, তাহা নিম্নের ব্যতিক্রম,

তাহা উলটপালট করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই ঝাপছাড়া, সূচ্যিত দিনের মত হঠাৎ আসিয়া বত কাজের পোকেই কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে—কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিরা-কুঁদিয়া শুষ্ক হইয়া উঠে !

ভোগানাদ, তিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন ঝাপছাড়া ! সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধোত নীলাকাশের যৌৱনাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের স্তম্ভপিত্তের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমক বাজিতেছে। আজ যুক্তার উল্লস স্তম্ভমুখি এই কণ্ঠনিরত সংসারের হাঙ্গামানে কেমন নিস্তক হইয়া আসিয়া গাঁফাইয়াছে !—সুন্দর লাভজীবী !

ভোগানাদ, আমি জানি, তুমি অমৃত ! জীবনে কণে কণে অতি অমৃত রূপেই তুমি তোমার ভিকার কুলি লইয়া আসিয়া গাঁফাইয়াছ ! একেবারে হিসাবকিতাব নাতানাবুৎ করিয়া দিয়াছ। তোমার নমিভূমির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহার তোমার সিঁড়ির এসাদে যে এককোঁটা আমাকে দেখে নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতেই আমার বেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভুল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

‘আমি জানি, হুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যাহার অতীত। হুখ শরীরের কোথাও পাছে খুলা লাগে বলিয়া সূচ্যিত, আনন্দ খুলা গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া

দেব—এইজন্য হুখের পক্ষে ধূলা হেব, আন-
ন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ । হুখ, কিছু পাছে
হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, বখাসকণ বিত-
রণ করিয়া পরিতৃপ্ত ; এইজন্য হুখের পক্ষে
রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই
ঐশ্বর্য । হুখ, ব্যবহার, বন্ধনের মধ্যে আপ-
নার ঐচ্ছিক সতর্কভাবে রক্ষা করে ;
আনন্দ, সংসারের নৃষ্টির মধ্যে আপন সৌন্দ-
র্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে ; এইজন্য হুখ
বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন
করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে ।
হুখ, প্রাণটুকুর মত তাকাইয়া বসিয়া থাকে,
আনন্দ, হুখের বিধকে অনায়াসে পরিপাক
করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালটুকুর
দিকেই হুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের
পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান ।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন,
যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা ধামধাম গিনিই
আনিয়া উপস্থিত করেন । তিনি কেব্রাতিগ,
“সেটি হ্যাগল”—তিনি কেবলি নিখিলকে
নিয়মের বাহিরের . দিকে টানিতেছেন ।
নিয়মের সেবতা সংসারের সমস্ত পথকে
পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা
করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে
আকিঞ্চ করিয়া উত্তরোত্তর বৃহদায়মান
পাকওয়ারা কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতে-
ছেন । এই পাগল আপনার বেয়ালে সরী-
সৃপের বংশে পানী এবং বানরের বংশে
দাহু উদ্ভাবিত করিতেছেন । বাহা হইয়াছে,
বাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িত্বপে রক্ষা
করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা
রহিয়াছে—হিনি সেটাকে ছারখার করিয়া-

দিয়া, বাহা নাই, তাহারি জন্য পথ করিয়া
দিতেছেন । ইহার হাতে বাণী নাই, সাম-
ন্তস্যের আর ইহার নহে, পিনাক ব্যক্তিয়া
উঠে, বিধিবিহিত বস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়, এবং
কোথা হইতে একটি অপূর্ণতা উজ্জ্বল-আদিয়া
জুড়িয়া বসে । পাগলও ইহারি কীর্তি এবং
প্রতিভাও ইহারি কীর্তি । ইহার টানে বাহার
তার ছিড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর বাহার
তার অশ্রুতপূর্ণ হুখে ব্যক্তিরা উঠে, সে হইল
প্রতিভাবান । পাগলও দশের বাহিরে,
প্রতিভাবানও তাই—কিন্তু পাগল বাহিরেই
থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান দশকে একা-
দশের কোঠার টানিয়া-আনিয়া দশের অধি-
কার বাড়াইয়া দেন ।

তবু পাগল নব, তবু প্রতিভাবান নর,
আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার
মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তাহার অলঙ্কটাকলাপ
লইয়া, দেখা দেয় । সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির
মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, দাহুয়ের
মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে
আগিয়া উঠে । তখন কত সুখিলনের
আল লগতত্ত, কত জনের সখ্য ছারখার
হইয়া যায় ! হে ক্রত, তোমার ললাটের যে
ক্ষকধক্ অশিষিয়ার ফুলদ্বারা অন্ধকারে
গৃহের প্রাণীপ আলিঙ্গা উঠে—সেই শিখাতেই
লোকালয়ে সহস্রের হাহাকারনিত্তে নিশীথ-
রাতে স্রববাহ উপস্থিত হয় ! হায়, দাহু,
তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম
পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ
উৎকিষ্ট হইয়া উঠে । সংসারের উপরে
প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্য
তাণ একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ

হৃদয়েরই প্রবল আধাতে হুম ভাঙাকে ছিন্ন-
বিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে
অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত
করিয়া শক্তির নব নব শীলা ও সৃষ্টির নব নব
মুষ্টি প্রকাশ করিয়া তোলে। পাগল, তোমার
এই রক্ত আনন্দে শোণ দিতে আমার জীত
হৃদয় বেন পরাশ্রয় না হয়! সংহারের রক্ত-
আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদীপ্ত
চতীরনেত্র বেন প্রবলোক্তিতে আমার
অস্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে!
মৃত্যু কর, হে উদ্ভাস, মৃত্যু কর! তাহারই
সূৰ্য্যবেগে আকাশের লক্ষকোটিবোজনব্যাপী
উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ব্রাহ্মাণ হইতে
ধাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভরের
আক্ষেপে বেন এই রক্তপসীতের তাল কাটিয়া
না যায়! হে মৃত্যুহর, আমাদের সমস্ত
ভাল এবং সমস্ত মনের মধ্যে তোমারই
অব হউক!

আমাদের এই ক্যাপাদেবতার আবির্ভাব
যে কণে কণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইহার
পাণ্ডাশি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা
কণে কণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহ-
রহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে
মন্দ উজ্জল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয়
মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই,
তখন রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে
মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে লাগিয়া
উঠে।

আমিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের
মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মুষ্টি
লাগিয়াছে। সমুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়ো-
চাল-দেওয়া মূদীর দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা,

ঐ সরু গলি, ঐ গাছা-গালাচলকে প্রতিমিত্রের
পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়া-
ছিলাম। এইজন্য উহার আঁনাকে বন্ধ করিয়া
কেলিয়াছিলাম—রোদ এই কটা জিনিষের
মধ্যেই নম্রবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।
আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে।
আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন
পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভাল করিয়া
দেখিতেছিলামই না। আজ এই বাহ্য-কিছু
সমস্তকেই দেখিয়া দেখ করিতে পারিতেছি
না। আজ সেই সমস্তই আমার চারিদিকে
আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া
রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে
পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এই-
খানেই ছিলেন,—সেই অপূর্ণ, অপরিচিত,
অপরূপ, এই মূদীর দোকানের খোড়ো-
চালের প্রেক্ষিকে মগ্নতা করেন নাই—
কেবল, যে আলোকে তাহাকে দেখা যায়,
সে আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না।
আজ আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সমুখের দূত, ঐ
কাছের জিনিষ আমার কাছে একটি বহু-
সুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার
সঙ্গে গৌরীশঙ্করের সুবাসবেষ্টিত দুর্গমতা,
মহাসমুদ্রের তরঙ্গকল হস্তরতা আপনাদের
সঙ্গাতির জ্ঞাপন করিতেছে।

এবুনি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে
পারা যায়, বাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না
পাতাইয়া বসিয়াছিলাম, সে আমার ঘরকন্নার
বাহিরে। আমি বাহ্যকে প্রতিমূহূর্তের
বাধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া
ছিলাম, তাহার মত দূরত হৃদয়ত জিনিষ
কিছুই নাই। আমি বাহ্যকে ভালরূপ জানি

মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমানা
আঁকিয়া-দিয়া ব্যস্তিরজমা হইয়া বসিয়া
ছিল। সে. সেলি, কখন একমুহুর্তে সমস্ত
সীমানা পার হইয়া অপূর্ণরহস্তম্বর হইয়া
উঠিয়াছে। বাহাকে নিঃশব্দে দিক্ দিয়া,
স্থিতির দিক্ দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ
দস্তরসমস্ত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ
হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক্ হইতে, ঐ
অশানচারী পাগলের তরফ হইতে, হঠাৎ
দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না--
আশ্চর্য! ও কে! বাহাকে চিরদিন জানি-
রাছি, সেই এ কে! যে একদিকে ধরতর, সে
আর-দিকে জনতর, যে একদিকে কাজের,
সে আর-একদিকে সমস্ত আবস্তকের বাহিরে,
বাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে
আর-একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত—
যে একদিকে সকলের সঙ্গে বেশ ঝাপ খাইয়া
গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভগ্নর ঝাপছাড়া,
আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন বাহাকে দেখি নাই, আজ
তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে
মুক্তলাভ করিয়া বাচিলাম। আমি ভাবিতে-
ছিলাম, চারিদিকে অতিপরিচিতের বেড়ার
মধ্যে প্রাত্যহিক নিঃশব্দে বার্তা আমি বাধা
—আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্ণের কোলের
মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি
ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়সাহেবের মত
অত্যন্ত একজন শ্রুগস্তার হিলাবী লোকের
হাতে শড়িরা সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া
যাইতেছি—আজ সেই বড়সাহেবের চেয়ে
ধিনি বড়, সেই মত বেহিসাবী পাগলের
বিপুল উদার অট্টহাস্ত জলে-মূলে-আকাশে
সপ্তলোক ভেস করিয়া অনিত্ত গুনিয়া হাঁক
ছাড়িয়া বাচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত
রহিল! আহার জরুরি-কাজের বোকা ঐ
স্বটিছাড়ার পারের কাছে কেঁদা দিলাম—
তাঁহার তাওবন্তের মাথাতে তাহা চূর্ণচূর্ণ
হইয়া ধুলি হইয়া উড়িয়া থাক্!

নমস্কার ।

যে কেহ মোরে দিবেছে ভ্রুখ,

দিবেছে কুঁড়ি পরিচর,

সবারে আমি ননি ।

যে কেহ মোরে দিবেছে ভ্রুখ

দিবেছে কুঁড়ি পরিচর,

সবারে আমি ননি ।

যে কেহ ঘোরে বেগেছে ভালো,
 অগেছে ঘরে তাঁহারি আলো,
 তাঁহারি নামে সবারি আজি
 পেয়েছি আমি পরিচয়,
 সবারে আমি নমি ।
 বা কিছু কাছে এগেছে, আছে,
 এনেছে তাঁরে প্রাণে,
 সবারে আমি নমি ।
 বা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে
 টেনেছে তাঁরি পানে,
 সবারে আমি নমি ।
 জানি বা আমি নাহি বা জানি,
 মানি বা আমি নাহি বা মানি,
 নহন হেলি নিখিলে আমি
 পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
 সবারে আমি নমি !

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

দেশের কথা ।

অঙ্কুর ত্রিভুজ দীনেশচন্দ্র পেন ত্রিভুজ
 সখারাম দেউতর মহানরেন্দ্র রচিত “দেশের
 কথা” নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের
 নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । তাহার আরম্ভে
 তিনি লিখিতেছেন :—

“এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে ।
 ভারতহিতৈষী ভিখি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং
 দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি
 ভারতের স্বাধীনগণ যে সকল বিষয় লইয়া
 বছব্যসর বাৎসর্য্য আলোচনা করিতেছেন,

তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক-
 খানি রচিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের বর্তমান
 অবস্থাসম্বন্ধে অনেক তথ্য অল্পষ্টভাবে আশা-
 দেয় ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া
 তাহা সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত
 হইয়া উঠিয়াছে ।

“কোন সাধুপুণ্ডিত স্মৃতি উজ্জান দাবদস্ত
 হইয়া গেলে কিংবা কোন স্মরণশীল পরিচিত
 বৃদ্ধ ২১৭ ককাল দেখিলে মনের বেক্রম
 অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয়

শিক্ষাবিধিাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ বেউকর-মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও ট্যাটিষ্টিক্ হইতে সমৃদ্ধ কথ্য বিশেষে একটি মন্ত্রচ্ছন্দী দৃষ্ট উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃষ্ট একটি বিরোগান্ত নাটকের ন্যায়,—প্রত্যেক এই যে, ইহাতে কালনিক ছুঁখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিঃস্বের চুঃখদারিত্রা ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিত্তকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া-তুলিয়া বেদনাধোনের সকার করিয়াছেন।”

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন :—

“বেউকরমহাশয় বলেন, পুনঃপুন আন্দোলন করিলে গভর্মেন্ট অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।”

শিক্ষাটা কি এই হইল? ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্বলজাতির স্বব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবল জাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই গোপ্তব্রবা কিরিয়া পাওয়া যায়? ব্যাণায়ট! এতই সহজ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন—তা ছাড়া আর কি করিব? একটা ত কিছু করা চাই।

আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় ত ঐ অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস

হইতে লাভ করিবার বিষয় কি দেখিলে? আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে, ইংরাজের আদর্শ আমাদের দ্বন্দ্ব অর করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক্ হইতে আমাদের দ্বন্দ্ব বিমুখ হইতেছিল। মুখে আক্ষালন করিয়া বাহাই বলি, আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল—বিলাতী সভ্যতার মত সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কি, শক্তি কোথায়, তাহা বথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিষ্টিজ্-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর বড়ই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, ততই আমাদের দ্বন্দ্বের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ বথার্থভাবে আমাদের দ্বন্দ্বকে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্তপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতা-টাকে তোমরা ভালই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা, কাহাকে বলে, তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ঐ নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোকানুকি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিষ্টিজ্-মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিষটা বিশেষ, নামটাও বিশেষ থাকিলে ক্ষতি নাই—যদি কোনো বাংলাশব্দই চালাইতে হয়, তবে “স্বাদেশিকতা” কথাটা ব্যবহার করা বাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবধানা এই যে, স্বদেশের উদ্দেশ্যে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না,

সেইখানেই ধর্ম বল, ন্যায্য বল, আপনাদের দাবি উপাধান করিতে পারে—কিন্তু যেখানে বদেদেশের বার্ষ লইয়া কথা, সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। বদেশীয় বার্ষপন্নতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয়, তাহাই প্যাট্রিষ্টিজম্-শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

বার্ষপন্নতা কখনই ধর্মের মন্ত্র আপনাকে সংঘত করে না, স্বার্থের মন্ত্রই করে। ইংরাজ কখনই এ কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে করাসী-সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতার আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, হুতরাং আমাদেরও ক্ষতি;—নিজের পেট ভরাইবার মন্ত্র আবৃত্তক হইলে করাসীকে সে বটিকার মত গিলিয়া কেলিতে পারে, বিধা-মাত্র করে না। তাহার বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গারে গোর আছে, করাসীও নেহাৎ কীর্ণদ্রব্য নহে, অতএব কি জানি, লাভ করিতে গিয়া মূলধনহীনে হারানো অসম্ভব নহে। এখানে কৃষানিবৃত্তির মন্ত্র আশিরা-আজিকার ভালপাণো সমস্ত মুড়াইয়া ধাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদ্রুতপ্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোল-রূপ লঙ্কার যুক্তিমূল্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, বার্ষপন্নতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশংসা দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া কেলিবেই। বদেশীয় বার্ষপন্নতা আজ সেইমন্ত্র কেবলি পৃথিবীর ভাল চুকিয়া-চুকিয়া দেখতাকে-মুছ ভর দেখাইয়া গুস্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী Sven Hedinএর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের তিব্বত-আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller States appears precarious. A small State which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words 'Love thy neighbours as thyself,' 'Thou shalt not steal,' 'Thou shalt do no murder' 'Peace on earth and good-will towards men', instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern policy. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ সকল কথার তাৎপর্য্য আমাদের কাছে অংশ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ, রেল-

শ্রুতি ও বড় বড় ইংলিশবই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে, তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যজাতির জন্য অস্তিত্ব সন্ধান করিতে হইবে—তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যচর্য্যের জন্য পাশ্চাত্য সভ্যজাতিদের দ্বারা যথার্থ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিশ্চয় সেনের আদর্শ ও নিশ্চয় শক্তিকে নিত্যকাল অবজ্ঞার বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অয়ের অভাবে কল হইয়া, তেলের অভাবে দান হইয়া করিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার বেশের আদর্শই বা কোথায়, ধর্ম্মই বা কোথায়? আদর্শরক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার অবাধচর্য্যের স্থল কোথায়? কাজেই শেষে দরখাস্ত করিতেই হয়—শুধু ইংরাজি-ভাষায় রেজোলুশন্ পাস না করিলে চলিবে না।

একদিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপরদিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উত্তম স্বভাবতই আগিয়া উঠে। এমনি করিয়া ইংরাজিতে বাহ্যক নেশন—অর্থাৎ পোলিটিকাল-স্বার্থবদ্ধ জনলক্ষ্যদায়—বলে, তাহার উত্তর হইতে থাকে।

আমাদের বেশের বর্ত্তমান অবস্থার তাহার উত্তর না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য্য প্রয়োজনে বাহ্য আমাকে লইতেই হইবে, তাহার লক্ষ্যে অস্তিত্বের সুখভাব থাকা কিছু নয়। একথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতত্ত্বই মনুষ্যের চরমলাভ। তাহার উপরেও ধর্ম্মকে

রক্ষা করিতে হইবে,—মনুষ্যকে জ্ঞানশালত্বের চেয়ে বড় বলিয়া জানিতে হইবে। জ্ঞান-শালত্বের প্রবিধার বাস্তবের মনুষ্যকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া—মিথ্যাঞ্জে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দিষ্টতাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা! সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা দাইবে, জ্ঞানশালত্ব-মুক্ত দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই স্বার্থপরতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোম্বাইয়ুগে ইংরাজের তরফে রসদেয় মধ্যে রাশিরাশি ভাণ্ডাল। আপানের সঙ্গে যুক্ত রাশিরাশি পকেট সেই-রূপ দেখা গেছে। মনুষ্যের মঙ্গলকে যদি জ্ঞানশালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে জ্ঞানশালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে—ইহার অন্তথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ, ধর্ম্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে, তাহা নয়।

বাণেশ্বরের প্রভাব বড় কম নয়। ভারতবর্ষের অধিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ভায় মনীষী ব্যক্তি “বেশের কথা”র সমালোচনার ছলে এক আংগার লিখিয়াছেন :—

“গভর্মেন্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তাহার আর একটা চক্ষু সাগরমেন্থলা শ্বেতবীপাধিপতি বাণিজ্যলক্ষ্যের চরণনখর-প্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা আমরা কোনো-ক্রমেই অস্তায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।”

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এপারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে

জানদণ্ড কতকটা সাধঃ থাকিত । কিন্তু তাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের দেউতরমহাশয়ের এইখানি কি তাহাই সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে প্রমাণ করিয়াছে ? আসল কথা, আমরা হইবে । এ কার্যে যুগ্মশেষের দিকে আজকাল অনেকেরই মনে করি, জ্ঞাননালিটির স্পর্শবির অপর্ণে সমস্ত অস্ত্রের সোনার চাঁদ আমাদেব সম্পূর্ণ ভ্রষ্টা চাই—বাহা শিক্ষা ও অবস্থার ভগ্নে, অস্ত্রদিকে ধাবিত হইরাছে, তাহাকে যরের দিকে কিরাইতে হইবে । আশা করি, দেউতরমহাশয়ের এইখানি আমাদিগকে সেই পথে বাজার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না ।

বাহা হউক, আমাদিগকে নেশান্ বীধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে । আমাদেব জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণ-পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বভোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিন্তকে, আমাদের প্রতি-

পুরুষসিংহ ।

[হান্সরসব্যতিরিক্ত নবরসের কবিতা ।

অদ্ভুত ।

অক্ষরোড়াকটার ভ্রোড়া কি যে তা বোলা না
দিন্টাতোড় করিয়া শোর সতের পোলা না !

বীভৎস ।

মেজাজ্ গেল বিগড়ে তাহে মুসড়ে গেল প্রাণ ;
ভব খেলা সিংহবান্ গৃহেতে কিরে বান ।

রৌত্র ।

এবেশি গেহ কহিল —“কেহ দিবে না কি গো ভাত ?”
“এগেছ যবে ?”—গিরি তাঁরে কহিল দৈবাৎ ;
“বেশিলে পান্য ক্ষুধাপিপাসা থাকে কি কাহারো ?”
আর কে ভাখে ? গাঁড়াল বৈকে সিংহ বেতরো ।

ভয়ানক ।

কহিল রাগি’—“দেশ-ভেদগী হইব এখনি ।”
হাসিন গুণ্ মূহল মধু গোপনে গৃহিণী ।

বহু গুলি ওলিখে তুলি' বাঁধিয়া পোটলা,
বলে—“ওরে, দেশটা ছেড়ে চলিছ একেলা !”

আদি ।

অগ্নিরে এসে গিরী হেসে থলে সেগুলি,
একটি হাত এসারি নাথে রাখিল আঙুলি ।

বীর ।

ক্রোধে অধীর হেল বীর, কথা না মানিল ;
বেলায় আরে আঁকড়ে ধরে বোঁচকা টানিল ।
হাঁচকা টানে বোঁচকা নিতে রহুকে গেল হাত ;
ছটুকে পড়ে' সিংহ যে রে ভূমিতে চিংগাং ।

কল্প ।

অশ্রু ব্যথা ! সিংহ কথা কহিছে কাতরে
“হলেম খুন হনুদুহনু আনতে যা ত রে !”
দুচারি-ঘটি অশ্রুর ছিটা, পাথার বাতাসে ;
হনুদু-চনু-পটির গুণে তুলিল মাথা সে ।

বাৎসল্য ।

ঝাড়িয়া দিল পাতের খুলো হস্ত বুলায়ে,
রহিল তবু সিংহবাবু ওঠ খুলায়ে ।

শান্ত ।

বালায় কোরে পথ্য তাঁরে দিলেন গৃহিণী ।
যতক খানু আবার চানু, দুধাটা এমনি ।
হাঁড়িটি বেশ করিয়া শেব, গুড়াকু ছুঁকিয়া,
ঘুমে ও ঘুমে সকল গোল গোল রে চুকিয়া ।

ত্রিবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

আমি সে জানি ।



কুমি যে আমারে চাও
আমি সে জানি ।
কেন যে ঘোরে কাঁদাও
আমি সে জানি ।

এ আলোকে এ আঁধারে
 কেন তুমি আপনারে
 ছায়াখানি দিবে ছাও
 আমি সে জানি ।

সারাদিন নানাকালে
 কেন তুমি নানাসাথে
 কত সুরে ডাক লাও
 আমি সে জানি ।

সারা হ'লে বেয়া-নেয়া
 দিনান্তের শেষ খেয়া
 কোন্-দিক-পানে বাও
 আমি সে জানি ।

বংশীধ্বনি ।



কি সুর বাজে আমার প্রাণে
 আমিই জানি মনই জানে !
 কিসের লাগি সদাই জাগি,
 কাহার কাছে কি খন মাগি,
 তাকাই কেন পথের পানে,
 আমিই জানি মনই জানে !

ধারের পাশে প্রভাত আলো
 সন্ধ্যা নামে বনের বাসে ।
 সকাল-সন্ধ্যাে বংশী বাজে,
 বিকল করে সকল কাজে,
 বাজায় কে যে কিসের তানে
 আমিই জানি মনই জানে !

বঙ্গদর্শন ।

গীতার দর্শন ।

ভগবদ্গীতার একদিকে যেমন ধর্মতত্ত্ব, অস্ত্র-
দিকে সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র—তত্ত্ববিজ্ঞা। ধর্মতত্ত্বে
নিকাম কর্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, সমদর্শন, ব্রহ্ম-
জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তিগম্যমিত উপদেশমালার
সাংখ্য, যোগ, বেদান্ততত্ত্বসকল এখিত রহি-
রাছে। সাংখ্যের পুরুষবিংশতি তত্ত্ব, প্রকৃতি-
পুরুষতত্ত্ব, ত্রৈগুণ্যবিচার; যোগের শন-দম-
ধান-সমাধি প্রকৃতি অষ্টাঙ্গ প্রকরণ; বেদা-
ন্তের অদ্বৈতবাদ ও মাধ্ববাদ, এ সকলই
গীতাত্ত্ব মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অন্তর্ভুক্ত।
এই প্রতিষন্দী দর্শনত্রয় যেন পরস্পর প্রাধান্ত-
লাভের লব্ধ উপস্থি রহিয়াছে। ভগবান্ ও
তাঁহাদের বন্দ মিটার্হবার স্তম্ভ তেমনি বহু-
স্থল। গীতাত্ত্ব দর্শন সাংখ্যপ্রধান অথবা
যোগপ্রধান, এই বিষয়ে অনেকসময় সন্দেহ
উপস্থিত হয়; সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার
নিমিত্ত ত্রীকাক প্রথমেই বলিয়া রাখিলেন যে,
উহারা উভয়েই এক, সাংখ্য ও যা, যোগ ও
তা, বাসকেরা উহাদিগকে পৃথক্ করিয়া
বলে। তিনি চান যে, সাংখ্য ও যোগের,
জ্ঞান ও কর্মের বিবাদ মিটিয়া যায়। জ্ঞান-
বাদী ও কর্মবাদী, ইহাদের পরস্পর পার্থক্য

যত অনর্থের মূল; জ্ঞান কর্ম বিনা নিরর্থক
—কর্মও জ্ঞান বিনা নিফল ও অমঙ্গলকর।

গীতার বেদান্ততত্ত্বের ও বিলক্ষণ প্রতি-
পত্তি। বেদান্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ
অমুরাগ; এমন কি, একস্থানে তিনি 'বেদান্ত-
কৃত', বেদান্তকর্তা বলিয়া আপনার পরিচয়
দিয়াছেন। ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে যে,
অদ্বৈতবাদ তাঁহার উপদেশের সারতত্ত্ব।
জীবাত্মকে অভেদজ্ঞানই তাঁহার মতে সার্বিক
জ্ঞান—প্রভেদজ্ঞান রাস্মদিক জ্ঞান।

সর্বকৃত্ত্বং যেনৈকঃ ভাবনুভবমীকতে।

অবিভক্তং বিহক্তেঙ্ তচ্ছ্রদ্ধানঃ বিদ্ধি সাদ্বিকম্।

পৃথক্বেদে তু দ্বজ্ঞানঃ নানাভাবান্ পৃথগিধান্।

বেতি সর্কেষু কৃত্তেণ তস্মজ্ঞানং বিদ্ধি সাক্ষদম্। ১৮
২০-২১

কর্মযোগের প্রারম্ভেই যে আত্মতত্ত্ববিধরক
উপদেশ আছে, আত্ম-পরমাত্মার অভেদ-
ভাব না দেখিলে তাঁহার অর্থ হয় না। সে
সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য এই যে, জীবাত্মা
পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন,
মুতরাং অবিনাশী। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর
হয়, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।
যদি তাহা হইত, তবে মৃতের স্তম্ভ বৃথা

শোক করিতেছ কেন ? যুঁজে কেনই বা
বিশ্রুত ?

অবিনাশি তু তবিত্তি যেন সম্মিহনঃ ততম্ ।

বিনাশরসত্ত্বাত ন কশ্চিৎ কতু মধতি ।

অন্তবত ইমং দেহা বিতাতোক্তাঃ পরীরিণঃ ।

অবিনোদপ্রবেশত তদ্ব্যবস্থায় ভারত । ১৭.১৮

সেই যে সর্বব্যাপী পরমায়া, তাঁহাকে
অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহ বিনাশ
করিতে সক্ষম নহে । নিত্য, অবিনাশী এবং
অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নবর বলিয়া
কথিত হইয়াছে, অতএব হে ভারত ! যুঁজ
কর ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ঃ পুরাণো

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে । ২

ইনি অমরবিহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ,
শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না ।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ স্পষ্টই বলিতে-
ছেন—

মমৈবাশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃক্যানীশ্রিয়ানি প্রকৃতিহানি কথতি । ৭

এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই
অংশ । ইনি প্রকৃতিবিলীন পকেস্ত্রিয় ও
মনকে আকর্ষণ করেন ।

কি আত্মজ্ঞান, কি ব্রহ্মজ্ঞান, গীতার
উপদেশসকল বেদান্তভাবে অমূল্য ; যে
সমস্ত বচন পূর্বাপর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা
হইতে এ কথা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে। “বিশ্ব-
রূপদর্শন” অধ্যায়ে এই একাত্তাব অপূর্ণ
কবিশ্রমাদুরীত প্রস্তুতি । বেদান্তের সঙ্গে
সঙ্গে ইহাতে সাংখ্য ও বোগতত্ত্বসকল উপদিষ্ট
হইতেছে । প্রথম ছয় অধ্যায়ে বোগশাস্ত্রের
অনুশাসিত কর্মযোগ—শেষ ছয় অধ্যায়ের

অধিকাংশ সাংখ্যোক্ত উপদেশে পূর্ণ, মধ্যাংশ
ও অন্তান্ত স্থানে বেদান্ত ;—গীতার রচনা-
প্রণালী এইরূপ বিমিশ্র । কিন্তু এই পরস্পর-
বিরোধী তত্ত্বের কি কেনি বন্ধনহুই নাই ?
অবশ্য আছে এবং তাহা হুস্বদর্শী হৃদয়গণ
দেখিতে পান । ফলতঃ, এ কথা সন্দেহই এক-
বাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্বধর্মসম্বন্ধেই
গীতার প্রধান গৌরব । ত্রীকৃত জানিতেন যে,
সকল শাস্ত্রের শিক্ষা—সকলপ্রকার সাধনার
একই লক্ষ্য—যিনি যে পথ বিয়া গমন করুন,
সেই একই স্থানে গিয়া তাঁহাকে পৌছিতে
হইবে।—

ধ্যানেনাশ্বনি পত্ততি কেচিবাশ্বানমাশ্বনা ।

অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কুর্ষ্যেযেন চাপরে ।

অন্তে বেবমজানন্তঃ প্রবর্তন্ত্য উপাসতে ।

ভেদপি চ্যাস্তিতরস্তোব বৃহাৎ প্রতিপরাধণাঃ । ১৩

১৪.২৭

কেহ কেহ ধ্যানযোগে, কেহ সাংখ্য-
যোগে, কেহ বা কর্মযোগে আত্মাতে পর-
মাত্মাকে উপলব্ধি করেন । অন্তেরা তাঁহাকে
এইরূপে জানিতে না পারিয়া শুকর নিকট
উপদেশ প্রবণপূর্বক তাঁহার উপাসনার
প্রবৃত্ত হন । সেই প্রতিপরাধণ ব্যক্তির্যোগ
মুত্যা হইতে উত্তীর্ণ হয়েন । এই সকল ভিন্ন
ভিন্ন পন্থীর লক্ষ্য ও গতি একই । এইহেতু
গীতার প্রণয়নকালে যে সমস্ত দর্শনতত্ত্ব
প্রচলিত ছিল, তাহার কোনটিকেই তিনি
উপেক্ষা করেন নাই—সর্বলক্ষেই আপনার
মতের সঙ্গে মিলাইয়া প্রস্তর দিতেছেন । এই
সার্বভৌমতা গীতার একটি বিশেষত্ব ।
“গীতার সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার লেশ-
মাত্র নাই । সেইজন্য সকল প্রণীত দার্শনিক,
সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান

আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ
এছ। কি জানী, কি কখাঁ, কি যোগী,
কি ভক্ত, সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপা-
দেয়।" এই কথাগুলি আমি হীরেন্দ্রবাবুর
“গীতার ঈশ্বরবাদ” প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত
করিয়া দিলাম। তাঁহার প্রবন্ধগুলি সারবান,
বুদ্ধিগর্ভ, অতি সুপাঠ্য হইরাছে—গীতাহু-
রাগিমায়েরই প্রণিধানযোগ্য।

সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষরূপ “বৈতবাদ,
বেদান্তের মৌনব্রহ্মে অতেনরূপ অষ্টভববাদ—
এ উভয়ই গীতাশাস্ত্রে বানলাভ করিয়াছে।
প্রকৃতি কোথাও অনাদি মূলতত্ত্ব, কোথাও
বা ঐশ্বরী মায়ার অবগুপ্তিতা। কখন
অপ্রধান, কখনও ঈশ্বরের অধীনে কার্য্য
করিতেছে। আপাতত মনে হইতে পারে,
এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের সামঞ্জস্য-
সাধন একপ্রকার অসম্ভব। অথচ গীতার
মধ্যে এই সমস্ত তত্ত্বের একটি সমন্বয়ভেদ
পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়; ইহাদের মধ্যে
একটি বন্ধনস্থ আছে। সেই বন্ধন হচ্ছে
গীতোপনিষ্ট ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ। হীরেন্দ্র-
বাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “দর্শনশাস্ত্র-
সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা
ক্রমশঃ বহুমূল হয় যে, তাহাদের মধ্যে কি
একটা অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব রহিয়া
গিয়াছে; আর গীতা ঈশ্বরবাদের অবতারণা
করিয়া সেই অভাবের পূরণ করিয়াছেন,
সেই অসম্পূর্ণতার বোচন করিয়াছেন।
এই একটি রাসায়নিক বস্তুর সংযোগে দর্শন-
শাস্ত্রকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।”
গদি তাহার প্রমাণ আশঙ্কক হয়, তবে দ্বিতীয়
তুলিকায সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শনের চিত্রে

যে রূপান্তর ঘটয়াছে, তাহা দেখিতে হয়,
এবং হীরেন্দ্রবাবু তাহার প্রবন্ধে তাহা বিশদ-
রূপে দেখাইয়াছেন। তিনি যে ধার গুলিয়া
দিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া গীতোক্ত ব্রহ্ম-
বাদে প্রবেশ করা সহজ।

গীতা সাংখ্যমত অমুদয়ন করিয়া যে ভাবে
প্রকৃতিপুরুষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমে
আমি তাহা দেখাইব। আরোপন অধ্যায়ে
আছে—

“প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি
জানিবে; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখ-
দুঃখাদি গুণসকল প্রকৃতিসম্বৃত্ত বলিয়া
জানিবে।” ২০ সবিকার প্রকৃতি ও পুরুষ
মিলিয়া সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পর্য্যায়-
ক্রমে এইরূপ :—

১। অব্যাক বা মূলপ্রকৃতি।

২। বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব।

৩। অহঙ্কার।

৪—৮। পঞ্চতন্মাত্র। ৯—১৯। একাদশ ইন্দ্রিয়।

২০—২৪। পঞ্চ মহাত্মত।

২৫। পুরুষ।

পঞ্চতন্মাত্র কিনা ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ-
বিধ = শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

একাদশ ইন্দ্রিয় = পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ
কর্মেন্দ্রিয় ও মন (অন্তরীন্দ্রিয়)।

পঞ্চ মহাত্মত = ক্ষিত্তি; অপ্ (অল),
তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

এই পর্য্যায় হইতে স্বষ্টির ক্রম উপলভ
হইবে। বলা—

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে
অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র

একাদশ ইন্দ্রিয় ; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাত্ম ।

পুরুষ = আত্মা, অনাদি, ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন ।

কোন কোন সাংখ্যকার (ভবসমান) অষ্ট প্রকৃতি ও বোড়শ বিকার, এই দুই শ্রেণীতে চতুর্বিংশতি তরকে বিভক্ত করেন ।

অষ্ট প্রকৃতি কিনা মূলপ্রকৃতি এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র । এই পঞ্চোক্ত সপ্তক যদিও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ইহারা ইন্দ্রিয় ও মহাত্মাদির সৃষ্টিকর্তা বলিয়া গোণভাবে প্রকৃতি । এই অষ্ট প্রকৃতির বোড়শ বিকার হক্কে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাত্ম ।

সীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩৮ স্লোকে এই চতুর্বিংশতি তরের উল্লেখ আছে—

মহাত্মাত্ত্বজ্ঞাতো বুদ্ধিরবাক্তনবঃ ১ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকক পঞ্চ ত্রৈবিংশগোচরাঃ ২০

অবাক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, বুদ্ধি অর্থাৎ মহন্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ পঞ্চাদি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়পঞ্চ, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চমহাত্ম । ইহাদের নাম সবিকার ক্ষেত্র । ইচ্ছা-দেব প্রভৃতি ক্ষেত্রবর্ধ পরের স্লোকে কথিত হইয়াছে—

ইচ্ছা যোগঃ স্রবঃ স্রবঃ সঙ্গাত্তক্কেতনা গুতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সীতাসেন সবিকারমুদাত্তম্ ।

ইচ্ছা, দ্রব্য, স্রব, স্রব, সঙ্গাত্ত অর্থাৎ দেহেজ্ঞিদের সমষ্টি, চেতনা ও গুতি, এই দেহ ও মনোবৃত্তিসমুদায় ক্ষেত্রাত্তপাতী । ইহার সর্বসমেন সবিকার ক্ষেত্র ।

৪ অধিক প্রকৃতি হইতে পঞ্চতত্ত্বময় ভগ-

ভের উৎপত্তি কিরূপে হইল ? সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ এই—

প্রকৃতি গুণময়ী ; সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত । প্রথমকালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে—এই সাম্যাবস্থায় বিচ্যুতি ঘটিলেই সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় । এই বিপ্লবে প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম, তাহাই মহন্তত্ব, মহন্তের বিকার অহঙ্কার ; অহঙ্কারের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় । পঞ্চতন্মাত্রের বিকারে পঞ্চমহাত্মত্বের উৎপত্তি । এই পঞ্চমহাত্ম মূলবিষয়রূপে ও জীবদেহরূপে আমাদের উপভোগ্য হয় ।

সদ্ব্যবহারের সাধ্যাভিধানিত অবাক্ত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে বুদ্ধি, তাহা কি ? বুদ্ধির অর্থ প্রকাশ, আশোক, চিৎপ্রভার প্রথম বিকাশ । বাহ্য স্রষ্টাবস্থা হইতে প্রবৃত্ত করে, তাহাই বুদ্ধি । বুদ্ধির অপর নাম মহন্তত্ব । এই মহন্তত্বকে সজ্ঞাত শাস্ত্রেও জ্ঞানস্থানীর বলা হইয়াছে । মহন্তের পরিণাম অহঙ্কার । আগে বুদ্ধির উদয়, পরে তদ্বিরয়ে অহঙ্কার অর্থাৎ আমি, আমার, এই বিশিষ্টজ্ঞান জন্মে । বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর প্রতিঘাত না হইলে এই জ্ঞান আমাদের আরম্ভ হয় না । জ্ঞানের এই যে নিষ্ঠরাস্থক বিকাশ, তাহাই অহঙ্কারের কার্য্য । অতএব বলা বাইতে পারে যে, অহঙ্কার হইতে জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হয় । অহঙ্কার তাহার জ্ঞেয়বিষয় কোথা হইতে পায় ? ইন্দ্রিয়সকল হইতে । ইন্দ্রিয়ের বধ্য কি আদৌ, পঞ্চতন্মাত্র - শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস, গন্ধ ; ইহারাই আবার পঞ্চমহা-
ভূতের উপাদান । “অবিশেষ্যং বিশেষ্যরন্তঃ”
অর্থাৎ স্বস্বভূতসকল হইতে মূলভূতের
উৎপত্তি । এই নিয়মে, শব্দ হইতে আকাশ,
স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে ভেদ, রস
হইতে জল, এবং আকাশ হইতে পৃথিবী
বধাক্রমে উৎপন্ন হয় । পূর্ব-পূর্ব ভূত পর-
পর ভূতের কারণ, সেজন্য পর-পর ভূতে
একএকটি অধিক বর্ণ বিস্তারমান আছে ।
আকাশের এক গুণ শব্দ ; বায়ু বিগুণ-বিশিষ্ট ;
ভেদে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ত্রিগুণ , জলে শব্দ-
স্পর্শ-রূপ-রস এবং পৃথিবীতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-
রস-গন্ধ অবস্থিত আছে । এই স্বস্বভূত
ও মূলভূত ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যীয় বিষয় ।
মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই গম্য ;—জ্ঞানেন্দ্রিয়,
কর্মেন্দ্রিয়, উভয়গন্ধক অন্তরিত্ত্বিহীন । মনের
ধর্ম কি ?

“কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা দ্রোহঃপ্রজ্ঞা বৃত্তিরবৃত্তি-
চৌর্গীর্থাভিজ্ঞাতাঃ সর্বসং মন এবেতি ।”

সঙ্কল্প, বিকল্প, কামনা ইত্যাদি মনোবর্ণ ।

এখন কতকটা জ্ঞানো গেল, আমরা যে
বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞান-
ক্রিয়া সাংখ্যমতে কিরূপে সম্পন্ন হয় ? ইহা
আরো একটুকু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা
যাউক । এই জ্ঞানক্রিয়ার প্রণালী দুই
বিভিন্নপ্রকার বল্য হইতে পারে । এক
এই যে, বিষয়জ্ঞান প্রথমে মনোরাগে প্রবেশ
করে । মন যোপাল্লিত বিন্দু অহঙ্কারের
নিকট আনিয়া দেয় । অহঙ্কার তাহা বাহিরা-
লইয়া বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করে । বুদ্ধিতে
সেই জ্ঞান পরিণতিলাভ করিলে তবে তাহা
পুরুষের বোধগম্য হয় । এইরূপে ইন্দ্রিয়কর্তৃক

বিষয়গ্রহণ, পরকণে তাহা মনের নিকট
অর্পণ ; সঙ্কল্যাত্মক মন হইতে অহঙ্কারে, অহ-
ঙ্কার হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পৌছিয়া
জ্ঞানের উত্তরোত্তর বিকাশ হয় । একান্তির
চিত্রপটে অগংচিত্রের এই যে ক্রমবিকাশ,
তাহা আরোহী প্রণালীতে সম্পন্ন হয় । সাংখ্য-
তত্ত্বকৌমুদীতে ইহার এই এক দৃষ্টান্ত
আছে (৩৬)—

“গ্রামাধ্যক্ষগণ প্রজাদের নিকট হইতে
রাজ্যের আদায় করিয়া যেমন বিভাগের কর্তৃ-
পুরুষের হস্তে আনিয়া দেয়, ইনি আবার
কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করেন, কোষা-
ধ্যক্ষ তাহা রাজ্যের কাছে লইয়া যান ;
সেইরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়গণ কোন বিষয় পাইবা-
মাত্র মনের নিকট লইয়া যায়, মন তাহা
নেথিয়া-লইয়া অহঙ্কারের হস্তে প্রদান করে,
অহঙ্কার তাহা গণিমা-গাথিয়া আশ্বাসাৎ
করিয়া বুদ্ধির নিকট লইয়া উপস্থিত করে ।
বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভাবনা বা প্রজ্ঞারূপে
পরিণত হয় ।”

এই গেল আরোহী প্রণালী । অবরোহী
প্রণালীতে বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়-
জ্ঞান অহঙ্কারে সঞ্চারিত হয়—সামান্ত হইতে
বিশেষে, ব্যাপক হইতে সঙ্কীর্ণে, সর্বগত
হইতে বস্তুগত ক্ষেত্রে অবতরণ করে । বুদ্ধি
সারসত্যের আলোক ধারণ করে, অহঙ্কার
তাহা আপনার গভীর তিতর-আনিয়া স্বায়ত্ত
করে । বস্তুগত (objective) চৈতন্যকে
ব্যক্তিগত (subjective) করা অহঙ্কারের
কার্য্য । বুদ্ধিতে জ্ঞানের উত্তরেক, অহঙ্কারে
জ্ঞানের কার্য্য পরিমাপ্য হয় । মন অন্তরিত্ত্বিহীন,
ইনি ধারণাধারের কার্য্য করেন ; এই প্রকারে

কাছে আসিয়া গগনে জগৎবস্তুরে আত্ম-
পরিচয় দিয়া উপর-উপর ধাপে আরোহণ
করিতে হয়, ইহার সাহায্য বাতীত জ্ঞানের
বিষয় বুদ্ধি কিংবা অহংকারের কাছে পৌছিতেই
পারে না ।

“মহাশাখানাস্তকার্যাম্”, “১০মোহহকারঃ”
—এই দুই কপিলমুখে উক্তরূপ অবরোধী
প্রণালী লক্ষিত হইবে ।

এইরূপে মনোবুদ্ধি-অহংকাররূপ অন্তর্ভাগে
জ্ঞানের কার্যনির্বাহ হইতেছে, পুরুষ কিন্তু
এই সকল কার্যের সহিত লিপ্ত থাকেন না ।
যড়ির যন্ত্রের দ্বারা প্রকৃতির কার্য চলিতেছে
—পুরুষ উদাসীনভাবে সকল দেখিতেছেন ;
কখনও বা মোহবশতঃ “অহং কর্তা” ভাবিয়া
আত্মাভিমানে মগ্ন হইতেছেন ।

গীতার অনেকস্থানে “অব্যক্ত” শব্দ
প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় । “অব্যক্তা-
দীনি তূতানি”, “অব্যক্তিনিঃশানি”—অব্যক্ত
হইতে জগতের উৎপত্তি, প্রলয়কালে জগ-
তের অব্যক্তে তিরোভাব ।

অব্যক্তাব্যক্তঃ সর্গাঃ প্রভবঃপ্রলয়ঃপ্রলয়ঃ ।

সামগ্র্যখনে এলীকন্ত ততৈবাব্যক্তঃপ্রলয়ঃ ।

এলয়ের অবস্থানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে
ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং যড়ির
অবস্থানে উহা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায় ।

গীতার মহতের পরিবর্তে বুদ্ধিশব্দের
প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই বুদ্ধিশব্দ নানা
অর্থে ব্যবহৃত । বুদ্ধির একটি অর্থ নিশ্চয়া-
ন্বিতিক অস্তঃকরণবৃত্তি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দৃষ্ট
হইবে । সাংখ্যদর্শনেও নিশ্চয়বৃত্তিমতী বুদ্ধির
কথা আছে । মূল মহতত্ব যখন শরীরে
পরিস্ফুট হইয়া বাষ্টিভাব ধারণ করে, তখন

তাহা দেহীর অস্তঃকরণে নিশ্চয়ান্বিতিক বুদ্ধির
রূপে আবির্ভূত হয় । পৌত্তাক্র এই বাব-
সায়ান্বিতিক বা নিশ্চয়ান্বিতিক বুদ্ধির অর্থ
ভগবানে একাগ্রবুদ্ধি = একনিষ্ঠতা ।

গীতার ‘পঞ্চভূত ও মনোবুদ্ধি-অহংকার’,
এই অষ্টমা প্রকৃতি দ্বয়ের অপরা প্রকৃতি
বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা পরে দেখান
হইবে ।

গীতার যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ
আছে, তাহা উপরে বলা হইয়াছে ; বৈশ্বশা-
বিচারেও সাংখ্যই গীতার আদর্শ ।

চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে

সম, রজ, তম, এই ত্রিগুণ প্রকৃতিসমুৎ
জানিবে । এই গুণত্রয় দেহীকে বেধে আবদ্ধ
করিয়া রাখে ।

ত্রিগুণলক্ষণ—

সমগুণ নির্মলতাগ্রন্থক প্রকাশক ও
অনামক ; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে ‘মুখসন্ধে’
ও ‘জ্ঞানসন্ধে’ বাঁধিয়া রাখে ।

রজোগুণ রাগাদ্বয়, তৃষ্ণা ও আসক্তি
উহা হইতে সমুৎপত্ত ; উহা দেহীকে কর্শে
নিবদ্ধ করিয়া রাখে ।

তমোগুণ অজ্ঞান ও মোহজনক ; উহা
প্রাণীদিগকে অমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতে
অতিভূত করিয়া রাখে ।

সমগুণ প্রাণীদিগকে মুখে ময়, রজোগুণ
কর্শে সংসক্ত, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরো-
হিত করিয়া প্রমাদে আচ্ছন্ন করে ।

গীতা বলে—

ন ত্যজি পুণিবাঃ বা তিবি বেবেগ বা পুনঃ ।

সখ্যং প্রকৃতিমৈবভূতং যদাভিঃ স্তাং ত্রিভিঃ সৈঃ ।

- নাহি এই পৃথিবীতে হেন কোন জন,
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,
কর্ণ বর্ষা কোথাও না পাইবে দেখিতে,
হৃত বৈ এই প্রতিম ত্রিগুণ হইতে।

গীতা দেখাইতেছেন, এই বিশ্বসংসারে
ত্রৈলোক্যের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত। বজ্র-
দান-তপস্বী, আহার, কৰ্ত্তাকর্ষজ্ঞান, ত্যাগ,
অন্ধা, বুদ্ধি-বুদ্ধি-স্বপ্ন, এমন কোন গুণ নাই,
কোন কৰ্ম নাই, যাহা ত্রিগুণের সংপ্রব-
রহিত। গুণভেদে ত্রিধা ভিন্ন হইয়া কোন
কোন বিষয়ের কি কি রূপান্তর ঘটে, তাহা
১৭।১৮ অধ্যায়ে তার তার করিয়া দেখানো
হইয়াছে।

সাংখ্যোক্তা বলেন, প্রকৃতিতে এই তিন
বিরোধী গুণের সততই সংগ্রাম চালাতেছে,
“একে অত্রকে পরাভব করিবার জন্য সর্বা-
ক্ষণ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন
সব বিলম্বী হইয়া প্রকাশ, বা স্রব, বা লঘুতা
উৎপাদন করিতেছে; কখনও রজ প্রবল হইয়া
প্রবৃত্তি, বা চঃখ, বা চাকলা উৎপাদন করি-
তেছে; আবার কখনও বা তম উৎকট হইয়া
নিরব (প্রতিবন্ধ,) বা মোহ, বা গুরুত্ব উৎপন্ন
করিতেছে।”

গীতাও ইহার অনুরোধন করিতেছেন:—

- রক্তবস্ত্রাভিরূপ সৰ্বঃ ভবতি ভারত। ১৪
রজঃ সৰ্বঃ ভবতৈব তবঃ সৰ্বঃ রজতয়া। ১৫

হে ভারত! সর্বগুণ রজ ও তমকে,
রক্তোত্তম সর্ব ও তমকে, তমোত্তম রজ ও
সবকে অভিহিত করিয়া রাখে।

যখন সর্বগুণ পরিবর্তিত হয়, তখন
জ্ঞানের প্রকাশ। রক্তোত্তম প্রবৃত্তি হইলে
লোভ, প্রবৃত্তি, কামারপ্রসূতা, অশান্তি

অন্তঃ; তমোত্তম পরিবর্তিত হইলে অজ্ঞান,
অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সজাত হয়।
১১—১৩। সব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে
লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান
আবির্ভূত হয়। ১৭

প্রকৃতি-পুরুষের গুণাগুণ—

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ববিষয়ে
প্রকৃতি এবং সুখদুঃখভোগবিষয়ে পুরুষই
কারণ। ১০
২০

যিনি প্রকৃতিকে সকল কৰ্মের কর্ত্তা এবং
আপনাকে অকর্ত্তারূপে দেখেন, তিনিই
দ্ব্যর্থ দেখেন। ১০
২২

প্রকৃতির গুণের দ্বারাষ্ট সকল কৰ্ম কৃত
হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মুচিচিত্ত আপনাকে কর্ত্তা
মনে করে। ২৭

গীতা বলেন যে, শরীর, অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা,
চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, আশ্রয়াদি বায়ুর বিবিধ
চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা, এই পঞ্চকারণ সকল কৰ্মের প্রবর্তক।
১৮। পুরুষ অকর্ত্তা। ১১

পুরুষের লক্ষণ—

অনাবিহাতিগুণস্বায়ং পরমাত্মদেবায়ঃ।

শরীরবাহিণী কোশের ন কারাতি ন লিপ্যতে। ১০
৩১

হে কোশের! এই অবায় পরমাত্মা
অনাধিত ও নিভঃগণপ্রযুক্ত শরীরস্থ হইয়াও
কোন কৰ্ম করেন না ও কিছুতেই লিপ্ত
হয়েন না।

পুরুষঃ প্রকৃতিঃ। হি হৃৎক্ষে প্রকৃতিমাত্ম গুণান্।

কারণঃ গুণসঙ্গোহন্ত সমসংযোগিরহস্যঃ। ২১

পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া
প্রকৃতিতেই সুখদুঃখ ভোগ করেন। এই

গুণসম্বন্ধে তাহার সদস্যলোচনে অস্বাভাবিক
একমাত্র কারণ।

এই সমস্ত তত্ত্ব সামান্যতঃ কাপিলসাংখ্যের
অনুযায়ী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ
উভয়েই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন।
প্রকৃতি অড়, পুরুষ চেতন; প্রকৃতি সবিচার,
পুরুষ কূটম্ব নির্বিকার; প্রকৃতি গুণসম্বন্ধী,
পুরুষ নিঃস্বর্ণ; প্রকৃতি ভোগা, পুরুষ
ভোক্তা। প্রকৃতির গুণের দ্বারা এই সমস্ত
কর্ম নিশ্চয় হয়, অগতের সৃষ্টিস্থিতির—
সমস্তই প্রকৃতির কার্য; পুরুষ অকর্তা,
উদাসীন, সাক্ষিব্রূপ। প্রকৃতি হইতে
সব্বদ্রব্যমোক্ষ উৎপন্ন, পুরুষ তচ্ছনিত-
স্বপ্নঃখভোগী। এই গুণানুবন্ধেই পুরুষ
মোহে নিবদ্ধ থাকে।

প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে।
সেইজন্য প্রকৃতির গুণ পুরুষে এবং পুরুষের
গুণ প্রকৃতিতে উপচরিত হয়। সেইজন্য
বস্তুত অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে সচেতন
বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুত কর্তা না হইলেও
পুরুষকে কর্তা বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃতি অচেতন, স্তব্ধাঃ অন্ধ; পুরুষ
অকর্তা, অতএব খল্ল + চলৎশক্তিরহিত।
প্রকৃতি ব্যক্তিরেকে পুরুষ বন্ধ, পুরুষ ব্যক্তি-
রেকে প্রকৃতি অন্ধ—উভয়ে সংযুক্ত থাকিয়া
একে অস্তের অভাব পূরণ করে। তাহাদের
সংযোগের ফলেই সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টি
নিজের অন্ত নহে—পরের অন্ত। পুরুষ
দর্শক হইয়া উপস্থিত না থাকিলে প্রকৃতি
কোন কার্য করে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য—
পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

সাংখ্যশাস্ত্র নিরীক্ষরশাস্ত্র। সাংখ্য-

দর্শনে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই নাই। সাংখ্য-
এবচনহুয়ে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিবেদ করা
হইয়াছে। উহার প্রথম অধ্যায়ের ৯২ সূত্র
হুয়ে—“ঈশ্বরাসিদ্ধোঃ” অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-
বিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইজন্য সেবর
পাতঞ্জলদর্শনের বিপরীতপক্ষে কাপিলদর্শনকে
নিরীক্ষরসাংখ্য বলা হয়। সাংখ্যেরা বলেন,
প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ—প্রকৃতি পরিণত
না হইয়া থাকিতে পারে না; অতঃ কথায়,
প্রকৃতি স্বতঃই অগৎসৃষ্টি করে, কোন স্বতন্ত্র
চেতন কর্তার অপেক্ষা রাখে না। অগতের
সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বরের কোন হস্ত নাই।

গীতার অপর পক্ষে ঈশ্বরবাদ সমুচ্ছল।
ঈতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ঈশ্বরবাদপ্রভাবে
অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। সাংখ্যমতে
প্রকৃতি ও পুরুষ বিবের চরম বৈত—এই
মহা-বৈত সাংখ্যশাস্ত্রের পঞ্চাঙ্গমান। “এই
উভয়ের সমন্বয়ে যে চরম একত্বে উপনীত
হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস
নাই। গীতা কিন্তু সে চরম একত্বে স্পষ্ট-
উপদেশ দিয়াছেন।” গীতার মতে ঈশ্বরই
অগতের মূলকারণ—“সর্বভূতেশ্বরে সনাতন
বীজ।” ১। এই পঞ্চভূতময় অড়অগৎ ও
জীবভূত অগৎ, তাহার দুই অংশ—দুই প্রকৃতি
—এক অপরা প্রকৃতি, অন্য পরা প্রকৃতি।

ভগবান্ বলিতেছেন—

ভূমিঃপান্থনো বায়ুঃ খঃ মনো বুদ্ধিঃশব্দঃ।

অহঙ্কার ইত্যঃ মে তিরা প্রকৃতিঃপরা।

অপরেণনিত্যত্বজ্ঞাঃ প্রকৃতিঃ বিদ্ধি মে পরা।

জীবভূতাং মহাবীজাং যদ্বদঃ ধাত্বাভে মনঃ ১-১

“ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন,
বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্টপ্রকার

প্রকৃতি। ইহা আমার অপরাধ বা নিরুপা
প্রকৃতি; ইহা ভিন্ন আমার উৎকৃষ্টা বা পরা
প্রকৃতিও জান।^১ ইনি জীববৃত্তা এবং ইনি
জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। কৃত চরিত্র
তাঁহার অপরাধ প্রকৃতি। ঈশ্বরের যে শক্তি
জীববৃত্তা—“যঃ প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ” এবং
যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই
তাঁহার পরা প্রকৃতি।

আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

মম যোনির্মহদ্বন্ধ তস্মিন্ পৰ্জঃ বধামাহুঃ ।

সম্বৎ সৰ্ব্বভূতানাং ভক্তা ভবতি ভাবত ।

সৰ্ব্বযোনিবৃ কৌন্তেয় দুৰ্ভয়ঃ সম্বন্তি য়াঃ ।

ভাসাং ব্রহ্ম মহঃশোনিরহং পৌরুষঃ পিতা ৷ ১—৫

প্রকৃতি (মহদ্বন্ধ) মহদ্বোনি, আমি
বীজপ্রদ পিতা; আমি এই প্রকৃতিরূপ
যোনিতে সমস্ত জগতের যে বীজ বিক্ষেপ
করি, তাহা হইতে কৃতসকল উৎপন্ন
হয়।

পুনশ্চ—

মুদাধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ পুণ্ড্রৈঃ সচাচরম্ ।

হেতুনানেন কেতুর জগৎ বিপর্য্যবর্ততে ৷ ১২

প্রকৃতি আমার অধাক্ষতানিধকন এই
বিশ্বেচরাচর প্রসব করিতেছে, এইহেতু জগৎ
পরিচালিত হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গীতু সত্ত্ব, রজ,
তমোগুণ প্রকৃতিসম্বৃত বলিয়া সাংখ্যমতের
পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু এই গুণত্রয়
আপনা হইতেই প্রকৃতিতে আসিয়া মিলিত
হইয়াছে, তিনি এ কথা বলেন না। এ বিবরে
ভগবৎপ্রতি এই—

যে চৈব মাষিকা ভাবা রাজনাপ্তোমশাং যে ।

মত এবেতি তান্ বিদ্ধি, ন মহঃ কেতুঃ তে মমি ৷ ১২

মাষিক, রাজসিক, তামসিক ভাবসকল
আমি হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন,
কিন্তু আমি এ সকলে আবদ্ধ নহি।

গুণই সর্বেসর্গা নহে, গুণের উপরেও
পরমাশ্রা আছেন, তাহা পরের স্রোকে
স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

নাত্মং জগত্যাঃ কৰ্ত্তাঃ যদা ব্রহ্মহুপকৃতি ।

গুণেত্যক্ত পরং যেতি নত্যাং সোহদিগচ্ছতি ৷ ১৩

গুণই কৰ্ত্তা, গুণ ভিন্ন কৰ্ত্তা নাই, ইহা
জানিয়া যিনি গুণের অতীত পরমাত্মাকেও
দেখেন, তিনি আমার শারূপ্যাভ করেন।

এই সকল স্রোক একত্র করিয়া ভাবার্থ
কি পাওয়া যায়? এই যে, প্রকৃতি চরম
তত্ত্ব নহে, ঈশ্বরই জগতের মূল কারণ। প্রকৃতি
তাঁহার শক্তি ধারণ করিয়া বিশ্বেচরাচর
সৃজন করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সেতুস্বরূপ
হইয়া সমুদ্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,
তাঁহার অধাক্ষতা, তাঁহার শাসনে প্রকৃতির
কার্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। প্রকৃতির
স্বয়ংজন্মমোহণ তাহা হইতেই প্রসূত,
কিন্তু তিনি এই জিগণে আবদ্ধ নহেন।
যে মাধক এই জিগণের মধ্য দিয়া জিগণা-
তীত পরমাত্মাকে দেখেন, তিনিই বোধ
দেখেন।

প্রকৃতির ভায়ে গীতার পুরুষতত্ত্বও ঈশ্বর-
ভাবে অহপ্রাপিত। গীতাক্ত পুরুষবাদ
সাংখ্যপুরুষতত্ত্ব হইতে অনেক ভিন্ন। গীতা
বলিতেছেন, “এই দেহে বর্তমান পরম পুরুষ
মাকী, অহমত্বা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর।
ইনি পরমাশ্রা বলিয়াও উক্ত হইলেন।”^{১৩}

পূনোক্ত ৩১ স্রোকে “অনাদিত্যায় ভর্গব্যং”
ইত্যাদি বিশেষণে পুরুষ পরমাত্মাকে

কথিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদতাবহি গীতার সারভব। অন্তঃকর্মে ভগবান্ বলিতেছেন—“আমি আত্মরূপে সকলের জন্মে অধিষ্ঠিত। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে।” এই পরমাত্মা যদিও জীবাত্মা হইতে পুঙ্খকল্পে কোপাও নির্দিষ্ট হন নাই, তথাপি “উপদ্রষ্টা, অমৃত্যু, তর্জী, ভোক্তা, মহেশ্বর” এই শব্দগুলি, কোনটি পরমাত্মার, কোন শব্দ বা জীবাত্মার প্রযোজ্য, দেন জীবাত্মা-পরমাত্মা দুটি পুরুষ দেহমধ্যে একত্রে বাস করিতেছেন।

উপনিষদে এই ভাব হুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

হা হুশী সত্যং সখ্যাত্মনঃ পুরুষঃ পরিপূর্ণতাত্মঃ ।

ভ্রমারনঃ পিঙ্গবঃ বাহ্যস্তানভ্যন্তোচ্চৈশ্বর্যকণ্ঠিতঃ ।

মুণ্ডক ২.১.১ ; শ্বেতাশ্বর ৪.১৩

হুই হুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—উভয়ের পরস্পরের সঙ্গ। ইহাদের একজন ফলভোক্তা, অন্তজন অনাহারী থাকিয়া সাক্ষিরূপে বিদ্যমান (গীতার যিনি অন্তর্দ্বারী এবং কলদাতা)।

পুরুষ এক কি অনেক? এই প্রশ্নের উত্তর বেদান্তে একপ্রকার, সাংখ্যে অন্ত-প্রকার। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। অমৃত্যুর কালভেদ, প্রকৃতি ও ভগভেদ, বর্ণাভ্রমভেদ ইত্যাদি কারণে পুরুষের বহু প্রতিপন্ন হইতেছে। পুরুষ যদি বহু হয়, তবে পুরুষ অর্থে পরিমিত জীবাত্মা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অথচ সাংখ্যের ইহাও বলেন যে, পুরুষ সর্বব্যাপী, পূর্ণমাত্মা প্রকৃতি গড়বিকারবর্জিত। পুরুষের

বহু এবং তাহার সর্বব্যাপী অনাদি নির্জ-কার ব্রহ্মপদে পরস্পর বিরোধী, তাহা তাহার বিবেচনা করেন না। সে কাহা হউক, গীতা এ বিষয়ে বেদান্তের পথবর্তী হইয়া বহু হইতে একে পৌছিয়াছেন। গীতোপদেশে অবৈত-ত্বের কিরূপ প্রাধান্য, তাহা জানবোধ-বাধ্যানে দৃষ্টে মনোচোচিত হইয়াছে, এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। গীতার প্রকৃতি-পুরুষের অত্র নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ। প্রকৃতি ক্ষেত্র, পুরুষ ক্ষেত্রজ। ভগবান্ ক্ষেত্ররূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাম-মান। “যেমন এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ একই পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকাশিত করেন।” ১৩, “যেমন সর্বত্রগামী মহাবায়ু আকাশে অবস্থান করে, তরুণ সকল তৃণই আমাতে (পরমাত্মাতে) অবস্থিত।” ১৪

আমি হ’তে পরত কোন ঠাই নাহি কিছু আর

সবে আমি ওজস্বাত, গাথা থা থায়ে মগিয়ার।

গীতোক পুরুষ সেই সর্বভূতান্তরাত্মা, সর্বব্যাপী পরমপুরুষ,—অনন্তভক্তি দ্বারা যাহাকে লাভ করা যায়। ২২

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের যে ব্যাখ্যা আছে, তজ্জা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরুন্মেষ করা যাইতে পারে। পুরুষ তিনপ্রকার—কর অর্থাৎ কর-অগৎ; অকর কিনা জীবাত্মা; এবং কর-করের অতীত বিশ্বব্রহ্মভর্তা পরমাত্মা যিনি, তিনি পুরুষোত্তম। এইস্থলে সাংখ্যপুরুষের উর্দ্ধে সেই সর্বব্যাপী সর্বাত্ম পরমপুরুষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অতএব দেখা গাইতেছে, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বে ঈশ্বরবান সমারোপিত করিয়া গীতা ত্রাহাকে নুতন করিয়া গড়িয়া ফুলিয়াছেন। সাংখ্যদশনে কি সৃষ্টি, কি মুক্তি, কিছুতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্কই নাই, সাংখ্যের লক্ষ্য যে কৈরলাসমুক্তি, তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান। কিসের জ্ঞান? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান—প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান। এই তত্ত্ব জ্ঞান বাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহার মুক্তি

অনিশ্চিত। এই জ্ঞানদ্বারা পুরুষ বস্তু আপনাকে আপনি সমাধিক্রমে জানিতে পারে, তখন প্রকৃতি নর্ত্তকীর লীলাপেলা ধামিরা যায়, সৃষ্টির বিগ্রাম হয়, তখনই জীব জগতের অধিকার ভাড়াইয়া কৈকলাধামে উপনীত হয়। ইহাই সাংখ্যপ্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতানির্দিষ্ট মুক্তিপথ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সে পথে বিচরণ করিতে হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া জীবের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমত্বেজস্রনাথ ঠাকুর ।

কসিকাদ্বীপের একটি গল্প ।

[অনুবাদ]

পটোভেকিয়োসহর হইতে কসিকাদ্বীপের ভিতরের দিকে উত্তরপশ্চিম মুখে চলিতে থাকিলে দেখিবে যে, অসি ক্রমেই চড়্‌তি। বড় বড় পাথরের ফাঁকে আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া, মাঝে মাঝে নালা পার হইয়া, ঘণ্টা-তিনেক চলিলে মাকীনাথক অঙ্গলের ধারে আসিয়া পড়িবে। এই মাকীনাথক কসিকার ছাপপালকদের ও বাহারা কোনরকম বে-আইনী কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের আজ্ঞা।

কসিকার চাষীরা অমিতে সার দেওয়া বাচাইবার জন্য অঙ্গলের এক আরগার আশুন লাগাইয়া দেয়। আশুন যদি দরকারের চেয়ে বেশীরকম ছড়াইয়া পড়ে, তাহার আর উপায়

নাই; কিন্তু সে যেমনই হোক, এই ছাই-পড়া অমিতে বুনারী করিলে চাষীর কসলের আর মার থাকে না। ক্ষেত উঠিয়া গেলে, আগেকার পাছের যে গোড়াগুলি পুড়িয়া যায় নাই, তাহা হইতে তাক্সা ভালপালা সম্ভার; এইগুলি বৎসরকতকের মধ্যে পাঁচছয়হাতপরিমাণ ঠেলিয়া উঠে। এই-প্রকার ঘন পাছড়ার অঙ্গলকে মাকী কহে। ইহাতে পাঁচরকমের গাছ যেমন-তেমন জড়া-জড়ি করিয়া বাড়িতে থাকে। কুড়লহাতে না গেলে ইহার মধ্যে মাছবের বাতারাভের সাধ্য নাই। জাগগায় জায়গায় এই মাকী এত ঘন ও বেঁধাঘেঁষি যে, বুনা ছাগলগুলিও ভেদ করিতে পারে না।

যদি মাহুব পুন করিয়া থাকে, তবে এই পট্টোভেক্সিয়ার নাকীর আশ্রয় লইয়ো। সেখানে একটি ভাল বন্দুক ও কিছু বারুদগুলি লইয়া নির্ভীয়ে বসবাস করিতে পারিবে। একটি মোটোগোচের গায়ের কাগড় লইতে তুলিয়ো না, তাহা পাতাও চলিবে, গায়ে দেওয়াও চলিবে। ছাগপালকেত্রা তোমাকে দুখ-ছানা-বাদাম ভোগাইবে এবং আইন-আদালত বা দ্রুতব্যক্তির আত্মীয়বন্ধন হইতে তোমার কোনই ভয় থাকিবে না,—যতক্ষণ না বারুদাদি কিনিবার জন্য আবার মহেরে বাইতে বাধ্য হইবে।

আমি যখন ১৮—সালে কসিকার গিরা-ছিলাম, তখন মাটিয়ো নাকী হইতে ক্রোশ-খানেক দূরে বাড়ী করিয়াছিল। সে স্থানের মধ্যে মাটিয়ো কিছু অবস্থাপন্ন লোক। সেখানকার যুনোরা তাহার ছাগলের পাল পাহাড়ের উপর এখানে-ওখানে চরাইয়া বেড়াইত, ইহারই আর হইতে মাটিয়ো রাজার হালে থাকিত, অর্থাৎ তাহাকে আর খাটিয়া খাইতে হইত না।

আমি যে ঘটনার কথা আজ বলিব, তাহার বৎসর-দুই পরে আমার যখন মাটি-য়োর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাহার বয়স পঞ্চাশের বেশী দেখায় নাই। কল্পনা কর—মজবুত গড়নের বৈটেখাটো মাহুবটি, বিশৃঙ্খল কালো কোঁকড়া চুল, টিকিল নাক, বড় বড় অলঙ্কারে চোখ, পোঁড়া-পোঁড়া রং।

তাহাদের মধ্যে, প্রায় সকলেই যেখানে বন্দুক ভাল ছুঁড়িতে পারে, সেখানেও মাটি-য়োর নিশানা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার ভক্ত খুব ধোঁধানাম ছিল। ধর না কেন, সে কখনো

ছুরা দিয়া যুনো ছাগল মারিত না, তিন-রশি তফাৎ হইতে ইচ্ছামত মাথাধ কি কাঁধে এক গুলি লাগাইয়া তাহাদিগকে পাড়িয়া ফেলিত। লোকে আশীর কাছে তাহার হাতপাকাইয়ের এক গম করিল,—বাহা কসি-কার বাহিরের লোকেবু হঠাৎ বিশ্বাসই হইবে না। হাতপকাশেক দূরে এক বাতি বলাইয়া তাহার সামনে এক পাতলা কাগজ ধরা হইল। এই কাগজের দিকে সে নিশানা টিক করিবার পর বাতি নিবান হইল। মিনিটখানেক পরে আওয়াধ করিতে আরম্ভ করিয়া সে চারবারের মধ্যে তিনবার কাগজ ফুটো করিল।

একুপ অসাধারণ নৈপুণ্য থাকার মাটি-য়োর বিশেষ ব্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। লোকে বলিত যে, সে পক্ষিস্থাবে যেমন ভয়কর, বন্ধুরূপে তেমনি বিশ্বাসী। সে সর্গদ্বাই লোকের কাজকর্ম উদ্ধার করিয়া দিত, গরী-বের প্রতি মুক্তহস্ত ছিল, এবং সে জেলার সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখিয়া চলিত। তবে তাহার নামে এ গরও ছিল, যে, কটেজেলার যেখানে সে বিয়ে করে, সেখানে যে ঘেরেকে তার পছন্দ হয়, তার আর-এক উপস্থিত পাতকে সে কিছু সংক্ষেপে সমাইয়া ফেলিয়া-ছিল; অতঃপর সে ব্যক্তি একদিন কানাইতে বসিলে, তাহাকে আচম্ভক্যে যে গুলিটি লাগে, সেটি লোকে মাটিয়োর নামেই জমা করিয়া রাখিয়াছিল।

এই ব্যাপার চাপা পড়িয়া গেলে, মাটিয়ো বিবাহকার্য সমাধা করে। তাহার স্ত্রী গীসেপা প্রথমে তাহাকে একটির পর একটি তিন কড়া জোদান দেওয়াতে সে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছিল। পরে এক ছেলে হইল, মাটিরো তাহার নাম রাখিল কটুনাটো (ভাগাবান্)। সেই ইহাদের একমাত্র বংশধর এবং পরিবারের আশ্রয়। "মেয়েগুলির সংপাতে বিবাহ হইয়াছিল সময়ে-অসময়ে তাহাদের বাপ নিঃসন্কেতে জামাইয়ের বন্ধু ও ছোৱার উপর নির্ভর করিতে পারিত। ছেলেটি সে সময়ে দশবৎসরের মাত্র, কিন্তু তার মধ্যেই উপবৃত্ত হইয়া উঠিবার বিলম্ব করিচ্ছিল হিতে-ছিল।

একদিন শরৎকালে মাটিরো গ্রীকে লইয়া মাকীর মধ্যে এক আবাদে তাহার ছাপলের পাল ভবাবধান করিবার জন্য সকাল-সকাল বাড়ী হইতে বাহির হইল। কটুনাটোর ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যায়, কিন্তু সে আবাদ অনেকদূর, তা ছাড়া বাড়ী-খবরদারী করার জন্যও একজনের থাকাদরকার, তাই বাপ ব্যরণ করিল। ইহার জন্য তাহাকে পড়াইতে হইয়াছিল কি না, পরে দেখা যাইবে।

মাটিরো ঘণ্টাকতক গিয়াছে। কটুনাটো প্রস্তুতভাবে রোদে শুইয়া দূরের নীল পাহাড়গুলি দেখিতেছে, আর আগামী রবিবারে সুবেদার-খুড়ার ওখানে নিমন্ত্রণ যাইতে যাইবে, সে কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে এক বন্ধুকের আওয়াজে তাহার চিন্তার স্রোত হঠাৎ বাধা পাইল। সে উঠিয়া, মাঠের যে দিক হইতে আওয়াজ আসিল, সে দিকে কিরিয়া তাকাইল। আওয়াজের পর আওয়াজ কখনো অম, কখনো বেই সমর অন্তর হইতে হইতে ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। শেষে মাঠ হইতে মাটিরোর বাড়ীর দিকে আসিবার রাস্তার মাথার এক লোক দেখা

গেল। তাহার নখা নাড়া, পরনে ছেঁড়া কাপড় ও পাহাড়ী টুপি; বন্ধুকের উপর শাঠির মত হর দিয়া কোমরকমে শরীরটাকে টানিয়া আনিতেছে। তাহার উরুতে গুলির চোঁট লাগিয়াছে।

এই লোকটি দল্লা—অর্থাৎ আইনের হাত এড়াইবার জন্য পালাইয়া বেড়াইতেছে। সে রাস্তারান্তি সহরে বাকল আনিতে গিয়া রাস্তার একদল সিপাহীর হাতে পড়িয়া গিয়াছিল। খুব একপতন লড়িয়া, সে কোন-গতিকে পাথরের আড়ালে আড়ালে ফিরিয়া বোঁড় দিতে পারিয়াছিল। তাহারও কঁাকে পাইলেই গুলি চালাইতে চালাইতে উর্দ্ধ্বাসে তড়া করিয়াছিল। সে সিপাহীদের অস্ত্র-মাত্র আগিহে ছিল, এমন অবস্থায় বোঁড়া পা লইয়া ধরা পড়িবার আগে তাহার পক্ষে মাকীতে পৌছন অসম্ভব। সে কটুনাটোর নিকটে আসিয়া কহিল—“তুই কি মাটিরোর ছেলে?”

“হাঁ।”

“আমি গ্যানেটো। আমাকে লাল পাগড়ীতে তড়া কংছে। আর চলতে পারছি নে, আমাকে লুকা।”

“বাবকে জিজ্ঞাসা না করে তোমাকে লুকোলে তিন কি বলবেন?”

“তিনি বলবেন—‘বেশ করেছিস্।’”

“কে জানে?”

“দীর্ঘ লুকা, তারা এল বলে।”

“বাবার বাড়ী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর না।”

“আরে মজা! অপেক্ষা করব কি? তারা আর পাঁচমিনিটের মধ্যেই পৌছে যাবে।”

আমার লুকে। নশি, নর ও গোকে যেমনই ফেলবে।”

কটুনাটো অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তর করিল—
—“তোমার বন্ধু ত দেখছি খালি, আর খেলতেও আর টাটা নেই।”

“আমার ছোরাটা ত আছে।”

“আমার সঙ্গে দৌড়ে পারবে?”

এই বলিয়া বালক এক লাফে দম্ভার আয়তনের বাহিরে গেল।

“তুই দেখছি বাপের বেটা ন’সু। আমাকে শেষে বাড়ীর সামনে ধরিয়ে দিবি?” এই কথা বালকের মনে লাগিল। সে একটু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তোমাকে লুকোলে কি দেবে?”

দম্ভা কেবল ঘাঁটিয়া একটি মুজ্রা বাহির করিল। বোধ হয় ইহা সে বান্দবগিরিরে অস্ত্র রাখিয়াছিল। রূপা দেখিয়া কটুনাটোর মুখে হাসি দেখা গিল। সে মুজ্রাটি খাবলাইরা-ধরিয়া গ্যানেটোকে বলিল—“কিছু ভর নেই।”

তৎকণাৎ পার্শ্ববর্তী খড়ের গাদার সে এক মন্ত গর্ত করিল। গ্যানেটো ভাঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া গেলে বালক তাহাকে এমন করিয়া খড়চাণা দিল যে, দম্ভও বন্ধ না হয়, অথচ ভিতরে লোক আছে, তাহা ঘূণাক্ষরেও বুঝা সম্ভব না হয়। সে আর এক প্যাঁচাও কুণি ঠাওরাইল। এক বিড়াল সবে বাজা দিরাছিল, সেগুলিহুৎ তাহাকে গাদার উপর রাখিল,—বাহাতে দেখায় যেন সম্প্রতি খড় নাড়াচাড়া করা হয় নাই। পরে বাড়ীর ধারের রাস্তার রক্তের দাগ দেখিয়া সেগুলি বেশ করিয়া ঘূণাচাণা দিয়া সে

আবার আগেকার মত পলায়নভাবে দৌড়ে গুইয়া পড়িল।

মিনিটকতক পরে এক জমাদারের অধীনে ছরজন থাকোঁপোবাক লালপঙ্গুধারী সিপাহী মাটিরোর দুরারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল জমাদার, মাটিগোসের কুটুং হইত, তাহার নাম গধা। সে খুব ভূখোড় সিপাহী, অনেক দম্ভা গেরেস্তার করিয়াছে বলিয়া তাহার উহাকে বধের মত ভর করিত। কটুনাটো যেখানে গুইয়া ছিল, সে দিকে হাঁটিয়া গিয়া সে কহিল—“কিরে ভায়া! তুই যে মন্ত হয়ে উঠেছিস! এখান দিখে এইমাজ কাওকে যেতে দেখেছিস?”

বালক ভ্রাতা সাজিয়া উত্তর করিল—
“আমি কিন্তু তোমার মত ঢাণ্ডা এখনো হ’তে পারি নি জমাদারদাদা।”

“সময়ে সবই হবে। কিন্তু বল দেখি, কোন লোক যেতে দেখিছিস কি?”

“লোক যেতে দেখেছি কি না?”

“হাঁ। একটা লোক, মাথার কালে। মথুগের পাহাড়ী টুপি, গারে হলুদ-কাক-করা লাল কোর্তা।”

“মাথার পাহাড়ী টুপি, গারে হলুদ-কাক-করা লাল কোর্তা?”

“হাঁ। চট করে” উত্তর দে না, আমার কথাগুলো এমন করে আওড়াস নে।”

“আজ সকালে পাহাড়ীসাহেব আমাধের দুরোর দিখে বোড়ার চড়ে” গিরেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা কয়লেন, ‘বাবা কেমন আছেন?’ আমি বল্লম—”

“কিরে বদমাইস! আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে নাকি? না করে বলে’ ফেল, গ্যানেটো”

কোনদিকে গেল। আমরা তাকেই খুঁজছি।
আমি বেশ জানি, সে এই রাস্তা ধরে' গেছে।"

"কে জানে?"

"কে জানে কিরে? আমি জানি, তুই তাকে দেখেছিলি।"

"ঘুমিয়ে থাকলে কি মানুষ দেখা যায়?"

"তুই কখনই ঘুমিয়ে ছিলি নে হস্ত-
ভাঙ্গা! বন্ধুকের আওয়াজে নিশ্চরই তোকে
জাগিয়ে দিয়েছিল।"

"তোমার বন্ধুকের এতই আওয়াজ
নাকি জমাদারদাদা? আমার বাবার বন্ধু-
কটার ওর চেয়ে ঢের বেশী হয়।"

"মুখ পাখী ছোঁড়া! আমি ঠিক বুঝেছি,
তুই গ্যানেটোকে দেখেছিলি—হয় ত লুকিয়েও
থাকতে পারিস। দেখ ত বাবার, বাড়ীর
ভিতর দিয়ে দেখ ত, বেটা আছে কি না।
তার এক পা বই চলেছিল না,—সে কাঁচা ছেলে
ত নয় যে, ঐরকম চালে নাকী পর্যন্ত তেলে
চলবার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া রক্তের দাগও
এখানে-এসে থেমে গেছে।"

ফটু'নাটো একটু ফত্কে হাসি হাসিয়া
বলিল—“বাবা কি বলবেন? তিনি না থাকতে
তোমরা বাড়ী চড়াও হয়েছ জান্লে কি
বলবেন?"

গম্বা-জমাদার বাণকের কান ধরিয়া
কাঁহিতে লাগিল—“যারে শাস্তাছাড়া! তুই
জানিস, আমি মনে করলে তোর হুর বন্দে
কিতে পারি! দশবিশ বা কসালে বোধ
হয় তোর কথা বেরোবে।"

কিন্তু ফটু'নাটোর আক্লান্দেশনা ঘুটিল না
—সে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—“আমার
‘বাবা মাটিরো!”

“জানিস পাখী ছোঁড়া, আমি তোকে
গারনে পুরতে পারি, তোকে হাতে-পায়ে
শিকল দিয়ে অন্ধকূপে ফেলে রাখতে পারি?
গ্যানেটো কোথা আছে যদি না বলিস, তোকে
কাঁসিকাঠে চড়াব।"

এই কাকী লম্বা-চোড়াই গুনিয়া ছেলে
ত হাসিয়া কুটিকুটি। সে আবার বলিল—
“মাটিরো আমার বাবা!"

এক সিপাহী কানে কানে কহিল—
“জমাদারজী, মাটিরোকে খাটিয়ে কাঁচ
নেই।"

গম্বা মুকিলে পড়িল। সিপাহীদের বাড়ীর
ভিতরটা দেখিয়া আসিতে বৈশী সময় লাগে
নাই—কসিকার গৃহস্থের বাড়ী বলিতে একটি-
মাত্র চৌকাঘর, বসিবার, খাইবার ও শিকার
করিবার বাহা-কিছু জিনিষপত্র, সব তাহারই
মধ্যে। সিপাহীর ফিরিলে গম্বা তাহারের
সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করিতে লাগিল।
চুই ফটু'নাটোটা তাহার দাখা ও সিপাহীরা
গোলে পড়িয়াছে দেখিয়া খড়ের গাদার হেলান
দিয়া বিড়ালের গারে হুত ব্লাইতে ব্লাইতে
মজা দেখিতে লাগিল।

এক সিপাহী খড়ের গাদার নিকট গেল,
বিড়াল দেখিল; আলগোচে একবার খড়ের
গারে সঙানের খোঁচা মারিল; আবার—
‘এমন জারপায় কি মানুষ থাকতে পারে,
দেখতে হয় বলে' দেখা'—এইভাবে মাথা
নাড়িয়া ফিরিয়া আসিল। খড়ের মধ্যে কোন
সাদাশপ পাওয়া গেল না, বাণকের মুখেও
কিছু চাকলা দেখা দিল না।

জমাদার ও তাহার দল কি করিবে, কিছুই
ভাবিয়া পায় না। কেহ কেহ খেন

হর' ভাবে এক আধবার নাচের দিকে তাকাইতে লাগিল। এমন সময়ে কঠা, শাসনে কিছু হইবার নহে সাবাস্ত করিয়া, মিষ্ট কথা গারে হাতি বৃণাইয়া কান-উভারের শেব-চোটা দেখাইয়া করিল। সে বলিল—“ভায়া খুব হ'সিয়ার ছেলে। এর পর একজন হ'রে উঠ'বি দেখ'ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে এমন ব্যবহারটা কি বড় সুবিধের হ'ল? মাটিয়া-খুড়ো যদি মনে কঠে না পেত, আমি তোকে সঙ্গে ধরে' না নিয়ে যেতাম ত কি বলছি।”

“ইস্!”

“খুড়ো কিন্তু কি'বে এ'লে আমি সব বলে' দেব। তুই মিথ্যাক'বা বলে'ছিস্ জন্ম'লে সে নারের চোটে তোর চামড়া ফাটি'বে দেখে।”

“তার পর?”

“তুই দেখে নিস্। কিন্তু দেখু, ভাল ছেলে হ'লে আমি তোকে একটা জিনিষ দেব।”

“জমাদারদাদা, আমিও তোমাকে একটু উপদেশ দেব। তুমি যদি এখানে আর দেবী কর, তা হ'লে গ্যানেটো মার্কাতো পৌছে বাবে, তখন তোমার মত দশটা শেরানি কুইলেও তাকে আর ধরতে পারবে না।”

জমাদার গেব হইতে রূপার ঘড়ি বাহির করিল, নাম আন্সাজ বিশপচিন টাকা হইবে। লোডে কটু'নাটোর চোখ অলিতেছে দেখিয়া, সে চেনের আগা ধরিয়া ঘড়িটি তাহার মুখের সামনে লটকাইয়া বলিতে লাগিল—“কিরে বন্দাইস্! এরকম ঘড়ি গলায় দুলিতে বেড়াতে লাগ'বে কেমন? সহরের মধ্যে দি'রে ঘাবি'দেন ময়ুর প্যাকম তুলে' শে'খু। আর সবাত কেটা বেছেছে, কটা

বেছেছে' করে' চারদিকে ঘির'বে, আর তুই বল'বি—‘আম'র ঘড়িটা দেখে নাও না গা!’”

• “আমি বড় হ'লে সুবেদার-খুড়ো আমার ঘড়ি দেবে।”

“তা ত দেখে, কিন্তু সুবেদারের ছেলের যে এখনই ঘড়ি রয়েছে—সেটা এত ভাল নয় বটে, তবে তার বয়সও তোর চেয়ে কম।”

বালক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

“আচ্ছা ভায়া, আমার এ ঘড়িটা চান্ কি না, বল দেখি?”

হঠাৎ আশ্রমাচ্ছ সামনে ধরিয়া দিলে বিভাগের বেমন হর, ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কটু'নাটোরও সেইরকম চেহারা হইল। বিভাগ সন্দেহ করে, বুঝি-বা তাহালা করা হইতেছে; একবার করিয়া থা'বা বাড়ায়, অথচ ছু'ইতে সাহস পায় না; মাঝে মাঝে চোখ ফিরাই,—পাছে অতি লোডে বিপন্ ঘটে; আবার ঠোট চাটে, যেন মনিবকে বলিতেছে—“এমন নিষ্ঠুর ঠাট্টা কেন?”

গদা-জমাদারের চেহারার কাকির ভাব কিছু না থাকিলেও কটু'নাটো হাত না বাড়াইয়া, কাঠহালি হালিয়া বসিল—“আমাকে নিয়ে মজা পেরেছ নাকি?”

“মাইরি! আমি ঠাট্টা করছি নে। গ্যানেটো কোথায়, আমাকে বল্লেই এই ঘড়ি তোরই হবে।”

অবিশ্বাসের ভাবে মুচুকে হেসে কটু'নাটো তার বড়-বড় কালো-কালো চোখ দিয়া জমাদারের মুখের দিকে প্যাটপ্যাট করিয়া চাহিয়া তাহার কপাল কত'র বিশ্বাস করা চলে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। জমাদার বলিয়া উঠিল “বা বলছি, তা করলে বড়ি তোকে যদি না দিই, তবে আমি জমাদারই নই। আমার এই লোকজন সব সাক্ষী রয়েল, আমার কথা খেলাপ করার জো নেই।”

এইরূপ বলিতে বলিতে গদা বড়িটা ক্রমেই বলকের মুখের কাছাকাছি আনিতে লাগিল, শেষে প্রায় তাহার গালে আদিয়া ঠেকিল। মুখ দেখিয়াই বুঝা যায় যে তাহার মনের ভিতরটা কেমন তোলপাড় করিতেছে—‘বিশ্বাস তাত্তি, কি বড়ি ছাড়ি।’ তাহার খোলা বুক সম্মুখে উঠিতে-পড়িতে লাগিল, আর একটু হইলে যেন দম আটকাইয়া আসিবে। ততক্ষণ বড়ি সম্মুখে ছলিতেছে, কখনো গুরিয়া নাফেও ঠেকিতেছে। অবশেষে একটু একটু করিয়া ডানহাতটা বড়ির দিকে উঠিতে লাগিল; আঙ্গুলের ডগা তাহাতে গিয়া ঠেকিল: বড়ির পুরো বোকাটা হাতের উপর পড়িল। কিন্তু জমাদার তাহাতেও চেনের আগাটা ছাড়িল না। কানের ভিতরটার আকাশের মত নীল রং, বাহিরের তপাটা টাটকা পালিশ করা, ব্রোদে আঙ্গুলের মত ঝলকাচ্ছে। লোভ আর কিছুতেই সামলাইয়া রাখা গেল না।

কটুনাটো ধী-হাতটাও তুলিয়া কাঁধের উপর দিয়া বুড়া আঙুলের ইচ্ছিতে পিছনের খড়ের পাখাটা দেখাইয়া দিল। জমাদার তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল চেনটা ছাড়িয়া দিল। কটুনাটো বড়িটা এখন নিজস্ব সম্পত্তি জানিয়া হরিণের মত একলাফে খড়ের কাছ হইতে হাতকতক ভক্ষাতে সরিয়া দাঁড়াইল। সিপাহীরাও

তরুণে খড় নাবাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে খড় নড়িয়া উঠিল এবং এক রক্তমাখা লোক ছোঁড়াহাতে বাহির হইল। কিন্তু সে উঠিতে গিয়া দেখে, পারের লক্ষমটা আড়ষ্ট হওয়ার তাহার খাড়া হইবার উপায় নাই। সে সেখানেই পড়িল। জমাদার তাহার খাড়ের উপর হৃদয় খাটাইয়া পড়িয়া ছোর! ছিনাইয়া লইল। মুহূর্তমধ্যে তাহার খড়্‌ফানিসহেও সে আটোপিটে বাধা পড়িল।

গ্যানেটো দড়িবাধা কাঠের বোকার মত মাটিতে পড়িয়া নিকটে আগন্ত ফটুনাটোর দিকে ফিরিয়া, গত না রাগে, ততোধিক ঘৃণার বলিল,—“—র বাচ্ছা!”

বালক তাহার নিকট যে মুদ্রাটি পাইয়াছিল, তাহাতে আর অধিকার নাই বোধে তাহা গ্যানেটোর দিকে ছুঁড়িয়া দিল। কিন্তু সে কাথোর প্রতি দয়া কক্ষণমাত্র করিল না। সে জমাদারকে অতি প্রশান্তভাবে বলিল—“পরাভাট, আমি তা হাঁটতে পারব না, কামাকে সহর পর্যন্ত ধ’রে নিয়ে যেতে হচ্ছে।”

বিজয়েৎজুল জমাদার কহিল—“এই-সাজ ত’ তুমি ছাগলের বাচ্ছার মত লাকাতে লাকাতে এলে। আচ্ছা তবু নেই, আমি তোমার ধনুতে পেয়ে এত খুশী আছি যে, গিঠে করে’ নিয়ে একক্রোশ হাঁটলেও হারয়ান্ হব না। বা হোক, ভালপালার উপর তোমার গায়ে কানপড়টা পেতে একটা ডলির মত করে’ দিচ্ছি, একটু আগে গিয়ে ঘোড়া পাওয়া যাবে এখন।”

বন্দী कहिल—“দেউ ভাণ, চুনির উপর ছুটি খড়ও বিছিয়ে দিও, যাতে একটু আরামে যেতে পারি।”

সিপাহীরা কেহ ভালপালা জুটাইয়া ভুলি গড়িলে, কেহ বা গ্যানেটোর ঘাটার কাপড় বাধিতে বাস্ত, এমন সময়ে হঠাৎ সত্ৰীক-মাটিয়োকৈ মাকীর রাত্রার কাঁকের উপর দেখা গেল। স্ত্রীটি মত্ত এক বাসামত্তরা খলের ভারে কষ্টে স্থিত্ব; চলিতেছে, বামটি কেবল হাতে এক বন্দুক, পিঠে ঝোলান এক বন্দুক লইয়া। খাতিরমদারতাবে আসিতেছে—কারণ পুরুষমানুষের অগ্রগণ্য ছাড়া অন্য কোন বোঝা বহিতে নাই।

বাড়ীতে সিপাহী দেখিয়া মাটিয়োকৈ প্রণমেই ভাবিল, বৃদ্ধি তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। তাহার এমন খট্কা লাগে কেন? সে কি কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কিছু বাগাবাদী করিয়াছিল? তাহা নহে—মাটিয়োকৈ ত সরকারের বাধা বলিয়া জ্বাতিই ছিল। তবে হাজার হোক কসিকাবাদী, তাহার উপর পাহাড়ী। ও জাতের এমন প্রাণ কেহই নাই, যাঁহার পূর্বকথা ভাবিতে বসিলে একটানা-একটা গল্প মনে না পড়ে—হয় বন্দুকের গুলি, নয় ছোয়ার খোঁচা, নয় ত ঐরকম ছোটখাটো কিছু একটা। অন্যদের অপেক্ষা এ সবকিছু মাটিয়োকৈ মনটা কিছু পরিষ্কারই ছিল, কারণ বছরদশেক হইল, সে কোর মানুষের দিকে বন্দুক তাগু করে নাই। তবু সাবধানের মার নাই, হুতরাং সে বাচিবার একচোট ভালরকম চেষ্টা করিতে পারিবার মত ব্যবস্থা করিল।

স্ত্রীকে कहिल “ওগো! দোচুকা যেন তৈরী হও।”

গীলোয়া তৎক্ষণাৎ হুকুমমত কাজ করিল। প্যুছে কাছের সমস্ত বাধে বলিয়া কাঁধে-ঝোলান বন্দুকটা সে স্ত্রীর হাতে দিল। হাতের টার ঘোড়া তুলিয়া ধীরে ধীরে গাছের সাতের ধার দিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল, যাহাতে যোগাযোগ দেখিলেই সে একলাকে বড় একটা গাছের পিছনে নিজের লরীর আড়াল করিয়া বন্দুক চাড়িতে পারে। স্ত্রী ফাল্গু বন্দুকটা আর টোটোর বাক্স লইয়া পিছনে পিছনে লাগিয়া রহিল। বুকের সমস্ত গুণ্ণহিণীর কাণা বামীর অজ্ঞ জোগান।

ওদিকে জমাদার মাটিয়োকৈ একাধে পা টিপিয়া টিপিয়া বন্দুক তুলিয়া আসিতে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল—“কি জানি যদি এই গ্যানেটোর সঙ্গে মাটিয়োকৈ কোন আত্মীয়তা পাকে, কিংবা যদি বন্দুই হ’লে একে খালাস করিতে চায়, তা হ’লে চিঠি ডাকে দিলে যেন নির্ধাত ঠিকানায় পৌছয়, ওর ছই বন্দুকের ছই গুলি দু’জনকে পাবেই পাবে। আর কুটুখিতা ছলে যদি আমায়ই উপর বন্দুকের বাঁধিটা কেলে বসে?”

এই সমস্তার অবস্থার সে এক অতি সাহসিক মন্তব্য আঁটিল। সে কুটুখোচিত সন্তা-বণ করিয়া একাই মাটিয়োকৈ দিকে অগ্রসর হইয়া ঘটনাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে চলিল। যে অল্প পথটুকু তাহাকে এইভাবে বাইতে হইল, সেটা ভয়ঙ্কর লম্বা বোধ হইতে লাগিল। নিকটে গিয়াই হাঁকিল—“কিপো

খুঁড়োমশায়! তোমার দরদার কি ?
আমি তোমার কুটুপ, গম্বা !”

মাটিরো উত্তরে কপাটি না কহিয়া থামিয়া
গেল, এবং গম্বা যতদল কথা বলিতেছে, তত-
ক্ষণ বন্ধুক আঁতে আঁতে উঠাইয়া, জমাদার
পৌছিতে পৌছিতে নল আকাশের দিকে
করিল। জমাদার আবার বলিল—“ভাল ত
খুঁড়ো, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়
নি।”

“কি ববর ?”

“এ দিক্ দিগে যেতে যেতে ভাবলুম,
তোমার বাড়ীতে তুঁ মেরে খবরটা নিয়ে গাই।
আমাদের আল সাজ্জা নগা পাল্লা হয়েচে,
কিন্তু তাতে তঃব নেই, এক মন্ত শিকার
পাওয়া গেছে। গ্যানেটোটা ধরা পড়েছে।”

গীসেপা বলিয়া উঠিল—“বাটা গেল!
সবে সেদিন ও আমাদের একটা ছাপল চুরি
করেছে।”

এই কথার গম্বার ধড়ে প্রাণ এল।

মাটিরো কহিল—“বোটা কি মাথে করেছে
—বিশের চোটে খেঁচারা করে কি ?”

জমাদার কিছু দমিয়া গিয়া কহিতে লাগিল
—“হতভাগাটা বাথের মত লড়েছিল। আমার
এক সেপাইকে ত মেয়েই কেনে - শুধু তা
নয়, আবার চার্দ-সরদারের হাত ভেঙে
দিলে—তবে তাকে বড় লোকমান হয় নি,
সে বোটা করাঁসী বৈ ত নয়। তার পর এমন
না ঢাকা দিলে যে, মরতানেরও সাধা নেই,
খুঁজে বার করে। আমার কটুনাটো-ভায়া
অজুগ্রহ না করলে ওকে কিছুতেই পাকড়াও
করা যেত না।”

মাটিরো বলিয়া উঠিল—“কটুনাটো?”

প্রতিশ্রুতির মত গীসেপা কহিল—“কটু-
নাটো?”

“হাঁ। গ্যানেটো। তোমার ঐ খড়ের
গাদাটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু ভায়া
আমার তার বিত্তে কাঁস করে’ দিলে। আমি
জুবেনার-খুঁড়োকে বোলবো, যাতে ওর বাহা-
ছরীর জন্তে ভালরকম পুরস্কার পাঠিয়ে দেব।
আর ফটুনাটোর সঙ্গে তোমারও নাম আমি
জেনেরালসাহেবের কাছে জানাব।”

যাত কিড়মিড় করিয়া মাটিরো বলিল—
“মরণ আর কি !”

এতক্ষণে তাহার সিপাহীদলের নিকটে
পৌছিল। গ্যানেটো। ব্রহ্মা হইবার জন্ত
প্রস্তুত হইয়া ভুলিতে বসিয়াছিল। গম্বার
সঙ্গে মাটিরোকে দেখিয়া একটু বাঁকা-হাসি
হাসিল। পরে বাড়ার ছরারের দিকে মুখ
কিয়াইয়া খুঁ ফেলিয়া বলিল—“খুবখোরের
বাড়ী!”

মরিবার জন্ত প্রস্তুত না হইয়া মাটিরো-
স্বপ্নকে এমন কথা বলিতে কেহ সাহস পাইত
না। ছোরার এক বাথে এক বৈ ছরের
দরকারই হইত না—এ অপমানের হাতে-
হাতে শোধ হইত। কিন্তু মাটিরো
শিরে করাঘাত ছাড়া আর কোনরকম নড়া-
চড়া করিল না, তাহার বা’ হইবার, বেন
হইয়া গেছে।

বাবাকে আসিতে দেখিয়া কটুনাটো
বাড়ী ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। একই পরেই
সে একপাত্র গুধ হাতে বাস্তিরে আসিয়া বাড়
হেঁট করিয়া তাহা গ্যানেটোকে দিতে গেল।
দম্ভ্য তারবারে চীৎকার করিয়া উঠিল—
“দুর হাঁ!”

পরে একজন সিপাহীও দিকে ফিরিয়া কহিল “ভাই হে, একটু জল দাও তা।”

সিপাহী নিজের কনের চোখটা তার হাতে বরিয়া দিলে, ধরা। বাহার সঙ্গে সবে মাত্র সমানে লাড়িয়াছিল, তাহার হাতে অন্য-রাসে জল খাইল। তাহার পর সে দরবার করিল,—বাহাতে তাহার হাততাইটা পিঠের দিকে না বাধিয়া বৃকের উপর রাখিয়া বাধা হয়। সে বলিল—“আমি আরামে শুতে ভালবাসি।”

তাহারা বিনা বাধ্যবৃত্তে ধরাই ইচ্ছা পূর্ণ করিল। পরে জমাদার নিকন্তর মাটিঘোর নিকট বিদায় চাহিয়া চলিবার ইঙ্গিত করিল এবং হনহনপক্ষে মাঠের দিকে নাথিয়া গেল।

মিনিটদশেক মাটিঘোর বাক্য সরিল না। বালক একবার মার দিলে, একবার বাবার দিকে ক্যালক্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল; বাপ রাগে গম্ভীর হইয়া তাহার দিকে কটমটু করিয়া চাহিয়া রহিল। খানিক পরে চাপা, অথচ বাহারী জানে তাহাদের পক্ষে ভয়ানক হয়ে মাটিঘোে বলিল—“আরস্ত করেছ ভাল।”

“বাবা!”—বলিয়া বালক ছলছল চোখে বেন বাপের পায়ে পড়িবার জন্য এক পা বাড়াইল।

কিন্তু মাটিঘোে গম্ভীর উঠিল—“আমার কাছ থেকে দূর হ।”

বালক ক্রুদ্ধিত্তে কানিতে বাপের নিকট হইতে ছুইচার পা তাকাতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

গীসেপা কাছে আসিল। কটুনাটোর

পিরানের ফাঁক হইতে চেনের আগটা বাহির হইয়াছিল, সেটা তাহার চোখে পড়িল। সে কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—“ঘড়িটা তোকে কে দিলে?”

“জমাদারদাদা।”

মাটিঘোে এক হ্যাঁচকার ঘড়ি টান দিয়া পাণরের উপর আছড়াইয়া চূরনার করিল। সে বলিল—“দেখ মাগি! এ ছেলে কি আমার?”

গীসেপার রোদে-পোড়া গালদুটা ইটের মত টকটকে হইয়া উঠিল।

“তুমি কি যে বল, তার ঠিক নেই,—কর সঙ্গে কথা ক’জ, ভুলে গেছ নাকি?”

“বা হোক, এ বংশের এহ প্রথম ছেলে, যে ভুলেও অবিবাসের কাজ করেছে।”

কটুনাটোর কীজনো-মোজানী বিগুন বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু মাটিঘোর ব্যথের চাহনী তাহার মুখ হইতে সরিল না। অবশেষে সে বাঁটুটা একবার মাটিতে ঠুকিয়া বশুক আবার বাড়ি তুলিয়া গেল এবং কটুনাটোকে সঙ্গে আসিতে হুকিয়া মাকীর দিকে ফিরিয়া চলিল। বালক তাহাই করিল।

গীসেপা মাটিঘোর শিচনে ধাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল এবং কালোচোখে স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বেন তাহার মনের কথাটা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—“ওখো, তোমার ছেলে যে গো!”

মাটিঘোে বলিল—“আমায় ছাড়, আমি ওর বাপ।”

গীসেপা ছেলেকে একবার বৃকে আঁকড়া

ইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া বিত্তমাতা মারীর মূর্তির সামনে পড়িয়া কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাটিয়ে মাকীর হাতা ধরিয়া রশিচারণাচ তফাতে এক নালা পাইয়া তাহার মধ্যে নাবিয়া পড়িল। বন্দুকের বাঁট দিয়া ঠুকিয়া দেবিল, মাটি নরম, খোঁড়া সহজ। এ স্থান পেনিকের অতিপ্রাণের উপযোগী বোধ করিল।

“কটুনাটো! ঐ বড় পাথরের ধারে গিয়া ধাক্কাও।” বালক বাপের কথামত সেখানে গিয়া হাটু গাড়িয়া পড়িল।

“তুমি শুকতোত্র থা জান, তা বল।”

“বাবা! বাবা! আমাকে মেরো না!”

মাটিয়ে পুনরায় ভাবনায় বসিল—
“তোত্র থা!”

বালক কোঁপাইতে কোঁপাইতে খতিয়ে-মতিয়ে দুই একটি তোত্র আওড়াইল। পিতা প্রত্যেকটির পর উচ্চকণ্ঠে শাস্তিপাঠ করিল।

“এ ছাড়া আর কিছু জান?”

“মারীতোত্র জানি বাবা, আর পিসিমা যে বন্দনাটা শিখিয়েছিলেন।”

“সেটা মত্ত লম্বা, ও হোঙ্ক, তা-ও বল।”

বালক কঁপকণ্ঠে বন্দনা সাজ করিল।

“শেষ হইয়াছে?”

“বোহাই বাবা! আমাকে মাপ কর,

আমি আর কখনো করব না। আমি সুবে-নার-খুড়োর হাতে-পায়ে ধরে’ গ্যানেটোর সাজা মাপ করিয়ে দেব।”

সে কাদাকাটি করিতে থাকিল। মাটিয়ে বন্দুকের খোঁড়া ভুলিয়া লইয়াছিল, এক্ষণে নিশানা ঠিক করিয়া কহিল—“তগবান্ তোমার ক্ষমা করুন!”

বালক উঠিয়া বাপের পা ভড়াইয়া ধরি-বার প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু সময় পাইল না। মাটিয়ে বন্দুক ছাড়িল, কটুনাটো কাঠের মত মরিয়া পড়িল।

মড়ার দিকে একটিবারও না চাহিয়া মাটিয়ে ছেলেকে গোর দিবার জন্ত কোদাল আনিতে বাড়ী ফিরিল। দুই পা ঘাইতেই, গীলেনা বন্দুকের আগুয়াজে ভরে অস্থির হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহার সঙ্গে দেখা হইল। সে কাঁদিয়া উঠিল—“কি করলে?”

“সুবিচার!”

“সে কোথায়?”

“নালায়। আমি তাকে গোর দিতে চলিলাম। সে উপবৃক্ষ বৃষ্টানের মত মরেছে, আমি তার ভালরকম সংকার করাব। বড়-জামাইবাড়ী খবর পাঠিয়ে দাও, সে আমাদের সঙ্গে এসে থাকুক।”

ত্ৰিহরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী সমাজ ।

“জ্বলা জ্বলা” বস্তুনি ত্বিত হইয়া উঠি-
রাছে। কিন্তু সে চাতকপক্ষীর মত উর্দ্ধের
দিকে তাকাইয়া আছে—কর্তৃপক্ষীরো মল-
বর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি
নাই।

শুরুশুরু মেঘগর্জন হুহু হইয়াছে—
গবর্মেণ্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃক্ষানিবারণের
বা-হন-একটা উপায় হয় ত চেষ্টা—অতএব
আপাতত আমরা সেজন্য উৎসাহ প্রকাশ
করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এট যে, পূর্বে
আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল,—ধাধাতে
সমাজ অভ্যস্ত বহু নিঃশেষে আপনাত সমস্ত
অভাব আপনাই মিটাইয়া লইত—যেলে
তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না ?

আমাদের যে সকল অভাব বিদেশীরা
গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলি
না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অল্পকিষ্ট
ভারতবর্ষের চারের তৃক্ষা জন্মাইয়া দিবার জন্য
কর্জনসাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন,
আজ্ঞা, যা হয় আশু-মূল-সম্পাদনার আমাদের
চারের বাটী ভর্তি করিতে থাকুন; এবং এই
চারের চেয়েও বৈ আশাময় তরলরসের তৃক্ষা
—যাহা প্রলয়কালের স্বর্ঘ্যাকৃষ্টির দ্বারা
বিচিত্র উজ্জল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমা-
দগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তা

পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিশেরী ভাষার
পরিবেষণের দ্বারা লইলে অসম্ভব হয় না—
কিন্তু জ্বলন্ত তৃক্ষা ত স্বদেশের বাটী সনাতন
জিনিষ !—ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আসিবার পূর্বে
আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল
তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালরূপেই হইয়া
আসিয়াছে—এজন্য শাসনকর্তাদের রাজ-
স্বত্বকে কোনোদিন ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে
হয় নাই।

আমাদের দেশে বুদ্ধিগ্রহ, রাজারক্ষা
এবং বিচারকাণ্ড রাজা করিয়াছেন, কিন্তু
বিত্তদান হইতে অলসান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ
এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত
নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজ্যের রাজত্ব
আমাদের দেশের উপর দিয়া বজ্রের মত
বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া
আনাগিগকে পুত্তর মত করিতে পারে নাই,
সমাজ নষ্ট করিয়া আনাগিগকে একেবারে
লক্ষ্যছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজার রাজার
লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের স্বর্ঘ্যর-
ক্ষণ বেগুজ্বলে, আমাদের আনন্ডঠালোর বন-
জ্বারের দেবারতন উঠিতেছে, অতিথিশালা
হাপিত হইতেছে, পুষ্কারীখান চলিতেছে,
শুরুমশায় শুভধরী কসাইতেছেন, টোলে
শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চর্ডানগুপে রামা-
ধর্মপাঠ হইতেছে এবং কীন্তনের আরাধে

পঞ্জার প্রাপ্ত সুখ'দয় সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা চাহে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে ভীত হয় নাই ।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গল-কর্ম ও আনন্দ-উৎসব এককাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধৃত করিয়া আসিয়াছে, এমনকি কি টাঁদার খাতা কুক্কিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে ঘারে ঘারে মাথা খুঁড়িয়া ধরিতে হইয়াছে, না, রক্তপুরুষদিগকে স্মরণীয় মস্তবাসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে ! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্ত-চলাচলের জন্য যেমন চৌনহলুদাটিং অন্য বস্ত্রক—সমাজের সমস্ত অত্যাচারক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত রাজ-বিক নিয়মে ঘটয়া আসিয়াছে ।

আজ আমাদের দেশে ভুল নাট বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা । সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে তাহার মূল কারণটা । আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই । আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে ।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বহা-বর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অস্ত্রত তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, বাস্তু নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভাষাবেশ আপন দীর্ঘজীবির ছাটিলে ফাটিলে বট-অশ্বখকে প্রেরণ দিয়া পেচকবান্ধড়ের বিহারগুল হইয়া উঠে ।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য

জিনিষ নহে । সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল এখন বাংলার সেই পল্লীকোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে । তাই ভূতাহার সেবা-লয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জগদগুণি দূষিত—পঙ্কোচ্ছার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধবরের অট্টালিকা-গুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দ-জ্বলি উঠে না । কাজেই এখন জনদানের কর্তা সরকারবাহাদুর, বাহাদুরানের কর্তা সরকারবাহাদুর, বিভাগদানের ব্যবহার জন্তও সরকারবাহাদুরের ঘরে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয় । যে গাছ আপনার ছল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে । না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সাধকতা কি ?

এইরাজিতে তাহাকে টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিকতাবাহ তাহাকে বলে সরকার । এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি-আকারে ছিল । কিন্তু বিলাতের টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে । বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার টেটের হাতে সমপণ করিয়াছে—ভারত-বর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাজ করিয়াছিল ।

দেশের বাহারা 'শক্তহানীর' ছিলেন, বাহারা সমস্ত দেশকে 'দিনা বেতনে' বিভাগশিক্ষা, প্রশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকে পালন করা, পুষ্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না, তাহা নহে ।

কিন্তু কেবল আংশিকভাবে বস্ত্রত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীণ। রাজা যদি সাধারণ বস্ত্র করেন, হঠাৎ যদি বেশ অস্বাভাবিক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিজ্ঞান-শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের সমস্ত নীতিবোধ খনন করিয়া দিভেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পদ ব্যক্তিমানই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জনপাত্ত রক্ষিত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আর্থ-আমোদ ও বার্ষিক্যধনে স্বাধীন তাহার কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড় বড় কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর প্রাপ্ত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন

প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যভার আনয়। রাজা বুদ্ধ করিতে যান, পিতার করিতে যান, রাজকাৰ্য্য করুন বা আমোদ করিগা দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিত্য নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আন্তর্য্যরূপে, বিভিন্নরূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকতে আমরা ধর্ম বলিতে বাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই বার্ষিক-সংযম ও আত্মত্যাগ চর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেককেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাপনশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতি-
স্বাধারণের কল্যাণভার যেখানেই

পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মঙ্গল্যান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজ-শক্তি যদি অপর্যাপ্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এইজন্যই যুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পূর্ণ হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের মঙ্গল্যভার উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাচাইয়া আদিয়াছি। নিম্নেই শিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম-শিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জন-সাধারণের ধর্মব্যবহার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরাজ টেটকে বাচাইলেই বাচ, আমরা ধর্মব্যবহারকে বাচাইলেই বাচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই টেটকে জ্ঞাত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিবৃত্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পুঞ্জ-শাল্য পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবশ্যই টেটের গবর্নমেন্টকে খোঁচা বাড়িয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিরন্তর বেলেজা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির ডিকিংসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালবাসি, অন্তঃকরণে এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্তব্যের সাধারণের সর্বদাই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ভাল, না তাহা বিশেষ-ভাবে দৃষ্ট হইলে একট: জাতিগত নির্দিষ্ট

হওয়া ভাল । আমাদের বক্তৃতা এই যে, এ তর্ক
বিজ্ঞানবোধের ভিত্তিটুকুই বলা যায় যে, এ
কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো
কাজে লাগিবে না ।

কারণ এ কথা আমাদের কাছে বুদ্ধিতেই
হইবে—বিশাখাচার্যের চেষ্টা সমস্ত সমাজের
সম্মতির উপরে অবিস্মরণরূপে প্রতিষ্ঠিত—
তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভি-
বাক্ত হইয়া উঠিয়াছে । শুদ্ধান্ত- তর্কের
দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারি না
অতএব ভাল হইলেও তাহা আমাদের
অনধিগম্য !

আমাদের দেশে সরকারবাগদার
সমাজের কেহই নহে, সরকার সমাজের
বাহিরে । অতএব যেকোনো নিয়ম তাঁহাদের
কাছ হইতে প্ৰকাশ্য করিব, তাহা স্বাধী-
নত্বের মূল্য নিশ্চয় লাভ করিতে হইবে । যে
কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করা হইয়া লষ্টবে,
সেই কর্মসমূহকে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য
করিয়া ফুলিবে অথচ এই অকর্মণ্যতা
আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য ছিল না ।

আমাদের নানাজাতিক, নানা রাজ্যের অধীনতা-
প্রাপ্ত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ
চিরদিন আপনাদের সমস্ত কাজে আপন নির্ভর
করিয়া আসিয়াছে, শুদ্ধবৎ কোনো বিষয়েই
বাহিরের জ্ঞান কাঙ্ক্ষাকেও হৃদয়ে গ্রহণ করিতে
সেই নাই । সেইজন্য রাজত্ব বহন দেশ
হইতে নির্ভরাসিত, সমাজলব্ধী তখনো বিদায়-
গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই আজও আমা-
দের একেবারে মাটিতে গিয়া ঠেকিতে
পারি নাই ।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিয়ে

চেষ্টার একে একে সমাজবাহিত হইতে হইতে
ফুলিয়া দিবার জন্য উদ্বৃত্ত হইয়াছি । এমন
কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের
আইনের দ্বারা আমাদের অপরিবর্তনীয়রূপে
আটপুটে বাধিতে দিয়াছি কেবলমাত্র আপত্তি
করি নাই । এ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে
থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে
বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করি-
য়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে
নাই । আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে
বাধিয়া গেছে,—পরিবর্তনমাত্রই আজ নিজেকে
অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হই-
য়াছে । ইহাতে বৃদ্ধা আইতেছে, সেখানে
আমাদের মতগতান—যে মতগতানকে আমরা
নিজের অন্তরের মধ্যে সবচেয়ে বন্ধা করিয়া
এতদিন পাতিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের
অন্তরমত মতগতান আজ অনাবৃত-অব্যাহত
হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা
আক্রমণ করিয়াছে । ইহাই বিপদ, জলকট
বিপদ নহে ।

পূর্বে যাহারা বাদুগাহের দরবারে রয়ে-
রাই হইয়াছেন, নবাবরা যাহাদের মতগত ও
সহায়তার জন্য ভ্রমণ করিতেন, তাহারা
এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—
সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাহাদের
কাছে উচ্চ ছিল । তাহারা প্রতিপত্তি-
লাভের জন্য নিজের সমাজের বিবে-
চনা করিতেন না । রাজপ্রসাদের রাজধানী
দিল্লি তাহাদিগকে যে সম্মান দিতেন তাহা নাই,
সেই চরম সম্মানের জন্য তাহাদিগকে অধ্যাত
অন্যপনীর কুটারদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে

হইত । দেশের সমাজ পোষক

এলিবে মহাদেশের ব্যাণ্ণ, ইহা সরকার-
দত্ত রাজস্বসংগ্রহের উপাধির চেয়ে
তাহাদের কাছে বড় ছিল। অতীতের
সম্মান ইহাও অস্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—
রাজধানীর লাহায়া, রাজস্বের গৌরব ইহা-
দের চিত্তকে নিজের পরি হইতে বিক্ষিপ্ত
করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ-
আবেগ কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই,
এবং মহাব্যবসায়ের সমস্ত ব্যবস্থা পল্লিতে
পল্লিতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক খুব বলিবে, ইহাতে আজ
আমাদের সুখ নাই; কাজেই দেশের দিকে
আমাদের চোঁটের স্বাভাবিক গতি নহে। সুখ
অবস্থার শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক অব্যাহত
উত্তেজনা শরীরের মধ্যেই থাকে—যখন যুগ-
নাতি, আমোদ, সাপের বিষ শিরার
সঞ্চার করিতে হয়, তখন অবস্থাটা নিত্য
সংস্কার। আজকাল আমাদের সমাজ-
শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা ইহাকে
কোনো কাজেই প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না
—বৈজ্ঞানিকের বড়ি না হইলে একেবারে
আল। এখন সরকারের নিকট হইতে হয়
তিকা, নয় তাগিদ সরকার হইয়া পড়িয়াছে।
এখন দেশের জনকষ্টনিবারণের জন্য গব-
র্নমেন্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—
স্বাভাবিক তাগিদগুলি সব বন্ধ হইয়া গেছে।
দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও
হোচে না। আমাদের কদর যে পোরা
কাছে দলিখৎ লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের
কৃতি যে সাহেবের দোকানে বিকায় হইয়া গেল!

কে বলে, জনকষ্টনিবারণের সামর্থ্য আমা-
দের নাই? একদা দেশের যে অর্থ দেশের

কল্যাণকর সাধন করিয়া চরম সার্থকতা
লাভ করিত, আজ সেই অর্থ অজস্রবার
মিলটনের আড়গড়া, ডাইন্সের গাড়িখানা,
ল্যান্ডারসের আসবাবপত্র, হার্মান কোম্পানির
মেশিনের দোকানকে অভিভুক্ত করিয়া দিতেছে!
বদেশের গুপ্ততালুতে, জলবিদ্যুৎ দিবার বেলায়
টানাটানি না পড়িবে কেন?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, লেডিসক্রিন
কলে, ম্যাক্সিমিলিয়ানসহেবের ঘোড়দৌড়ে,
লটসাহেবের অভ্যর্থনার টাকা করিয়া পড়ি-
তেছে কখন? যখন, সেই টাকা-আগান্কারী
প্রকার হল দীপ্তমধ্যস্থ পানীয়জলের জন্য
হাফাকার করিতেছে, যখন ম্যালেরিয়ার
তাহারা উৎসাহ হইয়া গেল, যখন তাহাদের
গরুবাছুর চরিবার একছটাক জমি নাই,
যখন তাহাদের নিম্নভূমির উপর হইতে বর্ষার
পর তিনচোরমাস ধরিয়া জলনিকালের
কোনো উপায় থাকে না!

আর বাহারা পল্লী হইতে বাহির হইয়া
সামাজ্য অবস্থা হইতে ধনি-অবস্থায়, উত্তীর্ণ
হইয়াছেন—তাহাদেরও পুনের আড়ম্বর করি-
বার স্থান সমরে এবং আড়ম্বরের উপায়ও
বারো-আনা বিলাতী। ইহাতে যে টাকা-
গুলি কেবল বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা
নহে, কদরও দেশে থাকে না। কুটির দ্বারা,
অস্ত্রাঙ্গের দ্বারা, আচরণের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা
বাহাকে অবজ্ঞা করি, তাহাকে সাহায্য
করিবার জন্য যে কেবল আর্থিকশক্তির
অভাব ঘটে, তাহা নহে—চিন্তাশক্তিও থাকে
না। অতরাং তখন দেশহিতৈষিতার সর্ব-
প্রধান বুলি এই হইয়া দাঁড়াই যে, “আমরা
নিজে কিছুই করতে পারব না”

আমরা পাড়িছুড়ি কোট্টবুট গাইরা অত্যন্ত
বাস্ত হইয়া পড়িয়াছি ! হে সরকার, আমরা
'গলাশ', অতএব কুমিই সমস্ত করিয়া দাও—
যদি না কর, তবে গালি দিব !”

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে ।
আমি একথা বলিতেছি না যে, সকলেই
আপন আপন পন্নীর মাটি লাড়ুড়িয়া পড়িয়া
পাক, বিজ্ঞা ও ধনধান অর্জনের জন্য বাহিরে
বাইবার কোনো প্রয়োজন নাই । যে আক-
র্ষণে বাঙালিগণটাকে বাহিরে টানিতেছে,
তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে
—তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্বো-
ধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির
কর্ণক্ষেত্রে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে
বিত্তীর্ণ করিতেছে ।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত
শ্রমণ করাইয়া দেওয়া সরকার যে, ঘর ও
বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন
একেবারে উন্টোপাটো হইয়া না যায়। বাহিরে
অর্জন করিতে হইবে, ঘরে লক্ষ্য করিবার
লক্ষ্যই । বাহিরে শক্তি বাটাইতে হইলেও
হৃদয়কে আপনায় ধরে রাখিতে হইবে । শিক্ষা
করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে । কিন্তু
আমরা আজকাল—

“ঘর কৈন্থ বাহির, বাহির কৈন্থ ঘর,

* পর কৈন্থ আপন, আপন কৈন্থ পর।”

এইলক্ষ্য কবিকথিত “শ্রোতের সৌগন্ধ”র
মত ভাদিয়াই চলিয়াছি ।

এরূপ অথবা কোনোমতেই চিরকাল
পাকিতে পারে না । এইলক্ষ্য আপাতত
শ্রোতের অত্যন্ত প্রাধান্য দেখিলেও মনকে
ইতাল হইতে দিই না । ইহাও ত দেখা

গেছে, একসময় ইংরাজিপ্রচারা চর্চ্চা দেশে
অত্যন্ত প্রবল ছিল—তখনকার শিক্ষিত
যুবকেরা বাংলাভাষাকে একান্তমনে ত্যাগ
করিতেন । তখন কি কেহ কল্পনাও করিতে
পারিত বে, মাইকেল নবুহদন দত্ত বাংলা-
ভাষার আধুনিক কাব্যসাহিত্যের প্রথম
অবতারণা করিবেন এবং রিচার্ডসনের প্রিয়-
ছাত্র বাংলাভাষার বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস
ও সমালোচনা লিখিতে অগৌরব বোধ করি-
বেন না ।

যেমন সাহিত্যে, তেমনি সকল দিকেই
শ্রোত করিব—ঘরে আসিতেই হইবে ।
চারিদিকে তাহার লক্ষ্য দেখা দিতেছে ।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রিয়তা একবার
বাহিরে ফিরিয়া আসিবার ফলে আমরা
দেখিতেছি, বঙ্গসাহিত্য আর তাহার পৈতৃক-
সীমানা অনেকদূর পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া গেছে ।
তাহার বিচিত্রশক্তি আর নানাদিকে নানা
আকারে আপনাকে নানাপথে ধাবিত
করিয়াছে । তেমন বাহাদের হৃদয় একবার
বাহিরে ঘুরিয়া অরণ্যে যে, ঘরে ফিরিয়া আসি-
য়াছে, তাহার ঘরকে বড় করিয়া তুলিবে ।

বিধাতা এইলক্ষ্যই আমাদেরকে এমন
করিয়া স্ফূর্ণ দিচ্ দিয়া ঘর হইতে খেদাইতে-
ছেন—বাহিরটাকে এমন অবশরদ্ধি করিয়া
বারংবার আমাদের বুদ্ধবুদ্ধের উপর সবলে
নিষ্কেপ করিয়াছেন । তিনি ভারতবর্ষে
ঘর-বাহিরের একটা বৃহৎ সামরিক করিবেন ।
যেখানে পতিবীৰ্য্যবাহার আয়োজন ছিল,
সেখানে পরিপূর্ণ মহাবীরের বিচিত্র উপকরণ
আহরণ ও লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি আমা-
দিগকে আহ্বান করিয়াছেন,—ঐহানে

আমরা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, সেখানে বৃহত্তরভাবে আমরা স্বাধীন হইব। এখন আমাদের সমাজ নিষ্কলিতভাবে সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, সমাজ হইয়া সকলের সহিত যোগদ্বাপন করিবে,—পরিষদ সহিত পরিষদ, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়, দেশের সহিত দেশ গাঁথিয়া এক হইয়া যাইবে।

বিচ্ছেদে প্রেমকে প্রবল, নিপনকে বিনষ্ট করিয়া তোলে, একথা পুরাতন। একবার হারাবোঁর ভিতর দিয়া পাওয়া অষ্টষ্টরূপে পাইবার উপায়। আমরা যে মাকে একবার আপনাকে হারাইয়াছিলাম, সে কেবল আপনাকে প্রবলভাবে, বৃহত্তরভাবে কিরিয়া পাইবার জন্য। আধুনিক ভারতবর্ষ আপনাদের পরিষদ আশ্রয়ে খুঁজিয়া পাড়িয়াছিল এককালে যাঁহা বৃহৎ ছিল তাহা সন্নিহন, যাঁহা সমগ্র ছিল তাহা ভাগ্যত, যাঁহা সমাজ ছিল তাহা ক্ষুদ্র, যাঁহা জ্ঞানগত ছিল তাহা প্রথাগত, অভ্যাসগত হইয়া অসুস্থ হইয়াছিল। এইবার পশ্চিমের আঘাতে জাগ্রত-চাউয়া ভারতবর্ষ কি একটা সম্পূর্ণ পৃথক্‌বার করা আশয় আরম্ভ করিবে? তাহা নহে। সে আপনাকে উজ্জলভাবে, প্রবলভাবে কিরিয়া পাইবে—যাঁহা বহু ছিল তাহাই সূত্র পাইবে, যাঁহা গুহ ছিল তাহাই চারিদিকে আপন কাণে প্রবৃত্ত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙালির চিত্ত বরের মুখ লইয়াছে,—নানা দিক্ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে বঙ্গদেশের নারী আমাদের প্রাচীণ আকর্ষণ করি-

তেছে এবং বঙ্গদেশী ভাষা বঙ্গদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে, বঙ্গদেশের শ্রুতিব্রতী আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, বঙ্গদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রামধারে ভিক্রাধাওর জন্য যে পাণ্ডুর সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যাহই একটু একটু করিয়া আমাদের কাছে গৃহস্থের পৌছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে। দেশে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুপ্রাতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা বঙ্গদেশী লোকের কাছেই প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছি এবং সম্প্রতি বঙ্গমান প্রোভিন্সিয়াল কন্সটারেন্সের সভাপতি আমাদের স্বদার্বাক্ষণের পোলিটিক্যাল উদ্ভবকে জাতীয় আনুষ্ঠিতরতাচোর পাড়াইবার জন্য প্রোভিন্সিয়াল উৎসাহিত করিয়াছেন।

এমন অবস্থার দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অল্পত অসঙ্গতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্সিয়াল কন্সটারেন্স তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কন্সটারেন্স দেশকে যন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বঙ্গদেশী। আমরা ইংরাজী-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জ্ঞান—আপনারসংসারগণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নাই, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হইবে না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা হৃদেই থাকি। তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আশা-আপোচনার বাহিরে পাড়া করিয়া রাখিয়াছি।

আমরা গোড়াভি বিলাতের জয়যাত্রার জন্য ছলবলকৌশল-সামগ্রিকারের ব্যক্তি কিছুই রাখি নাই, কিন্তু দেশের জয় যে তৎপেক্ষা সমাপ্ত এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই;—তাঁই আমাদের হাব-ভাববিলাসের চর্কা সমগ্রই পুরায়কমে বিলাতিধরণের হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের মন কত ভুলাইতে পারিলাম না—স্বাভাবিক তথা হেঁট করিয়া ক্রিতে হইল। এখন এ সমগ্র মিথ্যা ছলকলা কেলিয়া-দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবার জন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি ? কারণ, পোলিটিকাল সাধনার উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের জয়কে এক করা। কিন্তু দেশের জয়ের প্রতি দৃষ্টান্তমাত্র না করিয়া, দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবল-মাত্র বিদেশীর জয় ব্যাকরণের মত বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিকাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতাশাগ্রস্ত দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের জয়লাভকেই যদি চরমলাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কাৰ্য্য-কলাপে যে সমগ্র চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে সমগ্রকে দূরে রাখিয়া দেশের ধর্মার্থ কাছে বাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে কর, প্রোভিন্সিয়াল কন্ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থ দেশের মঙ্গলার্থ কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কত করিতাম ? তাহা হইলে আমরা বিলাতিদের একটা

সভা না বানাইয়া দেশীয়দের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রীগণ-আনন্দ-আল্লাসে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিজ্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীটনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক-লিওন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ স্থাপিত করিয়া বুকাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু অর্থত্বের পরামর্শ আছে—তাহা তত্ৰাত্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পলিবাসী। এই পরিমার্কে মাকে এখন আপনার বাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎচত্বরের রক্তচলাচল অল্পতব করিবার জন্য উৎসাহ হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আনিলাম। এই উৎসবে পরি আপনার সমগ্র স্বকীয়তা বিস্মৃত হয়,—তাহার জয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগমন, তেমনি বিশ্বের ভাবে পলির জয়কে তরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর—মেলা। ✓

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহার সংস্রব লইয়া আসিবে, তাহারের মন খুলিতে অনেক দৌর হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাত্রাগ

একত্র হয়, তাহার সন্তোষই জনর পুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লিগুলি যেদিন হালগাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহারের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানাব্যানে বঙ্গবরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই সমস্ত মেলাগুলির হুজ্জে দেশের লোকের সঙ্গে বর্ণনাতাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার তরু শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সম্বীৰ্য করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের জনর সজ্জার করিয়া যেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিপ্পুসলমানের মধ্যে সত্য স্বাপন করেন,—কোনো প্রকার নিফল পলিটিক্সের সংগ্রহ না রাখিয়া বিভাগীয়, পঞ্চাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতিসম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে স্বার্থেই সচেত করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি, ঘুরিগা ঘুরিগা বাংলা-দেশের নানান্যানে মেলা করিবার ক্ষমতা একদল লোক প্রস্তুত হন, তাহারা নূতন নূতন বাজা, কীর্জন, কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বাজু-বাণ, মাতিবুলন, ব্যাঘ্রাম ও ভোজ-

বাজির আয়োজন লইয়া দিগ্বিত্তে থাকেন, তবে বাহনিকারের ক্ষমতা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র আবিতে হয় না। তাহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলায় জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা দিয়া যেন এবং বৌকানদারদের নিকট হইতে বর্ণানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থার সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাবে বাহা উত্তৃত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলায় দলের সহিত সমস্ত দেশের জনরের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তরুতর করিয়া জানিযেন এবং ইহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিত্রকাল আনন্দ-উৎসবের হুজ্জে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বকল্পার বিবাহাদি ব্যাপারে বাহ্যিকিছু আমোদ-আজাদ, সমস্তই কেবল সহরের ধনী বহুদিককে ধিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াক্ষেপে প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে সক্ষম হন না—সেখানে “ইতরে জনাঃ” মিষ্টানের উপায় জোগাইয়া থাকে, কিন্তু “মিষ্টান্ন” “ইতরে জনাঃ” কণামাত্র ভোগ করিতে পার না—ভোগ করেন “বান্ধবাঃ”। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিদানন্দ হইয়া

পক্ষিতেছে এবং যে সাহিত্যোদেশের আশা-
বুদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া
রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণলোকের
আনন্দভান্ডার হইয়া উঠিতেছে। আমাদের
এই কল্পিত দেশাস্পদার যদি সাহিত্যের
ধারা, আনন্দের স্রোত, বাংলার পল্লিবায়ে
আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে
এই শতশ্রামলা বাংলার স্বস্তিরূপ দিনে
দিনে শুক মকতুমি হঠরা যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে
যে, যে সকল বড় বড় জগদগুরু আমাদিগকে
জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত
হইয়া কেবল যে আমাদের জগৎ ঘটাইয়াছে,
তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও
মৃত্যু বিস্তার করিতেছে—তেন্নি আমাদের
দেশে যে সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত
আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ
দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিকার অব্যোগ্য
হইয়াছে, তাহা নহে, কুশিকারও আকর হইয়া
উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শতশ্রেণী শত্রুও
হইতেছে না, কাটাগাছও প্রস্রুত হইতেছে। এমন
অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই
মেলোগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে
স্বদেশের কাছে, ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে
হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া
না ওঠেন—এ কথা না বলিয়া বসেন যে, এই
মেলোগুলির প্রতি গবর্নমেন্টের অত্যন্ত ঔদা-
সীন্য দেখা যাইতেছে—অতএব আমরা সভা
করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবল বেগে গবর্ন-
মেন্টের নীচো নাড়াহিঁতে শুরু করিয়া দিই—
মেলোগুলার মাঝার উপরে দলবল-আইন

কাহ্নন-সম্মত পুলিশ-কমিশনার ভাতিয়া
পড়ুক—সমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক।
ধৈর্য ধরিতে হইবে,—বিগত ছয়, বাছা পাট,
সেও বীকার, কিন্তু এ সমস্ত আনন্দের নিজের
কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষী আমাদের ঘর
মিকাইয়া আসিয়াছেন,—মুনিমিসিপালিটির
মজুর নহ। মুনিমিসিপালিটির সরকারি
কর্তার পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে,
কিন্তু লক্ষীর সম্বন্ধনীতে পবিত্র করিয়া
তোলে, এ কথা আমরা বেন না ভুলি।

আমাদের দিলী লোকের সঙ্গে দিলী ধারার
মিলিবার যে কি উপলক্ষ্য হইতে পারে,
আমি তাহারি একটি দৃষ্টান্ত দিলাম যাত্র—
এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়নে রাখিয়া আরম্ভে
আনিয়া কি করিয়া যে একটা দেশবাসী
মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে,
তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

এইখানে সবিনয়ে একটি কথা বলিতে
ইচ্ছা করি। আমি যে একটা নূতন-পদ্ম-
উদ্ভাবনকারী দলের মধ্যে একজন, একদল
স্পষ্টার লেশমাত্র আমার মনে নাই। জাহ্নবী
অনেকটা পথ পূর্নমুখে চলিয়া অবশেষে এক-
সময়ে দক্ষিণগামিনী হইয়া সমুদ্রলাভ করিয়া-
ছেন, এমন দক্ষিণের পথ অহকার করিবার
অধিকারী নহে, বরং তাহা পূর্নপথেরই অঙ্গ-
বৃত্তিযাত্র। দেশ যখন একদা আগ্রস্ত হইয়া
“কন্টিট্রানশাল অ্যাজিটেশনে”র রেখা
ধরিয়া বাজোঁধরের হারের মুখে ছুটিয়াছিল,
তখন সমস্ত শিক্ষিতসমাজের বুদ্ধিগেগ তাহার
মধ্যে ছিল। আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,
সেই স্রোতের পথ বাক লইবার উপক্রম
করিতেছে। আশা করি, একত্র যেন কেমনে

ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ বাছাই করি লইবার চেষ্টা না করেন। যাচাযা সাধনাবারা, তৎপরা ধারা, ধর্মিক ধারা ইত্যাদি শক্ত সমাজের চিত্তকে বঙ্গদেশের কার্যে চালিত করিয়াছেন,— যথেষ্টের কার্যে একাধ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে যে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে বার্থ হইয়াছে, এ আমি কখনই বলিব না। তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের সুখ রাজ্যেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের ক্ষমতা নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের অভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাঁরা বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ঐক্যের অমৃতকণার আশ্রমে যখন আপনার মধ্যে আপনার পথ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুত্রবারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত চেষ্টাতে পারে না। এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে— এখন সে আত্মশক্তি-আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতালভের দিকে অনিবার্যভাবে চলিবে— কোনো একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদ-লাভের দিকে নহে। এই যে পথের দিক-পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতেছে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কৃতকর্ম নহে—যে চিত্তশ্রোত প্রথমে একদিকে পথ লইয়াছিল, ইহা তাহারি কাজ—ইহা নুতন জ্যোত নহে। যে অধুর প্রথম বৃত্তিকা ভেদ করিয়া অজ্ঞাত আলোকের দিকে মাথা তুলিয়াছিল, পরবর্তী শাখা-প্রশাখা যেন নিজেতে “ওরিজিনাল” জ্ঞান করিয়া সেই অধুরকে সেকলে বলিয়া উপহাস না করে।

গতবারে এ প্রবন্ধ যখন আমি পাঠ করিলাম, তখন আমার উক্ত কথাটি সকলের কাছে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। প্রতীতিতে এই কথা উদ্ভিষ্টাছিল যে, দেশে নানা শক্তি নানা লোককে, নামানলকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিবে, ইহাই দেশের সাধারণ ও উন্নতির লক্ষণ। অতএব কেবলমাত্র সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না।

যু প্রবন্ধপ্রণেতার শেষে এমন কথা যখন উদ্ভিষ্ট, তখন মুকিলাম, আমার সমস্ত প্রবন্ধই বার্থ হইয়াছে। আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিলাতে যেমনই হোক, আমাদের দেশে সমাজ একটা ক্ষুদ্রব্যাপার নহে—বৃহৎবিগ্রহ, কিয়ৎপরিমাণে পাহাড়ের কাণ্ড ও কিয়ৎপরিমাণে বিচারের কাজ ছাড়া দেশের আর সমস্ত মঙ্গলকার্যই আমাদের সমাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিল,—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। এইজন্য এই সমাজব্যবস্থার উপরেই আমাদের মনোযোগ—আমাদের সভ্যতা স্থাপিত, এবং এইজন্য এই সমাজকে আমরা চিরদিন সর্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় রাখিতে একান্ত সচেষ্ট ছিলাম। অতএব কে বলিল, সমাজের কাজ বলিতে কেবল একটিমাত্র কাজ বুঝাইতেছে?

আমি যদি বলি শরীরের সমস্ত কাজ শরীরেই করা উচিত, তবে কি কেহ এই বলিবেন, আমি তাহার কণ্ঠক্ষেত্রকে সর্পিণ করিয়া আনিতে বলিতেছি। শরীরের কাজ বিবিধ, শরীরের কর্মস্থানও বিপুল, সে সবকে কুহারো সন্দেহ নাই কিন্তু শারীরিক ক্রিয়া শরীরের নিজের জিনিস, এ কথা

চিরদিন ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না ।
আমি যদি পরকে বলি তুমি আমার হইয়া
হজম করিয়া দাও—এবং সেজন্য হজম করা
যদি পরের দ্বারা সম্ভবপর হয়, তবে তাহারই
মঙ্গল নাই । ব্যবহারের অভাবে নিজের
পাকস্থলীটিকে সম্পূর্ণ খোয়াইয়া পরাশ্রিত-
শ্রেণীর জীবের দ্বারা চিরকাল পরের গায়ে
সংলগ্ন হইয়া দিয়া পরিপুষ্টভাবে চোখ বুজিয়া
থাকাকে গোরবের বিষয় বলা চলে না ।
ইংরাজের পাকস্থলী তাহার ঠেটের মধ্যে
থাকিতে পারে, কিন্তু ঠেট তাহার সমাজের
বহির্ভূত নহে—ইংরাজ সর্বদাই রাজনৈতিক
আন্দোলন নহে। ব্যাপৃত থাকে, কারণ রাজ-
নীতি তাহার স্বকীয় কলহের মধ্যেই । আমরা
তাহার নকল করিয়া পরের পাকস্থলীতে
নিয়তই যদি আন্দোলন উপস্থিত করিতে
বাই, তাহাতে কি আমাদের হজমের কোনো
সহায়তা করিবে ? বাহারা জাবর কাটে,
তাহাদের হজম করিবার বিধি একরূপ ;
বাহারা জাবর কাটে না, তাহাদের হজম
করিবার বিধি অল্পরূপ । জাবরকাটা হজম
করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া যদি প্রমাণিত
হয়, তথাপি তাহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য
নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে ।

বাহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের
পক্ষে মঙ্গলকর বলেন না, তাহাদিগকে অল্প-
পক্ষে “পেসিমিষ্ট” অর্থাৎ আশাহীনদের দল
নাম দিয়াছেন । অর্থাৎ রাজার কাছে
কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা গুতটা
হতাশায় হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে
তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন ।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা

আমাদিগকে মাঝে মাঝে লজ্জাঘাতে তাহার
সিংহদ্বার হইতে পেদাঠেতেছেন বলিয়াই যে
অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি,
কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভপ্রাক্ষিক-
লুহ হতভাগ্য শৃগালের সাহসকে আশ্রয়
করি নাই । আমি এই কথাই বলি, পরের
প্রদানভিক্ষাই যথার্থ “পেসিমিষ্ট” আশাহীন
দীনের লক্ষণ । গলায় কাছা না লইলে
আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনো-
মতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস ✓
করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি ।
আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হোক,
আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্ব-
জাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে
সার্থকতালাভের ক্ষত্র উৎসুক হইরাছি,
তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল
প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা
বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে
তাহা পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হইতে থাকিবে ।
অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কি,
আমাদিগকে চারিদিক হইতেই তাহার
সন্ধান করিতে হইবে ।

মাহুকের সঙ্গে মাহুকের আত্মীয়সম্বন্ধ-
স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান
চেষ্টা ছিল । দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ
স্থাপিতে হইবে, সম্মানেরা বরক হইলেও
সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামের ব্যক্তিদের
সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থানিধিচারে যথাবোধ্য
আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইকে; শুক-
পুত্রোদিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামি-প্রজাতন্ত্র
সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ রাখা রহি-
য়াছে । এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্য

নৈতিক সম্বন্ধ নহে এগুলি চন্দ্রের সম্বন্ধ । ইহারা কেহ বা পিতৃপানায়, কেহ বা পুত্রহানী, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্ক । আমরা যে কোনো মানুষের যথার্থ সংজ্ঞা যে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি । এইজন্য কোনো অবস্থার মানুষকে আমরা আমাদের কার্য-সাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না । ইহার ভালমন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি ভদ্রপেক্ষাও বড়, ইহা প্রাচ্য ।

আপানযুক্তব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জল হইবে । যুক্তব্যাপারটি একটা কলের জিনিষ, সম্বন্ধ নাই—সৈন্ত-দিগকে কলের মত হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের নতই চলিতে হয় । কিন্তু তৎসঙ্গেও আপানের প্রত্যেক সৈন্ত সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে ;—তাঁহারা অঙ্গ ছড়বৎ নহে, রক্তোদ্ভাদগ্রস্ত পতুবৎ নহে ; তাঁহারা প্রত্যেকে নিকাদোর সহিত এবং সেই হুজ্জে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সেই সম্বন্ধের নিকট তাঁহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে । “এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্ত আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত—রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্ধেলার দাবাবোড়ের মত মরিত না—মানুষের মত চন্দ্রের সম্বন্ধ লইয়া, ধর্মের সৌর্যব লইয়া মরিত । ইহাতে যুক্তব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট আশ্চর্য্যতার মত হইয়া পড়াইত—এবং এইরূপ কাণ্ডকে

শাস্তাভ্যাস মনোচোকেরা বণিয়া থাকেন— “ইহা চমৎকার—কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে !” আপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিলাইয়া প্রাচ্য-প্রভাচ্য উভয়েরই কাছে ধস্ত হইয়াছেন ।

যাহা হউক, এইরূপই আমাদের প্রকৃতি । প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমরা চন্দ্রের সম্বন্ধ-ধারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি । সুতরাং অনাবশ্যক দ্বারিষও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয় । প্রয়োজনের সম্বন্ধ সর্বাঙ্গ ;—আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ । প্রভুত্বের মধ্যে যদি কেবল প্রভুত্বের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাল আদির এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনো-একর আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দ্বারিষকে পুত্রকর্তার বিবাহ এবং প্রাচ্যশাস্তি পর্যন্ত টানিয়া-লইয়া বাইতে হয় ।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন । আমি রাজদাহী ও ঢাকার প্রোভিন্স-তাল কন্কারেঙ্গে উপস্থিত ছিলাম । এই কন্কারেঙ্গ-ব্যাপারকে আমরা একটা শুক্লতর কাজের বলিয়া মনে করি, সম্বন্ধ নাই—কিন্তু আত্মীয় এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরমের চেয়ে অতিথিসংকারের তাবটাই সুপরিষ্কৃত । যেন বরষাজীর দল গিয়াছি—আহার-বিহার-আরাম-আমোদের ভক্ত দাবী ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আমান-কর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাপ্যতর । যদি তাহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই—এত চকোচোখাশেহপের,

এউ শরনাসন, এত
গাড়িখোড়া, এত রস
কেন—তবে কথাটা অ

কাণের দোহাই দি;

আমাদের জাতের সো

আমরা শিকার চোটের

হইয়া উঠি না কেন, তবু আত্মানকারীকে

কাণের উপরে উঠিতে হইবে। কাণকেও

আমরা জন্মের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে

চাই না। বসন্ত কনফারেন্সে কেহো অংশ

আমাদের চিত্তকে ভেদন করিয়া আকর্ষণ

করে নাই,—আতিথ্য যেমন করিয়াছিল।

কনফারেন্স তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই

দেশী জন্মটুকুকে একেবারে বাহ দিতে পারে

নাই। আত্মানকারিগণ আহুতবর্গকে

অতিথিভাবে, আত্মীয়ভাবে সংবর্ধনা করাকে

আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাহাদের পরিভ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কি

পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঋাহারা

দেখিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন। কনফারেন্সের

মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই

ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে

পুরা কৃত্য করে—যে অংশ কেহো, তিনদিন

মাত্র তাহার কাছ, বাকি বৎসরটা তাহার

সাক্ষ্যই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি

যে সেবার স্বত্ব বিশেষরূপে ভারতবর্ষের

প্রকৃতিগত, তাহারিক বৃহৎভাবে অহুষ্ঠাননের

উপলব্ধ্য ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ

আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহ

গৃহে আচরিত হয়, তাহারিক বৃহৎ-পরিভূমি

দিবার জন্ত পুরাকালে বড় বড় দজ্জাহটানু

হইত—এখন বহুদিন হইতে সে সমস্ত লুপ

বসন্ত

... ১৭৪ বার উদযাটন

কারয়া দিলেন, তাহার দজ্জাহটারের মাঝ

খানে তাহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ

করিলেন। এমনি করিয়া কনফারেন্স-কন

ফারেন্সের মাঝখানে পূর্ব যখন বিলাতী

বক্তৃতার ধুম ওটপটা করতালি—সেখানেও,

সেই যোরতর সভাপ্রণেও আমাদের বিনি

মাতা, তিনি শ্রিত্বেরে তাহার একটুখানি

ঘরের সামগ্রী, তাহার সহস্রপ্রতি একটুখানি

মিষ্টান্ন, সকলকে ভাঙিয়া, বাটরা, বাওরাইয়া

চলিয়া যান, আর যে কি করা হইতেছে, তাহা

তিনি ভাল বুঝিতেই পারেন না। মা'র

মুখের হাসি আরো একটুখানি ছুটিত,—যদি

তিনি দেখিতেন, পুরাতন দজ্জের জায় এই

সকল আধুনিক যন্ত্রে কেবল বইপড়া লোক

নয়, কেবল খড়িচেনদারী লোক নয়—

আহুত-অনাহুত আপাতরসাদারণ সকলেই

অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায়

ভোজ্য কম হইত, আভ্যন্তরীণ ক্ষম পড়িত—

কিন্তু আনন্দ-মঞ্চের ও মাতার আশীর্ব্বাদে

সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহাই হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,

ভারতবর্ষ কাছ করিতে বলিয়াও মানব

স্বত্বের মাধুর্যটুকু ভূগিতে পারে না। সেই

স্বত্বের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায়

সহজে স্বীকার করিতেই ভারতবর্ষের ঘরে-পরে,

উকে-নাচে, গৃহের ও আশ্রয়কে একটি ঘূর্ণি

ভাঙ্গসংকে ভক্তিও

রবে না? স্বদেশের

এক, তাকে আশ্রয়ের

হইবে না? আমরা

বিভাদান প্রভৃতি মঙ্গল-

হাতে বিদায়মান করিয়া

ভাবিতে হয়

আজ যদি এই সামাজিক সংস্কার প্রচলিত হইয়া থাকে, যদি অন্নদান, অন্নান, আশ্রয়দান, স্বাস্থ্যদান, বিভাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য ছিন্নসমাজ হইতে অলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখি না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্রসংস্কার অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অস্তিত্ব করিবার ক্ষমতা হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চাঙ্গের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুত্র, সমস্ত মনুষ্য ও পশু-পক্ষীর সহিত আপনায় মঙ্গলসংস্কার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চতাব্য হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সংস্কৃতি কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে বদেশকে গ্রহণ করিয়া এক পরমা বা তদনুগত। অন্ন—একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তরুল ও বদেশবলিগ্রহণে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই—এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদের তপস্কার আশ্রয়, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি

দেশ হইতে আমাদের চোঁটা, চিত্তা ও ক্ষমতাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেলিব? গবর্মেন্ট আমাদের স্বাধীনতার অলঙ্কারের অলঙ্কার হাটকা দিতেছেন—মনে করুন, আমাদের আকোলনের প্রচণ্ড ভাগিদে পঞ্চাঙ্গলঙ্কা টাকা দিলেন এবং দেশে চলার কষ্ট একেবারেই রহিল না—তাহার ফল কি হইল? তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের স্বত্রে, দেশের বে ক্ষমতা এতদিন সমাজের মধ্যেই কাণ্ড করিয়াছে ও ভূপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সম্পূর্ণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে, সেইখানেই সে তাহার সমস্ত ক্ষমতা প্রত্যাবর্তন দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের ভদ্র যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসংস্কৃতি একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেন্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অন্ন আক্ষেপের বিষয় হইবে? এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশ-হিতৈষিতা? ইহা কদাচিৎ হইতে পারে না!

ইহা কখনই চিরদিন এদেশে প্রভুর পাটবে না—কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে ! আমরা আমাদের অতি দূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়-মিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী কৃত্রিয়া দূরে রাখি নাই—তাহাদিগকেও নিজের সম্বাননের সহিত সমান স্থান দিয়াছি ; আমাদের বহুকে-অর্জিত অন্নও বহুদূর কুইয়াদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা এক-দিনের ক্ষুদ্র ও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া করনা করি নাই—আর আমরা বলিব, আমাদের জননী লক্ষ্মীম্বর ভার আমরা বহন করিতে পারিব না ? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিজ্ঞা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই বে, ভিক্ষার অন্ন মনের মত না হইলেই আমরা চাৎকার করিতে থাকিব ? কদাচ নহে—কদাচ নহে ! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকে এবং প্রতি-দিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম ! এইবার সমস্ত আশি-রাছে,—যখন আমাদের সমগ্র একটি স্ববৃহৎ নবদেবী সমাজ হইয়া উঠিবে। সমস্ত আশি-রাছে,—যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি,—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ভাগ্য করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ভাগ্য করিতে পারিব না !

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত জন্মের সম্বন্ধধারা খুব বড় জারগা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোট পরিচ্ছেদই আমরা প্রত্যাকভাবে আ-পনার করিয়া গহরা তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পাত্রাধ বিত্তীয় কারণেই কনের দরকার হয় দেশকে আমরা

কখনই পল্লির মত করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না—কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিষটা আমাদের ছিল না, স্ত্রতয়া ইহা বিদেশ হইতে আনা হইতে হইবে এবং কারখানাঘরের সমস্ত সাধনসামান-আইন-কানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অগম্য নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিরম যে-দেশই হোক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই বার্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, পঞ্চ কণে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্তের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যাকভাবে অহুভব না করিব, যেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালই বল আর মন্দই বল, গালিই নাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। ততএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতালাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদের মনে রাখিয়া রাখিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাত্ররূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ নবদেবী সমাজকে তত্ত্ব করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ বন্ধিত হইবে।

পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সম্বন্ধ অবি-জ্ঞ ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে বাওয়াতে সমাজ শাশ্বত হইয়াছে। সুতরাং দায়িত্ব

হঠাতে বাধা হইয়া পরিসমাপ্তি খণ্ডখণ্ডভাবে আপনায় কাণ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে বসেন্দ্র সমাজ তেমন বনিষ্টভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আমরা আমাদের মনুষ্য আছে—কিন্তু আমাদের কর্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সত্যীর্ষতা প্রবেশ করিয়াছে। সত্যীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বড় হইয়া থাকা বাধ্য-কর নহে, এইজন্য, বাহা ভাঙিয়াছে, তাহার ক্ষত আমরা পোক করিব না—বাহা গড়িতে হইবে, তাহার প্রতি আমাদের সনত্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আগকাল জড়ভাবে, যথেষ্টাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, বাহা গট্টা উঠিতেছে, তাহাট ঘটিতে দেওয়া কখনই আমাদের প্রেরণ্য হইতে পারে না।

একণে, আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাহার পার্শ্বনতা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ কর, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কি করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার বাধা ঘুড়িয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকই আপনায় কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই বক্ষ। “এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টা-গুলিকে নির্দিষ্টপথে আকর্ষণ করিয়া লইবার দ্রুত একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজে কোনো দল সেট কেন্দ্রের স্থল অধি-

কার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কা তাহা যদি-বা অনেকগুলি ছুগছুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্য-টিকে দৃঢ়ভাবে অহুত্ব ও বক্ষা করিতে পারে না—নিখিল দারিদ্র প্রত্যেকের বক্ষ হইতে খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পার না।

আমাদের সমাজ এখন আর একপভাবে চলিবে না। কারণ, বাঢ়ির হইতে যে উত্ততশক্তি প্রত্যাহ সমাজকে আশ্বস্ত করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিভাগের হঠাতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাড়ার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য দুলুহুস সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে গাঁড় করা হইতে হটবে। তাহা করা ইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা—সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণশাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অহুত্ব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভাল, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের দ্বারা অনিষ্ট করিতে পারে না।

আবার, এইরূপ অধিপতির অতিবেকই সমাজকে জাতি রাধিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষত্ব আপনায় একটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অল্পের হয়রা উঠিবে।

ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবে। সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক, মঙ্গলকর্ষণ, চালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইহারাই করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি গুরুত্বপূর্ণ আনন্ডটি প্রভৃতির জায় এই স্বদেশীসমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দ্রুত বলিয়া মনে করি না। ইহা বখানানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটবে না। আমাদের দেশে যেখানে দানে বড় বড় মঠ-মন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছা-পূর্ব্বক আপনায় আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষতঃ যখন অল্পে অল্পে বাহ্য-বিভাগ দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশ-কেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উদ্ধল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনীতিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে

পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার একোয় নিয়ম একস্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাষ্ট্রিক্ত বিজয়তাকে কেবলমাত্র গুণ্যকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কি করিয়া দেশের সহিত দেশের সামঞ্জস্য-বিধান করিতে হয়, কি করিয়া রাজ্যের সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, আপন তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একইকালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসম্বন্ধ করিতে পারিব আমরা বদেশকে একটি মাছের মধ্যে প্রত্যাক করিতে পারিব এবং তাহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশীসমাজের ওপার্শ্ব দেখা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষস্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষস্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষস্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্নেন্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্দাকাটি বধেই করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্দাকাটি বুঝা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল? দেশকে খণ্ডিত করিলে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের

মধ্যে কোথাও কোনো বাধ্যতা থাকিবে না ? ব্যাধির বীজ বহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভাল—কিন্তু ভয় যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, প্রাণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃপক্ষ কি থাকিবে না ? সেই কর্তৃপক্ষ যদি আমরা সমাজের মধ্যে স্রষ্টৃ-সৃষ্টি করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাণ্যকে আঘাত করিয়া বাণ্যকে নিষ্কীর্ণ করিতে পারিবে না। সমস্ত কতকে আরোগ্য করা, একাকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মুচ্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কৰ্ম হইবে। আজকাল বিদেশী ঔষধপুস্তক সংকলনের পুস্তকবহরন আমাদের গকে উপাধি-বিতরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু সংকলনের সাধুবাদ ও আধিকার আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধৃত হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মত আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের বেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া-দিয়া উত্তর পক্ষের মধ্যে প্রীতিপান্ধি-স্থাপন, উত্তর পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তব্য সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বার-বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক আদর্শ আশ্রয়

দেয় স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আশ্রয়কার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয় ত সাধারণভাবে আমরা এ কথা স্বীকার করিবে, কিন্তু ব্যাপারধাণা ঘটাইয়া তোলা ওঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। ওঁহারা বলিবেন—নির্কীর্জন করিব কি করিয়া, সবাই নির্কীর্জকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে ত সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচারবিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনোকালে কাজে নাবা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত,—দেশের কোনো লোক বা কোনো দল ওঁহারা সখকে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া-লইয়া লোককে নির্কীর্জন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কল হইবে—যেমন করিয়া হোক, একটি লোক দ্বন্দ্ব করা এবং ওঁহারা নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ওঁহারা চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিরোগের প্রত্যাব সম্ভাব্য হইত, যদি রাজ্য সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে—আমরা, এতদ্ব্যতিরিক্ত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেই বাধ্যতা-ভুলিয়া উড়িয়া পড়িয়াইবার ভয় ইচ্ছক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্যলোককে

বাড়ী-করাইয়া তাঁহার অধানে একদল লোক
বধাধভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-
রাজত্ব দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া
উঠিবে—পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, কখনা
করিয়া আমরা বাহা আশা করিতে না
পারিব, তাহাও লাভ করিব—সমাজের
অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এত ব্যাপারের চালনাতার
আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিকল্পিতভাবে সকল সময়েই
শক্তিমাত্র থাকি পাঠেন না; কিন্তু
দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত
হইয়া উঠাদের চক্র অপেক্ষা করে। যে
শক্তি আপাততঃ যোগাযোগের অভাবে
কাজে লাগিল না, সে শক্তি যদি সমাজে
কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়,
তবে সে সমাজ ভুট্টা-কণ্ডালের মত শূন্য হইয়া
যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি,
তিনি সকল সময়ে যোগাযোগ না হইলেও,
সমাজের শক্তি- সমাজের আন্তঃভেদনা তাঁহাকে
অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অব-
শেষে বিধাতার অঙ্গীকারে এই শক্তিসঞ্চয়ের
সঙ্গে যখন যোগাযোগ যোগ হইবে, তখন
দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্যবশে
আপনাকে সর্বত্র বিস্তার করিবে। আমরা
কৃত্রিম দোকানীর মত সমস্ত লাভলোকসানের
হিসাব হাতে হাতে দেখিতে নাই—কিন্তু বড়
ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া বোলে না।
যেহে একএকটা বড়দিন আসে, সেইদিন বড়-
লোকের তলবে দেশের সমস্ত শালতামাসি
নিকাল বড়খাতার প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়।
রাজক্রেমন্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধ-
সমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপা-

তত আনাদের কাজ দপর তৈরি রাখা,
কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ
হিসাব তলব করিবেন, সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া
শির নত কবিব না—সেপাইতে পারিব, জমার
ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে বাহাকে বড়
করিব, এত বড় লোক চাহিলেই পাওয়া যায়
না। বস্তুতঃ রাজা তাঁহার সকল প্রকারই
চেয়ে যে দাবাবত বড়, তাহা নহে। কিন্তু
রাজাই রাজাকে বড় করে। জাপানের
মিকাদো জাপানের সমস্ত সুখী, সমস্ত শাখক,
সমস্ত শ্রমবীরদের দ্বারাই বড়। আমাদের
সমাজপতিও সমাজের মহাশেষ মহৎ হইতে
থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড় লোকই
তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিবে। মন্দি-
রের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে
উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ
করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি, আমার এই
প্রস্তাব যদি-বা অনেকে অস্বীকারভাবেও গ্রহণ
করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্যে পরিণত
হইতে পারিবে না। এমন কি, প্রস্তাব-
কারীর অযোগ্যতা ও ভ্রান্ত্য বহির্বিধ প্রাস-
ঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষ, ত্রুটি ও স্থলন
সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক
অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে
থাক। আশ্চর্য্য নহে। আমার বিনীত
নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা
করিবেন।" অভ্যর্থনা সভামধ্যে আমি
আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারি নাই, এ কথা
বলিলেও পাছে অভ্যর্থনা প্রকাশ করা হয়,
এজন্য আমি বৃষ্টি আর্চ। আমি অত

যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে
তাহা বলাইতে উচিত করিয়াছে। তাহা
আমার কথা নহে—তাহা আমার স্থিতি নহে,
তাহা আমাকে উচ্চারিতমাত্র। আপ-
নারা এ শব্দমাত্র করিবেন না, আমি আমার
অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্তৃত হইয়া
বদেশীসমাজগঠনকার্যে নিজেকে অত্যা-
তাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল
এইটুকুমাত্র বলিব—আম্রনু, আমরা মনকে
প্রস্তুত করি,—কুদ্র দগাদগি, কুতক,
পরানিধা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে
দমরকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান করিয়া
অন্ত মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের
দনে, জননীর বিশেষ আয়োজনের দিনে চিন্তকে
উদার করিয়া, কণ্ঠের আঁত অগ্রসূচ করিয়া,
সমগ্রকার লক্ষ্যবস্তুর প্রতিষ্ঠা দৃষ্টিবাদের
চুগুগুতাকে নবোদয় আবিষ্কারের মধ্যে
নিষ্পেক্ষ করিয়া এবং নিম্নোক্ত আঁত চিন্তনকে
তাহার শতমুখ প্রকটভূমিতে শব্দভূমিতে
সদয়ের অককার-গুহাভরণ হইতে নবল
উৎপাদিত করিয়া সমাজের পুত্র আসনে
বিনয়বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির
অভিধেয় করি—আম্রনুভূত সমাজকে সনাথ
করি—ততক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহ-
কক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি
—শব্দ বানিয়া উঠুক, দুপের পবিত্রগন্ধ
উলগত হইতে থাকুক—দেশতার অনিমেব
কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ, আপনাকে
সর্বোচ্চতায় সঠিক বলিয়া একবার অনুভব
করুক!

এই অভিধেয়ের পরে সমাজপতি
তাহার চারিদিকে আবদান করিয়া

লইবেন, কি ভাবে সমাজের কার্যে সমাজকে
প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলবার বিষয়
নহে। নিঃসন্দেহ, যেরূপ বাস্তব আমাদের চির-
ন্তন সমাজপ্রকৃতির অন্তর্গত, তাহাই তাঁহাকে
অবলম্বন করিতে হইবে—বদেশের পুরাতন
প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে
বখান্বানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন।
আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও মল-
বিশেষের দ্বারা হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও
অপবাদ সহ করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র
নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে—
সমস্ত কলরবকোলাহলের মধ্যে আপনার
গোরবে তাঁহাকে দৃঢ়গড়ারভাবে অবিকলিত
থাকিতে হইবে। কাল যদি তাহার
অভিধেয় হয়, তবে তাহার পরদিন হইতেই
আমরা অনেকেই অবোধ বাচালের দ্বারা
এমগত প্রশ্ন তুলিতে পারিব—কি করা
হইল, এ কাজগুলো শেষ হইল না কেন, এবার
বৈশাখে বারো-আনা আম বড় পড়িয়া
গেল কেন, আমার প্রতিবেশীর ভাগিনের
'ভগনিধি'উপাধি পাইল, আর আমার
ভ্রাতৃপুত্র কি অপরাধ করিয়াছে? কোনো
অন্যভক্ত কৈকিয়তের চেষ্টা না করিয়া এই
সমস্ত প্রশ্নবৃত্তি তাঁহাকে নীরবে সহ করিতে
হইবে।

অতএব বাঁহাকে আমরা সমাজের সর্বোচ্চ
সম্মানের দ্বারা বরণ করি, তাঁহাকে এক-
দিনের জন্তও আমরা স্তবধারিততার আশা
দিতে পারিব না। আমাদের যে উচ্চত
নব্যসমাজ কাহাকেও দগরের সহিত প্রভা
করিতে সক্ষম না হইয়া নিজেই প্রতিদিন
অগ্রসর করিয়া উঠিতেছে, সেই সমাজের

হৃদিমুখ-কণ্ঠক-খচিত স্বৈর্ভাষনুগু আসনে
বাহাকে আশীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন
তাঁহাকে প্রচুরধর্ম্মদানে বল ও সহিষ্ণুতা
প্রদান করেন—তিনি যেন নিজের ক্ষমতা-
কল্পনের মধ্যেই শান্তি ও কথের মধ্যেই পুত-
কার লাভ করিতে পারেন ।

এইস্থলে, বর্ত্তমানে কে আমাদের সমাধ-
পতি হইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের একজনেরও
নাম যদি না করি, তবে আমার পক্ষে অত্যন্ত
ভীকৃত্য প্রকাশ পাইবে । শুধু তাহাই নহে,
নাম করিলে আমার প্রত্যাবর্ত্তি আরো, সকলের
কাছে সুপরিচুত হইয়া উঠিবে । অতএব
এই ক্ষণে—এই স্থানেই তাঁহার নামোচ্চ-
করিবার অন্ত ও আমি প্র-ত হইতেছি ।

যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠাবাদ্য হিন্দু-
সমাজের অকুণ্ঠিত প্রজা আকর্ষণ করিয়াছেন,।
অপরদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার
যিনি মহৎ পৌরষের অধিকারী ; একদিকে
কঠোর দায়িত্ব বাহ্যের অপরিচিত নহে,
অন্তদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির
মধ্যে উজ্জীর্ণ ; যাহাকে দেশের লোক যেমন
সম্মান করে, বিদেশি রাজপুরুষেরা তেমনি
প্রজ্ঞা করিয়া থাকে ;—যিনি কতৃপক্ষের
বিশ্বাসভাজন, অগতঃ যিনি আশ্রয়ভের স্বাধী-
নতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই ; নিরপেক্ষ ন্যায়-
বিচার বাহ্যের প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত ;
নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধসম্মত বাহ্যের
পক্ষে স্বাভাবিক ; যিনি হযোগাতার সহিত
রাজ্য ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কল-
তার সমাধা করিয়া বিচিত্র অতিজ্ঞতার দ্বারা
ঐশ্বর্য্যবান্ অক্ষুণ্ণ অবসর লাভ করিয়াছেন ;
সেই স্বদেশপ্রেমের শাস্ত্র পাণ্ডিত্য, সেই

ধনসম্পদের মধ্যেও অবিলম্বিত, তপোনিষ্ঠ
ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুনাথ বসো-
পাধ্যায়ের নাম যদি এখানে আমি উচ্চা-
রণ করি, তবে অনেক পরবর্ত্তিত বর্ষনার অপে-
ক্ষাও সহজে আপনাতঃ বৃষ্টিবেন, কিন্তু
সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর
জ্ঞান করিতেছি । বৃষ্টিতে পারিবেন, নিজের
ব্যক্তিগত সংস্কার, সমাজত, আচারবিচার
লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি
না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব,
দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে
উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত
সমাজের শ্রুত রাজত্ববর্ধন এই বিশেষোপায়কে
মূলকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি । আপনাতঃ
সকলেও সমস্ত ক্ষুদ্রতর ও কণ্ঠহানিকর বিধা,
সমস্ত ব্যক্তিগত, সংস্কারগত পক্ষপাতিক পরিহার
করিয়া অন্তঃসময়ের আমার সমর্থন করুন,
অধিনায়ককে বেজ্ঞাক্রমে বরণ করিয়া তাঁহার
অধীনতা স্বাক্ষরপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন
করুন, এবং অন্তঃহৃদে ভাব্য তুলি-কীধা
সমস্ত ছাড়ি কারিয়া পূজাধীন্য বশের কার্য্যে
দেশকে স্বার্থভাবে প্রযুক্ত করুন !

নিজের শক্তিকে আপনাতঃ অবিশ্বাস
করিবেন না, আপনাতঃ নিষ্ঠর জানিবেন—
সময় উপস্থিত হইয়াছে । নিষ্ঠর জানিবেন—
ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাধিতা তুলি-
বার ধর্ম্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে । নানা
প্রতিকূলব্যাপীর মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ
বরাবর একটা বাবস্থা করিয়া চলিয়াছে ;
তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে । এই ভারত-
বর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি
এত ভারতবর্ষ এখন এত মুক্তির দ্বারের

নূতনকালের সহিত আপনাদের পুরাতনের
আন্তর্ঘ্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে।
আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে
যোগ দিতে পারি—অড়ত্বের বশে বা বিদ্রো-
হের ভাঙনায় প্রতিপক্ষে ইহার প্রতিফলতা
না করি।

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত
এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই
আর্য্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধি-
বাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই
বিরোধে আর্য্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনা-
র্য্যেতা আদিম অট্টেলিগান্ বা আমেরিকগণের
নত উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য্য
উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা
আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্য-
সবেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল।
তাহাদিগকে লইয়া আন্যদমাঙ্গ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর একবার সুদীর্ঘকাল
বিলিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাবের
সবর বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের
সহিত বহুতর পরস্পারের ঘনিষ্ঠ সংস্রব
বটিকাছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই
মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর। বিরোধে
আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে—
মিলনের অসন্তর্ক অবস্থার অতি সহজেই
সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধভারতবর্ষে
তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়ারাণী ধর্ম-
প্রাচ্যনের সমস্ত কঠোরত্বই নানাভাষিত
আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভাসিয়া আসিয়া-
ছিল, কেহ চেষ্টা করি নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ-উচ্চ অগতির মধ্যেও
ব্যবস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ

করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং বাহ্য-
কিছু অভ্যাগত, সমগ্রকে একত্র করিয়া
লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ষে আপনাদের সমাজ
স্থাপিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্বা-
পেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু
এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাদের একটি
ঐক্য সর্বত্রই সে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে।
আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, নানা
বতোবিরোধ-আত্মপ্রশংসা এই হিন্দু-
ধর্মের, এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্-
খানে? সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ
পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি
কঠিন—কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোট
গোণকের গোণত্ব বৃদ্ধিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু
গোল পৃথিবীকে বাহ্যিক প্রত্যক্ষ করিয়া
দেখে, তাহারা ইহাকে চ্যাপ্টা বলিয়াই অসু-
ভব করে। তেমনি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-
অসঙ্গত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে
তাহার ঐক্যত্ব নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে।
এই ঐক্য অসুখির দ্বারা নির্দেশ করিয়া
দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-
প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও সূচ্যভাবে যে
আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে
পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের
সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত
সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই,
তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে
এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের
প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও
মুসলমানসমাজের মিলনে এমন একটি
সংযোগস্থল হই হইতেছিল, যেখানে উভয়

সমাজের সীমারেখা নির্দিষ্ট থাকিতেন ;
নানকপন্থী, কথোরপন্থী ও নিরপ্রেমীর
বৈষ্ণবসমাজ ইহা নৃপাত্তম্বল । আমাদের
বেশে সাধারণের মধ্যে নানাভাবে ধর্ম ও
আচার লইয়া যে সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে,
শিক্ষিতসমাজের তাহার কোনো খবর রাখেন
না । যদি রাখিতেন ত দেখিতেন, এখনো
ভিতরে ভিতরে এই সামন্তসাম্রাজ্যের সমীচীন
প্রক্রিয়া বন্ধ নাই ।

সম্প্রতি আর এক প্রবল বিদেশী আর-
এক ধর্ম, আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা
লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এইরূপে
পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয়
করিয়া চার বৃহৎসমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ,
মুসলমান, খৃষ্টান, তাহারা সকলেই ভারত-
বর্ষে আসিয়া নিলিয়াছে । বিধাতা যেন
একটা বৃহৎ সামাজিক পরিদর্শনের জন্য ভারত-
বর্ষেই একটা বড় রাসায়নিক কারখানাঘর
খুলিয়াছেন ।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার
করিতে হইবে যে, বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময়
সমাজে যে একটা বিশ্রাম ও বিশ্রান্ততা ঘটি-
রাছিল, তাহাতে পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে
একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে । নূতন ও
পরিবর্তনমাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা
নিরতিশয় লক্ষণ । একেবারে মজার মধ্যে
নিহিত হইয়া রহিয়াছে । এরূপ চিরস্থায়ী
আতঙ্কের অবস্থার সমাজ অগ্রসর হইতে পারে
না । বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী
হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে ।
যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই
তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সংজ্ঞা

চলানোর ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে
না । মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আতঙ্কের
আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে
স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বশোভিত ও রাখিতে
হয় । নহিলে তাহাকে পশু হইয়া বাঁচিয়া
থাকিতে হয়, সর্পিতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে
হয়—তাহা একপ্রকার জীবমৃত্যু ।

বৌদ্ধধর্মবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার বাহ্য-
কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটোষাটো রক্ষা
করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে
সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে
জাগ দিয়া বেড়িয়াছে । ইহাতে ভারতবর্ষকে
আপনার একটি মহৎপদ হারাতে হইয়াছে
এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে শুষ্কর আসন
লাভ করিয়াছিল ; ধর্ম, বিজ্ঞানে, দর্শনে,
ভারতবর্ষীয় চিন্তার সাহসের সীমা ছিল না ;
সেই চিত্ত, সকলদিকে সুদূর সুদূর প্রদেশ-
সকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি
অবাধে প্রেরণ করিত । এইরূপে ভারতবর্ষ
যে শুষ্কর সিংহাসন দখল করিয়াছিল, তাহা
হইতে আজ সে ঝট্ট হইয়াছে ;—আজ তাহাকে
ছাত্র স্বীকার করিতে হইতেছে । ইহার
কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে ।
সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক্ দিগ্ধই ভয়ে
ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র,
কি জ্ঞানময় সমুদ্র । আমরা ছিলাম বিবেক
—দাঁড়াইলাম পরীতে । সক্র ও রক্ষা করি-
বার জন্য সমাজে যে ভীকর শ্রীশক্তি আছে,
সেই শক্তিই, কোতুলপরিপাক্যক্রিয় সাধন-
শীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধি-
পতা লাভ করিল । তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যে ও
দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্বৈরাধিকৃতসম্পদ হইয়া

পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষে বাহ্য-
কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া-
উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছিল,
তাহা আর্মী অতঃপূর্বের অগভীরের বাহ্যে
প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ
জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না,
যাহা থোওয়া বাইতেছে, তাহা থোওয়াই
বাইতেছে।

✓ বস্তুত এই গুরুত্ব পদই আমরা হারাই-
রাছি। ব্রাহ্মণবর্ষ কোনোকালে আমাদের
দেশে চরমদম্পন্দরূপে ছিল না—তাহা
কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের
দগদগ অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার
অভাব আমাদের দেশের সাধারণতর অভাব
নহে। ব্রাহ্মণবর্ষের অধিকার-অর্থাতঃ জ্ঞানের
অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধি-
কার আমাদের সমাজের বর্গার্থ প্রাপ্তের
আগার ছিল। এখন হইতে অচোরপালন-
মাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—এখন
হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিস্মৃত
হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর
সকলেই আপনাদিগকে শূত্র ওর্থাৎ অনাথ্য
বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—
সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব
ঐশ্বর্যবিস্তরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল,
সেই ব্রাহ্মণ এখন আপন বর্গার্থ মাহাত্ম্য
বিশর্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া-
আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ
করিল—তখন হইতে আমরা অন্তর্ভুক্তও কিছু
দিতেছি না, আপনায় যাহা ছিল, তাহাকেও
অকস্মাৎ ও বিস্মৃত করিতেছি।

ইহা নিকট জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্ব-

মানবের মত। বিশ্বমানবকে মান করিবার,
সহায়তা করিবার দায়িত্ব কি উদ্ভাবন করি-
তেছে, ইহারই সহস্র বিধ প্রত্যেক জাতি
প্রতিষ্ঠালাভ করে। এখন হইতে সেই উদ্ভা-
বনের প্রাপত্তি কোনো জাতি হারায়, তখন
হইতেই সে দ্বিরাটমানবের কলেবরে পক্ষা-
ঘাতগ্রস্ত অঙ্গের দ্বায় কেবল ভারবহুরূপে
বিদ্রাঘ করে। বস্তুত কেবল টিকিয়া থাকাই
গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য
লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে
ভিক্ত-চীন-জাপান অভাগত যুরোপের ভয়ে
সমস্ত দ্বারবাতাখন বন্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই
ভিক্ত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া
সমাদরে নিরুৎকৃতিত্বের গৃহের মধ্যে
ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্ত এবং
পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অধিনায় উদ্বে-
জিত করিয়া ফিরে নাট—সর্বত্র শান্তি, স্বাধীন্য
ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি
অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব
সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা কতি-
য়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তির চেয়ে
বড়।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা এখন
আপনার সঙ্গ পুটলি-পাটুলা লইয়া ভীত-
চিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই
ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের
প্রবল আঘাতে এই ভীত পলাতক সমাজের
কুত্রগেড়া অনেকরূপে ভাঙিয়াছে। বাংলার
ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির যেমন
ক্ষুণ্ণ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে
আসিয়া পড়িয়াছে এখন ইহাকে ঠেকায়

কাহার সাধা ! এই উৎপাতে আমাদের সে
প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা ভািনব
আমরা আবিষ্কার করিলাম । আমাদের কি
অশেষ শক্তি ছিল, তাহা সেথো পড়িল এবং
আমরা কি অশেষ মনস্ত হইয়া পড়িয়াছি,
তাহাও ধরা পড়িতে বিনয় হইল না ।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি
যে, তৎকালে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই
আত্মরক্ষা বলে না । নিজের অন্তনিহিত
শক্তিকে সমস্তোভাবে প্রয়োগ করা, চালনা
করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায় । ইহা
বিধাতার নিয়ম । ইংরাজ ততক্ষণ পর্য্যন্ত
আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, - যতক্ষণ
আমাদের চিত্ত লড়বত্যাগ করিয়া তাহার
নিজের উত্তমকে কাছে না লাগাইবে । কোণে
বসিয়া কেবল “গেল গেল” বলিয়া হাৎকার
করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই । সকল
বিষয়ে ইংরাজের সহকরণ করিয়া ছদ্ম-
বেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা, তাহাও
নিজেকে ভোগানো মাত্র । আমরা প্রকৃত
ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ
হইবার আশা ইংরাজকে ত্রেকাইতে পারিব
না ।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের
কচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকায়ীরা
বাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র
উপায়—আমরা নিজে বাহ্য, তাহাই সম্ভা-
ভাবে, সবলভাবে, সলেনভাবে, সম্পূর্ণভাবে
হইয়া উঠা ।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা
বিশেষ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই
মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার

কাজ আদিয়াছে । আমাদের দেশে তাপসেরা
তপস্তাধারা যে শক্তি সঞ্চার করিয়া
দিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে
নিষ্ফল করিবেন না । সেইজন্য উপযুক্ত
সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে মুক্তির
পাঁড়নের দ্বারা প্রায়ত্ত করিয়াছেন ।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের
মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অঙ্গ-
নিহিত ধর্ম । ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ
বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া
কল্পনা করে না । এইজন্যই ত্যাগ না
করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ-
ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায় ।
এইজন্য সকল পক্ষকেই সে স্বীকার করে—
বহুদানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায় ।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো
সমাজকে আমাদের বিরোধী করনা করিয়া
আমরা ভীত হইব না । প্রত্যেক নব নব
সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের
বিতারেরই প্রত্যাশা করিব । হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসল-
মান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই
করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহার একটা
সামঞ্জস্য বুঝিয়া পাইবে । সেই সামঞ্জস্য
অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু ।
তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দতই দেশবিদেশের হৌক,
তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের ।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই
নিয়োগটি যদি মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য
হির হইবে,—লক্ষ্য দূর হইবে,—ভারতবর্ষের
মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার
সন্ধান পাইব । আমাদেরকে ইহা মনে
রাখিতেই হইবে যে, যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে

যে চিরকালই আমরা শুভমাণ ছাত্রের মত
 গ্রহণ করিব, তাহা নহে, ভারতবর্ষের সর্ব-
 স্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে
 একটি শতদল পাঞ্জর মধ্যে বিকশিত করিয়া
 তুশিষেন—তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন।
 আশাদের ভারতের মনোবী ডাক্তার শ্রীযুক্ত
 ব্রজদীপেন্দ্র বসুতর, উদ্ভিদতর ও লঙ্ঘতর
 ক্ষেত্রে একসময়ানার মধ্যে আনিবার পক্ষে
 সহায়তা করিয়াছেন—মনস্তরকেও যে তিনি
 কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠার
 আনিয়া দাঁড় করাইবেন না, তাহা বলিতে
 পারি না। এই ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয়
 প্রতিভার প্রধান কক্ষ। ভারতবর্ষ কাহাকেও
 তাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার
 পক্ষে নহে ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার
 করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট্ একের
 মধ্যে সকলেরই স্বতন্ত্র প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি
 করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসমূহ
 পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া
 দিবে।

সেই স্মরণ দিন আসিবার পূর্বে—
 “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্ !” যে এক-
 মাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার,
 অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার লজ্জ
 নিরত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন
 তাগারের চিরসকিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে
 নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃ-
 করণের মধ্যে অন্রান্তভাবে লকার করিয়া
 আমাদের চিত্তিকে সুদীর্ঘ পরাবীণতার নিশীথ-
 রাজ্যে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়াছেন
 —মদোক্ত ধর্মী ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাহার
 একটুখানি স্থান করিয়া দিবার লজ্জ প্রাপণ

চাংকার না করিয়া দেশের মহাবলে সন্তান-
 পরিবৃত বঙ্গশালার তাহাকে প্রত্যক্ষ উপ-
 লব্ধি কর! আমরা কি এই জনমীর জীর্ণ-
 গৃহ সংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহে-
 বের বাড়ীর বিলু চুকাইয়া উঠিতে না পারি,
 পাছে আমাদের সাহসজ্ঞা-আত্মবাস্ত-আত্ম-
 ধরে কন্মতি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে
 মাতা একদিন অল্পপূর্ণা ছিলেন, পরের পাক-
 শালার দ্বারে তাহারি অন্নের ব্যবস্থা করিতে
 হইবে? আমাদের দেশ ত একদিন ধনকে তুচ্ছ
 করিতে জানিত,—একদিন ধারিত্র্যকেও
 শোভন ও মহিমায়িত করিতে শিখিতছিল—
 আজ আমরা কি টাকার কাছে লটগট
 ধূল্যবলুপ্তিত হইয়া আমাদের সনাতন
 বর্ধকে অপমানিত করিব? আজ আবার
 আমরা সেই গুচিগুচ, সেই মিতসংযত, সেই
 ব্রহ্মোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমা-
 দের ভগবতী জনমীর সেবার নিযুক্ত হইতে
 পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতার
 খাওয়া ত কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না,
 একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি
 আমরা আর ভিড়িয়া পাইব না? আমরা
 কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেষণ করিতে
 প্রস্তুত হইবার লজ্জ নিজের কোনো আশ্রয়,
 কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব
 না? একদিন বাহা আমাদের পক্ষে নিত্যজই
 সহজ ছিল, তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ
 একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?—
 কখনই নহে! নিরতিশয় হুঃসময়ও ভারত-
 বর্ষের নিঃশব্দ প্রকান্তপ্রভাব দীর্ঘতাবে,
 নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয় করিয়া তুলি-
 য়াছে। আমি নিঃশব্দ জ্ঞান, আমাদের হৃদ-



চারদিনের এই ইঙ্গুলের দুখবর্ণিতা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লক্ষ্যন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগভীর আত্মনা প্রতিমূর্ত্তে আমাদের কক্ষ-কুহরে ধনিত হইয়া উঠিতেছে; —এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শটনঃশটন সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ বেখানে পথটি আমাদের যক্ষলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের পৃথ্ব্যজায়ন্তের অভিমুখে দাঁড়াইয়া “একবার তোরা যা বলিয়া ডাক্!” একবার বীকার কর,

যাতার সেবা বহুশ্রে করিবার অস্ত্র আমরা প্রস্তুত হইলাম, একবার বীকার কর, দেশের উদ্দেশে প্রতাহ আমরা পুন্নার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা কর, অশ্বত্থমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া-দিয়া নিজেরা অভ্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অবাক-কুয়াণ্ডের জায় অধঃপাতের দোশান হইতে দোশানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাহনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

নৌকাডুবি ।

৪২

পরদিন হেমললিনী প্রভুবে উঠিয়া যখন প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাঁহার শোবার ঘরের জানলার কাছে একটা ক্যাবিনের কেনারা টানিয়া চূপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘরে আসবাব অধিক নাই। একটি খাট আছে, এক কোণে একটি আল্‌মারি—একটি দেয়ালে অন্নদাবাবুর পরলোকগতা স্ত্রীর একটি ছায়াপ্রায় বিদ্যমান বাধানো কোটোগ্রাফ্—এবং তাহারি সম্মুখের দেয়ালে সেই তাঁহার পত্নীর বহুতরচিত্ত একখণ্ড পশমের কারুকার্য। স্ত্রীর জীবদ্দশার আল্‌মারিতে যে সমস্ত টুকিটাকি সৌধীন জিনিষ যেমন-তাহব সজ্জিত ছিল, আজো তাহারা তেমনি রহিয়াছে।

হেমললিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল

—“বাবা, আজ এমন চূপ করিয়া বসিয়া আছেন! বেড়াতে যাও নাই কেন?”

অন্নদাবাবু ধরাপড়া অপরাধীর জায় অপ্রস্তুতভাবে কহিলেন, “আজকাল হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—কাষ্টিকমাসের হিমটা লাগানো ভাল কি না, তাই তাবিত্তি!”

কতকাল হইতে অন্নদাবাবু প্রতিদিন সকালবেলায় নিরমিত বেড়াইয়া আসিতেন—ছেন, হিম-বুড়িতে কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। তিনি বলিতেন, “সাধনা না করিলে ভাল জিনিষ মেলে না—যাহারা সকালবেলায় খুব একচক্র বেড়াইয়া না আসে, তাহারা চারের পৈরীলার ঝিক ঘণ্টাঘাটি বোঝে না।” লোককে পিল খাওয়াও সখ্যে তাঁহার যেমন আদেখা হেছে —সকালবেলায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে

দেওয়া নবকেন্দ্ৰ তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার
উৎসাহে ছিন্ন। সেই অগ্রদাবানু আজ
কঠিনকালের চিত্তের ওচর করিলে তাহা
বিস্ময় করা কঠিন হইয়া উঠে।

হেমন্তকালের ভোরের আলোতে এই
বিস্ময়মুখ বৃদ্ধকে তাঁহার নির্জন শয়নঘরের
বাতায়নে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া
আজ হঠাৎ অন্নদাবাবুর জীবনের স্নানমস্তা
হেমন্তলিনীর কাছে প্রত্যক্ষ চটয়া উঠিল।
সন্ধানেরা সভাবতঃ আপনাদের নবীন-
জীবনের সুখসংগে লইয়াই বাগুত; এই
বৃদ্ধের কাছে যেদিন সংসার বিমর্ষ-বিকল
হইয়া দেখা দেয়, সেদিন জগৎ অব্যাহত
করিবার জন্য তাঁহার পাথে কেহই নাই;
কেবল যে কষ্ট চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া
গেছে, যে কষ্টের স্পন্দ তাহার সমস্ত মায়না-
সম্পদ লইয়া কোন্ নোকাডগে প্রবাহিত—
সেই কষ্টের নিকটস্থ স্বভাব, সেই স্পর্শের
বিরহাশ্রুত পুরাতন গৃহদ্বারকে চিরপরিচিত
লব্যাসনকে পরিপূর্ণ করিয়া কাগর উঠে,
ইহা কে জানিতে পার!

যে ছেলে তাহার বিছানার পাশে শান্ত-
ধৈর্যের সঙ্গে আসন রোগের বেদনা সহ্য
করিতেছে, তাহাকে দেখিলে মায়ের প্রাণ
ধমন করিয়া উঠে, আত্ম স্তম্ভভাবে আসীন
অন্নদাবাবুকে দেখিয়া হেমন্তলিনীর প্রাণ
ভেঙনি করিয়া উঠিল। তাঁহার পক্ষান্তে
দাঁড়াইয়া পাকচুল বাড়িবার ছেলে মাথার
কোমল অনুরক্তলি চালনা করিয়া হেম
বলিল—“বাবা, চল না, আমরা দুজনে চাদে
‘বড়াইতে যাই!’”

হুইতনে চাদে গেলে । তখন আকাশের

লগ্নু শিশিরবাস্প নবপ্রভাতের আধিভাবকে
আর গোপন করিতে পারিতেছে না। আবহণ
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বাইতেছে। হঠাৎ চোখের
সম্মুখে মাথার উপরে এই ভবের সহিত
স্বর্ণের দীপ্যমান সঙ্কলন দেখিয়া অন্নদাবাবু
মূহূর্ত্তকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন,
একবার চোখ বুজিলেন এবং দীর্ঘ দীর্ঘ
নমস্কার করিলেন। পরক্ষণে হেমন্তলিনীর
মাথার উপরে হাত রাখিয়া কহিলেন—“মা,
প্রতিদিন বাহা বহন করিয়া আনিতেছে,
তাহা অস্বস্ত্যভাবে, শাস্তভাবে নিরোধার্থ্য
করিয়া লইব।”

হেমন্তলিনী চুপস্বরে কহিল, “বাবা, তুমি
আমাকে আশীর্ষাদের সহিত বাহা আবেশ
করিলে, তাহা আমি সম্মতিতে গ্রহণ করিব।
তুমি আমাকে কিছু বল না কেন বাবা?
তুমি আমাকে দুর্জল মনে করিলে না।
আমি স্বভাবত চুপচাপ করিয়া থাকি, ভাল
করিয়া কিছু বলিতে পারি না, সেইজন্য
ডাবিয়ে না যে, আমি কেবল অসুখী হইয়াই
আছি। তুমি বাহা ইচ্ছা কর, তাহাই পালন
করিতে পারিলে আমি ভাল থাকি। আমাকে
নিজের খেরালে ফেলিয়া রাখিলে না—
আমাকে আদেশ কর!”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“মা, আদেশ করা
কি খুব সহজ কাজ মনে করিস? সংসারে
ক’টা লোক তাহা পারে! আমার মত
দুর্জলমাত্র্য কাহাকেও চালনা করিবার জন্য
হয় নাই, সে আমি নিশ্চয় জানি।”

দুর্জলতার জন্য অন্নদাকে কতবার কত
লোকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছে,
এই সেজন্য হেমন্তলিনীর মাতা কাছ হইতে

তিনি কত ভৎসনা ও উপদেশ পাইয়াছেন, তাহা গল্প করিতে লাগিলেন। হেমললিনার মা যে কিরূপ শাস্ত্র অগচ্ছ দৃঢ় ছিলেন, তিনি যে কিরূপ লোক চিনিতেন, সংসারবুদ্ধি যে অন্নদার চেয়ে তাহার কত বেশি ছিল, বৃদ্ধ তাহারই আনা দৃষ্টান্ত দিতে লাগিলেন।

এ সব কথা হেমললিনার কাছে ইতিপূর্বে কখনো হয় নাই—এবং এ সব কথা বাহার কাছে মন পুণিয়া বলিতে পারেন, এমন লোকও অন্নদার কেহ ছিল না। আজ ছুন্দের আবাতে পিতা ও কন্যার মধ্যে একটা ঘেন্না বাধ্যমান ভিন্ন হইয়া গেছে—বেদনার টানে পরস্পর ঘেন্না খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

পূর্বসিগন্দের মৌখিকখরস্রের উপরে স্বর্ণা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হেমললিনী কহিল, “বাবা, চল, আর সকাল-সকাল চা খাইয়া লইবে। তার পরে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার দোকালের গল্প শুনিব। এ সব কথা আমার কঁঠ ভাঙ লাগে, বলিতে পারি না।”

হেমললিনাশব্দকে অন্নদাবাবুর বোধশক্তি আজকাল এমনি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, এই চা খাইতে তাড়া দিবার কারণ বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। আর কিছু পরেই অন্নদার চায়ের টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তাহারি সঙ্গ এড়াইবার অন্য তাড়াভাড়ি চা খাওয়া পারিয়া লইয়া হেম পিতার কক্ষে নিভৃত্তে আসিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা তিনি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন। বাধাভুক্ত ভাঙ ভাঙের মত

তাহার কন্যা যে সমস্তা অগচ্ছ হইয়া আছে, ইহা তাহার মনে অত্যন্ত ব্যথিত।

নাচে গিয়া দেখিলেন, চাকর এখনো চায়ের গল্প তৈরি করে নাই। তাহার উপরে হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন—সে বুঝা বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আজ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চায়ের তলব হইয়াছে। “চাকররা সব বাধু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ঘুম ভাড়াইবার জন্য আবার অন্য লোক রাখা দরকার হইয়াছে”—এইরূপ মত তিনি অত্যন্ত নিঃশব্দে প্রচার করিলেন।

চাকর ত তাড়াভাড়ি চায়ের মল আনিয়া উপস্থিত করিল। অন্নদাবাবু অন্যান্য বৈষ্ণব গল্প করিতে করিতে ঘোরে-স্বপ্নে-আত্মানে চারণ উপভোগ করিতেন, আজ তাহা না করিয়া অনাবশ্যক সময়তার সহিত পেরালা নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেমললিনী কিছু ধ্যান্য্য হইয়া কহিল—“বাবা, আজ কি তোমার কোথাও বাহির হইবার তাড়া আছে?”

অন্নদাবাবু কহিলেন “কিছু না, কিছু না। তাহার দিনে গরম চা-টা এক চুমুকে খাইয়া লইলে বেশ বামিয়া পরায়টা হাফা হইয়া যায়।”

কিন্তু অন্নদাবাবুর পরায়ের স্বর্ণ নির্গত হইবার পূর্বেই যোগেশ্বর অক্ষরকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আজ অক্ষরের বেশ-ভূষার একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। হাতে রূপা-বাঁধানো ছড়ি—বুকের কাছে বড়ির চেন হুনিতেছে—বামহাতে একটা ব্রাউন্ কাগজে মোড়া কেতাব। অন্যান্য অক্ষর টেবিলের চা অংশে আস, আর সেখানে

বলিয়া হেমেনলিনীর অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইল—হাসিমুখে কহিল, “আপনার যদি আর ক্রত চলিতেছে।”

হেমেনলিনী অক্ষরের মুখের দিকে চাহিল না, তাহার কথার উত্তরমাত্র দিল না। অন্নদাবাবু কহিলেন, “হে, চল ত মা উপরে। আমার প্রথম কাগড়গুলো একবার রৌদ্রে দেওয়া দরকার।”

যোগেন্দ্র কহিল—“বাবা, রৌদ্র ত পালাইতেছে না—এত তাড়াতাড়ি কেন? হে, অক্ষরকে একপেছালা চা ঢালিয়া দাও। আমরা চাদের দরকার আছে—কিন্তু অতিথি আগে।”

অক্ষর হাসিয়া হেমেনলিনীকে কহিল—“কর্তব্যের খাতিরে এতবড় আত্মত্যাগ দেখিয়াছেন? বিত্তীয় সার্বস্বলিপু মিডনি।”

হেমেনলিনী অক্ষরের কথায় লেশমাত্র অবদান প্রকাশ না করিয়া হুইপেয়াল। চা প্রস্তুত করিয়া একপেছালা যোগেন্দ্রকে দিল ও অপর পেয়ালটি অক্ষরের অনতিদূরে ঝেং-একটু ঠেলিয়া-দিয়া অন্নদাবাবুর মুখের দিকে তাকাইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “রৌদ্র বাড়িয়া উঠিলে কষ্ট হইবে—চল, এইবেলা চল।”

যোগেন্দ্র কহিল—“আজ কাগড় রৌদ্রে দেওয়া থাক্ না! অক্ষর আসিয়াছে—”

অন্নদা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“তোমাদের কেবলি অবরুদ্ধি! তোমরা কেবল জেঁই করিয়া অন্ত্রলোকের মর্মান্তিক বেদনার উপর দিয়া নিজের ইচ্ছাকে জারি করিতে চাও! আমি অনেকদিন নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর এরূপ চলিবে না!

না হে, কাল হইতে উপরে আমার ঘরে তোতে-আমাতে চা খাইব।”

এই বলিয়া হেমকে লইয়া অন্নদা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন হেম শান্তবরে কহিল, “বাবা আর একটু বোল! আজ তোমার ভাল করিয়া চা খাওয়া হইল না! অক্ষরবাবু, কাগজে-মোড়। এই রহস্যটি কি, বিজ্ঞাশা করিতে পারি কি?”

অক্ষর কহিল, “ওধু বিজ্ঞাশা কেন, এ রহস্য উন্মোচন করিতেও পারেন!”—এই বলিয়া মোড়কটি হেমেনলিনীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

হেম পুলিশা দেখিল, একখানি মরকো-বাধানো টেনিসন্। হঠাৎ চমকিয়া-উঠিয়া তাহার মুখ পানুবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠিক এই টেনিসন্, এইরূপ বাধানো, সে পূর্বে উপহার পাইয়াছে এবং সেই বইখানি আরও তাহার শোবার ঘরের দেয়ালের মধ্যে গোপন সমাদরে রক্ষিত আছে।

যোগেন্দ্র ঝেং হাসিয়া কহিল, “রহস্য এখনো সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় নাই।”—এই বলিয়া বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠপাতাটি পুলিশা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। সেই পাতার লেখা আছে—“শ্রীমতী হেমেনলিনীর প্রতি অক্ষরপ্রচার উপহার।”

তৎক্ষণাৎ বইখানা হেমের হাত হইতে একেবারে ভূতলে পড়িয়া গেল—এবং তৎ-এতি সে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া কহিল—“বাবা, চল।”

উত্তরে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রের চোখছটা আগুনেন্ন মত জ্বলিতে লাগিল। সে কহিল “না, আমার”

আর এখানে থাকা পোনাটল না। আমি
যেখানে হোক একটা ইটুলমাটোর লইয়া
এখান হইতে চলিয়া যাইব।”

অক্ষর কহিল, “ভাই, তুমি মিথ্যা রূপ
করিতেছ। আমি ত তখন সন্ধ্যা প্রকাশ
করিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি
আমাকে বারবার আশ্বাস দেওয়াতেই আমি
বিস্ত্রিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয়
বলিতেছি আমার প্রতি হেমনলিনুর মন
কোনোদিন অস্থূল হইবে না। অতএব
দে আশা ছাড়িয়া দাও! কিন্তু আসল কথা
এই যে, উনি বাহ্যতে রম্যকে ভুলিতে
পারেন, সেটা তোমাদের কড়া কর্তব্য।”

বোগেন্স কহিল—“তুমি ত বলিলে কর্তব্য
—উপায়টা কি গুনি!”

অক্ষর কহিল—“আমি ছাড়া জগতে আর
বিবাহযোগ্য যুগপুরুষ নাই নাকি! আমি
দেখিতেছি, তুমি যদি তোমার বোন হইতে,
তবে আমার আইবড় নাম ঘোচাইবার জন্য
পিতৃপুত্রবধিককে হত্যাভাবে দিন গণনা
করিতে হইত না! যেমন করিয়া হোক,
একটি ভাল পাত্র ভোগাড় করা চাই,—বাহার
প্রতি তাকাইবারাত্র অবিলম্বে কাণ্ড রোদ্রে
দ্বিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া না গুঠে।”

বোগেন্স। পাত্র ত কয়দাস দিয়া মেলে
না!

অক্ষর। তুমি একবারে এত অল্পেই
হাল ছাড়িয়া দিয়া বোস কেন? পাত্রের
সন্ধান আমি বলিতে পারি, কিন্তু তাড়াহুড়া
যদি কর, তবে সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে।
প্রথমেই বিবাহের কথা পাড়ি। এই পক্ষকে
সম্বন্ধিত করিয়া তুলিলে চলিবে না। আগে

আগে আলোপারিত্রয় জমিতে দাও, তাহার
পরে সময় বুঝিয়া দিনটির করিও।

বোগেন্স। প্রণাদীটি অতি উত্তম, কিন্তু
লোকটি কে গুনি!

অক্ষর। তুমি তাহাকে ত্রেমন ভাল
করিয়া আন না, কিন্তু দেখিয়াছ। নলিনাক-
ডাকার।

বোগেন্স। নলিনাক!

অক্ষর। চম্কাও কেন! তাহাকে লইয়া
ব্রাহ্মণমাজে গেলমান চলিতেছে, চমুক্ না।
তা বলিয়া অমন পাত্রটিকে হাতছাড়া করিবে?

বোগেন্স। আমি হাত তুলিয়া লইসেই
অমনি পাত্র যদি হাতছাড়া হইত, তা হইলে
ভাবনা কি ছিল? কিন্তু নলিনাক বিবাহ
করিতে কি রাজি হইবেন?

অক্ষর। রাজি হইবেন, এমন কথা
বলিতে পারি না। কিন্তু সময়ে কি না হইতে
পারে! বোগেন্স, আমার কথা শোন।
কাল নলিনাকের বক্তৃতার দিন আছে—
সেই বক্তৃতার হেমনলিনীকে লইয়া যাও।
লোকটার বলিবার কথ্যতা আছে। শ্রীলোকের
চিত্ত-আকর্ষণের পক্ষে ঐ কথ্যতা অকিঞ্চিৎ-
কর নয়! হায়, অবোধ অবগার! একথা
বোঝে না যে, বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা
স্বামী টের ভাল।

বোগেন্স। কিন্তু নলিনাকের ইতিহাসটা
কি, ভাল করিয়া বল দেখি, শোনা যাক।

অক্ষর। দেখ বোগেন্স, ইতিহাসে যদি
কিছু খুঁত থাকে, তাহা লইয়া দ্বন্দ্বি বাত
হইয়ো না। অল্প একটুখানি খুঁতে ভুলত
জিনিস মূলত হয় আমি ত সেটাকে মোত
মনে করি।

অকস্মিক নলিনাকের চিত্তে এমন ব্যথা বর্শিল, তাহা সংক্ষেপে এই : নলিনাকের পিতা রাজ ব্রজ করিমপুর-সরকারের একটি ছোট্ট খাটো জমিদার ছিলেন। তাঁহার বহুতরিত্রিশ বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীকে ধর্ম গ্রহণ করিলেন না এবং আচারবিচারসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্বামীর সঙ্গে যাতায়াত রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা ব্রাহ্মবল্লভের পক্ষে স্বতন্ত্র নয়। তাঁহার ছেলে নলিনাক ধর্ম প্রচারের উৎসাহে ও বক্তৃতাশক্তিদ্বারা উপযুক্তবয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠান্নত করেন। তিনি সরকারী ডাক্তারের কাজে বাংলার নানাজানে অবস্থিত করিয়া চরিত্রের নিখলতা, চিকিৎসার নৈপুণ্য ও সংকল্পের উল্লেখ্যে সমস্ত খ্যাতি বিস্তার করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে একটি অস্বাভাবিক বাণিজ্য ঘটিল। বৃদ্ধবয়সে রাজব্রজ একটি বিদবাকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ উদ্যত হইয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে নিরত করিতে পারিল না। রাজব্রজ বলিতে লাগিলেন, “আমার বর্তমান স্ত্রী আমার যথার্থ সঙ্গধর্মী নহে—যাহার সঙ্গে ধর্ম, মতে, ব্যবহার ও রূপে মিল হইয়াছে, তাহাকে জাঁকপে গ্রহণ না করিলে অস্ত্রায় হইবে।” এই বলিয়া রাজব্রজ সর্বসাধারণের দিকারের মধ্যে সেই বিদবাকে অগত্যা! হিন্দুস্তানুসারে বিবাহ করিলেন।

ইহার পরে নলিনাকের না গৃহত্যাগ করিয়া কাশী বাটতে প্রস্তুত হইলে নলিনাক পুত্রের ডাক্তারি চাকির্য-আদিয়: করিলেন

—“মা, আমিও তোমার সঙ্গে কাশী যাইব।”
মা কাশীয়া কহিলেন, “বাছা, আমার সঙ্গে তোদের ত কিছুই যোগে না, কেন মিছামিছি কষ্ট পাইবি?”

নলিনাক কহিল, “তোমার সঙ্গে আমার কিছুট অমিল হইবে না।”

নলিনাক তাহার এই স্বামিপরিভ্যক্ত স্বভাবানিত বাতাকে প্রশংসা করিবার জন্য দুঃস্বপ্ন হইল। তাঁহার সঙ্গে কাশী গেল। মা কহিলেন “বাবা, ঘরে কি বৌ আদিবে না?”

নলিনাক বিপদে পড়িল, কহিল, “কাজ কি মা, বেশ আছি।”

মা বুঝিলেন, নলিন অনেকটা ভাগ্য করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মপরিবারের বাহিরে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বাণিত হইয়া তিনি কহিলেন, “বাছা, আমার জন্যে তুই চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, এত কোনোমতেই হইতে পারে না। তোমার দেখানে হুচি, তুই বিবাহ কর। বাবা, আমি কখনো আপত্তি করিব না।”

নলিন দুইএকদিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “তুমি যেমন চাও, আমি তেমনি একটি বউ আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব—তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে অমিল হইবে, তোমাকে দুঃখ দিবে, এমন মেয়ে আমি কখনই ঘরে আনিব না।”

এই বলিয়া নলিন পাত্রীর সহানে বাংলা-দেশে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে মাঝখানে ইতিহাসে একটুখানি বিচ্ছেদ আছে। কেহ বলে, গোপনে সে এক পল্লিতে গিয়া কোন এক অনাথকে বিবাহ করিয়া-

ছিল এবং বিবাহের পরেই তাহার স্থাবিযোগ হইয়াছিল। কেহ বা তাহাতে নন্দন প্রকাশ করে। অক্ষয়ের বিশ্বাস এই যে, বিবাহ করিতে আসিয়া শেষমুহুর্তে সে পিছাইয়াছিল।

বাহাই হউক, অক্ষয়ের মতে, এখন নিশ্চয়ই নলিনাক বাহাকেই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, তাহার না তাহাতে আপত্তি না করিয়া খুসিই হইবেন। হেমলিনীর মত এমন মেয়ে নলিনাক কোথায় পাইবে! আর বাই হোক, হেনের ঘেঁষা মধুর স্বভাব, তাহাতে সে যে তাহার শাওড়িকে গণ্ডে তক্তিক্রিয়া করিয়া চলিবে, কোনোটাই তাঁহাকে কষ্ট দিবে না, সে বিষয়ে কোনো নন্দন নাই। নলিনাক গদিন ভাল করিয়া হেমকে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অতএব, অক্ষয়ের পরামর্শ এই যে, কোনো-মতে দুজনের পরিচয় করাটয়া দেওয়া চউক!

২৩

অক্ষর চলিয়া গাইবামাত্র যোগেন্দ্র দোতলার উঠিয়া গেল। দেখিল, উপরের বসিবার ঘরে হেমলিনীকে কাছে বসাইয়া অন্নদাবাবু গল্প করিতেছেন। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া অন্নদা একটু লজ্জিত হইলেন। আজ চায়ের টেবিলে তাঁহার দাবাবিক দাস্তাব নষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার রোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাতেও তাঁহার মনে মনে ক্ষোভ ছিল। তাই তাড়াতাড়ি “বিশেষ সমাধরের ঘরে” কহিলেন, “এস যোগেন্দ্র, বাস।”

যোগেন্দ্র কহিলেন, “বাবা, ভোমরা যে কোনোখানে বাহির হওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ! প্রচণ্ড দিনরাত্রি ঘরে বসিয়া থাক। কি ভাল!”

অন্নদা কহিল “ঐ শোন! আমরা ত চিত্তকল এইরকম কোণে ধমিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি। হেমকে ত কোথাও বাহির করিতে চইলে মাথাগোড়াগুড়ি করিতে হইত।”

হেম কহিল “কেন বাবা আমার দোষ দাও? তুমি কোথায় আমাকে লইয়া গাইতে চাও, চল না।”

হেমলিনী আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়াও সবলে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে মনের মধ্যে একটা শোক চাপিয়া ধরিয়া ঘরের মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া নাই! তাহার চারিদিকে যেখানে ঘাহা কিছু হইতেছে, সব বিষয়েই বেন তাহার প্রভুত্ব অত্যন্ত সতীব হইয়া আছে।

যোগেন্দ্র কহিল—“বাবা, কাল একটা মীটিং আছে, সেখানে হেমকে লইয়া চল না!”

অন্নদা জানিতেন, মীটিংয়ের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হেমলিনী চেরদিনই একান্ত অনিচ্ছা ও সংকোচ অনুভব করে তাই তিনি কিছু না বলিয়া একবার হেমের মুখের দিকে চাহিলেন।

হেম হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল—“মীটিং? সেখানে কে বক্তৃতা দিবে দাদা?”

যোগেন্দ্র। নলিনাক-ভাস্কর।

অন্নদা। নলিনাক!

যোগেন্দ্র। তারি চমৎকার বলিতে পারেন। তা ছাড়া, লোকটার জীবনের ইতিহাস শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া বাইতে হয়। এমন ত্যাগস্বীকার। এমন দৃঢ়তা! এরকম মানুষের মত মানুষ পাওয়া হুঁত!

আর ঘণ্টা-ভই আগে একটা অশ্লষ্ট জনকৃতি ছাড়া নলিনাক্ষকে যোগেন্দ্র কিছুই জানিত না ।

হেম একটা আগ্রহ দেখাইয়া কহিল, “বেশ ত বাবা, চল না, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে বাইব !”

হেমলিনীর এইরূপ উৎসাহের তাৎপার্য্যকে অম্মা সম্পূর্ণ বিবাহ করিলেন না—তথাপি তিনি মনে মনে একটু খুশি হইলেন । তিনি ভাবিলেন, হেম যদি জোর করিয়াও এইরূপ মেলামেশা ঘাওয়া-আসা করিতে থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র উহার মন স্থির হইবে । মাহুয়ের সহবাসই মাহুয়ের সর্বপ্রকার মনোবৈকল্যের প্রধান ঔষধ । তিনি কহিলেন, “তা বেশ ত যোগেন্দ্র, কাল বন্ধ-মনের আমাদের মীটিঙে লটকা দাইয়ো । কিন্তু নলিনাক্ষকে কি জান, বল ত ! অনেক লোকে ত অনেক কথা কর !”

যে অনেক লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে, প্রথমতঃ যোগেন্দ্র তাহাদিগকে খুব একচোট গালি দিয়া লইল । বলিল, “ধর্ম্ম লটকা বাহারা ভড়ং করে, তাহারা মনে করে, কথার কথার পুরের প্রতি অবিচার ও পর-নিন্দা করিবার ক্ষমতা তাহারা ভগবানের পাক-রিত লসিল লইয়া জগদ্রহণ করিয়াছে—ধর্ম্ম-বাবসারীদের মত এতবড় সঙ্গীর্ণচিত্ত বিশ্ব-নিষ্কৃ আর জগুতে নাই !”—বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল ।

অম্মা যোগেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিবার ক্ষমতা রাখার বলিতে লাগিলেন—“সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক ! পরের মোহজট লইয়া কেবল

আলোচনা করিতে থাকিলে মন ছোট হইয়া যায়, স্বভাব সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে, জগদের সরসতা থাকে না ।”

যোগেন্দ্র কহিল—“বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ ! কিন্তু ধার্ম্মিকের মত আমার স্বভাব নয়—আমি মম্ব বলিতেও জানি, ভাল বলিতেও জানি—এবং সুখের উপরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া হাতে-হাতেই সব কথা চুকাইয়া ফেলি ।”

অম্মা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—“যোগেন্দ্র, তুমি কি পাগল হইয়াছ ? তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিব কেন ? আমি কি তোমাকে চিনি না ?”

তখন ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া যোগেন্দ্র নলিনাক্ষের বৃত্তান্ত বিবর্তিত করিল । কহিল, “মাতাকে সুখী করিবার জন্য নলিনাক্ষ আচারসম্বন্ধে সংযত হইয়া কালীতে বাস করিতেছে, এইজন্যই, বাবা, তুমি তাহাদিগকে অনেক লোক বল, তাহারা অনেক কথা বলিতেছে । কিন্তু আমি ত এজন্য নলিনাক্ষকে ভালই বলি ! হেম, তুমি কি বল !”

হেমলিনী কহিল—“আমিও ত তাই বলি !”

যোগেন্দ্র কহিল—“হেম যে ভালই বলিবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম । বাবাকে সুখী করিবার জন্য হেম একটা-কিছু ত্যাগ-বীকার করিবার উপলক্ষ্য পাইলে যেন বাচে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি !”

অম্মা দেহকোমলহাতে হেমের সুখের দিকে চাহিলেন—হেমলিনী লজ্জার রক্তিম মুখখানি নত করিল ।

বঙ্গদর্শন ।

তপস্যা ।*

বিশ্বামিত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি ঐশ্বর্যত একজন বলদৃষ্ট, গোড়পরাধণ, পরশ্রীকাতর ক্ষত্রিয় নরপতি । তাঁহার মধ্যে রমোত্তম পূর্ণমাত্রায় দেবীপাশমান । বসিষ্ঠাশ্রমে তিনি অতিপা, মহর্ষি বসিষ্ঠ পরম-শ্রীতিপূরক তাঁহার যোগোচিত সৎকার করিলেন । তাঁহার কৃতজ্ঞতাপরূপ বসিষ্ঠের কামধেয়টি দেখিয়া বিশ্বামিত্রের চক্কর লোভ ধ্বসিল । পশি তাহাকে সে কামধেয় প্রদান করিলেন না, সেজন্য তাঁহার দারুণ অভিমান ও ক্রোধের উদয় হইল । ক্রোধের পরই বল-প্রয়োগসমূহা এবং যুদ্ধ । যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তাঁহার অভিমান বিগুণ বাড়িয়া উঠিল । যুদ্ধত ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম কেবল ধাপবজ্রতপস্তা । সেই ব্রাহ্মণের হস্তে বিশ্বামিত্র পরাস্ত হইলেন, ব্রহ্মভেজ তাঁহার ক্ষত্রিয়ভেজ নিস্ত্রত হইয়া পড়িল । ইহা অপেক্ষা অপমানের বিধ আর কি হইতে পারে ? তাই বিশ্বামিত্র শিবের আরাধনার প্রবৃত্ত হইলেন । সে কিজন ?

নিচের হিতাকাঙ্ক্ষার নচে, সে কেবল পর-শিড়নের জন্ত, শত্রুদমনের জন্ত, বসিষ্ঠকে ভয় করিবার জন্ত । “বিশ্বামিত্রের চিত্তে জিহ্বাসাগ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, তিনি তখনও রমোত্তমপ্রধান ক্ষত্রিয় । তপস্তার ফলে তিনি শিবের নিকট বরণাত করিয়া যেন করিলেন—“এবার আর আমাকে পার কে ? আমি এখনই বসিষ্ঠকে সবংশে নিধন করিব ।” কিন্তু তাঁহার সকল দর্প চূর্ণ হইল—বসিষ্ঠের ব্রহ্মভেজে তাঁহার ক্ষত্র্যভেজ নির্দাপিত হইল । তিনি বৃত্তিতে পারিলেন, তিনি যত-বড় রাজাই হউন, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার বাড়াবাড়ি খাটিবে না । ব্রাহ্মণ না হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের নিকট জয়ের আশা নাই । তাই তিনি ব্রাহ্মণবলাভ করিবার জন্ত কঠোর তপস্তার প্রবৃত্ত হইলেন । এই সময়ে তাঁহার জীবননাটকের এক নূতন অঙ্ক উন্মোচিত হইল । তপস্তা করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত তম ও রমোত্তম-নিমুক্ত হইয়া যতই বিগুণ সম্ভাবাপন্ন

হইতে লাগিল, তিনি ততই এক একটি উচ্চ-স্তরে উঠিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিল। দেখেন, তিনি আর সেই ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র নাই, তিনি তপস্বীর কলে হইয়াছেন 'ব্রাহ্মর্ষি'—অর্থাৎ অর্ধেক ব্রাহ্ম, অর্ধেক কবি। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাই আবার তপস্বীর প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে আরও উচ্চ উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই ত্রিশছুর ব্যাপার সম্মুখিত হইল। ইহাও বিশ্বামিত্রের একটি বিশেষ পরীক্ষা। সেই ত্রিকুবনবিশ্বরকারী ঘটনার আমরা যেখানে পাঠ, বিশ্বামিত্র তপস্বীর বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অস্তিত্ব কবিগণ তাঁহাকে একজন স্মৃতি বলিয়া গণ্য করিতেছেন। এমন কি, সকলেই তাঁহার তপোভক্তের ভীত। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিশছুর স্বর্গলোক পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেন। এমন কি, তপোবলে তিনি আর একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্বীর দুর্দমনীয় তেজে জ্বালাময়গণ কম্পিত হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু তপস্বীর এতদূর অগ্রসর হইলেও বিশ্বামিত্রের মধ্যে তখনও রম্যোত্তম রহিয়াছে। তখনও তিনি ক্রোধ, রিগীষা, বিদ্বেষের বশীভূত, তখনও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। শেষত তিনি আবার তপস্বী আরম্ভ করিলেন। এবার অশ্রবীর রাজার পালা। ইহাও বিশ্বামিত্রের পরীক্ষার স্তম্ভ। এবার তপঃপ্রভাবে তাঁহার চিত্ত আরও প্রশস্ত ও প্রশান্ত হইয়াছে। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বসিষ্টের সঙ্গে

যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবার তিনি ক্ষিত্ত জনসেনাদের প্রাণরক্ষার নিতের পুত্রদ্বিপকে অশ্রবীর রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার এতদূর চিত্তোন্নতি দেখিয়া ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—“বিশ্বামিত্র, তুমি কবি হইয়াছ।”

কিন্তু কবি হইয়াও তিনি সন্তুষ্ট নহেন; তাই আবার ঘোরতর তপস্বী আরম্ভ করিলেন। আবার তাঁহার পরীক্ষা হইল। এবারকার পরীক্ষায় তিনি পরাস্ত হইলেন। মনকার রূপের মোহে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে কণকালের স্তম্ভ। এইরূপ কণকালী চিত্তবিস্ত্রাণ অনেকেরই ঘটতে পারে। তাঁহার পূর্ণসম্মিত তপোবল আবার জাগিয়া উঠিল। কামরূপের পরাভব ঘটিল। তখন অমৃত্যুতাপের বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্ত আবার নিশ্চলভাবে ধারণ করিল। এবার ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে আর-এক-শ্রেণী উপরে প্রোৎসাহন দিলেন। এবার তিনি 'মহর্ষি' হইলেন। তিনি এখন লোভকে জয় করিয়াছেন, কামকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন না। তাই তিনি আবার অধিক-তর কঠোর তপস্বী আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আবার পরীক্ষা হইল। ইহা তাঁহার তপোভক্তের স্তম্ভ রম্যাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রম্যা তাঁহাকে রূপের মোহে মগ্ন হইতে পারিল না—সে নিজে মজিল। তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া বিশ্বামিত্রও পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন না। তিনি লোভজয় করিয়াছেন, কামজয় করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ক্রোধ-জয় করিতে পারেন নাই। তিনি অমৃত্যু

হইলেন, তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনেকদিন পরে ইন্দ্র তাহার পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া ক্ষমার সময় তাহার মূখের অঙ্গ কাড়িয়া লইলেন। বিধামিত্র কিন্তু এবার ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি এতদিনে ক্রোধকেও অঙ্গ করিয়াছেন। তাহার উগ্র তপস্যার ফলস্বরূপ উদ্বেষিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখন তিনি তপসিদ্ধ। এখন তাহার মধ্যে পাপের লেশমাত্র নাই। এখন তাহার চিত্ত রোগোত্তমবিসুক্ত হইয়াছে, এখন দয়া, কৃপা, জ্ঞানদেয়াগ্নাদি সমস্ত গুণ তাহার ভবন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। তাই ব্রহ্ম আসিয়া তাহাকে “ব্রহ্মর্ষি” বলিয়া সম্মান সন্তোষ করিলেন। বিধামিত্র কৃতার্থ হইলেন।

এইরূপে বিধামিত্রের বিরোধদ্বারা আমরা দেখিতেছি, একজন কামক্রোধ-লোভাদি-রিপুপরাধণ ক্ষত্রিয়রূপিত কি-প্রকার, সাধনবলে সমস্তগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। আমরা আরও পাইতেছি, আর্ধাভ্যতির দীর্ঘস্থানীয় ব্রাহ্মণের সাধন্য ও মহত্ব কতদূর সৌরবাসিত, কত-কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ। এবং ব্রাহ্মণগণ তপস্যাধারা এই ভারতভূমিতে যে আধ্যাত্মিকতা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ কঁত উচ্চ। যে ব্রাহ্মণের সৌরবাসিত পদ একদিন রাণধি, ঋষি, মহর্ষি পদে অপেক্ষাও প্রাচীন ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণবংশের কি শোচনীয় দুর্গতি!

এই বিধামিত্রোপাখ্যানের আমরা আরও একটি তত্ত্বের নোনাং পাইতেছি। আমরা

দেখ অনেকটা বিধাদি, তপস্যাধারাধারা পুরুষকার অপেক্ষা দৈববল শ্রেষ্ঠ, আমাদের অদৃষ্টের শাসন অকাটা। কিন্তু এখানে আমরা তাহার অস্ত্রবিধ নামাংস পাইতেছি। ত্রিশদু—বসিষ্ঠ এবং তাহার পুত্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিধামিত্রের পরমাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

“হে সুনিবর! আমি বর্ণাবিধি কাল-ধর্ম পালন করিয়াছি, শতগুণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সদাচার ও সঙ্গুণ দ্বারা শুদ্ধ-মনের সম্বোধন সম্পাদন করিয়াছি, কিন্তু কৈ, কেহই ত আমার প্রতি সম্মত হইলেন না। অতএব আমার হির বিবাস, গৌরব নিরর্থক, সেইই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে দৈবকর্তৃক বিদ্যিত হইয়া আমি আপনায় পরমাপন্ন হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রেম হউন। পুরুষকারদ্বারা দৈবকে নিবর্তিত করুন—

‘দৈবঃ পুরুষকারণে নিবর্তিতুযর্হসি।’

পুরুষকারের সাফল্য অলঙ্ঘনীয় মহাত্মা বিধামিত্র স্বীয় পুরুষকারপ্রভাবে দৈবের নিয়তিবন্ধন ছিন্ন ও দৈবগণকে পরাস্ত করিয়া কিপ্রকারে ত্রিশদু মনোহর না সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। “পুরুষকারদ্বারা” কিপ্রকারে দৈবকে “অতিক্রম করা যায়, বিধামিত্র তাঁহার নিজীবনের কার্যকলাপদ্বারাও তাহা বিশেষরূপে সম্ভব করিয়াছেন। স্তম্ভরঃ বৈরবল অনতিক্রমণীয়, পুরুষকার দৈববলতির নিকট পরাভূত, এ কথা হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকৃত অভিত্যক্ত নহে। আমাদের পূর্বজন আর্ধাপুরুষগণ যেকোন কঠোর তপসা-ধারা দৈববলকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের

নিজ নিজ অভীষ্টপথে সিঁড়ি লাভ করিতেন,
 পুরাণেজিহাদে তাঁহার বহু উপাহরণ বিস্তারিত।
 তপস্তা যে কেবল ব্রহ্মবলাভের উপায়, তাহা
 নহে; তপস্তা যে সর্বপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধির
 প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা তাঁহার সনাক্তরূপে বুঝিয়া-
 ছিলেন। তাই তাঁহার যখন বাহা লাভ
 কারিবার অল্প কৃতসঙ্কর হইতেন, তখন তাহা
 লাভের জন্য অস্ত্রের স্থাপেক্ষা না হইয়া,
 অস্ত্রের নিকট তিক্ত করিতে না গিয়া,
 শূন্যকর অবলম্বনপূর্বক তপস্তার প্রসূত
 হইতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই—
 হিরণ্যকশিপু অমরবরশাভের অল্প তপস্তা
 করিতেছেন, এবং পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠপদ-
 লাভের অল্প তপস্তা করিতেছেন, ভগীরথ
 গঙ্গা আনয়নের অল্প তপস্তা করিতেছেন,
 হৈমবতী উমা পতিলাভের অল্প তপস্তা
 করিতেছেন, অর্জুন পাণ্ডবতাপলাভের
 অল্প তপস্তা করিতেছেন, হুগ্রথ রাজা তাঁহার
 ভ্রাতারাপুনঃপ্রাপ্তির অল্প তপস্তা করিতেছেন,
 সমাধিবৈজ্ঞানিক নির্মাণমোক্ষলাভের অল্প তপস্তা
 করিতেছেন, মহারাজ অশ্বপতি একটি অলোক-
 সাম্রাজ্য-সম্বন্ধি লাভের অল্প তপস্তা
 করিতেছেন। পুরাণেজিহাদে একটা আরও
 নত নত দৃষ্টান্ত আছে। বসন্ত বসিষ্ঠদেহ
 শব্দার্থ জ্ঞান তপ যে সর্বকামপ্রদ, ইহা পূর্ন-
 তন আর্ধ্যগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন।
 অথবা সেই কামদেহই পরীক্ষিত তপস্তা।
 তাই বসিষ্ঠ বিষ্ণুবিজ্ঞকে বলিতেছেন

“শাপজী শিব! বহু: কাণ্ডিগারবতো বধা।

অস্ত্রাং হব্যাক কব্যাক প্রাপ্যাত্মা তপৈব চ।

আরওমহিষোদ্রেক বলিহোমপুণ্ডরিক।

শব্দাকলম্বটকারো বিদ্যাশ্চ বিবিধান্তরা।

আরওমহিষোদ্রেক বলিহোমপুণ্ডরিক।

সর্বপ্রকারেই সন্তোষজনক।

অর্থাৎ আশ্বিন বাক্তির কাণ্ডিগার জ্ঞান শব্দা-
 আশ্বিন চিরসংসার; আশ্বিন হব্যাকলম্ব,
 জীবনব্যক্তি, অমিষোদ্রেক, বলি, হোম, শব্দা-
 কার, বটকার ও বিবিধ বিদ্যা এসমস্তই
 ইহার আরম্ভ।

এই বসিষ্ঠের পরীক্ষিত তপস্তা কামদেহ-
 যেমন জুড়ার প্রচুরপরিমাণে অমিষোদ্রেক
 করিতে পারে, তেমন শত্রুবিলাপের অল্প
 অপ্রতিহত সৌধাবীয়া ও অগণন সৈন্যসম্পদ
 প্রদান করিতে পারে, আবার হুগ্রথ-ইন্দ্রি-
 যুক্তি-প্রশমনের দ্বারা সাধককে ব্রহ্মকে পর্যাক্ত
 উন্নয়ন করিতে পারে। তপস্তা কামদেহের
 জ্ঞান সর্বকামদা—বসন্ত, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই
 চতুর্বিধ কাম প্রদান করিতে সমর্থ। তাই
 ভগবান্‌ মহা বলেন—

“তপোব্রহ্মনিব: সর্গ: দেবমাত্মন: স্বপ্ন:।

তপোব্রহ্ম: স্বপ্ন: শ্রোত্র: তপোব্রহ্ম: দেবমাত্মন:।

ব্রাহ্মণ্যতপো জ্ঞান: তপ: কত্রত ধর্মণ:।

বৈজ্ঞান্যতপো বাষ্ঠা: তপ: পুত্রত সৈবন:।

অর্থ: সন্তোষজ্ঞান: কলম্বা: নিগদন:।

তপসৈব অশ্বপতি মৌলোকা: সন্তোষজ্ঞান:।

উপাধ্যায়গো বিদ্যা: দেবী চ বিবিধা বিদ্যা:।

তপসৈব অশ্বপতি তপসৈব: হি সাধন:।

বসন্ত: বসন্ত: বসন্ত: বসন্ত: বসন্ত:।

সর্বত্র তপসা সাধা: তপো হি ত্রুতক্রম:।

মহাভারত, ১১শ অধ্যায়, ২০৪—২০৯

ইহার তাৎপৰ্য এই—দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে
 বসন্তপ্রকার স্বপ্ন আছে, তপতাই সে সকলের
 আদি, তপতাই তাহাদের স্থিতি, তপতাই
 তাহাদের শেষ। ব্রাহ্মণের তপস্তা জ্ঞান,
 কত্রিয়ার তপস্তা প্রজারক্ষণ (যুদ্ধাদি),

বৈজ্ঞানিক তপতা কৃষিবানিজ্যাদি, শূন্যের তপতা সেবা ; - অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিজ নিজ বর্ণবর্ণ পাশ্চন করিতে হইলে তপস্তার প্রয়োজন । সেইরূপ সংসারত্যাগী যথুগণ আত্মসংযম এবং কলমূল্যবায়ু ভক্ষণপূর্বক যে উৎকট তপতা করেন, তদ্বারাই তাঁহারা বিবাক্তান লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নব-দর্পণের স্তার দর্শন করিতে পারেন । শুভবল, বিভাবল, নীরোগিতা এবং বিবিধ বর্ণা-বিত্তে স্থিতি, অর্থাৎ বাহ্যভক্ত মূখ, বিভাভক্ত মূখ এবং যগাদিপ্রাপ্তভক্ত মূখ, এই দর্শনপ্রকার স্বথের একমাত্র তপতাই সাধন । বাহ্য-কিছু হস্ত, বাহ্য-কিছু দ্বন্দ্ব, বাহ্য-কিছু হর্ষম, বাহ্য-কিছু দ্রুত, তৎসমস্তই তপোবলে সাধন করা যায়—তপস্তার শক্তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ।

বিদ্যামিত্র এই তপোবলকে আশ্রয় করিয়া একটি নূতন দর্শনপ্রণালী সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ভগবান্ মহা বলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তপতাকে আশ্রয় করিয়া এই জিহুবন সৃষ্টি করিয়াছেন । যে তপস্তার বলে বিদ্যামিত্রের স্তার মানব স্বয়ঃসৃষ্টিকর্তার স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে তপস্তার বর্ণিত সামান্য নহে । সে তপস্তার বল কোথা হইতে আসে ? সে তপতা কি ? বিদ্যামিত্রের তপতা কি ?

তপস্তার অর্থ সাধনবলে আত্মশক্তির বিকাশ । আনাদের মানবাত্মার গতি উচ্চতম শক্তিসকল নিহিত রহিয়াছে । কেন না, মানবাত্মা ত আর কিছু নহে, মানবাত্মাই

ও ব্রহ্ম একই বস্তু । যে কামক্রোধাদি রিপু-গণের উত্তেজনায় আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যে মারামোহের আবরণে আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছি, যদি একবার সাধনমথ্যারা সেই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিতে পারি, যদি একবার কঠোর আত্মসংযমমথ্যারা সেই মারামোহের আবরণ অপসারিত করিতে পারি, তবে আমার আত্মার শক্তিসকল পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে, তখন মেঘনিম্নস্থক তাকরের স্তার আমার আত্মাই ব্রহ্মরূপে জাগিয়া উঠিবে । তাহ বসিষ্ঠের নিকট পরান্ত হইয়া বিদ্যামিত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন—“ইন্দ্রিয়মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্তায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ তপতাই ব্রহ্মলগ্নভের কারণ ।” বিদ্যামিত্র কি সাধনপ্রণালী অবলম্বনে কামক্রোধ-গোভ্রমোহাদি রিপুবিশগকে দমন করিয়া তাঁহার আত্মায় গৃহভাবে নিহিত বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান, শম-দম-ভিত্তিকাদি গুণ বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবগিত নহে । কিন্তু তপঃসাধনের জন্য সংসারত্যাগপূর্বক বনগমন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় না । ভগবান্ মহা বলেন - “ব্রাহ্মণের জ্ঞানোপার্জন তপতা, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণ তপতা, বৈজ্ঞানিক কৃষি-বানিজ্যাদি তপতা, শূন্যের সেবাবৃত্তি তপতা । ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সংসারবাজা-নির্সাহের এত যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি সেই পথে থাকিয়াও তপতা করিতে পারেন । তপঃসাধনকে গীতার তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা—সারীর তপ, বাচ্য তপ এবং মানস তপ ।

* দ্বৈতব্রাহ্মণ—আত্মাই ব্রহ্ম । আমার আত্মা

“দেববিজয়ক শাস্ত্রাভ্যুত্থানং শেখরঃ”

ব্রহ্মচর্যমহিমাঃ শাখায়াঃ তপঃ পাতকঃ ।

অগ্ন্যবেগকরঃ সত্যঃ প্রিয়হিতকঃ সৎ

বাধ্যায়্যাসননৈকম বাধ্যবঃ তপ উত্তমঃ ।

মনঃপ্রসাদঃ সোম্যঃ সৌম্যশাসনিসিগ্রহঃ ।

জাঘনঃশুভ্রিতোক্তং তপো নানন্দমুত্তমং ।”

১৭৭ অধ্যায়, ১৪—১৫ ।

‘দেবতা, ব্রাহ্মণ, শুক এবং সাধুশাস্ত্র
পূজা, শৌচাগার, গচ্ছতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা,
ইহাকে পরীর তপ বলে । অগ্ন্যবেগকর, সত্য,
প্রিয় এবং হিত বাক্য কথন, এবং বেদাধ্যয়ন
করাকে বাধ্য তপ বলে । মনের প্রসন্নতা,
সোম্যতা (সর্গলোকে হিতবিত্তি), যৌন
(নিবিড় বিষয় চিন্তা না করা), আত্মবিনিগ্রহ,
শুভ্রিত্তি, ইহাকে মানস তপ বলে ।’

এই গীতোক্ত তপঃসাধন গাইত্র্যশাস্ত্রের
সম্পূর্ণ উপযোগী । ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, সত্য-
নিষ্ঠা, দেববিজয়কৃত্তিক, শাস্ত্রাভ্যাস, চিত্ত-
শুদ্ধি, আত্মবিনিগ্রহ—এই সকল সাধনই
তপস্তা । এই সকল সাধনদ্বারা আত্মার
অতি উচ্চতম শক্তিসকলের ক্ষুদ্র হস্ত
থাকে, এবং ক্রমশঃ মুখ্যত্বের পূর্ণবিকাশ
হয় । তবে যে সকল পূর্ণতন মনোবী
কেবল মত্তব্যাসনাতে মগ্নই না হয় তা ব্রহ্মজ্ঞান-
লাভের জন্য বাকুল হইতেন, তাহারা সহস্র-
বাধ্যবিষমুগল সংসারপ্রম ত্যাগ করিয়া
বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক তপস্তা করিতেন ।
তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা যেমন অতি উচ্চ ছিল,
তেমনি তাঁহাদের আত্মশক্তির উত্তর নির্ভরও
পূর্ব বেনী ছিল । তাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভের
জন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতেন না,
“তুমি আমাকে জ্ঞান কর” বলিয়া কোন
দেবতার রূপাকটাকলাভের জন্য তাঁহার

চরণতলে পুষ্ঠিত হইতেন না । সে যুগের
সাধনা ছিল জোরজবরদস্তীমূলক । “তুমি
দেবতা, আমাকে অভীষ্টবস্তু প্রদান করিবে
না ? আচ্ছা দেখিব আমি, তুমি কোথায়
কার কেমন দেবতা । আমি এই তপস্তায়
বসিলাম ।” তাঁহারা যোগতর কঠোরতায়
অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাই তাঁহাদের
সাধনার এতদূর জোরজবরদস্তী ছিল ।
তাঁহাদের এইরূপ হৃদমনীর আত্মবল ছিল
বলিয়াই তাঁহাদের তপস্তায় ইহা তীক্ষ্ণ
হইতেন, ধরাতল কম্পিত হইত, ব্রহ্মা স্বয়ং
বরপ্রদানের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতেন ।
এইরূপে তাঁহারা তপোবলে আত্মবিজয়ী
হইয়া পরে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন । এই
চর্যের বিষয়সম্বন্ধে তাঁহাদের বিজয়বৈজয়তী
উড্ডীন হইয়াছিল—কিন্তু তাহা পানব-
বলের দ্বারা নহে,—maxim gun কিংবা
torpedo boat এর দ্বারা নহে, তাহা
তাঁহাদের তপোলক বিশ্বদ্রাবী ক্ষমতার প্রীতি-
প্রবাহদ্বারা । তাঁহারা তপঃসাধনাদ্বারা
“সর্গভূতহ্মাশ্বানং সর্গভূতানি চান্ধনি”
দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । তাঁহা-
দের তপস্তার ফলে একদিন ভারতবর্ষে যে
অপূর্ব ব্রাহ্মণসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল,
তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে—“সামা-মৈত্রী-
স্বাধীনতা ।” যে “সামা-মৈত্রী-স্বাধীনতা”র
মোহাই দিয়া একদিন করাচীজাতি মর-
শোণিতে ধরাতল দ্রাবিত করিয়াছিল, আমি
সে সামা-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিতেছি
না । যে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একদিন
দৈত্যকুমার প্রজ্ঞান দৈত্যানিগ্ধদিগকে উপ-
দেশ দিয়াছিলেন—

‘দর্শন পৈতৃকঃ। সমতাপশেঃ
সমবসাদানমস্তু ততঃ।’

‘হে দৈত্যশিশুগণ, তোমরা সাম্য অবগমন
কর—সাম্যই বিকুর পশুত আরাধনা’, আমি
সেই সাম্যের কথা কহিতেছি। দৈত্যপতি
ত্রিগুণকশিপু প্রহ্লাদকে রাজনৌতি শিখা
করিবার অন্ত গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন। প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস
করিয়া প্রত্যাগত হইলে, ত্রিগুণকশিপু
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘‘মিত্রেণ বর্জিত কথমরিবর্গেণ বৃপতিঃ।’’

‘রাজা মিত্রের সহিত বিক্রপ ব্যবহার
করিবেন, আর শত্রুর সঙ্গেই বা কিরূপ
ব্যবহার করিবেন?’

তত্বত্তরে দৈত্যকুমার বলিলেন—

‘‘দর্শনভূতাক্ষং তাত দমব্রাণে চন্দ্রময়ং।

পরমাধনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কৃতঃ।

স্বাখি ভগবান্ বিদূর্ময় চাক্রত চাপ্তি সঃ

বতন্ততোহয়ঃ মিত্রঃ মে শত্রুশেতি পুথক্ কৃতঃ।’’

‘হে পিতঃ, অগস্ত্য অগস্ত্য পরমাত্মা
গোবিন্দ যখন দর্শনভূতের অন্তরাযুক্তপে
বিশ্রব্দ করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু,
একরূপ কথা কেন? ভগবান্ বিদূর্ময় তোমাকে
আছেন, আমাকে আছেন, অন্তরও আছেন।
হস্তরাং ইনি মিত্র, উনি শত্রু, একরূপ ভেদ-
জ্ঞান থাকিবে কেন?’

যে সাম্য অগস্ত্যের অগতে শত্রুমিত্রের
ভেদ দেখিতে পার না, তাহাই প্রকৃত সাম্য।
করাণীজাতি যে সাম্যের সাধন করিয়া-
ছিলেন, তাহা অস্বভাবমূলক—তাহার মূলমন্ত্র
হইতেছে, ‘‘তুমি যে মানুষ, আমিও সেই
মানুষ; তোমার যে অধিকার আছে,

আমারও সেই অধিকার থাকা উচিত।’’

আর এটী স্বদিগ্গের তপস্তালিঙ্গ সাম্য অস-
কার্যনিশেষের ফল : ‘‘তুমি আমি সকলেই
সজ্জিদানন্দময়, তোমরা হঠাতে আমার কোন
পৃথক্ অস্তিত্ব নাই’’—এইরূপ ধারণামূলক।
এইপ্রকার সাম্যসাধনা দ্বারাষ্ট মৈত্রেয় রাজা-
শ্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সর্বত্র
সকলেই স্বাধীনতামাত্র করে, কেহ কাহাকে
অধীনতাপ্রদানে আবদ্ধ করিতে পারে না।
তখন সকলেষ্ট সকলকে এক বিশ্বব্যাপী
পরমাখ্যার সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করে।
এইরূপ সাম্য হঠাতে মৈত্রেয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত
হয়, মৈত্রেয় হঠাতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়।
আজ maxim gun ও torpedo boatএর
যুগে যে সাম্য-মৈত্রেয়-স্বাধীনতা কবির
স্বপ্নপ্রায়ের কল্পনা এবং William Stead,
Count Tolstoy প্রমুখ লোকচিত্তব্রত
মহাত্মাদিগের জন্মের পূর্বে আশা ও
আকাঙ্ক্ষার বস্তু, এতদিন ত্রাণদর্শনের
তপোবলে ভারতবর্ষে সেই সাম্য-মৈত্রেয়-
স্বাধীনতার বাস্তববিকাস (realisation)
হইয়াছিল। তাহাযের সেই বিশ্বব্যাপী
শ্রীতির অল্পশীতনে এসেছে কখনও patriot-
ismশ্রেণীর জাতীয়ভাবে বিকাশ হইতে
পারে নাই। বিশ্বব্যাপী ভাবের করে
যজ্ঞোত্তিকার উত্তর কখনও সম্ভবপর নহে।
যিনি বিশ্বের মিত্র—যিনি বিশ্বামিত্র—তাহার
জন্মে আমার এইটুকু সীমানাসংরক্ষণচিহ্নিত
ভারতবর্ষ, আমার এইটুকু সীমানাসংরক্ষণ-
চিহ্নিত ইংলণ্ড, আমার এইটুকু সীমানাসং-
রক্ষণচিহ্নিত ফ্রান্স, ইত্যাকার সজীব,
সীমাবদ্ধ ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। Patriot-

ism-সেই সঙ্গীণ, সোনারক দারবার ফল ।
 Patriotism-এর মূলে স্বার্থপরতা ও পরাধীনতা ।
 বিশ্ববিশ্রুত হিন্দুর ক্ষমতা তাই কখনও
 Patriotism দৃষ্টিতে করিতে পারে নাই ।
 এমন কি, সংস্কৃতসাহিত্যে Patriotism-
 শব্দের একটি প্রতিশব্দও খুঁজিয়া পাওয়া
 যাইবে না । বিশ্বাসিত্বের ক্ষমতা সমগ্র বিশ্ব—
 হাবরজঙ্গম-কীটপতঙ্গ-পশুপক্ষি-মহুয়াদি-সং-
 লিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড—এক পবিত্র স্রীতির
 নিবাহাতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল ।
 তাই আদর্শব্রাহ্মণ বিশ্বাসিত্বের বিশ্ববাসী
 ক্ষমতা শব্দব্রহ্মের স্মরণ তেজ ব্রাহ্মণ-
 সভ্যতার মূলমন্ত্র সাংগীতীয়রূপে প্রকটিত
 হইয়াছিলেন ।

সেই মহানহিমমণ্ডিত মহাত্মাদিগের
 বংশধরগণ আমরা—আজ আমাদের সে
 তপোবল নাই, সে তেজোবীৰ্য্য নাই, সে
 জ্ঞানবীৰ্য্য নাই—আমরা এখন অধঃপতিত,
 দলিস্রুতি । যে সাধনবলে তাঁহারা মহুয়া
 হইতে ধ্বংস, ধ্বংস হইতে দেবতা উন্নীত
 হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের সে সাধন
 ভুলিয়া গিয়াছি । দেবতা, ধ্বংস, ব্রাহ্মণ ও
 অতি দূরের কথা, আমরা এখন মহুয়া হাটা-
 ইয়া বসিয়াছি । তাই আজ সেই মনীষিগণের
 সাধনসম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াও আমরা
 লামান্ত পার্থিব স্বস্থস্থবিধার জন্য পরমুখাপেকী,
 অস্ত্রের কুপাতিব্যবহারী । আমাদের বর্তমান
 অবস্থার বরং গ্রিন্থের সহিত আমাদেরকে
 তুলনা করা যাইতে পারে ।

ইংরেজাতি আমাদের রাজা, ইংরেজ
 বিজেতা, আমরা বিজিত । কিন্তু কোন কোন
 স্বাধীন ইংরেজ সে ভাব ভুলিয়া-গিয়া আমাদের

হৃদয়কে অন্ধ তাঁহাদের বিশ্ববিশ্রুত শি-
 সাহিত্য, বংশবিস্তারের দ্বার উন্মোচন
 করিয়া দিলেন । আমরা ইংরেজের সাহায্যে
 উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে
 সঙ্গে আমাদের মনে নানাপ্রকার খেয়াল-
 জাগিয়া উঠিল । ইংরেজাতি তাঁহাদের
 মহাগৌরবাবিত্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (Political
 independence) কতশতাব্দীব্যাপী আত্ম-
 লন, বুদ্ধিবিশেষ ও শোণিতপাতের কল-
 পাইয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, গ্রিন্থের
 সশরীরে স্বর্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া
 ছিলেন, আমরা তরুণ ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া
 British citizenship লাভের জন্য অতিব্র-
 ব্যাণ্ড হইয়া উঠিলাম । কিন্তু বর্তমান
 যুগের বসিষ্টগণ এবং তাঁহার পুত্রগণ অর্থাৎ
 ইংরেজরাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার অধীনস্থ
 ইংরেজ কর্মচারীগণ আমাদেরকে অবজা-
 পূর্বক প্রত্যাখ্যান করিলেন । আমরা
 তখন করেকজন মহামন্ত্রী উদারচেতা
 ইংরেজবিদ্যামিত্রের শরণাপন্ন হইলাম ।
 তাঁহারা আমাদের সশরীরে স্বর্গগমনের
 জন্য এক মহাবল্লভ আরম্ভ করিলেন, তাঁহা
 হইতেছে— Indian National Congress
 —জাতীয় মহাসমিতি । বিশ্বাসিত্বের
 লইয়া যেমন স্বর্গের মধ্যে একটা দলাদলি
 সৃষ্টি হইয়াছিল, এই বক্ত লইয়াও আমাদের
 রাজবিস্তারের মধ্যে তেমনি একটা দলাদলি
 আরম্ভ হইল । সেই দলাদলির চেয়ে অধিক
 স্বর্গধাম বিলাতভূমি পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়া
 সেখানেও ইহা লইয়া দেবতাদের মধ্যে
 একটা দলাদলি উৎপন্ন হইল । কিন্তু হৃৎকোষ
 বিষয়, আমাদের তাতাতে এপর্য্যন্ত কোন

গঠিত হয় নাই। বিখ্যামিত্রের দল অপমানিত
পত্রাঙ্কিত হইয়াই যাহেন। কলির বিখ্য-
মিত্রের ততদূর উপোষণ নাই কে, ত্রিশত-
গণের ভক্ত একটি নতন স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি
করিবেন। তবে তাঁহাদের ক্ষমতা যে একে-
বারেই নাই, তাহা নহে। ত্রেতার বিখ্যামিত্র
তপোবলে যেমন কতকগুলি নক্ষত্র সৃষ্টি
করিয়া ত্রিশতকে সেই-কৃত্রিম-নক্ষত্ররাজি-
পরিবৃত্ত হইয়া মনে মনে স্বর্গস্থল কল্পনা
করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন,
সেইরূপ কলির বিখ্যামিত্রের প্রভাবেও
আমাদের ত্রিশতগণের মনস্তত্ত্বের ভক্ত
কয়েকটি নক্ষত্রভূষণ প্রদত্ত হইরাছে—
যথা—C. S. I., C. I. F., Hon'ble, Rai
Bahadur &c. &c.। আমাদের ত্রিশতগণ
এই সকল কৃত্রিম নক্ষত্রালোকে তাঁহাদের
নিজ নিজ মনের অন্ধকার কতকটা দূর
করিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু
তাহাদের স্বর্গগমনের ভক্ত, যে জনসাধারণের
হিতকামনা, এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল,
তাহারা পূর্বে “বে ত্রিমরে” ছিল, এখনও “সেই
ত্রিমরে” ডুবিয়া রহিয়াছে। বরং সম্ভ্রান্তি
এই মহাযজ্ঞভূতানের কলে জনসাধারণের
অজ্ঞানভিমির আরও ঘনীভূত হওয়ার
সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে।

জাতীয়-মহাসমিতি-সমধিক্তিত আবেদন-
কারিগণের সক্রোধ প্রার্থনার ইংরেজরাজ
কিছুমান কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া,
ইহার মধ্যে আর-এক নতন প্রস্তাব উপস্থিত
করা হইয়াছিল। সে কি ? না, কংগ্রেসের
সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলার ব্যবস্থা। অর্থাৎ
জাতীয় মহাসমিতির বাহিরাগণের বক্তৃতার

তরঙ্গে আমাদের নিচ্ছলপ্রাণে জাতীয়তার
তড়িচ্ছটাগুরুন হইবার বেটুকুস্বাকী থাকিবে,
তাহা নিশ্চয়ই লাঠির চুকাচুকাশবে পূর্ণ-
মাত্রার আগিরা উঠিবে। আর সেই লাঠি-
ধারী বীরবৃন্দের সৌর্গ্যবীরাগুণরাজমবার্তা
ডেলিগেটদিগের মুখে দেশবিশেষে প্রচারিত
হইলে অতি অল্পকালমধ্যেই ভারতবাসী
একটি অভিনব জাতীয়তা সৃষ্ট হইবে। যাহা
হউক, ভিকারিগণের সঙ্গে লাঠিখেল দেখিয়া
গৃহস্থারী ভয়ে ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া
পলায়ন করিলে পাছে ভিন্দালাতের অভ্যস্ত
ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কাতেই হউক অথবা
অস্ত্র যে কারণেই হউক, সেই লাঠিখেলার
প্রস্তাবটি মহাসমিতিতে গৃহীত হয় নাই।
কিন্তু তাহা না হইয়া থাকিলেও,
শরীরের বলবান চন্দ্রসহ সাহসের অভাব-
পূরণ হইতে পারে, এই আশাশে ও বিশ্বাসে,
এখনও স্থানে স্থানে সেই বীরসুপুরুষকারী
মহামত্রেয় সাধনা পুরাণময় চলিয়াছে;—বোধ
হয় এই আশায় যে, এমন একদিন আসিবে,
যেদিন ইংরেজ সেই লাঠির ভয়ে bag and
baggage এবং গোলাগুলি লইয়া রণতরি-
আরোহণে ভারতবর্ষ হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া
পলায়ন করিবে! সে যাহা হউক, আগন্তুক
এই লাঠিধারী বীরগণ হইতে ইংরেজ অপেক্ষা
যেদূর নিরীহ ভ্রমলোকদিগেরই ভয়ের
কারণ বেশী। এই সকল বীরগণের স্মরণ-
সৌর্গ্য উত্তেজিত হইলে যখন তাহারা কণ-
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখন ঘেঘের পাড়িতে
কিংবা গড়ের মাঠে তাহাদের উপযুক্ত দুবিনীত
ইংরেজসৈন্য না মিলিলে, তাহাদের
ভৈলাক লাঠি ও বজ্রকটার ঘূসি যে অতি

সামান্য কারণে অনেকানেক দেশীয় নিরীহ ভাষ্যমাত্রের দ্রাব্যবিহার্য কিংবা মৃত্যু চূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবে না, তাহার একরার-নামা কোথায় ?

বর্তমান সাম্যত্বের মধ্যে মহাগমিত্তির পৃষ্ঠপোষক কিংবা লাঠিধেলার পক্ষপাতী বাহাদুর আছেন, তাঁহারা অসুগ্রহপূর্বক আমার বুদ্ধতা মার্জন্য করিবেন। দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর মাতৃভূমির হিতকামনার এই সকল আন্তরিক উত্তমকে আমি স্তম্ভের সহিত প্রভা করি। প্রভা করি বলিয়াই এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি। কোন শিক্ষিত ভারতসন্তানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নয় যে, ভারতবাসিগণের আবার জাতীয় অভ্যুদয় হউক, আবার ভারত প্রবৃত্ত হউক ? কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের এই জাতীয়জীবনের সুমুগ্ধশায় তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ক্ষমতা যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তদ্বারা তাহাকে বাঁচাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যে বিকারগ্রস্ত রোগীর নাড়ী গমিয়া গাইতেছে—pulse sink করিতেছে,—তাহাকে জীবিত রাখিবার ক্ষমতা বসি তড়িতবস্ত্র (battery) লাগান হয়, তবে যে অঙ্গে সেই তড়িৎপ্রবাহ সংযোজিত হইবে, কেবল সেই অঙ্গই ক্ষণ-কালের জন্য নড়িয়া উঠিবে, তাহাতে রোগী জীবনী শক্তি লাভ করিয়া আবার পাক্কাইয়া উঠিবে না। মৃত তেকের পারে তড়িৎপ্রবাহ স্ক্রুটিত হওয়াতে, সেই পাঁটা কেবল ক্ষণকালের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সে তেঁক ত ধরে থাকে নাই। আমাদের জাতীয়জীবনের

পুনর্গঠন করিতে হইবে, প্রথমে দেখিতে হইবে, তাহার pulse কান্থানে; পরে সেই pulse ধরিয়া, রোগের মাতৃস্থ অস্থুলে, উপ-যুক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে—সেই pulse বাহাতে rise করে—আবার বাহাতে বসি আসে—সেজন্য আবৃত্তক হইলে উত্তেজক ঔষধ (stimulant) দিতে হইবে।

এই বিশাল ভারতবর্ষে আমরা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্ট-পারসী প্রভৃতি নানাভাষা বাস করিতেছি—আমরা সকলেই একদেশ-বাসী এবং একপ্রকারের শাসনাধীনে থাকিয়া পরস্পরের সহঃস্বভাগী। ইহাই আমাদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবন্ধনের প্রকট স্বরূপ, সম্বোধন নাই। কিন্তু আমাদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার এই স্বরূপ জাতীয়তা-বন্ধনের কোন সম্ভাবনা দেখি না। ইংরেজশাসনের যৌগপ্রদর্শন করিবার জন্য ভিন্নজাতীয় এবং ভিন্নদেশীয় লোকমণ্ডলী সমবেত হইলেই যে তাহাদের মধ্যে হইতে একটা জাতীয়তা জন্মিত, বাহারা উঠিবে, এরূপ আশা করা বুঝা। আমরা কেবল শাসনকর্তৃগণের যৌগপর্যায়-লোচনাধারাই আমাদের কর্তব্যকর্ত্তের পর্যাবসান হইল মনে করি,—জাতীয়তাসংক্রিয় ক্ষমতা আমাদের মধ্যে যে সকল জন ব্যক্তি আবৃত্তক, তাহা অর্জন ও অগ্রসর করিবার চেষ্টা করি কই ? বাহাদের মধ্যে তাই-তা-ই-এ-একতা নাই, বঙ্গোপদ্বীপের মধ্যে একতা নাই, সমাজীয় লোকের মধ্যে একতা নাই—বাহাদের মধ্যে গ্রাম্যস্থল লইয়া দলাদলি, সহরের মিউনিসিপালিটি লইয়া দলাদলি, ডাক্তারখানা লইয়া দলাদলি, সাহিত্য-

সুস্থিতি লইয়া দণ্ডাদিনি সাহারা হুসিকিত
হইয়াও বারোয়ারির আন্দোলনসমূহের জন্ত
সহস্র সহস্র টাকা উড়াইয়া দিতেছে, অথচ
সাধারণহিতকর প্রতিষ্ঠিত স্কুল কিংবা ডাক্তার-
খানার চাহা। স্বাক্ষর করিয়া দিতে অনিচ্ছুক—
এইপ্রকার লোকমণ্ডলীর মধ্যে শুধু এক বিশাল-
দেশবাদী ও এক ইংরেজ সম্রাটের শাসনা-
ধীনে থাকিয়া একপ্রকার মুখভাগী এবং
একপ্রকার চঃখভোগী বলিয়া কি, কখনও
একতা বন্ধন হইতে পারে, না জাতীয়তার
পুষ্টন হইতে পারে? বস্তুর আমাদের হিন্দু-
জাতির মধ্যে কখনও স্বদেশপ্রেমিতুলক
জাতীয়বন্ধন ঘটে না। “আমরা এক-
জাতি”—“আমাদের এক দেশ” বলিয়া সর্ব-
জনীন জাতীয়তাব কখনও হিন্দুজাতির মধ্যে
বহুস্থল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।
সুতরাং এইরূপ জাতীয়তাস্বপ্নের পূর্বে
আমাদের মধ্যে বাহ্যতে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের
বিকাশ হয়, সর্বপ্রথমে তাহার চেটা করা আব-
শ্যক। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব
গঠিত চইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক
ঐক্য এবং জাতীয় উৎকর্ষ অবশ্যস্বাভাবী।
সাদৃশ্যতা (honesty), ঐকান্তিকতা (sinc-
erity), কর্তব্যনিষ্ঠা (devotion to duty),
সম্মতি (moral courage), একতা
(unity), স্বার্থত্যাগ (self-sacrifice)
ইত্যাদি-মহাব্যোচিষ্ট গুণগ্রাম আমাদের মধ্যে
গঠিত হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা-
প্রকৃতি জমাট বাধিবে। কিন্তু এই সকল গুণ
লাভ করিতে হইলে সাধনা চাই, তপস্তা
চাই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে কঠোর সাধনা-
বলে তাহার আশ্রম অশ্রুশূন্যে লুকাইত

উচ্চতম শক্তিসকলের বিকাশ করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন, আমাদেরকে ও সেইরূপ কঠোর
সাধনা, কঠোর তপস্তা করিতে হইবে।
মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমাদের বর্তমান যুগের
আদর্শ;—তাঁহার অমর অধ্যাপনার, গুরুত্ব
প্রতিষ্ঠা এবং কঠোর আত্মসংযমই আমাদের
উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তাঁহার জীবন্ত
দৃষ্টান্ত সমূখে রাখিয়া আজ আমাদেরকে
আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে
দীক্ষিত হইয়া কঠোর তপস্তা করিতে
হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরমোদার
বিশ্বপ্রেমের আদর্শে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ধর্মগত ভেদ ভুলিয়া-
গিয়া এই হিন্দুজাতির হিন্দু-মুসলমান, শিখ-
খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্বপ্রকার জাতি মিলিয়া এক
অভিনব বিশাল মহাজাতি গঠন করিতে
হইবে। এইরূপে তপস্তা দ্বারা আমাদের
মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং জাতীয়তাস্বপ্নের
ক্ষুরণ হইলে—লোকপিতামহ প্রজ্ঞা যেমন এক-
দিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ্যপদবীতে বরণ করি-
বার প্রস্তাব দিয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,
গুণগ্রাহী ইংরেজজাতিও তরুণ আমাদেরকে
সমগ্রভাবে উচ্চতম রাজনৈতিক স্বাধীনতার
মাল্যচন্দন পরাধার জন্ত অগ্রসর হইবেন—
তখন আর আমাদেরকে বিলাত পর্বত
প্রিয়া ভিক্ষকের জায় ইংরেজের দ্বারে দ্বারে
ভারতের হুৎখাহিনী কীর্তন করিয়া
বেড়াইতে হইবে না।

বনের মুখশ্রী বাঁধা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে,
সেই মহাকবি দীপকরাগে সাহিরাছেন—

“ছিল নটে আমে তপস্তার বলে
কামেসিকি হ’ত এ বহীনগলে,

আগনি আগিয়া উজ্জ্বল হইবে

সংগ্রাম করিতে অধ্যবসে ।

"এখন সেদিন না হইবে যে আর

দেব-আত্মাধনে ভারত-উদ্ধার

হইবে না—হইবে না—খেল ভারতীয় ;

০ এ সব সৈন্তা নহে তেমন ।"

ভারতীয় খুলিলেই যদি ভারত উদ্ধার হইত, তবে একদিন স্বাভাবিকভাবে ভীমার্জুন কিংবা খিরেটায়ের প্রতাপাদিত্যগণের দ্বারা কবে ভারতবাসী স্বাধীন হইত । যদি বঙ্গভার উদ্ধার কিংবা কবিবরের উদ্বোধন ভারত-উদ্ধার হইত, তবে দেশে এত ব্যক্তি ও বক্তা থাকিতে আমাদের এ দুর্দশা কেন ? আমরা কতকাল ধরিয়া যুগোপ ও আমেরিকার বীরবলের ঐতিহাসিক কাহিনী আলোচনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে বীরত্ব আগিয়া উঠে না কেন ? ভারত-উদ্ধার এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া আমার বিবেচনার আমাদিগকে একবার আত্ম-উদ্ধারে মনোনিবেশ করিতে হইবে । পরম সৌভাগ্যের বিষয়, পূর্বতন আত্মগণের তপস্যার ফলে এখনও আমাদের মধ্যে সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই । সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ কোথায় ? হিন্দু-জাতির ধর্মপ্রবণ চিন্তে । ধর্মের উৎকর্ষদ্বারাই একদিন আমাদের ব্যক্তিগত মহত্ব, সামাজিক একতা এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল, আবার সেই ধর্মের অপকর্ষদ্বারাই আমাদের সর্বপ্রকার অধঃপতন ঘটরাছে । ধর্মই হিন্দুর জীবনবায়ু, ধর্মই হিন্দুর জাতীয়জীবনের pulse । তাই এই নিম্নরূপ অধঃপাতের দিনেও এক ধর্মের

নামে সমগ্র হিন্দুজাতির জয়যাত্রা বাধিয়া উঠে, একমাত্র ধর্মের নামে প্রত্যেক হিন্দুর ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া থাকে, একমাত্র ধর্মচূষকের আকর্ষণবলে সমাজের বহুবিধির চির-মরিচা-পড়া দোহকণাভরি ছুটিয়া আসিয়া পুঞ্জীকৃত হয় । এই ধর্মের আকর্ষণে সেদিন বিহার-অফলে হিন্দুসম্রাট সাধারণ গোহত্যানিবারকের জন্য মুলগমানে সহিত সুসুখময়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণবিসর্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছিল । এই জীবন ধর্মবিশ্বাসের বলে এখনও মহল মহল হিন্দু নরনারী একমালা-দুইমালার পথ হাঁটিয়া অত্যাচারে অনিচ্ছায় তর্পণ তীর্থকল ধর্মনের লজ্জা ছুটিয়া যায় এবং পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত ও কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বহিমুখে পতনের ভয় অমানচিত্রে প্রাণবিসর্জন দেয় । এক ধর্ম ভিন্ন আর কোন্ বস্তুর জন্য হিন্দুজাতি এভাবে জীবন দিতে প্রস্তুত ? হিন্দুজাতি কোন্ মহাপুরুষকে সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে ? তাঁহাকে নহে,—যিনি মর্ম-স্পর্শিনী আশাময়ী তাহার বদেখহিতৈষণা সমুদ্বোধক বক্তৃতা করিতে পারেন । তাঁহাকে নহে,—যিনি অগাধজ্ঞান, প্রথমবুদ্ধি ও সর্বদর্শিত্বেরোদর্শনবলে কুট রাক্ষসেতিক সমস্তাসকলের মীমাংসা করিতে পারেন । তাঁহাকে নহে,—যিনি শাণ্ডিল্য-কপাল-কল্পে অগণন-শফল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাদিতে হাদিতে জীবনবিসর্জন দিতে পারেন । আজ যদি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাশ্রবণক মহাবীর ওয়াশিংটন কিংবা ইটালীর দেশহিতৈষী বীরব্রেট ম্যাটিনি, কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর

জৌরবরবি মহাত্মা গান্ধীজী আসিয়া আমা-
দের দেশে উপস্থিত হন, তবে হিন্দুজাতি
ঐহাঙ্গিককে চিনিবে না। হিন্দুজাতির নেতা
ছিলেন তপস্বিরাজ ঐরামচন্দ্র, ধর্মরাজা-
সংগোপক শ্রীকৃষ্ণ, সর্বভাগী বিশ্বশ্রমিক
কল্কাদেব, পরমযোগী জ্ঞানাতার শঙ্করাচার্য।
এরূপ কোন তপঃপরায়ণ মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ
কখনও হিন্দুজাতির নেতা হইতে পারেন
নাই; এবং বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় যদি
কখনও আবার হিন্দুজাতির অত্যাখান ঘটে,
তবে সে এইরূপ কোন তপস্বী মহাপুরুষের
সুভাবিত্যবেই ঘটবে। আজ হিন্দুজাতি
একজন প্রকৃত নেতার অভাব মর্মে মর্মে
অনুভব করিয়া হাহাকার করিতেছে! সে
সুতরাদি কবে আসিবে,—যেদিন সেই মহা-
পুরুষের সুভাবিত্যবে বহুসংখ্যাপী জীর্ণ-
সংস্কারভাবে হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে
আবর্জনারাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তাহার
অধিনয় করসম্পর্শে ভষ্মীভূত হইয়া যাইবে ?
কবে এই বিশাল ধর্মবিটপীর গায়ে কালা-
ভারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন-সাম্প্রদায়িক-
বৃত্তিভেদ-বশত যে সকল বর-আলোকিত
কৃত্ত কৃত্ত কোটির নির্মিত হইয়াছে, সেগুলি
তাহার অঙ্গবিচ্ছিন্ন-সিদ্ধাঙ্গাতিঃ-সঙ্কারে
পূর্ণমহাত্ম্যসৌপ্তে সমুজ্জল হইবে, এবং
এই জীর্ণশীর্ণ ধর্মভর নবজীবন লাভ করিয়া
জাতীয়তার সজীবব্রিৎ পুষ্পরবে সুশোভিত
হইবে ?

কিন্তু এইরূপ কোন ধর্মবীরকে আবাহন
ও আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইলে, আমা-
দেরও সাধনা চাই, তপস্তা চাই। বহু
তপস্তার ফলে মঠাধামে তাহাদের সুভাগমন

হয়। আমাদের এই ভ্রূণটির দিনে আমরা
যেমন ওয়াশিংটন, ম্যাটিনি, গান্ধীজীকে
চিনিব না, সেইরূপ রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,
শঙ্করকেও চিনিব না। বহু সাধনাব্যাহার
আমাদিগকে তাহাদের নিকটবর্তী করে
উন্নীত করিতে পারিলে, তবে আমরা তাহাদের
মহিমা সমাগুরূপে বুঝিতে পারিব।
কঠোর তপস্তাব্যাহার ধর্মজীবন গঠন করিতে
পারিলে, আমরা তাহাদিগকে আকর্ষণ
করিয়া আনিতে পারিব। যেমতামার সঙ্কল্পনুল
বিচ্ছাংশিখা কেবল তপনই সন্নিবেশে ভূতলে
অবতীর্ণ হইয়া থাকে, যখন ভূপৃষ্ঠে তড়িৎ-
শক্তি সমানতেজে উদ্ভীষ্ট হইয়া তাহাকে
আকর্ষণ করে। সুতরাং মহাব্যবসায়
করিতে হইলে,—জাতীয়জীবন গঠন করিতে
হইলে,—হিন্দুজাতির নেতাকে অভিনন্দন
করিতে হইলে, আমাদের হৃদয়নিহিত
ধর্মবীরকে তপস্তাব্যাহার, সংযমব্যাহার, আচার-
অনুষ্ঠানের দ্বারা বহিত করিতে হইবে।
কঠোর তপস্তা ভিন্ন এ জাতির পুনরুত্থানের
সম্ভাবনা নাই।

তপস্তাব্যাহার পূর্বকালে কাণ্ডাসিদ্ধি হইত,
এখন কি হয় না ? ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক
যুগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে আমরা
কি দেখিতে পাই ? আমরা দেখি, আমাদের
এই ঘোর ভূমিনেও যেখানে যেখানে তপঃ-
প্রভাব কিছুমাত্র ছুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই
একএকটি জাতীয় অত্যাখানের উদ্ভব হই-
য়াছে। যেমন কোন স্থানে বিন্দুস্রাব মিট-
রন পাইলে পিপীলিকাএণী তাহার অব্যবণে
ধাবিত হইয়া সেই মিটরনের আশ্রয়ে মতিরা
গায়, এমন কি, সেই মিটরনে প্রতীকৃত হইয়া

হুঁসিয়া তাহাতে আশ্চর্যমন্ডন করে, সেইরূপ তপস্বী হিন্দুসমাজের এতই প্রিয়, ধর্ম হিন্দু জাতির জীবনের অগ্রসরের সহিত এতদূর গৃহ ও পৃথিব্যে সযত্ন বে, এই বর্তমান সময়েও বিত্তি যিনি নিজের জীবনে কিছুমাত্র তপস্যাবাহাণ্য বিকশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের একএকটি নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া একএকটি সম্ভাব্য গঠন করিয়া গিয়াছেন । এইরূপে বর্তমান সময়ে মহাবীর শিবাজীর বৈরাগ্য-ভৌতিক-পৈত্রিকপতাকা-তলে মহারাজীর জাতির এক মহাজাতীর অভ্যুত্থান ঘটয়াছিল । এইরূপে ব্রাহ্মসম্রাজ্য শিখগুরুর অধিনায়কতার ভারতগৌরব শিখজাতির এক বিরাট অভ্যুত্থান ঘটয়াছিল । এইরূপে প্রেমাবতার ত্রিগোবিন্দদেবের সন্ন্যাসসাধন-বলে বঙ্গদেশে এক সুশৃঙ্খল প্রেমতরঙ্গপ্রবাহ ছুটিয়াছিল । এইরূপে তপবিপ্রবর ত্রিহাস-কৃষ্ণদেবের তপসাধনার দৃষ্টান্তে বর্তমান সময়েও আর্ধ্যধর্মের এক বিশাল অভ্যুত্থান ঘটয়াছে । শুধু তপস্যাবারা মানবজীবন কতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহা এই শেষোক্ত মহাপুরুষের জীবনী পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় । Mr. William Digby তাঁহার "Prosperous British India" নামক গ্রন্থে বলেন—

"During the last Century the finest fruit of British intellectual culture was probably to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they were mere gropers in the dark compared with

the uncultured and illiterate Ram Krishna of Bengal, who knowing naught of what we term learning, spake as no other man of his age spoke and revealed God to weary mortals"—(Chap. II.—p. ৫৭).

সেই জ্যেষ্ঠাঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, কজির রামা বিখ্যাত এক তপস্যাগুরু আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মর্ষিগুরুবাতে উন্নত হইয়াছিলেন । এই ঘোর কলিযুগেও আমরা দেখিতেছি, সেই তপস্যার বলে একটি অশিক্ষিত বিধববুদ্ধিহীন শাস্ত্রজ্ঞানমূর্ত্ত সমাজ পুণ্যারী উৎকর্ষ শতাব্দীর মহাগৌরবান্বিত পাক্তা শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জলতম প্রদীপ Robert Browning ও John Ruskinকেও শিবাজীর আলোকে নিম্নত করিয়াছেন ।

বর্তমান সময়ের বাঙালীসমাজেও তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ দেখা বাইতেছে । আর ভারতবর্ষের অভ্যন্তর জাতি অপেক্ষা বাঙালী-জাতি বুদ্ধিবলে, বিভাবলে এতদূর উন্নত কিসে ? এই জাতীয় অধঃপাতের দিনেও আর কোন্ প্রদেশ বহুকাগমধো রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, ভূদেব সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমগ্র ভারতের সুখোজ্জ্বলাকারী এতগুলি রত্ন (আমি কোন জীবিত মহাত্মার নামো-ল্লেখ করিতেছি না) প্রদত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে ? ইহার কারণ—এই সকল মহাত্মা-দিগের পিতৃপিতামহগণের তপস্যা । বর্তমান .

সময়ে অনেক উদ্ধামগতি সমাজসংস্কারক মহামহোপাধ্যায় রবুন্দ্রনন্দকে তাঁহাদের সংস্কারপথের বিস্তারিত কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করেন। বাস্তবিকরূপে যেমন তাহাদের ভোজবান্ধি দেখাইবার পূর্বে আত্ম-রাস সুরকারকে একবার গালি না দিলে তাঁহাদের তেতিবিজ্ঞা দিক হইল না মনে করে, আমাদের সমাজসংস্কারকগণও রবু-নন্দনকে একবার গালি না দিলে তাঁহাদের সংস্কারচেষ্টা বিফল হইল মনে করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাঙালীসমাজ এই মহাত্মার নিকট বিশেষরূপে ক্ষণী। উক্ত মহাত্মা স্বাবিশ্বস্তিগমুদ্র মগনপূর্বক তাঁহার অষ্টা-বিশতিতত্ত্বসঙ্কলনদ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষ-গণের স্বর্গচর্য্যার পথ সুগম করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজের যে মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীসন্ধ্যাবর্জিত হইয়া এখনও পর্য্যন্ত যেদ্রোহান ও পাচকশ্রেণীতে পরিণত হন নাই,—এখনও যে উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে ক্রমাগত সহস্র সহস্র graduate ও under-graduate বাহির হইতেছেন,—তাঁহার একমাত্র কারণ রবুন্দ্রনন্দের স্মৃতি-

শাস্ত্র। বিগত সহস্রাব্দিক বর্ষের পরাধীনতায় প্রচণ্ড নিপেষণে বাঙালীজাতির মানসিক বৃত্তিভিত্তি যে একেবারে ভগ্ন ও দলিত হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ রবু-নন্দনের সংগৃহীত বিত্তক আচার-অমুঠান-নিয়ম-সংঘের শালনদ্বারা উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মনে পুণ্য ও পবিত্রতার বল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে elastic (স্থিতিস্থাপকত্ববিশিষ্ট) করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল কঠোর তপোনিয়ম এতদিন এ জাতিকে জীবিত রাখিয়াছিল। কিন্তু দ্রুতের বিষয়, পাকাতা সভ্যতা ও শিক্ষার স্রোতে এখন সেই সকল সামাজিকবাহ্যপ্রদ আচার-অমুঠান ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এখন বাঙালীসমাজে আহার-বিহারে, আচার-অমুঠানে সংঘ-সহিষ্ণুতা-শীলতার অভাব ক্রমেই দৃশ্যরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার পরিবর্তে সমাজে এক উদ্ধাম-উন্মুক্ত বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাই এখন বাঙালীর মধ্যে পুঙ্কের তায় ফণলম্বা পুঙ্কের সংখ্যা দিনদিনই বিরল হইতেছে। বাঙালীসমাজ এখন ক্রমেই-নিভেজ ও অবসর হইয়া পড়িতেছে।

ত্রিযতীন্দ্রমোহন সিংহ ।

খুড়া-মহাশয় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় । বড় ঘরের বারান্দার মাড়র পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্তী তামাক খাইতেছেন । ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ ছোটভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসিবার কথা আছে ।

ইহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন । গ্রামটি নৈহাটির নিকট চন্দ্রদেবপুর । ইহারা এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু তনা বার নাকি, বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ মশহাজার টাকা আছে । কেহ বলে ইহা বাজে গুজব, কেহ বলে ইহা সত্য কথা । কিন্তু কেহই সে টাকা বলকে দেখে নাই । সে টাকা যে লোহার সিঁদুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিঁদুকটি-বাহ্য সকলে দেখিয়াছে । সেটি বৃদ্ধের শরন-কক্ষে অবস্থিত । বৃদ্ধ সর্বদা সেই ঘরে বসিয়া সিঁদুকটি আগুলাইয়া থাকিতেন । তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্তৃত্ববাহনে লইয়া বাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও গিয়া নাই । সকলে বলে, তিনি সিঁদুকটি কেলিয়া বাইতে পারেন না ।

গগন চক্রবর্তী বসিয়া-বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন । ক্রমে ডাক্তার-বাঘুর লঙ্কায় আলো উঠানে পড়িল । ডাক্তারবাঘু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“চক্রবর্তিমশাই, খবর কি?”

চক্রবর্তী হঁকাটি নামাইয়া বলিলেন—“ডাক্তারবাঘু? এস । খবর ভাল । এখনও বেহীস রওয়েছেন,—বড্ড জরটা রয়েছে কিনা । কিন্তু নাড়ী বেশ চলে এখনও । উঠে এস—একবার দেখ না ।”

ডাক্তারবাঘু উঠিয়া আসিলেন । চক্রবর্তী হঁকাটি সপরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ছুরার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন । ডাক্তারও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন । শিল্পজ্ঞের উপর একটি মাত্র প্রদীপ রানভাবে জলিতেছিল । একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তাপোষের উপর যলিন শয্যায় গমন করিয়া বৃদ্ধরোগী নিজা বাইতেছেন । তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধু সাবিজী পায়ে হাত বুলাইতেছে ।

ইহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিজী ঘোমটা টানিয়া দিল । গগন চক্রবর্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন । ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়িপত্রীক্ষা করিলেন,—“খানিটা দিয়া উক্ততা লইলেন । পরীক্ষাতে বলিলেন—“এখনও খুব জর । সে কিবাহ-মিস্কান্‌হাটা খাওয়ান হুকে?”

সাবিজী তাঁহার ঘোমটাবৃত মস্তক সন্ধান করিয়া জানাইল, হইতেছে ।

ডাক্তার বলিলেন—“আজ সারারাত্রি ওটা দেওয়া হোক । ভোরের দিকে রিমশনু হবার সম্ভাবনা ।”

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাতীর আসিলেন ।
গগনচন্দ্র ও তাঁহার সচিত্র দরজা অবধি
বাটিলেন ।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“নবুকে
খবর দিয়েছেন ?”

“না, দিই নি । কিছু ভাবনা নেই,
হামা ভাল হ’য়ে উঠবেন । ওরকম ত হয়ই
ওঁর মাঝে মাঝে । নবুকে খবর দিলেই
এখনই খরচপত্র করে’ বাড়ী আসবে তাই
খবর দিই নি ।”

ডাক্তারবাবু বলিলেন “গতিক বড়
ভাল বোধ হচ্ছে না কি ? আজ পাঁচ-পাঁচ
দিন ছুটটা ছাড়ল না,—তারি ওরল হ’য়ে
পড়েছেন । অর ছাড়বার সময় সামলাতে
পারলে হয় ।”

গগন বলিলেন—“আরে না না । আমি
এতকাল দেখছি । কিছু ভয় নেই ।”

“দেখা থাক । অনেক বচনটা হয়েছে
কিনা, তাই ভয় হয় ।” বলিয়া ডাক্তারবাবু
মুঠমকপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন ।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল,—ভোর-
বেলায় প্রাণবায়ু ত্বকের দেহশিঞ্জর ছাড়িয়া
গেল । মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎক মিনিটের
অল্প ঋণ তাঁহার চেতনা হইয়াছিল । তখন
জিনি, শুধু বলিয়াছিলেন—“নবু—নবু
এসেছে ?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বাড়ীতে ক্রমশঃ বোল উঠিলে, পাফার
লোক ছুইট-একটি করিয়া আসিয়া সমবেত
হুইতে লাগিল । সকলেই বলিল—“তা
বেশ গেছেন, খুব গেছেন । বয়স হয়েছিল,
তোমাদের সব রেখে গেছেন,—এ ত ওঁর

সৌভাগ্য । তবে নবু কাছে থাকলেই ভাল
হ’ত ।”

সংস্কারের সমস্ত আয়োজন হইতে
লাগিল । দেখানে সত্যচরণ নামে একটি
যুবক পাড়াইয়া ছিল,—সে নবু কুম্বারের একজন
বিশেষ বন্ধু । তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র
বলিলেন—“তুমি বাবা গিবে নবুকে একখানি
টেলিগ্রাফ করে’ দাও । আমার আর হাত-
পা আসছে না ।”

সত্যচরণ বলিল “আজ্ঞা, আমি
আপনি ঘাবার সময় ট্রেন থেকে টেলিগ্রাফ
করে’ দেব এখন ।” সত্যচরণ কলিকাতার
চাকরি করে—যেও রথটার ট্রেনে আপিস
যায় ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সে দিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল ।
সন্ধ্যা হইলে সকলে দুধাদি পান করিয়া
সকালে সকালে শয়ন করিল । গগনচন্দ্র
বিপন্ন । তিনি একা একথরে শয়ন করিয়া-
ছিলেন । অনেক রাত্রি হইল,—পুষের
কুম্বাপি আর কোন সাড়াশব্দ নাই—কেবল
গগনচন্দ্র তাঁহার শব্দায় এগাশ-ওগাশ
করিতেছেন । শোকটা ইহারই সর্বাপেক্ষা
অধিক লাগিয়াছে বুঝি ? ইহা শোক, না
আতঙ্ক ?—হুইটি নিকটসম্পর্কীয় বৃদ্ধের
মধ্যে একটি ঘরিলে, অপরটির সহজেই একটা
আতঙ্ক উপস্থিত হয় ;—তাঁহার মনে হয়, এই-
বার আমার বাংলা ত আসিল ।

বাহা চটক, ক্রমে রাত্রি গত হইল ।
গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শব্দাত্যাগ করিয়া
উঠিলেন । অন্ধকারে, অতি সন্তর্পণে, নিজেরা
ঘরের ষোলটি খুলিয়া, নম্রপদে বাহিরে আসিয়া

দণ্ডাধমানে হইলেন। তখনই অঙ্গকার,—
তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়াছে।
নাঠের প্রান্তে শূণ্য একটা ডাকিয়া উঠিল।
গগনচক্রে ক্ষণকাল নিঃশব্দভাবে বাঁড়াইয়া-
থাকিয়া, ধীরে ধীরে বড় ঘরের বারান্দার
দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরায়ে
বুকের মুত্থা হইয়াছে,—সে ঘরটি আন্ধ তাল-
বন্ধ। গগনচক্রে নিঃশব্দে তালগাটা খুলিয়া সেই
বন্ধকারঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার
বুকটা হুহু হু করিয়া উঠিল। হাম হাম-
বেহ!—এতরায়ে নিঃশব্দে চাক্ষুশ
খুঁজি তাতার মুত্থাখাটি একবার দেখিবার
অন্ত ও অঙ্গপাত করিবার অন্ত থাকিয়াছেন!

গগনচক্রে পূর্ববৎ সাবধানতার সহিত
ঘরের ঘরটি প্রথমে বন্ধ করিয়া-সিঁধা একটি
দিশাশালাই আলিলেন। প্রদীপটি আলিয়া,
পূর্বকথিত লোহার সিঁছুকটির নিকট অগ্রসর
হইলেন। সিঁছুকটির উপর হইতে একটি
ভাঙা কাঠের হাতবার, একখানি ছিন্ন মহা-
ভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামা-
ইয়া, সিঁছুকটি খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি
কাপড়ের পুঁটুলি তাহা হইতে নামাইবার
পর, নীচের দিক্ হইতে পুরাতন-লাগচেলি-
বাধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির হইল।
সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়া-
বন্ধি অনেক নোট্ রহিয়াছে। তাহা
দেখিযাহাজ, সেই ক্ষণিকালেক, সেই মুত্থাককে
গগনচক্রে মসৌর্যক মুখমণ্ডলে ওর দস্ত-
পংক্তির ছটা ক্ষণকালের অন্ত উদ্ভাসিত হইয়া
উঠিল।

অবিরতমতে পুঁটুলিগুলি ধপাধানে পুনঃ-
সম্মিষিষ্ট করিয়া, গগনচক্রে সিঁছুকটি বন্ধ

করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত ও ভাণ্ডা-
বন্ধ ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর
পূর্ববৎ সাতাইয়া-রাখিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া,
ঘরারে ভালো বন্ধ করিয়া, নিজ শয্যাগৃহে
আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ছথারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ আলিয়া,
গগনচক্রে শয্যার উপর উপবেশন করিলেন।
বালিশের নিরে তাঁহার চশ্মার খোঁজটি
ছিল। চশ্মাটি চক্ষে লাগাইয়া, নোড়ের
তাড়াগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—
কেবল দশটাকার নোট্,—একখানি
নব্বয়ওয়ারি নোট্ তাহাতে ছিল না।
একটি তাড়া খুলিয়া নোট্‌গুলি দাবদাহের
গণনা করিয়া দেখিলেন,—একশতখানি
আছে,—হাতার টাকা। এতোক তাড়াটি
খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন, এতোক-
টিতেই হাতার টাকা করিয়া। একশ দশটি
তাড়া ছিল—দশহাজার টাকা।

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না,—গগনচক্রে
নোট্‌গুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে
লাগিলেন। একশ করিতে করিতে ভয়ের
হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুঁটুলিটি
নিজের সিঁছুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া,
ঘরের বাহিরে আসিলেন।

হুইএকটা কাক ডাকিতে আরম্ভ
করিয়াছে—অন্ন অন্ন আন্দো হইয়াছে। গাড়ুটি
হাতে করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া, আন্ত-
বাগানের ভিতর দিয়া গগনচক্রে পুঙ্খনিপী-
তীরে উপবিষ্ট হইলেন। তখনও কোথাও
অন্যমন্তব্যের দেখা নাই। প্রথমেই গগনচক্রে,
দাদার লোহার সিঁছুকের চাবিটি, জোরে
ছুড়িয়া পুঙ্খনিপীত মহাধানে নিঃক্ষেপ করি-

গেল। তাহার পর চতুর্থ প্রকালন করিয়া
বাড়িতে চলু করিয়া, ঘায়ে ঘায়ে বাড়ী
কিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

এইখনি বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে
পিতৃপিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া
দৌড়িল। সে হইতমধ্যেই নিজের সাধারণ
বৈধ পরিভাষণ করিয়া কাটা পরিয়াছে,
স্বপ্ন করিয়া আসিয়াছে।

— নবকুমারের বাড়ী পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে
আসি একবার ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। তাহা
তিনিরা প্রতিবেশীরা আসিয়া সাহায্য দিতে
লাগিল। সকলে বলিল—“নবু, কেঁদে না
বাঁবা, চুপ কর। বাপ-মা কি আর লোকের
চিহ্নদিন থাকে? এই তোমার খুড়ামশায়
স্ববেছেন, ইনিই এখন তোমার বাপ হলেন।
চুপ কর বাবা।”

প্রতিবেশীরা গৃহ ভাগ করিবার সময়
পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—
“আজ,—গগনচক্রবর্তী খুড়ার চেহারাটা
খুবই’রে গেছে দেখেছ একদিনে! চোখটোখ
সব একবারে ব’স’ গেছে।”

একজন বলিল—“আহা, তাইয়ের
শোকটা বড় বেগেছে বাবুনের।”—চক্ষু-
জ্বালাতন কারণ যে সারারাত্রি আগরণ
করার অন্তরে শরতানের জীবনবৃত্তা,
তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

সন্ধ্যায় নবকুমার খুড়ামশায়ের সহিত
আসিয়া হবিষ্যার ভোজন করিল। ভোজ-
ান্তরে গগনচক্র মাহুর পাতিয়া বসিয়া
ছায়ায় বাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাহার
কাছে বসিয়া ছিল। খুড়ামশায় বলিলেন—

“প্রাচীনায়িত্র ত আয়োজন এইবেলা থেকে
করতে হবে! ঢাকাভড়ি কিছু এনেছ?”

নবকুমার বলিল “ঢাকাভড়ি আমি
কোথার পাব? বাবার সিদ্ধক থেকে কিছু
বেকতে পারে বোধ হয়।”

“তা বেশ যদি কিছু থাকে।”

“চাবিটা?”

“চাবি? চাবি কোথায়, তা ত বলতে
পারি নে।—হয় ত বউমাকে দিয়ে গেছেন।
বিজ্ঞান কর দেখি।”

নবকুমার গিয়া মাঝখানে বিজ্ঞান
করিল। মাঝখানে বলিল—“আমাকে ত
দিয়ে যান নি। শেক-শব্দ তার কোমরের
খুঁদীতে ছি-দেখেছে। খুড়ামশায় হয় ত
খুঁলে নিয়ে থাকবেন।”

“না,—তীন ত বলেন—চাবি কোথায়,
কিছুই জানেন না।”

নবকুমার ফিরিয়া আসিয়া খুড়ামশা-
য়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন
“তার কোমরে ছিল! তা ত লক্ষ্য করি নি।
তবে হয় ত তার সঙ্গে চিতার উঠেছে।”

নবকুমার একটু বিব্রতের সঙ্গে বলিল—
“ওটা আপনি লক্ষ্য করলেন না?”

খুড়ামশায়ের হাঁকা নামাইয়া কাঁদ-কাঁদ
যে বলিলেন—“আরে বাবা—সে সময় কি
আমার চাবি-সিদ্ধক-ঢাকাভড়ি তাব্বার
যত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা
পার।”

নবকুমার কিরংফণ সীজন রহিল।
খুড়ামশায় ধূমান করিয়া ঘাইতে
লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল—“তবে
এখন উপায়?”

“উপায় আর কি ? কামার ডাকের
সিদ্ধুক খোলাতে হবে।”

কামার ডাকাইয়া সিদ্ধুক খোলান হইল।
তাহা হইতে কেবল গুটিকিৎসক নগদ টাকা
আর নবকুমারের পরলোকগতা জননী
খানকয়েক দোনা ও রূপার পুরাতন অল-
কার বাহির হইল।

হঁহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথার হাত
দ্বারা বসিয়া পড়িল। তাহারও বয়সের মনে
বিশ্বাস ছিল যে, তাহার পিতার সিদ্ধুকে নগদ
দশহাজার টাকা আছে। তাহার মনে
বিশ্বাস হইল, খুড়ামহাশয়ই সে টাকা
গরহইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষসাদুদ
কিছুই নাই।

খোলা সিদ্ধুকের সমুখে নবকুমার
বসিয়া আঁতড়িয়াছিল, এমনসময় খুড়ামহাশয়
আসিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন—“কিছু পেলেন ?”

সিদ্ধুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল,
নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে বিজ্ঞাসা
করিল—“দশহাজার টাকা ছিল যে, কোথা
গেল ?”

গগনচক্র আন্দব্য হইয়া বলিলেন—“কত
টাকা ?”

“দশহাজার।”

খুড়ামহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া
গেল। একটু কাঠখাসি হাসিয়া তিনি বল-
লেন—“দশহাজার টাকা ! পাগল ! কোথা
পাবেন তিনি ?”

নবকুমার বলিল—“কেন, সকলেই ত
বলত, এই সিদ্ধুকে তাঁর দশহাজার টাকা
আছে।”

“সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত

সকলদাই বলতেন, তাঁর এক পরসাগ দেখে।
তুমি পশ্চিম থেকে যা ঢাকাড়ি পাঠাতে,
মাঝে মাঝে তাই খরচায় কুন্তেন, আর ছ-
পাঁচ টাকা কমিয়েছিলেন। হ্যাঃ—দশ-
হাজার টাকা ! দশহাজার টাকা কি
সাধারণ কথা রে বাবা !”

নবকুমার আর কি করিলে। নীরবে
মনে মনে হুঁসে ও রাগ হ্রস্ব করিয়া, যথাসময়ে
পিতৃশ্রদ্ধা সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই
তাহার ছুটি ছুরাইল,—ভয়ঙ্কর লইয়া কপ-
হানে কিরিয়া বাইতে হইবে। এতদিন
তাহার পিতার সেবাশ্রম্যার জন্ত ত্রীক
বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সার্বিকীকে
সে পশ্চিমে লইয়া নিম্নের কাছে রাখিলে।
ত্রীকে বলিয়া গেল, পুজার ছুটি হইতে
আর বেশি ধরণ নাই। হাতমধ্যে একটা
বাড়ী তিক করিয়া, পুজার সময় আসিয়া,
তাহাকে লইয়া বাহবে।

পক্ষম পরিচ্ছেদ।

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন
গহনাগুলি বিক্রয় করিলে, কিছু কাপড়-
চোপড়ও কিনবার প্রয়োজন আছে। সাত-
দিন বউবাজার ও বড়বাজারে ঘুরিয়া আড়াই-
শত টাকার গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়-
বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া
কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেট-
বুকে নোট ছিল, টাকা দিবার জন্ত পকেট-
বুক বাহির করিতে বাইরা দেখে,—পকেট-
বুক নাই—জ্বাণোরে কখন চুরি করিয়াছে,
জানিতে পারে নাই।

বিপদের উপর বিপদ সেই পকেট-
বুক তাহার রিটার্ন টিকিটখানি পয়সা ছিল,

—আড়াইশত টাকার নোট ছিল,—বান-কড়ক পুরাতন দ্বিটিপত্র ছিল— সব গিয়াছে !

দোকানের কাগড় দোকানে রাখিয়া, নবকুমার বাসার ফিরিয়া আসিল। আজ পঞ্জাব-মেল সে কর্তৃত্বানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল,—এমন টাকা নাই যে, নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আশিষে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। তৎপ্রে ব্রিয়মাণ হইয়া কৌশলরকমে নবকুমার বাবার সাক্ষিধাপন করিল।

প্রত্যাহতে, তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই,—বাপার একটি নোট। বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন—“নবকুমারবাবু, দেখুন, ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর ভিত্তি করেন। কাল যে আপনার পকেটবুক চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বস্তুতে হইবে।”

নবকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিল “কেন, ব্যাপারটা কি ?”

মূলকণের সুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—“সত্যরাজে পঞ্জাব-মেল আপান্-শেলের নিকট পৌছিলে একটি মাল-গাড়ির সঙ্গে ভাষণ গণিশন্ হইয়া যায়। হুইত্তিনখানি বাজিগাড়ি চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার অত্যন্ত আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। বাজিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সংঘাতিতকরকম আহত। মৃতের তালিকা—”

মৃতের তালিকার মধ্যে “নবকুমার চক্র-বট্টার নামও পাওয়া গেল।”

মূলবাবুটি বলিলেন “কিরকম ? আপনিও মরেছেন নাকি ?”

নবকুমার বলিল—“বোধ হয় আমার নামের অন্ত কেউ ?”

সুবকটি হাসিয়া বলিলেন—“আপনি নবকুমারবাবুর তৃত নন ত ? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।” বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দুই-একটা কথা উদয় হইল। সে সকাল-সকাল আহার সাধিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া, আপান্-শেলে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিশ-আফিসে সন্ধান লইল। জিজ্ঞাসা করিল—“একজন নবকুমার চক্রবর্তী বলে’ যে মরেছে—আপনারা তাঁর নাম জানুলেন কি করে’ ?”

দারোগা বলিল—“তার পকেট থেকে এই পকেটবুকটি বেরিয়েছে।”

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেটবুক—তাহাতে তাহার নোট, চিঠি, রিটার্নটিকিট, সবই রহিয়াছে। বাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই ;—সেই জ্বাচোরই তবে মারা পড়িয়াছে। পাপের একপ, হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় মা।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কে ?”

“আমি নবকুমারবাবুর একজন বন্ধু।”

“লাশের কি হবে ? ম্যাক্সিমডেচের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি লাশের আখ্যায়িকা এসে কেউ জালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে, নইলে আমরা পুতে ফেলব।”

নবকুমার একবার ভাবিল,—পুঁতিরাই ফেলুক। তাহার মস্তকে এত সময়ে একটা মংলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিয়া, যদি সংবাদ পাইয়া খুঁড়ামহাশয়ের আসেন, তখন লাপ দেখিয়াই আনিতে পারিবেন, আমি নহি।

দারোগার নিকট লাপ আলাইবার অজ্ঞানতি চাহিল। দারোগা বলিল—“এর এ টাকাকড়ি? লাপের ওয়ারিশকে?”

“লাপের এক ব্রা আছে, খুঁড়া আছে। ব্রা ওয়ারিশ। খুঁড়াকে খবর দিলে আসিয়া টাকা লইয়া বাইবে।”

দারোগা খুঁড়ার কিকানাদি নোট করিয়া লইল। লাপ আলাইয়া নবকুমার কণিকাতার ফিরিয়া আসিল। খুঁড়াবাহুটি আসিয়া ক্রিজালা করিলেন “কি মশাই? খবর কি?”

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল—“গিরে দেখুন,—আমি নই,—আর একজনই মরেছে বটে।”

বাগুটি বলিলেন—“তবু ভাল।”

পরদিন সত্যচরণের আপিলে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। ওঁনিও, যদিও পল্লিগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটার লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাবার ফিরিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল,—গগনস্ত্র বৈঠকখানায় বসিয়া ভাষ্যক পাইতেছেন। পাড়ার ছুঁচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গভর্ণমেন্ট নবকুমারের প্রাণ হইয়া গেছে। বৃদ্ধের প্রাণ যেমন

বটা করিয়া হয়, যুবকের প্রাণ সেজন্য হয় না। গগনস্ত্র আশানুগুণ হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার প্রোট আনিয়াছিলেন,—তাহারই মধ্যে হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা পরচ করিয়া প্রাণ করিয়াছেন। বাকী ছুঁশত টাকা নবকুমারের বিববাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন মথবা ছিল, তখন সন্ধ্যার তাহার যে একটা স্নানাম ছিল,—তাঁহাকে অত্যন্ত আশা লাগিয়াছে। যেদিন বাবার মৃত্যুসংবাদ আসে, সেদিনমাত্র সে অত্যন্ত কান্দাকাটি করিয়াছিল। রাজ্যে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সাহবা দিল। পরদিন হইতে সে যুবখানি খিম্ব করিয়া পাকে বটে, কিন্তু সত্যবিধবার যেক্ষণ হওয়া উচিত। তাহার কিছুই দেখা যায় না। আর যোজনই বিশ্রংরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় একপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? একপ অব্যক্তাবিক বাণবিধবা ত হিন্দুগৃহে প্রাণ দেখা যায় না।

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হঁকাটি নিয়মিত-রূপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এ সত্যটি অস্ত্র আর নীরব, কেবল মাকে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—“সংসার অনিত্য, সকলই মারা!”—কেহ বা বলিতেছেন,—“এখা নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল,—আজকালকার দিনে ওরকম আর দেখা যায় না।”

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পরশক ওঁনি গেল। মুর্ত্ত পরে, বাড়ীর চাকর চিনিবাসি, ছুঁপাইতে হাঁপাটতে, গলগল্য হইয়া, ছুঁচু কপালে ভূণিয়া, বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ

করিল। হাঁপাতে হাঁপাতে শুধু হইবার বলিল—“কত কত।” তাহার মুখে আর কোন বাক্যনিঃসরণ হইল না—লোকটা সেইখানে মুক্তি হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিমিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা ব্রহ্ম হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কিহে চিনিবাস, অমন কম্বল কেন?”

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল—
“বাহ বাম বাম। ভূত কত।”

উহার মধ্যে যে বৃদ্ধটি বাল্যকালে কিকিৎ হৈরাণ্ডি পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—
“যে বোটা চাখা—কত কি? কত আত্ম নাকি?”

চিনিবাস চল কপালে ভুলিয়া বলিল
“কত নাই! ঐ পুকুরদ্বারে বীশতলায় দেখা গিয়াছে।”

অনেক প্রশ্নের পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্বে যখন সে পুকুরে বাসন জিজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের উপানীকোণে বীশতালের তলায় অন্ধকারে দেখিল—আপাদমন্তক শালা কাপড়ে ঢাকা একটা-কি বেড়াইতেছে। নিকটবর্তী হইয়া যাত্রী পদার্থটা কাছে আসিল,—ঠিক নব-কুমারের মত চেহারা,—আর বলিল—“ওরে চিনি,—একবার খুঁড়োমশারকে ডেকে বলিতে পারিস?”—তাহা শুনিয়া যাত্রী চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটী সেখানে ফেলিয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুঁড়োমশা-ও রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—
“ঠিক দেখেছিল?”

“ঠিক না ত কি বৈঠক দেখেছি কত। ওরে বাবারে, আর আমি সকেবেলা বাসন বাজতে বাব না।”

পূর্বোক্ত নাস্তিক প্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন—“চক্রবর্তিমশার, ঐ কথা আপনি বিশ্বাস করতেন? বোটা অসাবধানে বাসন-শালা ভেঙে ফেলচে—ভাই এসে ঐ একটা ওজর করছে।”—কিন্তু বক্তার ভয়ঙ্কর ভিতরটা গোপনে ছরছর করিতে লাগিল।

সে সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পর, তিন-চারিদিন ধরিয়া, পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া গগনচক্রবর্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধরে, কেহ ভাঙা শিবমন্দিরের নিকট, কেহ অল্প কোথাও, “নবকুমারকে” দেখিয়াছেন। পূর্বোক্ত নাস্তিক বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দেখা যায় না।—অত্যন্ত বৃদ্ধেরা গগনচক্রবর্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন—“শাস্ত্র ত মিথ্যা হবার নয়। অপঘাতবৃত্তটো হ’ল কিনা,—ওরকম ত হবারই কথা। বছরটা পূজক, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ডি দিইয়ে দাও, উদ্ধার হ’রে যাবেন।”

একদিন সন্ধ্যার পর খুঁড়োমশার পুত্র-বিশ্বী তীর হইতে ব্রহ্ম হুইয়া, অলতরা পাড়টি হাতে করিয়া, আমবাগানের ভিত্তর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সন্ধ্যা এক্ষেত্রে পরিহিত সূর্য্য তাহার সম্মুখে আসিয়া গাড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। মাঝখানে করিবামাত্র

সে বলিল—“খুঁড়েশ্বর,—সে মনহাভার
টাকা—”

আর শুনিবার পূর্বে, খুঁড়েশ্বর সেই-
খানে গাড়ী, আছাড়িয়া-ফেলিয়া “রাম রাম”
শব্দ করিতে করিতে উচ্চাঙ্গে দৌড়িয়া
পালাইলেন।

পরদিন অমাবস্তা,—সন্ধ্যার পর খুঁড়া-
শ্বর আর বাজির বাহির হইলেন না।
রাত্রি নয়টার সময় আহাৰ করিয়া শয়ন
করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রার মধ্য,—
রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গায়ে কাঠার
অতি দীপ্ত হস্তস্পর্শে খুঁড়েশ্বরের নিজা-
তত্ত্ব হইল। খুঁড়েশ্বর চমকিয়া ঘুমের
ধোরে বলিলেন—“কে ও?”

অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল—
“আমি নবকুমার।”

শুনিমাত্র খুঁড়েশ্বরের ঘুমের ধোর
চট করিয়া ভাঙিয়া গেল।

ভূত বলিল—“সে মনহাভার টাকা
আমার হঁটকে ষতদিন না দিচ্—ওতদিন
রোজ আসব তাঁগার। কর্তে—রোজ
আসব—রোজ আসব—রোজ আসব।”

বলিয়া নবকুমার চুপ করিল—ভূতটি যে
কে, তাহা পাঠক পূর্বেই অবগত বুঝিয়াছেন।
খুঁড়েশ্বরের নিদ্রা তখন ঘনঘন-বহিতে
লাগিল। ক্রমে তাহার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিয়া
মূর্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন
খোলা জানালায়-কাছে গিয়া, তাহার একটি
পর্যবে কোশলে সরাইয়া, নিজান্ত হইয়া
গেল। বাহিরে কিরদূরে সত্যচরণ অপেক্ষা
করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আগিল
হইতে কিরিয়া আসিয়া নবকুমারকে
সংবাদ দিল,—খুঁড়েশ্বর তাহারই ট্রেনে
কলিকাতার গিরাছিল,—সাবিত্রীর নামে
মনহাভার টাকার কোম্পানির কাগজ
কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ বিজ্ঞাসা
করিয়াছিল “এ টাকা কোথা থেকে এল?”

গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—“টাকাটা ছিল
আমার দামার। সকলে যে বলত, তাঁর দশ-
হাজার টাকা আছে তা দেখছি মিথ্যে নয়।
কিন্তু তাঁর লোহার সিঁদুক থেকে বেরোয় নি।
কালকে রাতে হঠাৎ তাঁর একটা পুরোণো
টিনের বাস থুনে দেখি, একটুকরো লাল
চেলীতে মোড়া দশহাজার টাকার নোট।
দেখে আমার হারবে বিষাদ উপস্থিত হ’ল
আর কি! আহা, আশে যদি নবু বেঁচে
থাকত!—দিত্বন! যা হোক, বিধবাটার
উপার হ’ল।”

হীর পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া
খুঁড়েশ্বরকে এক চিঠি লিখিল। লিখিল,
সে শুনিয়াঃঃখিত হইরাছে যে, তাহার মৃত্যুর
একটা শুভব উঠিয়াছে এবং প্রাণশান্তিও
হইয়া গেছে—কিন্তু বাস্তবিক সে বাচিয়া
আছে এবং একটু কার্য উপলক্ষ্যে স্নানান্তরে
গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ী আসিবে
এবং একদিন থাকিয়া স্নানান্তরে লইয়া পশ্চিম
যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাড়ী আসিয়া শুনিয়া, খুঁড়া-
শ্বর কি-একটা অগ্ররি কার্য উপলক্ষ্যে
স্নানান্তরে গিয়াছেন। স্নানান্তরে লইয়া সে পশ্চিম
চলিয়া গেল।

শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

জীবক ।*

[বুকের চিকিৎসক]

পালি বিনয়পিটকের প্রথম ও অষ্টম খন্ডকে এবং তিব্বতীয় ক্যাংস্তার গ্রন্থের দুই-ব অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীবকের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। মগধসাম্রাজ্যের রাধগৃহনগরে জীবকের জন্ম হয়। কোন কারণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণ হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবক, অষ্টাদশ বিত্তা ও চতুঃষষ্টি কলা, ইহার কোন একটি শিখিয়া আত্মিকানির্মাণ করিবেন, এরূপ কর্তব্য করিলেন। তদনুসারে তিনি তক্ষশিলায় † বাইরা

ভদ্রতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদের অধ্যাপকের নিকট খীর প্রার্থনা জানাইলেন। এই অধ্যাপকের নাম আত্রেয়। অধ্যাপক জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি আমাকে কত করিয়া বেতন দিতে পারিবে?” জীবক বলিলেন—“মহাপ্রভু, কাশ্যকেও না বলিয়া আমি গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি; স্তুতরাং আমি আপনাকে উপযুক্ত বেতন দিতে পারিব না; শিক্ষা সমাপন করিয়া আমি চিরজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব।”

* জীবকের কৃত্যে কোন উপাখ্যানিক বৈচিত্র্য নাই। পাড়াইহাজার বংশের পুণ্ড্র ভারতে চিকিৎসাশিক্ষায় ক্রিয়মান অবস্থা ছিল, তাহার কতক আভাস ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

† জীবকের পদভূমি বুৎপুহ (Putra), কিন্তু তাঁহাকে চিকিৎসাশিক্ষা শিখিতে তক্ষশিলায় (Punjab) বাইতে হইয়াছিল। ইহা যাহা ধনুমান হয়, তখন তক্ষশিলা বিদ্যালয়ের প্রধান গুরু ছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্মে তক্ষশিলা সর্বপ্রধান বিদ্যালয়ের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পার্শ্বনি ও চানকা এই বিদ্যালয়ের কাজ। তক্ষশিলা স্বাক্ষর্যবশের রাজধানী। ইহা ভারত ও পারস্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। পারস্যের সম্রাট বরহমুণ্ড প্রভৃতির অধীনে সময়ে তক্ষশিলা পারস্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রীকবীর আলেকজান্ডার তক্ষশিলা অধিকার করেন। সীলিসের অধঃপতনের সময়ে ইহা শকসাম্রাজ্যের হস্তগত হয়। তক্ষশিলা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আশ্বাধের বৌদ্ধ সংস্কৃতচতুঃপাদীর শিক্ষাপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তক্ষশিলা-বিদ্যালয়ে অষ্টাবশিষ্টায় আলোচনা হইত। প্রত্যেক বিদ্যা শিখাইবার জন্য ত্রিবিধ ত্রিবিধ অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিতেন। অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত মাসিক বেতন অথবা একযোগে বহু অর্থ গ্রহণ করিতেন। যহু বলিয়াছেন—

গুরুতঃশ্রমো বিদ্যা পুঙ্খলেন ধবেন বা।

অথবা বিদ্যায়া বিদ্যা চতুর্ধী নোপপদাতে ।

আশ্বাধের বেশে গুরুতঃশ্রমো বিদ্যালাভ হইত। কিন্তু তক্ষশিলায় “শিক্ষা ধন” (৩০ ধর্ম) না দিয়া কেহই শিক্ষা শিখিতে পারিতেন না। তক্ষশিলায় সৈন্যিক সন্তানদের প্রভাব ছিল।

আত্মের * জীবকের কথাই সবই হইত। তাঁহাকে চিকিৎসানাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জীবক ক্রমান্বয়ে সাতবৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসানাস্ত্র সমাপন করিলেন। তখন অধ্যাপক তাঁহার অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—“এই বিজ্ঞানয়ের চতুর্দিকে ১৬মাইলের মধ্যে যে সকল লতা ও বৃক্ষ আছে, উহাদের মধ্যে চিকিৎসার বেণ্ডুলির প্রয়োজন হয় না, সেইগুলি অম্লসন্ধান করিয়া আন।” চারিদিন পরে জীবক অধ্যাপকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন—“বন্যায়, ঔষধে প্রয়োজন হয় না, এমন লতা পাইলাম না।” অধ্যাপক খ্রীত হইয়া জীবককে ঘূহে বাইতে অম্লমতি করিলেন। জীবক মনুষ্যে প্রত্যাবর্তনকালে একদিন সাক্ষাত-

(অধ্যাপক) :—রাভো অবস্থিত করেন। তথ্য কোন রমণীর খোর শিরঃশোভা হইয়াছিল। জীবক চিকিৎসাধারা তাঁহুর রোগবিধিক্তি করেন। তিনি একটু মাখন উত্তপ্ত করিয়া একটি ঔষধ উহার সহিত মিশাইয়া দেন এবং মিশ্রিত দ্রব্য উক্ত রমণীকে নস্ত করিতে বলেন। রমণী ঐ দ্রব্যটি নাসিকাধারা যুক্তিকে ও কণ্ঠে আকর্ষণ করিলেন। এইরূপ গ্রহণ করিবার পর তৎক্ষণাত তাঁহার শিরঃশোভার শক্তি হইল।

রাজগৃহে আসিয়া জীবক রাজা বিধিসারকে ভগনন্দরোগ হইতে বিমুক্ত করেন। একটি ঔষধের মাঝিবে এই রোগের উপশম হয়। বিধিসার সবটাই হইয়া জীবককে অপরিমিত অর্থ + প্রদান করেন।

* আমরা দেখিলাম, জীবক যে সমস্ত তথ্যনির্দেশ গ্রহণ করেন, তখন আত্মের ভরত্যা বিদ্যালয়ের চিকিৎসানাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। হিন্দুচিকিৎসাসংগ্ৰহে অত্রিপুত্রের ইরেখ বর্ণিত পাণ্ডুরা বার। অষ্টাদশবৎসে লিপিত আছে—

ব্রহ্মা শ্রুতম্ভোঃ বেদং প্রজাপতিনকৌশলং।

সোহবিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোহত্রিপুত্রোদিকান্ মুনীনঃ।

ব্রহ্মা চিকিৎসানাস্ত্রের প্রধান অবতরক। তৎসমস্তর দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও অত্রিপুত্র একত্রে এই নাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার করেন।

অষ্টাদশবৎসে যে অত্রিপুত্রের উল্লেখ আছে, তিনি বৌদ্ধগ্রন্থের আত্মের ভিন্ন আর কেহই নহেন। তিলকীর গ্রন্থে (মূল-ব. তপঃ) আত্মের নাম গান্-সেন্-কি-বু। ইহার আবহাবিক অর্থ “অত্রের পুত্র” বা “অত্রিপুত্র”। অতএব অত্রিপুত্র, আত্মের ও গান্-সেন্-কি-বু একই ব্যক্তির নাম। এক্ষণে আত্মের আদিভাবকালনির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের কোনপ্রকার কষ্ট পাইতে হইবে না। ইহা যার নিঃসন্দেহরূপে বলা যায়, তিনি খৃঃ পূঃ ৬০০-৬৫০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কারণ, আত্মের জীবকের অধ্যাপক। জীবক বুদ্ধের চিকিৎসক। বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের লোক।

আত্মের সময়ে তৎকালিয়ার চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়। ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসাসংগ্রহ নিয়র তৎকালি ও তৎসম্প্রদিকটর স্থানে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে যে সকল লতা ও গাছের উল্লেখ আছে, উহা কাব্যের অতীতি হিন্দবংশের মধ্যে গণ্য। গাণ্ডীপাতা বা মথাকারতের কোন লতাগাছের উল্লেখ প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে নাই।

+ প্রাচীনকালে কোন কোন দেশে চিকিৎসাবিদ্যা অত্যন্ত সমাবৃত্ত হইত। নীপের অত্রচিকিৎসার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। চিকিৎসক ডিমোক্রিট্‌স্ ইতিনিয়ার কোন পাত্তিকে রোগমুক্ত করিয়া এক বৎসরে ৬০০০, ছয়-ছয়টি টাকা বি পাইয়াছিলেন। হার্মোদের পোলিক্রেট্‌স্ উক্ত চিকিৎসককে ৬৬ বৎসরে ১২০০০, বারহাচার-

• রাজগৃহে এট সময়ের একজন ধনী বাস করিতেন। তাঁহার মন্তকে অসহ্য বেদনা হইয়াছিল। তাঁহার বোধ হইত, কেহ যেন মন্তকে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছে। জীবক একখানি তীক্ষ্ণ অস্ত্র • দ্বারা তাঁহার মন্তক হইতে ছোট কাঁট বাহির করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। রোগীকে সাতমান পৃষ্ঠে, সাতমান দক্ষিণপার্শ্বে ও সাতমান বামপার্শ্বে উপর তর দিয়া শুইয়া + থাকিতে হইয়াছিল।

তখনতর জীবক বারান্দী, উচ্চরিনী ও কৌশাখীতে গমন করিয়া বহু লোকের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। উচ্চরিনীর তাৎকালিক রাজা চন্দ্রপ্রস্তোত পাণ্ডুরোগে (jaundice) কষ্ট পাঠিতেছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, জীবক মগধরাজ বিধিয়ারের গৃহচিকিৎসক। তদনুসারে তিনি বিধিয়ারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জীবককে উচ্চ-চালা দিতে প্রেরণ হইয়াছিলেন। বহুদিগে গমন করিয়া চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছিলেন। (যেরোচোচা, তৃতীয় অধ্যায় ২৫তম)। আমাদের দেশে শাণ্ডকারেরা নিম্নম করিয়াছেন, চিকিৎসা করিয়া অর্ধগ্রহণ করিয়া বা জীবক তৎকালিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা আটান পারদীক ও মঙ্গলীক জাতির প্রদা অনুসারে রোগীর নিকট হইতে টাকা লইতেন।

• নানাশ্রে জ্ঞানী ব্যক্তি, অর্থচিকিৎসা সর্গপ্রদে মীন্দ্রে উদ্ভাবিত হইয়াছিল • পল্লাইনগরে কোন গৃহে কতকগুলি অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। উক্ত অস্ত্রগুলি বর্তমানকালে ব্যবহৃত ডাক্তারী অস্ত্রের অনুরূপ।

• পৃষ্ঠে, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে তর দিয়া লোয়াইয়া রাপা আটান চিকিৎসার একটি রীতি। রূহবিজ্ঞাতীর মধ্যে এই প্রদা প্রবর্তিত ছিল। পরমেশ্বর ইব্রেকলকে আদেশ করিয়াছিলেন, বামপার্শ্বে তর দিয়া ৩২ দিন ও দক্ষিণ-পার্শ্বে তর দিয়া ৩০ দিন শুইয়া থাক। (Ezekiel IV. 5)

• রাজার বাড়ীর কোন চিকিৎসককে আনিতে হইলে রাজার নিকট আদেশন করিতে হইত। ওল্ড টেষ্টে-মেন্টে দেখা যায়, নেগরি নিগের চিকিৎসায় সন্ত তিথ্যর এলিথাকে কিছু না বলিয়া, এলিথার প্রভু ইজরেলের জ্ঞানর নিকট আর্শনা জানাইয়াছিলেন। (2 Kings V. 5)

• তৈল পাণ্ডুরোগের মহৌষধ।

• আটান ভিষণগ্রন্থের মতে নাসিকাযার গন্ধগ্রহণ করা একপ্রকার রোগপ্রতিকারের উপায়। গন্ধগ্রহণে সকল রোগেরই উপশম হইতে পারে। ডিনোজিস্ট, বৃত্তাশ্রমায় লিখিত হইয়া আনিয়াছিলেন—“আর ৩ দিন বাচি-লেই আমি কৃষিজলেন্দবট পোষণ করিতে পারি।” কিন্তু তখন তাঁহার কিছু সাহায্য করিবার সামর্থ্য ছিল না।

• তিনি প্রথম কটি মৃত্যু করিয়া ৩ দিন বাচিতে ছিলেন।

ঘিনীতে আনয়ন করেন। জীবক একটি ঔষধ তৈলদ্বারাঃ স্নিক্ত করিয়া চন্দ্র-প্রস্তোতকে খাইতে বলেন। উহাতেই তাঁহার রোগমুক্তি হয়।

ইহার পরেই জীবক বুদ্ধদেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীর মধ্যে জীবক বস্তু। বেহেহু তিনি জগদ্যাদিপ্রমোচক বুদ্ধের বাধাবিমোচন করিয়াছিলেন। এক সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ অস্থির হয়। আনন্দ জীবকের নিকট বাইয়া এই সংবাদ বিজ্ঞাপন করেন। জীবক রাজগৃহের বিহারে আসিয়া বুদ্ধের চিকিৎসা করেন। তিনি তিনটি পদ্যপুস্তকের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রক্ষেপ করিয়া ঐ তিনটি পুস্তক তিন সনয়ে বুদ্ধকে আশ্রয় করিতে বলেন। পুস্তক তিনবার আশ্রয়ণ করিয়াই বুদ্ধের মঙ্গলার বিরচন হয়। ইহাতেই তাঁহার দেহ মঙ্গল হয় ও তিনি রোগমুক্ত হন।

তথাগতের বুদ্ধত্বগাভের বিংশতিবর্ষ পরে জীবক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি বুদ্ধকে প্রত্যহ তিনবার দেখিতে পাইবেন, এই আশয়ে রাজগৃহনগরে নিজের উদ্ভান-কুশিতে একটি বিহার নিৰ্মাণ করেন। ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিহাৰায়ের বুদ্ধার পর জীবক অজাতশত্রুর গৃহচিকিৎসক হন। তিনি বালচিকিৎসার নিপুণ ছিলেন বলিয়া তাহাকে “জীবক কোদারতচ্ছ” বলিত। জীবকের কথা শু-সারে একদিন অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের উপবেশ তনিবার জন্ত উৎসুক হন। তিনি জীবকের বিহারে গমন করিয়া বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ-পূৰ্ণক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

মগধে একসময়ে কুট, শোষ, ধবল, বম্বা ও অপমার, এই পঞ্চাবধ রোগের উপদ্রব হইয়া-ছিল। ঐ সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি-গণ জীবকের নিকটে গিয়া বলিয়াছিল— “মহাশয়, আমাদের রোগমুক্ত করুন।” জীবক উত্তর দেন— “মহাশয়গণ, আমাকে অনেক কাণ্ডা করিতে হয়। আমি রাজা বিহিষায়ের চিকিৎসক। রাজার অন্তঃপুরে আমি চিকিৎসা করি। বুদ্ধপ্রসূত ভিক্ষুসংঘেরও চিকিৎসক আমি। আমার সময় নাই, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।” রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ জীবককে পুনরায় বলিল— “মহাশয়, আমাদের দাড়া-কিছু সম্পত্তি আছে, আপনাকে দিতেছি; আমরা ত্রৈকাল আপনাদেহ্য হইয়া থাকিব; আমাদের সাধনের প্রার্থনা, আপনি আমা-দিগকে রোগমুক্ত করুন।” জীবক পুনরায়

উত্তর করিলেন— “মহাশয়গণ, আমার অনেক কাণ্ডা আছে, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না। তঁহঁর রোগাক্রান্ত লোকেরা মনে করিল— “বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সুখে বাস, সুখে ভোজন, সুখে শয়ন করেন। আমরাও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষু-শ্রেণীমধ্যে প্রবেশ করি। তাহা হইলে ভিক্ষুগণ আমাদের শুক্রমা এবং জীবক আমাদের চিকিৎসা করিবেন।” এইরূপ স্থির করিয়া ঐ সকল লোক ভিক্ষুসংঘের নিকটে গিয়া প্রত্নজা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ উহাদের পরিচয়। কারিতে নাগিলেন। জীবকও চিকিৎসাঘাৱা উহাদের রোগবিশুদ্ধি করিলেন। কিন্তু উহারা রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভিক্ষুগণ পরিচায়গ্ৰন্থক পুনরায় সংসারান্নমে প্রবিষ্ট হইল। জীবক উহা-দের অবস্থাস্থর দেখিয়া ক্ষিপ্তাঙ্গা করিলেন — “আপনারা ধর্ম্মভাবন ত্যাগ করিলেন কেন?” উহারা উত্তর করিল— “আমরা এক্ষণে রোগমুক্ত হইয়াছি, আর আমাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই।” জীবক এই কথা শুনিয়া মর্দ্যাহত হইলেন এবং তথা-গতের সমীপে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তথাগত ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— “হে ভিক্ষুগণ, আপনারা কুট, শোষ, ধবল, বম্বা ও অপমার, এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিতে পারেন, কিন্তু কখনও উহাদিগকে প্রত্নজা বা উপসম্পদা প্রদান করিবেন না, অর্থাৎ ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইবেন না।”

ঐসংগোচস্ত বিদ্যাকৃষণ ।

সার সত্যের আলোচনা ।

পুরাণ-কাহিনী ।

বিপ্লব প্রবন্ধে এই একটি কথা স্পষ্টকল্পে বলা হইয়াছিল যে, কান্টের দৃষ্টিতে বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সত্যের নিমন্ত্রণ হয় নাই। এ কথা সত্য—কিন্তু তথাপি বাস্তবিক-সত্তা সেই যজ্ঞের সত্যমণ্ডপে অনাহুত উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহার স্বামীকে ছাড়িয়া একাকিনী। বাস্তবিক-সত্তার স্বামী কে? না, কান্ট, বাহ্যকে বলেন—thing-in-itself স্বয়ংবস্ত। বাস্তবিক-সত্তা স্বয়ংবস্তকে ছাড়িয়া সংবিতের যোগাৎ একতা-বেশে স্বজ-তরনে প্রবেশ করিলেন। এই যে বস্তুরিহিততা বাস্তবিক-সত্তা, ইনি আপনাতে আপনি নাই। সত্যের নাক্ষত্রে বাস্তবিক-সত্তার প্রাণসংশয় উপস্থিত;—কাজেই কান্ট, সংশয়বাদী। যৌলিক পদার্থসকলের নাক্ষত্রে হইতে কান্ট, স্বয়ংবস্তকে সরাইয়া দিয়াছেন—তাহা তিনি দি'ন—কিন্তু আপনার ঘন হইতে একতিলও সরাইয়া দিতে পারেন নাই। কান্ট স্পষ্টাকরে বলিয়াছেন যে, স্বয়ংবস্তকে অনুপ্রাণিত করিতে পারা যায় না। এইজগৎ, যেহেতু তাহা করিলে এইরূপ একটা শিরো-নাড়ি-শিরঃপীড়া-রকমের অসমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, অস্তিত্ব নাই অথচ ভাবিত আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে। তার সাক্ষী—This proves no doubt that all speculative know-

ledge is limited to objects of experience ; but it should be carefully borne in mind that this leaves it perfectly open to us to think the same objects as things by themselves, though we cannot know them. For otherwise we should arrive at the absurd conclusion that there is phenomenal appearance without something that appears.

ইহার বাংলা ।

“এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের চিন্তাসম্মত সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষাধীন বস্তুর সন্নিবেশের গতি'র মধ্যে আবদ্ধ; এটা কিন্তু সাবধানে মনে রাখা চাই যে, সে-সব বস্তু'র বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানে জ্ঞানিতে পারা আমাদের সাধ্যাত্ত না-হইলেও তাহা মনে ভাবিতে পারিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই। কেন না, পরীক্ষাধীন বস্তুর সন্নিবেশের উপলব্ধি-কালে যদি তাহাদের বাস্তবিক-সত্তা মনেও ভাবা না যায়, তবে তাহাতে ফলে দাঁড়ায় এইরূপ একটা অসমস্ত কথা যে, অস্তিত্ব নাই অথচ ভাবিত আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে।” কান্ট এহে একটি কথা বলিতে-ছেন যে, বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানের অগম্য হইলেও তাহাকে মনে না ভাবিলেই নয়—এ কথাটার মধ্যে প্রাধান্য একটা প্লেথ প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে এই যে, যেন জ্ঞানের অগম্য পদার্থকেও মনে ভাবিতে পারা সম্ভবে । মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তাকে কান্ট 'কোজু পাতিয়া' গ্রহণ করিতেছেন ; অথচ, জ্ঞানে-জানা বাস্তবিক-সত্তা'র প্রতি তিনি পরাধীন । জ্ঞানে-জানা-বাস্তবিক-সত্তা হ'চ্ছেন সেই বাস্তবিক-সত্তা, যিনি বস্তুবস্তুর সহিত (thing-in-itselfএর সহিত) একাঙ্গনে উপবিষ্ট । রূপকটিকে ভাঙ করিয়া শুদ্ধাইয়া বলি—তাহা হইলেই কান্টের সংশয়বাদের প্রকৃত বৃত্তান্তটি আগামের সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিবে । কান্ট ছিলেন সর্বপ্রকারে স্বকারণে মজ । মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তা তাঁহার চিন্তার উদ্ভাবনা এক প্রকার মানসকল্প । বাস্তবিক-সত্তারূপিত সেই যে মানসকল্প সত্তা, তাঁহার প্রতি হ'চ্ছেন বস্তুবস্তুর । তাঁহার পিতার নিকটে (কান্টের নিকটে) তিনি মনে-ভাবা ; পিতার নিকটে (বস্তুবস্তুর নিকটে) জ্ঞানে-জানা । সেই বাস্তবিক-সত্তারূপিত সত্তা সংবিতের একতাবেনে পদার্থসত্তার মাঝখানে (category-বিগের মাঝখানে) অনাহুত আসিয়া উপস্থিত ; পূর্বে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া দৌরভবন চলিয়া আসিয়া আপনি একাকী । কান্ট বলেন, সংবিতের একতী বস্তু-পূজা হইলেও—যোগাঙ্গিকা ; তাহার ব্রিজে রহিয়াছে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে উন্মীলিত । পক্ষান্তরে, স্বয়ংবস্ত (thing-in-itself) নিত্যস্থই দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য ভালা । তুলতুলকে আছেন তিনি ভালা অনন্ত স্থানে বা অগম্য কৈলাসশিখরে সেইখানেই থাকুন । তাহাকে নিবন্ধ

করিয়া আনিয়া সত্তার মাঝখানে বসানো হইতে পারে না । কান্টের পূরণ-কাহিনী এ-যেমন একটি—এই-তেই আর-একটি কালী (অর্থাৎ কালের মুহূর্ত্তপরম্পরা) বুঝ করিতেছেন (কিনা ভাঙিতেছেন-পড়িতেছেন) যোগিনী সমভিব্যাহারে [কিনা যোগনাশক্তিকে (Synthesizerকে) সঙ্গে করিয়া কালীর স্বামী যিনি (অর্থাৎ কালের তিত্ত্ববিশিষ্ট যিনি) শূন্য মহাকাল (Eternity), তিনি মৃতবৎ পড়িয়া আছেন সটান । কালীর পিটিজলীয়া'র সহিত মহাকালের কেন কোনো সম্পর্কই নাই অথচ গোহে ঘোঁহায় অঙ্গাঙ্গ । কান্টের পুরাণে, যোগনাশক্তি সমভিব্যাহারী সংবিতের সহিত বস্তুবস্তুর (thing-in-itselfএর) কোনো সম্পর্কই নাই—অথচ উভয়ে পরম্পরের এপিট-ওপিট ।

পূর্ণাঙ্গ সত্তা ।

এই সকল ভেদবুদ্ধি সংশয়বাদের গোড়ার কথা । প্রকৃত সত্তা বাহ্য, তাহা আমরা বহু-পূর্বে বলিয়া চুকিয়াছি ; পাঠকে তাহা আন্তরিকতার স্বরণ করাইয়া দিই :—

সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ (বা জ্ঞান), এই তিনটি মৌলিক পদার্থ একরূপ হরিহরব্রহ্মা কে-তিনের কোনোটি অপর-দুটির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকালও একাকী থাকিতে পারে না । যেমন কাগজের এপিট-ওপিট এবং হুলতা । এপিট যেমন ওপিটের সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না, ত্যাহি তেইনি অস্তিত্বের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না । হুলতা যেমন এপিট-ওপিটের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ

কল্পিত একাকী থাকিতে পারে না, শক্তি
 তেমনি অতি-ভাতির সহিত সম্পক প্রতিষ্ঠা
 করিয়া একাকী থাকিতে পারে না । শুধুই
 কেবল সত্তা নহে, শুধুই কেবল শক্তি নহে,
 শুধুই কেবল প্রকাশ নহে ; পরন্তু অপ্রণোম-
 ক্রমে সত্তা হইতে শক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ
 পর্য্যন্ত এবং প্রতিপ্রণোম-ক্রমে প্রকাশ হইতে
 শক্তির মধ্য দিয়া সত্তা পর্য্যন্ত সবটা লইয়া
 এক অদ্বিতীয় অখণ্ডতা নিত্য-বর্তমান ।
 সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, এই তিনটি মৌলিক-
 পদার্থের একাত্মতাবের কথা এ বাহ্য
 বলিতেছি, একবার বাধ্যর্থ; একদিকে আমরা
 বিস্পষ্টভাবে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই,
 আর-এক দিকে সংক্ষিপ্তভাবে হাতের কাছে
 দেখিতে পাই । বিস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই
 বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে, সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাই
 ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে । এখনকার কালের নূতন নূতন
 বিজ্ঞান এবং ভবজ্ঞানের আলোকে বৃহৎ
 এবং ক্ষুদ্র উভয় ব্রহ্মাণ্ডের অনেকানেক নিগূঢ়
 তত্ত্ব অনেকে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু
 একটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গণিতগণের এখনো
 চক্ষু ফোটে নাই বাঁচ পরমেশ্বরের কৃপায়
 আমাদের এই দীন-দীন-মণিন হস্তশ্রীক দেশের
 ইহা সামান্য মোভাগোর বিষয় নহে যে,
 ব্রহ্মানুহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অগদাশচন্দ্র বসু সেই
 বিষয়টির বীতিমত পর্যালোচনার প্রবৃত্ত
 হইয়া ইহারি মধ্যে শকতকণাল অভাবিতপূর্ণ
 ক্ষান্তি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য
 গণিতজগতের হৃদয়স্থ বাধ্যর্থ দিরাছেন ।
 সে বিষয়টি সংক্ষেপে এই :—বাহ্য বৃহৎ-
 ব্রহ্মাণ্ডে —তাহাই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে ; বাহ্য
 ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে —তাহাই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে ;

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড, দোহে
 দোহার পর নহে—পরন্তু একেরই এপিট-
 ওপিট ! গুব সংক্ষেপে বলিলান :—তিনবা-
 য়াজে অনেক অনেক প্রকার ভুল বৃত্তিতে
 পারেন । অতএব তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক
 করিয়া দেখানো আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের
 অমূল্যলোমক্রম এবং প্রতিপ্রণোমক্রম কিরূপ ;
 (২) বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের
 অমূল্যলোমক্রম এবং প্রতিপ্রণোমক্রম কিরূপ ;
 (৩) উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ
 এই তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক করিয়া
 দেখানো আবশ্যক । তাহারই এক্ষণে চেষ্টা
 দেখা বাইতেছে ।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ ।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড আর-বিছ না—জীবাত্মা ।
 জীবাত্মা এক বটে, কিন্তু তিন লইয়া এক—

(১) আত্মসত্তা, (২) আত্মশক্তি এবং (৩)
 আত্মজ্ঞান, এই তিন লইয়া এক । পাশ্চাত্য
 দর্শনের আদিগুরু বলিয়াছেন—“আমি চিন্তা
 করিতেছি, অতএব আমি আছি ।” বৈকর্তার
 এই মূলবচনটির তাৎপর্য শুধু এই যে, যেমন
 দূর হইতে তরঙ্গজীড়া দেখিলে সমুদ্রের
 অস্তিত্ব প্রত্যক্ষমান হয়, তেমনি চিন্তার প্রতি
 লক্ষ্য নির্বিশেষ করিলে আত্মার অস্তিত্ব প্রতীয়-
 মান হয় । তা বই, উহার অর্থ কেহ যদি
 এক্ষণ বোঝেন যে, চিন্তার উপরেই আত্মার
 অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে” সেটা তাহার
 বড়ই ভুল । তরঙ্গজীড়ার উপরেও সমুদ্রের
 অস্তিত্ব নির্ভর করে না—চিন্তার উপরেও
 আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে না । কোনো
 মনুষ্যই চিন্তা করিয়া পৃথিবীতে আসেন

নাই, চিন্তা করিয়া বাণীঃ পাকেন না, চিন্তা করিয়া পূর্ণিবা হইতে অবসরত ভ'ন না। "আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি"—এ কথাটির অর্থ শুধুকেবল এই যে, চিন্তাতে আত্মশক্তি ক্ষুণ্ণি পায় এবং আত্মশক্তির ক্ষুণ্ণিতে আত্মসত্তা অভিযুক্ত হয়। আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রকাশ, এই তিনের কোনোটি অপর দুইটিকে চাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য দর্শনকারেরা সাক্ষাৎ-উপলব্ধিকে খাটো করিয়া চিন্তাকে বেশীমাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন—ইহা তাহাদের কথা বার্তার ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কাষ্টিকিত্ব বুঝিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি বাতিরেকে চিন্তা ফাঁকা। কিন্তু হইলে কি হয়—তিনিও ইউরোপের ভেদনুষ্ঠিত কতিন বরুন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনিও ভাবিতেছি'র মূল্যকেই অটক পাড়িয়া-গ্রহিয়া সংশয় বিব্রান্ত হইয়াছেন—জানিতেছি'র মূল্যকে পৌছিতে পারেন নাই। দেখতা যে আরগার বলিয়াছেন যে, "আমি ভাবিতেছি, অতএব আমি আছি", আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত দেই আরগার বলিয়াছেন— "আমি জানিতেছি, অতএব আমি আছি।"

"হুতা সমস্ততঃ সিদ্ধো জানেহহমিতাং বিবল্যৎ।"

চিন্তা, জিজ্ঞাসা, সংশয়, জ্ঞানসাধনের প্রথম সোপান, তাহাতে আর ভুল নাই—কিন্তু তাহাই কিছু-আর জ্ঞানের সারসর্গস্ব নহে। সমুদ্রে স্বীপ দিগে নবন-হর যে, সমুদ্র তরঙ্গেরই ক্রীড়াক্ষেত্র; কিন্তু সমুদ্রে ডুব দিলে সে ভুল অচিরে ঘুচিয়া যায়; তখন নবন হয় যে, সমুদ্র প্রশান্তির আলয়। "আমি আছি"—এই প্রশান্ত জ্ঞানটি আত্মার গভীরে

নিরন্তর আগিতেছে—তাহাই আত্মার অতিথের প্রত্যক্ষপ্রমাণ; তাহাতাহ, আত্মার অতিথি সঙ্গ্রহণ করিবার জন্য ভাবিতেছি'কে সাক্ষী মন্ত্র করা নিতান্তই বাড়ার ভাগ। এই এক-প্রকার—সোনার গায়ে সোনানি রঙ, মাথানো—প্রস্তুটিত, যোগাৎমূলের গায়ে গোলাপগুল মাথানো। স্পষ্টই বুঝিতে পারা বাইতেছে যে, আমাদের জীবজগৎ জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার তরঙ্গক্রীড়া বামানো আবশ্যক—চিন্তাবৃত্তি নিরোধ করা আবশ্যক। আর, আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল তাহারই প্রণালীপদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লে সাধনরূপী জ্ঞানের (অর্থাৎ চিন্তার) মূলে যেখানে সিদ্ধরূপী জ্ঞান (অর্থাৎ বৃত্তি:সিদ্ধ জ্ঞান) রহিয়াছে, সেইখানে মনকে লইয়া যাওয়া।

ইউরোপীয় দর্শনকারেরা "অসীম অসীম" করিয়া জন্মগতই গত্তগোল করেন। শেষে বলবৎ কান্ত দিয়া বলেন যে, অসীমকে চিন্তা দিয়া নাগাল পাওয়া যায় না। তাহাঁদের জ্ঞান উচিত যে, যে-অসীমকে তাহারা চিন্তা দিয়া বরুন করিয়া বরে জানিতে চেষ্টা করিতেছেন—তাহা তাহাদের চিন্তার পূর্ণ হইতেই বরে রহিয়াছে বোল-জানা মজুদ।

তোমার আত্মার অতিথি তো' আর তোমার চিন্তার ফল নহে তাহা তোমার চিন্তার মূল। যাহার মৌলতে তুমি চিন্তা করিতে পারিতেছ—তাহাকে তুমি চিন্তা দিয়া ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছ; এ তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না তো আর কি

এ বিষয়ে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা
যাহা বলেন, তাহা অত্যন্ত পরিষ্কার। তাহা-
দের কথা এই যে—

“মানব প্রত্যক্ষণঃ যোগঃ যে মনসিন নৃভূতসত্তে।

অধাত্তিরে বহনঃ সদ্ধঃ ব্যক্তির তে মহাব্যবিরঃ।”

প্রমাণকে আগাইয়া তুলিতেছে যে সাক্ষাৎ-
জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে বাহ্যারা প্রমাণ-
দ্বারা বৃত্তিতে ইচ্ছা করেন—সেই সকল মহা-
পুণ্ডিতেরা প্রকৃতিক ইন্দ্রিয়কণ্ঠদ্বারা অধিক
দৃঢ় করিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যে অধি
ইন্দ্রিয়কে দৃঢ় করিতেছে, সেই অধিক
তাহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃঢ় করিতে ইচ্ছা করেন।

আমাদের বক্তব্য কথা সংক্ষেপে এই :—
আত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান গোড়াতেই
একীভূত রহিয়াছে। গোড়াতে আত্মা
যেদণ্ড প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাই তিনি
আপনি; আর, আপনার সত্তা এবং প্রকাশের
মাধ্যমানে ইচ্ছা এবং শক্তি বাহ্য ক্ষুণ্ণি পাই-
তেছে, তাহাও তিনি আপনি। আত্মসত্তা,
আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, সমস্ত লইয়া
এক আত্মা। আত্মসত্তা চিন্তার পূর্ক হইতেই
ব্যক্তিমান—আত্মজ্ঞান চিন্তার পূর্ক হইতেই
ব্যক্তিমান—আত্মশক্তি চিন্তার পূর্ক হইতেই
ব্যক্তিমান। বাহ্য চিন্তার মূলে আছে, তাহাই
ব্যক্তি চিন্তার ফলে পাড়ার, তবেই চিন্তা সার্বক
চিন্তা হয়। পক্ষান্তরে, এরূপ যদি হয়
যে, চিন্তার মূলে আছে একরূপ ফলে
পাড়াইতেছে আর-একরূপ তবে তাহা চিন্তার
একপ্রকার কৃত্রিম কাতোকারি তাহা যথার্থ-
ভাবেই চিন্তা নহে।

ইতিপূর্কে বলিয়াছি যে, সত্তা, শক্তি এবং
প্রকাশের ক্রম দুইরূপ (১) অহলোম এবং

(২) প্রতিলোম। কৃত্ত-ব্রহ্মাণ্ডে অহলোম-
ক্রম এইরূপ :

প্রথমে আত্মসত্তা; তাহার পরে
চিহ্নিত্তির ক্ষুণ্ণি বা চিন্তা তাহার পরে
আত্মার প্রকাশ বা আত্মজ্ঞান।

প্রতিলোমক্রমে এইরূপ :—

প্রথমে আত্মপ্রকাশের উপলব্ধি—তাহার
পরে চিহ্নিত্তির উপলব্ধি, তাহার পরে আত্ম-
সত্তার উপলব্ধি।

অহলোম-পদ্ধতির পর-পর সিঁড়ির ধাপ
হচ্ছে—কর্তা, ক্রিয়া, কণ্ড; প্রতিলোম-পদ্ধতির
পর-পর সিঁড়ির ধাপ হচ্ছে—জ্ঞেয়, জ্ঞান,
জ্ঞাতা। আত্মা শুদ্ধকবেল একটা ফাঁকা
একরূপ নহে পরন্তু জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্তা-
কর্ম-ক্রিয়া, সমস্তেরই সমাধিধান বা কেন্দ্র-
স্থান অথবা বাহ্য একই কথা আত্মা—সত্তা,
শক্তি এবং প্রকাশ, তিনই একাধারে।

কৃত্ত-ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য-কিছু, সমস্তই বৃহৎ-
ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, এটা যখন হির;
এটা যখন হির যে, আমরা চিন্তা খাটা-
ইয়া আপনার সত্তাকেও জাননন করি নাই,
আপনার শক্তিকেও জাননন করি নাই,
আপনার প্রকাশকেও জাননন করি নাই,
তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,
আমাদের আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্ম-
প্রকাশ, তিনেরই মূল্যধার বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড।
এখন ব্রহ্মাণ্ড এই যে, কৃত্ত-ব্রহ্মাণ্ডের সার-
সর্বস্ব যেমন জীবাশ্মা বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের (অর্থাৎ
সর্বলগ্নভের) সারসর্বস্ব তেমন পরিমাণ।
অতএব এ কথা সত্য:সিদ্ধ যে, জীবাশ্মার
সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনেরই মূল্যধার
পরিমাণ।

এখানে বিশেষ একটা দৃষ্টব্য এই যে, আমি যখন আমার সমুখে একটা বৃক্ষ দেখিতেছি, তখন আমি যেমন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমার চিত্তের বলে আমি তাহা দেখিতেছি—তেমনি, আমি যখন আমার আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি, তখন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমি আমার চিত্তের বলে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা আত্মাকেই উপলব্ধি করি, আর বহির্বস্তুকেই উপলব্ধি করি সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা যে বস্তুকেই যখনই উপলব্ধি করি, তাহা ঐশ্বরিক শক্তির বলেই উপলব্ধি করি, নিশ্চয় বলে নহে। পুনশ্চ, ঐশ্বরিক শক্তির বলে বাহ্যিকিছু আমরা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহা জাগ্রত-জীবন্ত-ভাবে উপলব্ধি করি; পক্ষান্তরে, চিত্তাবারা বাহ্যিকিছু উপলব্ধি করি, তাহা সেট মূলগ্রন্থের এক-

প্রকার সংক্ষিপ্ত বহুবচন তাহাও আবার অনেক সময়ে প্রকৃত বহুবচন নহে—পরস্পর অপ্রত্যক্ষ। আত্মাকে যিনি যখন সাক্ষাৎ-জ্ঞানে জাগ্রত-জীবন্ত-ভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি তখন পরমাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের যোগে জীবাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ উপলব্ধি করেন। একমু সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধুকেবল চিত্তাবারা সত্তাবানীর নহে। চিত্তকে নিরোধ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিলে—কেন্দ্রমাত্র ঐশ্বর্যসাম্যেই তাহা সত্তাবানীর। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের তীক্ষ্ণ-লোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে—যেহেতু উভয়ের পরস্পরের সহিত পূজ্যপূজ্যরূপে ওতপ্রোত। এবারে এট পর্য্যন্তই বর্ণিত—বারান্তরে বৃহৎ-সম্রাজ্যের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইবে।

ত্ৰিবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ষ ।*

ত্রিবিক্রম-মহারাজের রাজ্যাভিষুখে ।

এখন সন্ধ্যা। এই সময়ে সূর্য্যাস্তের পরেই স্নিগ্ধ প্রশান্তি ও মধুর নৈশতা কোথা হইতে যেন সহসা আবিস্কৃত হয়। কিংবালেয় জন্ত এই ক্ষুদ্র অনাদৃত পল্লবটা-গ্রামে আমি বিশ্রাম করিতেছি। এইখানেই আজ রাত্রি-দাপন করিতে হইবে।

এই নিবাসনসময়ে, এই তরুতলে, এই নিশ্চিন্ততার মধ্যে, আমি আজ সর্বপ্রথম বাস্তবিকই দূরদেশে আসিয়াছি বলিয়া অনুভব করিতেছি।

আমি ফ্রান্স হইতে ডাক-আলোকে করিয়া, হরিৎ-শ্রামল আলোকে সিংহলদীপে

প্রথম উপনীত হই। সেইখানে সম্প্রদায়-
ধাক্কিয়া, পরে উপকূলগামী ককটা ভবন্ত
আহায়ে উঠিয়া, গুঁতরায়ে মানার-উপদাগর
পায় হইয়াছি। সেইখানকার সমুদ্র যেন
অট্টোহর টগবগু করিয়া ছুটিতেছে।
তাহার পর, সমস্তদিন শকটে আরোহণ
করিয়া, খুব শীঘ্র এই গ্রামে আসিয়া পৌছি-
য়াছি। জিবছুরাধিপতি আমার তদারধানের
জন্ত একটি লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি
আমার জন্ত, সুনিবিড় তরুণজলের ছায়াতলে
একটি ছোট শাদা বাড়ী ঠিক করিয়া
রাখিয়াছেন—সেইখানে আমাকে লইয়া
গেলেন।

আগামী কলা গরুর গাড়ি করিয়া
জিবছুরাছোৱা অধিকারভুক্ত একটি প্রদেশে
উপনীত হইব। সেইখান হইতে আমার
যাত্রা আরম্ভ হইবে। মোকে এই প্রদেশটিকে
“খয়রাৎ-মহল”ও বলিয়া থাকে। আমার
এই প্রদেশটিকে সুখশান্তির আশ্রম বলিয়া
মনে হয়। বর্তমানশতাব্দীতলভ বিলাস-
বিতরের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই ;
--পার্ব্বর্তী প্রদেশসমূহ হইতে একেবারে
বিজিন্ন, লোকবিরল, ভাল নারিকেল প্রভৃতি
তরুণশেফের ছায়াতলে অবস্থিত।

রাজি হইয়া আসিতেছে ; গ্রীষ্মকালের
অতি সুন্দর রাজি, কিন্তু চন্দ্রহীন। সেই
লোকটি ব্রাহ্মণমন্দিরের দীপালোক দেখাই-
বার জন্ত আমাকে শকটে করিয়া লইয়া
গেল। এই মন্দিরটি “তুণবলী”-নামক
পার্ব্বর্তী নগরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের
মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা সঙ্গোপক। বৃহৎ।

শকটের বাহিনীর : ১৩ জন। ১৩ জন। ১৩ জন।

নেত্র আমায় রক্তময় তরুণজলের মধ্য
দ্বিগুণ চেনিয়াছি ; আনন্দক মস্তকোপরি
ভ্রামল পরবর্তাল প্রসারিত ; সেই সকল তরুণের
শাখাপ্রশাখা হঠাৎ শিকড় বিস্তৃত হইয়া
আমার ভাষাদের মতিত খেঁচ মিলিবার চেষ্টা
করিতেছে। ভ্রামিত শিকড়গুলি সুদীর্ঘ
কেশভুজের দ্বারা প্রতীক্ৰমণ হইতেছে।
পদপুঞ্জের উপরে, পদ্যের কঁকে-কঁকে
অকালের অমৃত ভাণ্ডা, এবং নিম্নতলে—
এমন কি, “তুণবলী” উপরেও—অসংখ্য
চোনাংকি ভিকিমিকু করিতেছে। গ্রীষ্ম-
প্রধান দেশ, প্রতি সন্ধ্যায়, আত্মসবায়ির
দুলিঙ্গবৎ এত কীটগুলি অগিতে থাকে।
ভাণ্ডা ও জোনাংকির দুলিঙ্গজ্যোতি একরূপ
পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, উহার
মধ্যে কোনটি জ্যোতিংক ও কোনটি জ্যোতিং-
রিচণ, ভাণ্ডা নিরূপণ করা হ্রস্ব।

সিংহলের অবদাসজনক অস্ত্রবায়ু ভাগ
করিয়া, এইখানে আবার বাহ্যিক তরু-
বায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের
গ্রীষ্মকালীন সুন্দর রাজির মত, এখানে
আবার সেইরূপ সুখদ অনিল, নিখাসের
সহিত গ্রহণ করিতেছি এবং ফ্রান্সের
ফ্রান্সের পলীগ্রামে যেকোন গুনা ধীর, এখানেও
সেইরূপ ঐক্যীয়সঙ্গীত চারিদিক হইতে
গুণিতেছি। কিন্তু এই সকল পথে যে
পথিকলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে,
তাহারা আমাদের চক্ষে অদৃষ্ট ; --এই সকল
স্বাভাবিক পথিকেরা নিঃশব্দে খালি-পায়ে
চলিয়াছে। তাহাদের ফকের উপর মল্লমলের
উদ্ভবীয়। মধ্যে-মধ্যে, দূর হইতে যখন
চক্-চোলের শব্দ অথবা শানাইবজ্রসমূহিত

আঙ্গিনারের কালাপ কনিতে পাঠ, তখন
 ঠিক বৃত্তিতে পারি, এটি পণ্ডিতের কোন
 বিভাগ; তখন ইহাকে ভারতবর্ষ বলি।
 ব্রাহ্মণের বেশ বলিয়া চিনিতে পারি; আর
 তখন বৃত্তিতে পারি, আমাদের বেশ হইতে
 এই দানটি কতটা দূর ।

তরুণিমিত্রের মধ্যে, ছোট ছোট দান
 বাবাভাণ্ডারী বাড়ী পণের ভাণ্ডারের মধ্যে
 দিতে শুরু করিয়াছে; যেখানে আমাদের
 বাটবার কথা, সেই “ভুলবন্দী”-নগরে উভয়ই
 মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। পণের
 উইধারে ভালজাতীর বৃক্ষশ্রেণী;—তরু
 বৃক্ষের উপর ভরু করিয়া আকাশে
 বেন কালো-কালো পাখা বিস্তার করিয়া আছে।
 এই ভরুপথটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে
 একটি ছায়াচিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। এই
 ছায়াচিত্রটি একই বিশেষ-ধরণের, অতীব
 নয়নাকর্ষক। ইহা একটি প্রকাণ্ড মন্দির।
 ভারতবর্ষে যে কখনো আসে নাই, সে-ও
 ইহাকে মন্দির বলিয়া চিনিতে পারে
 কেন না, চিত্র-প্রতিমূর্তি-আদি দেখিয়া,
 পূর্ন হইতেই উহাদের আকারসম্বন্ধে সন্-
 দেরই কিছু-না-কিছু অস্পষ্ট ধারণা থাকে।
 কিন্তু ঐদৃশ প্রকাণ্ড মন্দির সহ্য। নৈশগগনে
 সমুখিত দেখিব, ইহা কখন কখন বা
 প্রত্যাশা করি নাই। ইহা যেন রাসীকৃত
 দেবমূর্তির একটা প্রকাণ্ড মূৰ্; ইহার
 চূড়াদেশে বিকটাকার মূর্তিতে আকর্ণ।
 অসংখ্যাত্মকাদীশ প্রকাশপটের উপর এই
 ছায়াচিত্রের রূপবর্ণ-রেখাপাত হইয়াছে।

একটু পরেই আমাদের গাড়ি একটি
 প্রান্তরময় খিলানন গুপের মধ্যে দিয়া, সেকেনে-

দরণের পুরনার সহচরকৌণ স্তম্ভশ্রেণীর
 মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দিরের এই অস্ত্র-
 বস্ত্রী প্রদেশটি অতিক্রম করিয়া, আবার
 যখন আমাদের মনোকোণটি তারকা-মণি-
 খচিত গগনাবর প্রদারিত হইল, তখন
 দেখিলাম, একটা বিশুল ঘেরের সমুখে আসিয়া
 পড়িয়াছি। তাহার সীমা লঙ্ঘন করিবার
 আমাদের অধিকার নাই। সেই প্রকাণ্ড
 মন্দিরমূর্তি একবারে আমাদের সমুখে—
 খুব নিকটে। সেই বিসদৃশপরিমাপকৃত
 মহাতারাকান্ত প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়ার নিম্ন
 দিয়া একটি পথ গিয়াছে—তাহার মধ্যে
 আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু
 সেই প্রবেশপথের মূণটি এত বড় যে, দেখান
 হইতে অভাস্তরপ দেবমণ্ডপের মূদ্র পশ্চাত্তাপ
 পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই
 পবিত্র অককারের মধ্যে, মন্দিরমণ্ডপের
 দুই ধারে অসংখ্য রহস্তময় দীপাবলী-সারি-
 লারি সজ্জিত। সেইখান হইতে দেখিতে
 নিবেদন নাই; কিন্তু তাহাও বেশিক্ষণের জন্য
 কিংবা খুব নিকটে গিয়া দেখা নিষিদ্ধ।

এই প্রদূরপ্রদারিত প্রবেশপথের প্রত্যেক
 দিকে, মণ্ডলাকারে-বিভক্ত স্তম্ভশ্রেণীর নিম্নে,
 ছোট-ছোট মণ্ডালের আলোকে, দেবভাস্কর
 ব্যবহারের জন্য ফুণের দোকান, মালায়
 দোকান, মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে। এই
 মণ্ডালের আলোকে, দোকানদারদিগকে এক
 মন্দিরের প্রস্তরময় তলদেশটি বেশ দেখিতে
 পাওয়া যায়। সেই প্রস্তরে বিকটাকার
 বিবিধ মূর্তি, অমৃতাকার ঘাবলস্তর মূর্তি খোদিত,
 কিন্তু সেই মূর্তিগুলি অসংখ্য ও বিশুদ্ধমূর্তি। ঐ
 সজ্জিত দোকানদারেরাও দেবমূর্তিবৎ অচল।

উহারেই স্নান করিয়া ঐ সকল লাল পাখরের উপর ঠেস দিয়া বহিয়াছে ; নেত্রগুলি অঙ্গুলি করিতেছে ; এবং উহারেই রমণীমূলত সুবীৰ্ণ কক কেশজঙ্ঘ হকের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে। উপরে পামগুলির মাথায়, খিলান-মন্ডলের সমীপবর্তী স্থানে, অঙ্ককার একাধিপত্য করিতেছে।

সকলের সুদূর পশ্চাত্তাগ পর্যন্ত আমি অলক্ষিতভাবে এখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি। অকৃত্রিম সারি-সারি বস্ত্র অঙ্গুলি-রূপে উপলব্ধি হইতেছে। কৌণপ্রভ দীপাবলা যনযোর অঙ্ককারের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। সুদূর প্রান্তে শুভ্রবসন মন্থবাস্ত্রিকল বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতেছে। এবং ঐ স্থানটি স্তম্ভিপাঠে ও পানকীর্তনে মুহমূহ অহরণিত হইতেছে।

যে নিবিড় দ্বার দিয়া আমি লুকাইয়া দেখিতেছি, তাহার গঠন অতি অপূর্ণ; একেবারেই ব্যস্তবিশ্ভার অপরিজ্ঞাত। দ্বারের একেটোটি খুব বড়। কিন্তু এতদূশ প্রকাণ্ড গগনম্পর্শী চূড়ার তুলনায়, মন্দিরের দ্বারটি বড়ই নাই, এমন কি, শুভ্রপথ বলিয়াও মনে হইতে পারে; মনে হয়, উহা যেন সুরঙ্গপথের দ্বার—রহস্যরাহোর প্রবেশপথ!

আমি জীবনের মধ্যে এই সঙ্গপ্রথম ব্রাহ্মণ বিপের একটি মন্দির দেখিবার আমার মনে হইল, আমি এমন একটা-কিছু দেখিলাম, বাহা পৌত্তলিকতার বিবাদ-অঙ্ককারে আচ্ছন্ন;—ভীষণ বৈরতাবাপন্ন লোকের বস্ত্রাশ্রয়। আমি এইরূপ দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই; আর ইহাও ভাবি নাই, মন্দিরে আমার প্রবেশনিষেধ হইবে। আমি কতকটা

আশা করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে গিয়া, মহাপুরুষপুণ্যগণ-অবলম্বিত ধর্মের অন্তর্গলে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোলোক প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এখন আমার সেই চিরপোষিত আশা অতীব স্তম্ভগর্ভ ও নিতান্ত “হেণেম্যান্‌বি” বলিয়া মনে হইতেছে।

আহা! বৃষ্টধর্মের মধ্যে কেমন একটি মন-ভুলানিয়া মধুময় শাস্তির তাব বিরাজিত—সেই ধর্ম, বাহ্যর দ্বার সকলেরই নিকট অবস্থিত এবং বাহ্য প্রকাহান ব্যক্তিদ্বিগেরও হিতসাধনে সতত নিযুক্ত।...

এখন আমাকে সকলে এইরূপ আশাস দিতেছে, ভারতবর্ষের অস্ত প্রবেশে, দেবালয়ের মধ্যে এতটা ব্রাহ্মণ কঠোরতা লক্ষিত হইবে না, এমন কি সেখানকার দেবালয়ে হরতো আমি গবেশ করিতেও অশ্রমমতি পাইব। বাহ্য হউক, এইবার এখান হইতে সরিয়া পড়া ভাল—বোম্বাই-পাকটা সুবুদ্ধির কার্য নহে। কিন্তু যদি ইচ্ছা করি, গাড়িতে থাকিয়া আন্তঃ-মাথে এই বৃহৎ মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে পারি—তাহাতে কোন বাধা নাই।

মন্দিরের বেরটা সমতলভোগ্য—এত বৃহৎ যে, ইহার মধ্যে একটা নগরের সমাবেশ হইতে পারে। ইহার চতুঃসীমার মধ্যেস্থল হইতে একটি প্রকাণ্ড তুণ সমুৎপত্ত—উহার নিম্নদেশে একটি দ্বার ফুটানো আছে। এই সকল মুক প্রাচীর, বাহার দ্বার দ্বারা আনন্দা নিম্নস্থ অঙ্ককারের মধ্যে চলিয়াছি,—উহা ভূগপ্রাচীরের দ্বার কঠোরভাবে বাড়া হইয়া আছে। যে বিজন পথটি আমার অগ্রসরণ করিতেছি, উহা সেই পথের গতিরূপে সামিল, বাহার মধ্যে নীচোতায লোকের

প্রবেশ নিষিদ্ধ। এইখানে আর-একপ্রকার প্রকাণ্ড তৃণের-পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—উহা দৈবক্রমে ঐতলে আটকাইয়া পড়িয়াছে। উহাও দেখিতে দেবমন্দিরের জায়,—কতকগুলি বিরাট চাকার উপর স্থাপিত; পূর্ব-উৎসবের দিনে দেবতাদেবগকে হাওয়া-বাওয়াইবার জন্য সহস্র-সহস্র গোক এই রথগুলিকে টানিয়া লইয়া যাহ; রথের চাকা বদিয়া গিয়াছে, তাই আর রাতে দেবতারা নর্ত্যদিয়েই জার এইখানেই নিরা থাইতেন।

আমাদের হই খারে সারি-সারি তাল-দাতার উচ্চবৃক্ষ—উহাদের কালো-কালো পাতা হুঁকিয়া রহিয়াছে; যে সময়ে আমরা এই তরুবাধির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম, সেই সময়ে ভক্তির প্রচণ্ড উত্তর উন্নয়ন চারিদিকে উজ্জ্বলিত হইতেছিল,—সেই সময় ধর্মের কতকগুলি বিশেষ বহুমানের উন্মেষ চলিতেছিল। এই প্রশান্ত স্বপ্নের রাতিতে, গহবর-গভীর ঢাকের শব্দ, ভূরার পেশাটিক নিনাদ আমাদের পশ্চাতে শুনা যাইতেছে; সে একজন বিকট শব্দ যে, শুনিয়া সর্বাঙ্গ বিহরিয়া উঠে।

এখনো আমরা পলকটাপ্রায়ে। মশক-পতঙ্গাদি তাড়াইবার জন্য তাড়ম্বর্ত্ত কতাগণ সমস্ত রাত বড়-বড় হাতপাখার অধিকে বাতাস করিয়াছে।

এক্ষণে এই বহুপুরাতন মৌর্যবংশ কুহর বাড়ীর মধ্যে অন্তর্গত প্রবেশ করিয়াছে। সাতমহী উত্তর প্রভার গৃহটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যের দীপ্যমান নক্ষত্রের মধ্যে আমি ভাগ্যত হইলাম।

শিখরিস্তম্ভ বারত্ৰাটি এখনো বেশ

ঠাণ্ডা। এটি স্বল্পর বসিবার স্থান। বারত্ৰাটি মৌর্যগলেণে তুষারগুহ। উহার মোটা-মোটা খাটো-খাটো অঙ্গমান (মনিজাকৃত) ধামগুলি চারিদিক-জতার ঘেরা।

চতুর্দিকে মাঠ-ময়দান, গ্রামা নিম্নভতা, বিহল প্রাচীনিক শাস্তি। যদিও অত্র প্রকৃতিস্বন্দরী একটু তাপদত্তা, পরন্তু প্রভাবে শুকতানিবন্ধন একটু অবসাদক্ৰিষ্টা, তথাপি এখানকার আলোকবশি দক্ষিণ-ফ্রান্সের স্বন্দরতম প্ৰভাতকিরণের জায় দিয়া প্রশান্ত। এখানে বড়-বড় তালভাতীর বৃক্ষ নাই; অথবা সিংহলের জায় উদ্যম উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য নাই। অশ্বকেন্দ্রীয় অরণ্যের জায় এখানকার বৃক্ষগুলি অনতি-উচ্চ ও বিহলপন্নব। দ্বিত্ততম মাঠ-ময়দান, কলের বাগান, ছাঁটা-ঘাসের উপর অধিত পরিকার-পরিষ্কর পায়ে-চলা পথ, দূরে বৃক্ষশাখার মধ্য চটতে পরিপূর্ণমান চুনাকামকরা ছোট-ছোট প্রাচীর, সুখাদবল ছোট-ছোট বাড়ী—এই সকল আমি অবলোকন করিতেছি। এবং আমার শৈশবেই স্বপ্নচিত্রিত দৃশ্যগুলি আমার আগার চতুর্দিকে দেখিতে বিস্তৃত হইতেছি।

যে চড়াইপাখী আমাদের গৃহভাণ্ডে নীড় নিগ্ৰহণ করে, সেই নিগ্ৰহ প্রায়া পাখীওলা এখানেও আছে দেখিতেছি। কেবল এতমাত্র প্রভেদ, ভাটীর ভীষণতম মাজেইই মস্তবের উপর প্রকণ অগাধ বিধান; উহারেরও তক্ষণ;—মাথার নিম্নটে গেলে উড়াই পলায় না।

আমি দেখিতে পাউতেছি, বঙ্গদেশসমুদ্র-জনিত বিষয় যেন আমার চতুর্দিকে হানে হানে

এদেশে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই পূর্ণ শতাব্দীর
সময়, আমাদের গ্রীষ্মকালের শোভাসৌন্দর্য
এখানে সন্তোষগ্ৰস্ত করিতেছি।...

আমি যে ভারতবর্ষে আছি, এই জ্ঞানটি
আমার অন্তরের অন্তর্ভুক্ত জাগতিক থাকিলেও,
যখন আমি এখানকার কোন অনাদৃত জন-
বিরল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন
একপ্রকার মধুর শিখরসহকারে, অনুভূতি-
সম্বন্ধীয় বিবিধ বিভ্রমের চাপে আপনাকে
ছাড়িয়া দিই।

এই সকল ছোট-ছোট শালা প্রাচীর,
চামেলি-লতা, হলদে-রং-ধরা ঘাস, সরৎকজ-
জ্বলত বিচিত্র রং—এই সব বসনকে
অরণ হইয়া, মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন
সেই Aunis,—সেই La Saintonge-র
মাত-ময়দান, আঙুর পাকিবার সময়ে, সেই
কনকোজ্জল-কতুকাপীন Meron-দীপের সেই
শান্তিময় বাড়িগুলি, আমার মনে পড়ে।

কিন্তু আবার, মধ্যে মধ্যে অনেক ছোটো-
খাটো জিনিষ পদমধ্যে উপস্থিত হইয়া
অর্থাৎ এই শব্দের ব্যাঘাত করে। ঐ দেখ,
ছরবৎসরব্যবস্থা একটী ছোট খালিকা, আমাকে
একটা সংবাদ দিবার জন্য, নিম্নগায় হইতে
প্রেরিত হইয়া এইখানে আসিয়াছে। ইহার
কালো রক্তময় চোখগুলি দীর্ঘায়ত; ইহার
নাক ফুঁড়িয়া চুনি-বসানো একটি সোনার
স্নাক্‌ফি আছে; চুনিগুলি বেধিতে
শোণিতবিন্দুর স্রাব।

দূরে, আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন শান্তিময়
শ্রান্তিকৃত দৃশ্যটিকে উদ্বেজিত করিয়া কি-
একটা অদ্ভুত জিনিষ গাভের মধ্য হইতে
বাহির হইয়াছে;—ত্রাণদিক দেবাক্ষরের

একটি কোণ,—দেবতা ও প্রাকৃতিক মন্দির
একটি কোণ। মন্দিরটি বহুদেবের-
গাছপালায় ঢাকা পড়িয়াছে।

তরুণের ভারসাম্যে, মধ্যাহ্নের সূর্য
আমাদের এই শালা বাড়িটির উপর ব্যস্তবিকই
একটু অতিরিক্ত-পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ
বর্ষণ করিতেছে।

ছোট-ছোট ফলবাগানের উপর,
অবসাদ-স্ত্রিময় তৃণভূমির উপর আলো
পড়িয়াছে—খুব উজ্জল আলো পড়িয়াছে।
আমাদের সেপ্টেম্বরমাসের দীপ্ততম মধ্যাহ্নও
এখানে হার মানে।

চারিদিকই নিস্তব্ধ। মেঠো-মাঠের
পথে আর কোন গণিক নাই। বড়-বড়
হাতপাখাগুলি এখন ঘুমাইতেছে; যে সকল
ভারতীয় তৃতা ঐ সকল পাখা বাজান
করিয়া থাকে, তাহারাও ঘুমাইতেছে। সব
চুপচাপ। কোথাও টুংক নাই। কেবল
কতকগুলি দাঁড়কাক—দাঁড়াদের দ্বিধানিত্রা
নিষিদ্ধ—তাহারাষ্ট আমার কান্দ্রায় প্রবেশ
করিয়া আমার চারিদিকে কা-কা-শব্দ করি-
তেছে। এত সকল নিষ্পন্দ পরার্থের মধ্যে,
উহাদের নানুনি-চালের পদশব্দ এবং উড়িবার
পক্ষসঞ্চালনশব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা
যায় না।...

হঠাৎ মনে পড়িল—খুইলোয়াংসবের
দিন আসন্ন; অর্থাৎ এখানকার এই চিরনির্মল
আকাশ—চিরগ্রীষ্মকতু আমাদের কল্পনার
উপর যেন ঘনঘোর বিবাদ চালিয়া দিল।

এইবার একে-একে আমার যাত্রার গাড়ি-
গুলি আসিয়া পৌছিল। এখান হইতে
ত্রিষকুরে যাইতে আর দুইদিন লাগিবে।

সেইখানে হাইবার এক আমাণ মন উৎসুক
হইয়া উঠিয়াছে। এট দেশীয় শকুন্তলি
মুদীর্ঘ “ককিনে”র (শবাব্দার জায় পিচন
দিক্ দিয়া উগাতে চুটিতে হয়; এবং পয়টন-
কালে বাধা হইয়া উহার মধ্যে চইয়া
দাকিতে হয়। উহাদের বৃষবাহনের) চুলক-
চালে নাচিতে নাচিতে চলে। আমার

পাড়ির বৃষদগল শোনা; উহাদের শিং নীলবর্ণে
বিশ্রুত। উহাদের গাড়ির চুড়ট কপিল
বর্ণের; এবং উহাদের শিং তাবা দিয়া
বাধােনো।

এখনও হুগা অস্ত্র বার নাই। উত্তরাংশে
আমাদের চারিটি মিরাহ শান্ত অলস বৃষ-
চণকৃষির উপর সটান উঠিয়া পড়িয়াছে।

ত্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

“বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের পরিশিষ্ট । *

“বদেশী সমাজ” শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি
প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্কন্ড ব্রহ্মদেব পাঠ
করি, † তৎসম্বন্ধে আমার প্রকের স্তম্ভ
ত্রিভুজ বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি
পত্র উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত-
কোতূহলনিবৃত্তির জন্য এ প্রবন্ধগুলি তিনি
আমার কাছে পাঠান নাই, কিন্তু সমাজনিষ্ঠ
ব্যক্তিমাজেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয়
উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি
আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক-
রূতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু প্রমোত্তরের মত লিখিতে গৈলে
লেখা নিত্যন্তই আদালতের সওয়াল-জবাবের
মত হইয়া পড়ায়। সেজন্য ঋণপাড়া লেখার

* ইহা ইতিপূর্বে বঙ্গবাণীতে বাহির হইয়া গেছে। কিন্তু “বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের সচিব এট প্রবন্ধের বসিষ্ট
সম্পর্ক। সেজন্য অনেকের আগ্রহে ও অনুরোধে এবং ইহার ব্যয়বসম্বন্ধে উক্ত “বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের
পরিশিষ্টরূপে ইহা বঙ্গবর্ধনে প্রকাশিত হইল।—(সহঃ সঃ)

† গত ১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মিনার্ভাব্রহ্মদেব চৈতন্যলাইবেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রবন্ধটি প্রথম পাঠিত হইয়াছিল।
তাহার পর পরিবর্তিত আকারে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার কর্কন্ড ব্রহ্মদেব তাহার বঙ্গবর্ধন হইতে পুনঃপাঠিত হয়।

উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আশ্রয়কার
জন্ত দেখানে উদ্যম প্রয়োগ বুঝ। যুরোপের
১। শক্তির ভাঙার টেট্ট অর্থাতঃ সরকার। সেই
টেট্ট বৈদেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভাঙ
• গ্রহণ করিয়াছে;—টেট্টই ডিক্কাবান করে,
টেট্টই বিদ্যাদান করে, ধর্মরক্ষার ভাঙও
টেট্টের উপর। অতএব এই টেট্টের শাসনকে
সর্বপ্রকারে মবল, কখিও ও লচেতন করিয়া
রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও
বাহিরের আক্রমণ হইতে বাচানোই
যুরোপের সভ্যতার প্রায়রক্ষার উপায়।

✓ আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের
মধ্যে। তাহা ধ্বংস্রূপে আমাদের সমাজের
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেটজন্তই এত-
কাল ধর্মকে, সমাজকে বাচানোই ভারতবর্ষ
একমাত্র আশ্রয়কার উপায় বলিয়া জানিয়া
আনিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই,
সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য
সমাজের স্বাধীনতাই বর্ধিতভাবে ভারতবর্ষের
স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল কংস্বার স্বাধীনতাই
স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্জিপাকও এই স্বাধী-
নতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা
অচেতনভাবে, মুঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতী-
দিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরাজ আমাদের
রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে—
সমাজটাকে নিতান্ত উপরিপাওনার মত
- গুইতেছে—“কাউ” বলিয়া ইহা আমরা
তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখ। ইংরাজের
আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার গইয়াছে।
হয় ত বর্ধিতভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই

বুঝিয়া বুঝি থাকিলে চলিবে না। পূর্বেকালে
সমাজবিশ্রোহী সমাজের কার্যে দণ্ড পাইয়া
অবশেষে সমাজের সঙ্গে রক্ষা করিত। সেই
রক্ষা অল্পবারে আপোষে নিশ্চিন্ত হইয়া বাইত।
তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো
প্রকার ব্যত্যয় বাহারা করিত, তাহারা
স্বতন্ত্রসম্প্রদায়রূপে সমাজের বিশেষ একটা
স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন
না, হিন্দুসমাজে আচ্যারবিচারের কোন পার্থক্য
নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই
পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার ভুলে গণ্ডীবদ্ধ
হইয়া পরম্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই।
কোনো অংশে কোনো দল পৃথক্ হইতে
গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন
হইতে হয়। পূর্বে একদল ছিন্ন হওয়া একটা
বিভাবিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন
সমাজ একদল মবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ
করিয়া টিকিয়া থাকা সহজ ছিল না।
সুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন
করিত, সে উকৃতভাবে ব্যাহির হইয়া বাইত
না। সমাজও নিজের শক্তিসম্বন্ধে নিঃসং-
শয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঐদারী প্রকাশ
করিয়া পৃথক্পদ্বাবলম্বীকে বণাবোম্যভাবে
নিজের অঙ্গীভূত করিয়া গইত।

এখন যে দল একটু পৃথক্ হয়, তাহাকে
তাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরাজের আইন
কোনটা হিন্দু, কোনটা অহিন্দু, তাহা বিচার
করিবার ভার লইয়াছে—রক্ষা করিবার ভার
ইংরাজের হাতে নাই; সমাজের হাতেও নাই।
তাহার কারণ, পৃথক্ হওয়ার দরুন কাহারো
কোনো কতিবৃত্তি নাই—ইংরাজরচিত স্বতন্ত্র

আইনের আশ্রয়ে কাহারো 'কছুতে বিশেষ বাধ্যতা ঘটে না। অতএব এমন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আত্মকলপিত বধন চৌলস। উঠিতে থাকে, তখন বেধনার অস্তির করে। কিং বধন সে উঠিয়া পড়ে, তখন শরীর তাহাকে গ্রস্তভাবে রক্ষা করে। যদি দীত উঠিবার কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া দীতগুলিকে বিসজ্জন দেওয়াই শরীর সাধ্যাত্ত করে, তবে বুঝি, তাহার অবস্থা ভাল নহে, বুঝি, তাহার শক্তি-হীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যাসকে প্রচলিত করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জন করিতে নিরুপায়ভাবে ব্যথা হওয়া সমাজের সমীচীতার লক্ষণ নহে। এবং, এই বর্জন করিবার অস্ত্র ইংরাজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

বেথানেই সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডিতক আপনার বাহিরে কেলিতেছে, সেখানে কেবল নিজেকে ছোট করিতেছে, তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ বতাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তর্ষীর বেঠনের মধ্যে পড়িবে। কেবলি ষোড়শীহতে থাকিবে, এই যদি আমাদের অবস্থা হয়, তবে নিশ্চয় হুঁচকিত্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবহার্য করিয়া সমস্ত দক্ষা করি-

তাহি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

তুখু এট নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রবাহকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া, আমরা ইংরাজের আইনকে বাটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারো ভ্রূগোচর নাই। বেধিন কোনো পরিবারে সম্মানদিগকে চাণ্ডীয়া করিবার অস্ত্র পুলিসমান্ ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই জের।

মুগলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খৃষ্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতরে উপর বস্তার মত থাকিয়া দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমতাটা ছিল না। যদি থাকিত, তবে তাহার হিন্দুসমাজের সহিত এই সকল পর-সমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন—এমন ভাবে করিতেন, যাতে পরস্পরের মধ্যে নিরন্ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথার কথার তির তির পক্ষে বন্দ বাধিয়া উঠিতেছে, এই বন্দ—অশান্তি, অব্যবস্থা ও দুর্বলতার কারণ।

বেথানে স্পষ্ট বন্দ বাধিতেছে না, সেখানে ভিতরে ভিতরে অশান্তিভাবে সমাজ বিকলিত হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়প্রাপ্ত ও শাধাশয় রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পয়ের পক্ষে আপনার সীমানানির্ব্বরণকে কোনো কর্তৃক প্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নির্ব্বরণের প্রতিও তাহার কর্তৃক আগ্রহ নাই। বাধা আপনি হইতেছে, তাহাই হইতেছে;—যখন বাপাশরটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে, তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া

বিলাপ করিয়া উঠিতেছে । কিন্তু আর পর্যন্ত বিলাপে কেহ বক্তাকে ঠেকাঠেতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাতঃ বিলাপ নহে ।

বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী সভ্যতা আমাদের বনকে, আমাদের বৃদ্ধকে যদি অভিজ্ঞত করিয়া না ফেলিত, তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বলিত না ।

শুভ্রতর রোগে যখন রাগীর মস্তিষ্ক বিকল হয়, তখন ডাক্তার তর পার ৬ তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাহা মণ্ডকই করিয়া থাকে—সে যখন অভিজ্ঞত হইয়া পড়ে, তখন বৈজ্ঞানিক ঔষধ তাহার সঙ্গপ্রধান সহায় হইতে বলিত হয় ।

প্রবল ও বিচৈত্রশক্তিশালী যুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের বনকে অভিজ্ঞত করিয়াছে । সেই মনই সমাজের মণ্ডক ; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনায় স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া ?

এইরূপে বিদেশীশিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিতলোক জনসমনকে অভিজ্ঞত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা গ্রহসনে পরিহাস করে । কিন্তু শাস্ত্র-ভাষে কেন বিচার করে না যে,—কেন এমনটা ঘটতেছে ?

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সজ্জিত থাকে, তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে । নিমিত্ত অবস্থায় বদিকশি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায় ।

বিলাতিসভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে

তুলনা করিলাম বলিয়া মাত্ৰনা প্রাথনা করি । বস্থানে সকল জিনিষই ভাল, আমাদের পতিত ভাল জিনিষও জ্ঞানাল । চোখের কামল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে । আমার উপহার ইহাষ্ট কৈফিয়ৎ ।

বাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সন্তোষ-সজ্জিত থাকিত, তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিকল করিয়া দিতে পারিত না ।

হুর্ভাগ্যক্রমে ঈংরাজ যখন তাহার কলকল, তাহার বিজ্ঞানদর্শন লব্ধি আমাদের ধারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল । যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্তা তখন ক্ষান্ত ছিল । আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পৃথি রোত্তে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম । আমরা কিছুই করিতেছিলাম না । আমাদের গৌরবের দিন বহুদূর পশ্চাতে দিগন্তরেখার ছায়ার মত দেখা গাইতেছিল । সমুদ্রের গুফারিণীর পাড়িও সেই পরভ্রমালার চেরে বৃহৎরূপে, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয় ।

বাহা হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট-নির্জিত, সেই সময়ে একটা সচেষ্ট-শক্তি, গুরু ঈশ্বরের সঙ্ঘে আমাদের মেধাগমের জ্ঞাত তাহার বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবির্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্‌দগিগত বেঠন করিয়া দেখা দিল । ইহাতে অভিজ্ঞত করিবে না কেন ।

আমাদের পাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সঙ্গতোভাবে জাগ্রত করা । আমরা যে আমাদের পুণ্ড্রপুত্রের সম্পত্তি বিস্মা-বিস্মা হুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের

গৌরব নহে ; আমরা সেই ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই এখন সমাজের সর্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব, তবনি নিজে প্রীতি স্বার্থ লক্ষ্য সত্য হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে ।

আমাদের এই নিজের নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন বলিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি । তাহার কারণ ভীকতা । আমাদের বাহ্য-কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে সুকিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী-সত্যতার আঘাতে আমাদের অভিব্যক্ত হইবার কারণ ।

কিন্তু প্রথমে বাহ্য-আমাদিগকে অভিব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাই আমাদিগকে ভাগ্যত করিতেছে । প্রথম স্পৃহিত্তে যে প্রথম আলোক চোখে ধোঁয়া লাগিয়া দেখ, তাহাই ক্রমশ আমাদের চৃষ্টিশক্তির সত্যতা করে । এখন আমরা সভাগভাবে, সম্মানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে রক্ষণভাবে, প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি ।

এখন এই আদর্শকে কি করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপন্থাহনশ্রমে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে । যেমন আছি, ঠিক তেমনি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন হুর্গতি ঘটত না ।

আমি যে ভাবার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মংলব মনে মনে আঁটিয়াছি, বঙ্গবাসীর কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অশুভব

করিয়াছেন । আমার স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবার বতব্বর গতাব অনাগ্রা, আশা করি, অল্প দিনজনের ততদূর না থাকিতে পরিত্র আমার এই স্বপ্নহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে ? প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিবা ! যদি একই মংলবই আমার থাকিবে, তবে আমার স্বপ্নের প্রতিবাদেই বা চেষ্টা কেন ? কোনো বলক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পটির মংলব আছে নাকি করিয়া-কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে ?

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে একাকার্যপন করে, এ কথা অর্থ-ইহা হইতেই পারে না, ভারতবর্ষ ভীমশ্রোণী বুলিয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম, সমতল করিয়া দেয় । বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে ধ্বংস করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে, ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্ম-সার্থকতা বলিয়া জানে । এই বিচিত্র্যকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার্য করা নহে, পরকে পরস্পরের অধিকার দ্রুপ্ত-রূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, এ কথা-ই আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে ? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে একাকার্যপন করিতে, পরকে আপন করিতে, লা পারি—আমরাও যদি পদশব্দটি ভবিষ্যতে, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই আমরা ইহা-ইহা লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে সুকি, পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্য আদর্শদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই গীত্যাঁড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ বিদ্য-

হীরামুকুর পদরা সামুলাও—দখ্যার সাড়া তোমার প্রাচীন ভিত্তির ‘পরে সিংহলৈর
পাওরা গেছে এতঃ তুমি যখন অসাড়-অচেতন সিংহকাটি একমুহুর্ত বিপ্রায় করিতেছে
হইয়া যায় কুড়িয়া পড়িয়া আছে, তখন না।

শিবাজি-উৎসব।



কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি আনি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরুণোর অন্ধকারে বসে’—
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভারনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নাহি’—
“একধন্দ্ররাজ্যপালে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বঁধে দিব আমি!”

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত আগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই জাহার প্রাণে
কৃত শঙ্খনাদ!
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্মল
‘অমল উত্তরা’
ভক্তাতুর সঙ্ঘাকালে শত পল্লীসন্ধানের দল
ছিল বকে করি’।

৩

তার পরে একদিন মারাঠার প্রাক্তর হইতে
তব বঙ্গশিখা
আঁকি মিলি রিগ্মিগন্তে বৃগবৃগান্তের বিচ্যাম্বব্রিতে
মহামন্ত্রশিখা।

মোগল-উকীষদীর্ঘ প্রফুল্লিত প্রলয়প্রদোষে

পকপত্র যথা,—

সেদিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বহুনির্বোধে

কি ছিল ব্যভাতি !

৪

ভার পরে শূন্য হ'ল স্বপ্নাস্কন্ধ নিবিড় নিশীথে

দিল্লিরাজশালা,—

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাস্ত্রিগ মিশিতে

"দীপালোকমালা !

শব্দলুপ্ত গৃধ্রদের উর্জ্বর বীভৎস চীৎকারে

মোগলমহিমা

রাগে অশানশয্যা,—মুষ্টিঘের ভস্মরেখাকারে

হ'ল তার সীমা !

৫

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে

নিঃশব্দ-চরণ

আনিল বণিকলক্ষী অরঙ্গপথের অন্ধকারে

রাজসিংহাসন !

বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোপকৈ অভিবিক্ত করি'

নিল চূপে চূপে ;

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শব্দরা,

রাজমণ্ডলপে !

৬

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি !

কোথা তব নাম !

"গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলার হ'ল মাটি—

তুচ্ছ পরিণাম !

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দ্বারা বলি' করে পরিহাস

অট্টহাস্তরবে,—

তব পূণ্যচেষ্টা যত ভররের নিফল প্রদাস—

এই জ্বীনে সবে !

৭

অঁর ইতিবৃত্তকথা, কান্ড কর মুখর ভাষণ !

ওগো বিদ্যামহি,

তোমার লিখন-পরে বিদ্যাত্তি অবার লিখন

হবে আদি অন্তী !

যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে

তব বাস্তবায়ী ?

যে তপস্বী সত্য জারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে,

নিষ্ঠর সে জানি ! •

৮

হে রাজতপসি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা

বিধিত্ত ভাঙারে

দক্ষিত হইয়া পৌছে, কাল কত তার এক কণা

পারে হরিবারে ?

তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশস্বায়ী পূজাঘরে,

সে সত্যসাধন

কে জানিত হৃদে গেছে চির-বুদ্বুগাতর-তরে

ভারতের ধন !

৯

অখাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হুহু রামবৈরাগি,

গিরিদরীতলে,

—বর্ষার নিকর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি'

পরিপূর্ণ বলে—

দেইমতে বাহিরিলে,—বিষলোক ভাবিল বিষয়ে,

'বাহার পতাকা

অধর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে

কোথা ছিল ঢাকা !'

১০

দেইমত ভাবিতেছি' আমি কবি এ পূর্বভারতে—

কি অপূর্ণ হেরি !

বঙ্গের অঙ্গনঘারে কেমনে ধুলিল কোথা হৃতে

তব অস্তিত্ব ?

তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিষ বিদারি'
 প্রতাপ তোমার
 এ প্রাণীদিগকে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি'
 উদিলু আবার ?

১১

মরে না মরে না কত সত্য বাহা, শত শতাব্দীর
 বিশ্বস্তির তলে,
 নাহি মরে উপেক্ষার, অপমানে না হয় অস্তির,
 . আঘাতে না টলে !
 যারে ভেবেছিল সব কোন্ কালে হয়েছে নিঃশেষ
 কর্মপরপারে,
 এল সেই সত্য তব পূজা অতিথির ধরি' বেশ
 ভারতের ধারে !

১২

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
 'ভবিষ্যের পানে
 একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেখায় সে কি বৃক্ষ মহান
 হেরিছে কে জানে !
 অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি ন'য়ে
 আনিয়াছ আজ,
 ' তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
 সেই তব কাজ !

১৩

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্ত, * রণ-অঞ্চল,
 অস্ত্র ধরতর, —
 ' আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
 হয় হয় হয় !
 শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি',
 করিল আচ্ছাদন,
 মুহূর্তে ক্ষণদ্বন্দে তোমারেই বরিল, হে 'বামি,
 বাঙালীর প্রাণ !

১৪

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন লভ্যকাল ধরি'—

জানে নি স্বপনে

তোমার মত নাম বঙ্গ-যাত্রাটারে এক করি'

দিবে বিনা রণে ।

তোমার তপস্তাতেই দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান

আজি অত্যাৎ

মৃত্যুহীন-বাণীতপে আমি দিবে নূতন পরাণ,

নূতন প্রভাত !

১৫

যাত্রাটার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি, ধর্মরাজ,

ডেকেছিলে যবে,

রাজা বলে' আমি নাই, আমি নাই, পাই নাই লাজ

মে ভৈরব রবে !

তোমার রূপাণবীণি একদিন যবে চমকিলা

বঙ্গের আকাশে

মে ঘোর ভূরোগদিনে না বৃষ্টিরূপ দেই লীলা,

লুকাই তরাসে !

১৬

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিরাছ অমরমূর্তি, —

সমুন্নত তালে

যে রাজকিরীট শোভে লুকায়ে না তার দিবাজোতি

কতু কোনোকালে !

তোমাতে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন,

তুমি যৎসারাজ !

তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন

ধাঁড়াইবে আজ !

১৭

সেদিন তুমি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ

নিরুপাতি' লব !

কণ্ঠে কণ্ঠে বকে বকে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ

ধানমস্ত্রে তব !

পড়া করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী'বসন

দরিত্রের বল !

“একধর্মগ্রাণ্ড চবে এ ভারতে” এ মণাবচন

কবির সম্বল !

১৮

মারাগীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল

জয়ন্ত শিবাজি !

মাবাগীর সাথে আজি, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল

মহোৎসবে আজি !

আজি এক সভাভঙ্গে ভারতের পশ্চিম পুরব

দক্ষিণে ও বায়ে

একত্রে কবক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব

এক পুণানামে ।

নোকাডুবি ।

৪৪

সভাভঙ্গের পর অরবা হেমলিনাকে লইয়া
বন্ধন ঘরে ফিরিলেন, তখনো সন্ধ্যা হয় নাই ।
চা খাইতে বসিয়া অরবাবাবু কহিলেন, “আজ
বড় আনন্দলাভ করিয়াছি !” ইহার অধিক
আর তিনি কথা কহিলেন না ;—তাঁহার
মনের ভিতরের দিকে একটা ভাবের স্রোত
বহিতেছিল ।

আজ চা খাওয়ার পরেই হেমলিনী
আন্তে আন্তে উপরে চলিয়া গেল, অরবাবাবু
তাহা লক্ষ্য করিলেন না ।

আজ সভাভঙ্গে—নলিনাক—যিনি বক্তৃতা
করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে আশ্চর্য

ভরণ এবং স্বকুমার ; বুঝাবরসেও যেন শৈশব-
বের অমানলাবণ্য তাঁহার মুখত্রীক পরি-
তাপ করে নাই ; অথচ তাঁহার অন্তরঙ্গতা
হইতে যেন একটি ধ্যানপরতার গাভীর্ণা
তাঁহার চকুদিকে বিকীর্ণ হইতেছে । তাঁহার
ইহঁ চক্ষু অন্তর্ভূতির সূক্ষ্মগামিতার যথো-
নিমগ্ন । তাঁহাকে দেখিলেই বুদ্ধিতে পারা
যায় যে, নিরম-সংঘবের দ্বারা তিনি নিরম
সাধনশীল, অথচ তাঁহার মুখের তাব একটি
সহজ প্রসন্নতার দ্বারা দীপ্যমান ।

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল “কতি” ।
তিনি বলিয়াছিলেন, সংসারে যে ব্যক্তি কিছু
হারায় নাই, সে কিছু পায় নাই । আত্মনি

যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না; ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখন যথার্থ ত্যাগ আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা-কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ, তাহা সমুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে, সে লোক হর্ভাগ্য; বরঞ্চ তাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা নানব-চিন্তকের আছে। যাহা আমার গর, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করণোড় করিয়া বলিতে পারি, “আমি দিলাম, আমার ত্যাগের দান, আমার দুঃখের দান, আমার অশ্রুর দান”—তবে ক্ষুদ্র ব্রহ্ম হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের উপকরণমাত্র ছিল, তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের দেব-মন্দিরের রত্নভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকে।

এই কথাগুলি আজ হেমললিতার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বাসিতেছে। ছাদের উপরে নক্ষত্রবীণ আকাশের তলে সে আজ শুভ হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত মন আজ পূর্ণ—সমস্ত আকাশ, সমস্ত জগৎসংসার তাহার কাছে আজ পরিপূর্ণ।

বক্তৃতাসভা হইতে ফিরিবার সময় যোগেন্দ্র কহিল, “অক্ষর, তুমি বেশ পাত্রটি নক্সান করিয়াছ না হোক! এত সন্ন্যাসী! এর অর্ধেক কথা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না!”

অক্ষর কহিল, “রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। হেমললিতা রোগশয্যার ধানে মগ্ন আছেন—সে ধ্যান

সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের মত সহজ লোক ভাঙাইতে পারিবে না। যখন বক্তৃতা চলিতেছিল, তখন তুমি কি হেমের মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই?”

যোগেন্দ্র। দেখিয়াছি বই কি। ভাল লাগিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু বক্তৃতা ভাল লাগিলেই যে বক্তাকে বরমাল্য দেওয়া সহজ হয়, তাহার কোনো হেতু দেখি না।

অক্ষর। ঐ বক্তৃতা কি আমাদের মত কাহারো মুখে শুনিবে ভাল লাগিত? তুমি জান না যোগেন্দ্র, তপস্বীর উপর মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে। সন্ন্যাসীর মত উন্নত পন্থা করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহা কাব্যে লিখিয়া গেছেন। আমি তোমাকে বলিতেছি, আর যে-কোনো পাত্র তুমি বাড়ী করিবে, হেমললিতা রোগশয্যার সঙ্গে মনে মনে তাহার তুলনা করিবে—সে তুলনার কেহ টিকিতে পারিবে না। নলিনাক্ষ মাহুটি সাধারণ লোকের মতই নয়—ইহার সঙ্গে তুলনার কথা মনেই উদয় হইবে না। অতঃপর কোনো যুবককে হেমললিতার সমুখে আনিগেই তোমাদের উদ্দেশ্য সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সমস্ত হৃদয় বিজয়ী হইয়া উঠিবে। কিন্তু নলিনাক্ষকে বেশ একটু কৌশল করিয়া যদি এখানে আনিতে পার, তাহা হইলে হেমের মনে কোনো সন্দেহ উঠিবে না,—তাহার পরে ক্রমে শ্রদ্ধা হইতে মায়াধান পর্যন্ত কোনোপ্রকারে চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত শক্ত হইবে না।

যোগেন্দ্র। কৌশলটা আমার দ্বারা ভাল

ঘটিয়া ওঠে না—বলটাই আমার পক্ষে সচত।
কিন্তু বাই বল, পাতটি আমার পছন্দ হইতেছে না।

অক্ষয়। বেশ যোগেন, ভূমি নিম্নের
শেষ লইয়া সমস্ত মাটি করিয়া না! লুকল
সুবিধা একত্রে পাওয়া যায় না। যেমন
করিয়া হোক, রমেশের চিন্তা হেমলিনীর
মন হইতে না তাড়াইতে পারিলে আমি ত
ভাল বুঝি না। ভূমি যে গায়ের জোরে সেটা
করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনেও করিয়া
না। আমার পরামর্শ অনুসারে যদি ঠিকমত
চল, তাহা হইলে তোমাদের একটা সন্ধান
হইতেও পারে!

যোগেন্দ্র। অসল কথা, নলিনাক্ষ
আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্ব্বোধ। এরকম
লোকদের লইয়া কারবার করিতে আমি ভয়
করি। একটা দায় হইতে উদ্ধার হইতে
প্রিয়া কের আর-একটা দায়ের মধ্যে জড়াইয়া
পড়িব।

অক্ষয়। তাই, তোমরা নিম্নের দোষে
পুড়িয়াছ—আজকে সিঁদুরে রেশ দেখিয়া
আতঙ্ক লাগিতেছে! রমেশপক্ষের তোমরা
যে সোড়াগুড়ি একেবারে অন্ধ ছিল! এমন
ছেলে আর হয় না—চলনা কাহাকে বলে,
রমেশ তাহা জানে না—দর্শনশাস্ত্রে রমেশ
দ্বিতীয় শতাব্দী বসিলেই হয়, আর সাহিত্যে
বরং সপ্তমতীয় উনবিংশতাব্দীর পুরুষ-
সংস্করণ! রমেশকে প্রথম হইতেই আমার
ভাল লাগে নাই—এরকম অভ্যুচ্চ-আদর্শ-
ওয়ারী লোক আমার বরসে আমি চের-চের
দেখিয়াছি! কিন্তু আমার কথাটি কহিবার
জো ছিল না—তোমরা জানিতে, আমার মত
অযোগ্য অভ্যাজন কেবল নাহাওয়া-লোকদের

ঈর্ষা করিতেই জানে, আমাদের আর-কোনো
ক্ষমতা নাই। যা হোক, এতদিন পরে বুঝি-
য়াছ, মহাপুরুষদের দূর হইতে ভক্তি করা
চলে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নিম্নের যোনের
বিবাহের সম্বন্ধ করা নিরাপদ নহে। কিন্তু
'কণ্টকেটনব কটকম্!' এখন এই একটিনা
উপায় আছে, তখন আর এ লইয়া খুঁৎখুঁৎ
করিতে বসিয়া না!

যোগেন্দ্র। দেখ অক্ষয়, ভূমি যে আমা-
দের সকলের আগে রমেশকে চিনিতে
পারিয়াছিলে, এ কথা হাজার বলিলেও
আমি বিশ্বাস করিব না। তখন নিত্য
গায়ের আলস্য ভূমি রমেশকে হুঁচক দেধিতে
পারিতে না—সেটা যে তোমার অসাধারণ
বুদ্ধির পরিচয়, তাহা আমি মানিব না। বাই
হোক, কলকৌশলের যদি প্রয়োজন থাকে,
তবে ভূমি লাগে, আমার ধারা হইবে না।
নোটের উপরে নলিনাক্ষকে আমার ভালই
লাগিতেছে না।

যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় উভয়ে এখন অরদার
চা বাইবার ঘরে আসিয়া পৌছিল, দেখিল,
হেমলিনী ঘরের অভ্যর্থার দিয়া বাহির হইয়া
বাইতেছে। অক্ষয় বুদ্ধিল, হেমলিনী তাহা-
দিককে জান্না দিয়া পথেই ঘেঁষিতে পাইয়া-
ছিল। ঐহৎ একটু হাসিয়া সে অরদার
কাছে আসিয়া বসিল। চায়ের পেরাঝা ভণ্ডি
করিয়া লইয়া কহিল—“নলিনাক্ষবাবু যাহা
বলেন, একেবারে প্রাণের ভিতর হইতে বলেন,
সেইজন্য তাঁহার কথাগুলো এত সহজে প্রাণের
মধ্যে প্রিয়া প্রবেশ করে।”

অরদাবাবু কহিলেন—“লোকটির ক্ষমতা
আছে।”

অক্ষয় কহিল “তুচ্ছ কথাতা। এমন সাধু চরিত্রের লোক দেখা যায় না।

যোগেন্দ্র যদিও চর্যাস্তরের মধ্যে ছিল, তবু সে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—“আঃ, সাধুচরিত্রের কথা আর বলিয়ে না—সাধুগণ হইতে ভগবান্ আমাদিগকে পরিজ্ঞাপ করুন!”

যোগেন্দ্র কাল এই নলিনাক্ষের সাধুত্বের অল্প প্রশংসা করিয়াছিল—এবং যাহারা নলিনাক্ষের বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহাদিগকে নিম্নক বলিয়া গালি দিয়াছিল।

অন্নদা কহিলেন, “ছি যোগেন্দ্র, এমন কথা বলিয়ে না! বাহির হইতে বাহাদিগকে ভাল বলিয়ামনে হয়, অন্তরেও তাঁহারা ভাল, এ কথা বিশ্বাস করিয়া বরং আমি ঠকিতে রাখি আছি, তবু নিজের ক্ষত্র বৃত্তিমন্তার গৌরবরক্ষার জন্য সাধুতাকে সন্দেহ করিতে আমি প্রস্তুত নহি। নলিনাক্ষবাবু যে সব কথা বলিয়াছেন, এ সমস্ত পরের সুখের কথা নহে;—তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিত্তর হইতে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার পক্ষে আর তাহা নূতন লাভ বলিয়া বনে হইয়াছে। যে ব্যক্তি কপট, সে ব্যক্তি সত্যকার বিনিম্ব দিবে কোথা হইতে? সোনা যেমন বানানো যায় না, এ সব কথাও তেমনি বানানো যায় না। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, নলিনাক্ষবাবুকে আমি নিজে গিয়া সাধুবাদ দিয় আসিব।”

অক্ষয় কহিল—“আমার ভয় হয়, ইহার শরীর টেকে কি না?”

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “কেন, ইহার শরীর কি ভাল নয়?”

অক্ষয়। ভাল থাকিবার ত কথা নহে—দিনরাত্রি আপনায় পড়েন। এং পাঞ্জালোচনা লইয়াই আছেন, শরীরের খাত ত আর খুটি নাই।

অন্নদা কহিলেন—“এটা ভারি অস্ত্রার! শরীর নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের নাই—আমরা আমাদের শরীর খুটি করি নাই। আমি যদি উঁহাকে কাছে পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই অন্নদিনেই আমি উঁহার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতাম। আসলে স্বাস্থ্যরক্ষার ঔতিকতক সহজ নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে প্রথম হচ্ছে—

যোগেন্দ্র অঈর্ষ্যা হইয়া কহিল—“বাবা, বুধা কেন তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ! নলিনাক্ষবাবুর শরীর ত দিব্য দেখিলাম,—তাঁহাকে দেখিয়া আজ আমার বেশ বোধ হইল, সাধু-জিনিষটা স্বাধ্যাকর। আমার নিজেরই মনে হইতেছে, ওটা চেঁচা করিয়া দেখিলে হয়!”

অন্নদা কহিলেন—“না যোগেন্দ্র, অক্ষয় বাহা বলিতেছে, তাহা হইতেও পারে। আমাদের দেশে বড় বড় লোকেরা প্রায় অন্নবরপেই মারা যান—ইহার নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া দেশের লোকসান করিয়া থাকেন। এটা কিছুতে ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। যোগেন্দ্র, তুমি নলিনাক্ষবাবুকে বাহা বনে করিতেছ, তাহা নয়; উঁহার মধ্যে আসল জিনিষ আছে। উঁহাকে এখন হইতেই দাবধান করিয়া দেওয়া দরকার।”

অক্ষয়। আমি উঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিব। আপনি যদি উঁহাকে একটু ভাল করিয়া খুঁচাইয়া দেন ত

ভাল হয় । আর, আমার মনে হয়, আপনি সেই যে শিকড়ের রসটা আমাকে পরাকার সময় দিরাছিলেন, সেটা আশ্রয় বলকারক ! যে কোনো লোক সর্বদা মনকে খাটাইতেছে, তাহার পক্ষে এমন মহোৎসব আর নাই । আপনি যদি একবার মনিনাক্ষণ্যকে—

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল—“আঃ, অক্ষর, কুনি জালাইলে ! বড় বাড়াবাড়ি করিতেছ । আমি চলিলাম !

৪৫

অপরাত্তের দিকে দোতলায় বসিবার ঘরে অন্নদাবাবু একটা কেরারার উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—পাশে একটি ছোট চৌকিতে বসিয়া হেমললিতা তাহার পিতার লজ্জা নতুন বালিশের ওয়াড় তৈরি করিতেছে । মাঝে মাঝে একএকবার উষ্মচিত্তে নিম্নিত অন্নদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে । খোলা জান্না দিয়া তাহার মুখের উপর যে আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোতে আজ অন্নদাবাবুর মুখ স্পষ্টই হৃদয়ে দেখাইতেছে । অন্নদিনের মধ্যেই তাহার মুখে জরার চিহ্ন গুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে । আজকাল প্রত্যহ বেলা দুটো-তিনটের পর তাহাকে ঘুমে অভিভূত করিয়া ফেলে ; হাজার কাজ থাকিলেও তিনি আপনাকে জাগাইয়া রাখিতে পারেন না ;—হেমললিতার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতেও তাহার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে । এমন কি, সকালবেলাতেও প্রায় মাঝে মাঝে দেখা যায়, চৌকিতে বসিয়া একখানা বই হাতে করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন । প্রত্যহ নিয়মিত বেড়াইতে

বাইতেন, এখন আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই—এখন ঘর হইতে বাহির হইতে ক্লান্তি ও অনিচ্ছা বোধ হয় । পূর্বে যখন তাহার শরীর ভাল ছিল, তখন তিনি ডাক্তারি ও কবিতাজি নানাপ্রকার বটিকারি সর্বদাই ব্যবহার করিতেন—এখন আর ওষুধ খাইবারও উৎসাহ নাই—এবং নিজের অবসাদ লইয়া আজকাল তিনি আর আলোচনা-মাত্রও করেন না, বরঞ্চ তাহা গোপন করিতেই চেষ্টা করেন ।

হেমললিতা আজকাল আর তাহার কাছছাড়া হয় না । তাহারি কাজে তাহার দিন কাটিয়া যায় । অন্নদাবাবু তাহার শরীরের গিয়া দেখেন, প্রায় প্রত্যহই তাহার ঘরের ছোটখাট পরিবর্তন হইতেছে । একদিন দেখিলেন, চোখে আলো লাগে বলিয়া তাহার জান্না তুলিতে সবুজ ছিটের ছোট ছোট পরদা খাটানো হইয়াছে । একদিন দেখিলেন, তাহার বসিবার কেরারার, যে আরগাটোতে মাথার তেল লাগিয়া কালো হইয়া গিয়াছিল, সেখানে ফুলের কাজ-করা কাপড়ের আবরণ পড়িয়াছে । তাহার চিরকালে টিপাইটার উপর একটা পশমের টিপাইটাকা কোথা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে ! তাহার শোবার ঘরের প্রবেশদ্বারের লজ্জা একটা নানারঙের পুথির পরদাও যে তৈরি হইতেছে, তাহারও সন্ধান তিনি পাইয়াছেন । পূর্বে বাহির হইবার সময় অন্নদাবাবু তাহার জামা-চামেরের ছিন্নপ্রতীসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না—এখন এ সকল বিষয়ে তাহার নিজের স্বাধীনতা আর চলিতেছে না । অন্নদাবাবু বলেন, “মা হেম আমাকে আমায়

এই শেষবরসে সৌখ্যন করিয়া ছুটিতেছে
লোকে দেখিলে হাসিবে যে !”

আজ তাহার পিতা যখন কেদারায় ঘুমাইয়া
পড়িয়াছেন, তখন মিড়িতে পদশব্দ শুনিয়া
হেমলিনী কোল হইতে পেলাইয়ের সামগ্রী
নানাইয়া তাহার দ্বাধাকে সতর্ক করিয়া
বিবাহ অস্ত্র বারের কাছে গেল। পিতা
বেশিল, তাহার দ্বাধার সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক-
বাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাড়া-
তাড়ি অস্ত্র ঘরে পালাইবার উপক্রম করিতেই
বোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া কহিল—“হেম,
নলিনাকবাবু আসিয়াছেন, ইহার সঙ্গে
তোমার পরিচয় করাইয়া দিই।”

হেম ধম্বকিয়া দাঁড়াইল এবং নলিনাক
তাহার সম্মুখে আসিতেই তাহার মুখের
দিকে না চাহিয়া নমস্কার করিল। অন্নদা-
বাবু দ্বিগুণা-উত্তীর্ণা ডাকিলেন—“হেম।” হেম
তাহার কাছে আসিয়া মুহুরে কহিল,
“নলিনাকবাবু আসিয়াছেন।”

বোগেন্দ্রের সহিত নলিনাক বরে প্রবেশ
করিতেই অন্নদাবাবু ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া
নলিনাককে অভ্যর্থনা করিয়া আনিগেল।
কহিলেন, “আজ আমার বড় সৌভাগ্য,—
আপনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। হেম,
কোথায় বাইতেছ না, এইখানে, বোস।
নলিনাকবাবু, এটি আমার কস্তা হেম,—আমরা
দুজনেই সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিতে
গিয়া বড় আনন্দলাভ করিয়া আসিয়াছি।
আপনিই যে একটি কথা বলিয়াছেন, আমার
যাহা পাইয়াছি তাহা কখনোই হারাইতে পারি
না, যাহা বখাৰ্হ পাই নাই তাহাই হারাই—
এ কথাটির অর্থ বড় গভীর—কি বল না

হেম? বাস্তবিক কোন ভিনিষটিকে যে
আমার করিতে পারিয়াছি, আর কোনটিকে
পারি নাই, তাহার পরীক্ষা কর তখন, যখন
তাহা আমাদের হাতের কাঁছ হইতে সরিয়া
যায়। নলিনাকবাবু, আপনার কাছে আমাদের
একটি অনুরোধ আছে। মাঝে মাঝে আপনি
আসিয়া যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া
যান, তবে আমাদের বড় উপকার হয়।
আমরা বড় কোথাও বাহির হই না—আপনি
যখন আসিবেন, আমাদের আর আশ্রয়
মেয়েটিকে এই ঘরেই দেখিতে পাইবেন।”

নলিনাক আগন্তুত হেমলিনীর মুখের
দিকে একবার চাহিয়া কহিল—“আমি বক্তৃতা-
সভায় বড় বড় কথা বলিয়া আসিয়াছি বলিয়া
আপনার আমাকে মন্ত একটা গভীরলোক
মনে করিবেন না। আমি লোকজনের সঙ্গে
মিশিতে খুব ভালবাসি, গমগুজব করিয়া
বেড়াই—অন্নদাবাবু যে আলোচনার কথা
বলিতেছেন, আমার যদি সে সমস্ত অভ্যাস
থাকিত, তবে লোকে আমার কাছে বেঁধিত
না। সেদিন ছাত্ররা নিত্যন্ত ধরিয়া পড়িয়া-
ছিল বলিয়া বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম—
অনুরোধ এড়াইবার ক্ষমতা আমার একে-
বারেই নাই—কিন্তু এমন করিয়া বলিয়া
আসিয়াছি যে, দ্বিতীয়বার অনুরোধ হইবার
আপকা আমার নাই। ছাত্ররা স্পষ্টই
বলিতেছে, আমার বক্তৃতা বারো-আনা
বোকাই যায় নাই। বোগেনবাবু, আপনি
ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন—আপনাকে
সত্বকনয়নে বড়ির দিকে তাকাইতে দেখিয়া
আমার চন্দর যে বিচলিত হয় নাই, এ কথা
মনে করিবেন না।”

যোগেন্দ্র কহিল—“আমি ভাল বৃত্তিতে পারি নাই, সেটা আমাদ বৃত্তির ধোণ হইতে পারে, সেজন্য তাপনি কিছুমাত্র কৃত্ত হইবেন না।”

অন্নদা। যোগেন্দ্র, সব কথা বৃত্তিয়ার বসন সব নয়।

নলিনাক্ষ। সব কথা বৃত্তিয়ার দরকারও সব সময়ে দেখি না। তাহার জলের এখনো দরকার পড়ে নাই, এমন সহস্র উদাসীন লোকের সমুখ দিয়া নদীর ধারা অবশেষে একজন তৃষার্তের জলপাত্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেজন্য নদী কখনো খেদ করে না। কার কাজে লাগি, আর কার কাজে লাগি না, সে কথা লইয়া আন্দোলন করিয়া কষ্ট পাইবার দরকার কি? নিজের গরজে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, তাহার সার্থকতা লইয়া কাহারো সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্নদা। কিন্তু নলিনবাবু, আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে। ঈশ্বর আপনাদিগকে কাজ করাইয়া লইবার জন্য পৃথিবীকে পাঠাইয়াছেন, তাই বলিয়া শরীরকে অবহেলা করিবেন না। তাহার মাতা, তাহার পিতা এ কথা সর্বদাই অন্ন করাইতে হয় যে, মূলধন নষ্ট করিয়া ফেলিবেন না, তাহা হইলে দান করিবার শক্তি চলিয়া যাইবে।

নলিনাক্ষ। আপনি যদি আমাকে কখনো ভাল করিয়া জানিবার অবসর পান, তবে দেখিবেন, আমি সংসারে কোনো কিছুকেই অবহেলা করি না। জগতে নিতান্তই ভিক্ষকের মত আদিরাছিলাম, বহুকষ্টে বহু লোকের আত্মকুলো শরীরমন অঙ্গে অঙ্গে প্রস্রবত হইয়া উঠিয়াছে। আমার

পক্ষে এ সবাবী মোতা পার না যে, আমি কিছুকেই অবহেলা করিয়া নষ্ট করিব। যে ব্যক্তি গড়িতে পারে না, সে ব্যক্তি ভাঙিবার অধিকারীও নহে।

অন্নদা। বড় ঠিক কথা বলিয়াছেন। আপনি কতকটা এইভাবেই কথাই সেদিনকার প্রবন্ধেও বলিয়াছিলেন।

নলিনাক্ষ। আমি বলিয়াছিলাম—সংসারের জিনিষগুলিও আমার জন্য বলিয়া থাকে না, সমস্তও আমার জন্য মাপেকা করে না। এমন অবস্থায় কেবল ক্ষতির উপরেই সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকিলে তার চেয়ে অনেক বৃহৎ ক্ষতিই হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা হয় আমরা। এত বড় ধনী নই যে, এই সংসারের ঐশ্বর্য্য আমার এমনি করিয়াই অগ্রাহ্য করিতে পারি! অন্নদাবাবু, আমি আনন্দকেই ঈশ্বরের পূজা বলিয়া জানি। ধৈর্য-আক্ষেপ-পরিভ্রাণ লইয়া যেদিন বিশ্ব-দেখাণকে মগ্ন করিয়া ফেলি, সেদিন আর-বাধা-কিছু হারাইয়াছে, সেই সঙ্গে ভগবানকেও হারাই। আমি নিরানন্দ লইয়া অধিকক্ষণ করার করিতে সাহস করি না।

যোগেন্দ্র। আপনারা বহুন্, আমি চলিলাম—একটু কাজ আছে!

নলিনাক্ষ। যোগেন্দ্রবাবু, আপনি কিছু আমাকে মাপ করিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, লোককে অতিষ্ঠ করা আমার স্বভাব নয়! আজ অন্নদাবাবু নিতান্ত উত্তেজিত করিয়া আমাকে লোকসমাজের পক্ষে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। আজ না হয় আমি উঠি! চলুন, খানিকটা রাস্তা আপনার সঙ্গে যাওয়া যাক!

যোগেন্দ্র। না না, আপনি বহু ন।
আমার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। আমি
কোথাও বেশিফণ চূপ করিয়া বলিয়া থাকিতে
পারি না।

অন্নদা। নলিনাকবাবু, যোগেন্দ্রের জন্ত
আপনি ব্যস্ত হইবেন না। যোগেন্দ্র এখন,
যখন খুসি আসে, যখন খুসি যায়, উৎসাহে
ধরিয়া রাখা শক্ত।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা
করিলেন, “নলিনবাবু, আপনি এখন কোথায়
আছেন?”

নলিনাক হাসিয়া কহিল—“আমি যে
বিশেষ কোথাও আছি, তাহা বলিতে পারি
না। আমার জানা শুনা লোক অনেক
আছেন, তাঁহারা আমাকে টানাটানি করিয়া
লইয়া বেড়ান। আমার সে দরু লাগে না -
কিন্তু মানুষের চূপ করিয়া থাকার প্রয়োজন
আছে। তাই যোগেন্দ্রবাবু আমার জন্ত
আপনার বাড়ীর ঠিক পানের বাড়ীতেই
গান করিয়া দিচ্ছিলেন। এ গলিটি বেশ
নিভৃত বটে।”

এই সংবাদে অন্নদাবাবু বিশেষ আনন্দ-
প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যদি লক্ষ্য
করিয়া দেখিতেন ত দেখিতে পাইতেন যে,
কথাটা শুনিবামাত্র হেমললিনীর মুখ
কর্ণকালের জন্ত বেদনার বিবর্ণ হইয়া
গেল। ঐ পানের বাসাতেই রমেশ
ছিল।

ইতিমধ্যে চা তৈরির খবর পাইয়া সকলে
মিলিয়া নীচে চা খাইবার ঘরে গেলেন।
অন্নদাবাবু কহিলেন, “মা হেম, নলিনবাবুকে
একপেন্সালা চা দাও।”

নলিনাক কহিল, “না অন্নদাবাবু, আমি
চা খাইব না।”

অন্নদা। সে কি কথা, নলিনবাবু! এক-
পেন্সালা চা—না হয় ত কিছু মিষ্টি খান!

নলিনাক। আমাকে মাপ করিবেন।

অন্নদা। আপনি ডাক্তার, আপনাকে
আর কি বলিব? মধ্যাহ্নভোজনের তিন-
চার-খণ্ড পরে চাহের উপলক্ষ্যে খানিকটা
পরমল্ল খাওয়া হজমের পক্ষে যে নিতান্ত
উপকারী। অভ্যাস না থাকে যদি, আপনাকে
না হয় খুব পাংলা করিয়া চা তৈরি করিয়া দিই!

নলিনাক চকিতের মধ্যে হেমললিনীর
মুখের দিকে চাহিয়া বৃষ্টিতে পারিল যে, হেম-
ললিনী নলিনাকের চা খাইতে সর্বোচ্চমত্রে
একটা কি আন্দাজ করিয়াছে এবং তাহাই
লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছে।
তৎক্ষণাৎ হেমললিনীর দিকে চাহিয়া নলিনাক
কহিল—“আপনি বাহা মনে করিতেছেন, তাহা
সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আপনাদের এই চাহের
টেবিলকে আমি ঘূর্ণা করিতেছি, বলিয়া
মনেও করিবেন না। পূর্বে আমি যথেষ্ট চা
খাইয়াছি—চাহের গন্ধে এখনো আমার মনটা
উৎসুক হয়—আপনাদের চা খাইতে দেখিয়া
আমি আনন্দবোধ করিতেছি। কিন্তু আপ-
নারা বোধ হয় জানেন না, আমার মা অত্যন্ত
আচোরপরায়ণ—আমি ছাড়া তাঁহার স্বার্থ
আপনার কেহ নাই—সেই মার কাছে আমি
সমুচিত হইয়া খাইতে পারিব না। এইজন্য
আমি চা খাই না। কিন্তু আপনারা চা
খাইয়া যে সুখটুকু পাইতেছেন, আমি তাহার
ভাগ পাইতেছি। আপনাদের আতিথ্য হইতে
আমি বঞ্চিত নহি।”

‘ইতিপূর্বে নলিনাক্ষের কথাবার্তার ভেদ-
নলিনী মনে মনে একটু ঘেন্না ভাষাত
পাইতেছিল । সে বৃষ্টিতে পারিতেছিল,
নলিনাক্ষ নিজেকে তাহারদের কাছে ঠিকভাবে
প্রকাশ করিতেছিল না । সে কেবলি বেশি
কথা কহিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবারই
চেষ্টা করিতেছিল ।’ হেমনলিনী আনিত
না, প্রথম পরিচয়ে নলিনাক্ষ একটা
একান্ত সঙ্কোচের ভাব কিছুতেই তাড়াইতে
পারে না । এইজন্য নূতন বোকের কাছে
অনেকস্থলেই সে নিজের স্বভাবের বিকক্ষে
জোর করিয়া প্রগল্ভ হইয়া উঠে । নিজের
অকৃত্রিম মনের কথা বলিতে গেলেও তাহার
মধ্যে একটা বেহুুর লাগাইয়া বসে । সেটা
নিজের কানেও ঠেকে । সেইজন্যই আজ
যোগেজ্ঞ যখন অন্ধার হইয়া উঠিয়া পড়িল,
তখন নলিনাক্ষ মনের মধ্যে একটা দিকার
অনুভব করিয়া তাহার সঙ্গে পালাইবার চেষ্টা
করিয়াছিল ।

কিন্তু নলিনাক্ষ যখন যার কথা বলিল,
তখন হেমনলিনী প্রকার চক্ষে তাহার মুখের
দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না, এবং
মাতার উল্লেখমাঝে সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের
মুখে যে একটি সরস ভক্তির গাঙ্গীর্ঘ্য প্রকাশ
পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র
হইয়া গেল । তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল,
নলিনাক্ষের মাতার সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলো-
চনা করে, কিন্তু সঙ্কোচে তাহা পারিল না ।

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,
“বিলক্ষণ! এ কথা পূর্বে জানিলে আমি
কখনই আপনাকে চা খাইতে অনুরোধ
করিতাম না । মাপ করিবেন ।”

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, “চা
নইতে পারিলাম না বলিয়া আপনাদের
অনুরোধ হইতে কেন বঞ্চিত হইব ?”

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে হেমনলিনী
তাড়াতাড়ি পিতাকে লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া
বসিল এবং বাংলা মাসিকপত্রিকা হইতে
প্রবন্ধ বাছিয়া তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে
লাগিল । শুনিতে শুনিতে অন্নদাবাবু অনতি-
বিলম্বে ঘুমাষ্টয়া পড়িলেন । কিছুদিন হইতে
অন্নদাবাবুর শরীরে এইরূপ অবসাদের লক্ষণ
নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে ।

অন্নদাবাবু ঘুমাষ্টয়া পড়িতেই আজ হেম-
নলিনী নিঃশব্দপথে ঘর হইতে বাহির হইয়া
ছাদের উপর উঠিল । হেমন্তের সূর্য্য
অন্ত গিরাজে । আকাশে আজ বর্ণজট্টা নাই ।
কলিকাতার নিমিশ্রিত ঘনত্ব বাপের
ভিতর দিয়া অত্যন্ত মলিন তামবর্ণ সূর্য্যাস্তের
আভা অতিকৃত হইতেছে ।

ছাদের প্রান্ত প্রাচীরে ভর দিয়া হেমনলিনী
পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল । আজ
ঘরের জানালাগুলি খোলা ; এতদিনের কদ-
ম্বরে বায়ুচলনার চেষ্টা করা হইতেছে । ঘর-
গুলি ঘেন্না এককাল যে পুরাতনের বহ-
বৃত্তিকে বুক চাপিয়া ধরিয়া বাহিরের সহিত
সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সেই বৃত্তিকে
আজ অনন্ত আকাশ, বাতাস ও আলোকের
মধ্যে বিদায় দিবার জন্য বন্ধকপাট উন্মুক্ত
করিয়াছে । হেমনলিনী সেই মুক্তব্যাক্যের
ধরগুলির পুঙ্খভা ও অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধ-
কার এই সারস্বতকালের বাস্পস্বরভেদী স্নান-
করণ রশ্মিরেখার জাঘ, তাহার ব্যাকুলদৃষ্টি
প্রবেশ করিল ।

বিন্যস্তের শেষ আশোঁড়িৎ যখন অবসর
হইয়া গেল, তখন সেই অন্ধকারে হঠাৎ
পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া হেমেনলিনী চকিত
হইয়া পশ্চাতে কিরিয়া পাড়াইল। অন্নদাবাবু
কহিলেন, “মা, তুমি একলা ছায়ে আসিয়াছ?
আজ আমার কেমন-একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,
কিছু টের পাই নাই।”

এতাই যে তাঁহার তন্দ্রা আসে, এতক্ষণ-
এমণের বিরুদ্ধে তাহা অন্নদাবাবু অস্বীকার
করিতে চেষ্টা করেন হেমেনলিনীও এমন
চূপ করিয়া থাকে, যেন সে তাঁহার ঘুম লক্ষ্যই
করে নাই।

অন্নদাবাবুকে দেখিয়া হেম আজ অত্যন্ত
লজ্জিত হইল। অন্নদাবাবুরও মনের মধ্যে
একটা দা লাগিল। রনেশের বাপারটা
ক্রমে হেমেনলিনীর জীবন হইতে দূরে সরিয়া
বাইতেছে, এই আশা করিয়া কয়দিন তাঁহার
মনটা লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল—আজ সন্ধ্যার
অন্ধকারে হেমকে একলা ছায়ে উপর দেখিয়া
আবার তাঁহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া
উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। হেম
তাহা শুনিতে পাইল। সেই দীর্ঘনিশ্বাসের
মধ্যে এই বৃদ্ধের যে একটি ক্রান্তি ও পরা-
ভবের মৈয়ত্রী ব্যক্তিগা উঠিল, তাহা সেই
মুহূর্ত্তেই হেমেনলিনীর নয়নপথ অব্যক্ত করিয়া
দিল। ভৎসনাৎ সে পিতার কাছে আসিয়া
কহিল, “বাবা, চল আমাদের বসিবার ঘরে
বাই—এখানে কিয় পড়িতেছে।”

অন্নদাবাবু কোনো কথা না বলিয়া আন্তে
আন্তে নীচে নামিয়া আসিলেন ও চূপ করিয়া
অত্যন্ত কেদারাটির উপরে বসিলেন। হেম-
নলিনী তাঁহার পাশে একটি চৌকি টানিয়া-

আমিয়া বসিল ও ভাড়াভাড়ি একটা-কেবল
কণোপকণনের প্রসঙ্গ তুলিবার মত বলিল—
“বাবা, নলিনাক্ষবাবু কেমন চমৎকার
লোক!”

নলিনাক্ষবাবুকে হেমেনলিনীর ঠিক এতটুকু
চমৎকার ঠেকে নাই—কিন্তু নিজেই
মনের বিষয়তা অপ্রমাণ করিবার জন্য
কথাটাতে কিছু অতিরিক্ত উত্তম প্রয়োগ
করিয়া বসিল। এ কথা যেন কেহ না শ্রবণ-
যে, পৃথিবীতে সকল লোক এবং সকল
জিনিষের উপরেই হেমেনলিনীর ঔদাসীন্য
অমিয়া গেছে।

অন্নদাবাবুও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন—
তিনি কহিলেন, “ছেলেটিকে আমারও বঙ্গ
ভাল লাগিয়াছে। বয়সে বোধ করি
আমার যোগেন্দ্রেরই সমান হইবে, কিন্তু মুখ
দেখিলে যেন বালক বোধ হয়। অথচ
চোখছটে। দেখিয়াছ হেম! আমি ত এমন
চোখ দেখি নাই। তাহার চোখে তাকিয়া
আমার কি-একটা মনে হইতে লাগিল বলিতে
পারি না। তুমি লক্ষ্য কর নাই?”

হেম কহিল—“না বাবা, আমি ঠিক তাঁর
চোখের দিকে তেমন করিয়া চাহি নাই
কিন্তু তাঁহার হাসিটি বড় প্রসঙ্গ।”

অন্নদা। ঠিক বলিয়াছ, তাঁহার হাসির
একটা বিশেষ আছে বটে। মনে হয় কেন,
বাবা—কিন্তু দেখিতেছেন, সকল হইতেই একটা
প্রসঙ্গতা প্রতিকলিত হইয়া তাঁহার মুখের
উপরে আসিয়া পড়িতেছে।

হেম কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহার পূর্বে
কোনো লোকেরই সম্বন্ধে অন্নদাবাবু এ-প্রকার
উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করেন নাই।

এখন কি, হেমেনলিনার মনে ঈশ্বর-একটু ঈর্ষার
দিকার হইল—সে ঈশ্বর নিজেকে লইয়া, কি
ক্রমশে লইয়া, তাহা বলা শক্ত । রমেশের
প্রতি অন্নদাবাবুর প্রভা ছিল বটে, কিন্তু এমন
ভয়ঙ্কর ভাবের বেহ ছিল না । রমেশ যে
ঈর্ষার অন্তঃকরণকে তেমন গভীরতর স্থানে
স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, তাহা নহে ।

অন্নদা । নলিনাক্ষবাবু যে আমাদের
পালের বাড়ীটি লইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়
খুশি হইয়াছি ।

হেমেনলিনী । কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে
বড় বেশি বিরক্ত করিতে আরম্ভ করি, তাহা
হইলে ত তিনি টিকিতে পারিবেন না ।
তিনি নির্জন মনে করিয়াই এই গলির মধ্যে
বিশ্রাম করিতে আসিয়াছেন ।

অন্নদা । দেখ সেন, নলিনাক্ষবাবুদের
হস্ত লোক নিজেরা বাহা চান, তাহাই সে
নির্জিয়ে ভোগ করিতে পাইবেন, বিধাতা
তাঁহাদের ললাটে এমনটা লেখেন নাই ।
তাঁহাবু কাছ হইতে আমরা বাহা চাই, তাহা
তাঁহার এড়াইবার ক্ষমতা নাই । আমরা
তাঁহাকে বিরক্ত বহি করি, তবে সে তাঁহাকে
অহিতৈষী হইবে । এরকম লোক বাড়ীর
কর্জীর মত আগে সকলের আহার শেষ
হইলে তবে নিজের আহারে বসিতে পারেন—
বৈশা হইয়া বাইতেছে বলিয়া অভিধিক
কিরাইতে পারেন না ।

যখন তখন বাহাকে-তাহাকে লইয়া অন্নদা-
বাবুকে এরূপ কেহ মাতিয়া উঠিতে দেখে
নাই—বরঞ্চ তিনি সাধারণত খ্যাত লোক-
বিগকেও যথেষ্ট খ্যাতি দিতে কৃপণতা করেন ।
এইজন্য তাঁহার এই ভক্তির সহস্র উচ্ছ্বাস
হেমেনলিনাকে স্পর্শ করিল । তখন হেম-
নলিনী নলিনাক্ষকে সাধারণ বহুধাত্রেণী
হটতে তফাত করিয়া আপনার অস্বস্তিত
ঈর্ষাকে গলন করিয়া ফেলিল ও ক্রমশই কথা-
প্রসঙ্গে অন্নদাবাবুর উৎসাহ বিনা বিরোধে
তাহার হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল ।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “মা, চল একবার
ও বাড়ীটা দেখিয়া আসি । কাল নলিনবাবু
ওখানে আসিবেন, দেখি, সমস্ত পরিষ্কার
করা হইয়াছে কি না ।”

হেমেনলিনী চুপ করিয়া রহিল । একটু পরে
কহিল, “এখন অন্ধকার হইয়া গেছে, এখন
কি ভাগ দেখা যাইবে ?”

হেমের অনিচ্ছা দেখিয়া অন্নদাবাবু
কহিলেন, “আচ্ছা থাক, কাল সকালে দিয়া
দেখিয়া আসিবে ।”

ইহার পরে সন্ধ্যাকাল কোনো কথা হইল
না । হঠাৎ হেম উঠিয়া কহিল, “চল বাবা,
বাড়ীটা দেখিয়া আসি গে ।”

এই বলিয়া, দেখানে বেদনা, সেইখানেই
হেম অত্যন্ত স্পর্ধার সহিত আঘাত করিতে
প্রস্তুত হইল ।

ক্রমশ ।

শুভযাত্রা ।



গুরু হেমন্তের রাত্রি অবসান-প্রায়,
হিমক্লিষ্ট চাঁদখানি অস্তে বাধ যার ।
সুখমর-শায়নীর-অবসর-শেষে
শুভযাত্রা করি' পুন ক্রিষ্টিব বিনেশে ।

অবিভ্রান্ত কল্যানে গাহি নিরবধি,
ধৌত করি সৌধবল বহে পূর্ণা নদী ।
তরুণী প্রস্তুত বাটে,—প্রস্তুত সকলি ;
যাত্রীগণ দিল লাড়া দুর্গা দুর্গা বলি' ।
বয়সাক্ত গর্বে পূর্ণ কূলে কূলে
হুগায়ে হুগায়ে তরি স্রোতস্বিনী হুগে ।
বহিল বিভাতব্য হিমকণা হানি' ।
শীতাক্ত-ভঙ্গু-পরে বস্ত্রাকণ টানি'
শব্দাণীন পুরবাসী তস্মাত্তর স্নেহে ;
অশান্তি আগিছে শুধু দুইখানি বুক ।
'হৃদ্য-অহ্ময়ে যাত্রা'—তার পর নাকি
পড়িবে 'অধিন' ;—আর আশঙ্কতা বাকি ।
ভূতা আসি কহে দ্বারে—“প্রস্তুত সকলি ;”
তাড়াতাড়ি উঠিলাম স্নেহনয়া ভুলি' ।
—সকলি প্রস্তুত ? কিন্তু বিদায় যে বাকি !
কম্পাঘিত হাতখানি শিরাধন্তে রাখি'
কঙ্কণে কহিলাম, “তবে আসি আসি ।”
—অধনি নয়ন-পেল অশ্রুজলে, তাসি' ;

বহিরা কপোল বন্ধ তিতিল। বসন
বিগলিত প্রণয়ের সূঁধা প্রস্রবণ !
নারিলু ঘাইতে ছাড়ি'—বসিল আবার ;
অশ্রুসিক্ত ঋণি ছটি চুপি' ধারবার,
কত-না সাধনাবাণী কহিলু কাতরে,
ভূতা ডাকি' কহে পুন উল্লকঠবরে—
“কর্তা পাঠালেন বলি'—‘আরওেরি নাই’”—
“এই আসি বল গিরে”—“প্রিয়ে তবে ঘাই ?”
আবার সে কণ্ঠখানি আসিল জড়য়ে ;
বাম্পাকুল নেত্র হ'তে আশ্রপক্ষাঘ্নে
আবার জ্বলিল অশ্রু আকুল উল্লাসে ।
—দোয়েল উঠিল ডাকি' বাতায়নপাশে ।
“বিদায় বিদায় তবে ।” মুহূর্ত্তবরে,
ওলিগাম “এস তবে” কম্পিত মর্মরে ।
এবার বাজিল কর্ণে দ্রুত কক্ষরবে—
“কিসের বিলম্ব এত, কতক্ষণ হবে ?”
স্বর্ঘ্যোদয়ে ‘মহাদেউ’-দোঁবের সকার ;
সমাজদেবের আজ্ঞা—“যাত্রা নাহি আর ।”
কদম্বদেবতা হাসি' কহিল উত্তরে,
“এসব বিদায়দৃষ্টি সর্ব্বদোষ হয়ে ।”

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলি' নৌকা দিলু থুলি' ;
অশুভযাত্রার কথা বরা গেহু ভুলি' ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৪৩

অন্নদাবাবুর পাশের বাসার ধারের সম্মুখে কিছু কিছু জিনিষপত্র লইয়া গোপন গাড়ি এবং দুটে আনাগোনা করিতে লাগিল। ঝাড়পৌছ এবং দরজা জানুনা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শোনা যাইতেছে। “স্বাস্থ্যবশতঃ দিক্‌টা হইতে বহুকাল পরে পোয়ার কুণ্ডলী দেখা দিয়াছে। একতলার উঠানের কোণে খোলা কলের ঘুঘু হইতে জলপড়ার শব্দ এ বাড়ীতে আদিয়া পৌছিতেছে।

সেই তার বহুপরিচিত এতদিনের স্ত্রী-বাসায় লোকবসতির এই সকল শব্দ ও শব্দে হেমললিনীর মনটাকে আজ অত্যন্ত উত্তলা করিয়া তুলিল। নূতন অন্নদাবাবুর সকল-বেলাকার রোস্ত্রে সমস্ত কলিকাতা বিচিত্র কাজে লাগিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই প্রভাত, এই রোস্ত্রে হেমললিনীর চারিদিকের আকাশে কি শব্দ, কি কথা আগাইয়া তুলিতেছে! হেম যেদিকে যায়, যেদিকে তাকায়, সকল দিক্ হইতেই তাহাকে কোন অনশ্রীর আবির্ভাব বেটন করে—গুহা গুহাইয়া গেছে যাহা কিংবদন্তি নহে, যাহা

সর্বপ্রকারেই অসম্ভব, তাহাই পথদ্বারা পিতৃহীন শিশুর মত আশ্রিকার এই আলোকে, এই বাতাসে কোথা হইতে কেবলি ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে! এই সময়টাতে অন্নদাবাবু তাহার কাগের চিত্তপত্র ও হিসাব লেখার কাজে নিযুক্ত থাকেন। হেমললিনী তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি প্রিজ্ঞাসা করিলেন, “কি মা, কোনো কথা আছে!”

হেমললিনী কহিল—“না বাবা, একবার কেবল দেখিতে আসিলাম,—তুমি কি করিতেছ!”

অন্নদাবাবু তাহার চমকা খুলিয়া বাতাস বন্ধ করিয়া কহিলেন—“এই যে এখানে চৌকি আছে, একটু বোসো না।”

হেমললিনী কহিল, “না বাবা, আমি বসিব না। তুমি কাজ কর!”

সেখান হইতে গিয়া হেমললিনী আল-মারিতে তাহার বইগুলি গোছাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গোছানো বড় বেশি অগ্রসর হয় না। হঠাৎ একএকটা বই হাতে পড়ে, অমনি তাহা খুলিয়া তাহার পাতাগুলি

উন্টাইয়া যায়,—এট বটগুলির পাতার
এককাররচিত হেঁসকল কপা ছাড়া আছে,
তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কতদিনের কত অরচিত
কপা কত অন্তর অকরে জড়িত হইয়া আছে,
তাহারা হেমনলিনীর বুকের মধ্যে—গোড়ো-
বাড়ীর শূকরগুলোর ভিতর দিয়া যেমন
করিয়া সন্ধ্যাবেলাকার পাহী কেবলি অকারণে
আনাগোনা করিতে থাকে, তেমনি করিয়া
কিরিতে লাগিল। তাহার বইসাকানো
শেষ হইল না। আত্মারি বক করিয়া
আবার তাহার পিতার পরনথরে দিয়া
কহিল, “বাও বাবা, তুমি নাইতে বাও,
আমি তোমার বর একটু ওছাইয়া কেণি।”

অন্নদাবাবু কহিলেন “বর ত বেশ
গোছানো আছে, আবার কি ওছাইবে !
হেম, আমার এই ছোট বরটাকে লইয়া আর
কি করিবে বল দেখি যে-একম করিয়া
তুলিয়াছ, এখানে আমার বিছানা না রাখিয়া
দিমির সম্মুখত রাখিলে শোভা পাইত।”

হেমনলিনী কহিল—“না বাবা, তুমি
বাও—সমস্ত পরিষ্কার করিতে হইবে।”

বাধা সন্ধানটির মত অন্নদাবাবু মাথার
হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেলে পর
সমস্ত বিছানাপত্র তুলিয়া, জিনিসপত্র কাড়িয়া,
ঘেঁটা বেছানো ছিল সেটাকে আবার আর-
এক জায়গায় রাখিয়া, বরটাকে হেমনলিনী
আবার নুতনরকম করিয়া সাজাইয়া দিল।
ইহাতে অনেকটা সময় গেল—কিন্তু সমস্ত
কাছের মনো কল্পবেদনা তাহার জবরকে
একমুহূর্ত বিপ্রাম দিল না।

আহারান্তে অন্নদাবাবু তাহার চৌকিতে
গুমহিয়া পড়িলে আজ হেমনলিনী নিজের

শোবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।
বিবাহবাণীপারবর্তিত সোলমালের পর হইতে
অন্নদাবাবু, বোধ করি, কতক পরিচিত
লোকের কৌতুকপট্ট হইতে বকা করিবার
জন্ত উপাসনাপুর্বে যান নাই। আজ হের
যেহের কার্পেটের উপর বসিয়া অত্যন্ত
রীতি অল্পপারে উপাসনা করিতে চেষ্টা
করিল। কিন্তু মনকে কিছুতেই ঠেকাইতে
পারিল না, অন্তরের মধ্যে অন্তর্ধাতিকে
ধরিতে পারিল না। অল্পসময়ে সত্য
উপস্থিত হইয়া উপাসনাকার্য্যে সে অধা-
পালনবরূপ যোগ দিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে
—উপদেশ ও গান শুনিয়া তাহার মনে যে
একটা ভাবোন্ময় হইয়াছে, তাহাকেই সে
কৃতার্থতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু
আজ তাহার অত্যন্ত আবশ্যকের সময়।
আজ সে প্রব একটা-কিছুকে চূড়ান্তিত-
ভাবে ধরিতে চায়; আজ কেবল অধাপালন,
কেবল ভাবের তৃপ্তি নয়,—আজ ডাক্তার
মাছ যেমন করিয়া জল চায়, তেমনি অস্ত্রিয়া
সে শাস্তি ও সাধনা চাহিতেছে। এখন
কিছুতেই কিছু হইল না, তখন হেমনলিনী
কাদিয়া-উঠিয়া কহিল—“এতদিন তবে
আমি কি করিয়ায় ! হৃৎথের দিনের জন্তে,
আমি কিছুই অন্তরের মধ্যে সঞ্চয় করিতে
পারি নাই !”—অনেকদিন পরে তাহার
হার্ণোনিয়মের ধূলা কাড়িয়া ব্রহ্মলীল
পাহিতে বসিল। কিন্তু এ হার্ণোনিয়মে
ব্রহ্মলীলতের রাগিণী ভেদ করিয়া ও কি
স্বর বাজে ! অকস্মেৎ পরিপূর্ণ ও কি স্বর !

ঘরে আঘাতের সঙ্গে ডাক পড়িল—
“হেম !”

হেমনগিনী দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিল
“কি বাবা !”

অন্নদাবাবু কহিলেন “তোমার গান
শুনিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। অনেক-
দিন তোমার গানবাঞ্ছনা শুনি নাই।”

এই বলিয়া তিনি বলিলেন। হেম-
নগিনী কহিল—“বাবা, কি গান গাহিব ?”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“তোমার যে গান
মনে আসে গাও।”

হেমনগিনী— তাহার ত কোনো গানই
মনে আসে না—তুমি বাগা বলিবে, তাহাট
গাহিব।

হেমনগিনীর কাছ হইতে যে সব গান
শোনা তাহার অভ্যাস, তাহারই মধ্যে বাছিয়া
অন্নদাবাবু ফরমাস করিলেন। সেই
পুরাতন গানের খানিকটা গাহিয়াই হেম-
নগিনী হার্ষোনিয়ম বন্ধ করিয়া দিল। তাহার
কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইল
হেম ? গলা ভাল নাই বুঝি !”

হেম সংক্ষেপে কহিল—“না।”—বলিয়াই
সে উঠিয়া পড়িল, এবং ঘরের কোণে তাহার
কাপড়ের আলমারিটা খুলিয়া মিছামিছি
কাপড় খাটিতে খাটিতে তাহার দুই চোখ
দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অন্নদাবাবু কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—মনে
করিলেন, হঠাৎ বুঝি কাপড়সবকে একটা
কোনো কথা তাহার মনে পড়িয়াছে।
কহিলেন, “চল, তবে ও ঘরে বাই।”

হেমনগিনী কহিল—“বাইতেছি।”

অন্নদাবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে
‘হেমনগিনী তাহার বিদ্যাবাহু শুইয়া বালিবে

মুখ ঢাকিয়া কাদিয়া লইল। তাহার পরে
ভাল করিয়া চোখে-মুখে জল দিয়া তাহার
পিতার কাছে গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন “ও বাঁড়ীতে আজ
নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, আমি গিয়া
তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া দিয়া
আসি।”

হেম কহিল—“তিনি নিশ্চয় আজ বাস্ত
আছেন, আজ তাঁহাকে নাই বা ডাকিলে !
তা ছাড়া একটু অপেক্ষা করিয়া দেখ না
বাবা,—তিনি যদি লোকের সঙ্গে ভাল না
বাসেন, তবে আমরা যেন জোর করিয়া
তাঁহাকে আঁতর করিয়া না তুলি !”

অন্নদাবাবু অনিচ্ছাক্রমে হেমের পরামর্শ
গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পরে যোগেন্দ্র উঠিয়া গেলে হেম
অন্নদাবাবুকে কহিল, “বাবা, আজ, তুমি
আমাকে লইয়া একবারটি উপাসনা কর
না !”

তিনি অন্নদাবাবু কণ্ঠকালের অল্প অল্প
হইয়া বসিয়া রহিলেন; একবার চোখ বুজিয়া
নিজের অন্তরের দিকে যেন দৃষ্টিপাত করি-
লেন। তাহার পরে ধীরবরে কহিলেন,
“না হেম, আমি সত্যকথা বলিতেছি, ইচ্ছা
করিলেই আমি উপাসনা করিতে পারি না।
এমন কি, যখন একলা নিভৃত্তে চোঁটা করি,
তখনো অনেকসময় জগদেব মধ্যে গুরুত্ব-
শূন্যতা অনুভব করিয়া কিরিয়া আসিতে
হয়। অল্প কাহাকেও লইয়া কখনো উভয়
করিয়া উপাসনা করিতে গেলে সেই শব্দ-
শূন্য এবং শ্রোতার প্রতি আমার মন
‘নিকপ্ত হইয়া যায়। আমি সাধক নই মা।

আর কেহ যখন উপাসনা করেন, তখন তাঁহার উপদেশে ও খানে যেটুকু লাভ করি, সেই আমার মূল্য ।”

হেমনলিনী কহিল—“কাল রবিবার আছে, কাল আমরা সমাধে যাইব। কি বল বাবা ?”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“বেশ ত !”

পরদিন হুধা উত্তিবার পূর্বেই হেমনলিনী ছাশে উঠিল। তাহার ঈচ্ছা ছিল, প্রশান্ত প্রত্যাশে উপাসনাবারা সে আর-একবার মনকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। ছাশে উঠিয়া দেখিল, হেমনলিনীর বাড়ীর নিকে পশ্চাৎ করিয়া নলিনাক পূর্বমুখ হইয়া জোড়হস্তে নিশ্চলমূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। এট নীতের প্রভাতে তাহার পিঠ হঠাতে খলিত-প্রায় একখানি তদনের চাদর ভূমিপর্গাত লুটাইয়া পড়িয়াছে। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হুধোদ্যোগের কিছুকাল পরে হেম আবার ছাশে উঠিয়া দেখিল, নলিনাক ছাদের মেঝের উপরে হুধোর নিকে মুখ করিয়া পশ্চাসনে বসিয়া আছে। এবারে সে ‘কণকাল’ দাঁড়াইয়া দেখিল—পশ্চাৎ হইতেও বৃত্তিতে পারিল, নলিনাক অমুঠঘারা একএকবার একএকটি নাসারন্ধ্র যোথ করিয়া শ্বাসক্রিয়া লইয়া কি-একটা অভ্যাস করিতেছে। হেমনলিনী কিছুই বৃত্তিতে না পারিয়া আবার হাস হইতে নীচের তলায় নামিয়া গেল।

অন্নদাবাবু মনে করিয়াছিলেন, নলিনাক আজ কোনো একসময়ে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে। সে তাহাকে বুঝাইয়া-

ছিল, নলিনাক যদি তাঁহাদের সঙ্গে প্রাথমীর মনে করে, তবে আপনি দেখা করিতে আসিবে অন্নদাবাবু তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নলিনাককে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর একটি আশ্রয় আকর্ষণ হইয়াছিল। তাহার বুদ্ধ-বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহার মধ্যে যে গভীর-তম অস্তিত্ব আছে, নলিনাকের দ্বারাতেই তাহার পূরণ ঘটবে। তিনি হেমনলিনীকে বলিয়াছিলেন, শুদ্ধমাত্র নলিনাকবাবুর কঠোর গুনিয়াই আমি জানি না কেমন করিয়া বৃত্তিগ্রাহি, তাহার সমস্ত কথা একটা পূর্ণতার মধ্য হইতে উঠিতেছে।

আজও নলিনাকের দেখা না পাইয়া অন্নদাবাবু নিরাশমনে দকার সময় হেম-নলিনীকে লইয়া উপাসনাগৃহে গেলেন। পূর্বে হেম যে তাহা উপাসনালয়ে প্রবেশ করিত, আজ সে তাহা গেল না—কিছু-একটা গুনিয়া আসিবে, করিয়া আসিবে, ভাবিয়া আসিবে বলিয়া নয়, কিছু-একটা লইয়া আসিবে বলিয়াই সে কল্পিত আগ্রহে সতাহলে প্রবেশ করিয়া। কথার উপর কথা, কথার উপর কথা, অনেক কথা সে গুনিল কিন্তু কোথায় সেই কথা, কোথায় তাহার অন্তরঃ অস্তিত্ব, কোথায় তাহার ভূতাত্ত্বিক মন। যখন হেমনলিনী কোনো মধ্যান্তিক প্রয়োজন না লইয়া এখানে আসিয়াছে, তখন সেই কথাপ্রবাহের অনর্গল আঘাতে মনের মধ্যে সে বিচিত্র আন্দোলন অমুভব করিয়া হুধ পাইয়াছে। আজ সে তাহার চেয়ে অনেক বেশি চাহিয়া-ছিল বলিয়া কিছুই পাইল না। তাহার

পক্ষে অনাবশ্যক কথার দ্বারা তাহাকে প্রভা-
করিতে লাগিল ।

১ ঘরে কিয়দূর আসিবার সময় অন্নদাবাবু
গলির ঘোরের কাছেই নলিনাককে দেখিতে
পাইলেন । তাড়াতাড়ি গাড়ি ধাঁড় করাইয়া
নামিয়া পড়িলেন—কহিলেন, “কই নলিনাক-
বাবু, ঘরের পাশে আসিয়া অবধি আপনাকে
যে আর দেখিতে পাই না ।”

নলিনাক কহিল—“প্রয়োজন ‘হইলেট
ডাক মিথেন বলিয়া নিশ্চিত হইয়া আছি ।”

অন্নদা । কোনো কাল যদি না থাকে,
তবে একবার আমাদের ওদিকে চলুন ।
অধিক রাত হয় নাট । আপনার আহার
হইয়াছে কি ?

নলিনাক কহিল, “আমি রাত্রে আহার
করি না ।”

অন্নদা । তবে দয়া করিয়া আমাদের
আহারহলে সাক্ষী হইয়া বসিবেন ।

সেদিন বাড়ী লইয়া গিয়া নলিনাককে
অন্নদাবাবু নানা গভীর বিষয়ে নানা প্রশ্ন
করিতে লাগিলেন । রবিবারে বন্ধুবাড়ীতে
বোগেশ্বরের নিমন্ত্রণ ছিল । নিভৃতঘরে পিতা ও
কজা নিশ্চল হইয়া নলিনাকের মুখ হইতে
তথ্যকথা শুনিতে লাগিল । রাত প্রায় ছই-
এছই হইয়া গেলে বোগেশ্ব আসিতেই তাঁহা-
দের সজা ভাঙিয়া গেল ।

৪৭

১ কয়েকদিনের মধ্যেই নলিনাকের সহিত
অন্নদাবাবুদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল ।
প্রথমে হেমলিনী মনে করিয়াছিল, নলি-
নাকের মত লোকের কাছে কেবল বড় বড়
“আধ্যাত্মিক বিষয়েই বাস্তব উপদেশ পাওয়া

যাটবে—এমন মানুষের সঙ্গে যে সাধারণ
বিষয়ে সহজ লোকের মত আলাপ চলিতে
পারে, তাহা নহেও করিতে পারে নাই ।
অপচ সমস্ত হাতাণাপের মধ্যে নলিনাকের
একটা কেমন দূরত্ব ছিল ।

একদিন অন্নদাবাবু ও হেমলিনীর সঙ্গে
নলিনাকের কথাবার্তা চলিতেছিল, এমন
সময়ে বোগেশ্ব কিছু উত্তেজিত হইয়া আসিয়া
কহিল, “শ্রাম বাবা, আজকাল আমাদের
সমাজের শোকে নলিনাকবাবুর চেলা
বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই লইয়া এই-
মাত্র পরেশের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হইয়া
গেছে ।”

অন্নদাবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, “ইহাতে
আমি ত লজ্জার কথা কিছু দেখি না ।
যেখানে সকলেই গুরু, কেহই চেলা নয়, সেই
হলে মিশিতেই আমার লজ্জাবোধ হয়—
সেখানে শিক্ষা দিবার চড়াযুড়িতে শিক্ষা
পাইবার অবকাশ থাকে না ।”

নলিনাক । অন্নদাবাবু, আমিও আপ-
নার দলে—আমরা চেলায় দল । যেখানে
আমাদের কিছু শিখিবার সম্ভাবনা আছে,
সেইখানেই আমরা তাঁর বহিরা বেড়াইব ।

বোগেশ্ব অধীর হইয়া কহিল—“না না,
কথাটা ভাল নয় । নলিনাবাবু, কেহই যে
আপনার বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পারিবে না
—দ্বাধারা আপনার কাছে আসিবে, তাহারা
আপনার চেলা বলিয়া খ্যাত হইয়া যাইবে,
এমন বদনামটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে ।
আপনি কি-সব কাকত করেন, ওগুলো ছাড়িয়া
দিউন ।”

নলিনাক । কি করিয়া থাকি বলুন !

বোগেন্দ্র। ঐ যে তানবাহি প্রাণায়াম করেন, ভোরের বেলায় হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া থাকেন, বাওঘাওয়া লইয়া নানা প্রকার অশচর্যবিচার করিতে চাড়েন না, ইহাতে দেশের মধ্যে আপনি খাপছাড়া হইয়া পড়েন।

বোগেন্দ্রের এই ভ্রূতবাক্যে বাধিত হইয়া হেমলিনী মাথা নীচু করিল। নলিনাক হাসিয়া কহিল—“বোগেনবাবু, দেশের মধ্যে খাপছাড়া হওয়াটা দোষের। কিন্তু তলোয়ারই কি, আর মাহুবই কি, তাহার সবটাই কি খাপের মধ্যে থাকে? খাপের ভিতরে তলোয়ারের যে অংশটা থাকিতে বাধ্য, সেটাতে সকল তলোয়ারেরই একা আছে—বাহিরের হাতলটাতে শিল্পীর ইচ্ছা ও নৈপুণ্য অনুসারে কারিগরি নানারকমের হইয়া থাকে। মাহুবেও দেশের খাপের বাহিরে নিজের বিশেষ কারিগরির একটা কারণ আছে, সেটাও কি আপনারা বেমখল করিতে চান? আর, আমার কাছে এও আশ্চর্য লাগে, আমি সকলের অগোচরে ঘরে বসিয়া যে সকল নিরীহ অল্পজ্ঞান করিয়া থাকি, তাহা লোকের চোখেই বা পড়ে কি করিয়া, আর তাহা লইয়া আলোচনাই বা হয় কেন?”

বোগেন্দ্র। আপনি তা জানেন না বৃদ্ধি, বাহারি অগস্ত্যের উন্নতির ভার সম্পূর্ণ নিজের বন্ধে লইয়াছে, তাহার পরের ঘরে কোথায় কি ঘটিলে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে। যেইকু খবর না পায়, সেটুকু পূরণ করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের আছে। এনহিলে বিশ্বের সংশোধনকার্য চলিবে কি করিয়া? তা ছাড়া

নলিনবাবু, পাচজনে বাহা না করে, তাহা চোখের আড়ালে করিলেও চোখে পড়িয়া যায়—বাহা সকলেই করে, তাহাতে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। এই দেখুন না কেন, আপনি ছায়ে বসিয়া কি-সব কাণ্ড করেন, তাহা আমাদের হেমের চোখেও পড়িয়া গেছে—হেম সে কথা বাবাকে বলিতেছিল—অথচ হেমও আপনার সংশোধনের ভার গ্রহণ করে নাই!

হেমলিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে বাধিত হইয়া একটাকি বলবার উপক্রম করিষামাত্র নলিনাক কহিল, “আপনি কিছু-মাত্র লজ্জা পাইবেন না; ছায়ে বেড়াইতে উঠিয়া সকালে-সন্ধ্যায় আপনি যদি আমার আত্মিককৃত্য দেখিয়া থাকেন, সেজন্য আপনারা কে দেখা করিবে? আপনার ছুটি চক্ষু আছে বলিয়া আপনি লজ্জিত হইবেন না; ও দোষটা আমাদেরও আছে।”

অরুণ। তা ছাড়া হেম আপনার আত্মিক-স্বন্ধে আমার কাছে কোনো আপত্তি প্রকাশ করে নাই। সে প্রজ্ঞাপূর্বক আপনার সাধন-প্রণালীসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল।

বোগেন্দ্র। আমি কিন্তু ও সব কিছু বুঝি না। আমরা সাধারণ সংসারে সহজরকমে যেভাবে চলিয়া বাইতেছি, তাহাতে কোনো বিশেষ অনুবিধা দেখিতেছি না,—গোপনে অদৃতকাণ্ড করিয়া, বিশেষ-কিছু বেলাভ হয়, আমার তাহা যেন হয় না—বরং উহাতে মনের যেন একটা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া মাহুবেকে একবৌকা করিয়া দেয়। কিন্তু আপনি আমার কথার রাগ করিবেন না—আমি নিতান্ত সাধারণমানুষ; পৃথিবীর মধ্যে

আমি নেহাৎ মাঝারিরকম ভারগাটাতেই থাকি ; বাঁহারা কোনোপ্রকার উচ্চমকে চড়িয়া বলেন, আঁহার পক্ষে ঢেলা না মারিয়া তাঁহাদের নাপাল পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার মত এমন অসংখ্য লোক আছে, অতএব আপনি যদি সকলকে ছাড়িয়া কোনো অদূতলোকে উড়াও হইরা বান, তবে আপনাকে অসংখ্য ঢেলা বাইতে হইবে।

নলিনাক। ঢেলা যে নানারকমের আছে! কোনোটা বা স্পর্শ করে, কোনোটা বা চিহ্নিত করিয়া যায়। যদি কেহ বলে, লোকটা পাগলামি করিতেছে, সেলেমাহুনি করিতেছে, তাহাতে কোনো ক্ষতি করে না—কিন্তু যখন বলে, লোকটা সাধুগিরি-সাধকগিরি করিতেছেন, গুরু হইয়া উঠিয়া সেলামগ্রহের চেষ্টায় আছেন, তখন সে কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতে গেলে বে-পরিস্রাম হাসির দরকার হয়, সে-পরিস্রাম অপরিণাপ্ত হাসি জোগায় না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আঁহার বলিতেছি, আমার উপরে রাগ করিবেন না নলিনবাবু। আপনি ছাণে উঠিয়া যাঁহা খুলি করুন, আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কে? আমার বক্তব্য কেবল এই যে, সাধারণের সৌমান্য মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিলে কোনো কথা পাকে না। সকলের বেরকম চলিতেছে, আমার তেমনি চলিয়া গেলেই যথেষ্ট;—তাঁহার বেশি চলিতে গেলেই লোকের ভিড় জমিয়া যায়। তাহার গালি বিকৃ বা ভক্তি করুক, তাহাতে কিছু আসে-যায় না—কিন্তু জীবনটা এইরকম ভিড়ের মধ্যে কাটানো কি আরামের ?

নলিনাক। যোগেনবাবু, নান্ কোথায় ? আমাকে আমার চাদের উপর ইটতে একেবারে সর্বসাধারণের নান্-বাধানো একতলার মেঝের উপর সবলে হঠাৎ উত্তীর্ণ করিয়া-বিয়া পালাইলে চলিবে কেন ?

যোগেন্দ্র। আজকের মত আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে—আর নহ! একটু খুঁরিয়া আসি গে!

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে পর হেমলিনী দুখনত করিয়া টেবিলতাকার কালরগুলির প্রতি অকারণে উপদ্রব করিতে লাগিল। সে সময়ে অহুদকান করিলে তাহার চক্ষুপূর্ণ-বের প্রাপ্তে একটা আত্মতার লক্ষণও দেখা যাইত।

অমর্য। কহিলেন—“নলিনবাবু, আপনার সাধনভঞ্নের কি প্রণালী, নিশ্চয় জানি না—বোপ করি আমাদের হইতে সত্য। যদি গোপনার না হয়, তবে—”

নলিনাক। কিছু গোপনার নহ। আমার সাধনা অভ্যস্ত প্রকৃত। আমি প্রাণায়াম করি, সে কথা সত্য—আমি প্রভাতের জ্যোতি দৃষ্টির দ্বারা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি, এ কথাও সত্য—আমি নদীর ধলের মধ্যে বুক পর্যন্ত ডুবাইয়া উপাসনা করি, ইহাও মিথ্যা নহ—আমি অনেকসময় স্নানো মাঠের মধ্যে ধূলির উপর লুটাইয়া শুষ্ক হইয়া বহুদীর্ঘ স্পর্শসর্গক্ষে অহুতব করিয়া আসি। ইহাও অস্বীকার করিব না। স্মৃতিষ্ক, জলবাহু, উত্তাপ-জ্যোতির দ্বারা নিখিলের সহিত আমি সম্বন্ধ-বুদ্ধ—আমি সেই বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধজ্ঞকে যদি নিজের মধ্যে সমীপভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে অহুতব করিতে পারি—তবে জগতের মধ্যে

যে পরমহস্তময় আছেন, তাহাকে অবাবহিত-
ভাবে সর্গস্ত্র' উপলব্ধি করিব দেখুন না
কেন, আমরা সচরাচর যে ভাবায় কথা
করিয়া থাকি, কাব্য তাহারই চরমোৎকর্ষ,
সেই উৎকর্ষ তাহাকে এমন শক্তিবান করে,
বাহ্যতে সে বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ
করিতে পারে। আমরা সচরাচর কথাবার্ত্তার
মধ্যেই তাবপ্রকাশের সুবিধার অন্ত যে স্রবের
আভাস লাগাইয়া থাকি, তাহারই চরমোৎকর্ষ
সঙ্গীত—সেই উৎকর্ষ লাভ করিয়া সঙ্গীত
অনির্লঙ্ঘনীয়ক আমাদের চিত্তের মধ্যে সঞ্চার
করিয়া দেয়। তেমনি আমরা নিখাসপ্রবাস,
দর্শনম্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা সাধারণভাবে নিয়-
তই বিষয়ে উপলব্ধি করিতেছি—কিন্তু সেই
ক্রিয়াগুলির বিশেষভাবে যদি উৎকর্ষসাধন
করিয়া তুলি, তবে নিখিল বাস্তব করিয়া যে
অনির্লঙ্ঘনীয় আছেন, তাহাকে আমাদের অন্ত-
রের অন্তরে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারি।
আমি মনে করি, ইহাই প্রত্যক্ষলাভ। যে
বাণী জলে-স্থলে-আকাশে, অগ্নিতে-বায়ুতে,
খাল্ডে-পানীয়ে আছে, আমি আমার চক্ষু-কর্ণ-
নাসিকা-রসনা-ত্বক্কে, আমার বুদ্ধিকে সঙ্গীত-
মনে সেই বাণী, সেই মন্ত্র গ্রহণে নিযুক্ত করি-
রাছি—ইহাতে ঐহারা ধ্বজের লোককে
হারাইলেন বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছেন, তাহা-
দিগকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে,—
সকলকেই লাভ করিব, এই আমার সাধনা ;
কাহাকেই হারাইব, এমন আশির আশ্রয়
নহে।

হেমললিতা একাগ্রমনে নলিনাক্ষের কথা
শ্রবণভঞ্জন। নলিনাক্ষ চুপ করিয়ানাজ
সে অসম্বোধে 'ভক্তাদা' কারণ, "আপনার

বিশেষ ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বের
এই বাণী কি সকলেই শুনিতে পারিবে ?"

নলিনাক্ষ কহিল—“দেখুন, আমরা সকলে
অত্যন্ত বোঁশ শিক্ষিত হইয়াছি—এটা বাঁটি,
ওটা জল, এটা তুচ্ছ, ওটা নিম্নোঁব, এই
বলিয়া আর সমস্ত বিষয়েই আমরা দূরে
কেলিয়াছি। তাই এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের উপর
চিত্তকে বর্ষাধৃতভাবে প্রয়োগ করিয়া ইহা
হইতে-বাহ্য গ্রহণ করিবার, তাহা গ্রহণ
করিতে পারি না—তাহ একমাত্র মাহুঘের
বাক্যের দাস হইয়া পড়িয়াছি। এ কথা
ভাবি না, বাক্য ত একটা প্রতিকলিত পদার্থ-
মাত্র—সেই বাক্য সত্যও হইতে পারে,
মিথ্যাও হইতে পারে কিন্তু যে বিশ্ব সত্যেরই
নির্ধারণদ্বারা, একেবারে সেই বিশ্বের মধ্যেই
কল্পপুট ডুবাঁইবা অন্তরঙ্গ গ্রহণ করিলে
প্রবঞ্চিত হইব না। আমরা যে শৈশব
হইতে কেবল মাহুঘের বাক্য শোনাকেই
শিক্ষা মান করিতে অভ্যাস করিয়াছি—
ঈশ্বরের পাঠশালার, এই সুবিপুল মূল-মূল-
আকাশের কাছে অকৃত্রিম প্রচার সহিত
যাই না, ইহাতেই আমাদেরগকে অন্ধ ও বন্ধির
করিয়াছে।”

হেমললিতা বিজ্ঞাসা করিল, “এই পূর্ণ-
শিক্ষার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করা কি
কঠিন ?”

নলিনাক্ষ। কঠিন বটে। প্রকৃতিভেদে
কাহারো কাছে বোঁশ কঠিন, কাহারো
কাছে অল্প কঠিন। বাক্যের খাঁচার যে
মাহুঘপক্ষী আবদ্ধ থাকিয়া পরের দস্ত দ্বারা
বাহ্য বাঁচরা আছে, বিশ্বের আলোকধোঁত
আকাশে ডিঁড়ি নিভের দ্বারা আবদ্ধ

সমবেশন করার প্রস্তাব সে অসম্ভব মনে
করিয়া ভীত হইয়া উঠে । অন্ন অন্ন করিয়া
তাহার তথ্য তর্জিত হইয়া, তাহার ডানার বুল-
সকার করিতে হয় ।

হেমনলিনী জনগণের বাহিরের দিকে
তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল । সে নিজের
অন্তরের দিকে চাহিয়া অধুনা করিয়াছে,
আজ পর্য্যন্ত অনেক উপদেশবাক্য শুনিয়াও
তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয় নাই । মাঝে
মাঝে তাহার ভাবোন্মত্ত হইয়াছে, চোখে জল
আসিয়াছে, কনক উত্তেজিত হইয়াছে—মনে
করিয়াছে, বৃষ্টি ইহাকেই বলে পাওয়া ।
কিন্তু হাতের মধ্যে, কিছুই পায় না, মনের
মধ্যে নিশ্চরক্সণে, প্রবলপে কিছুই থাকে
না । তবু এতদিন সে জানিত না, উপাসনার
ফল কেবলমাত্র ভাবাহুত্বই নহে, 'জানিত
না, ধর্মের সত্য করতলজন্তু আমলকের ন্যায়
স্থানশিথিল তাহা সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাহা
রূপে-রূপে-রূপে-রূপে আবির্ভূত । নলি-
নাকের কথা শুনিয়া হঠাৎ সে দেখিতে
পাইল, তাহার মন একেবারেই রিক্ত
তাহার চতুর্দিকস্থিত বিষের মধ্যেও তাহার
কোনো অধিকার নাই । সে কাজকর্ম
করিতেছে, সুখঃখ ভোগ করিয়া চলিতেছে,
কিন্তু সে একেবারেই শূন্য—সে এমনভাবে
আছে, যেন সে এই অসীম বিশ্বসংসারের
মধ্যে অশ্রদ্ধা গ্রহণ করে নাই—যেন কেবল সে
এক কলিকাতার গলিতে, এই বাসার মধ্যেই
আছে । দিনে দিনে নলিনাকের সহিত
আলাপ করিতে করিতে সে আপনার
অন্তরের দৈত্য দেখিতে পাইল এবং নলি-
নাকের পথ অনুসরণ করবার দ্রুত বাকুল-

ভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিল । অতঃপর
সবর যখন সে অন্তরে-বাহিরে কোনো
অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখনই
নলিনাক বিষকে তাহার সম্মুখে যেন নুতন
করিয়া উপস্থাপিত করিল । হেমনলিনীর
পূর্বাভাস চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা
শকতের আঘাত পাইয়া একমাত্রসময় তাড়িয়া-
চুরিয়া পথ হইতে বিক্ষিপ্ত ও অচল হইয়া
পড়িয়া ছিল । তাহার উপর দিবা দিনের পর
দিন বৃষ্টি বাইতেছিল—তাহার জীবনের
সম্মুখে কোনো লক্ষ্য ছিল না । কেমন করিয়া,
কি গঠিয়া সে যে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা
প্রতিদিনই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না—
এমন ভয়ানক নলিনাক তাহাকে চলিবার
পথ ও বাঁচিবার উৎসাহ দান করিল । তখন
চারিদিকের মত একটা নিরম্মলনের দ্রুত
তাহার মন কিছুদিন হইতে উন্মত্ত ছিল—
কারণ, নিরম্ম মনের পক্ষে একটা দৃঢ় অব-
লম্বন—তবু তাহাই নহে, শোক কেবলমাত্র
মনের ভাব-আকারের টিকিতে চাপ না, সে
বাহিরেরও একটা-কোনো কঙ্কসাধনের মধ্যে
আপনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে ।
এপর্য্যন্ত হেমনলিনী পেরুপ কিছুই করিতে
পারে নাই,—লোকচক্ষুপাতের সঙ্কেতে বেদ-
নাকে সে অতঃপর গোপনে আপনায় মনের
মধ্যেই শালন করিয়া আসিয়াছে । নলিনাকের
সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া আজ যখন
সে শুভি আচার ও নিরামিষ আহার গ্রহণ
করিল, তখন তাহার মন বড় তৃপ্তিলাভ
করিল । নিজের শরনধরের মধ্যে হইতে
মাজুর ও কার্পেট তুলিয়া-ফেলিয়া বিছানাটি
একবারে পদার ধার আড়ান করিল—সে

ঘরে আর-কোনো জিনিষ রাখিল না। সেই মেয়ে প্রত্যাহ হেমলিনীকে সহজে মল ঢালিয়া পরিষ্কার করিত। একটি রেকাবিতে কয়েকটি ফুল থাকিত; মানান্তে শুভবস্ত্র পরিয়া সেই ঘানে মেয়ের উপরে হেমলিনী বসিত—সমস্ত মুক্তবাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে অব্যাহিত আলোক প্রবেশ করিত, এবং সেই আলোকের দ্বারা আকাশের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা সে আপনার অন্তঃকরণকে অভিযুক্ত করিয়া লইত। অন্নদাবাবু সম্পূর্ণভাবে হেমলিনীর সহিত যোগ দিতে পারিতেন না—কিন্তু নিরুপপালনের দ্বারা হেমলিনীর মুখে যে একটি পবিত্র পরিভূষিত দীপ্তি প্রকাশ পাইত, তাহা দেখিয়া রুদ্ধের মন শ্রিত হইয়া যায়। এখন হইতে নলিনাক আসিলে হেমলিনীর এই ঘরেই মেয়ের উপরে বসিয়া তাঁহাদের তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলিত।

যোগেশ্বর একেবারে বিব্রোহী হইয়া উঠিল—“এ সমস্ত কি হইতেছে! তোমরা যে সকলে মিলিয়া বাড়ীটাকে ভয়ঙ্কর পবিত্র করিয়া তুলিলে আমার মত লোকের এখানে পা রেলিবার ভাষণ নাই।”

আগে হইলে যোগেশ্বরের বিজ্ঞে হেমলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত;—এখন অন্নদাবাবু যোগেশ্বরের কণার মাঝে মাঝে রাগ করিয়া উঠেন, কিন্তু হেমলিনী নলিনাকের সঙ্গে যোগ দিয়া শান্তমুখে হাত করে। এখন সে একটি দ্বিধাহীন নিশ্চিত নির্ভর অবলম্বন করিয়াছে—এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করাকে সে চরিত্রতা বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে তাহার এখনকার সমস্ত আচরণকে

অদ্বুত মনে করিয়া পরিহাস করিতেছে, তাহা সে জানিত কিন্তু নলিনাকের প্রতি তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস সমস্ত লোককে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিয়াছে—এইজন্য লোকের সম্মুখে সে আর সঙ্কুচিত হইত না।

একদিন হেমলিনী প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা শেষ করিয়া তাহার সেই নিযুক্ত ঘরটিতে বাতায়নের সম্মুখে শুভ হইয়া বসিয়া আছে, এমনসময় চঠাৎ অন্নদাবাবু নলিনাককে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হেমলিনীর কদর তখন পরিপূর্ণ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে নলিনাককে ও পরে তাহার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদগুলি গ্রহণ করিল। নলিনাক সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “বাস্ত হইবেন না নলিনাবাবু, হেম আপনার কর্তব্য করিয়াছে।”

অল্পদিন এত সকালে নলিনাক এখানে আসে না। তাই বিশেষ উৎসুকতার সহিত হেমলিনী তাহার সূঁথের দিকে চাহিল। নলিনাক কহিল, “কান্না হইতে মার খবর পাওয়া গেল, তাহার শরীর তেমন ভাল নাই, তাই আজ সকাল ট্রেনে কান্নাতে বাইখ স্থির করিয়াছি। দিনের বেলায় খবরসম্বৎ আবার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হইতে হইবে, তাই এখন আপনাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“কি আর বলিব, আপনার মার অসুখ, ভগবান করুন তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন। এই করদিনে আমরা আপনার কাছে সে উপকার পাইয়াছি,

তাঁহার ঋণ কোনোকালে শোধ করিতে পারিব না।”

নলিনাক্ষ কহিল “নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের কাছ হইতে আমি অনেক ঋণকার্য পাইয়াছি। প্রতিবেশীকে যেমন দাসত্ব দিয়া করিতে হইত, তাহা শুধু করিয়াই ছেঁদে—তা ছাড়া যে সকল গভীর কথা গইয়া এতদিন আমি একলা মনে মনে আলোচনা করিতে ছিলাম, আপনাদের প্রকার দ্বারা তাহাকে নূতন ভেঙ্গ দিয়াছেন আমার ভাবনা ও সাধনা আপনাদের জীবন অবলম্বন করিয়া আমার পক্ষে আরো বিগুণ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অল্প মাহুষের চন্দরের সহযোগিতার সাধকতানিভ যে কত সহজ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।”

অন্নমা কহিলেন, “আমি আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, আমাদের একটা-কিছু বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সেটা যে কি, আমরা জানিতাম না—ঠিক এমন সময়ই কোথা হইতে আপনাকে পাইলাম, এবং দেখিলাম, আপনাকে নহিলে আমাদের চলিত না। আমরা অত্যন্ত ক্লেশ, লোকজনের কাছে ঘাটাত্ত আমাদের বড় বেশি নাই—কোনো সত্য দ্বিগুণ বক্তৃতা শুনিবার বাতিল : আমাদের একেবারে নাই বলিলেই হয়—

যদি-না আমি যাই, কিন্তু হেমকে নড়াইতে পারা বড় শক্ত। কিন্তু সেদিন এ কি

“আশ্চর্য্য বলুন দেখি—যেহুনি যোগেশ্বরের কাছে গুলিলাম আপনি বক্তৃতা করিবেন, আমরা দুজনই কোনো আপত্তি প্রকাশ না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম—এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। এসব

কথা মনে রাখিবেন নলিনাক্ষ! ইহা হইতে বুঝিবেন, আপনাকে আমাদের নিঃসন্দেহ প্রয়োজন আছে, নহিলে এমনটি ঘটতে পারিত না। আমরা আপনার দায়বদ্ধগণ!”

নলিনাক্ষ। আপনারাও এ কথা মনে রাখিবেন, আপনাদের কাছে ছাড়া আর কাহারো কাছে আমি আমার জীবনের গুরুত্ব প্রকাশ করি নাই। সত্যকে প্রকাশ করিতে পারাই সত্যসম্বন্ধে চরম-শিক্ষা। সেই প্রকাশ করিবার গভীর প্রয়োজন আপনাদের দ্বারা মিটাইতে পারিয়াছি। অতএব আপনাদিগকে আমার যে কতখানি প্রয়োজন ছিল, সে কথাও আপনারা কখনো ভুলিবেন না।

হেমনলিনী কোনো কথা কহে নাই; ব্যত্যয়নের ভিতর দিয়া রৌদ্র আসিয়া যোজের উপরে পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনাক্ষের বথন উঠিবার সময় হটল, তখন সে কহিল—“আপনার মা কেমন থাকেন, সে খবর আমরা যেন জানিতে পাই।”

নলিনাক্ষ উঠিয়া পাঁজাইতেই হেমনলিনী পুনর্বার তাহাকে ভ্রূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।

৬৮

এ কয়দিন অক্ষর দেখা দেয় নাই। নলিনাক্ষ কান্দিতে চলিয়া গেলে আজ সে বৌগেঞ্জের সঙ্গে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে দেখা দিয়াছে। অক্ষর মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, রমেশের স্থিতি হেমনলিনীর মনে কতখানি জাগিয়া আছে, তাহা পরিমাপ করিবার সচল উপায় অক্ষরের পাত তাহার বিরাগ-

প্রকাশ । আর দেখি—, হেমলিনীমীর মুখ
প্রশান্ত—অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার মুখের
তাব কিছুমাত্র বিকৃত হইল না—সহজ
প্রসন্নতার সহিত হেমলিনী কহিল—
“আপনাকে যে এতদিন দেখি নাই ?”

অক্ষর কহিল, “আমরা কি প্রত্যহ
দেখিবার যোগ্য ?”

হেমলিনী হাসিয়া কহিল, “সে যোগ্যতা
না থাকিলে যদি দেখাশোনা বন্ধ করা
উচিত বোধ করেন, তবে আমাদের অনেক-
কেই নির্জনবাদ অবলম্বন করিতে হয়।”

যোগেন্দ্র । অক্ষর মনে করিয়াছিল,
একলা বিনয় করিয়া বাহ্যভরি লইবে, হেম
তাহার উপরেও টেকা দিয়া সমস্ত মনুষ্য-
জাতির হইয়া বিনয় করিয়া লইল, কিন্তু এ
সম্বন্ধে আমার একটুখানি বলিবার কথা
আছে। আমাদের মত সাধারণ লোকই
প্রত্যহ দেখাশোনার যোগ্য—আর দ্বারা
অসাধারণ, তাঁহাদিগকে কদাচ-কখনো দেখাই
ভাল, তাহার বেশি সহ করা শক্ত। এই-
জন্যই ত অরণ্য-পর্বতে-গহ্বরেই তাঁহারা
যুগ্ম বেড়ান—লোকালয়ে তাঁহারা স্থা-
ভাবে বসতি আরম্ভ করিয়া দিলে অক্ষর-
যোগেন্দ্র প্রকৃতি নিভাস্তই সামান্ত লোকদের
পক্ষে ভারি মুকিল।

যোগেন্দ্রের কথাটার মধ্যে যে বোঁচা ছিল,
হেমলিনীকে তাহা বিঁধিল। কোনো
উত্তর না দিয়া তিনিপেরালা চা তৈরি করিয়া
সে অন্নদা, অক্ষর ও যোগেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপন
করিল। যোগেন্দ্র কহিল, “তুমি বুঝি চা
খাইবে না ?”

‘ হেমলিনী ভাবিত, এবার যোগেন্দ্রের

কাছে কঠিন কথা ভাবিতে হইবে, তবু সে
শান্ত মূর্ততার সহিত বলিল,—“না, আমি চা
ছাড়িয়া দিয়াছি।”

“যোগেন্দ্র । এবারে দ্রুতিমত তপস্কা
আরম্ভ হইল বুঝি ! চাহের পাতার মধ্যে
বুঝি আধ্যাত্মিক তেজ, যথেষ্ট নাই, থাকিছু
আছে, সমস্তটী হস্তকির মধ্যে ? কি বিশদেই
পড়া গেল। হেম, ও সমস্ত রাখিয়া দাড়া
একপেরালা চা খাইলেই যদি তোমার যোগ-
বাগ ভাঙিয়া যায়, তবে থাক না। এ সংসারে
পুণ্য মজুত জিনিষও টেকে না, অমন লম্বকা
ব্যাপার লইয়া পাঁচজনের মধ্যে চলা অসম্ভব।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া বহুতে আর-
এক-পেরালা চা বৈরি করিয়া হেমলিনীর
সম্মুখে রাখিল। সে তাহাতে হস্তক্ষেপ
না করিয়া অন্নদাবাবুকে কহিল, “বাবা, আজ
যে তুমি শুধু চা খাইলে, আর কিছু
খাইবে না ?”

অন্নদাবাবুর কঠোর এবং হাত কাঁপিতে
লাগিল,—“না আমি সত্য বলিতেছি, এটোবিলে
কিছু খাইতে আমার মুখে রোচে না।
যোগেন্দ্রের কথাগুলো আমি অনেককাল
পর্যন্ত নীরবে সহ করিতে চেষ্টা করিতেছি।
জানি, আমার শরীরমনের এ অবস্থায় কথা
বলিতে গেলেই আমি কি বলিতেছি
বলিয়া কেলি—শেষকালে অসুতাপ করিতে
হইবে।”

হেমলিনী তাহার পিতার চেয়ারের
পানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বাবা, তুমি
রাগ করিও না ! দাদা আমাকে চা খাওয়া-
ইতে চান, সে ত ভালই আমি ত কিছু
ভাঙাতে মনে করি নাট। না বাবা,

তোমাকে খাটতে চাইবে না। খাটিলে তোমার অস্থির করে আমি জানি।”

এই বলিয়া হেম আহার্যের পাত্র তাহার বাপের সন্মুখে টানিয়া আনিয়া। অল্পদা-
বীরে ঘরে খাটতে লাগিলেন।

হেমললিনী নিজের চোকেতে ক্রিয়া-
আদিয়া বোগেশ্বরের প্রস্তুত চাষের পেয়ালা
হইতে চা খাটতে উত্তত হইল। অক্ষর
তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল—“মাণ করিবেন,
ও পেয়ালাটি আমাকে দিতে চাইবে, আমার
পেয়ালা ফুরাইয়া গেছে।”

বোগেশ্বর উঠিয়া-আসিয়া হেমললিনীর
হাত হইতে পেয়ালাটা টানিয়া লইল এবং
অল্পদাকে কহিল, “আমার অন্তর চাইয়াছে,
আমাকে মাণ কর।”

অল্পদা তাহার কোনো উত্তর-করিতে
পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে তাঁহার চুই
চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বোগেশ্বর অক্ষরকে লইয়া আস্তে আস্তে
ঘর হইতে ধরিয়া গেল। অল্পদাবাবু অহার
করিয়া উঠিয়া হেমললিনীর হাত ধরিয়া
কম্পমানচরণে উপরের ঘরে গেলেন।

সেই রাত্রেই অল্পদাবাবুর শূলবেধনার
মত হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা
করিয়া বলিল, “তাঁহার বক্তৃতির বিকার উপ-
স্থিত হইয়াছে—এখনো রোগ অগ্রসর হয়
নাই, এইবেলা পশ্চিমে কোনো বাত্মকর
হানে পিয়া বৎসরবানেক কিংবা ছয়মাস
বাঁস করিয়া আসিলে শরীর নির্দোষ হইতে
পারিবে।”

বেশনা উপনয় হইলে ও ডাক্তার চলিয়া,
গেলে অল্পদাবাবু কহিলেন, “হেম, চল মা,

আমরা কিছুদিন না চঃ কাশীতে গিয়াই
পাকি।”

ঠিক একই সময়ে হেমললিনীর মনেও
সে কথা উদয় হইয়াছিল। নলিনাক্ষ চলিয়া
গাইবান্ধা হেম আপন সাধনসম্বন্ধে একটা
দুর্জলতা অস্থত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।
নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমললিনীর
সমস্ত আত্মিকক্রিয়াকে যেন বৃদ্ধ অবলম্বন
হিত। নলিনাক্ষের মুখভিত্তিতে যে একটা
দ্বির নিষ্ঠা ও প্রশান্ত এসমস্ততার বীজি
ছিল, তাহাই হেমললিনীর বিশ্বাসকে সর্বদাই
যেন বিকলিত করিয়া রাখিয়াছিল; নলি-
নাক্ষের অবর্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে
যেন একটা স্নানচ্ছায়া আসিয়া পড়িল।
তাই আজ সমস্তদিন হেমললিনী নলিনাক্ষের
উপদিষ্ট সমস্ত অমুষ্ঠান অনেক ভোর করিয়া
এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু
তাহাতে প্রাপ্তি আসিয়া এমন নৈরস্ত উপ-
স্থিত হইয়াছিল যে, সে অশ্রু সংবরণ করিতে
পারে নাই। চাষের টেবিলে বৃদ্ধতার স্মৃতি
সে আতিথ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার
মনের মধ্যে একটা তার চাপিয়াছিল।
আবার তাহাকে তাহার সেই পূর্বস্মৃতির
বেদনা বিগুণবেগে আক্রমণ করিয়াছে—
আবার তাহার মন যেন গৃহহীন, আশ্রয়হীনের
মত হাহা করিয়া বেড়াইতে উত্তত হইয়াছে।
তাই যখন সে কাশী বাইবার প্রার্থন শুনিয়া,
তখন ব্যগ্র হইয়া কহিল, “বাবা, সেই বেশ
হইবে!”

পরদিন একটা আয়োজনের উদ্দেশ্যে
বেথিয়া বোগেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল—“কি,
বাপারটা কি?”

অথবা কহিলেন—“আমরা পশ্চিমে যাই-
তেছি।”

যোগেন্দ্র বিজ্ঞাপা করিল—“পশ্চিমে
কোপায়?”

অথবা কহিলেন—“ঘুরিতে ঘুরিতে একটা-
কোনো জায়গা পছন্দ করিয়া লইব।”—তিনি
যে কান্নিতে ঘাইতেছেন, এ কথা একদমে

যোগেন্দ্রের কাছে বলিতে সম্মুচিত
হইলেন।

যোগেন্দ্র কহিল—“অর্মি কিং এবার
ভৌমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি
সেই হেড্‌কোয়ার্টারের নিকট দরবার পাঠাইয়া
দিয়াছি, তাহার উত্তরের মন্ত্র অপেক্ষা করি-
তেছি।”

ক্রমশঃ ।

যাত্রা ও থিয়েটার ।

যাত্রা একটা ভয়ানক ভিড়—এখানে নিরাম ও
মৃৎশিলার কোন চিহ্ন নাই। খেলোয়াড়গণের
সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গী, এমন কি, পাদক্ষেপ
পর্যন্ত সকলই কতকটা অভূতপূর্বের।
যিনি ত্রৌপদী সাজিয়াছেন, তাহার ভাল
করিয়া গৌরু কামান হয় নাই, আবার বেশ-
হুয়ার কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া হয় ত
তিনি কৃত্রিম অভিনয় জুড়িয়া দিলেন।
অধিকারিমহাশয়ের শিক্ষকের ভাবে ইতস্তত
বৃষ্টিক্ষেপ, এবং সমস্তবিশেষে সঙ্গীতকারী
কোন বালকের রহসি কর্ণপীড়ন; এই নারদ
রূপাধানে বশোদাকে প্রবেশ দিতেছেন, আবার
তখনই উত্তরকালে পাদক্ষেপপূর্বক ফিরিয়া-
দাড়াইয়া অল্পনাসিকবরে “এই ত মধুরার
আগমন করুন” বলিয়া এক স্থানেই অস্ত
বৃত্তের অবতীর্ণা, এ সকল অপার হস্তরসের
বিষয়। বালকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ সাবিত্রী
সাজিয়াছে, কেহ বা ঐহার মতী সাজিয়াছে;
অধিকারিমহাশয় একটা গানে টান দিলেন,

সেই যোগে সাবিত্রী তাহার মণীর হাত
হইতে হঁকাটি পাইয়া প্রাণপণে একবার
তামাকটানিয়া লইল সেই মৃৎপটল অল্প-
কূলপবনে মণিকমণ্ডলীর মুখের উপর লইয়া-
আসিয়া সাবিত্রীর চিহ্ন মানমপটে ক্ষণকাল
আঁধার করিয়া ফেলিল। রাগরাগিণী-আলাপ-
কারী বালকের প্রাণান্ত চীৎকারের মত
মুগ্ধভঙ্গী—বাহা তাহার সঙ্গীত অভ্যাসকালীন
কানমলাকে মণিকরের কল্পনার সম্মুখে
উপস্থিত করে—রবিগণের শগুণাটিনির্মিত
দীর্ঘ শব্দরাশি, বাহার প্রান্তস্থিত হলের
সঙ্গে কর্ণের বহন স্পষ্ট প্রত্যক—নিজের
বক্তব্য-সমাধা-অন্তেই তৎক্ষণাৎ রবিমহাশয়-
কর্তৃক বেহালার কর্ণপীড়ন, কিংবা বাঁধা-
তাড়ন,—আর সেই “নীলমবরণ, পীতবসন,
ভবভয়ভঞ্জন, কলসদমন, লীলাঘর” প্রকৃতি
বাঁধা বিশেষণরাশির অল্পশ উল্লিখণ কিংবা
কোন বৃত্তবর্ণনোপলক্ষে “তৎকল্পব কি
শোভাই ধারণ করেছে, কুহুমকুল জুড়িয়া”

আছে, ডাঙে ডাঙে বিহগগণ গান করছে, অপরিসর গুন্ডুন শব্দ তুলেছে, ঘাটা কি মনোহর, কাকিলকাকিলা—ইত্যাদি-
 একাত্তর একত্রে বিস্তৃত আবৃত্তি—এ সমস্তই এই নাটকবর্ণনাত্মক ব্যক্তিগণের রসভঙ্গ না করিয়া যায় না। ইংরাজ পর জুড়িবল “রাজ-
 সিংহাসনে বসিতে বাসনা” বলিয়া এখন সমকালে অপরূপভাবে মুখভঙ্গী ও হস্তপ্রদারণ পূর্বক সাহিত্যে থাকে এবং অনেক সময়ে তান বেওয়ার উপলক্ষে সঙ্গীতকে হেয়ভাবে পরিগণ্য করে, তখন ক্রমশঃ মাগার বাঁধিয়া শব্দপীড়া নিবারণ করিতে হয়। শুনিবাছি, এইরূপ এক জুড়ীর দলের চৈৎকার অসহ্য হওয়াতে বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট বেলুসাৎবে ক্রুদ্ধ হয়ে বলিয়াছিলেন—“বোক্তারগোথকে বৈঠক্নে কহো।”

ইংরাজ তুলনার পিরেটার বর্ণনা রাজ হানের আর্কলিপপত্রতঃ হটক (কংবা বেকুতে বিস্তার মন্দির হটক, হুন্সর বৃদ্ধপটলি বর্ণিত) হানসমূহের মাতাস দিতে সচেষ্ট; অভিনেতৃগণ সাত্তাবিকভাবে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি বাহার সঙ্গে উপস্থিত হয়, পরিচ্ছন্ন ও সজ্জীতে তাহারই বিভিন্ন জন্মাইয়া থাকে। যদি একজন অভিনেতাকেই অগতঃ বিহু ও বীরসিংহের অভিনয় করিতে হয়, তবে এমনভাবে মূর্তির পরিবর্তন করিয়া যেন যে, কে আর তাহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিবে? এদিকে কথাগুলি সব ছোটখাট—বক্তার সেই অর্ধঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় তুলনার তাহা কি আরামদায়ক! এখানে ভীম গদা বাড়ি করিয়া উঠত গুন্ড উৎসেপপূর্বক একঘণ্টাকাল মধ্যে দস্ত

নিশ্চেষ্ট করিতে থাকে না। এখানে অনেক বৃদ্ধপট এমন হুন্সর হই যে, অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদের বর্ণের সঙ্গে একত্রে রাধিরা পশ্চাত্ত্বিত প্রাদাশাবল্য কিংবা তরুণলবাহি চকুর কৃষ্ণাধারন করে। এখানে ছই বীরবর হুন্সর পূর্বে বাগ্‌হুন্সই একদণ্ড কাটাইয়া দেন না ও তাহাদের মুখনিঃসৃত নিঃশ্বাস-কণা শ্রোতার গাত্র দিক্ত করে না। এই সকল নানা কারণে গাজা দেখার পর থিরেটার দেখার কি আরাম

কিন্তু তবু বলিব, পিরেটার চিত্রের হিসাবেই সুপ্রী। আমাদের দেশীজনের খাটি ও বিচিত্র ভাবরাশি স্বল্পপ্রকারপৃথগ্যাবল্লীত ব্যক্তার মধ্যে বেল্লপ বিকাশ পাইত, থিরেটারে তাহা পায় নাই। ঠকা ছাড়া থিরেটারে যে সকল পুত্রক অভিনীত হয়, তাহার অনেকগুলি অভিনেতার কৃত্রিম ও পরাম্বল্লকগ-মোহন; সেগুলি ইংরেজীধরণের বক্তৃতার উদগ্র, অগতঃ ইংরেজীনাটকের আখ্যান ভাগ থেক্স ঘটনা ও কথের বিভিন্নতার চিত্র আকৃষ্ট করে, এগুলি তাহা করেন। ইংরেজীনাটকের নকল করিয়া আমরা নাটক রচনা করিতে যাই, কিন্তু তাহা গ্রহন হইয়া পড়ে। গেডিনাক্‌বেপ্ কিন্তু হইয়া প্রলাপ বিকণ্ডেন, এই দুটোকে বা অপর কোন দুটোকে গ্রাহনই রসমকের শেষকাণ্টা ক্ষিপ্ততার অভিনয়ে অসহনীয় হইয়া উঠে; বড় বড় ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের শেষ অর্কে গ্রাহন দেখা যায়, কোন স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ উচ্চক্ষে চই হাত প্রদারণ করিয়া আশিয়া বলিয়া থাকেন—“ও কি দেখছি, ঐ যে অসহ্যপূর্ণ ছায়ার জা

মুক্তি । এইভাবে ক্ষণে ভরে উড়নভ হইয়া
 মুক্তি হইয়া পড়; নতুবা: সর্বদানে যে সমুদ্রে
 অমূল্যনির্দেশপূরক ভাষামি কহা—
 আত্মকাল নাটকগুলির একটা কাণানু
 ধাড়াইয়াছে। পৃথিবীতে অনেকে ভীষণ
 পাপ করে, অনেকে শোকহুঃখ সহ
 করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই কিন্তু হইয়া
 পড়ে না। পাপ বা শোকভাষের অবশ্যস্বার্থী
 পরিণাম যে ক্ষিপ্ততা, এই ধারণা নাটককার-
 গণের মস্তক হইতে কবে দূর হইবে এবং
 উচ্চবুদ্ধি, বর্তমান দৃষ্টি, —শেবাকের অপরিহার্য
 এই মুক্তি হইতে রক্তকণ্ডলি কবে নিস্তার
 পাইবে? তার পর অসামান্য নৈসর্গিক ঘেন
 আত্মকাল অনেক নাটকের কাণানের মধ্যে
 ধাড়াইতেছে। জলের মধ্যে নারকনারিকার
 দুঃখাংক্ষেপ ও হাঁকাইতে হাঁকাহতে প্রেমের
 বক্তৃতা আত্মকাল প্রতাপ ও নৈবলিনীর
 দেখাশোনা অপরাধের নারকনারিকার অত-
 ক্রম করিতেছেন। স্বভাবের প্রবর্তনায় যে
 ছবিটি আপনি জন্মের হয়,—অশ্রুক্ষেপে তাহা
 স্বেচ্ছা হয় না। পৌরাণিক নাটকগুলিতে
 প্রায়ই দৈবশক্তির উপর বড় বেশী নির্ভর—
 দেবদেবীরা এত ঘনঘন আসিতেছেন যে,
 মানুষের বস্তুগুলি সংকল্প, তাহারাই ঘেন
 হাতে ধরিয়া করাইয়া দিতেছেন, সুতরাং
 তাহা জ্বর স্পর্শ করে না। পৌরাণিক
 বিষয়ের কাহিনীর অংশ সঙ্গীত দিয়া
 আগাইলে জন্মের হয়, এ বিষয়ে যাত্রার যে
 সফলতা হইত—নাটকে তাহা কিছুমাত্র হয়
 না। প্রাচীন যাত্রার ধনন প্রভাসদ্বয়ের
 চর, কি চরিত্রের মধুরায় প্রদান, নান
 বিভিন্নগণ ও কল্পনার চরিত্র মনোমালী

হইয়া প্রোত্যাদের সমুদ্রে আঁকত হইয়া উঠিত,
 তখন সেই উচ্চাৎ জন্মপ্রোত্যে কলকলোল
 একবারে ধামিয়া বাইত। "দৃষ্টপটের অভাব,
 রথি কি যশোদার অবশ্যকৃত সাক্ষ্য—
 এ সকল নত নত ক্রটি তখন আর অদৃষ্টাৎ
 রসভঙ্গ করিতে পারিত না;—যাত্রার অধ্যাক-
 গণ দর্শকের অন্তরে যে সকল অশ্রুটানে ক্রটি
 করিতেন, কল্পনাময়ী আসিয়া অশ্রুক্ষেপে
 নিবৃত্তিতে তাহা পূরণ করিয়া বাইতেন। কহা
 অপেক্ষা মানই সাধারণের চিতে তাব উজ্জেক
 করিতে বেশী সমর্থ; থিয়েটারের যথাসমর্থ
 কথা, কিন্তু যাত্রার যথাসমর্থ গান। যাত্রা-
 গুলি যে এখন একদল হস্তী হইয়া পড়িয়াছে,
 তাহার প্রধান কারণ, থিয়েটারের অশ্রুক্ষেপে
 কথার অবতারণা। যাত্রার যে অশ্রু, তাহাকে
 তাহাই মানায়;—নারদ যদি বীণ ছাড়িয়া
 গাভীর ধরেন কিংবা অশ্রু গাভীর ছাড়িয়া
 বীণা ধরেন, তাহা হইলে তাহাদের যে দুঃখ
 হয়, থিয়েটারের অশ্রুক্ষেপ করিতে গিয়া আত্ম-
 কালকার যাত্রার তাহাই হইয়াছে। তরতীমলন,
 রামধনবাস কিংবা কৃষ্ণগীতা তিনটা পুঙ্কে
 যে অনিন্দ্য, যে নৈতিক শিক্ষা হইত, এখন
 থিয়েটারে স্বেচ্ছা হয় না। যাত্রার হস্তগোলা
 আমোদ আসিয়া জীবন দিয়া বাইত, জ্বর
 করণা কিংবা পরপ্রীতিতে শিক্ত করিয়া দিত,
 কিন্তু থিয়েটারের আমোদ বিচিত্র বাজির
 তার চকের সমুদ্রে পুড়িয়া তখনই ছাই হইয়া
 যায়; যাত্রা গাহা বিদায়কালে দিয়া বাইত,
 রক্তমি তাহা দেয় না। যাত্রা চক্র সমুদ্রে
 অশ্রু দেখাইত, কিন্তু চক্র হইতে দূরে চের
 বেশী দেখাত; যে সব দৃষ্ট যাত্রা ওয়াগারা
 আঁকিয়া দেখাত না, দর্শকের কল্পনা

তাঁহা স্থির করিয়া আঁকিতে প্রবৃত্ত হইত। কল্পনা ও ভাবের রাজ্যে সকল কথা বাস্তব করিয়া কোণে দর্শক কি শ্রোতার মনের চক্ষু ও মনের কর্ণের মস্ত আঁর কি রাখা হইল ! সহস্র চোঁটার বৈকুণ্ঠ-ধাককে দৃষ্টপটে আঁকিতে চেষ্টা করিলেও কর্ণকের চক্ষে আদর্শ ধর্ম হইয়া বাইবে, কিন্তু দর্শককে কথার ইঙ্গিত দিয়া যদি তাঁহার কল্পনাকে সজাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে কল্পনামোহী যাহা আঁকিবেন, হটালোর চিত্রকরও তাহা কখনই পারিবে না। ব্যস্তের গানগুলি শ্রোতার মনের ভিতর দিয়া অবশ্যই নানা বিচিত্রছন্দ ও রাগিণীতে চিত্ত ভরিয়া ফেলিত। গানটি যেমন স্মৃতিতে পাঁথিরা-আনিয়া কল্পনার দ্বারা তাহা পটুত্বিত করা যায়, কথাগুলিকে সেরূপ করিয়াই না। রসালয়ে গান না আছে, তাহা নহে কিন্তু গান সেখানে কথার আড়ালে পড়ে। আমি অপেরার কথা বলিতেছি না, আমাদের রসালো অপেরা এখনও সেরূপ প্রাধান্যলাভ করে নাই।

এই যাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাসমিলনের সেই ছোঁচের নিকট রাণীর অহ্নয়ের দৃষ্ট মনে পড়ে। কোথার দার, কোথার ধারী, কোথার মধুরা ! কোন দৃষ্ট নাই, রাণী বালকবৃন্দের সঙ্গে একত্রে মিলিয়া গান গাহিতেছেন, কিন্তু শ্রোতা সেই যাত্রার বাহু দৃষ্টপটাদির অভাবের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, গানের করুণ ছন্দ তাঁহাকে সত্যসত্যই মধুরাপুরীতে লইয়া গিয়াছে। হুখিনী যশোদাকে জীবন্ত করিয়া দেখাইতেছে। সেট বিলাপ, সেই আঁধার উত্তরে এখন যারা কঠোর ভাবের তাঁহাকে

সরাইয়া দিতেছে, সমস্ত মাতৃদয় ব্যাকুল-ভাবে লুটাইয়া পড়িতেছে, তখন যজ্ঞবলে শ্রীকৃষ্ণের সহসা মাতাকে মনে পড়িল—বোধ হয়, মাতৃদয়ের এই ঘোর দুঃখ কোন অলঙ্কিত তদ্রূপে মাতার পোকমুহুরান চিত্রটি মনে আগাহিয়াছিল। যজ্ঞবলে আর এক দৃষ্ট উপস্থিত হইল; মধুরার মহারাজের হস্ত হইতে যজ্ঞের বারিষ্পূর্ণ তুলাটি খসিয়া পড়িয়াছে, তিনি কাঁদিয়া বলরামের হাত ধরিয়া গাহিতে লাগলেন, “দাদা বল বল, আমার হুখিনী মা কোথায় গেল” — সেই মনোহর রাগিণীর সঙ্গত আঁধার উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃমূল আকুল হইতেন; জাতিভেদা, দর্শক, একসঙ্গে চক্ষুজলে সঙ্গের মুখ তামিয়া যাইত—বাৎসল্য সজাগ হইয়া উঠিত; পদার অন্তরালে সাদোকর্ণের দ্বারা শিশুর জন্ত করুণ বাধা উপনীত উঠিত; মৃত মাতা-দিগকে মনে করিয়া যুবকগণের মুখ প্রলতরা মেঘের মত হইত; যাত্রাভঙ্গের বহুদিন, বহু-বৎসর পরেও শ্রোতা স্তব্ধ করিত—“আমার হুখিনী মা কোথায় গেল ?” কহ, সেরূপ ভাব ত থিয়েটারে হয় না। থিয়েটার নিষ্ঠুরতা বা বর্করতার চিত্র দেখাইয়া দর্শক উদ্বেগনার উদ্বেক করে, কিন্তু পাণ্ডা করুণাকে এরূপ স্মৃতি-মজী করিতে পারে না। দেশের বাঁটভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের বাহুল্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদের রসকুঁমিলি আয়বকনা করিয়া থাকে। যাত্রার এখন আর সে সরলভাব নাই।—বদেশ-হিতৈষামূলক বক্তৃতা এখন যাত্রার চুকিয়াছে, গাইয়া স্বহৃৎস্বের চিত্র জীবন্ত করা এখন তাহারাই হের মনে করে;—ভারত-ইতিহাসের

কোন কোন ঘটনা এইরূপ তাহার পাশা-
লেখা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে । বলা বাহুল্য,
নিজের দেখানে নিপুণতা, তাহা ছাড়িয়া
পরাম্ভকরণেই আরম্ভ করা অবধি দ্বারা-
গুলি একান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে ।
কিন্তু এখনও সেই রাখালবালকের ছবিগুলি
মনে জাগিয়া আছে । কীড়াকৌতুকের হাট
ভাঙিয়া রাখালরাজ চলিয়া গিয়াছেন,—
গাভীগুলি নিশ্চয়, বলাবনের তরুরাজি
দূসর, শ্রীধাম বাকুলকণ্ঠে গাহিতেছে—
“তাই ভেবে কি তাইরে স্থল ছেড়ে গেছে
প্রাণের কানাই । আমরা সমান্ত ভেবে
কখন মন্ত্র করি নাই ।” সেই গানে সরল
রাখালজন্মের পবিত্র সখা ও ওৎখ কোন
চিরন্তন প্রেরণারহেব আরম্ভগাপারূপ
আমাদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা পাঠিয়াছে । এণ্য
রিতকেশা বিরহিণী রাধার সাংকট্যের—
“ছিলাম নিভাবশে, দেখেনে স্বপ্নাবেশে, বধু
অভাগিনীর বাসে এসেছিল”—কিংবা মেঘদর্শনে
“বধু আমার জ্বরকমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল-
আধ বোস বোস হে শ্রীপাদ” প্রভৃতি গানের
রেশ এখনও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে ।

প্রাচীন যাত্রার প্রধান অঙ্গ ছিল মনোহরসুই
রাগিণী এট রাগিণী বঙ্গদেশের বীর
সম্পত্তি, ইহার মধুরাকর্ষ্য কর্তব্য জন্মে
কোমল ভাবরাশির প্রেক্ষণ উত্তরক করিতে
পারে, অতঃ কোন রাগরাগিণী তাহা পারে
না । এখনকার যাত্রা এট রাগিণীকে
পরিমাণে ভাগ করিয়া থিয়েটারের
করণে মিশ্র বা জড়লা রাগিণীতে গান বাধিয়া
থাকে ।

কিন্তু প্রাচীন যাত্রার ভাঁড় হইতে
নিক প্রহসনের ভাঁড় অনেকগুলি
এবং রঙ্গালয়ের যদি কিছু খাঁটি জিনিষ থাকে,
তাহা প্রহসনগুলির অপূর্ণ অভিনয় । এখন
বাংলাদেশের অভিনয় প্রহসনের উপাদান
গণ্যেই পরিমাণে প্রোগাইতেছে । আমাদের
গ্রাম্য উপর গুল নেক্টাই, অতঃ ইংরেজী-
উচ্চারণ, সভ্যসমিতিতে হঠাৎ গ্যারিবজার মত
গা-ঝাড়া দিয়া উঠা, বক্তৃতার অকাতরে
আগ-
ভাগের মত উচ্চত হওয়া, কিন্তু গৃহে কনেটে-
বলের ভয়ে বিনিত্রানিকন্তন এঁড়াই-
শত শত বিবরে একাধ প্রহসনগুলিকে পুষ-
কাইতেছে ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রামায়ণের রচনাকাল ।

বিচারপদ্ধতি ।

“যঃ শিবম্ সত্যং সামচরিত্যতুসাপরম্ ।

অনুশব্দঃ সুনিঃ বন্দে প্রাক্তনমকন্দম্ ॥”

আদিকান্তের পঞ্চম সর্গ হইতে রামায়ণের
মাধ্যানবস্তুর আরম্ভ । তাহার বক্তা বা

গায়কবৃণ্ডের নাম কুশীলব । তাহার
প্রথমে তপস্বিসমাজে ও তাহার পর রাম-
চন্দ্রের রাজসভায় স্থলপিত্তব্রশংখ্যে-
রামায়ণকথা গান করিয়া, তাহার অপূর্ণ

রচনাকৌশলের গৌরব ঘোষণা করিয়া ছিলেন।

হুইলবোর্কি মাধ্যমবয়স সংস্কৃতসাহিত্যে যদ্বি-বাস্তবিক-বিবচিত “আদিকাব্য” নামে উপস্থাপিত। মানবলম্বে কাব্যশাস্ত্রের বৈধিমা অহুত হইবার পর, সকল দেশের লোকেই তাহাদের আদিকবির নাম চিরস্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। কে কোন্ দেশের আদিকবি, তাহার প্রধান প্রমাণ জনশ্রুতি। ভারতবর্ষের জনশ্রুতি বাস্তবিক আদিকবি বলিয়া অত্যাধি ঘোষণা করিয়া আসিতেছে।

কোন দেশের আদিকবি কবক;— গ্রামাভ্যাসের সরল সঙ্গীতে কাব্যকীর্তন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। কোন দেশের আদিকবি ভিক্সারজীবা;—জীবিকা-জনের যত পথে পথে কাব্যকীর্তন করিয়া কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের আদিকবি তপস্বী;—শাস্ত্র-রসাম্পূর পুণ্যশ্রমের সিদ্ধোদ্যায় উপবেশন করিয়া, লোকশিক্ষার কাব্যরচনার প্রবৃত্ত হইয়া, রচনাগোবধে অহুরক্ত ভক্ত-বৃন্দের নিকট অত্যাধি দেবতার স্তায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

কোন পুরাকালে এই আদিকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার ক্ষমতা প্রবল

কৌতূহল বিস্তারিত থাকিতেও, সে কৌতূহল চরিতার করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের পুরাতন অর্ভাক্তের বস্তুসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের ক্ষমতা চোঁটার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু সকল চোঁটাই তর্ককোলাহলে অভিভূত হইয়া, ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে।

তথাপি নূতন চোঁটার প্রয়োজন পুনঃপুন অহুত হইয়া থাকে। রামায়ণ কোন্ সময়ের গ্রন্থ, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে রামায়ণপাঠের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু রামায়ণোক্ত সকল কথা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়ক্ষয় করিবার ব্যাঘাত হয়। যে দিনে চলিয়া গিয়াছে, সে কোন্ অতীত গৌরবের পূণ্যভূমি, —তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে, সংস্কৃত-সাহিত্যলোচনার আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় না। রচনাকালনির্ণয়ের চোঁটা পুনঃপুন ব্যর্থ হইলেও, পুনঃপুন অভিনব চোঁটার আশ্রয় হইয়া থাকে। তদ্বারা রচনাকাল নির্ণীত না হইলেও, রামায়ণের অতিপ্রাচীনতা প্রতিপাদিত হয়।

পুরাতনের অঙ্গসকানে গ্রহণ হইলে, পুরাতন গ্রন্থের আলোচনা প্রতিষ্ঠাপ করা যায় না। সে আলোচনার স্বত্বক্ষেপ করিবার ক্ষমতা, রচনাকালনির্ণয়ের চোঁটা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সে পথ নিত্যমুগ্ধ হইলেও,

* It has been a standing reproach against our studies that it is impossible to find anything historical in Indian literature. To a certain extent this reproach is well-founded; and this accounts no doubt for the indifference with which Sanskrit literature is regarded by the public at large. Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. 63.

তাহাই একমাত্র পথ। তাহাতে অগ্রসর হইবার উপায়,—বিচারপদ্ধতি। বিচার-পদ্ধতির দোষে অনেক সময়ে তথ্যাস্থল্যভাবের চেষ্টা বার্থ হইয়া পড়ে। রামায়ণের রচনা-কালনির্ণয়ের জন্য কিরূপ বিচারপদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ করা কর্তব্য, তাহা স্থির করা আবশ্যিক।

“তপঃখাণ্ডায়নিকঃ তপসী বাসিনা বরু।

নারায়ণঃ পরিপশ্রজ্য বাসীকিমু নিপুত্রবঃ।”

রামায়ণের আরম্ভ এইরূপ। কাব্য-রচনাই একটি প্রশ্ন। তপসী বাসীকি তপঃ-খাণ্ডায়নিকের বাগ্বেত্তাদের বরদীয়া সুনিপুত্রব নারদকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, দৃঢ়ব্রত, বীৰ্য্যবান্ ও গুণবান্ এমন কে ? ইহাই বাসীকির প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তদুত্তরে বহুর্বি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস হইতে রাবণবধান্তে রাজ্যান্তিমেক পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিলে, সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া, কবিগুরু “পৌলস্ত্যবধ”নামক এক মহাকাব্য রচনা করেন। তাহাই “রামায়ণ” নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে।

গ্রন্থগত এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় অমূল্যের, রামরাজ্য বর্ত্তমান থাকিতেই, রামায়ণ রচিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামচন্দ্রের সমুদ্রে কুশীলবের রামায়ণ গান করিবার কথাও তাহার পক্ষসমর্থন করে। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ কবিকল্পিত বলিতে বাধ্য কি ? গ্রন্থগৌরব বর্ধন করিবার জন্য বাসীকির পক্ষে এরূপ অলীক আখ্যায়িকার অবতারণা করা কি নিতান্ত অসম্ভব ? এই তর্ক উপস্থিত করা নিতান্ত সহজ। ইহার

উত্তরপ্রদান করা সহজ নহে। একমাত্র উত্তর এই,—বাসীকি যে কোনরূপ অলীক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণাত্মক। কিন্তু বাসীকির এই উক্তি সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তদ্বারা রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

কবে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে-আরোহণ করেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, গ্রন্থগত-আখ্যায়িকা-অবলম্বনে রামায়ণের রচনাকাল নির্ণীত হইতে পারিত। কিন্তু ত্রৈতাবতার রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর কতকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে ? পূরণ তাহার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিয়া, বহু প্রমাণাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ অবস্থায় রামায়ণ-বে ভাবার গ্রন্থ, সেই-ভাবা-নিবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করিতে হইবে।

‘সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস’ ল্যম্বরের নানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাণি তাহার উপর নির্ভর নির্ভর করিবার উপায় নাই। তাহা ইউরোপীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর জল্পনা-প্রাণে অর্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারোক্ত অধ্যায়সমূহ ও অধ্যয়নানুসঙ্গ মর্ক্স প্রভৃতিই। কিন্তু তাহাদের বদেয়াসুত্রাপ নিরূপেক বিচারকার্যের এবল অন্তরায় ! তাহার ভারতীয় সাহিত্যের অতিপ্রাচীনবে আচ্ছাদন স্থাপন করিতে অসম্মত।

এই সকল ইউরোপীয় অধ্যাপকের মধ্যে পণ্ডিতবর মোক্ষমূল্যের নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তাহার “প্রাচীন সংস্কৃত সাহি-

তোয় ইতিহাস" বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ অনেকের নিকট, প্রামাণিক ইতিহাসের সমাধার লাভ করিয়াছে। সে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিতরূপে কোটকবিহীন। তাহারই প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের চন্দ্র, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও যজু নামক চারিটি রচনাবলি পরিকল্পিত হইয়াছে। লিখনভঙ্গিতে বোধ হয়, সভ্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ঋত্ব একটির পর একটি সাহিত্যবলি আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছিল; তাহার প্রথম যুগে চন্দ্র, দ্বিতীয় যুগে মন্ত্র, তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ যুগে যজুগ্রন্থ রচিত হইয়া যুগচতুষ্টয়ের রচনাকার্য্য পরি-সমাপ্ত হয়। এই যুগচতুষ্টয়ের পরমায়ু সহস্র-বৎসর; খৃষ্টপূর্ব ১২০০ বর্ষে আরম্ভ, খৃষ্টপূর্ব ২০০ বর্ষে শেষ। তাহার পূর্বে ভারতবর্ষে সাহিত্যোৎপাদন হয় নাই।

বে দেশের লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশের পুরাতনসম্বন্ধে কেহ কিছু সাহস করিয়া লিখিয়া বাসিলে, তাহাই ত্রেতা-ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া লয়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর, সাহস করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্ধকাল নিদেশ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে আত্মাহ্বান করিতে অসম্মত হইলে, প্রমাণপ্রবাসের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। যিনি কাগজনিদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি,—সে কথা অল্প-লোকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। যিনি তাহাতে আত্মাহ্বান করিতে অসম্মত, তাহা-কেই প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে। অসত্য

একটি প্রমাণের অবতারণা করিতে হইল। মোক্ষমূলরের ইতিহাস রচিত ১৮৫৮-৫৯ খ্রিঃ, সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুকসাহেব একটি ধোঁয়াভাবী গণনার অবতারণা করিয়া, খৃষ্টাব্দিভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্বে বেদবিভাগের প্রমাণ আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।^১ প্রমাণটি সংস্কৃতজ্ঞগণের নিকট স্থপরিচিত; তাহা ঐতিহাসিকতত্ত্বাত্মক বহুবার প্রীকৃত হইয়াছে। মোক্ষমূলরের মতে খৃষ্টাব্দিভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্বে বেদবিভাগ সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তৎকালে বেদের জন্ম পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। যিনি এরূপ নুস্তন কথা শুনাতে বাসনা করেন, তিনি কোলব্রুকের ত্রাস্তিপ্রদর্শন করিলে, তাহার কথার আত্ম-হ্বাপন করা সহজ হইত। কোলব্রুকের ত্রাস্তিপ্রদর্শন করা দূরে থাকুক, মোক্ষমূলর বহুত অস্বস্থ্য এতদ্বারা কোনস্থানে তাহার উল্লেখ পশ্চাত্ত করেন নাই। সুশিক্ষিত উইলসন্, লাসেন্ প্রভৃতি অধীগণ কোল-ব্রুকের গণনালঙ্ঘন শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। তাহার উল্লেখ করিতে হইলে, পুস্তকার্থঃস্বপ্নের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইত, নচেৎ মোক্ষমূলরের এই পাতকসমাজে উপ-হাসাম্পন্ন হইয়া উঠিত। মোক্ষমূলর স্বপক-রক্ষার্থে কোলব্রুকের গণনার কথা একেবারে গোপা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! ইহার অল্প অধ্যাপক গোলাব্দিব্রু সন্মালোচনাজালে মোক্ষমূলরকে তিরস্কার করিতে ক্রটি করেন নাই।†

• Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I. p. 110-1201.

† He has not only not invalidated the passage I have quoted, but he has not even made mention of it.—Goldstucker's Panini, p. 75.

অধ্যাপক মোকুম্ভারের এছের প্রায় সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক আরও একখানি গ্রন্থ সভ্যসমাজে সুপ্রচলিত। তাহা অধ্যাপক ওয়েবরের দেখানীগ্রন্থত। তাহাতে কোলুক্কের বিখ্যাত জ্যোতিষী গণনার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার ভ্রম প্রদর্শন না করিয়াই, অধ্যাপক ওয়েবর তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে অসম্মত। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক এই সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া, রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে। সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে, তাহাতে বিষয় কি? মূলগ্রন্থ অধ্যয়নের ক্লেশস্বীকার না করিয়া, এই সকল পাকাত্য মতের মাঝখানে জড়িত হইয়া, আমরা পদে পদে বিভ্রান্ত হইতেছি। ইহাকে প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি বলিয়া দীকার করা যায় না।

প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইলে, অধ্যয়নভ্রম স্বীকার করিতে হইবে। তজ্জন্ম সংস্কৃতভাষার মূলপ্রকৃতিও আলোচনা করিতে হইবে। উত্তরকালে সংস্কৃতভাষা সর্বাধিকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যে বিবিধবিধ রচনাগোবিন্দ লাভ করিয়াছিল, তাহা সহসা সংঘটিত হয় নাই। একদা সংস্কৃতভাষা উচ্ছৃঙ্খল ভাষা কোনরূপ সংঘন স্বীকার করিত না। তখন তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তাহার পর, ধীরে ধীরে সংস্কার সাধিত হইয়া, 'সংস্কৃত' ভাষা গঠিত হইয়াছিল।

কোন সময়ে এই সংস্কারকায্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে অসংখ্য ভাষা ধীরে ধীরে সংস্কারমণ্ডার হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্যে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "সকুম্ভিততটনা পুনঃভাষা যত্র যত্রা মনসা বাচস্পতি" মহাভাষাকার ভগবান্ পতঞ্জলি এই বৈদিক ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, ভাষাসংস্কারের প্রাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। "সকুম্ভিততটনা পুনঃভাষা যত্র যত্রা মনসা বাচস্পতি" মহাভাষাকার ভগবান্ পতঞ্জলি এই বৈদিক ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, ভাষাসংস্কারের প্রাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। "সকুম্ভিততটনা পুনঃভাষা যত্র যত্রা মনসা বাচস্পতি" মহাভাষাকার ভগবান্ পতঞ্জলি এই বৈদিক ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, ভাষাসংস্কারের প্রাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

অসংস্কৃতভাষার কোনও সাহিত্য রচিত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। এক্ষণে যে সকল সাহিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সমগ্রই সংস্কৃতভাষার সাহিত্য। তাহা ব্যাকরণশৃঙ্খলে সুসংবদ্ধ হইয়া সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনার প্রধান সহায় সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ-কোন সময়ে ব্যাকরণরচনার সূত্রপাত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পানিনিয়) ব্যাকরণ সর্বাঙ্গপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিচিত। তাহাতেও পুরাতন নানা ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে সাহিত্য যে বহু পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পানিনিয়জ্ঞে সেই পুরাতন সাহিত্যের কিরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, পানিনিয়জ্ঞের আলোচনার প্রবৃত্তি হইবে,

সকলকেই ব্যাকার করিতে হইবে, এমন স্থলব্যত যথাবিস্তৃত ব্যাকরণস্থল কোনও আখ্যায় শৈশবদশায় সন্নিহিত হইতে পড়েন না। অতঃকোন সভাসম্মেলনেই এক্ষণ ব্যাকরণ বর্তমান নাই। পাণিনির পূর্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার ব্যাকরণস্থলে তাহারই আশেচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কত সাহিত্য ও কত ব্যাকরণ, না জানি কতকাল ধরিয়া, সংস্কৃতভাষাকে এমন সর্বস্বাক্ষর ব্যাকরণ-রচনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু পট্টভাষা পণ্ডিতবর্গ এই পুরাতন ব্যাকরণের স্বেচ্ছায়ানুসৃত রচনাকাল নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে নানা অসঙ্গতির অবতারণা করিতে হয়।

পাণিনিহস্তের আশেচনা নিত্য নীরস বলিয়া পরিচিত। সেই আশেচনা, কোন কোন লেখক অত্যন্ত গ্রন্থাণের অবতারণা করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্গলনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতন সরসন করিতে হইলে, পাণিনিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সিক্কাম হইবার সম্ভাবনা কোথায়? নীরস হইলেও পাণিনিহস্তের আশেচনা করা আবশ্যিক। ভাষা ও সম্বন্ধভার ইতিহাস কদাপি নীরস বলিয়া নিম্নিত হইতে পারে না। পাণিনিহস্তে সংস্কৃতভাষার যে 'অবহার পরিচয়' প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত উত্তরকালের সংস্কৃতভাষার তুলনা করিলে, পাণিনিহস্তের আশেচনা কাব্যের স্তরে মধুময় ও বিজ্ঞানের গায় শিক্ষাপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

যে ব্যাকরণস্থল সঙ্গলন করিয়া পাণিনি এইরূপ বিখ্যাত অমরকাক্ষে সভা

সম্মেলন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহার প্রয়োজন প্রদর্শনের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত স্থল রচিত হইয়াছিল। সে স্থলটি এই :—

“অপ নবায়নানব।”

এই হইবে ‘শব্দ’ অংশগণন করাই ব্যাকরণরচনার প্রয়োজন বলিয়া উল্লিখিত। কোন্ ‘শব্দ’ অংশগণনের জন্য এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল? সমগ্র স্থল অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ‘শব্দ’ শব্দে ‘অপনন্দ’ পরিভাষ্য হইয়া, সাধু-‘শব্দ’ গৃহীত হইয়াছে। পাণিনির সময়ে জনসম্মেলন বাহা সাধুশব্দ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারই অংশগণন-সম্পাদনায় পাণিনিহস্তের অবতারণা। মহাভাষ্যকার এই হস্তের বিচারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন :—

“কথং শব্দানব? লৌকিকানাং বৈদিকানাং।”

লৌকিক ও বৈদিক, এই দুই শ্রেণীতে সাধুশব্দ বিভক্ত; উত্তর শ্রেণীর সাধুশব্দের অংশগণনের জন্যই পাণিনিহস্ত রচিত হইয়াছিল। পাণিনি কিন্তু লৌকিক ও বৈদিক নামক পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি সাধু-শব্দকে ‘ছন্দ’ ও ভাষা নামক ভাগবৎ বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহার সময়ে দুই শ্রেণীর সাহিত্যে দুই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহৃত হইত; উত্তর শ্রেণীর জন্যই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। পাণিনি যাহাকে ‘ছন্দ’ ও ‘ভাষা’ বলিয়া পাথক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, পতঞ্জলি তাহাকেই ‘বৈদিক’ ও ‘লৌকিক’ নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বাহা ‘লৌকিক’ বা ‘বৈদিক’ উত্তরশ্রেণীর বহির্ভূত, পতঞ্জলি তাহাকেই ‘অপনন্দ’ বলিয়া ‘শব্দ’ ভাষা ভাগে।

‘শব্দ’ অর্থাৎ সাধুশব্দ প্রয়োগভেদে তিনপ্রকার:—(১) কেবল ছন্দে ব্যবহৃত শব্দ, (২) কেবল ভাষার ব্যবহৃত শব্দ, (৩) ভাষার ও ছন্দে কুল্যারূপে ব্যবহৃত শব্দ। পাণিনির সময়ে যে শব্দ কেবল ভাষার ব্যবহৃত হইত, ছন্দে হইত না; অথবা কেবল ছন্দে হইত, ভাষার হইত না; সূত্র-মধ্যে তাহা সেইভাবে উল্লিখিত আছে। যেখানে সেক্ষণ উল্লেখ নাই, সেখানে ভাষা ও ছন্দে কুল্যারূপে ব্যবহারের নিয়ম থাকি বৃত্তিতে হয়। সূত্রবিভাগের এই পদ্ধতি স্মরণ থাকিলে, পাণিনিহৃত্তের আলোচনার নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাণিনি বাহ্যকে ‘ছন্দস্’ বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অর্থ কি? তিনি কোনস্থলে তাহার লক্ষণ নির্দেশ করেন নাই। তাহার সময়ে ‘ছন্দস্’শব্দের সে অর্থ প্রচলিত ছিল, সেই অর্থেই ‘ছন্দস্’শব্দ ব্যবহৃত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে ‘ছন্দস্’শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির সময়ে এতগুলি ভিষ্মাৎ প্রচলিত ছিল কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। ‘ছন্দস্’শব্দের নানা অর্থ—

“ইচ্ছাসংহতরোমায়ৈ চন্দো বেদে চ ছন্দসি।”

‘ছন্দস্’শব্দের এক অর্থ ইচ্ছা; এই অর্থে “বৃহদ্র” কথা উৎপন্ন হইয়াছে। এই অর্থে পাণিনিহৃত্তে ‘ছন্দস্’শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ‘ছন্দস্’শব্দের আর এক অর্থ,

পদ্যবন্ধের নিয়ম। এই অর্থে পাণিনি ‘ছন্দস্’শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকিলে, যোগ্য পদ্য তাহা ‘ছন্দস্’ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, পদ্যনিবন্ধপুণ্যেণিক সাহিত্যকে

ভাষাসাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এবং পাণিনির সময়ে ভাষাসাহিত্যে পদ্য প্রচলিত না, থাকিও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পাণিনি কি অর্থে ‘ছন্দস্’শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন? তাহার ব্যাকরণে ছন্দস্, মত্ৰ, ব্রাহ্মণ ও কল্পের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণাদি পাণিনির মতে বেদমধ্যে পরিগণিত ছিল না। এরূপ তর্ক নিতান্ত একদেশবর্ষী। সমগ্র সূত্র আলোচনা করিলে, এই শ্রেণীর তর্কের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পাণিনি কেবল শব্দের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ প্রদর্শনের জন্যই ছন্দস্, মত্ৰ, ব্রাহ্মণ, সূত্র ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; তদ্বারা সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ নির্দিষ্ট হয় নাই। ‘পাণিনিহৃত্তের সকল স্থানে ‘ছন্দস্’-শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার সাধারণ অর্থ ‘বেদ’ কোনস্থলে তাহার বিশেষ অর্থ ‘মত্ৰ’; কোনস্থলে বিশেষ অর্থ ‘ব্রাহ্মণ’। বেদার্থে সাধারণভাবে যে সকল সূত্রে ‘ছন্দস্’শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১২১১ সূত্রে উল্লেখযোগ্য। ১২১৩৬ সূত্রে ব্রাহ্মণার্থে ও ৪২১৩৬ সূত্রে মত্ৰার্থে ‘ছন্দস্’-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। ‘ছন্দস্’ ও ‘ভাষা’ শব্দের ব্যবহারে পাণিনি ছই শ্রেণীর সাহিত্য প্রচলিত থাকা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা ‘ছন্দস্’ নামে অভিহিত, তাহা ছন্দ, মত্ৰ, ব্রাহ্মণ বা কল্পের অন্তর্গত হইলেও, ‘ভাষা’ নহে। তাহারই সাধারণ নাম “বৈদিক সাহিত্য”। ‘ভাষাসাহিত্য’ তাহা হইতে পৃথক।

‘ছন্দস্’ ও ‘ভাবা’-সাহিত্যের প্রভেদ-
প্রদর্শনার্থ পাণিনিহুজে সমস্ত সাহিত্য ‘দৃষ্টে,’
‘শ্রোত্বে’ ও ‘কৃত’ নামক ভাগে বিভক্ত।
বৈদিকসাহিত্য ‘দৃষ্টে’ বা ‘শ্রোত্বে’ ভাষা-
সাহিত্য ‘কৃত’। কৃতগ্রন্থ কর্তার নামে,
শ্রোত্বে শ্রোতায় নামে, ও দৃষ্টে দ্রষ্টার নামে
পরিচিত ছিল। পাণিনির সময়ে মহাব্যাক্ত
ভাষাসাহিত্যে যে নান্যপ্রকারের গ্রন্থ প্রচলিত
ছিল, তাহার পরিচয় পাইলেও, সেই সকল
গ্রন্থের অস্ত কোন পরিচয় পাইবার উপায়
নাই। দৃষ্ট ও শ্রোত্বে নামক যে বৈদিক-
সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার নানা পরিচয়
প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনির সময়ে রামায়ণ
প্রচলিত থাকিবার কোন আভাস প্রাপ্ত
হওয়া যায় না; ওকালে যে সাহিত্য বিবেচ-
নাবে শিক্ষিতসমাজে সমাদৃত ছিল, তাহার
অধিকাংশই বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্গত
ছিল। সে সাহিত্যের দ্রষ্টা বা শ্রোতা ঋষি-
পুত্রের নাম ও পরিচয় পাণিনিহুজে প্রাপ্ত
হওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বাস্তবিক নাম
দেখিতে পাওয়া যায় না।

একদে যেহা পাণিনি-ব্যাकरण নামে মুদ্রিত,
অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহা
একতন্ত্রভাবে ত্রিহুনি-ব্যাकरण। পাণিনির
হুজি, কাব্যায়নের বার্তিক ও পতঞ্জলির
ভাষ্য মিলিত হইয়া “ত্রিহুনি-ব্যাकरण” নামে
প্রচলিত হইয়াছে। হুনিগ্রন্থকে সমসাময়িক
বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথমে
পাণিনি, তাহার পর কাব্যায়ন, তাহার পর
পতঞ্জলি। ইহাদের মধ্যে কাহার কতকাল
পরে কে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা
নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

পাণিনিহুজের সত্যিক উদ্দেশ্যে কাব্য-
ায়নের বার্তিক সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহা
সন্দেহ স্থপরিচিত। বার্তিক তির হুজের
অসম্পূর্ণতা দূর হইত না। কিন্তু পাণিনির
সময়ে পাণিনিহুজে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা
ছিল কি না, তাহার প্রমাণাত্য। কাব্য-
ায়নের সময়ে সংস্কৃতভাষার যে অবস্থা বর্তমান
ছিল, তাহার পক্ষে পাণিনিহুজের নানা অস-
ম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়াছিল। সেই অসম্পূর্ণতা
দূর করিবার চেষ্টাই বার্তিকের অবতারণা।
অধ্যাপক সোন্‌হুজী কর্তৃক তাহার সমালোচনার
প্রবৃত্তি হইয়া গণনা করিয়া দেখাইয়া গিয়া-
ছেন,—পাণিনিহুজ ৩২২৬ হুজের মধ্যে
প্রায় ১৫০০ হুজে কাব্যায়ন বার্তিক যোগ
করেন; অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ হুজ কাব্যায়নের
বিচারে অসম্পূর্ণ ছিল। পাণিনি এতগুলি
হুজ অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন কেন? ইহা
কি তাহার অনবধানতা, না অজ্ঞতার
নিদর্শন? পাণিনি ও কাব্যায়নকে সম-
সাময়িক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে,
পাণিনির একরূপ অজ্ঞতা বা অনবধানতা স্বীকার
করা চলে না। পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য
প্রচলিত ছিল, তাহার ব্যাকরণহুজে সেই
সাহিত্যের সমগ্র শব্দগুণ্যনামে অসম্বন্ধ, ইহা
প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাহার অনব-
ধানতা বা অজ্ঞতা স্বীকার করা
অসম্ভব। কিন্তু সে সাহিত্য কোথায়? সে-
কালের লৌকিকসাহিত্য বিলুপ্ত হইয়া
গিয়াছে। দেকাশের বৈদিকসাহিত্য বর্ত-
মান থাকিলেও, কোন্‌ কোন্‌ এই পাণিনির
সময়ের, কোন্‌ কোন্‌ এই তাহার পরবর্তী
কালের, তদ্বিষয়ে মতভেদের অভাব নাই।

পাণিনির সময়ে যে সকল শব্দ কেবল বৈদিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, তাহার ব্যবহৃত হইত না, উত্তরকালে যেহেতু অনেক শব্দ ভাষাসাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল। ‘মামু-
নিক বঙ্গসাহিত্যে যেমন সংকুচিত হইতে শব্দ
আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে, ভাষা-
সাহিত্যও সেইরূপ বৈদিকসাহিত্য হইতে
শব্দ আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।
কোন সময়ে কত বৈদিকশব্দ তাহার প্রবিষ্ট
হইয়াছিল, অভিধান থাকিলে তাহার
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অমর-
কোষের পূর্ববর্তী কালের অভিধান প্রাপ্ত
হওয়া যায় না। * অগত্যা অমরকোষ
ধরিয়াই বিচার করা আবশ্যক। অমরকোষ
লৌকিক শব্দকোষ; বাচ্য লৌকিকসাহিত্যে
ব্যবহৃত হইত না, এক্ষণ শব্দ অমরকোষে
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উত্তরকালে ‘অমর-
কোষের’ অতিরিক্ত নানান শব্দ তাহার ব্যবহৃত
হইয়াছে; পরবর্তী অভিধানে তাহার
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদন্ত ‘অমর-
কোষের’ পরিণতিরূপ ‘ত্রিকাণ্ডশেষ’ নামক
অভিধান সংকলিত হইয়াছিল। সংকলনকর্তা
পূর্বসমস্ত অষ্টাক্ষরে লিখিয়া প্রিহাছেন,—
“অলৌকিকবাক্যময়ঃ বাক্যো ন যানি নামানি সমুলিখ্যে ।
হিসাব্য তৈরপাদুনা অচিরময়ঃ প্রবঃ পুত্রসমস্তমতঃ ।”
এই শ্লোকে বুঝিতে পারা যায়,—অমরসিংহের
সময়ে লৌকিকসাহিত্যে অপরিচিত শব্দ
উত্তরকালে লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া-
ছিল। “ত্রিকাণ্ডশেষে” এই সকল শব্দ
সংকলিত হইয়াছে।

পাণিনির সময়ে যে শব্দ লৌকিকসাহিত্যে
ব্যবহৃত হইত না, রামায়ণে সেগুলি শব্দের

ব্যবহার দেখিলে, রামায়ণকে পাণিনির পর-
বর্তী কালের গ্রন্থ বলিতে হইত থাকে না।
পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত
ছিল, উত্তরকালে তাহারও কিছু কিছু ব্যতি-
ক্রম ঘটিয়াছিল। তদ্বারা রামায়ণের রচনা-
কালনির্দেশের উপায় আবিষ্কৃত হইতে
পারে। সুতরাং রামায়ণের রচনাকাল-
নির্ণয়ের চেষ্টা করিবার পূর্বে, পাণিনিহস্তের
আলোচনা করা আবশ্যিক।

পাণিনিহস্তে কোন বাখ্যা বা উদাহরণ
সংযুক্ত ছিল না। তাহা শিবাগণ উপদেশ-
ক্রমে জ্ঞাত হইতেন। কাত্যায়ন বার্তিক
সংযোগ করিবার সময়ে উদাহরণের অবতারণা
করেন। তাহার কাত্যায়ন সহিত অনেক
নূতন উদাহরণ সংযুক্ত করিয়া দেন।
কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি আপন আপন সময়ের
প্রচলিত সাহিত্য হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ
করিয়াছিলেন। বার্তিকহস্তসংযোগের সময়ে
বার্তিকহস্তসংযোগের প্রয়োজন কি, তাহা
বুঝাইবার জন্য কাত্যায়নকে উদাহরণ
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হইয়াছিল,—বার্তিক
সংযোগ না করিলে, উদাহরণাক্ত শব্দ
পাণিনিহস্তের দ্বারা শাসন করা যায় না।
এই সকল উদাহরণের বিচার করিলেই বুঝিতে
পারা যায়, পাণিনির পুত্রাতন হস্তকে অতি-
নব সাহিত্যের উপযোগী করিয়া লইবার
জরুরি আধিক্য বার্তিকের অবতারণা।
অত্যাধা পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক
ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহারা
কি সমসাময়িক ?

“কথাসরিংসাপরের” একটি আখ্যা-
রিকার পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সঙ্ক-

দায়িক বৈয়াকরণ বলিয়া উল্লিখিত। “কথাসরিৎসাগরে” বৃত্তীরাশ্রয়ন সত্যাদির গল্পপুস্তক। “ভোজপ্রবন্ধ” নামক গল্পপুস্তকে কালিদাস, অবতৃষ্টি প্রভৃতি কবিগণ সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত। “কথাসরিৎসাগরের” আখ্যায়িকাও সেইরূপ। অথচ তাহাকে প্রামাণিক ইতিহাস মনে করিয়া, অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। “কথাসরিৎসাগরের” আখ্যায়িকা সত্য হইলে, পাণিনি অপেক্ষা কাত্যায়নকেই অধিকতর যুৎসব বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। নোক্ষ-মূল্য তাহাই করিয়া গিয়াছেন :—

কাত্যায়ন কিন্তু পাণিনির প্রতি একপক্ষ-অনুসার প্রদর্শন করেন নাহ। নোক্ষমূল্যের যত্নে পাণিনি অসমগ্রব্যাকরণরচয়িতা! অদ্বৈতশে কাত্যায়নবিরচিত পাণিনি-সম্ভার-মোক বলিয়া যে প্রোক সম্ভাপি প্রচলিত আছে, তাহাতে কাত্যায়ন পাণনিকে সমগ্র-ব্যাকরণরচয়িতা বলিয়াই নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। বধা :

“বৈয়াকরণসমগ্রবিধিমা মহেশ্বরঃ ।

কুৎসং ব্যাকরণং শ্রোতঃ তস্মৈ পাণিনে নমঃ ।”

পাণিনি যে চতুর্ধন “প্রত্যাহারহজ্ঞ” অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে “অক্ষরসমাহার” অর্থাৎ অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ, উ ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ পাঠের সিদ্ধ ও সনাতন ক্রম পরিত্যক্ত হইয়া নূতন ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা পাণিনিবিরচিত বলিয়া পরিচিত নহে। তিনি অবশ্যই কোন

পূর্বসূরী বৈয়াকরণের গ্রন্থ হইতে এই চতুর্ধন হজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে ও অবাবিহিত পরে সে কথা লোকে জানিত; কালে তাহা বিদ্বত হইয়া জনসাধারণ এক অলৌকিক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছিল। লোকে বলিত, পাণিনি ইহা ভুল-ভাবন ভবানৌপতি মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাত্যায়ন বহুপরবর্তী কালের বৈয়াকরণ না হইলে, তিনি নমস্কার-প্রোক্ষে এই অলৌকিক জনপ্রতির উল্লেখ করিতেন না। অস্ত্র প্রমাণ না থাকিলে, এই নমস্কারপ্রোক্ষ ধরিয়াই কাত্যায়নকে পাণিনির বহুপরকালবর্তী বলা চলিত। কিন্তু অস্ত্র প্রমাণেরও অভাব নাই।

পুত্র ও বার্তিক ভুলনাম সমালোচনা করিলে, পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিবার উপায় থাকে না। ধরং বলিতে হয়,—কাত্যায়ন তাহার সময়ের প্রচলিত সাহিত্যের সমগ্র শব্দগ্রন্থাদিনকার্যে পাণিনি-হজ্ঞের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া, পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব সাহিত্যের উপযোগী করিবার জন্যই বার্তিক সংযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তদ্বোধে অনেক বার্তিক যে বিনা প্রয়োজনেও সংযুক্ত হইয়াছিল, উত্তর-কালে ভাষাকার তাহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অধিকাংশস্থলে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

রামায়ণোক্ত নন্দাশ্রয়ণনের জন্য পাণিনি-

• His Varttikas are supplementary rules, which show a more extensive and accurate knowledge of Sanskrit than even the work of Panini, —Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. 241.

বড় সমর্থ কি না, তাহার বিচারে অগ্রসর তৎপূর্বে কাতাচেন পাণিনির পরবর্তী হইলেই, রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের কি না, তাহার আলোচনা করা প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি আবিস্কৃত হইবে। আবিস্কৃত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

সংযম ।*

বড় আশা ছিল, নবোদ্ভূত বঙ্গসাহিত্য-
দ্বারা বঙ্গসমাজ আবার সুসংস্কৃত হইয়া পূণ্য
ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবে। সাহিত্য-
সেবিগণের প্রথম উদ্ভবে এইরূপ আশা-
সম্ভারের যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের
বড়ই দুর্ভাগ্য, আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ
উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দাইতেছে, তদ্বারা সমাজের
উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ অপ-
কার সাধিত হইতেছে। যে সাহিত্য জন-
সমাজকে পূণ্য ও পবিত্রতার পথে আকর্ষণ
করিয়া এক মহৎ লক্ষ্য ও উচ্চতম আদর্শের
দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ সাহিত্যদ্বারাই
সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।
পরন্তু যে সাহিত্য জাতীয়জীবনের উচ্চতম
আদর্শ তুলিয়া দিয়া সমাজের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খ-
লতা, অমিতাচার ও অসংযমরূপ লোভপ্রসন্ন
বহ্নিকে পুষ্ট করিবার জন্য তাহাতে আপাত-
মনোরম মাদকতামির মোহময় প্রেরণ রূপ ঘৃতা-
হতি প্রদান করে, সে সাহিত্যদ্বারা সমাজ
অধিকতর কলুষিত হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা
দেখাইব, বর্তমান সময় ও তাহাই হইতেছে।

মানবজন্মের যত প্রকার বৃত্তি আছে, তাহার
মধ্যে প্রেম সর্বাগ্রেষ্ঠ। প্রেমে ও দুর্দমনীয়।
প্রেমের নান্য আবেগময়, আবেশময়, মোহময়,
মধুময়, মদিরাময় রূপ আর নাই। প্রেমই
আমাদের সমাজবন্ধনের রক্ত এবং কাব্য-
কলার উপাদান। এই প্রেমের উদ্দাম উদ্ভী-
পনাধারা সমাজের যে শুষ্কতার অনিষ্ট সাধিত
হইতে পারে, তাহা আমাদের কবিগণ বিশেষ-
রূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া যুবকযুবতীর প্রেম-
শীলামর গাঢ়করবিবাহ সমাজ হইতে তুলিয়া
দিয়া এবং বর্তমান সময়ের উপযোগী বাল্য-
বিবাহ প্রবর্তিত করিয়া হিন্দুসমাজে দাম্পত্য-
প্রীতিকে একটি শান্তিময় সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর
দেবধাতে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু
আমাদের পাক্ষাত্য-আদর্শ-প্রিয় কবিগণ
দেখিলেন, প্রেমকে এরূপ গার্হস্থ্যজীবনধাতে
মুগ্ধমনগতিতে একঘেরেভাবে প্রবর্তিত
হইতে মিলে সেই অদ্বুতরসসেকহীন—
romanceমূল্য--জীবনের সাধকতা কি,
আর কাব্যকলারই বা উপযুক্ত ক্ষুদ্রতা
হইবে কেন? সেজন্য কাব্যকলার নবনব

* ইহা সম্বন্ধীনাট্যরচিত্তির এবারকার বাদিক অভিব্যক্তিতে লেখককর্তৃক পঠিত "বিধানব্রতের উপজ্ঞান" শব্দক ব্যবহার
করা হইয়াছে।

রসবৃত্তির অস্তিত্ব প্রায়ঃ এবং সম্যকমধ্যে
 বাধীন প্রেমের উন্মুক্ত তরঙ্গ ছুটাইবার চক্ৰ
 তাঁহার পাশ্চাত্য আদর্শে কাহারওনা আরম্ভ
 করিয়াছেন। বড়ই কোভের বিষয়, যে
 সকল গ্রন্থকারের উচ্চল প্রতিভার আভা
 বকীর সাহিত্য গৌরবান্বিত, তাঁহারাও এই
 সামাজিক উচ্ছ্বলতার পথপ্রদর্শকরূপে
 অবতীর্ণ হইয়াছেন। অবাধপ্রেমের বিচিত্র-
 নীলা প্রদর্শন করিতে না পারিলে উপভাস
 ভবে না স্বীকার করি, কিন্তু তাহারও একটা
 সূক্ষ্মবোধ সীমা থাকিবে কৰ্ত্তব্য। সমাজে নর-
 নারীচরিত্রের উপর আপাতমধুর সাহিত্যের
 কতদূর প্রভাব, ইহা গ্রন্থকারদিগের সর্বদা
 স্মরণ রাখা কৰ্ত্তব্য। ঔপন্যাসিক প্রেমচিহ্ন-
 দ্বারা বাধীনপ্রেমের নীলাভূমি পাশ্চাত্য-
 সমাজে যে কত গুরুতর অনিষ্ট সাধিত
 হইতেছে, তাহা আজকাল কোন কোন
 পাশ্চাত্য গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতেছেন।
 এই প্রসঙ্গে Marie Corelli প্রণীত
 "Sorrows of Satan" এবং Mrs. Henry
 Wood প্রণীত "East Lynne" উপভাস
 বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যসমাজে
 প্রেমকে অতিমাত্র বাধীনতা দিতে দিতে
 এখন তাহার পাখা হইয়াছে; সে এখন সূক্ষ্ম
 সূক্ষ্মতর আকাশে—Ethereal region—
 উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সে এখন আর
 দাবায়ন-বরকরা-রূপ খুঁটিনাটির মধ্যে আবদ্ধ
 ও আবদ্ধ থাকিয়া নিজকে হুমিযলিন করিতে
 নিতান্তই অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্যসমাজে স্বামী
 এখন স্ত্রীর নিকট হইতে আদর-অহুয়াগ-
 মেহ সবই পাইতেছেন, কেবল পান না গ্রেই
 অদূতরহস্যময় বস্তুটি অর্থাৎ love বা ভাল-

বাসা। স্ত্রীর নিকট চতুস্তে সেই সূক্ষ্মতম পদার্থটি
 লাভ করা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে।
 কারণ love বড় ethereal—আকাশশরীরী,
 তাহা কাহাকেও ধরাচোঁড়া দেখ না—তাহা নর-
 নারীর ইচ্ছাধীন নহে—তাহা নরনারীর ইচ্ছা-
 শক্তির অধীনতাপন্ন ছিন্ন করিয়া বহু উর্ধ্বে
 উড়িয়াছে;—"It is a capricious pas-
 sion and generally comes without
 the knowledge and against the
 will." অবাধ উন্মুক্ত বাধীনপ্রেমের কি
 অদূত পরিণাম!

পূর্বে বলিয়াছি, প্রেমবৃত্তিটি বড় দুর্বল-
 নীর। একবার রান্ ডাউয়া দিলে সেই
 চুই অবশ্যে সংবত করিতে পারে, একপ
 সারথি কে আছে? সেই অসংবত চুই অব
 প্রবলবেগে ছুট পাইয়া পাশ্চাত্যসমাজে নর-
 নারীকে অনবরত সংসারের খাতে ফেলি-
 তেছে। কত কত মূল্যবান জীবন প্রেমবিপাকে
 পড়িয়া বিফল হইয়া বাইতেছে। আবার
 দাম্পত্যপ্রেম অত্যধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া
 নরনারীর জগৎ একচেটিয়া ধ্বংস করিয়া
 বসিয়াছে। দৈবের তর্জিত অতিদুরের কথা,
 এমন কি, পিতামাতা-ভাইভগিনীর জন্তও
 পাশ্চাত্যসমাজে একটুকু স্থান সম্ভবান হইয়া
 কঠিন। স্ত্রী আসিয়া স্বামীর জগৎ একেবারে
 পূর্ণমাত্রায় ধ্বংস করিয়া বসিলেন, তাহাতে
 আর কাহারও স্থান হইবার সম্ভাবনা রহিল
 না। একটী অসংবত জগৎ একই সময়ে
 দৈবের প্রীতি, পিতামাতার তর্জিত, স্ত্রীর প্রতি
 ভালবাসা, ভাইভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-
 বন্ধুর প্রতি মেহ,—এবং একটী পরিবারে
 ইচ্ছাদের সকলের একত্র অবস্থান, এই নেত্র-

পীড়িতের দৃষ্ট কেবল কামানগের তপঃপুত্র
 অসংকুল স্থানান্তরিত হিন্দুপরিবারের দেখা
 যায়। হিন্দুপরিবার বিখ্যাতাশঙ্কার নিলয়,
 তাই এখানে পীড়িত বহু-হিতে—বিবিধ
 ভাবে পরিণতি। তুমি সহধর্মিণী বিবাহ
 করিয়া আনিয়া তোমাকে আমার আশ্রয়
 অক্ষাংশ দান করিয়াছি সন্তা; কিন্তু তাই
 বলিয়া আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করি
 নাই—এই বৃদ্ধ পরিবারে আমার আর পাচ-
 জন কেমন আমার আশ্রয় সহিত মিলিয়া
 এক হইয়া আছে, তুমিও তাহাদের মধ্যে
 মিলিয়া থাক আমার আর পাঁচজনকে
 পরিভাগ করিয়া, একটা কোমাকে লইয়া
 আমি কি করিব? তন্মুদ্রণে সহধর্মিণীর
 ইচ্ছাই ভাষা অধিকার। হিন্দুত্ব ইচ্ছাতেই
 সম্ভব। কিন্তু ইচ্ছাতে তাহার কোন লোকসানও
 নাই। তিনি দামিচন্দরের একমাত্র প্রেম-
 নাত্রিকা না হইতে পারিয়া পাশ্চাত্য-
 পন্থীর তুলনায় যেটুকু আদর ও
 সোহাগ কম পাইতেছেন, সম্মানগণের
 জননীরূপে, ভ্রাতার ভগিনীরূপে, পিতা-
 মাতার কঙ্কারূপে এবং একপরিবারস্থ
 অস্তিত্ব সকলের আনন্দমাধিনী সহচরী বা
 আত্মীয়রূপে সেই আদর ও সোহাগের শত-
 গুণ হৃদয়মতে লাভ করিতেছেন। ইচ্ছাই
 হিন্দুত্ববিশেষ বিশেষ গৌরব। কিন্তু এই
 সৌন্দর্যমিত পয় লাভ করিবার জন্য হিন্দু-
 পন্থীকে জ্যোপনীর ভ্রাতৃ উপনিধী হইতে
 হইবে। তাহি বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয়-
 সাহিত্যরচয়িতাদের পাশ্চাত্যদর্শনবহুলনাটক-
 নবেল-পাঠের ফলে হিন্দুপরিবারে এইরূপ
 আদর্শগৃহিণীর সংখ্যা দিনদিন হ্রাস হই-

তেছে। সংঘম, সাংযুক্তা, শূলভা প্রভৃতি
 শোভনীয় গুণসকল হিন্দুপরিবার হইতে
 দিনদিন অস্তিত্ব হইতেছে। সাহিত্য-
 রচয়িতা হিন্দুর অসংখ্য চিত্রে নিত্যময় ভোগ-
 লালসা প্রাগুক্ত করিয়া সমাজের বিশেষ
 অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

হয়ত কেহ বলিবেন, কঠোর ধর্মশাস্ত্রের
 শাসনে হিন্দুজাতির মানসিক শক্তিসমূহ
 নিম্নোন্নত ও দলিত হইয়া গিয়া সমাজের
 বর্ষেই অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। সে সকল
 কঠোর শাসনের ব্যবস্থা আর কেন? এখন
 অস্তিত্ব সুসভ্য জাতিসকল যেমন ব্যক্তি-
 গত স্বাধীনচিত্তা, স্বাধীন আচারব্যবহার,
 স্বাধীন কন্যাদানসকল অবলম্বন করিয়া সমু-
 দ্রত হইয়াছে, আমাদেরকেও তাহার ক্রিতে
 হইবে। এইবার উত্তরে বলা যাউতেছে, শুধু
 ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যথেষ্ট ব্যবহার্য্যধারা
 কখন কোন জাতি উন্নতিলাভ করিতে
 পারে না। যে জাতি যত বড় হইয়াছে, সেই
 জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই জাতীয় কর্তব্য-
 বুद्धির নিকট তত অধিক দৃষ্ট অধনত
 করিতে বাধ্য। যুগের কথা,—প্রত্যেক ব্যক্তি
 স্বাধীন; কিন্তু কথায় প্রত্যেক ব্যক্তি জাতীয়
 কর্তব্যবুদ্ধির অধীন। ইংরেজ, ফর, জাপান
 জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জাতির বিজা-
 কাঙ্ক্ষার জীবন বিসর্জন দিতে কৃতজ্ঞতার
 বলিয়াই এই সকল জাতি এতদূর রাষ্ট্রীয়
 সমুদ্রতি লাভ করিতে পারিয়াছে। স্বাধীন-
 জাতীয় প্রত্যেক পুরুষ কতক বৎসর পর্য্যন্ত
 যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতে বাধ্য। আজ জাপা-
 নীর সৌধাধীর্ঘ্যপরাক্রম দেখিয়া সমগ্র
 পৃথিবী অস্তিত, কিন্তু জাপানীদিগের এই

সকল গুণ কত কঠোর সাধনাবশে অর্জিত হইয়াছে, তাহা আমরা করজনে অনুসন্ধান করি ? সম্প্রতি জাপান প্রবাসী একজন বাঙালী কোন সামগ্রিক পত্রিকার জাপানী-বিপ্লবের, বসেনের হিতকর, কঠোর সাধনার কথা প্রসঙ্গে বলেন—

“জাপানের ক্ষত্রিয়সমাজ ‘সামুরাই’ নামে পরিচিত। ইহাদের শৌর্য্যসাহসের পরিচয়ে তত্ত্বিত হইতে হয়। এই সামরিক জাতির অন্নবয়স্ক বালকবালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালের স্পার্টানদিগের অনুরূপ; বরং অনেকবিষয়ে তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতর বিশ্বয়কর। অতি বাল্যকাল হইতে সামুরাইকে সহিষ্ণুতার আধার করিয়া তুলিবার জন্য শিত্যামাতারা বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। সহিষ্ণুতা-শিক্ষার জন্য বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ শূর্য্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া নগ্নপদে বহুব্র পর্ব্বাঙ্গ ভ্রমণ করিতে হয়। শীতকালে এই-রূপ ‘বালিগারে বরফের উপর দিয়া গুরুগৃহে যাইতে হয়। তাহাদের বাহাতে রাজিঅঙ্গ-রপের অভ্যাস হয়, সে বিষয়েও অভিভাব-কেরা যত্নের ক্রটি করেন না। মাসের মধ্যে অন্তত দুইদিন সমস্তরাজি জাগিয়া বালক-বালিকাদিগকে উক্কেঃগরে পাঠ আবৃত্তি করিতে হয়। কৃষাবিষয় জাপানী ক্ষত্রিয়-বালকদিগের শিক্ষার তৃতীয় অঙ্গ। দীর্ঘকাল অগ্রেণে অনশনে ঘাপন করিতে অসমর্থ হওয়া সামুরাইবালকে বপক্ষে ষোড় লক্ষ্যার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সকল শিক্ষার বালকবালিকাদিগের দেহ ক্ষুদ্র হইলে সামুরাই-জনকজননী তাহা-

দিগকে নিতীক পরিবার তন্ত্র নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।” যে সকল স্তানে ভূতের উপস্থানের ভয়ে সাধারণ লোকে ঘাইতে সাহসী হয় না, সেই সকল স্তানে ও ভীষণ শ্রমশ্রমভূমিতে অতি অন্নবয়স্ক সামুরাই-বালককে পুনঃপুনঃ গমন করিতে বাধ্য করা হয়। কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদের দণ্ড হইলে রাজিকালে একাকী বালকদিগকে বহাভূমিতে গমনপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির হেহস্পর্শ ও ছিন্ন-মস্তকে কোনপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত পুত্রিয়া আসিতে হয়।” ইত্যাদি।

‘হিতবাদী’—১ই মার্চ, ১৩১৫।

জাপানীদিগের ‘জাতীয় কর্তব্যবুদ্ধির’ চরণতলে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলি-দানকে কি বলিব ? ইহাই ত তপত। জাপানীজাতি পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগ-বিলাসতরঙ্গের গা ছাড়িয়া না দিয়া, তাহার যথা হইতে যতটুকু স্বকার জাতি ও স্বকীয় সমাজের হিতকর উপযোগে, তাহাই চাঁকিয়া লইয়াছে। আর আমরা ? আমরা সেই বাহ্যচাক্চিক্যময় সভ্যতার কুহকে পড়িয়া আমাদের জাতীয় কর্তব্যবুদ্ধি তুলিয়া সেই সভ্যতার ভোগবিলাসপ্রবাহে কাঠভূগবৎ ভাসিয়া যাইতেছি।

পাশ্চাত্যজাতি আমাদেরকে অহরহ ইহাই বলিয়া টিটকারি দেন যে, আমরা অসভ্য, আমাদের—standard of comfort নিতান্ত low অর্থাৎ আমাদের বাহ্যিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার মাপকাঠিটা নিতান্ত ক্ষুদ্র। তাহাদের তুলনায় আমরা শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি অধিক লক্ষ্য করি না। ‘নিতা নুতন ইবেদ’ (ক’নন ও সবেদ ক্রিনিয়ে

অল্প আয়ত্তা অধিক অর্থব্যয় করিতে পারি
না। তাঁহাদের এই তিরস্কারে ভীত হইয়া
এবং পান্দ্ভাত্যসভ্যতার বাহ্যিক চাঁকজমকে
মুগ্ধ হইয়া আজ আমরা ক্রমাগতই তাঁহাদের
অনুকরণে নিত্য নূতন অস্ত্র-বস্ত্রের সৃষ্টিপূর্বক
তাঁহাদের পরিপূরণের অল্প অকাতরে অর্থব্যয়
করিয়া দরিদ্রতার বৃত্তি করিতেছি। কিন্তু
ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা আমরা
একবারও ভাবিয়া দেখি না। এই stand-
ard of comfort বৃদ্ধি করিতে গিয়া
পান্দ্ভাত্যভাতিসকল কি দোরস্তর অনাস্থিতে
কাণধান করিতেছে, তাহা আমাদের চিন্তা
করিয়া দেখা উচিত। এখন পান্দ্ভাত্য-
সভ্যতাবিস্তারের অর্থ এই—তোমরা তোমা-
দের ভোগলাগস চরিতার্থ করবার জন্য
নিত্য নূতন বস্ত্রের আবিষ্কার কর, সেই সেই
বস্ত্র প্রাপ্তির জন্য সপ্তপায়ে হটক, অসপ্তপায়ে
হটক, অর্থসংগ্রহ কর, সেই অর্থ বদলে না
মিলিলে তাহা লাভের জন্য অন্যদেশ আধিকার
কর, অস্ত্রভাতির সর্ব্বথ অপরহণ কর, অস্ত্র
ভাতিকে যুদ্ধবিগ্রহে প্রয়োগ কর, প্রবৃত্তির মুখে
নিক্ষেপ কর। যদি অস্ত্র কোন সমতাশালী
ভাতি সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়,
তবে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সে
ভাতি যদি দলপক্ষ সৈন্য, দলভাটার কামান
সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে তোমরা বিশলক্ষ
সৈন্য এবং বিশহাজার কামান সংগ্রহ কর।
যদি সেই ভাতি পাঁচধান, রণতীর প্রস্তুত
করিতে আরম্ভ করে, তবে তোমরা দলধান
প্রস্তুত কর। এইরূপে দুস্তভাতিবৃন্দের
দুর্দমনীয় ভোগলাগস হইতে পৃথিবীতে
রাণের চিতাবহিরি নাহি প্রতিনিরন্ত সমরানল

প্রজ্ঞিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা কি মহা-
দৌরবাহিত পান্ডিত্যভাষ্যতার পরিণাম ?
পরমেস্বর কি এইরূপ পার্শ্ববৃত্তিসকল চরি-
তার্থ করিবার জন্য মানবজাতির সৃষ্টি করিয়া-
ছেন ? অগতে শাস্তি, প্রীতি, পবিত্রতার
স্বাক্ষর কি কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে না ?
অগতে কি কখনও সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার
পবিত্রবন্ধনে মানবমণ্ডলী সংবদ্ধ হইবে না ?

আমাদের দেশে খাচা ঘাঁহারা জাপানের
সুখলব্ধিশোধ্যব্যাধি দে খাচা সেদিকে লক্ষ্য
দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন, তাহারিগকে বলি
— যে তপস্তাবলে জাপানি আছ বহুকালব্যাপী
সুখপ্তির ফোড় হইতে জাগ্রত হইয়া অগতের
লম্বকে গৌরবমণ্ডিত মত্তক উন্নত করিয়াছে,
আমাদিগকেও সেইরূপ তপস্তা করিতে
হইবে। পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগবিলাসে
মাজলে কখন এ জাতির উন্নতি হইবে না।
একথা আমাদের অরণরথা উচিত, পাশ্চাত্য-
জাতির। সভ্যতার যে মাপকাঠি বাহির
করিয়াছে, তাহাই অগতে একমাত্র মাপকাঠি
নহে। তাহার। যে standard of com-
fort আমাদিগকে দেখাইতেছে, তাহাই
একমাত্র standard of comfort নহে।
বিধামিত্রাদি অধিবাসের তপোবলে আটান-
ভারতে যে আর্ষসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া-
ছিল—বাহার প্রভাব এখনও চীন-জাপানে,
এমন কি, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অসম্ভার
বিজয়মান রহিয়াছে, আমরা সেই মহাগৌর-
বান্বিত আর্ষসভ্যতার উত্তরাধিকারী।
পাশ্চাত্যসভ্যতার যেমন একটা standard
of comfort আছে, সেই আর্ষসভ্যতারও
তেমন একটা standard of comfort ছিল।

পাশ্চাত্যসভ্যতার standard হইতেছে শরীর ও মনের তৃপ্তি । আৰ্শদভ্যতার standard ছিল আত্মার তৃপ্তি । পাশ্চাত্য-সভ্যতার নিরিখে তিনিই তত উচ্চপদে ও সন্মানিত, যিনি যত অধিকপরিমাণে অর্থত্যাগ করিয়া নিজের গ্যাক্ পূরণ করিবেন যিনি উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিবেন,—যিনি অধিকপরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া নিজের ও পরিজনবর্গের উত্তম বেশভূষা, আহার-বিহার ও আমোদ-আজ্ঞাদের ব্যবস্থা করিবেন—যিনি সর্পসংস্কারকে নিজের প্রত্নত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন । আর আৰ্শদভ্যতার নিরিখে তিনিই সর্পসংস্কারকে অধিক সন্মানিত ও পূজিত, যাঁহার এ সংসারে আপনায় বলিবার কপদকও নাই, অথচ যাঁহার কিছু-মাত্র অর্থলিপ্সা নাই—যাঁহার বাস করিবার জন্য একখানি গৃহও নাই, অথচ যিনি তাহার কিছুমাত্র অভাববোধ করেন না যিনি আহারবিহারবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বীতশ্পৃহ—যিনি পরের অনিষ্ট করিবার তত্ত্ব কিছুমাত্র ক্ষমতা চাহেন না,—যিনি বসনভূষণদ্বয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, মান-অপমান যাঁহার নিকট ভূলা—যাঁহার নিকট শত্রু-মিত্রের ভেদ নাই—যিনি আয়তৃপ্ত, আত্মারাম । বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্যসভ্যতার আদর্শ-পুরুষ আমেরিকার সেই ধনকুবের Peirpont Morgan, আৰ্শদভ্যতার আদর্শপুরুষ সেই কালীধামের ত্রৈলোক্যবাসী । শুদ্ধ আত্মার তৃপ্তির জন্য ভারতবাসীগণ প্রাচীনকালে ধনমান, রাজ্য ঐর্ষ্যা, স্বধ-সম্পদ তৃপ্তবৎ পরিত্যাগ করিতেন । ইহার বহু উদাহরণ রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে

দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের বর্তমান সময়ে যদি কোন রাজকুমারি কিংবা বড়-লোকের ছেলে তাঁহাদের পৈতৃকদানে গমন করেন, তবে তাঁহার বেশভূষা-চাকরখানদামা প্রভৃতির খোল-আনা খটা বেশিরা চকু স্থির হয় । কিন্তু একদিন অযোগ্যদার—এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট মশরুফের দুইটি কিশোর-বরক কুমার তাক্কাবাদের নিমিত্ত মহাবি বিখানিজের সহিত নানাবিগ্দেশশয্যাটনে বহির্গত হইয়াছিলেন । তখন তাঁহারা কি বেশে কতজন ভৃত্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন ? আমরা দেখিতে পাই, রাম-লক্ষণ তাঁহাদের রাজোচিত বেশভূষা তাপ করিয়া সেই তপস্বীর সঙ্গে তপস্বিবেশে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার জায় কখন ফলশ্রুতগণে, কখন বা অনশনে নানাভাবে পরিভ্রমণ করিয়া-ছিলেন । রামলক্ষণ ছিলেন অসভ্য, কারণ তাঁহাদের standard of comfort নিতান্ত ছোট ছিল । আর আমরা মহা-সভ্য, কারণ আমাদের standard of comfort তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ !

পাশ্চাত্যসভ্যতার ঐক্যজালিক মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে আমাদের নৈতিক অবহাও দিনদিন শোচনীয় হইতেছে, আমরা মল্লবায় হারাইতেছি । যতই আমাদের অট্টালিকা-আসবাব, পোষাকপরিচ্ছদ, আয়বকারদার খটা বাড়িতেছে, ততই আমাদের আত্মার বল কমিয়া আসিতেছে । ১৮১৫ বৎসর পূর্বে চা-পান-করাটা কেবল সাহেবদার-এও উচ্চশ্রেণীর বড়লোকদিগেরই স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু এই ১৫ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রত্যেক মধ্য-

বিত্ত, এমন কি, অনেক দারিদ্র্য পারবারের
 নিত্যক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে ।
 এতাবৎকাল প্রোত্বর্ণের খেয়া ও সহিষ্ণুতার
 কঠিন পরীক্ষা করা হইয়াছে, নচেৎ আমি
 আর অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতে পারি-
 তাম, শুদ্ধ পাশ্চাত্যসভ্যতার খাতিরে
 আমরা আরও কতপ্রকার অভাব উদ্ভাবন
 করিয়া আমাদের দরিদ্রতার বুদ্ধি করিতেছি ।
 আমরা যুগে “তারতের দরিদ্রতা” বলিয়া
 কত আন্দোলন করি, কত বিজ্ঞানিউন
 পাস্ করি, কত হাহতান করি,—কিন্তু
 দেশের দরিদ্রতা আমরা কতটা নিজেরাই
 বুদ্ধি করিতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া
 দেখি না । আমাদের পিতৃপিতামহগণ এই
 গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সারা দিনরাত্রি খালি গায়
 কাটাইতেন, অথচ তাহারা দীর্ঘজীবী ও
 নীরোগ ছিলেন । আমাদের কিং অষ্ট-
 গ্রহর পক্ষী কিংবা লাট গায় না দিয়া থাকিলে
 বাহ্যরক্ষা হয় না । অথচ আমাদের রোগ
 চিরদিন একটা-না-একটা লাগিয়াই আছে,
 এবং আমাদের আত্ম প্রায় পক্ষাণ্ড পার হয়
 না । বাহ্য হউক, আমরা অর্থ আছে, আমি
 যেন একপ ভাষাকপড় ব্যবহার করিতে
 পারিলাম । কিন্তু আমার অহুকরণে পরাণ-
 নাক্তির পুত্র যে আট আনা দিয়া ঐ কালো-
 ডোরাবৃত্ত বিলাতী গল্পী কিনিয়া নৌকা
 বাহিবার সময় গায় বিদ্যাছে, ও কি আর
 উহার শিকার মত ঈতকালের রাজ্যে হিনের
 মধ্যে জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিতে পারিবে ?
 কখনই না । দেশের ভদ্রলোকদিগের
 অহুকরণে পরিব্রজী ও বিলাসিতার পক্ষে
 নিম্ন হইতেছে । পূর্ণে কলিমন্দি শেখ যখন

তাহার ক্ষেত্র চাষ করিতে গাইত, তখন
 মাটির বাসনে ও পিতলের বটীতে তাহার
 প্রাতরাশের লব্ধ ভাত ও জল আসিত ।
 কিন্তু আমি বচকে দেখিয়াছি, এখন ena-
 melled plate, enamelled cups, ena-
 melled glass না হইলে তাহার সেই ভাত
 ও জল আসে না । এইরূপ আর কত
 দৃষ্টান্ত দিব ?

আমরা এইরূপে নিজেদের বিলাস-
 প্রিয়তা দ্বারা দেশের অভাববৃদ্ধি ও দরিদ্র-
 তার বৃদ্ধি করিতেছি, অপচ আমাদের
 পূর্বপুরুষগণ যে সকল উপায়ে দরিদ্রদের
 অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, আমরা
 সেগুলি একে একে পরিত্যাগ করিতেছি ।
 আমাদের দেশে গৃহস্থমাজেরই অতিথি-
 সৎকার একটি অবশ্যকর্তব্য বর্ণ্য বলিয়া
 পরিগণিত ছিল । এই পবিত্র অঙ্গুষ্ঠানের
 দ্বারা যেমন অনেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি গৃহস্থের
 আলয়ে আশ্রয় পাইত, তেমন গৃহস্থও সর্বদা
 স্নানিত অঙ্গুলীদ্বারা জনহের প্রশস্ততা
 লাভ করিতেন । কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের
 বিষয়, সেই অতিথিসৎকার এখন হিন্দুসমাজ
 হইতে উঠিয়া বাইতেছে । এখন আমরা
 আমাদের কতশত কৃত্রিম অভাব পূরণ
 করিতেই ব্যস্ত, অতিথিসৎকার ব্যয় বর্জন
 করিতে পারিব কেন ? আমাদের ভারত-
 সম্রাট মহামতি এডওয়ার্ডের শুভ-অভি-
 যেকোপলক্ষে তাহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের
 আকাঙ্ক্ষায় অনেকগুলি দরিদ্রলোক এক
 বেলা আহ্বানের লব্ধ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল,
 সেজন্য বিলাতে এক মহা হৈট পড়িয়া
 গেল । কারণ, এরূপ অঙ্গুষ্ঠান সে দেশে

অগ্রতপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে যে নিত্যমাত্র পরিবর্তন, তাহারও পিতৃমাতৃপ্রাণে কিংবা পূজাপার্ষ্যে অনেক প্রতিবেদী নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। হিন্দুর কোন শুভকর্ম বাগ্ন্য এইরূপ সঙ্গসাধারণের প্রীতিভোজ বাতিরেকে সকল ও সুসিদ্ধ হইবে না। উহার কারণ কি? ইহার কারণ এই—হিন্দু জাতিতে যে, এই সকল পূজাপার্ষ্যাদিতে যে দেবতার অর্চনা করা হয়, এই বিধ তাহার দেহ। তিনি বৈশ্বানর—বিরাট—সর্বভূতাত্তরায়। তাই বিশ্বজনের তৃপ্তিতে তাঁহার তৃপ্তি,—বিশ্বজনের প্রীতিতে তাঁহার প্রীতি,—বিশ্বজনের সমস্তোষে তাঁহার সমস্তোষ। তাই আমাদের পূর্বপুরুষ-পণের অন্তঃকরণ যেমন উদার ছিল, তাঁহাদের নিমন্ত্রিতমণ্ডলীও তেমনই ব্যাপক ছিল। আমরা সভ্যতাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অ্যহার্যের “পদ”-সংখ্যা ও রসমাধুর্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিতের সীমাটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে এখন মাত্র ৭৭টি select friendsএ—বাছাই করা অন্তরঙ্গে—পরিণত হইয়াছে। এইরূপে আমরা সুখে বসিই হরিদ্রের বস্ত্র বলিয়া আশঙ্কণ বোধনা করিতেছি, ততই যে সকল দার দিয়া আমাদের উপার্জিত অর্থ অতি অল্পপরিমাণেও দরিদ্রের হাতে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল আটবাট খুব airtight—নিশ্চিহ্ন—করিয়া বন্ধ করিতেছি। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কলকারখানা-শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে দরিদ্রপোষণের ব্যবস্থা নিত্যমাত্র আবশ্যক হইয়াছে, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। এবং এই শুভ-উদ্দেশ্যে

সামান্যে সম্প্রতি তেচারি ঘানা করিয়, চাঁদা-সংগ্রহের আয়োজন হইতেছে; তাহা বিশেষ প্রাণসন্মীয়, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের দরিদ্রতানিবারণের জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তিগত আত্মসাধন গ্রহিরাছে, তাহাদের অমূল্য নাকরা যে গুরুতর সামাজিক ও নৈতিক পাপ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পাপ কালনের জন্য এখন আমাদেরিগকে কঠোর তপস্তা করিতে হইবে। দার্যকালব্যাপী বহুবিধ সামাজিক দুর্গতির জন্য আমাদের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহা হইতে পুনরুত্থানের জন্য আমাদেরিগকে কঠোর তপস্তা করিতে হইবে। বাহ্যচাক্ৰিকামবী পাশ্চাত্যসভ্যতার সম্পর্শে আসিয়া আমাদের যে সকল মানসিক ও সামাজিক দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা হইতে আন্তরক্ষার জন্য আমাদেরিগকে তপস্তা করিতে হইবে। আমরা যে মনুষ্য হইতে দিনদিন অলিত হইতেছি, তাহা পুনরায় লাভ করিবার জন্য আমাদেরিগকে তপস্তা করিতে হইবে। এই ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি লইয়া একটা বিশাল জাতীয়তাসৃষ্টি অনেক দূরের কথা, আমাদের বর্তমান অবস্থার বাহাতে কেবল নানাদেশবাসী বিভিন্নবর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু-সমাজ লইয়া একটা জাতীয়বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন ঘূচ হয়, বাহাতে আমাদের মধ্যে একটা সামাজিক “কর্তব্যজ্ঞান—জাতীয় কর্তব্যজ্ঞান” সৃষ্টি হইতে পারে, বাহাতে আমরা ধার্ম্যপ্রাণে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, সংবদ, প্রীতি ও দান্যিগাণি-ভূষণের বিকাশ করিতে সমর্থ হই, সেজন্য

আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, এখন কালের স্রোত ফিরান অসম্ভব—কালের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু আমাদের শ্রমের রাখা উচিত, এই বিশ্বব্রাহ্মের একজন স্রষ্টা, পাতা ও বিধাতা আছেন। তিনি কালের কর্তা এবং কালের নিয়ামক। তাঁহারই ভরে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া য য কর্তব্যসাধন করিয়া যাইতে পারি, তবে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে। তাঁহার প্রীতির অস্ত্র জনহের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা চাই। তিনি আত্মনিগমক যখন যে অবস্থার রাখেন, তখন সেই অবস্থাতেই সমস্ত থাকিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার পুনরাবদানের অপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীমত্তগবদ্গীতার অর্জুনক ভগবান্ এই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

ঈশ্বর সৰ্ব্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন ভিত্তিঃ ।

সাব্যস্মৈ সৰ্ব্বভূতানি যদ্যহংসি মায়াঃ ।

ভবেৎ পরমাং পদম্ সৰ্ব্বভাবেন সারতঃ ।

তৎপ্রসাদাৎ গয়াং শান্তিঃ হানঃ প্রাপসি শাশ্বতম্ ।

ঈশ্বর সৰ্ব্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া যত্নের স্তার তাহাদিগকে চালাইতেছেন। অতএব হে অর্জুন, একমাত্র তাঁহারই পরোপায় হও,—তাঁহার প্রসাদে তুমি শান্তি ও অবিনশ্বর হান প্রাপ্ত হইবে। অধিকর এমার্সন বলিয়াছেন—

“A little consideration of what takes place around us every day would show us, that a higher law

than our will, regulates events; that our painful labours are unnecessary and fruitless; that only in our easy, simple, spontaneous action are we strong, and by contenting ourselves with obedience we become divine. Belief and love—a believing love will relieve us of a vast bond of care. O my brothers, God exists. There is a soul at the centre of nature, and over the will of every man, so that none of us can wrong the universe....We need only obey. There is a Guidance for each of us, and by lowly listening we shall hear the right word.”
—*Spiritual Laws.*

সেই সৰ্ব্বনিয়ামক, সৰ্ব্বভূতান্তরায় বিশ্ববিধাতার প্রীতির অস্ত্র আমাদের তপস্যা করিতে হইবে। আমাদের আরও শ্রম রাখা কর্তব্য, প্রকৃতিবৈচিত্র্য সেই বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির এক গুচরহস্ত। পৃথিবীর সকল জাতি একই পন্থা অবলম্বন করিয়া সমুন্নত হইবে, ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি সকল জাতিকেই একই উপাধানে সৃষ্টি করিয়া একইপ্রকার প্রাকৃতিক প্রভাবের মধ্যে স্থাপন করিতেন। কে জানে, এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির দুর্গতির মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলবিধানের বীজ নিহিত নাই? যখন সমস্তসেপ বস্তুর জলে ভাসিয়া যায়, তখন কৃষক তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট শস্তের বীজ একটু অন্নপরিষের উত্তম্নিতে

বপন করিয়া দাখে, এবং পরে বস্তা ছাড়িয়া গেলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর তাহার সমস্ত ক্ষেত্রে লাগাইয়া দেয়। আজ যখন সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভভাতিগণের আত্মিক-বিল-গ্রহত ভীষণ বিবেচ, লিখাংসা, বার্থপরতা ও শোণিতপিপাসার বহ্নিত সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তখন কে জানে, সিধাতার মঙ্গল-বিধানে এই ক্ষুদ্রদেশে, হিন্দুজাতির মধ্যে, প্রাচীনসভ্যতাগ্রহত শাস্তি, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের বীজ জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্য রক্ষিত হইতেছে না? কে জানে, এই সকল দুর্ভিক্ষাতি যখন পরম্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা ক্লাস্ত হইয়া পড়িবে, যখন অবিরত ভোগলালসার চরিতার্থভাবারা তাহাদের দ্বন্দ্বের অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তন্মারা এই কবিপ্রযুক্তি প্রাচীনসভ্যতার শাস্তিপ্রীতি-পবিত্রতাময়ী সুখা পানের জন্য কাতরকণ্ঠে লালায়িত না হইবে?

তাই আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয়-জীবনের এই মহাপরিবর্তনসময়ে, transition period—আজ যখন আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্য-

তার মধ্যস্থলে, ভোগনঃসম ও ভোগ-পিপাসার সম্মুখগে-মিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তি-মার্গের সন্ধিস্থলে—গাঁড়াত্মা কিংকর্ষ্যাবিশুদ্ধ হইয়া তাবিতোহি, তখন আমাদের জাতীয় ইতিহাস রামায়ণরূপ অন্তর্ভেদী শৈলশিখরে, সেই আদর্শত্রাঙ্কণ, সাণিত্রায়শ্রেয় ব্রহ্মা, শ্রীমাম-চন্দ্রের শিক্ষাগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র গাঁড়াইয়া আমাদের ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—
“হে আর্ঘ্যবংশধরগণ, তোমরা কালের স্রোতে ডাসিয়া বাইও না, আমারই মত সংঘমমার্গের অনুসরণ কর। দেখ, আমি বে তপস্শ্রাবণে কল্পিত হইতে রাখিষ্যে, রাজবিত্ত হইতে ঋষিষে, ক্ষয়িত্ত হইতে মহর্ষিষে, মহর্ষিত্ত হইতে ব্রহ্মবিষে উন্নীত হইয়াছি, তোমরাও সেই তপস্তার আশ্রয় কর। আমি বৈষ্ণব দুর্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া পুরুষকারের শপিত রূপানে দৈবের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম, তোমরাও সেই দুর্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় কর। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা বর্তমান ভীষণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া এই সিদ্ধিবিদেবিত পুণ্যভূমির মুখোচ্ছল কর।”
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ।

ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ষ ।

২

ত্রিবন্ধুর-রাজ্যে ।

তিনঘটিকার সময় এখান হইতে যাত্রা করিলাম । এখন স্বর্গের তাপ আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে । শকটের ভিতরে মাছ ও শতরজি পাতা । ছাদ এত নীচু যে, সিধা হইয়া বসিবার জো নাই ; কাজেই, আহত ব্যক্তির জায় পা ছড়াইয়া শুইয়া রহিলাম । গাড়ির বলসেয়া ঢুলুকি-চালে নাচিতে-নাচিতে চলিতে লাগিল । এইভাবে দুইরাত্রি অধিকার চলিয়া আমার নিদ্রাবিলাসকণ ব্যাঘাত করিবে । ঘণ্টার-ঘণ্টায় আমার বাহন ও বাহক বদলি হইবে । সমস্ত পথটায় ডাকের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে । এখন যেখানে আমি আছি—এই পূর্ণভারত, আর যেখানে যাইতেছি—সেই ত্রিবন্ধুররাজ্য, এই উত্তরের মধ্যবর্তী এই যে যাতায়াতের পথ—এটি দক্ষিণদিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে । এই সুখের “ধন্যতা-মহলে” এখনও রেলপথ হয় নাই যে, তদ্বারা পরপুটদিগের আমদানি হইবে, কিংবা ইহার ধনধান্য বিদেশে চলিয়া যাইবে । উত্তর দিক্ দিয়া, খালপথে নৌকাযোগে, ক্ষুদ্ররাজ্য কোচিনের সহিত ইহার যোগাযোগ আছে । এই খাল-বিল অনেকগুলি । তা ছাড়া, আশ্চর্যকণ উপযোগী ইহার কতগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা আছে,—তদ্বারা বাহিরের সংস্পর্শ হইতে উহা সুরক্ষিত ।

ইহার পশ্চিমে বন্দরহীন সমুদ্র, দূরদৃষ্টি সৈকতবেলাকুমি—বাহার উপর ফেনময় তরঙ্গ-রাশি অবিরাম ভাঙিয়া পড়িতেছে । “বাটো” গিরিমালা—ভারতের একপ্রকার মেরুপর্বত বলিলেও হয়—পূর্বদিকে অবস্থিত ;—উহার শৈলচূড়া, উহার অরণ্য, উহার ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু কতকটা প্রহরীর কাণা করিতেছে ।

আমার গাড়ির বলদহুটি কখন ঢুলুকি-চালে, কখন বা ছুটিয়া চলিতেছে । যেই একটা গ্রাম পার হইতেছি, অমনি আমার দীর্ঘপথ আরম্ভ হইতেছে—বৈচিত্র্যহীন, অকুরন্ত । স্বর্গা জলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে । পথের দুইধারে যে বৃক্ষগুলি সারিসারি চলিয়াছে, উহা দেখিতে কতকটা আমাদের আখরোট ও “আশু”-পাতার মত । যেগুলিকে আখরোট-পাতার মত বলিতেছি, উহা আসলে তরুণ বটবৃক্ষ,—কাল সহকারে প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে । শিকড়ের জটা স্থানে-স্থানে বাহির হইতে শ্রব করিয়াছে ; উহার ক্যাকড়াগুলি মাটির বিকে নামিতেছে ; তাহা হইতে আবার নূতন ক্যাকড়া বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইবে ।

এই দুই-সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া, আমার অবিদ্যত কান্দারকুমি অতিক্রম করিয়া

চলিয়াছি। মধ্যে-মধ্যে বিরলসংবেশ ভাল-
নারিকেল দৃষ্ট হইতেছে।

বেশিবার জমা ও নিখাস কেলিবার জন্য
পাড়ির পার্শ্বদেশে ছোট-ছোট রকু-জান্না
আছে। পশ্চাত্তাগে ছোট একটি-গোল
ঘরজা, তাহার মধ্য দিয়া, মাথা চোট
করিয়া, এই সচক্ৰ শবাধারের মধ্যে প্রবেশ
করিয়াছি।

আমার পাড়ির প্রায় গা বেঁধিগা, ঠিক
পিছনে, আমার চাকরবাকরদিগের ও
শ্রিনিবংশের পাড়িটি চলিয়াছে। যে ছইটি
বীর্ষকার নিরীহ বলদ ঐ পাড়ি টানিতেছে,
উহারো আমার খুব নিকটবর্তী; আমি পাড়ির
মধ্যে গুইয়া সর্বদাই দেখিতে পাই, বলদ-দুটি
যেন আমার পা ছুঁইয়া রহিয়াছে। উহারো কি
নিরীহ জানোয়ার! বাহক উহাদের শুধু নাকে
দড়ি দিয়া চালাইতেছে; পাখে অনিচ্ছা-
ক্রমেও কাহারো অনিষ্ট হয়, তাই যেন উহা-
দের শিং-দুটিও পিছনদিকে পিঠের দাঁড়ার
উপর বাঁকিয়া পড়িয়াছে। পাড়ির বাহক
নিঃপ্রাণ, ভাববণ; আশ্চর্য্যরূপে দেহভার
স্বীকার করিয়া, সঙ্গাণ যুগলটির উপরে উবু হইয়া
বসিয়া, বাহুদুটি হাঁটুর উপর রাখিয়াছে; আর,
একটা বেতের চাবুক দিয়া বলদদ্বয়কে
জোঁকাইয়া করিতেছে; কিংবা বানরগুলো রাগিলে
বৈষ্ণব শব্দ করে, সেইরূপ সুখের শব্দ করিয়া
উহাদ্বয়কে উত্তোষিত করিতেছে।

কাস্তারকুমি, একটার-পর-একটা ক্রমা-
গত আসিতেছে; যতই তাহার অভ্যন্তরে
প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন কষ্টকর—
প্রথম কি—অসহ্য হেঁচা উঠিতেছে। দূর-
দূরান্তরে, কোথাও বা ছোটখাটো ধানের

ক্ষেত, কোথাও বা ছোটখাটো কার্পাসের
ক্ষেত দেখা যাইতেছে; নরুণা আর সমস্তই
মক—কেবলই মক—লাগানুসংঘের বিবাদ-
মান কিরণজ্ঞটার আলোকিত।

নিমন্ত্রণগণনে “বাটে”র গিরিমালা বহুত
উঁহা যেন ত্রিভুজরাজ্যের প্রাকারাবলী।
আজ আমরা যাত্রা, একটি বার-পর-নাই
সকল দৃষ্টিপথ দিয়া ঐ প্রাকার উল্লেখ
করিয়া যাইব।

সিংহলের বৃষ্টিবর্ষা ও হরিৎ-ভ্রমণ
ক্ষেত্রাদি বেশিমা-আসিয়া তাহার পর এই
সকল শুকলুমি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—
উহাতে একটি তৃণ পথান্ত্র জন্মায় না। শাদাটে
রঙের গুঁড়ি—এইরূপ কতকগুলি অকৃত ভাল-
জাতীয় বৃক্ষ ইতস্তত একাকী দণ্ডায়মান;—
উহাদ্বয়কে উত্তীর্ণরাজ্যের সামান্য বণিহাই
মনে হয় না। সোয়া, মঙ্গ, প্রকাণ্ড-উচ্চ
খোঁটার মত, তলদেশ দাঁত, তাহার পরেই
চরকা-কাতির নাথ হঠাৎ সৰু হইয়া উঠে
উঠিয়াছে। উহাদের অতি দীর্ঘ কান্ডের
অগ্রভাগে, আলোময় গগনের উচ্চদেশে, শুক-
কঠোর ছোট ছোট একএকগুচ্ছ তালপত্র
রহিয়াছে। এই শুকনীর শুকদিগের ছায়া-
চিহ্নগুলি, বরাবর রাস্তার ছই ধারে, বিবাদ-
মান নিমন্ত্রণের পাতা-স্থানে স্থানে দেখিতে
পাওয়া যায়। ছই-নারি তরুণ বটবৃক্ষের মধ্য দিয়া
এই যে পথটি গিয়াছে, ইহার মধ্যে জন-
মানব দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে হয়,
যেন এই পথটি ধারিয়া চলিলে আমরা কোথাও
গিয়া উপনীত হইব না। অবদানজনক
উদ্ভাণ, তাৎকালে অল্প-অল্প ঝাঁকানি-
কমানত পাড়ির একাধার কাছাকাছি শুক

এই সময়ে আমার ভ্রাতা আসিল—আমার চিত্রাপ্রবাহ ক্রমশঃ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

আর ৬ ঘণ্টিকার সময় রাত্রির উপর দিয়া অকৃত-ধরণের চার জন পথিক চলিয়া গেল। আমার চক্ষু এখনো তন্ম্রাবেশে প্রায় অর্ধনিম্নলিখিত; তা ছাড়া, এই একঘেয়ে পথে কিছুই বিশেষ দেখিতে পাই না—তাই হঠাৎ যখন চারিটি মল্লধামুষ্ঠিত দেখিলাম, তখন ইহাই একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইল। ইহারা খুব দীর্ঘকার—লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুত চলিতেছে; নয় গজ, একটা শাব্দ ও লাল-রঙের ধূতি-পরা, মাথায় একটা লাল পাগড়ি। এই বিজন কাহারের মধ্য দিয়া এই অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ, এতরূপ উজ্জলবেশে, এত দ্রুতগমে, না জানি কোথায় যাইতেছে?

পরে, অগ্রে অগ্রে, ধীরে ধীরে, এই “ধূপসি” ধর্ম-আটকানরা শব্দাক্ষের মধ্যে নিম্নাধো আবিহৃত হইয়া আমার সংজ্ঞা হরণ করিলেন—চারিদিকে কি হইতেছে, আমি আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

একঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার সময়, আগিরা-উঠিয়া সুস্বপ্ন দিবসের অন্তিম ছবিটি দর্শন করিলাম।

দেখিলাম, “ঘাটের” গিরিনালা হঠাৎ বেন আমার পার্শ্ববর্তী হইয়াছে—বেন এক লক্ষে ১০০ক্রোশ পথ লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমদিকের সনত সমভূমি এই গিরিনালার অবলম্ব।

অন্তর্যাম সূর্যের লোহিত কিরণে দিগন্ত-পট এখনো অগুরুভিত। ঐ লোহিত দিগন্ত-পটের উপর, এই প্রতীক-গিরিকার কেন্দ্র

পরিফুটরূপে প্রকটিত। উহাও শৈলচূড়াগুলির আকার ভারতবর্ষীয় ধরণের; বেধিতে কতকটা মন্দিরাদির চূড়া ও গুপ্তধ্বজের মত।

সক-সক খুঁটির মত ভালগাছ, আর কঠোরদর্শন সুসবর-তরু এখানকার একমাত্র বৃক্ষ-সৃষ্টিকা হইতে উঠে উঠিয়াছে; বাহ্যিক কিছু আশো এখনো অবশিষ্ট আছে, সেই আশোকে, হ্রান সোনাশি রঙের আকাশের-পারে, তাহাদের কালো-কালো কাঠিগুলা সর্বত্র প্রসারিত।

হঠাৎ অন্ধকার হইয়া পড়িল। এই অন্ধকার একটু বিবাহদ্রবিত, কেন না, আন্ধরাজে চাঁদ উঠিবে না।

প্রভাত পর্য্যন্ত এই সর্বোপ-পরাধারের মধ্যে ঝাঁপানি ঘাইতে ঘাইতে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাই না; চক্কের সমক্ষে সবই বেন বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিভাত হইতেছিল।

পথে ঘাইতে ঘাইতে, অস্ত গরুর গাড়ি বধনি আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখনি গোকর্ডের ঘটিকাম্বনি ও লোকজনের কি তহানক চীৎকারই শুনিতে পাওয়া যায়। সেই গাড়িগুলা এত মন্থরগতি যে, আমাদের পথ হইতে সরিয়া যাইতেও তাহাদের অনেক বিলম্ব হয়। মধ্যে মধ্যে বাহন ও বাহক কমলি করিবার ভ্রত, কোন গ্রামের নিকট আমাদের গাড়ি আসিয়া পামিতেছে। গ্রাম-গুলি রাতার ধারে অবস্থিত। গাড়ি হইতে অস্পষ্টরূপে, নিম্নিত ব্রাহ্মণদিগের আবাস-কুতীর দেখা যাইতেছে; সম্মুখে, দেয়ালের-কুপুদিতে, ভূতপ্রভু তাড়াইবার ভ্রত, ছোট-ছোট নারিকেল-তৈলের প্রদীপ জ্বলিয়া রহা হইয়াছে।

হুতোরা আমাকে অভিযানপূর্ণক
জাপাইয়া দিল। এখন প্রভাত; নীতল
শাত উষার ইহাই মধুরতম মুহূর্ত। আমরা
এখন নাগরকৈল-গ্রামে আসিয়া পৌছিরাছি।
আজ সমস্তদিন এইখানে থাকিরা, হৃদ্যাত্ত-
সময়ে আবার বাজা আরম্ভ করিব। যে পর্ত-
মালা গন্তকলা আমাদের সম্মুখে, অন্তর্যাম
হৃদ্যের কিরণ-উদ্ভাসিত লোহিতগগনে অঙ্কিত
বেখিয়াছিলেন, আজ তাহা আমাদের পিছনে
পড়িয়াছে। এখন দিগন্তদেশ রান-পাটনবর্ণে
রঞ্জিত। রাজিতে আমরা এই পর্তমালা পার
হইরা আসিয়াছি,—এখন আমরা জিবছুর-
রাভ্যে। এই বারাতা-প্রমাণা বাড়ীটি একটি
• পাখশালা; ইহার সম্মুখে আমাদের গাড়ি
আদিরা থামিল। শুভবসনধারী একজন ভারত-
বাসী হুই হস্তে স্বকীয় লম্বাট স্পর্শ করিয়া
আমার সম্মুখে নতশির হইলেন। ইনি পাখ-
শালার মধ্যাক। মহারাজের আদেশানুসারে,

ইনি আমার বাসের ভক্ত এই বাড়ীটি ঠিক
করিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতীয় অস্ত্রান্ত গ্রামের পাখশালার ভাৱ,
এ পাখশালাটিও সাদাসিধা একতলা গৃহ।
তিন-চারিটি শাণা-ধ্বংসে চুনকাচ-করা কামরা-
—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রায় খালি, শুইবার অস্ত্র
শুধু কতকগুলি বেতে-হাওয়া খাট পাতা।
হৃদ্যের প্রথম-উদ্ভাপ-প্রবৃত্ত গৃহের ছাদ গৃহ
হইতে চারিদিকে খানিকটা বাহির হইয়া
আসিয়াছে, আর কতকগুলো মোটা-মোটা
খাটো পান ঐ ছাদকে ধারণ করিয়া আছে।

তাহার পর মান; মানের পর প্রান্তরণ।
এই সময়ে ব্যগ্রতা-বিরহিত হুতোরা ভালপত্রের
পাখা দিয়া আমাকে অলমভাবে বাতাস
করিতে লাগিল। তাহার পর মধ্যাহ্নের
বিঘ্নতা; আলোক-উদ্ভাসিত মহা-নিশ্চলতা।
মধ্যে মধ্যে কাকেরা আমার কক্ষ-কুণ্ডিমের
তক্তার উপর আসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূজার পোষাক ।

১

অধিষ্ঠানসময়ের প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ভাষণ
• স্থলোচনাকে যে রেগেটোরিপত্র লিখিয়া-
ছিলেন, তাহার ভিতর একখানি ৫০০ টাকার
চেক ও একখানি পত্র ছিল। চিঠিখানা
নিভান্ত সাদাসিধারকম, লুকটিয়া পড়িবার
মত একটা কথাও ছিল না। বোধ হয়

অনেকদিন ধর করিতে করিতে ঐরকম
হইয়া যায়, ভালো ভালো সমস্ত ভাব তলাইয়া
যেন মূলবন্ধ হয়। বোধ হয় স্থলোচনার
মনেও একটা কিছু ঐরকম অস্পষ্টভাবে উদয়
হইয়াছিল। চেকখানি তখন বায়ে কুলি-
গেন, কিন্তু সেই সহজ কথায় সোজা ভাষায়
লেখা প্রেমসম্ভাষণপূর্ণ গল্পখানি বারবার

পড়িলেন—সেই লেখার চিত্র কিংবা সেই স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরের ছাঁচের মধ্যে হয় ত অপ-
তের চকের অগোচর কোন ইঙ্গিত ছিল,
তাহা তিনিই বুঝিলেন। চিত্রের মর্ম এই—
“এই যে টাকা পাঠাইলাম, ইহার মধ্যে দেড়-
শত টাকা তোমার একছড়া হারের। সেই
বে সন্ধ্যায় আমি পল্লব করিয়াছিলাম, সেই-
রকম একছড়া গড়াইবে। বেশ দামী জিনিষ
দিলে হয় ত তুমি অসন্তুষ্ট হইবে। পঞ্চাশ
টাকা দিয়া নিজের মনোমত একখানি শাড়ী
প্রস্তুত করাইবে। বাকী তিনশত টাকার
ছেলেমেয়েদের বাহা আবশ্যক, হইবে।”

নরেন্দ্রনাথের ছই* পুত্র ও ছই কন্যা।
ছেলেছইটি বড়, ছইটিই স্থলে পড়ে, নেয়ে-
ছইটি ছোট, একটি বিবাহের উপযুক্ত হই-
রাছে। সেইজন্য স্থলোচনা চেণেবেয়ে
সইয়া কয়েকমাস হইতে দেখে ছিলেন।
নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমে বড় উকীল। পূজার সময়
আসিবার কথা, তাহার পূর্বে পূজার কাপড়-
চোপড় কিনিবার জন্য টাকা পাঠাইয়া দিয়া
ছিলেন।

স্থলোচনা প্রথমে ছেলেদের জিজ্ঞাসা
করিলেন, “পূজার সময় তোমাদের কি চাই ?
উনি টাকা পাঠিয়েছেন।”

বড় ছেলে কণ্ঠে পড়ে, সে বলে,
“কোথার পুজো, এখন থেকেই কাপড়ের
তাড়া। আমার, একটা জরির পোষাক,
জরির পাগড়ি, আর জরির জুতা চাই।”

স্থলোচনা অন্ন অন্ন হাসিয়া বলিলেন,
“কেন, তোমার কি পরিবার বয়স নেই
নাকি ?”

“হাঁ, খুব আছে! আমি সেজেগুজে

রাস্তার বেরুব, রাস্তার গোকে হাততালি
দেবে, ক্রাসের ছেণেরা ছরমাগ ধোরে
ক্ষেপাবে, আর তোমার খুব আফ্লাদ হবে।”

* স্থলোচনা হাসিমুখে কহিলেন, “ছেলের
আন্তেল দেখ! আমি কি তোকে জরির
পোষাক পরতে বলছি নাকি ?

“তবে কি চাই, তার আবার জিজ্ঞাসা করা
কি! তুমি যা দেবে, তাই ভাল। এমন অননী
কি কারুর আছে।” বলিয়া বড় ছেলে,
দেবেস্ত্র, হাত ঘুয়াইয়া মাতাকে বরণ করিবার
ভাণ করিল।

ছোট ছেলে, সুরেশ্রও কোন ক্রমাবরণ
করিতে সীকার করিল না। মেয়েরা শাড়ী
জ্যাকেট কোন্ রঙের চার, তাহা বলিল।

পাশে পাড়াইয়া একটি বিপদা সব কথা
শুনিতেন। বয়স তেমন অধিক নয়, বড়
ঠাণ্ডা স্বভাব, মুন্ডের ভাব বড় মধুর। ইতি
নরেন্দ্রনাথের খুড়তাত ভগিনী, নাম মনো-
রমা। এ পর্যন্ত কোন কথা কহে নাই।
ছেলেমেয়েদের পূজার পোষাকের কথা শুন
হইলে বলিল, “স্টা বউ, পূজার দাণা তোমার
কিছু দেন নি ?”

অমনি স্থলোচনার মুখ বিয়ের কনের
মত লজ্জার রাঙা হইয়া উঠিল। বলিলেন,
“নিরেছেন বই কি। শাড়ী আর হারের জন্য
দুশো টাকা পাঠিয়েছেন।”

“সেইরকম সন্ধ্যায় বুঝি ?”

“হাঁ।”

“দাহার যেমন পঙ্গল।” মনোরমা হাসিয়া
কথাটা বলিল।

দেবেস্ত্র কহিল, “হাঁ মা, তুমি কেমন
কাপড় নেবে? বেশ টুকটুকে রাঙা-

বেনারসী পাড়ী। আর বেশ চওড়া অরির আঁচলা ?”

স্নোগোচনা কহিলেন, “যা যা! তোর যখন টাকা হবে, তখন কিনে দিস্।”

মনোরমা কহিল, “সেই কথা ভাল। সেবিনের বউয়ের যেমন সাজ হবে, তার খাণ্ড-কীরও সেইরকম হবে।”

তখন খুব একটা হাসির ঘটনা পড়িয়া গেল।

২

চইচারদিন যায়। একদিন মধ্যাহ্নের পর স্নোগোচনা ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন, যেহেতুইটি এক পাশে বসিয়া পুতুলখেলা করিতেছিল ও মুহুরের আগাগোড়া খেলা আকৃতি করিতেছিল। এমনসময় পাশের বাড়ীর গৃহিণী আসিলেন। মোড়ীসোটা মান্নব, সিঁড়ীতে উঠিয়া একটু হাঁপাটয়া পড়িয়াছিলেন। হাঁপ চাড়িয়া কহিলেন, “বেন বসান ওগাঁঠাকুরণ। বউ, তোমাকে দেখুলেই আমার লক্ষ্মীঠাকুরণ মনে পড়ে।”

স্নোগোচনা কহিলেন, “এস এস, বস!”

এদিক্ ওদিক্ খানিক কথাবার্তার পর পাশের বাড়ীর গৃহিণী যেহেতুের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “বেশ বউ, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলতে এসেছিলাম, কাকুর সাক্ষাতে বলবার নয়।”

স্নোগোচনা যেহেতুের বলিলেন, “তোরা নিজের খেলাঘরে গিয়ে খেলা কর।” যেহেতু উঠিয়া গেল।

পাশের বাড়ীর গৃহিণী তখন মুখ কাঁদু কাঁদু করিয়া, চক্ষু ভিজা-ভিজা করিয়া কহি-

লেন, “বউ, তোমার বল্ কি, আমার তারি বিপদ!”

অমনি স্নোগোচনার মুখ সহাস্তকৃতিতে কোমল হইল। বলিলেন, “কি হয়েছে?”

“এই আমার বিবিন খাটটি টাকা মাইনে পায়, তাইতে কষ্টেই চলে। আমার ত হাজারখানা যা গহনা ছিল, তা গিয়েচে, বেশের বাড়ীখানিও বাধা। এদিকে পুজা এল, কিছু না করলেও পাঁচশতদশ টাকা খরচ আছে। এমনসময় সাহেব বল্চে কিনা, পঞ্চাশটাকা না দিলে বিপিনের চাকরী থাক্বে না।”

“সে কেমন কথা? আর বিপিনবাবুই সাহেবকে টাকা দিতে গেলেন কেন?”

“তা ভাট, তোমরা কি জান্বে বল? তোমরা চলে উত্তীলমাহুধ, বডমাহুধ, কাকুর তোমার। রাখ না। কথার বলে, পরের চাকর। এই পূজার পর বিপিনের পাঁচোটাকা মাইনে বাড়বার কথা আছে, যদি সাহেব ওর নামে মিথো কোরে একটা কিছু লিখে দেয়, তা হলে মাইনে বাড়ী মাথার থাকুক, হয় ত চাকরী নিয়েই টানটানি হবে। সাহেবের টাকার দরকার, সে-পঞ্চাশটাকার কম কিছুতেই ছাড়্বে না। এখন উপায়?”

স্নোগোচনা চুপ করিয়া রহিলেন।

“গুনলম, এই পূজার পর তোমার কাছে নাকি হাজারটাকা এসেছে—”

“অত টাকা নয়, অত টাকার ত কোন দরকার নেই।”

“না, তাই বল্চি, কানে শোনা কথা বই ত নয়। তা তুমি রাজরাণী হও, আমার তেমন স্বভাব নয় যে, আমার তাতে চোক

টাকাতে। তোমার দমাদ শরীর তোমার কাছে টাকা খাঙ্কলেই নোকেব উপকার। ঐ পঞ্চাশট টাকা আমাকে দিতেই হবে। শুধু-
হাতে না দাও, এই ভাগ্যভোড়া রেখে দাও। ভাত্রমাস পড়তেই আমি যেমন কোরে পারি দেব।" গৃহিণী অকল হইতে নিতান্ত মরা-সোনার গালাভরা একভোড়া ভাগা বাহির করিলেন। বিক্রয় করিলে পঞ্চাশ-
টাকা হয় কি না, সন্দেহ।

স্বলোচনা কহিলেন, "একক রেখে আমি ত কিছু কখন দি নি, তুমি ভাগা ভুলে রাখ। পূবার টাকা ত সব আমার কাছে নেই, ছেলেদের টাকা ঠাকুরঝিকে দিয়েছি। ওর বেশ পসন্দ, তিনিষপত্র তৈরি করিয়ে দেবে। আর সে টাকার আমি হাত দিতে পারব না। আমার টাকারও হিসেব দিতে হবে, তা তোমার খন এত দরকার, আর ভাত্রমাসের গোড়াতেই ঘিরে দেবে বলচ, তখন—" কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া, বাস ফুলিয়া পাঁচখানা মশটাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহিণী আর বিলম্ব করিলেন না। নোট আর ভাগা একসঙ্গে আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিলেন। "তোমার লম্বার ভাতার হোক, তুমি রাজরাণেশ্বরী হও!" মুখে ঐ কথা, কিন্তু পা দরকার দিকে, পাছে স্বলোচনার মতের পরিবর্তন হয়, কিংবা আবার মদ-
বন্ধকের কথা ওঠে। স্বলোচনা কহিলেন, "এ কথা বৈন ঠাকুরবী না টের পার, সে ভুলে গাণ কোরবে।"

"রাম, তাকে কেন বলতে গেলাম!"

গৃহিণী মির্জা নানিয়া যেমন যাইতেছেন,

অননি পড়নি ত পড় একবারে মনোরমার মন্থে !

মনোরমা কহিল, "ওমা, কি ভাগ্যি ! এস এস!"

"না বাছা, আর আসব না, এখন যাকি!"

"তাই ত." অননি অকলের প্রতি মনো-
রমার নম্র পড়িল। কহিল, "আঁচলে বাঁধা কি পা ? বালা না ভাগা ?"

"ভাগা।"

"ঈশু, আবার উঁচুপানা কি ? মোটের তাক না কি ?"

পাশের বাড়ীর গৃহিণীর তখন ঐধ্যাত্য হইল। কহিলেন, "তা বাছা, তুমি ত আর দাও নি, তোমার অত খোঁজে কাজ কি ?"

মনোরমা স্তানমুখে কহিল, "আমি কোথায়-পাব ?" তাহার পর মুখ ফিরাইয়া, মুখ চিপিয়া হাসিয়া, সাংঘা গেল। তারি হুট !

স্বলোচনা মনে করিতেছিলেন, মনোরমা কিছুই জানিতে পারে নাই !

৩.

স্বলোচনা মনে মনে একটা হিসাব করিতে-
ছিলেন। হারছড়া গড়াইতে কিছু নিশ্চয় হইতে পারে, অতএব সে টাকাটা হাতে থাকা উচিত। কিন্তু শাড়ী মগধ কিনিতে পাওয়া যায়, কিংবা হুইমিনে তৈয়ারি করান যায়। পাশের বাড়ীর গৃহিণীকে যে টাকাটা দিয়াছিলেন, সেটা শাড়ীর হিসাবে কেলিগেলি ১২ ভাত্রমাসের গোড়ার দিবে ত বলিরাইবে! তাহার পর শাড়ী করাইতে কতক্ষণ ? এই-
রকম হিসাবী হুইচারিট গৃহিণী হইলে সংসারে বড় গোল বাধিত। স্বলোচনার হিসাবের

কথা বাড়ীর লোকে জানিত, এবং সেইজন্য তিনি সকলকে কিছু ভয় করিতেন ।

একদিন মনোরমা তাঁহাকে বিজ্ঞাপনা করিল, “বউ, দাদা তোমার টাকা পাঠায়েন, আর তুমি বাসে তুলে রাখ্লে ! হারিছড়া কেন গড়াতে দাও না ? ভাকুরার কথার ঠিক জান ত, কাল বল্লে দশমিন কোছাবে ।”

হুলোচনা কহিলেন, “হী ঠাকুরকি, ভাকুরা ডাক্তে বল, হারিছড়া গড়াতে দেব ।”

“আর শাড়ীখানা ?”

হুলোচনা একটু কৌতুক করিয়া কহিলেন, “শাড়ী ত আর ভাকুরার গড়্বে না, তার অস্ত্র অস্ত্র ভাড়া কেন ?”

“না, সেজন্য নয়, তবে পুজার খাঙ্গারে এর পর সব আক্রা হবে, মনের মতত্ব জিনিষ না পাওয়া যেতে পারে, এখন হলে ধীরে-স্থিরে, দেখে-তনে হত ।”

“না না, এখন কাজ নেই ।” কথাটা কিছু রুক্ষ হইল দেখিয়া হুলোচনা আবার কহিলেন, “তুমিও যেমন ঠাকুরকি, আমার কি-পুজার সময় সামগ্গোল্য করবার বয়স ? ছুড়ো বরসে ওর যেমন বাট ! বুড়ো মাগী আমি, আমার আবার গহনা, আবার শাড়ী ! সজ্জাও করে, হাসিও পায় !”

মনোরমা কহিল, “ও কেমন কথা হল ? সন্মীর কাছে পুজার সামগ্রী পাবে, এ ত মেয়েবাল্লদের ওভলক্ষ্য ! আর দামার চোকে কি তুমি বুড়ো হয়েচ ?”

অর্থাৎ হুলোচনা খণ্ডমন্ত বাহিয়া বলিলেন, “সত্যি কথাই ত, আমার মন্ত ভাগ্য-বতী কে ?”

মনোরমা ভাড়াভাড়ি একপাশা আরসি আনিয়া হুলোচনার মুখের সমুখে ধরিল, কহিল, “আমার দামার চোকের ঘোব হয়েচে, তিনি না হয় ভাল দেখতে পান না, কিন্তু তুমি ত আর চোকের মাথা বাঁও নি, কোন-খামটা বুড়া বল দেখি !”

হুলোচনা হাসিয়া কহিলেন, “এত রসও জানিল !”

ওদিকে ভাকুরা ডাকাইবার পূর্বে আর একজন বিনা ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

হুলোচনার পিছনেই তাঁহার মাসীর একজন পাতান সহী ছিলেন । তাঁহাকেও হুলোচনা মাসী বলিতেন । আজ দশ-বিশ বৎসর তাঁহার কোন খবর পান নাই । হঠাৎ একদিন সকালবেলা রেলের গাড়ী হইতে নামিয়া ঠিকা-গাড়ীতে করিয়া তিনি উপস্থিত । হুলোচনা অস্তিত্ব আফ্লায় করিয়া মাসীর পায়ে ধূল লইয়া কুলশত্রু বিজ্ঞাপনা করিলেন । বলিলেন, “নেরে আফ্রিক কর, আমি রান্নার উজ্জ্বল কোরে দি গে ।”

প্রাচীনা বিধবা সেকলে নোক, রাখিয়া-চাকিয়া কথা কহিতে বড় জানেন না, কহিয়া কহিলেন, “আর বাছা, রাধ-খাব কি, এইবার বুঝি পথে ধাঁড়তে হল !”

“কেন মাসি, কি হয়েছে ?”

“আমার মা-কিছু ছিল, দেওয়েরা ত কীকি দিবে নিয়োচেন, তা তাঁদের ধর্ম তাঁরা জানেন, আমি কোন কথা বলি নি । মেয়েটার এমন ব্যারাম গেল, তাঁরা একবার বিজ্ঞাপণ করেন নি কেমন আছে । আমার একখানি ঘর, তাই পকাশটাকার বাখা

রেখে তার চিকিৎসাপত্র করি। এমন হৃদে-
আসলে একশো টাকা হয়েছে। আট-
দিনের মধ্যে না দিতে পারলে বিক্রী হয়ে
যাবে। তখন পণে দাঁড়ান ছাড়া আর কি
উপায় থাকবে ?”

স্বলোচনার চকু মলে পুরিয়া আসিল।
চকু মুছিয়া কহিলেন, “সে কথা এই পরে
হবে। এখন তুমি কাপড় ছেড়ে অস্থির
কর।” অনেক পীড়াপীড়িতে মাসী মান করিয়া
পূজা করিতে বসিলেন। স্বলোচনা গিরা সহজে
তাঁহার রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন।
পূজা সমাপ্ত হইলে মাসীকে গিরা ধীরে
ধীরে কহিলেন, “মাসি, আমি টাকা দেব,
তুমি ভেব না, কিন্তু এ বাড়ীর কাউকে কিছু
বলো না।”

তখন আনন্দে মাসীর আর এক শোক
উপলিয়া উঠিল, চকু মুছিতে মুছিতে কহি-
লেন, “এমন স্বাক্ষরাণী অল্পপূর্ণি ঘেরকে
এখন কমলদিদি (স্বলোচনার মাতা)
দেখতে পেলেন না।”

মাসী নাম হইতেই কল্কলক্কে স্বলোচনা
উঠিয়া গেলেন।

মাসী সের্গিন থাকিলেন। পরদিবস
তাঁহার বাইবার সময় স্বলোচনা তাঁহার
হাতে পঞ্চরত বলিয়া পাঁচটাকা ও সেই
একশো টাকা দিলেন।

এবার আর কোন হিসাব হইল না।
প্রথম পকানটাকা যেন ধার বলিয়া দিয়া-
ছিলেন, কিন্তু এ টাকা ত ফেরত পাইবার
কথা নয়। হার গড়াইবার আর কোন
সম্ভাবনাই রহিল না। মনোরমা নাকে
নাথ্য কথা পাড়িত, স্বলোচনা কোনমতে

তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতেন। একদিন
স্বাক্ষরা আসিয়া উপস্থিত। স্বলোচনা
কহিলেন, “মাসি এখন গড়াইব না।”

“মনোরমা কহিল, “তবে কবে গড়াইবে ?
ভাড়ায়া বে আসিল।”

স্বলোচনা কহিলেন, “আমি যদি নাই
গড়াই ?”

মনোরমা কহিল, “তা হলে বাবা কি মনে
কোরবেন ? তিনি আফ্রান কোরে তোমার
একটা জিনিষ গড়াতে আগাম টাকা পাঠিয়ে
দিলেন, আর তুমি গড়াবে না ?”

স্বলোচনা শুকমুখে একটু হাসিয়া
কহিলেন, “তা যদি আমি টাকাটা জমাই
করি! আচ্ছা, যা হয় একটা কোরব এখন।”

করিবার মধ্যে সেইদিন কুড়ীটাকা দিয়া
একখানা ভাল গরম আনাইলেন। সেই
গরমখানা হাতে করিয়া মনোরমার ঘরে
গেলেন। সন্ধ্যোর সহিত বলিলেন, “ঠাকুরকি,
এইখানা তুমি নাও ত আমার বড় আফ্রান
হয়।”

মনোরমা গরম হাতে করিয়া বেশিয়া
বলিল, “দাদা ত কীবছর আমার একখানা
কোরে দেন।”

স্বলোচনা কহিলেন, “কেন, আমার কি
একখানা দিতে নাই ?”

“সে কি কথা বউদিদি, তুমি বলে
আমি আফ্রান কোরে নেব না ?” মনোরমা
স্বলোচনার পারের গুলি মাথার লইল, বলিল,
“বউদিদি, তুমি আমাদের ঘরের বউ;
তোমার সাক্ষাতে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু
তোমার দেখলে যে সাক্ষাৎ লক্ষ্যদর্শন হয়, এ
কথা কে না জানে ?”

হুলোচনা তাহার মূখে গাত দিলেন,
“চুপ চুপ, অমন কণা বলতে নেই, পাপ
হয়।”

বখন হুলোচনা ঘরের বাতির হইয়া
আগিলেন, তখন মনোরমা হাসিতে লাগিল,
“টাকরগটি কম নয়! ঘুঘু দিয়ে আমার
মুখ বন্ধ কোরবেন!” মনোরমা ভারি হুট!

৪

ভাত্রমাস আসিল, মাসের করকরিন গেল,
কিন্তু পাশের বাড়ীর গৃহিণীর আর দেখা
নাই! ভাত্রমাসে বড় হুটী। ভারি বাত
চাপিয়াছে, আর উপানশক্তি নাই বলিগেই
চলে। শুনিয়া হুলোচনা তাহাকে দেখিতে
গেলেন। বোধ হয়, গৃহিণী সম্রাতি শয্যাত্যাগ
করিয়াছেন, কেন না, এখন তিনি ঠাড়াইয়া
থড়িকা বাইতেছিলেন। হুলোচনাকে দেখিয়া
বলিলেন, “এই যে ও বাড়ীর বউ! তুমি
বুঝি সেই টাকাটার মজ্ঞ এসেচ? তা যাছা,
আমাকে মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল,
সে টাকা এখন আমি কোনমতেই দিতে
পারব না।”

হুলোচনা লজ্জায় অধোবদন হইলেন,
কহিলেন, “আমি সেজ্ঞ আসি নাই, তোমার
অস্থখ শুনে দেখতে এলাম।”

“তা এস, এস! তোমরা না দেখলে
আর কে দেখবে? অস্থখ বলে অস্থখ!
সর্কান্ন বাতে বেন পসু, পসু। আজ এই
এববার উঠে ঠাড়িয়েছি।” বাতের বেদনা-
বৃত্তি সহ্য আগ্রহিত হওয়াতে গৃহিণী কোমরে
হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর
পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। “কিছু
খাবার কো নেই বাছা, কিছু খাবার কো

নেই! কবিরাজের সব ব্যয়। আর এই
পোড়া বর্ষায় কি বা পাওয়া যায়! আমড়া
একেবারে ব্যয়। রাকোর জিনিসে অরুচি।
আজ একটু ভাল আছি বলে চটো আমড়া
হেঁচে পোস্তলতা নিয়ে চকড়ি কোরে এক-
মুঠো ভাত খাই।”

হুলোচনা কহিলেন, “বাতের পক্ষে বলে
আমড়া বড় খারাপ। যদি আবার অস্থখ হয়?”

“আর পারি নে বাছা! ডাক্তার-কবিরাজে
আমার কি কোরবে? এখন বেতে
পারগেই বাচি। আর এই বিপিনের আগাধ
চাড় কাটা হল।”

বিপিন তাহার দাতুপুত্র, তাহার সংসার
লইয়াই গৃহিণীর সংসার। তাহার সবচে
এমন কথা শুনিয়া হুলোচনা কিছু বিশ্বয়
প্রকাশ করিলেন গৃহিণী বলিলেন, “বোলো
না, বোলো না তার কথা আর বোলো না।
চাকরী ব্যয় বণে তোমার কাছ থেকে টাকা
এনে দিলাম, তার পর সে তাগা-দুগাছাও
গেল। এ দিকে অনেকদিন রাত্রে ও বাড়ী
থাকে না, বউটা ছেলেমাছুষ, কেঁদে কেঁদে
সারা হল। মাইনের টাকাও সব বাড়ীতে
দেয় না। এমন কোরবে কি চাকরী
থাকে?”

এ সমস্ত কথাই হুলোচনা কোন কথা
কহিলেন না। গৃহিণীর কথা সমাপ্ত হইলে
উঠিয়া আসিলেন।

ভাত্রমাসও ফুরাইয়া আসিল। ছেলে-
মেয়েদের পুজার পোষাক তৈয়ারি হইয়া
গেল। তখন তাহার হুলোচনাকে চাপিয়া
ধরিল, “মা, তোমার পুজার শাড়ী আর হার
কোপায়?”

হুলোচনা করিলেন, “সে যা হয় হবে এখন। তোদের কাপড়চোপড় হয়েছে, তোরা আমোদ-আহ্লাদ করবি, তাই দেখে আমার আহ্লাদ হবে। আমার না হয় নাই হল, আমি ত আর ছেলেনাছবি নই।”

দেবেশ্বর কহিল, “কেন, বাবা কি তোমার এক্সালাটা টাকা পাঠান নি? এই যে পিসিমা তাক্রা ডাক্তারে বলেছিলেন।”

মনোরমা কহিল, “তাক্রা ডাক্তারে কি হবে? বউ টাকা পুঁজি কোরে রেখেচে, ওর কোন সাধ নেই।” মনোরমার ঠোঁটের কোণে হঠাৎ হাসিটুকু হুলোচনা দেখিতে পাইলেন না।

হুলোচনা কহিলেন, “টাকা পুঁজি কোরে রাখা কি দোষের কথা নাকি? আমার কাপড়চোপড় গহনাগাতি অনেক আছে, এ বছর না হয় কিছু নাই করলাম।”

মনোরমা কহিল, “হ্যাঁ, তা হলে দাদা খুব খুঁশী হবেন। তিনি জানবেন, তোমার টাকার খুব দারী হয়েছে।”

হুলোচনা অল্প কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিলেন। ছেলেরা চলিয়া গেলে মনোরমাকে বলিলেন, “দেখ ঠাকুরকি, উনি এশে পর আমার কাপড় কি গহনার কথা তুমি শুঁকে কিছু বোলাও না। যা বলবার, আমি বলব।”

মনোরমা কহিল, “আমি আর কিছু বলব না।”

তুমিরা হুলোচনা কতক নিশ্চিত হইলেন। ছেলেরের ত মুখ বন্ধ করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহাদের কথা কোনমতে উড়াইয়া দেওয়া যায়। মনোরমা বলিলে কিছু গোল।

৫

পঞ্চমীর দিন সকালের সময় নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলেন। প্রসন্ন, প্রচুর গৌরমুর্তি, মুখে চক্রে প্রথম বুকির স্পষ্ট পরিচয়। সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র, চাকরবাকর মিলিয়া নামাইয়া বাড়ীর ভিতর গইরা গেল। নরেন্দ্রনাথ অন্তরমহলে প্রবেশ করিলে বাড়ীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল। হুলোচনা গৃহিণীর মত মাথার একটুপানি কাপড় দিয়া আনন্দপূর্ণমুখে একপাশে পাড়াইয়া ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন আছ?”

হুলোচনা কহিলেন, “ভাল আছি।”

এই পর্য্যন্ত সন্তোষ হইল।

নরেন্দ্রনাথ বিশ্রাম করিয়া, হাতখুব মুইয়া, চলখাবার খাইতে বাসিলেন। হুলোচনা একখানি ঝালর-দেওয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ছেলেরা তখন পূজার কাপড়ের কথা পাড়িল। নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “ও সব কথা আজ নয়, কাল সকালবেলা হবে।”

হুলোচনা সেখানকার বাড়ীর সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দাদাশাশুরী সব কেমন আছে? গাইবান্ধুর সব কেমন আছে? বিদ্বানপত্র নিয়মিত রৌদ্রে বেওয়া হয় ত? শোবার ঘরের পাশে যে আর একখানি ঘর তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার কত বাকি? রামচরণবাবু, মধুসূদনবাবুর বাড়ীর সকলে কেমন আছেন? ছেলেরাও আশ্রয়ের সহিত সে কথায় যোগ দিল। হরিণটা এখন কত বড় হইয়াছে? বাড়ীতে যে মশুর আছে, সেটা পালাইয়া যায় নাই ত? দেখিলেন

টাইঘোড়াতে এখন কে চড়ে ? খানিক পরে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “মনোরমা যে বড় চুপ কোরে রহেছে ? তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই ?”

মনোরমা হাসিল, কহিল, “আছে বই কি ! আমি যে সেই তুলসীগাছটি পুতিয়া-ছিলাম, সেটি আছে ত ?”

“বিলক্ষণ ! আছে না ত কি ? তুলসী-গাছের বহু সন্দেশই করে, কাউকে কিছু বলতে হয় না ।”

রাজে আর কোন কথা হইল না । পর-দিবস প্রাতে অভ্যাগত নরেন্দ্রনাথ হাঁটিয়া একটু বেড়াইয়া আসিলেন । বাড়ীতে ফিরিয়া যখন চা খাইতে বসিলেন, আবার সকলে তাঁহাকে ঘিরিল । চা খাইয়া, নরেন্দ্রনাথ জাম্বোয়ার মল মুখে লইয়া বসিলেন, কহিলেন, “এইবার পূজার জিনিষ । কাপড়-চোপড় কই সব দেখি ?”

মনোরমা ছেলেদের কাপড়, জুতা, বেয়েদের শাড়ী, জ্যাকেট সমস্ত লইয়া আসিল । স্নোচেনা তাঁহাকে যে গরম দিয়া-ছিলেন, সেখানিও লইয়া আসিল, কহিল, “বউ আমাকে এখানি দিয়াছেন ।”

স্নোচেনা লজ্জিতভাবে মুগ্ধবুধ কহিলেন, “স্বর্গের আবার দেখাতে হয় ?”

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “কেন দেখাবে না ? ঠিক দেখান” হয়েচে । তুমি ওকে পূজার জিনিষ দিয়েচ, ও দেখাবে না ?”

সকলের সামগ্রী আসিল, তখন নরেন্দ্র-নাথ স্নোচেনাকে কহিলেন, “তোমার জিনিষ কই ?”

স্নোচেনা ধীরে ধীরে আপনার ঘরে

প্রবেশ করিলেন । বেশিমা নরেন্দ্রনাথ নারব বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল । তিনি সে ইঙ্গিত বুঝিয়া অস্ব-হাসিলেন ।

স্নোচেনা ফিরিয়া আসিলে সকলে দেখিল, তাঁহার হাতে শাড়ী কি হার কিছু নাই, আছে সিনহার একখানি কোঁচোন উৎ-কৃষ্ট মূর্তি, আর একখানি সেইরকম কোঁচোন চানর । সেই মূর্তিচানর বামের পদতলে রাপিয়া, গলার বস্ত্রাঙ্গল দিয়া, বামের পাদ-পদ্মেরেণু মন্তকে দারন করিলেন । আবার যখন স্নোচেনা উদ্ভীষ্টা পাড়াইলেন, তখন তাঁহার সে মন্তোচেলফা যেন দূর হইয়া গেল, রূপগাবনা-স্বপ্নমোভাখোর হির দেবীমূর্তির স্তায় পাড়াইলেন । স্নোচেনা যখন তাঁহার পদানত, সেইসময় নরেন্দ্রনাথ একবার মনো-রমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন, ইঙ্গিতে কহিলেন, “এ কথা ত তুমি আমার বলনাই !” তাঁহার পর তাঁহার গম্ভীর মুখের দৃষ্টি বড় গভীরকোমল হইল । পরোক্ষভাবে পূজার উপহারস্বরূপ মূর্তিচানর তুলিয়া লইলেন । তাঁহার পর স্নোচেনার মুখের দিকে না চাহিয়া কহিলেন, “তোমার শাড়ী আর হার কোথায় ?”

“তৈয়ারি হয় নাই ।”

“কেন ?”

“আমার আর-বছরের কাপড় বেশ আছে, বছর বছর শাড়ীর কি আবশ্যক ? হার গড়ান হয় নি ।” স্নোচেনা বিরমুগ্ধিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন ।

তাঁহার পরে যে কথা হইল, নরেন্দ্র-নাথের যেন একটু বাধবৎ ঠোকতে লাগিল,

স্বশোচনা স্পষ্ট উত্তর দিও নাগেন : আর সকলে নীরব । কস্তা-গৃহিনীতে বোধাপড়। হইতেছে, তাহার মাঝে কে কণা কহিবে ?

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “কেন, আমি ত টাকা আশা না পাঠাইয়াছিলাম । যদি টাকা কম পড়িয়াছিল, আমাকে লিখিলে আরও পাঠাইতাম ।”

“সেমন্ত নয় । আমি ইচ্ছা কোরে পড়াই নি ।”

“টাকা কি হল ?”

“আমি খরচ কোরেছি

“সব ?”

“সব ।”

নরেন্দ্রনাথ নিজের হাতের কাপড়চাষর তুলিয়া ধরিলেন, “এক খরচ ত এই, আর এক খরচ মনোরমার হাতে” তাহার গবদ দেখাইয়া দিলেন—“বাকি ?”

“সে খরচের হিসেব তোনার পরে দেব ।”

“তা যেন দিলে, কিন্তু আজ বটী, আজ পর্বে কি ?”

“সিন্দুকে নতুন কাপড় আছে, আর কোরে পর্ব ।”

“আর কিছু না ? পূজার নিমন্ত্রণ বাবার সময়, বিজয়ার দিন ?”

“তুমি ত আমাকে অনেক কাপড় দিয়েচ, আমার কাপড়ের তাবনা কি !”

“আজ্ঞা, তাও যেন হল, তুমি যে আমাকে এই ধুতিচাদর দিলে, তার বদল আমি কি দেব ?”

“ওর কি বল দিতে হয় ?”

“হয় না ? তব কোরো পাটো তব করে না ?”

স্বশোচনার মুখ বক হইল । নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “দেখিন, খাটের আমার টেবিলের উপর ব্যাগ আছে, নিজে আর ।”

“ব্যাগ আসিল । পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ব্যাগ খুলিলেন । ব্যাগের ভিতর হইতে কাগজে মোড়া একখানি বিচিত্র বহুমুখ শাড়ী বাহির করিলেন । খুব ফিকে বাদামী রং, সেই রং স্বশোচনা পসন্দ করিতেন । আচ্ছাদ্য খুব চওড়া সঁজা দরির কাপ, সঁজা কাছের সূর পাড় । শাড়ী দেখিয়া ছেলেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল । স্বশোচনা হর্ষ-আনন্দে লজ্জায় নতমুখী হইয়া কহিলেন, “এ আর কারুর কাপ নয়, ঠাকুরবীর কাজ !”

মনোম্রা কহিল, “হাঁ, আমার কাজ । কিন্তু আমি দাদাকে কোন কথা বলি নি, শুধু চিঠি লিখেছিলাম । পূজার সময় তুমি নিজের জন্ত কিছু করলে না, সে খবর না দিলে তিনি কি মনে কোরতেন ?”

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “ঠিক কথা ।” তাহার পর ব্যাগে আবার হাত দিয়া উত্তম চামড়ার একটি ছোট বাল্ল বাহির করিলেন । সেটি পাশে রাখিয়া, ব্যাগ হইতে একটুকু ছোট মথমলের কাছকরা বলি বাহির করিলেন । তাহার ভিতর একশত চক্কে টাকা ছিল । কহিলেন, “মনোরমা আমাকে লিখিয়াছিল—তুমি হার গড়াও নি, শাড়ী তৈরি করাও নি, টাকা জমা কোরেছ । কিন্তু জমা, সেটা আমাকে বুকে নিতে বলেছিল । আমি তাই বুকে এই হৃদের টাকা নিচ্ছি । এসেছি । আসল টাকাটা যেনন জমা কোরেচ, এই সুদটাও সেইরকম জমা কোরে । আমি

এই পূজার সময় যেমন টাকা জমাবার সুবিধা, এমন আর কোন সুবিধা নয়।" ধলিহুট টাকা মনোরমার হাতে গিয়া চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে হার বাহির করিলেন। এবার আর বেড়নত টাকার গুরু হার নয়। হোতাশুভ্র হার কলমল করিতেছে। হার-ছড়া দুই হাতে তুলিয়া-ধরিয়া সুলোচনাকে ডাকিলেন, "এ দিকে এস!"

শ্রীভাবনতমুখী সাধবী পতির সমীপে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাহার গলায় হার পরাইয়া দিয়া, চিবুক ধরিয়া সন্দের সঙ্গুখে মুখ কিরাইয়া ধরিলেন। বিজ্ঞাপা করিলেন, "কেমন দেখাচ্ছে?"

পুত্র-কন্তা-নন্দন একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "ঠিক যেন চণ্ডীঠাকুর!"

দেবোত্তর প্রভাতস্থ্য উদয় হইতে ছিল, পথে কলাবউকে স্নান করাইতে লইয়া বাইতেছিল, অগ্রে ঢুলী নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল। ঘরে তিক্কু আগমনী গাহিতেছিল—
"ওমা জিনরনা, অঙ্গুণচরণা, এস এস এস মা!"

অরুণোদিত পাদপদ্মে, ব্রহ্মপ্রেম-প্রীতিপূর্ণ নয়নে, প্রেমের বদনে আনন্দ-ময়ী সেই আনন্দ-আলয়ে আগমন করিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।

হিন্দুদর্শন ।

বেদের মন্ত্রবর্ণ এবং উপনিষৎ এবং তদনুসারে হিন্দুর দর্শনসমূহ, আর পুণ্য, বৃত্তি, শীতা, তত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে কহেন, এই সৃষ্টির আদি-অন্ত নাই। ইহা নিত্য ও আগরণের ভাষা কখনও প্রলয়ে লীন, কখনও ব্যক্ত হয়। অতএব ইহা প্রবাহরূপে নিত্য। এমন সৃষ্টি হয় নাই, কাহাকে আদি বা প্রথম সৃষ্টি কহা যাইতে পারে, আর এমন প্রলয়ও হইবে না, যার পর আর সৃষ্টি হইবে না। সকলেই একবাক্যে কহেন যে, প্রত্যেক প্রলয়ে ভাবিসৃষ্টির ভ্রম। বৃত্তিসম্পন্ন উপাদান ও সচকারী কারণসমূহ,

জীবগণের সহ যুক্তরূপে অবস্থিতি করে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকবার নবসৃষ্টি দেখা দেয়। কুসুমাক্সিগ্রন্থে আছে—“জ্ঞানাদিভ্যঃ কালো মহাপ্রলয়ঃ”—মহাপ্রলয়ে অস্তগমনার্থগত থাকে না। “জ্ঞান”শব্দে উৎপত্তিবিশিষ্ট। উৎপত্তি বিশিষ্ট ভেদভাত স্থূল পদার্থগত থাকে না। কিন্তু পরমাণু, আকাশ, জল, বিদ্যুৎ ও আত্মা, এই পরগমনার্থ নিত্য। মহাপ্রলয়ে এ সমস্ত থাকে। পরমাণুগত গৌরবপ্রকার—পার্শ্ব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস। এতদ্বির অস্ত্যায় প্রাপ্তে বর্তমান মন। এই পরগত নব পদার্থ নিত্য। এ সমস্ত দ্ব্যবৃত্তিসম্পন্ন

এবং ইহারাই সৃষ্টির সনাক্তিকাবল। ইহা-
নের বিস্তারিতভাবে সৃষ্টির বিস্তারিততা হয়।
অতএব ইহার প্রত্যেক প্রণয়ে রক্ষিত ভাবি-
সৃষ্টির অক্ষয়বীর্যরূপ পূর্ণবক্তিকরণ। এই
নয়প্রকার প্রব্যাপনার্থের নাম “বিশেষ
পদার্থ”। সৃষ্টির ব্যক্তাবস্থায় ঘটপটাদি ও
মহুগাণাদি অবস্থার যে পৃথক্ জ্ঞান হয়,
তাহার নাম “ভেদ”। কিন্তু অবস্থারহিত
উক্ত নববির নিত্যপ্রবাহের মধ্যে প্রলম্বকালে
যে পরম্পর অতি হৃদ্য পার্থক্য থাকে, তাহার
নাম “বিশেষ”। জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শনের
কথিত এই “মহাপ্রলয়”এক পুরাতন ও মনো-
নামের উক্ত “নৈমিত্তিক প্রলয়”। তাহা
প্রকৃতিমায়ে পর্ষ্যবসিত “প্রাকৃতিক প্রলয়”
নহে। তাহা হইলে পরমাণুসকল অর্থাৎ
পুরুষাত্মক প্রকৃতিতে লীন হইয়া বাইত।
তাহাতে পরমাণু হইতে সর্গারম্ভ চলিত
না। কলত রঘুনাথ শিরোমণি “সিদ্ধান্ত-
লক্ষণে” লেখেন—“মহাপ্রলয়ে মানা-
ভাবাৎ”। মহাপ্রলয়ের অর্থাৎ প্রাকৃতিক
প্রলয়ের প্রমাণ নাই। অথবা এমন প্রলয়
অপ্রমাণ, বাহার অস্তে আর সৃষ্টি হইবে না।
সুতরাং জ্ঞানবৈশেষিকমতে পরমাণু-আদি
“বিশেষ”পদার্থের প্রাকৃতিক লয় হয় না।

সাংখ্যদর্শন পরমাণু প্রকৃতি “বিশেষ
পদার্থের” সীমা অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে
উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রকৃতিকে তাবৎ
সৃষ্টির বস্তুবীজ কহিয়াছেন। প্রত্যেক
প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতি এবং পুরুষ (আত্মা)
অবশিষ্ট থাকেন। তাহার উভয়েই নিত্য।
“মাত্তেহুত্বা তদ্বারা পারম্পর্যোপাণয়ৎ”
সং. ২-১৭৩) —বৈশেষিকদর্শনে যেমন

পারম্পর্যোপাণয়ের পরমাণু-কই ভগবতের মূল
উপাদান বলেন, সাংখ্যেরাও একই মহাব্যবসিক
মধ্যে রাখিয়া, পারম্পর্যসম্বন্ধে প্রকৃতিকেই মূল
উপাদানকরণ কহেন। সেই উপাদান
হইতে এই জগৎ বারবার সৃষ্ট এবং
প্রত্যেক মহাপ্রলয়ে তাহাতে প্রলীন হয়।

বেদান্তদর্শনমতেও সৃষ্টি প্রবাহরূপে
নিত্য। জীবাত্মা উৎপত্তিবিনাশরহিত। মায়াই
প্রকৃতি। জীবাত্মা এবং মায়ার উভয়েই ব্রহ্মের
অংশ। মায়ার ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি এবং তত্ত্ব হইতে
অনন্তত্ব। পরব্রহ্ম ঈশ্বরসংজ্ঞা গ্রহণপূর্বক,
যীর মায়াক্রিয়ের যোগে, জীবাত্মার ভোগার্থ
আপনার সেই মহাক্রিয়ের মধ্য হইতে এই
সৃষ্টির বহিঃপ্রকটন এবং মহাপ্রলয়ে সেই
শক্তিকোষের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিরূপ বিশাল
কার্যোৎসাহ উপসংহার করেন। তখন ঐ শক্তি
অন্তর্গতরূপে রূপে লীন থাকেন এবং
সৃষ্টিকালে জীবাত্মাকে সঙ্গে লইয়া জগৎরূপে
পরিণত হন।

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ বীরপূর্বকরূপ-
রূপিনী ঐ ব্রহ্মশক্তিরূপিনী প্রকৃতি অর্থাৎ
মায়াতে নামরূপবিহীন হইয়া হৃদয়রূপে প্রলীন
থাকে। নতুবা তৎকালে জগদীশ্বরের
অত্যন্তাভাব থাকে না। তবে যে কোন
কোন স্থলে প্রলয়োপলক্ষে “অসৎ” অর্থাৎ
কিছু ছিল না, এইরূপ উক্তি আছে, তাহার
অর্থ “অব্যাকৃত সৎ”। যথা বেদান্তাদিকরণ-
মালায়—

“বসন্তোৎপত্তিভাবঃ তদব্যাকৃত্যভিধানাভিপ্রায়ঃ, নতু
অত্যন্তাভাবভিপ্রায়ঃ। অত্যন্ত কালব্যবধিবেদ্যঃ।
তাৎপৰ্য্যমিতি তু ভগবৎসৃষ্টিব্রহ্মণি ন কাশি বিদ্যোদয়িঃ”

“অসৎ” শব্দের মাত্রা অর্থ, তাহা “অব্যাকৃত”

সং", "অপ্রকটিত সং", ইহাটি অতিপ্রাচীন ; নতুবা "অত্যাশ্চর্য্য" অভিপ্রেত নহে । কেন না, অত্যাশ্চর্য্যের কারণই নির্দিষ্ট । তাৎপর্য্যাত ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রকাশে কাহারো বিবাদ নাই । কেন না, তাহারই শক্তিতে অসংখ্য প্রাণীরা থাকে, তাহা হইতেই বহিঃপ্রসারিত হয়, —তিনিই ইহা সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অংশত অবশেষ ও ইহাকে পালন করেন ।

এইরূপ অগতির প্রবাহরূপ নিত্যবক্রতি ও ব্রহ্মমোহাদিসিদ্ধ । "স্বাভাব্যবস্ত" (শাং হুং ২।১।১১) —সৃষ্টির পূর্বে মহাপ্রলয়কালে সেই ব্রহ্মশক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অতি হৃদয়ভাবে অগং থাকে । অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টির মার্য্য অববয়বসকল ভাবিসৃষ্টির নিমিত্তে মার্য্যবীজরূপে অপেক্ষা করে । তাহারের নামরূপ থাকে না । ব্রহ্মশক্তিব্রহ্মশক্তি মহামায়ার গর্ভে তাহার বিলীন হইয়া থাকে । সৃষ্টিপ্রকাশার্থে উক্ত মার্য্য সংব্রূপ ব্রহ্মের একাংশব্যাপিনী মহাবীজরূপিণী মহাশক্তি । "কিছু" সর্বাঙ্গ হইলেও তাহার ব্রহ্মশক্তি মার্য্যবস্ত্রী—অর্থাৎ "যেন কিছুই ছিল না এবং পরব্রহ্ম বীজশক্তিবলে সমস্ত সৃষ্টি করিলেন । এ সব কণা বেদান্তপ্রকরণে পরে বুঝা যাইবে ।

অতঃপর জীবের কৃতকর্ম্মরূপিণী অবিশ্বাশক্তি উক্ত মার্য্য বিভাগবিশেষ । তাহাও অনাদি । "ন কন্মাবিশ্বাপাদিত্তি চেদ্যানাদি-ভাবং" (শাং হুং ২।১।৩৫) —এই সৃষ্টি পূর্ব্ববর্তী ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মকলের অগ্রবর্তী নহে, এমন আশঙ্কা অমূলক । যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে, প্রলয়কালে, ভাবিসৃষ্টির হেতুব্রূপ স্রুতিতত্ত্বরূপ অদৃষ্ট বিভাগক্রমে অপেক্ষা

করে । সৃষ্টি জীবাত্মা ও তাহার কর্ম্মকলের আদি নাই । বাস্তবিকবৎ সেই সমস্ত অনাদি ।

তথাচ সম্বরণ

"অত্যাশ্চর্য্যমাত্মাখ্যাতং ।" "অতি সর্ব্বতোভাবেন, 'ইচ্ছাৎ' লবণম্ভে: প্রবহনম্ভে: ই বিলম্বত্যাভ্যুতঃ ভবতি ।"

প্রলয়ের নীন জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্বেষ ধর্ম্মাধর্ম্মসহিত মানসিক রত্নসমূহ নিরুদ্ধভাবে ব্রহ্মশক্তিতে নীন হইয়া থাকে । তাহাই তাহার পূর্ব্বসৃষ্টির অগ্রসারী অদৃষ্ট । যথাকালে সেই অদৃষ্টসমষ্টির বলে (সহকারিতায়) দ্রষ্টাব্রূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ঈক্ষণ বা তপস্তা হইয়াছিল ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রলয়নিশা-বসানে জীবগণের অদৃষ্ট কর্তৃত্বভোক্তৃত্বের অদ্বৈতগুণতা সহ প্রকটিত হইবার অন্ত বাস্ত হইতেছিল । সেই অদৃষ্ট জীবের সৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও দ্রষ্টাব্রূপ ব্রহ্মসৃষ্টির অন্তর্গত । সেই মহাসৃষ্টি প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ । তাহাই "ঈক্ষণ" বা "তপস্তা" নামের বাচ্য । জীবগণের অদৃষ্টের তাৎপর্য্যকালে দ্রষ্টার মাহাশক্তির বিকাশরূপ জ্ঞান-ক্রিয়া ও বলক্রিয়া মার্য্য ক্রমপূর্ব্বক সৃষ্টি বহির্গত হইল । "যথাপূর্ব্বমকল্পং"—ঠিক সেইপ্রকার, যেমন পূর্ব্বকরে ছিল ।

এতাবতী ধর্ম্মনশ্বরের মতে সৃষ্টির উপা-দান ও অদৃষ্টরূপ হেতু অনাদি । স্রুতরাং সৃষ্টিও প্রবাহরূপে অনাদি ও নিত্য । কেবল যথাকালে, প্রলয়প্রান্ত হইতে বাস্তবপ্রান্তে এবং বাস্তবপ্রান্ত হইতে প্রলয়প্রান্তে—এইরূপ চিরকাল তাহার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের স্রূপ অতিব, অন্ত্যগামিত, অদ্বৈতবৎ, বিশ্বত্বং

এবং চিদাভাসও প্রভৃতি তবের গমনাগমন
হইতেছে।

অন্তঃপর আমরা সাংখ্যদর্শনের অম-
বিবরণে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া !

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া !

যার বেশ যার সাজ—

সে কোথা রহিল আঁত—

সে কোথা জন্মের মত গিরাতে চলিয়া :—

গেছে কি চলিয়া ?

কে বলে চলিয়া গেছে—

কেশেতে মিশায়ে আছে,

এই সেই সেই এই

অথচ কিছুই নেই

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া !

বেধি বেধি সেই মত্ত ব্যত্রেক জপিয়া !

যে মত্তে দীক্ষিত করি

গেল যোরে পরিহারি,

মিলারে হৃদয়বস্ত্রে

উচ্চারিব মহামন্ত্রে,

দেখি দেখি কতক্ষণ থাকে সে হুঁলিয়া :—

পারি কি না পারি তাহে

আঁখিপথে আনিবারে

কৃতান্তের বসুন্ধার কোশলে পুলিয়া !

যেমন কৃতান্তে তুধি

এনেছিল যুরিডিসি

অর্ছাস্ বিনোদ বাস্তব্যে বাজাইয়া।

আর কি সে আসিবে না—

পৃথগুহে পশিবে না—

আসে না কি পোষা পাখী পিঞ্জরে উড়িয়া ?

গভীর আঁধার নিশি :— গগন-সাগরে

যেন বেতপুষ্পপারা

ভাসিছে অসংখ্য তারা—

একটি শব্দ নাহি বৈশ্বকোচেরে !

অদূর সূত্রেতে শুধু

শুনা বায় মুহুমুদ

নৈশ-বিহঙ্গম-রব যেতেছে চলিয়া !

যেন গ্রাণ কাটা চাড়ি

ভবিস্যৎ দেয় পাড়ি
করিছে আনন্দরন থাকিয়া থাকিয়া ।

পাখা বিপ্লবিতা সেই
গ্রহানে শিক্তরগায় উড়িবার তরে !

বসি মুক্ত বাতায়নে
করে কেন শূন্যমনে
হেনকালে জ্ঞান হ'ল যেন অকস্মাৎ
জীবন-মরণ তার
মাকে দেই ভগ্নদ্বার, -
যেন কেহ দেই দ্বারে করে করাঘাত !
যথা সে প্রবাসী করে
আসি বহুদিন পরে
সহসা হেরিয়া রুদ্ধ ভবনের দ্বার ;
ভেমনি কে জ্ঞানহারা
বাকুণ-প্রবাসি-পারা
আঘাত করিছে সেই দ্বারে বারবার !

যেন পদশব্দ কার
আসে-যায় বারবার
লজ্জিত্বাবে চাহে সীমা লজ্জিতে না পারে ;—
ভূমিবারে যেই শব্দ
ছৎপিণ্ড হ'ত তত্ব—
টানিয়া জীবনশ্রান্তে ফেলিল আমারে !

কণে আসে কণে যায়
মুক্ত-বিহতিনী-প্রায়,
উপায় নাহিক পায় পশিতে পিল্লরে ;—
পিল্লরেতে পারি দেই

দুই জন দুই স্থানে—
টানাটানি প্রাণে প্রাণে,
এমন সময়ে কার্ কৰ্ত্ত সুধাময়—
যেন বগ্ন-মুদিত
চিরবিরহের দিত
তামাইল স্মৃতিশ্রোতে নিমগ্ন হৃদয় !

কার্ কৰ্ত্ত পদশব্দ—কার্ করাঘাত ?—
এ চেন নিশিতে একা—
চোখেতে পাই নে দেখা—
জীবন-উপান্তে আসি করে বাতায়নাত !
চিনি চিনি মনে করি,
কিন্তু চিনিবারে নারি,
যেন পথে পাখ্যাসে
বাধা মন তার পাশে ;
যেন রে তুনেছি কোথা
সে কৰ্ত্তহুদার কথা,
আজিও জীবনশ্রান্ত বহে তার পানে ।

অনন্তর সেই স্বর
উঠি শূন্য মনোহর,
পশিয়া নতঃপ্রথম

উচ্চারিল সেই নাম,
মিশাইয়া গেল'নেখে অন্তঃ গগনে !

করে যে কুন্তল ছিল
কর হ'তে পড়ে গেল,
লহরে লহরে কেশ ক্রমে বিস্তারিল !
তাহে সেই রূপরাশি
সে তমু শোভিত আসি,
যেন পৌর্ণমাসী-শশী মেঘে দেবা ধিগ !
যেন বনরাশিগিরে
নির্জন তটিনী তীরে
অকলঙ্ক টাদখানি হাসি সন্মিল !

• • •
• • •
কৈ সে কোথায় গেল আমারে তালিয়া ?

শুভগৃহে শূন্য আছে,

কেহ ত নাহিক কাছে,
সব শূন্য করে' গেছে শূন্যে মিশাইয়া !
অন্ধকার করি' হেথা
দে শশী উঠিল কোথা,
করিল আলোকময় কোন্ দ্বারো গিয়া ?
এত ভাগবাসাবাসি,
এত প্রাণে মেখামিষি,
এত সাধ এত আশা,
এত যে প্রাণের কৃপা,
সব কি অন্তের মত রহিল তুলিয়া ?

কারায়ুক্ত কারাবালে
কে কবে কিরিয়া আসে ?
কে চাহে কৃত্রিম হুঃখ নিগড় পরিয়া ?
কোথাও দেখি না তারে :—
নাহি চিত্ত এ সংসারে !—

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া।

গোপালকৃষ্ণ।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৪৮

রবেশ প্রত্যুবেই এলাহাবাদ হইতে গাজিপুরে
কিরিয়া আসিল। তখন রাত্তার অধিক
লোক ছিল না, এবং নীতের জড়িমায় রাত্তার
ঘরের গাছগুলো যেন পল্লবাবরণের মধ্যে
আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাড়ার বস্ত্র-
গুলির উপরে তখন একখানা করিয়া শাদা
কুশাণ ডিগগুলির উপরে নিশ্চল-আলীন
রাঙ্গহংসের মত হির হইয়া ছিল। সেই
নির্জন পথে গাড়ির মধ্যে একটা মত্ত মোটা
ওতারকোটের নীচে রবেশের বক্ষস্থল ঢকল
জংপিণ্ডের আঘাতে কেবলি তরঙ্গিত হইতে-
ছিল।

বাংলার বাহিরে গাড়ি দাঁড় করাইয়া
রবেশ নামিল। ভাবিল, গাড়ির শব্দ নিশ্চয়ই
কমলা শুনিয়াছে;—শব্দ শুনিয়া সে হয় শু
বায়নার বাহির হইয়া আসিরাছে। সহজে
কমলার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য এলাহা-
বাদ হইতে রবেশ একটি দামী মেক্সলেস্
কিনিয়া আনিয়াছে— তাহারই বাস্তুটা রবেশ
তাহার ওতারকোটের বৃহৎ পকেট হইতে
বাহির করিয়া লইল।

বাংলার সমুখে আসিয়া রবেশ দেখিল,
বিষণ-বেহারা বাওয়ালার শুইরা অকাতরে
নিদ্রা দিতেছে—ঘরের দারগুলি বন্ধ। বিমর্ষ-
মুখে রবেশ একটু থম্কিয়া দাঁড়াইল। একটু
উচ্চস্বরে ডাকিল “বিষণ!” ভাবিল, এই ডাকে
ঘরের ভিতরকার নিদ্রা ভাঙিবে। কিন্তু
এমন করিয়া নিদ্রা ভাঙাইবার বে অপেক্ষা
আছে, টহাই তাহার মনে বাজিল; রবেশ ত
অঙ্কেকরাতি ঘুমাইতে পারে নাই।

ওই-তিন ডাকেও বিষণ উঠিল না—শেষ-
কালে ঠেলিয়া তাহাকে উঠাইতে হইল।
বিষণ উঠিয়া-বসিয়া অণকাল হস্তবৃত্তির মত
তাকাইয়া রহিল। রবেশ জিজ্ঞাসা করিল—
“বহলি ঘরে আছেন?”

বিষণ প্রথমটা রবেশের কথা যেন বুঝি-
তেই পারিল না—তাহার পরে হঠাৎ চকিত
হইয়া উঠিয়া কহিল, “হী, তিনি ঘরেই
আছেন।”—এই বলিয়া সে পুনর্বার শুইয়া-
পড়িয়া নিদ্রা দিবার উপক্রম করিল।

রবেশ ঘর তেলিতেই ঘাঁর খুলিয়া গেল।
ভিত্তরে গিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিল, কেহ
কোথাও নাই! তথাপি একবার উচ্চস্বরে

ডাকিল, “কমলা কোথাও কোনো পাড়া পাইল না। বাহিরের বাগানে নিমগ্ন হইতলা পর্ণাশ্রুত গুরিমা আসিল। রাত্রাঘরে, চাকরদের ঘরে, আত্মবলঘরে সকল করিয়া আসিল, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইল না। তখন রৌদ্র উঠিয়া পড়িয়াছে—চাকরগণ ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বাংলার ইয়ারা হইতে অল লইবার মত কলস মাথায় পাড়ার ঘরে দুই একজন দেখা দিতেছে। পথের ওপারে কুঠীর প্রাঙ্গণে কোনো পল্লী-নারী বিচিত্র উচ্চস্বরে গান গাহিতে গাহিতে জাঁতার গম ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমেশ বাংলাঘরে কিরিয়া-আসিয়া দেখিল, বিপণ পুনরায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তখন সে নত হইয়া দুই হাতে গুল করিয়া বিপণকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল—দেখিল, তাহার নিখাসে ডাক্তার প্রবণ গন্ধ ছুটিতেছে।

ঝাঁকানির বিঘন বেগে বিপণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া খড়্‌খড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল “বহি কোথায়?”

বিপণ কহিল—“বহি ত ঘরেই আছেন।”

রমেশ। কই, ঘরে কোথায়?

বিপণ। কাল ত এখানেই আসিয়াছেন?

রমেশ। তাহার গরে কোথায় গেছেন?

বিপণ হাঁ করিয়া রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময়ে খুব চওড়াপাড়ের এক বাহারে খুঁটি পরিয়া চাঁদের উড়াইয়া রক্তবর্ণ-চক্ৰ উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, তোর মা কোথায়?”

উমেশ কহিল, “মা ত কাল হইতে এখানেই আছেন।”

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—“তুই কোথায় ছিলি?”

উমেশ কহিল “আমাকে মা কাল বিকালে সিধুবাবুদের বাড়ী যাত্রা গুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।”

গাড়োয়ান আসিয়া কহিল, “বাবু, আমার ভাড়া।”

রমেশ ভাড়াভাড়ি সেই গাড়িতে চড়িয়া একেবারে খুড়ার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, বাড়ীস্থক সকলেই যেন চকল। রমেশের মনে হইল, কমলার বুঝি কোনো অশুভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কাল সকাল কিছুর পরেই উমা হঠাৎ অত্যন্ত চাঁৎকার করিয়া কানিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার মুখ নীল ও হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ার সকলেই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। তাহার চিকিৎসা লইয়া কাল বাড়ীস্থক সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। সমস্ত রাত কেহ ঘুমাইতে পার নাই।

রমেশ মনে করিল, উমির অশুভ হওয়াতে নিশ্চয়ই কাল কমলাকে এখানে আনানো হইয়াছিল। বিপিনকে কহিল—“কমলা জাহায়ে উমিকে লইয়া খুবই উমির হইয়া আছে।”

কমলা কাল রাতে এখানে আসিয়াছিল। কি না, বিপিন তাহা নিশ্চয় আনিতে না—তাই রমেশের কথার একপ্রকার সত্য দিয়া কহিল, “হাঁ, তিনি উমিকে ঘেরকম ভালবাসেন, খুব

ভাবিতেছেন বই কি ! কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছে, ভাবনার কোনো কারণই নাই।”

বাধা হউক, অত্যন্ত উন্নতের মুখে কষ্ট-নার পূর্ণ উজ্জ্বল বাধা পাইয়া রমেশের মনটা বিকল হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহাদের মিলনে যেন একটা দৈবের বাধাত আছে।

এমনসময় রমেশের বাংলা হইতে উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানকার অন্তঃ-পুরে তাহার গতিবিধি ছিল। এই বালক-টাকে শৈলজা যেহেতু করিত। বাড়ীর ভিতরে শৈলজার ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া উমেশ ঘুম ভাঙিবার আশঙ্কায় শৈল ভাড়াভাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

উমেশ জিজ্ঞাসা করিল “মা কোথায় মাসিমা !”

শৈল বিম্বিত হইয়া কহিল—“কেন রে, তুই ত কাল তাহাকে সঙ্গে লইয়া ও বাড়ীতে গেলি। সন্ধ্যার পর আমাদের লছমনিমাকে ওখানে পাঠাইবার কথা ছিল, খবর অসুখে তাহা পারি নাই।

উমেশ মুখ দ্রাঘ করিয়া কহিল—
“ও বাড়ীতে ত তাহাকে দেখিলাম না।”

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল, “সে কি কথা ? কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি ?”

উমেশ। আমাকে ত মা থাকিতে দিলেন না। ও বাড়ীতে গিয়াই তিনি আমাকে নিধুবাবুদের ওখানে যাত্রা করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

শৈল। তোরও ত বেশ আকুল দেখিতেছি ! বিষণ কোথায় ছিল ?

উমেশ। বিষণ ত কিছুই বলিতে পারে না। কাল সে পূর্ব ভাড়ি খাইয়াছিল।

শৈল। বা, বা, শায় বাবুকে ডাকিয়া আন।

বিপিন আসিতেই শৈল কহিল—“ওগো, এক কি সর্বনাশ হইয়াছে !”

বিপিনের মুখ পাংগুর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কেন, কি হইয়াছে ?”

শৈল। কমল কাল ও বাংলার গিয়াছিল, তাহাকে ত সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া গাইতেছে না।

বিপিন। তিনি কি কাল রাত্রে এখানে আসেন নাই ?

শৈল। না গো ! উমির অসুখে আনা-ইব মনে করিয়াছিলাম, লোক কোথায় ছিল ? রমেশবাবু কি আসিয়াছেন ?

বিপিন। বোধ হয়, ও বাংলার ঘেঁষিতে না পাইয়া তিনি ঠিক করিয়াছেন, কমলা এখানেই আছেন। তিনি ও আমাদের এখানেই আসিয়াছেন।

শৈল। বাও বাও, শ্রুত বাও, তাহাকে গইয়া খোঁজ কর'গে ! উমি এখন ঘুমাইতেছে—সে ভাগই আছে।

বিপিন ও রমেশ আবার সেই পাকিতে উঠিয়া বাংলার ফিরিয়া গেল এবং বিষণকে লইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টার সোচ্চার-ভাড়া দিয়া বেটুকু খবর বাহির হইল, তাহা এই :—কাল বৈকালে কমলা একলা গঙ্গার ধারের অভিমুখে চলিয়াছিল। বিষণ তাহার সঙ্গে বাইবার প্রস্তাব করে, কমলা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া ফিরাইয়া দেয়।

সে পাহারা দিবার ছত্র বাগানের গেটের কাছে বসিয়া ছিল—এমন সময়ে গাছ হইতে সস্ত্রসজ্জিত কেনোচ্ছল তাড়ির কলস বাঁকে করিয়া তাড়ি ওরালা তাহার সমুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার পর হইতে বিশ্বাসসারে কি যে ঘটনাছে, তাহা বিশ্বাসের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নহে! যে পথ দিয়া কমলাকে গঙ্গার দিকে যাইতে দেখিয়াছিল, বিশ্বাস তাহা দেখাইয়া দিল।

সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে দিয়া রমেশ, বিপিন ও উমেশ কমলার সন্ধানে চলিল। উমেশ চতুর্দিক শিকারী হস্তের মত চারিদিকে তীক্ষ্ণ ব্যাকুলদৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। গঙ্গার তটে আসিয়া তিনজনে একবার দাঁড়াইল। সেখানে চারিদিক উন্মুক্ত। ঈশ্বর বালুকা প্রভাতরোজে ধুধু করিতেছে। কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না! উমেশ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল—“হা, মাগো, হা কোথায়?”—ও পারের হৃদয় উচ্চতীর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি কিরিয়া আসিল—কেহই সাড়া দিল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে উমেশ হঠাৎ ঘুরে শাদা কি—একটা দেখিতে পাইল। তাকাতাড়ি কাছে আসিয়া দেখিল, জলের একেবারে ধারেই একপোছা চাবি একটা কুমালে বাঁধা পড়িয়া আছে। “কিরে, ওটা কি?” বলিয়া রমেশও আসিয়া পড়িল। দেখিল, কমলারই চাবির গোছা।

সেখানে চাবি পড়িয়া ছিল, সেখানে বালুতটের প্রান্তভাগে পলিমাটি পড়িয়াছে। সেই কাঁচা মাটির উপর দিয়া গঙ্গার জল

পর্শায় ছোট ছোট পাথরের গভীর চিহ্ন পড়িয়া গেছে। খানিকটা জলের মধ্যে একটা-কি কিছুকি করিতেছিল, তাহা উমেশের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না—সে সেটা তাকাতাড়ি তুলিয়া ধরিতেই দেখা গেল, মোনার উপরে এনামেল করা একটি ছোটো ব্রোচ—ইহা রমেশেরই উপহার।

এইরূপে সমস্ত সন্ধানই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অনুলিনার্শন করিল, তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না—“হা, মাগো”—বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে খাঁপ দিয়া পড়িল। জল দেখানে অধিক ছিল ন,—উমেশ বারংবার পাগলের মত ডুব দিয়া দিয়া তলা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল—জল ঘোলা করিয়া তুলিল।

রমেশ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন কহিল—“উমেশ, তুই কি করিতে ছিন? উঠিয়া আর।”

উমেশ মুখ দিয়া জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল—“আমি উঠিব না—আমি উঠিব না! মাগো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারবে না!”

বিপিন ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু উমেশ জলের মাছের মত দাঁতার স্রিতে পারে—তাহার পক্ষে জলে আত্মহত্যা করা অত্যন্ত কঠিন। সে অনেকটা হাঁপাইয়া-খাঁপাইয়া সান্ত হইয়া ডিঙার উঠিয়া পড়িল এবং বালুর উপরে লুটাইয়া-পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নিম্নতর রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, “রমেশবাবু, চলুন! এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে! একবার পুলিশকে

খবর দেওয়া থাকে, তাহার সমস্ত সন্ধান করিয়া দেখুক !”

দৈনন্দিন যত্নে সেদিন আহারনিমিত্তা বন্ধ হইয়া কাহার হোল উঠিল। নদীতে জেলেরা নৌকা লইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত জাল টানিয়া বেড়াইল। পুলিশ চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিল। ট্রেনে গিয়া বিশেষ করিয়া খবর লইল, কমলার সহিত বর্ণনার মেলে, এমন কোনো বাঙালীর ঘরে রাখে রেলেগাড়িতে ওঠে নাই।

সেইদিনই বিকালে বুড়া আসিয়া পৌছিলেন। কয়দিন হইতে কমলার ব্যবহার ও আভ্যোপাস্ত সমুদয় রক্তাক্ত গুলিয়া তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কমলা গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া নদ্রিরাছে।

লহমনিয়া কহিল, “সেইজনই খুকি কাল রাতে অকারণে কাগা ছুঁড়িয়া এমন একটা অদ্ভুতকাণ্ড করিল—উহাকে ভাল করিয়া খাড়াইয়া লওয়া দরকার।”

রমেশের বৃকের ভিতরটা ঘেন শুকাইয়া গেল—তাহার মধ্যে অস্ত্রের বাস্তুকুণ্ড ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল “একদিন এই কমলা এই গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আবার পানে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মত আর একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অস্তিত্ব হইল।”

সূর্য্য-বধন অর্ধ গেল, তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আসিল—যেখানে চাবির গোছা পড়িয়া ছিল, সেখানে ঝাঁড়াইয়া সেই পারের চিত্রক’টি একদৃষ্টে দেখিল—তাহার পরে তীরে জুতা গুলিয়া ধুতি ওটাইয়া-লইয়া খানিকটা জল পয়ান্ত না’মিশ্র গেল এবং

বারা হইতে সেই নূতন নেকলেসটি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

রমেশ কখন বে গালিপুর হইতে চলিয়া গেল, পূজার বাড়ীতে তাহার খবর লইবার মত অবস্থা কাহারো রহিল না।

৪৯

এখন রমেশের সমুখে কোনো কাজ রহিল না। তাহার মনে চইতে লাগিল, ইহজীবনে সে ঘেন কোনো কাজ করিবে না, কোথাও দাড়ী চইয়া বসিতে পারিবে না। তাহার মনে হইল, তাহার জীবনের নাট্যপীলা একে-বারে শেষ হইয়া গেছে বাতি নিবিয়াছে, যখনিক পড়িয়াছে, সমস্ত সঙ্গীত মিস্ত্র—এখন তাহার কোনো বন্ধন নাই, কর্তব্য নাই, সুখও নাই। হেমলিনীর কথা তাহার মনে একেবারেই যে উদয় হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহা সে সরাইয়া দিরাছে,—সে মনে মনে বলিরাছে, “আবার জীবনে যে নিবাসন ঘটনা আঘাত করিল, তাহাতে আমাকে চির-জিনের অস্ত্র সংস্কারের অযোগ্য করিয়া তুলিরাছে। উদ্ধারিত গাভ প্রকৃত উপবনের মধ্যে স্থান পাইবার আশা কেন করিবে?”

রমেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার অস্ত্র বাহির হইল। একজারগার কোথাও বেশি-দিন রহিল না। সে নৌকার চড়িয়া কান্ট্রি ঘাটের শোভা দেখিল, সে দিল্লিতে কুন্ত-মিনরের উপরে চড়িল, আগ্রার জোৎস্না-রাতে তাঁর দেখিয়া আসিল। অনুভবের গুরুদরবার দেখিয়া রাতপূতানার আবুগুরুত-শিখরের মন্দির দেখিতে গেল—এমনি করিয়া রমেশ নিজের সন্ন্যাসমনকে আর বিপ্রায় দিল না।

কিন্তু দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ানো রমেশের স্বভাবলিঙ্গ নহে। সে নিতান্তই কুণো—এবং অল্পলোকের সুখাপেক্ষী। সে বালাকাল হইতে বড়খের পাতার উপরে কুঁকিয়া-পড়িয়া দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়াছে। ছাত্র-বস্থায় যখন ‘মেনে’ থাকিত, তখন তাহার দুইএকজন ছিঁতৈবী বন্ধু বরাবর তাহার তত্ত্ব-বধান করিয়াছে। নিজেই টাকাকড়ি, অশ্ব-বগনের ব্যবসায় তাহা সে কোনেদিন নিজে লইতে পারে নাই। তাহার পিতার আশ্রয়ের পুরাতন বিখ্যাসী লোকের হাতে তাহার বিষয়-আশয়ের তার থাকিতে জীবিকার অন্ত এতাদে তাবিত হইতেছে না। এক ছাত্রেরা খেলা, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতিতে যখন উৎসাহপ্রকাশ করিত, তখন রমেশ মনে করিত, ইহা বর্জ্যতামাত্র ও ইহাতে মানসিক উচ্চ প্রযুক্তিগুলির দোহায়া নষ্ট হইয়া যায়। সেই রমেশ আজ নিজের সমস্ত ভার নিজে সম্পূর্ণ বহন করিয়া, টিকিট কিনিয়া, হুটে ডাকিয়া, গাড়ির জিকের মধ্যে টেলাটেলির ভোরে নিজের স্থান করিয়া গইয়া, নতুন নতুন স্থানে টিকিটগাড়ির পাড়োয়ানের নির্দেশক্রমে বাসা ঠিক করিয়া এসব করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেও যে ঠিক নিজের স্বভাবের উত্তেজনার, তাহা নহে। সে অনেক গ্রন্থে পড়িয়াছে যে, জীবনে গুরুতর দুর্ঘটনার পরে চের লোকে এমনি করিয়া দেশে-বিদেশে নতুন নতুন দৃষ্ট দেখিয়া নিজেতে সর্জনবাই সচল রাখিয়া রাখালাভ করিয়া থাকে। তাই সেও সেই শোকাবুর লোকের শাস্ত্রসম্মত পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু এই উপায়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই

রমেশ নিজেকে একেবারে পারিত্রাণ করিয়া ফেলিল। অপরিচিত দেশের অনাশ্রয় ও অপরিচিত লোকের অসহন্য হইতে ছুটি গইয়া কোনো একটা নিভৃত কাগপাধ্যায়রাশে স্থায়ী হইয়া বসিবার জন্য তাহার সমস্ত শরীরমন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। গোড়ায় যখন সে ভ্রমণে বাহির হয়, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, চিরদিনই তাহাকে এমনি ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে—এখন রমেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, চিরদিন বলিতে অধিকদিন নহে— তাহাকে একটা বাসা করিতেই হইবে।

একদিন কানপুরের ডাকবাংলার নিকট-বস্তী পথে পারগরি করিতে করিতে রমেশ এত সকল কথা আলোচনা করিতেছে;—লাইব্রেরি সাধাইয়া, চারিদিকে বাগান করিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ বাসগিরি একটি মনোরম চিত্র গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার অধারনশীল শাস্ত্রময় নিভৃত জীবনবাজার মধুর কল্পনার আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমন-সময় হঠাৎ অনূরে একটি সামান্ত পথিককে দেখিয়া রমেশ একেবারে জর্জর হইয়া উঠিল। “আরে জান্‌কিয়া—জান্‌কিয়া” করিয়া ক্ষত-পদে রমেশ তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি রমেশকে দেখিয়া আশ্চর্য-হইয়া সেলাম করিল—কহিল, “বাবুজি এখানে যে!”

রমেশের সহিত অল্পদাৰ্শবাদের যখন প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন এই জান্‌কিয়া তাহাদের বেহারী ছিল। অল্পকয়েকদিন পরেই পীড়িত হইয়া জান্‌কিয়া বাড়ী চলিয়া যায়, তাহার পরে আর সে ফেরে নাট।

এইটুকু দূরপরিচয়ের সম্পর্কমাত্র

রমেশ এত উৎসাহ হইয়া উঠিল যে, পথের মধ্যে এই আনুক্রিয়া-বেহারার সঙ্গ তাহার একটা লাভ বলিয়া মনে হইল। আনুক্রিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বুড়াবাবু কেমন আছেন ? দিটিঠাকরণ তাগ আছেন ত ? মাণাবাবু কি করিতেছেন ?”

রমেশ কতকটা আলাজেই এ সকল কথাই উত্তর দিল। আনুক্রিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দিটিঠাকরণের ‘সাদি’ হইয়া গেছে ?”

রমেশের বুকটার ভিতরে একটা নাড়া খাইল, সে কহিল, “না, এখনো হয় নাই।”

আনুক্রিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সবক স্থির হইয়াছে কি ?”

রমেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “কই, তাহা ত ভনি নাই।”

আনুক্রিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্ভত হইলে রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখানে কি কর ?”

সে কহিল, “আমার এখানে বস্তুরবাড়ী—আমি এখানকার কলে কাজ করি।”

সে কত করিয়া পাহ, তাহার কিরকম করিয়া চলে, তাহার ছেলেপুলে আছে কি না, সবক রমেশ জিজ্ঞাসা করিল। আনুক্রিয়া মনে মনে কিছু বিস্মিত হইল। এই চমচাম-পরা বাবুটি অন্নদাবাবুর বাড়ীতে কোনোদিন আনুক্রিয়ার কোন খবর নয় নাই। আনুক্রিয়ার

বিবাহকালে রমেশ তাহার হাতে একটা টাকা দিল—সে পুনর্বার কাজ সারিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরিবার সময় ডাকবাংলার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া থাইখে আশ্রয় দিয়া, সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

রমেশ ডাকবাংলায় আদানকেশয়ার হেলান দিয়া বসিয়া অনেক কণা ভাবিল। এমন কি, তাহার মধ্যে এই আনুক্রিয়া-বেহারাতার প্রতি একটু দীর্ঘাও ছিল। ঐ যে আনুক্রিয়াটা কেমন বুদ্ধনতিতে কাজ করিতে গেল,—উহার এখানে থর আছে—কাজ সারিয়া সন্ধ্যাবেলায় আপনার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে—সেখানে দীপ জলিতেছে—অন্ন প্রস্তুত, এই কল্পনাটা রমেশের কাছে তুলে মনে হইল না। এই সময়ে, আনুক্রিয়া কলিকাতার যে বাড়ীতে কাজ করিত, সেই বাড়ীর ছোটবড় নানা কথা তাহার মনে উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় রমেশ ডাকবাংলায় একলা বসিয়া থাকিতে পারিল না। বেড়াইতে বাহির হইল। গুরিতে গুরিতে হঠাৎ একটা বাংলাবাড়ীর সম্মুখে আনুক্রিয়া দাঁড়াইল। সেখানে ঘরের মধ্যে হাঙ্গোনিয়ম বাজিতেছে এবং তাহার সঙ্গে শ্রীকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনা যাইতেছে। হঠাৎ কণকালের মত বিলম্ব হইল, যেন হেমলিনীই গাহিতেছে। যখন বুঝিল, হেমলিনী নয়, তখনো তাহার মনের সেই মোহ একেবারে ভাঙিয়া গেল না।

বাড়ীর একটি ভৃত্যের কাছে ধইতে থবর পাইল, কোনো বাড়ালী ভক্তলোক সঙ্গীক বেড়াইতে আসিয়া এখানে বাসা করিয়া আছেন। রাগা হইতে, এই সঙ্গীতসুধরিত দীপজলিত ঘরের দিকে রমেশ সতৃষ্ণ মননে চাহিয়া রহিল। বাবুটির সঙ্গে আলাপ করিবার মন্ত রমেশ পরদিন সকালে সেই বাংলার দিকে যাত্রা করিল। গেটের

কাছে আসিয়াই দেখিল, একটি যুবতী বাংলার সহিত সংলগ্ন চুলবাগানে ধীরগদ্যে বেড়াইতেছেন। রমেশ যে করদিন উচ্ছ্বাসে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল, সে করদিনের মধ্যে কোনো আধুনিক বাঙালী ভ্রমণলোককে সে দেখে নি;—আজ হঠাৎ এই বাঙালীর ঘেরটি যে তাহার চক্ষে এমন নূতন, এমন মধুর লাগিলে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারিত না। এই কাপড় পরিবার ভক্তি, এই চুলবাগা, এই ধীর গতি দেখিয়া এই প্রবাসের প্রভাতে তাহার মনে কোথাকার কোন্ ছবি জাগিয়া উঠিল! রমেশের ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই ঘেরটিকে কেবল একবার নমস্কার করিয়া আসে। আচ্ছা বিনি কোন্ ভাগ্যবানের ঘরটিকে ব্রিঙ্ক, উজ্জল, সুখান্ন করিয়া রাখিয়াছেন! এমন সময়ে হঠাৎ রমেশকে দেখিতে পাইয়া ঘেরটি বাগান হইতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে ক্রমে এমনি হইল যে, সেখানে-সেখানে বাহা-তাচ্ছা কেবল হেমলিনীর কথাই তাহাকে স্মরণ করাইতে লাগিল। লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিলে সেই সকল বই চোখে পড়ে,—বাহাতে হেমলিনীর স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। কাপড়ের দোকানের সুবুখ দিয়া বাইবার সময় হঠাৎ এমন একটা রঙের কাপড় দেখিয়া তাহার মনটা চমকিয়া উঠে,—বাহাতে হেমলিনীর কোনো-একটা দিনের বিশেষ সাজ তাহার মনে পড়িয়া যায়। প্রত্যহ সকালে-বিকালে বেড়াইতে গিয়া একটা ফিরিঙ্গির বাড়ীর কাছে দিয়া বাইবার সময় যেমন দেখে, তাহার গুটিজ্বী-
“তন হেম-পুঙ্খ টেবিল দিগিয়া বসিয়া চা

বাহাতেছে—অমনি তাহার মনের ভিতরটার থক্ করিয়া উঠে।

এই ভ্রমণপ্রাপ্ত যুবকটির অন্তঃকরণ কেবল ঘর চাহিয়া হাহা করিতে লাগিল। তাহার মনে একটি শাস্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখের কল্পনা কেবলি আঘাত হিতেছে! অবশেষে একদিন তাহার শোককালবাগানের ভ্রমণ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল এবং সে একটা মজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া রেলগাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

৫০

কলিকাতার পৌছিয়া রমেশ সেই কলুটোণার গল্‌টোর ভিতরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না। সেখানে গিয়া সে কি দেখিলে, কি শুনিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই! মনের মধ্যে কেবলি একটা আগত। হইতে লাগিল যে, সেখানে একটা ক্ষতের পরিবর্তন হইয়াছে। একদিন ত সে গগির মোড় পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা রমেশ নিজেই ঘোর করিয়া সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেখিল, বাড়ীর সমস্ত দরজা-দুলা বন্ধ—ভিতরে কোনো লোক আছে, এমন লক্ষণ নাই। তবু সেই সুখ-বেহারটা দ্বয় ত পুত্রবাড়ী আগল্গাই-তেছে মনে করিয়া রমেশ বেহারাকে ডাকিয়া দ্বারে ব্যস্তকত আঘাত করিল। কেহ সড়া দিল না। প্রতিবেদী চন্দ্রমোহন তাহার ঘরের বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল—সে কহিল, ‘কে ও! রমেশবাবু নাকি! ভাল আছেন ত? এ বাড়ীতে অন্নবাবুরা ত এখন কেহ নাই!’

রমেশ । তাঁহারা কোথায় গেছেন জানেন ?
চন্দ্রমোহন । সে খবর ত বলিতে পারি
না, পশ্চিমে গেছেন এই জানি ।

রমেশ । কে কে গেছেন মশায় ?

চন্দ্র । অন্নদাবাবু আর তাঁর ঘের ।

রমেশ । ঠিক জানেন, তাঁহাদের সঙ্গে
আর কেহ যান নাই ?

চন্দ্র । ঠিক জানি বই কি ! বাইবার
সময়ও আবার সঙ্গে দেখা হইয়াছে ।

তখন রমেশ ধৈর্য্যেরক্ষার অক্ষর হইয়া
কহিল—“আমি একজনকে কাছে থবর পাই-
য়াছি, নলিনবাবু বলিয়া একটি বাবু তাঁহাদের
সঙ্গে গেছেন ।”

চন্দ্র । তুল পদর পাইয়াছেন । নলিন-
বাবু আপনাকে ঐ বাসটাতেই দিনকয়েক
ছিলেন । ইহারা যাত্রা করিবার দিনইউঠার
পূর্বেই তিনি কানীতে গেছেন ।

রমেশ তখন এই নলিনবাবুটির বিবরণ
এত্র করিয়া করিয়া চন্দ্রমোহনের কাছে হইতে
বাঞ্ছা করিল । ইহার নাম নলিনাক চট্টো-
পাধ্যায় । শোনা গৈছে, পূর্বে তংপুরে
ডাক্তারি করিতেন, এখন নাকে লইয়া
কানীতেই আছেন । রমেশ কিছুকণ স্থব্ধ
হইয়া রহিল । জিজ্ঞাসা করিল “যোগেন
এখন কোথায় আছে বলিতে পারেন ?”

চন্দ্রমোহন খবর দিল, যোগেন্দ্র বরমন-
সিংহের একটি ছবিদারের স্থাপিত হাই-স্কুলের
খেডবাটারপরে নিযুক্ত হইয়া বিপাইপুরে
গিয়াছে ।

চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল “রমেশবাবু,
আপনাকে ত অনেকদিন দেখি নাই—আপনি
এতকাল কোথায় ছিলেন ?”

রমেশ আর গোপন করিবার কারণ
দেখিল না—সে কহিল, “প্র্যাক্টিস্ করিতে
গাজিপুরে গিয়াছিলাম ।”

চন্দ্র । এখন তবে কি সেইখানেই থাকা
হইবে ?

রমেশ । না, সেখানে আমার থাকা হইল
না—এখন কোথায় গাইব, ঠিক করি নাই ।

রমেশ চলিয়া বাইবার অনতিকাল পরেই
অক্ষর আসিয়া উপস্থিত হইল । যোগেন্দ্র
চলিয়া বাইবার সময়, নাকে নাকে তাগানের
বাড়ীর তত্ত্বাবধানের রত অক্ষরের উপর ভার
দিয়া গিয়াছিল । অক্ষর যে ভার গ্রহণ করে,
তাহা বন্ধ করিতে কখনো শৈথিল্য করে না
—তাই সে হঠাৎ এখন তখন আসিয়া দেখিয়া
যাও, বাড়ীর বেহার-দুতনের মধ্যে একজনও
হাসির থাকিয়া খবরদারি করিতেছে কি না ।

চন্দ্রমোহন তাহাকে কহিল, “রমেশবাবু
এই থাকিরক্ষণ হইল এখান হইতে চলিয়া
গেলেন ।”

অক্ষর বলেন কি ? কি করিতে আসিয়া-
ছিলেন ?

চন্দ্র । তাহা ত জানি না । আবার
কাছে অন্নদাবাবুদের সমস্ত খবর জানিগা
লইলেন । এমন রোগ্য হইয়া গেছেন, হঠাৎ
তাঁহাকে চেনাই কঠিন—বদি বেহারাকে না
ডাকিতেন, আমি চিনিতে পারিতাম না ।

অক্ষর । এখন কোথায় থাকেন, খবর
পাইলেন ?

চন্দ্র । এতদিন গাজিপুরে ছিলেন—
এখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন,
কোথায় থাকিবেন, ঠিক করিয়া বলিতে
পারিলেন না ।

অক্ষর বসিয়া—“ও !” বলিয়া আপন কর্ণে মন দিল ।

রমেশ বাগার ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল—“অদৃষ্ট এক বিষয় কোতৃৎক প্রবৃত্ত হইয়াছে ! একদিকে আমার সঙ্গে কলগার ও অল্পদিকে নলিনাকের সঙ্গে হেমললিনীর এই মিলন, এ যে একবারে উপভ্রাসের মত—সেও কুলিখিত উপভ্রাস ! এমনতর ঠিক উদ্দেশ্যান্ধা মিল করিয়া যেওনা অদৃষ্টেরই মত বেপারোঁরা রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব—সংসারে সে এমন অদৃষ্টতাও ঘটায়, বাহা ভীষণ লেখক কাল্পনিক উপাখ্যানে লিখিতে সাহস করে না ।” কিন্তু রমেশ ভাবিল, এবার সে যখন তাহার জীবনের সমস্তাঙ্গল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন খুব সম্ভব, অদৃষ্ট এই অটল উপভ্রাসের শেষ অধ্যায়ে রমেশের পক্ষে নিদারুণ উপসংহার লিখিবে না ।

বোগেশ্ব বশাইপুর জমিদারবাড়ীর নিকটবর্তী একটি একতলা বাড়ীতে বাসা পাইয়াছিল—সেখানে রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় বাজারের একটি লোক তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল । খামের উপরকার অক্ষর দেখিয়াই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল । খুলিয়া দেখিল, রমেশ লিখিয়াছে—সে বশাইপুরের একটি দোকানে অপেক্ষা করিতেছে, বিশেষ করেকটি কথা বলিবার আছে ।

বোগেশ্ব একেবারে চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল । রমেশকে যদিও সে একদিন অপমান করিতে বাধ্য হইয়াছিল—তবু সেই বাণ্যবন্ধকে এই দূরদেশে এতদিন অদৃষ্টের পরে কিরাইয়া দিতে পারিল না ।

এমন কি, তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দই হইল—কোতৃৎকও কম হইল না । বিশেষত হেমললিনী যখন কাছে নাই, তখন রমেশের দায়ী কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় না ।

পত্রাধিকটিকে স্তূপ করিয়া বোগেশ্ব নিজেই রমেশের সন্ধানে চলিল । দেখিল, সে একটি মুদির দোকানে একটা শূত্র কেঁরো-দিনের বাস খাড়া করিয়া তাহার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে ;—মুদি ব্রাহ্মণের হুকুম তাহাকে তামাক দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু চসমা-পরা বাবুটি তামাক খায় না । সুনিয়া মুদি তাহাকে সহরজাত কোনো অসুতশ্রেণীর পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়াছিল । সেই অবধি পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার আলাপপরিচয়ের চেষ্টা হয় নাই ।

বোগেশ্ব লম্বাঙ্গো আসিয়া একবারে রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল কহিল, “তোমার সঙ্গে পারা পেল না ! তুমি আপনার বিধা গাইয়াই গেল ! কোথায় একেবারে . সোভা আমার বাগার আসিয়া হাজির হইবে, না পথের মধ্যে মুদির দোকানে শুড়ের বাতাসা ও মুড়ির চাকুতির মাঝখানে অটল হইয়া বসিয়া আছে !”

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া একটুখানি হাসিল । বোগেশ্ব পথের মধ্যে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, কহিল—“বিনিই বাই, বলুন, বিধাতাকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই ! তিনি আমাদের সহরের মধ্যে মাপুষ্য করিয়া এতবড় সাহসিক করিয়া তুলিলেন, সে কি এই ঘোর পাড়াগাঁয়ের.

মধ্যে আমার দীবাঘাটাকে একেবারে মাঠে
মারিবার জন্ত ?”

রমেশ চারিদিকে তাকাইয়া কহিল,
“কেন, এ আশ্রয়টি ত মন্দ নয়।”

যোগেশ্বর। অর্থাৎ ?

রমেশ। অর্থাৎ নির্জন—

যোগেশ্বর। সেইজন্য আমার মত আরো
একটি জনকে বাব দিয়া এই নির্জনতা আর-
একটু বাড়াইবার জন্ত আমি অত্রস্থ ব্যাকুল
হইয়া আছি।

রমেশ। বাই বল, মনের শাস্তির
পক্ষে—

যোগেশ্বর। ও সব কথা আমাকে বলিয়ে

• না,—করদিন প্রচুর মনের শাস্তি লইয়া
আমার প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত হইয়া
আসিয়াছে! আমার সাধামত, এই শাস্তি
তাড়িবার জন্ত ফুট করি নাই। ইতিমধ্যে
সেক্রেটারির সঙ্গে হাতাধাত হইবার উপক্রম
হইয়াছে। জমিদারবাটুকে ও আমার
মেজাছির যে প্রকার পরিচয় দিয়াছি, সহজে
তিনি আমার উপরে আর হস্তক্ষেপ করিতে
আসিবেন না! তিনি আমাকে দিয়া ইংরাজি
খবরের কাগজে তাঁহার নকিবী করাইয়া
লইতে ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু আমার ইচ্ছা
স্বতন্ত্র, সেটা আমি তাঁকে কিছু প্রবলভাবে
বুঝাইয়া দিয়াছি। তবু বেটী কিয়া আছি, সে
আমার নিজগুণে নয়। আমার সঙ্গে অধিক

• যে-বাঁধে বি না থাকিতে এখানকার জয়েন্ট-
সাহেব আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন—
জমিদারটি সেইজন্য ভয়ে আমাকে নিবারণ
করিতে পারিতেছেন না যেদিন গেজেটে
দেখিব, জয়েন্ট বন্দী হইতেছেন, সেইদিনই

কিন্তু, আমার দেউদাদারিগণ্য বিলাইপুরের
আকাশ হইতে অস্তমিত হইল। ইতিমধ্যে
এখানে আমার একটমাত্র আশ্রয় আছে—
আমার পাক্কুরটি! আর সকলেই আমার
প্রতি যেহেতু দৃষ্টিনিষ্কেন্দ্র করিতেছে,
তাহাকে কোনোমতেই গুডদৃষ্টি বলা
চলে না।

যোগেশ্বরের বাগার আসিয়া রমেশ একটা
চৌকিতে বসিল। যোগেশ্বর কহিল, “না, বস
নয়! আমি জানি, প্রাণত্যাগ নাহে তোমার
একটা ঘোরতর কুসংসার আছে—সেটা
সারিয়া এস। ইতিমধ্যে আর একবার পরম-
জ্ঞানের কান্ধিটা আগুনে চড়াইয়া দিই।
আতিথের দোহাই দিয়া আজ দ্বিতীয়বার চা
পাইয়া লইব।”

এইরূপে আহা, আগাণ ও বিশ্রামে
দিন কাটিয়া গেল! রমেশ বে বিশেষ
কথাটা বলিবার জন্ত এখানে আসিয়া-
ছিল, যোগেশ্বর সমস্তদিন তাহা কোনোমতেই
বলিবার অবকাশ দিল না। সন্ধ্যার পরে
আহারান্তে কেরোদিনের আলোকে হুইজনে
ছই কেদারা টানিয়া-লইয়া বসিল। অদূরে
শূণ্য ডাকিয়া গেল ও বাহিরে অন্ধকার-
রাত্রি কিল্লীর নদে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

রমেশ কহিল, “যোগেন্দ্র, তুমি ভ জানিই,
তোমাকে কি কথা বলিতে আমি এখানে
আসিয়াছি। একদিন তুমি আমাকে যে
প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে প্রশ্নের উত্তর করিবার
সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। আজ আর
উত্তর দিবার কোনো বাধা নাই।”

এই বলিয়া রমেশ কিছুক্ষণ শুভ হইয়া
বসিয়া রছিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সে

আগাধোড়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল । মাঝে মাঝে তাহার ক্রম বৃদ্ধি হইয়া কঠ কল্পিত হইল—মাঝে মাঝে কোনো কোনো আশংকা সে দুইএকমিনিট চূপ করিয়া রহিল । যোগেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া দ্বির হইয়া তনিল ।

যখন বলা হইয়া গেল, তখন যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—“এই সকল কথা যদি দেখিন বলিতে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না ।”

রমেশ । বিশ্বাস করার যেত তখনো যেটুকু ছিল, এখনো তাহাই আছে । সেজন্য তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে গ্রামে একবার তোমাকে যাইতে হইবে । তাহার পরে দেখান হইতে কমলার মাতুলালয়েও লইয়া যাইব ।

যোগেন্দ্র । আমি কোনোখানে এক-পা নাড়িব না—আমি এই কেদারাটার উপরে অটল হইয়া বসিয়া তোমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিব । তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করা আমার চিরকালের অভিলাষ ;—জীবনে একবারমাত্র তাহার ব্যতীত হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমার কাছে নাপ চাই ।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া রমেশের সম্মুখে আসিল—রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুই বালাবন্ধ একবার পরস্পর ফোলাকুলি করিল । রমেশ ক্রম-কর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “আমি কোথা হইতে ভাগ্যচর্চিত এমন একটা প্রকৃত্ত মিন্যার দ্বারা জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম

যে, তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা দেওয়া ছাড়া আমি কোনোদিকেই কোনো উপায় দেখিতে পাই নাই । আজ যে অশ্রুি তাহা হইতে মুক্তি হইয়াছি, আর যে আমার কাহাতো কাহে কিছুই গোপন করিবার নাই, ইহাতে আমি প্রাণ পাইয়াছি । কমলা কি জানিরা, কি ভাবিয়া আশ্রয়ত্যা করিল, তাহা আমি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আর বুঝিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই—কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যত্না যদি এমন করিয়া আমাদের দুইজীবনের এই কঠিন গ্রীষ্ম কাটিয়া না দিত, তবে শেষ-কালে আমরা দুজনে যে কোন্ দুর্গতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতাম, তাহা মনে করিলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয় । যত্নার প্রাণ হইতে একদিন যে সমস্ত অকস্মৎ উঠিয়া আসিয়াছিল, যত্নার গর্ভেই একদিন সেই সমস্ত তেমনি অকস্মৎ বলীয়া হইয়া গেল !”

যোগেন্দ্র । কমলা যে নিশ্চয়ই আশ্রয়-ত্যা করিয়াছে, তাহা অলংঘ্যের দ্বিত্ব করিয়া বসিবে না । সে যাই হোক, তোমার এমিক্টা ত পরিষ্কার হইয়া গেল, এখন নলিনাক্ষের কথা আমি ভাবিতেছি ।

তাহার পরে যোগেন্দ্র নলিনাক্ষকে লইয়া পড়িল । কহিল, “আমি গুরুত্ব লোকের ভাল বুঝি না এবং বাহা বুঝি না, তাহা আমি পছন্দও করি না । কিন্তু অনেক লোকের অন্তরকম মতিই দেখি, তাহারায় বাহা বোকে না, তাহাই বেশি পছন্দ করে । তাই হেয়ের সস্ত্র আমার যথেষ্ট ভয় আছে । যখন দেখিলাম, সে চা ছাড়িয়া দিয়াছে, মাছমাংসও খায় না, এমন কি, ঠাট্টা করিলে পূর্ণের মত তাহার চোখ জলজল করিয়া আসে না, বরং

মুগ্ধবল হাদে, তখন দুক্লান, গতিক ভাল নয়। যাই হোক, তোমাকে সহায় পাইলে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তাহাও আমি নিশ্চয় জানি—অতএব প্রস্তুত হও—ছই বছর মিলিয়া সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।”

রমেশ হাসিয়া কহিল—“আমি যদিও বীর-পুরুষ বলিয়া খ্যাত নই, তবু প্রস্তুত আছি।”

যোগেন্দ্র। যোগ, আমার জিষ্টমাসের ছুটিটা আমুক।

রমেশ। সে ত দেরি আছে—ততক্ষণ আমি একলা অগ্রসর হই না কেন ?

যোগেন্দ্র। না না, সেটি কোনোমতেই হইবে না। তোমাদের বিবাহটি আমিই ভাঙিয়াছিলাম, আমি নিজের হাতে তাহার প্রতিকার করিব। তুমি যে আপে-ভাগে

গিয়া, আমার এই শুভকাংক্ষাটি চূরি করিবে, সে আমি ঘটতে দিব না।” ছুটির ত আর দশদিন বাকি আছে।

রমেশ। তবে ইতিমধ্যে আমি একবার—

যোগেন্দ্র। না না, সে সব আমি কিছু শুনিতে চাই না—এ দশদিন তুমি আমার এখানেই আছ! এখানে অগড়া করিবার বতস্তলা লোক ছিল, সব আমি একটু একটু করিয়া শেব করিয়াছি—এখন যুগের তার বদলাইবার জন্য একজন বছর প্রয়োজন হইয়াছে, এ অবস্থার তোমাকে ছাড়িবার জো নাই। এতদিন সন্ধ্যাবেলার কেবলি শেরালের ডাক শুনিয়া আসিয়াছি—এখন, এমন কি, তোমার কর্ণধরও আমার কাছে বীণাবিনিমিত্ত বলিয়া মনে হইতেছে, আমার অবস্থা এতই শোচনীয়!

ক্রমশঃ ।

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তসঙ্কলন ।

আমাদের ধনীদিগের বে দেশহিতকর বিষয়ে কচি নাই, নতুবা তাঁহাদের অবগতির জন্য আমি একটি প্রস্তাব করিতাম। সে প্রস্তাবটি এই—যেমন বর্গীর জে. এন্. ভাতা মহোদয় একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্য অনেক টাকা দিতে প্রতিক্ষিত হইয়াছিলেন,

- • • যেমন তাঁহাদারা লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইয়া দ্ববর্ষমধ্যে কয়েকটি ‘রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ স্থাপন করিয়াছেন, সেমনি ধনিগণ কয়েকজন সমবেত হইয়া একটা মহৎ কার্য্য করুন। ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংকলনের জন্য তিনটি রিসার্চ

ইনস্টিটিউট স্থাপন করুন। প্রথমটির বৃত্তি মাসিক ৩০০, তিনমত টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির বৃত্তি মাসিক একশত টাকা করিয়া। এই তিন ব্যক্তি কি করিবেন? দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তির অধীন থাকিয়া তাঁহাদেরই নির্দেশানুসারে কতকগুলি জাতব্য বিষয় সমুখে রাখিয়া প্রাচীন বেদ, বৈশাখ, শ্রুতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক বেশের ইতিবৃত্ত সংকলন করিবেন। ইহাদের তিন জনেরই সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাতে অভিজ্ঞ

এবং বর্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার ভাষ্য ও রসজ লোক ইংরা চাই। ইহারা প্রত্যেক পাঁচবৎসর অন্তর আপনাদের গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। আশা হয়, পচিশ-ত্রিশ বৎসর এইরূপ কার্য করিলে ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেকপরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে।

আমরা সচরাচর এই বলিয়া দ্বন্দ্ব করি যে, এসেলে বিদ্যাসাগোরা ইতিবৃত্ত নাই। অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ পুরাণসকল ইতিবৃত্তের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সে সকল গ্রন্থে সত্য ও কল্পনা একত্র প্রচুরমাত্রায় মিশ্রিত যে, সেই সকল বর্ণনাগুণের মধ্য হইতে সত্য উদ্ধার করা, নদীপ্রত্যমোত বান্ধুকারাশির মধ্য হইতে বর্ষবর্ণনগ্রন্থ অপেক্ষাও ক্লেশকর। এষ্ট এক মহাপ্রশ্ন পুরাতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিমাঝেরই মনে উদ্ভিত হয়, এই প্রাচ্যদেশবাসী আর্য্যসম্ভ্রামগণ পুরাতত্ত্বরচনার বিষয় ছিলেন কেন? বাহারা রামাণ্য-মহাভারতের ভায় বৃহৎকার গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থরচনা বাহাদের কিছুনাও আলস্য ছিল না, এক এক শাখাপ্রশাখাসম্বিত দর্শনের অটল সনাতনসকলের মধ্যে প্রবেশের ধৈর্য্য বাহাদের ছিল, সেই প্রাচীন হিন্দুগণ কেন আপনাদের দেশের ইতিবৃত্তরচনার বিষয় ছিলেন? ইহাদের আচরণের সহিত পাকাত্য জাতিসকলের আচরণের কি পার্থক্য লক্ষিত হয়! তৎকালে সন্তান সন্তান বৎসরের পূর্ব্ণকার ঘটনাসকল কেমন বর্ণাবধিকারে বর্ণিত রহিয়াছে। সে সকল বর্ণনার উপরে কেমন অনবদ্যে নিবর্ত্ত করিতে পারা যায়। একজন

ইতিবৃত্তরচনা প্রকৃতি কেন আমাদের দেশে লক্ষিত হয় নাই?

ইহা করণ বোধ হয় জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে অধেষণ করিতে হইবে। ভারতবাসী আর্য্যদিগের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাঁহা ইতিবৃত্তরচনার অঙ্গুল নহে। তাহা না হইলে এখানকার সাহিত্যে ইতিবৃত্ত বেশা দিতই দিত। অপর দিকে ইউরোপ-বাসীদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাঁহা ইতিবৃত্তরচনার অঙ্গুল। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে লইয়া উত্তর দেশের জাতীয় প্রকৃতির অঙ্গুলীলনে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, অঙ্গ-সুখীনতা বা ধ্যাননিষ্ঠতা ভারতীয়দিগের জাতীয় প্রকৃতি। বাহ্যবস্তুর প্রতি অনায়াস আমাদের প্রকৃতি ও শিক্ষাগত সংস্কার বসিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না। তৎপরে এখানে অতি প্রাচীনতম কাল হইতে অনাগতিকবর্ষের প্রচার হইয়া আসিতেছে। এখানকার জাতিগণ ও ধর্ম্মাধিগণ ত্রিদিন বাহিরের অগংকে ভুলিয়া ভিতরেই প্রেরণ পথ অধেষণ করিয়াছেন। আমাদের অধর্ম্মজ্ঞাতে এই কথা আছে যে, জানরাজাই সত্য রাজ্য, জানই শ্রেষ্ঠ, বহির্বিশ্ব অধিক হারায্য। এই-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ স্বভাবত বহির্ম্মপতের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। স্বদেশের ধনধান্য কে কি পরিমাণে অধিকার করিল? হিন্দু রাজা কি বননরপতি কে রাজসিংহাসনে বসিলেন, তাহাতে কি আসে-যায়? জানরাজো প্রবেশ করিয়া আমি বাহা দেখিতেছি, তাহা কে কাড়িয়া লইতে পারে? এবং তাহা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ অস্ত্র নিষয় থাকিল বা না থাকিল, তাহাতে কি?—

ইহাদের এইপ্রকার ভাব,—আমাদের দেশে
 প্রজাদের মনে এই ভাব বহুল। প্রাচীন
 গ্রীকজ্ঞানী ডাইম্ব্রিসের বিষয়ে একপ উক্ত
 আছে যে, দিথিবরী বীর আলেক্সান্ডার বধন
 তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোহুলাবিটে হইয়া
 তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, তখন দেখিলেন যে,
 সুবীষর একটি টেব বসিয়া রোদ পোহাইতে-
 ছেন। আলেক্সান্ডার সবলে গিয়া তাঁহার
 পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; জ্ঞানী পুরুষের সেদিকে
 দৃষ্টিই নাই। অবশেষে আলেক্সান্ডার বধন
 জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কিরূপে আপনার
 সাহায্য করিতে পারি? আমি কি করিলে
 আপনি প্রীত হন?” উত্তর রোদের
 আড়াল না করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেই
 সুবী হইল।” আমাদের নবদীপের বুনা রাম-
 নাথের বিষয়েও একপ একটি গল্প প্রচলিত
 আছে। বুনা রামনাথ বনে বৃক্ষতলে বসিয়া
 শিষ্যদিগকে পড়াইতেন; তাঁহার সামান্য
 কুটীরে তাহাদের সমস্ত স্থানসমাবেশ হইত
 না। একবার নদীরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
 নৌকারোহণে নবদীপপথে যাইতে যাইতে,
 রামনাথের পাণ্ডিত্যখ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট
 হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। গিয়া
 দেখিলেন, পণ্ডিতবর পাঠনাকার্য্যে নিমগ্ন।
 তাঁহার অর্ধসাহাব্যের প্রয়োজন আছে কি না,
 জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা
 করিলেন—“কিছু অশুপপত্তি আছে?”
 পণ্ডিত বৃকিলেন—ভ্রাতৃের অশুপপত্তির কথা
 বলিতেছেন। উত্তর “কিছুই অশুপপত্তি
 নাই।” তৎপরে প্রশ্ন—“অভাব আছে?”—
 আবার ভ্রাতৃের অভাব আসিল। শেষে
 . রাজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “সংসার

চলে কিরূপে?” পণ্ডিতবর নিকটস্থ তেঁতুল-
 বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন
 —“গৃহিণী ঐ তেঁতুলশাতার বেশ কোল
 করেন, আমাদের সুখেই আহার চলে।”
 ভারতীয় সুযোগ্যের, বিশেষ এইপ্রকার
 অনাহার ভাব ছিল। Plain living and
 high thinking—ইহা যদি কোনও দেশে
 কখনও কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, তবে
 তাহা এই ভারতবর্ষে।

সে বাহা হউক, যেজন এত কপার অব-
 তারণা করিয়াছি, তাহা এই যে, বাহুবল্লভ
 প্রতি অনাহার আমাদের অস্থিমাংসে প্রবিষ্ট
 হইয়া থাকিতে আমরা ইতিবৃত্তরচনার
 মনোনিবেশ করি নাই, অর্থাৎ আমরা ধ্যান-
 ধারা পরমার্থতত্ত্ব অবিগত করিবার চেষ্টা
 করিয়াছি; সাধনদ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে বহুপর
 হইয়াছি; আত্মানুভবিকৈ নিমগ্ন হইয়া
 লৌকিক সুখাংশ ভুলিয়াছি; কে কবে
 অসিল, কে কবে মরিল, কোন রাজা সিংহা-
 সনে বসিল, কোন যুদ্ধে কোন রাজা হারিল
 বা জিতিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময়
 হয় নাই, আবশ্যকতাওোধ করি নাই।

বোধ হয় ইহারও পশ্চাতে আর এক
 কারণ বিদ্যমান, তাহা এদেশের অস্বাভূত
 সাম্যাবস্থা। প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ এখানে
 কণে কণে পরিবর্তিত হয় না। একজন
 যোগী অনাবৃতবেশে প্রান্তঃকাল হইতে সান্নি-
 কাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে পারেন;
 আশ্রয়কার সমস্ত তাঁহাকে ব্যতিশয় হইতে হয়
 না। সুতরাং তিনি অবাধে বহির্জগতের
 প্রতি উদাসীন হইয়া আশ্চর্য্যের নিবৃত্ত
 থাকিতে পারেন। এইরূপেই বোধ হয়

আমাদের বহির্গতের প্রতি উপাশ্রিত
আসিয়াছে।

প্রতীত্যপেনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত
কারণ বিদ্যমান।—সেখানে প্রকৃতির ভীমকান্ত
রূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে। একই
অসাধারণ হইলেই শান্তিকোপ করিতে হয়।
বাণীর বাহির হইতে গেলেই মেঘের পরি-
চ্ছদের প্রতি দৃষ্টি হিতে হয়, মেঘ, বৃষ্টি,
বায়ু প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ রাখিতে হয়,
নজুবা ক্ষুদ্রতর শান্তি আসিয়া পড়ে। এই
কারণে যে সকল দেশের লোকের পরিদর্শন-
বৃত্তি (faculty of observation) সতই
প্রস্তুতিত হয়। তাহা হইতেই তাহাদের
ইতিবৃত্তরচনার অভ্যাস। এই কারণেই
দেখি, যে সকল দেশের অধিকাংশ লোকের
দৈনিকলিপি (Diary) রাখিবার অভ্যাস।
সর্বদাই সংবাদপত্রে শুনিতে পাঠি, কমুন্সের
অপবাদবুদ্ধি ঘটয়াছে; মুতদেহ পরীক্ষা
করিতে গিয়া দেখা গেল, পকেটে তাহার
দৈনিকলিপি রহিয়াছে, তাহাতে এই এই
বিষয়ের উল্লেখ আছে, ইত্যাদি। John
Morley মহামতি Gladstone-এর জীবন-
চরিত লিখিয়াছেন,—তাহার কত পৃষ্ঠা ম্যাড-
টোনের দৈনিকলিপিদ্বারা পরিপূরিত।
ম্যাডটোন হইতে সামান্য ভ্রমজীবী পর্যন্ত
সকলকেই দৈনিকলিপি রাখিতে হইবে।
অন্তএব দেখিতেছি; ইতিবৃত্তরচনা ঐ সকল
দেশের জাতীয় ব্যক্তির মধ্যে।

যে সকল দেশের সাধারণ মানুষের সহিত
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদের পরি-
দর্শনবৃত্তি (faculty of observation)
দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। যে সকল

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় একজন ভারতবর্ষীরের দৃষ্টি-
পথে পতিত হইত না, তাহাও তাহার
উল্লেখ করিতেছে; ঘটনাবলিগণের দিন-
তারিখ, প্রকার-প্রণালী আনুপূর্ণিক বর্ণাবধ
নির্দেশ করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, ইউরোপীয় জাতি-
সকলের ইতিবৃত্তপ্রিয়তা সেনিটিক্‌শ্বের
প্রভাবজাত। রিহনীজাতি সেনিটিক্‌জাতি
এবং খ্রীষ্টধর্ম রিহনীজাতি হইতে উৎপন্ন।
রিহনীধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম, উভয়ধর্মই ইতিবৃত্ত-
মূলক। ভগবতের বিভিন্ন জাতি ধর্মভাবকে
বিভিন্নভাবে সাধন করিয়াছে। ভারতীয়
আর্যগণ ঈশ্বরকে অস্থায় পরমাশ্রয়রূপে
দর্শন করিয়াছেন। একজ্ঞ তাহাদের সাধন
অন্তস্বর্গীয়, ধ্যানপ্রধান, ভাব ও তত্ত্বাত্মক
হইয়াছে। গ্রীকগণ ঈশ্বরকে সৌন্দর্যের
মধ্যে দেখিয়াছেন, একজ্ঞ তাহাদের মধ্যে
শিল্প, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সৌন্দর্যের শত শত
ভাব ফুটিয়াছে। রিহনীগণ ঈশ্বরকে ইতি-
বৃত্তের মধ্যে, মানবজগতের উপানুপাতিক
মধ্যে বিধাতারূপে দেখিয়াছেন, একজ্ঞ
তাহাদের ধর্মে ও তত্ত্বাত্মক খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর
পুণ্যের পুরস্কর্তা ও পাপের শাস্তা এবং
নীতির রক্ষকরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।
পাশ্চাত্যধর্ম যেভাবে ও যতদূর ইতিবৃত্তকে
ধর্মের সহিত জড়িত করিয়াছে, তাহা ভার-
তীয় আর্যদিগের চক্ষে অস্বাভাবিক বোধ
গৃহীত হয়। এদেশে ধর্মের আধ্যাত্মিকতা ও
গভীরতাই তাহার প্রধান লক্ষণ। এই দ্বিতীয়-
শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মতে ধর্মের
এই ইতিবৃত্তমূলকতা হইতেই পাশ্চাত্যদেশ-
সকলের ইতিবৃত্তপ্রিয়তা উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা এ বিচারে প্রভুত্ব না হইয়া এ কথা সকলে স্বীকার করি যে, পাশ্চাত্যরাহো ইতিবৃত্ত রচিবার যথ প্রকৃতি সেবা প্রিয়াছে, আমাদের এই প্রাচ্যদেশে সে প্রকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায় নাহি। তবে কি আমরা এদেশে ইতিবৃত্তসংকলনবিষয়ে একেবারে নিরাশ হইব? তাহা কেন? দেশের আসল ইতিবৃত্ত সকলনের অনেক উপাদান আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে। আসল ইতিবৃত্ত এতদন্ত বণিতেছি যে, সচরাচর অগতে ইতিবৃত্তনামে যাহা পরিচিত, তাহার মধ্যে অল্পই আসল ইতিবৃত্ত আছে। অল্প পর্য্যন্ত ইতিবৃত্তনামে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ রাজাদের উত্থান ও পতন, জাতিবিশেষের বিজ্ঞান বা অস্ত্রবিদ্যার প্রভৃতি হইয়াই বাসে। তাহাদের অধিকাংশ পাঠ করিলে মানবত্ব ও সমাজত্বের গুঢ় নিয়মসকল ধরিতে পারা যায় না। অর্থাৎ যে ইতিবৃত্ত সেই সকল গুঢ়ত্বের আভাস না দেয়, তাহা প্রকৃত ইতিবৃত্তের কার্য করে না। যেমন কোন বেগবন্তী স্রোতবর্তীর বন্ধে কখনও বা দিকভ্রমের পুলিন প্রকাশ পায়, কখনও বা আবার গ্রামজনপদ প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যায়,—এই যে ভাঙা ও গড়া, ইহা কোন আকস্মিক কারণে ঘটে না, অগ্নিশিখার গতি অতি দৃষ্ট অথচ অদৃষ্টজন্যই নিয়মসকলের অধীন; তেমনি মানবসমাজের উত্থান ও পতন, জাতিসকলের গতি ও কার্য, এ সকলও অদৃষ্ট অথচ অবিদ্রাষ্ট কার্যকারী নিয়মসকলের অধীন। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিবর্তনের

প্রায় মানবের সামাজিক জীবনেও বিবর্তন চলিতেছে। যে ইতিবৃত্ত দেশের বিবর্তন-ক্রিয়ার গতি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা empiricism, কিন্তু science নহে; অর্থাৎ দাগরাফিমাত্র, গাথুনি নহে।

বর্তমান সময়ে অগষ্ট কম্বট, হার্বার্ট স্পেন্সার, বকল প্রভৃতি ইতিবৃত্তকে দাগরাফি হইতে তুলিয়া গাথুনিতে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং আরও অনেক প্রতিভাশালী লেখক তাহাদের পদাঙ্কবর্তী হইয়া ইতিবৃত্ত হইতে সমাজত্ব গাথিয়া তুলিতেছেন।

এই ত গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে ইতিবৃত্ত সমাজের বাহিরের জীবনে আবদ্ধ, সামাজিক জীবনের ভিতরের কথা আমাদের গোচর করে না, তাহা কি প্রকৃত ইতিবৃত্ত? দৃষ্টান্তরূপ মনে করুন, আমরা এক্ষণে প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি,—জাপানবাসিগণ কৃষিগান্ধিপের উপরে জয়লাভ করিতেছে। যদি কেবল এই সকল বৃদ্ধের তারিখ ও বৃদ্ধের বিবরণ এবং হতাহতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহাই কি জাপানের ইতিবৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে? তাহা পাইয়াই কি আমাদের মন পরিতৃপ্ত হইবে? কখনই না। কোন্ শক্তিতে জাপান এত অল্পকালের মধ্যে এত পৌরুষ লাভ করিল? কি কি সামাজিক কারণের সমাবেশ হইয়া এই অদৃষ্ট পরিবর্তন আনয়ন করিল? কোন্ কোন্ ভাব, কোন্ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মননাত্মক মনে কার্য করিতেছে? তাহাদের শিক্ষার প্রণালী কি? রাজনীতির প্রকার কি? সামাজিক

বিধিবাচনা কি ? এ সকল জানিবার জন্য কি আমাদের মন বাঞ্ছ হয় না ? যাহাতে সেই ভিত্তিকার জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে, তাহাই প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বরং একথা বলিলে কিছুই অস্বাভাবিক হইত না যে, বাহিরের জীবনের ঘটনাগুলি না বলিয়া যদি ভিতরের জীবনের বিষয়গুলি বলে, তহা হইলে যেন প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলা হয়।

এখন আবার প্রকৃত বিষয়ের অঙ্গসমূহ করি। ভারতবর্ষের যে ইতিবৃত্ত নাই, আমরা বলি, সে ঐ বাহিরের ইতিবৃত্ত। ভিতরের ইতিবৃত্ত তবু তবু গোপন রহিয়াছে। এখনও যেনের নানা স্থানে প্রস্তরফলকে, তাম্রশাসনে, বিলুপ্ত নগরসকলের ভগ্নাবশেষে ইতিবৃত্তের অনেক ঘটনা নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে পুরাতত্ত্ববিদগণ গবেষণার দ্বারা প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক কথা আবিষ্কার করিতেছেন। নদ, তর, উৎসর সারণাখণ্ডীকৃত সমিধানের কালীর বিবেচনের তীর্থ, বৃকগম্বীর সন্নিকটে বিকুপদ, বহুসংখ্যক বৌদ্ধকীর্তির মধ্যে ভগ্নাখণ্ডের স্তম্ভস্থিত, এ সকলে কি প্রকাশ করিতেছে ? ইহাতে কি এই প্রকাশ করিতেছে না যে, এদেশে এমন যুগ আনিরাছিল, যখন পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধকীর্তি বিলোপ করিয়া হিন্দুকীর্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বর্তমান প্রধান হিন্দুতীর্থগুলি আর কিছুই নহে, বৌদ্ধধর্মের উপরে হিন্দুধর্মের অধ্যাবসায় মাত্র। আবার সেই কালীতেই হিন্দু-দেবদেবীর মন্দির তর করিয়া তৎস্থানে মুসলমানমসজিদ নির্মিত হইয়াছে, তাহার চিত্র অস্ত্রাঙ্গি দেবীপ্যমান। ইহাতে কি ইতিবৃত্ত কোনও ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে না ?

এই যেমন এক প্রকারে ইতিবৃত্ত তবু তবু গোপন রহিয়াছে, তেমনি অপরদিকে প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন ইতিবৃত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাই উদ্ধার করিবার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রিসার্চ কলার্শিপের প্রয়াস করিয়াছি। পুঙ্খানুপুঙ্খ তিন ব্যক্তি অতি প্রাচীনতম বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, বেদ, বেদাঙ্গ, পুর্বাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, কাব্য-নাট্যাদি সমুদয় তর তর করিয়া পাঠ করিয়া প্রাচীন সামাজিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়-সকল সংগ্রহ করিবেন ; এবং প্রত্যেক পাট-বৎসর পরে আপনাদের গবেষণার ফল সকলিত আকারে সাধারণের গোচর করিবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও অপরায়ণ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসকলও পাঠ করিতে হইবে।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত কিপ্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিতেছি। আমি প্রকৃতত্ববিৎ নহি ; একজন কোন গ্রন্থ লইয়া প্রাচীন সাহিত্য কখনও পাঠ করি নাই। যাহারা এইপ্রকার গবেষণার এক্ষণে প্রবৃত্ত আছেন, তাহাদিগকে আমার ছন্দরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তাহাদের প্রাপ্য প্রশংসা আমি লইতে ইচ্ছুক নহি। আমি এসম্বন্ধে বাহা বলিব, তাহা দ্বিযাজপ্রবর্ধন বলিয়া জানিবেন ; অস্থূল-নির্দেশপূর্বক পথ দেখাইয়া দেওয়া মাত্র,—যে পথে অগ্রসর হইলে যোগ্যতর ব্যক্তিরা প্রচুর ফললাভ করিতে পারেন।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, প্রাচীন-ইতিবৃত্ত-সংগ্রহাণ্ড বেদ, বেদাঙ্গ, পুর্বাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি কিছুই বাদ দেওয়া হইবে না। প্রথম বেদ,—আমি বেদমন্ত্রসকলের বিমূঢ়

আলোচনাঃ প্রবৃত্ত হইতে গঠিত হইয়া, তাহা
এ কথা সফল হই জ্ঞানেন যে, বেদমন্ত্রসকল
যদিও বেদভাষ্যের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়া-
ছিল, তথাপি তন্মধ্যে নিম্ন হইয়া গবেষণার
চক্ষে বিচার করিলে আদিম আৰ্য্যসমাজের
অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সেই
সকল বিষয়কে একত্র সম্বন্ধ করিলে প্রাচীন
সমাজের দ্বিতরকার অবস্থা অনেকপরিমাণে
জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। তবে বেদমন্ত্র-
সম্বন্ধে এই একটা কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে
হইবে যে, তাহাদিগকে কোন এক বিশেষ
স্থানের লিখিত মনে করা যাইতে পারে না।
তাহাতে অতি প্রাচীনতম কালের রচিত
মন্ত্র আছে, আবার অপেক্ষাকৃত অধুনাতন
সময়ের মন্ত্রও আছে। অর্থাৎ ঐ মন্ত্রসকলের
সকলনকর্তা সংগ্রহ করিবার সময় রচনা-
কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলন করেন
নাই; কেবলমাত্র উপাত্তবেদতা ও মন্ত্রকর্তা
অবিদ্যমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়াছেন।
তাহা হইলেও তাহার তারতম্য ও ছন্দের
রীতির বিভিন্নতা প্রভৃতির দ্বারা মন্ত্রসকলের
কালের বিষয়েও কিয়ৎপরিমাণে অনুমান
করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, বেদমন্ত্রসকলের আলোচনা-
দ্বারা পুরাতত্ত্ববিদগণ অনেক জ্ঞাতব্যবিষয়
নির্ধারণ করিয়াছেন। সে সমুদয়ের
এখানে উল্লেখ নির্ভর্য্যোজন। এইমাত্র বলি-
লেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীনতম বেদ যে
ঋগ্বেদ, তাহার মন্ত্রসকলের আলোচনাদ্বারা
আমরা জানিতেছি যে, যে কালে এই সকল
মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, সে কালে ভারতীয়
আৰ্য্যসমাজে বালিমাখ সমুদ্রযাত্রা, ধনা-

চর্চন ও ধনের হ্রদগ্রহণ, যানবাহনাদির
ব্যবহার, সমৃদ্ধিশালা নগরসকল স্থাপন ও
বেঙ্গাবৃত্তি প্রভৃতি নাগরিক পাপের শ্রীবৃদ্ধি
ইত্যাদি সভ্যতার সকল লক্ষণ ফুটিয়াছিল।
লিঙ্কাসা করি, এতটা জানিতে পারিলে কি
সামাজিক ইতিবৃত্তের অনেকটা জানা হইল
না? এইরূপে বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস
প্রভৃতির আলোচনার দ্বারাও অনেক সমাজ-
তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে।

এমন কি, কাব্যের মধ্যে নিম্নরূপ হইয়া
অনুসন্ধান করিলেও অনেক সামাজিক তত্ত্ব
নির্ণীত হইতে পারে। তাহারও দিঘাত্ত
প্রদর্শন করিতেছি। দৃষ্টান্তরূপ মহাকবি
কালিদাসের কালকে অবলম্বন করা যউক।
কিন্তু কালিদাস কোন্ সময়ে প্রাজ্ঞত্ব
হইয়াছিলেন?—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে
কিছুই নির্ধারণিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত
পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইরূপ একটি কিংবদন্তী
প্রচলিত আছে যে, কালিদাস উজ্জয়িনীপতি
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভাতে নবরত্নের
মধ্যে এক রত্ন ছিলেন। উক্ত নবরত্ন এই—
ধ্বজাঙ্গি, অশ্বপক, অমরসিংহ, শব্দ, বেতালা-
ভট্ট, ষটকর্ণক, কালিদাস, বরাহ ও মিহির।
যাহার নামে সংবৎ প্রচলিত, সেই বিক্রমাদিত্য
খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭২সংসারে মালবরাজ্যের সিংহা-
সনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কালিদাস তাঁহার
রাজ্যকালে রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন,
কি বিক্রমাদিত্যনারায়ণের অপর কোন
রাজার রাজসভাতে ছিলেন, তাহার বিষয়
নাই। কালিদাসের প্রাজ্ঞত্বকালের
বিষয়ে একটু চিন্তা করিবুর কথা
এইমাত্র আছে যে, পুরাতত্ত্ববিৎ কিলহরন

(Kielhorn) খ্রীষ্ট ৪৭২ সালে খোদিত কুমারগুপ্তনরপতির এক অমুশাসনপত্র হইতে নির্ধারণ করিয়াছেন যে, কালিদাস তৎপূর্বে প্রচলিত হইয়া থাকিবেন। কারণ ঐ অমুশাসনপত্রে অমুশাসনের একটি শ্লোকের অন্তর্গত একটি শ্লোক আছে। তত্তির বৃহগয়ার মহাশমনামক খোদিত পত্রে অমুশাসনের একটি শ্লোকের অন্তর্গত একটি শ্লোক আছে। ইহা যে খুব প্রত্যক্ষরূপক প্রমাণ হইল, তাহা নহে। পরে দেখা যাইবে যে, যে কালে বৌদ্ধধর্মের স্নানতা হইয়া হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কালিদাস সেই কালের মানুষ। তাহাও এই পক্ষ পক্ষান্তর মধ্যে ঘটয়াছিল।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' হইতে দেখাইতে যাইতেছি যে, একজন অমুশাসনের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি আছে। পাঠক ভুলিবেন না, এ সকল দ্বিধা-প্রদর্শন মাত্র।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এর প্রারম্ভেই দেখিতেছি, কবি শিবের আরাধনাপূর্বক গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। ঐক্যতত্ত্ববিদগণের সংবেদন্যরূপে জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় তিনচারি শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বৌদ্ধধর্মের স্নানতা হইয়া হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হইতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের এই স্নানতার সমুদয় কারণ এখনও অবগত হওয়া যায় নাই। কিন্তু এই কালের যে সকল বৌদ্ধ খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, পূর্বকার পালিতাহার পরিবর্তে আবার সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে অঙ্গীকার ছিল, তাহার পরিবর্তে আবার সমাদর প্রদর্শন করা হইতেছে।

অপরদিকে একজন প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে যে, এই কালের মধ্যে কান্তকূজ প্রভৃতি এদেশে যে সকল নরপতি উদ্ভিত হইয়াছিলেন, তাহার নিজ নিজ রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রাতে শিব ও শিবের ভুব অঙ্কিত করিয়াছেন। শক, কাঠ, হুন প্রভৃতি জাতি-সকল খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ঐ অঞ্চলের পক্ষ পক্ষান্তর পর্যন্ত হিন্দুধর্মের পশ্চিম-এদেশে রাজ্য করিয়াছিল। পুরাতত্ত্ববিদগণ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, ইহাদেরই সংস্পর্শে বিস্তৃত হইয়া পঞ্জাব, দিল্লী, কান্তকূজ, রাজপুতানা, মালব প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত মুদ্রার পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, শিবের পশ্চিমপারবর্তী জাতি-সকলের রাজগণ অগ্নি-উপাসনার সহিত শিব-পূজাও অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং নিজ নিজ মুদ্রাতে শিবমূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই শক, কাঠ, হুন প্রভৃতি জাতিগণ প্রকারান্তরিত শিবপূজা কি তাহাদের আদিভূমি সাইথিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আনিয়াছিল, অথবা ভারতবাসীদের সংস্পর্শ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল? এ বিচার পরিত্যাগ করিয়াও এ কথা অবশ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে হিন্দুধর্মের যে পুনরুত্থান হয়, শিবারাধনা তাহার প্রধান অঙ্গ ছিল, এবং কান্তকূজ, দিল্লী, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের রাজগণ ঐ পুনরুত্থানিত হিন্দুধর্মের ও তৎসম্বন্ধ শিবারাধনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এতম কি, একজন অমুশাসনও করা যায় যে, এই সকল এদেশের রাজগণ

সৈন্তদল প্রেরণপূৰ্ণক পূৰ্ণভাষ্য দেশসকলে
যৌদ্ধকৌত্তি বিলোপ ও হিন্দুধর্ম স্থাপন
করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কানিহাস
নিকট এই শিবারাধনার প্রবণ প্রচারের
সময় অনুদিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও
তাহার আত্মত্বের কাশসংক্ষেপ পূৰ্ণকার
অনুমানকে সমর্থন করিতেছে।

এই ভাষ্যে শিবারাধনার সাক্ষ্য। তৎ-
পরে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এর অপরাংশে অগ্র-
সর হওয়া যাক। তৎকাল প্রচলিত ধর্মের
প্রথম লক্ষণ পাইয়াছি শিবারাধনা; একটু
অগ্রসর হইয়াই আর একটি লক্ষণ লক্ষ্য
করিতে পারিতেছি। সেটি নৈবেদ্যাদি
কইরা তীর্থে গিয়া দেবমন্দির ধরণা দেওয়া।

মৃগয়াবিহারী হৃষ্যক যখন কথকবির
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তখন শকুন্তলপতি
কথের শিব্যরথের সহিত তাহার দেখা হইল।
যাণা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কথ আশ্রমে
আছেন কি না?” তৎপরে শিব্য বলিলেন—
“তিনি বীর কস্তা শকুন্তলার প্রতি অতিশি-
সংকারের ভার দিয়া শকুন্তলার বিব্রকারী
দৈবের প্রশমন-উদ্দেশ্যে সোমতীর্থে গমন
করিয়াছেন।” শকুন্তলার কি বিস্ময়, তাহা
কবি খুলিয়া বলিতেছেন না। বোধ হয়, বরল
বাঁকিয়া বাইতেছে, যৌবন পূর্ণ হইতে চলিল,
তথাপি অল্পবয়স বর ছুটিতেছে না, এই বিস্ময়।
এই বিস্ময় দৈবের প্রতিকূলতাবশহ উৎপন্ন
হইতেছে; এবং সেই দৈবের প্রসন্নতা-
পানদের সন্ত সোমতীর্থে গিয়া ধরণা
দেওয়া আবশ্যক। এ সোমতীর্থ বোধ হয়
বারকাপুরীস্থ সোমনাথতীর্থ হইবে। এই সকল
উক্তিভে আমাদের চক্ষের সমক্ষে তৎকাল-

প্রচলিত যে ধর্মের ছবি আনয়ন করিতেছে,
তাহা বৈদিক ক্রিষ্ণাকালপ যাগযজ্ঞাদির
ছবি নহে, কিন্তু এখনকার লৌকিক ধর্মের
অনুরূপ একটি ছবি। এতদ্বারা প্রমাণ
হইতেছে যে, আমরা বর্তমান হিন্দুধর্মকে যে
আকারে দেখিতেছি, সে আকার ইহা ঐশ্বর্য
পকমণতাবশী পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিল।
এই দীর্ঘকালে তাহাতে বিশেষ পরিবর্তন
সাধিত হয় নাই।

আর একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিলে এই ছবি আরও উজ্জ্বল হয়। হৃষ্যকের
জননী মৃগয়াবিহারী পুত্রের নিকটে এই সংবাদ
প্রেরণ করিলেন যে, বিশেষ দিনে তাঁর উপ-
বাসত্রয়ের পার্শ্বগার দিন; তাহার ইচ্ছা যে,
সেদিন পুত্র তাহার নিকটে উপস্থিত থাকেন।
হৃষ্যকের পক্ষে ইহা সাপেক্ষ বর হইল। তিনি
নিজে না গিয়া জননীকে পুত্রস্থানীয়
বিন্দুধর্মকে পাঠাইলেন; তিনি নিকটে
শকুন্তলার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার সুবিধা
পাইলেন।

এই যে উপবাসত্রয় ও তাহার পার্শ্ব,
ইহাও বর্তমান প্রচলিত ধর্মকে স্মরণ করাইয়া
দিতেছে। এখনও হিন্দুধর্মিলাপন তত্ত-উপবাস
প্রভৃতি করিতেছেন।

তৎপরে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য
ব্রহ্মচারী উপবাসী কথের তপতাবলম্বীরাও
শকুন্তলার বিস্ময় দূর হইল না, তাঁহাকে দৈব
প্রসন্ন করিবার জন্য সোমতীর্থে বাইতে হইল।
কবির এ কথাটা মনে লাগে নাই, তাহাতেই
প্রমাণ যে, দৈবের প্রতিকূলতাবিশ্বাসের অল্প
তীর্থাধিতে ধরণা দিতে যাওয়া, তখন সাধারণ
প্রভাকুলের মধ্যে এক প্রচলিত দ্বিধা যে,

কবি কবের আশ্রমে অশ্রুপরিতির এত কারণটাকে সর্বসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য কারণ মনে করিয়াছিলেন।

শাকু, তৎকালপ্রচলিত ধর্মের ছবিত এই। দেখা বাউক, সে সময়কার সামাজিক অবস্থার আর কি কি ভাব অবগত হওয়া ঘাইতে পারে। শকুন্তলার বিষকারী দৈবের প্রশমনের জন্য কব সোমতীর্থে গিয়াছেন। পূর্বেই প্রশ্ন করিয়াছি, সেটা কি বিষ? অশ্রুমান করিয়াছি যে, শকুন্তলা যৌবনসীমার উপনীত হইয়াছেন, তথাপি অশ্রুরূপ বর জুটিতেছে না, এই বিষ। এই অশ্রুমান যদি সত্য হয়, তবে দেখা ঘাইতেছে যে, কবির বিবেচনার কল্পার যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও বিবাহ না হওয়া এমন একটা প্রবণের কারণ যে, সেজন্য বিষকারী দৈবের আরোপ করিতে হয়। ইহাতেই প্রমাণ, কালিদাস যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে হিন্দুসমাজ মধ্যে বর্তমান সময়ের ন্যায় বালাবিবাহ প্রচলিত ছিল। আর এক ঘটনাবারা ইহা সমর্থিত হইতেছে। দ্রুপদ যখন আশ্রমে গিয়া কবিকল্পাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন শকুন্তলার বিষয়ে ছপার সখীস্বরূপে এই প্রশ্ন করিলেন—“ইনি কি চিরকোমার্য্য ধারণ করিয়া ব্রত-পরায়ণা থাকিবেন, অথবা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্রত ধারণ করিবেন?”—অর্থাৎ রাজার মনের ভাব, এই—“ইনি যে এতদিন অবিবাহিতা আছেন, তাহার কারণ কি? ইহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে কি না?” সখী উত্তর করিলেন, “মহাশয়, ধর্ম্মাচরণ-বিষয়েও ইহার স্বাধীনতা নাই; পিতার ইচ্ছা, তাঁহাকে সৎপাত্রে ব্রত করা।” অর্থাৎ

“এতদিন যে ইহার বিবাহ হয় নাই, তাহার উপরে ইহার হাত নাই, ধর্ম্মাচরণেও যখন ইহার স্বাধীনতা নাই, বিবাহবিষয়ে কি স্বাধীনতা থাকিবে? পিতার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে, অশ্রুরূপ বর জুটিগেই বিবাহ হইবে।”

এই উক্তিপ্রভৃতির ভিতরে প্রবেশ করিলেও অশ্রুভব করা যায় যে, নিশ্চয় সে সময়ে সমাজ মধ্যে বালাবিবাহ প্রচলিত ছিল, নতুবা বেচারি শকুন্তলার অবিবাহিতাবস্থা নইবা এত কৈফিয়তলব ও পক্ষসমর্থন চলিবে কেন?

ইহার পরেই আমরা আর একটি বিষয় দেখিতে পাইতেছি। কথখিবা যখন সংবাহ দিলেন যে, কুলপতি আশ্রমে নাই, তিনি বীর দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিবিসংকায়ের ভাৱ দিয়া সোমতীর্থে গিয়াছেন, তখন রাজা বলিলেন—“আজ্ঞা, তাঁর সঙ্গেই দেখা করি?” এইট একটু চিন্তা করিবার উপযুক্ত কথা। রাজা কিরূপে হঠাৎ একজন ভক্তলোকের ঘরের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন? ইহাতেই প্রমাণ, তখন নারীগণ অসঙ্কোচে পুরুষদিগের সহিত মিশিতে পারিতেন। সে বিষয়ে বাধা ছিল না। থাকিলে কবি রাজার মুখে আর এক উক্তি দিতেন; তাহা হইলে রাজা কথখিবা কে বলিতেন,—“আজ্ঞা, তবে আপনারা কুলপতিকে ডানাইবেন যে, আদি আশ্রমের কুলল জানিতে আসিয়াছিলেন।” তৎপরে কবিকল্পারা রাজার সহিত প্রথম দর্শনের দিনেও একান্তে নিরুপেষে বসিয়া বেঙ্গুপ সকল কথা ভাষিয়া বলিতেছেন, তাহাও কিছু আশ্চর্য্য। কেহ হয় ত বলিবেন,

ঐহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, — বনবাসিনী, তাঁহার ভ্র-
স্বামীর স্মৃতি কি জানেন? অরণ্যচারী
জনের অকপট স্মরণতা দেখাইবার জন্যই
কবি এক্ষণ করিয়াছেন, এইখানেই ত কবির
প্রতিভার বাহাদুরী । এ কথা কিরূপ পরিমাণে
সত্য । কিন্তু এক্ষণ মনে করা যাইতে পারে
না যে, কুলপতি কথের শিক্ষার অধীনে
ধাক্কি ও তাঁহার নারীধর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞা
ছিলেন । আগন্তুক পুরুষের সহিত কথা কহা
যদি শুৎকালে নারীধর্মবিরুদ্ধ হইত, তাহা
হইলে কবি তাঁহাদের লাজুকতার কারণ বল
হয় ত আর একটু ঘুরাইয়া আবরণ দিয়া ও
তাঁহা ভেদ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজসমীপে
উপনীত করিতেন ।

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে
সে দেশে সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে নারীর
অবরোধ ছিল না । অথচ রাজ-অবরোধের
উল্লেখ দেখা যাইতেছে, এবং ইহাও দেখা
যাইতেছে যে, পক্ষম অর্থে যেখানে শকুন্তলা
শাক্যবংশ ও গৌতমীর সহিত চন্দ্রস্বরের সম্মুখে
উপস্থিত হইতেছেন, তখন অবশুষ্ঠানবৃত্তি
হইয়া যাইতেছেন । এই সকলের একত্র
যোগ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
অবশ্যক নহে যে, সে সময়ে সাধারণ প্রজা-
কুলের মধ্যে নারীর অবরোধ ছিল না, নারী-
গণ অসঙ্কোচে পুরুষদিগের সহিত মিশিতেন ;
কিন্তু কোন প্রকৃতস্থানে যাইতে হইলে

ঐহারা আপনাদিগকে অবশুষ্ঠানের দ্বারা
আবৃত্ত করিতেন । কিন্তু ধনিগৃহের নারীদের
এ স্বাধীনতা ছিল না, সেখানে বহুবিবাহ ও
নারীর অবরোধ, চাই বিরাজমান ছিল । ইহা

* মধ্যভারতবর্ষের বর্তমান প্রকার কেমন অল্প-

রূপ ! ইহাতেই বোধ হয়, কালিদাসের উচ্চ-
শ্রমীর রাজসভার পারিষদ বলিয়া যে উল্লেখ
আছে, তদ্বোধে সত্য থাকিতে পারে ।

নারীকুলের অবস্থাস্বত্বকে আরও কোন
কোন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় । প্রথম—
চতুর্থ অঙ্কে দেখিতেছি, বিরহকাতরা শকু-
ন্তলা সখীদের পরামর্শে চন্দ্রস্বরে প্রণয়পত্রী
লিখিতে বসিতেছেন । ইহা কিছু নূতন নহে,
আরও অনেক নাটকে নারিকাদের প্রণয়-
লিপির উল্লেখ আছে । ইহাতেই প্রমাণ, সে
সময়ে ভক্তকুলানন্দাদিগের অনেকে লিখিতে ও
পড়িতে জানিতেন । এখনও গুজরাটদেশে
ও দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, ভক্তকুলানন্দাদিগের
মধ্যে লিখিবার ও পড়িবার রীতি বহুদিন
হইতে চলিয়া আসিতেছে । তাঁহাদের অনেকে
পিতা বা স্বস্তর প্রকৃতির নিকট শাস্ত্রপাঠ
করিয়া থাকেন । মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতভাষার
অভিজ্ঞা রমণীও পাওয়া যায় । বর্তমান
ইংরাজি শিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের
সহিত ইহার কোন সংশয় নাই । ইহা তাঁহা-
দের দেশের চিরন্তন প্রথা । কালিদাসের
উক্তিভেদে তাঁহার প্রমাণ পাইতেছি ।

ইহার উপরে তখন সম্রাটগৃহের রমণী-
গণ সঙ্গীত, চিত্রবিজ্ঞা প্রভৃতি স্নকুমার কলাতে
শিক্ষিতা হইতেন । তাহার প্রমাণ, পক্ষম
অঙ্কের প্রারম্ভে দেখিতেছি, রাজা ও বিদূষক
বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে
মধুর সঙ্গীতধ্বনি আদিত লাগিল । তাঁহারা
নির্ভারণ করিলেন যে, রাণী হংসপদিকা বর্ণ-
পরিচয় করিতেছেন, অর্থাৎ সারঙ্গামা
সাধিতেছেন । রাণী এক্ষণ উচ্চস্বরের গাহিতে
ছেন যে, বাহির হইতে তাহা শোনা যাইতেছে !

ইহা স্রোতিবিল্লত হইলে কবি কখনই ইহা
একপে সন্নিবেশিত করিতেন না ।

তবে ত কালিদাসের কালের অনেক
সামাজিক কথা আমরা জানিতে পারিতেছি ।
প্রবন্ধটি বাড়িয়া চলিল ; অতএব আর একটি
বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই অন্তকার মত উপ-
সংহার করিতেছি । অন্তান্ত কাব্যগ্রন্থ অব-
লম্বন করিয়া এইরূপ সমালোচনা করিবার
অভিপ্রায় রহিল । অবশিষ্ট বিষয়টি এই, যত
অধিক বেথানে ছন্দগত দীর্ঘত্বের হস্তে অসু-
বীরকটি পাইলেন, সেখানে দেখিতেছি যে,
দীর্ঘত্বকে পারিতোষিকরূপে অর্থ দিবারাত্র

ভাষার একজন বন্ধু প্রস্তাব করিতেছে—“চল
ভাই, ত'ড়ির দোকানে ঘাই ।” অথচ রাজার
নানা অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, রাজসভার
বর্ণনা রহিয়াছে, রাজপারিষদসভার উল্লেখ
রহিয়াছে, আমোদপ্রমোদের বর্ণনা রহিয়াছে,
কোথাও স্তম্ভাপানের উল্লেখ নাই । ইহাতে
একরূপ নির্ধারণ করা অধৌক্তিক নহে যে,
কালিদাসের কালে স্তম্ভাপান কেবল নিম্ন-
শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সম্রাট-
সমাজে ছিল না । স্তম্ভাণ্ড ব্যক্তিগণ এপ্রকার
আনোদকে ভুগা করিতেন । ইহাও বর্তমান
সময়ের সত্যাদেশসকলের প্রকার অল্পরূপ ।

ত্রিশবদাথ শাস্ত্রী ।

লক্ষ্মী-সরস্বতী ।

আমি লক্ষ্মী ! নিশাক্রমে ধীরে ধীরে আপনা বিকাশি*

উন্মুক্ত করিয়া রাখ অপরূপ তব রূপরাশি ।

গগন কুস্থলে তব তারকা অলুপ্ অগণন

স্তম্ভাশ্রয়-পাতিমাকে বস্ত্রোত্তিকা দীপুপ্ শোভন ।

কৌমুদী-কন্দলী-নিভ-হস্তে ললি হৈম পদ্মফুল

বিধ-কুসুম-কোকনদে রাখ লক্ষ্মী ! চরণ-ভাতুল ।

শ্রুত-বিকশিত শুদ্ধ বিধ তব করক্ আশ্রিত

রহক্ দাগিয়া তব পুণ্যমন্ড্রে প্রেমের ভারতী ।

এ নিশা-লক্ষ্মীর পার্শ্বে দিবাক্রমে তুমি সরস্বতি !

বিকচ-প্রোচ্ছল তুর্ণ প্রকটিয়া তব পূর্ণভোগ্যতি

এস নৃত্তিমতি এস ! রবিদীপ্ত তব দিব্যভাল

ফুটাক্ নী-রব হতে রবাকীর্ণ বিধ সুশিখাল ।

রণকসি* কর্ণভঙ্গী তীত্র-কর-অঙ্গুলি-ভাঙনে

মজ্জল গুণ্ডনে তব বিশ্ববাণা বাজুক্ সঘনে ।

শুভ্র জ্ঞান-সতপত্ন নিখিলজগদে হর্ষভরে

ওদ পদম্পর্শে-স্পর্শে ক্ষুণ্ণিত হউক গগন ধরে ।

ত্রিনিবন্ধনাথ ভট্টাচার্য্য ।

ত্রিভঙ্গুর-রাজ্য ।

হই ঘটিকার সময় ত্রিভঙ্গুর-মহারাজের দেও-
রানের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। তিনি
লিখিয়াছেন:—আমার যাত্রাপথের ধারে,
'নৈলজ্জোবাসের'-নামক একটি গ্রামে, আমার
ব্যবহারের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুত
থাকিবে। দেশানে বাইতে হইলে, এখান
হইতে ১১টা রাজ্যে চাড়িতে হইবে। কিন্তু
আমি এখনি ছাড়িব বলিয়া দ্বির করিলাম।

• আজ রাজ্যেই সেইখানে দিয়া পৌছিব।
স্বর্ঘ্যাক্ষর্য পূর্ণ্যাক্ষর্য অপেক্ষা করিয়া তাহার
পর যাত্রা করা—এবং প্রভাত পর্যন্ত—গাড়ি-
তেই নিদ্রা ঘাওয়া—ইহাই এখানকার
প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমি তাহা করি-
লাম না।

• আমি যাত্রা করিতে উত্তত হইলাম। এই
সময়ে স্বর্ঘ্যের প্রথম উত্তাপ। পাহাশালার
অধ্যক্ষ আমাকে হুই হাতে সেলাম করিতে
লাগিল। নীরব যাত্রা মুখে একটুত
করিয়া, তাম্রবর্ণ ভূতাবর্ণ আমার গাড়ির
সম্মুখে সারি দিয়া গাঁড়াইল। উভাদের মধ্যে
একটি নগ্নপ্রায় দরিদ্র বৃদ্ধা ছিল। তারতের
প্রায় সমস্ত পাহাশালাতেই, দানাপ্রায়ের

• জলাধারে জগ তরিয়া রাখাই ইহাদের কাণ।
ত্রিভঙ্গুরের সৌপামুদ্রা, আজ এই সর্কপ্রথম,
এই সব লোকদিগকে আমিনিজ্জহাতে বিতরণ
করিলাম। এই ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি, মোটা-মোটা,
কৃষ্ণকে গুটিকাগ মত। আমাদের বলদেরা,

এই অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে, চল-
চালে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে, অপেক্ষাকৃত শাখাপন্নবহুল
প্রদেশে—এমন কি, স্বকীয় উদ্ভিদপ্রাচুর্যে
সিংহলেরও সমকক্ষ—এরূপ একটি প্রদেশে
উপনীত হইলাম। এই জলগতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
পুষ্পবৃক্ষ পরিপূর্ণ। উচ্চ তালবৃক্ষের কাণ্ড-
গুলি গতকণ্য পীতাত ও গুচ্চ দেবিয়া-
ছিলাম, আজ দেখি, এখানে প্রচুর পত্রকুণ্ডলে
মুশোভিত। বড় বড় হরিৎভ্রামল শাখা-
পক্ষ বিস্তার করিয়া, নারিকেল-তরুণ
আবার আবৃত্ত হইরাছে। তুতল পর্যন্ত
শিকড়কুণ্ডল বিস্তার করিয়া, মার্গপার্শ্ব
বটবৃক্ষগুলি আমাদের মাথার উপর ছাড়াকারে
প্রসারিত। দেখিলে মনে হয়, এই প্রদেশ-
টিতে তরুসমাজের বিজনতা ও চর্কেত জটিল
অরণ্য ভিন্ন বৃদ্ধি আর কিছুই নাই। কিন্তু
এখন এই ছায়ায় পথে অনেক লোকজন
দেখা বাইতেছে। আমাদেরই মত, গরুর গাড়ি
চড়িয়া কতকগুলি লোক বাইতেছে। গরুর
পাল লইয়া রাখাল এবং জ্বাশামগ্রীতরা
চুপুড়ি মাথার করিয়া অগণ্য ব্রীলোক সারি-
সারি চলিরাছে।

ইতস্তত একএকটি ছোট ঐশ্বর্যমন্দির;
—বহু পুরাতন—বিলাস চ্যাপ্টা-পাথরে
গঠিত;—ইহাদিগকে মিশরদেশীয় স্থতি-
মন্দিরের ক্ষুদ্র নমুনা বলিয়া মনে হয়।

আবার, প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে, দুশল-মান ককিরের 'একটি সমাধিস্তম্ভ' ; উহা শুধু বাস্তবের বশে পূজ্যমান হইয়া উঠিয়াছে । উহা টাটকা হুণের মালায় সজ্জিত । আর, একটি গম্বুজধারী গণেশমূর্তি দেখিলাম ; নৈউতি ও গোলাপের মালা গাঁথিয়া, কোন ভক্তজন উহার কর্ণে পরাইয়া দিয়াছে ।

ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়—অথবা আবার চক্ষেরই ভ্রম—রাস্তার একতলি স্ত্রীলোক দেখিলাম, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটিকেও দেখিতে ভাল নয়, অথচ পুরুষেরা অধিকাংশই দেখিতে সুলভ । পুরুষের মুখে তাহ্রবর্ণটি বেরূপ মানাইয়াছে, রমণীর মুখে সেজন্য মানার নাই । পুরুষের গঠনতত্ত্ব পুরুষের গোঁফে ঢাকিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোক-নিগের অনাবৃত গঠনের সুলভতা আরও বেশি বলিয়া মনে হয় । বাহ্যের দেহগঠন স্ত্রীণীর রমণীমূর্তির স্তায় অনিন্দ্যসুন্দর—একরূপ কতকগুলি বাণিতা ছাড়া আর আর সকলেরই উদরদেশ অকালৈবঙ্গপা প্রাপ্ত হইয়াছে । জা ছাড়া, এমন কোন বস্ত্রাবরণও নাই, বাহ্যেতে ঐ অখোলখিত উদর কোন প্রকারে ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে । উহার নাক ছুঁড়িয়া সোনার নখ ও কান ছুঁড়িয়া কানবালা পরিয়া থাকে । কানবালাগুলি ওপরে এক তারিধে, উহাতে কান একেবারে স্থলিয়া পড়ে । তবে কিনা, উহার 'পারিয়া'-রমণী ; উল্লেস্বেণীর মহিলায়া মাল-বোঝাই গরুর গাড়িতে কখনই বাতাসাত করে না । এই উল্লেস্বেণীর স্ত্রীলোকদিগকে কিন্তু এখনও আমি দেখি নাই ।

এস্থায় এই সজ্জিত রমণীদিগের স্তম্ভ দূর-

দূরান্তরে একএকটি বিরামস্থান স্থাপিত হইয়াছে । নিবেট পাথরের বেদী, উচ্চতার এক-মাত্ৰ-সমান, এই বেদীর উপর উহার নিজ-নিজ বোঝা নামাইয়া রাখে । তাহার পর, আবার যখন ঐ বোঝাগুলি মাথায় উঠাইয়া লয়, তখন তাহাদিগকে ভূমি পর্য্যন্ত আর মাথা নোরাইতে হয় না ।

চারিদিকে কি রমণীর নিস্তরতা ! এই সকল বিহবলীভব তরুপ্রভুর বিরল আন-ভুলির মধ্যে কি রমণীর প্রশান্তি !

একটি বটবৃক্ষের তলে, মহামেঘের একটি পুরাতন মূর্তির সন্নিকটে, বেগুনি-রঙের পরিচ্ছদ-পরা, শাখা লম্বাধাড়ি, ইয়াণীর স্তায় মুখশ্রী, একটি লোক শান্তভাবে বলিয়া কি-একটা গ্রন্থ পাঠ করিতেছে ; হিন একজন প্রধান-পাত্রি—একজন গিরিয়ারদেশীয় প্রধান-পাত্রি ! প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই রহস্যময় ব্রাহ্মণের সেনে একি অদ্ভুত দৃষ্ট !

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই । আমি পূর্বেই জানিতাম, ত্রিবেঙ্গুর-মহারাজের রাজ্যে আর পাঁচলক্ষ বৃটানপ্রজার বসতি । এই সকল বৃটানদের পূর্বপুরুষগণ যে সময়ে এখানে গির্জা প্রতিষ্ঠা করে, যুরোপ তখনও পৌত্তলিকধর্মাবলম্বী । ইহার 'সেন্ট-টমাসের' শিবা বলিয়া পরিচয় দেয় । সেন্ট-টমাস্ প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন । কিন্তু সম্ভবত ইহার 'নেটোরী' সন্তানদের বৃটান, গিরিয়ারদেশ হইতে আসিয়াছে । এই সন্তানদের কর্তৃপক্ষীয়েরা বস্ত্রাবরণ এখানে পাত্রি-প্রচারক পাঠাইয়া থাকে । অদ্ভুত

ইহারা যে বহুপুরাতন, নোকপূর্য্য মহৎ বংশ
হইতে প্রভূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
তা ছাড়া, রাণেশ্বর উত্তরপ্রদেশে কতকগুলি
ইহনিও আছে। 'কেকসেনেমে'র মন্দির
দ্বিতীয়বার ধ্বংস হইবার পর, উহারা এদেশে
আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহা-
দিগকে কিংবা খুটানদিগকে কেহ কখন উৎ-
সীড়ন করে নাই। কেন না, এদেশে ধর্ম্ম-
সম্বন্ধীয় মতসংকীর্ণতা নরককাণ্ডেই বিস্তারিত।
এই স্থানটি মধ্যযুগকালে যে কখন কলু-
বিত হইয়াছে, এখন একটি দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত
হওয়া যায় না।

আমাদের বলদেরা গুল্কি-চালে অনবরত
• চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য অস্ত গেল।
সেই সঙ্গে সিংহলের ভায় এখানকার বাতাসও
ঐশ্বৰ্য্যময় হইল আর প্রভাতের পূর্ণ হইল। অব্যাক্ত
বৃষ্টিধারার পরমমিত্র নারিকেলবৃক্ষগুলি, অস্তিত্ত
বৃক্ষকে অপসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে এখানে
নিম্ন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। অমরা
এখন, সুবৃহৎ-সাধারণ-বিস্তারিত অক্লান্ত
তালবৃক্ষের খিলানদণ্ডপতলে প্রবেশ করি-
য়াছি। ইহা পশ্চিমভারতের উপকূলবর্তী
প্রদেশের—মালাবার-উপকূলের শত-শত
যোজন পর্য্যন্ত প্রসারিত। 'বাট'-পর্ব্বত-
মালায় অল্পবলী ক্ষুদ্র গিরিনৃপের পাদদেশ
দিয়া আমরা বতই চলিতেছি, ততই শৈলচূড়া-
সমূহে, শৈলবিগলিত অরণ্যে, ঝটিকাগুল
• নিবিড় অরণ্যে, অজ্ঞাত নভোমণ্ডল ভরা-
ক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

চারিধিকী ধরিয়া অনবরত কাঁকানি
বাঁহিতেছি, তাহার সঙ্গে তালে-তালে বলদেরা
• গুল্কি-চালে চলিতেছে। তইয়া-তইয়া

আমি শ্রান্ত-ক্রান্ত-অবস্থায়; আর সস্ত হই না।
কি করি, আমরা এই শব্দধারের স্তম্ভের
বন্ধুপথ দিয়া গলিয়া বাহির হইলাম এবং
বাহকের পার্শ্বে, বৃগকাঠ-আগনের উপর,
বানরেরা যেভাবে বসে, সেইভাবে একটু
বসিলাম। দিবালোক অনেকটা কমিয়া
আসিয়াছে। এই সকল মেঘের মধ্যে, এই
সকল তালগাছের মধ্যে, সন্ধ্যা সবেমাত্র দেখা
দিয়াছে। মার্গর বটবৃক্ষের হরিৎ-ক্রান্ত
স্বরূপ আনন্দের সমুদ্র দিয়া বরাবর সমান
চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে, অরণ্যের
মধ্যে, সন্ধ্যাছায়ায় কতকগুলি পদার্থ অতীব
অদৃষ্ট কিছুত-কিমান্ত-বলিয়া মনে হইতেছে।
মনে হইতেছে, যেন কতকগুলি শ্রমলকার
বিকটাকার গঠনহীন পশু, কখন বা একাকী
নিঃসঙ্গ, কখন বা দলে দলে একত্র, অথবা
পরস্পর উপরূপার সমাক্রান্ত রহিয়াছে।
এই গুল্ম শৈলস্তুপতির আর কিছুই নহে, কিন্তু
কি অদৃষ্ট, বিচিত্র! এই শৈলস্তুপগুলি স্থল-
চরী পশুদিগের ভায় বর্জ্বল ও তাহাদিগের
চর্চের ভায় মল্ল ও চিক্চিক্। উহাদের পর-
স্পরের মধ্যে যেন কোনপ্রকার বোণবন্ধন
নাই; প্রত্যেকেই যেন পৃথকভাবে এখানে
অধিষ্ঠিত। কোন সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর,
হতবাক্তিবিগের দেহগুলি বেত্রপ ভাবে থাকে,
উহারা সেইরূপ নিশ্চেষ্ট, বিনিক্ষিপ্ত, ছিন্ন-
বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে, যোটা-
যোটা গাছের ডাল, যোটামোটা গাছের
শিকড়গুলা হৃদয়ভেদের সাদৃশ্য ধারণ করি-
য়াছে।...যেন অজ্ঞাত প্রকৃতিদেবী স্বকীয়
শৈলবন্দনা, বিবিধ শৈলবটোয় বিকাশ-
কাণে, নির্ধনে কোন চরিত্রের আকাঙ্ক্ষা

লটরাই ব্যাপ্ত ছিলেন। যেন হস্তিমুষ্টির
কলনা-অমুরটি 'বহুকাল' হইতে এইখানে
বিভ্রমান। এমন কি, বিপাতা যখন গোড়ার
এই শৈলগুলি নির্মাণ করেন, তখনও বোধ
হয় তাঁহার চিন্তার মধ্যে এই কলনাটি গৃহ-
ভাবে বিভ্রমান ছিল।

বাত্তবিকই মনে হয়, হস্তী কিংবা হস্তীর
জগন্নিচর যেন এখানে সর্বত্রই দেখিতেছি।
আমাদের চক্ষুদিকে, অরণ্যের অন্ধকার হইতে
ঘনাইয়া উঠিতেছে, ততই যেন এইরূপ সামুদ্রিক
আমাদের মনে অধিকতররূপে প্রতী-
তিত হইতেছে;—আমাদের মনকে যেন
একেবারে অবিকার করিয়া বসিতেছে।

এখন আটটা রাত্রি। ঝটিকা আসন্ন
বলিয়া আশঙ্কা হইতেছিল, কিন্তু জানি না,
কি করিয়া সমস্ত আবার কোথার বিলীন
হইয়া গেল। স্বচ্ছ আকাশ, তারাময়ী
রজনী। ঝিল্লী ও শলভগণ উরাসতর গান
করিতেছে। কীটগণের হর্ষকোলাহলে সমস্ত
তরুণলব অগুরুনিত।

আমাদের সম্মুখে 'মশালের আলো' দেখা
যাইতেছে। তরুণলবের মধ্য দিয়া একদল
লোক আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।
ঢাকঢোল ও করতালের ধ্বনি, মধুযাকর্ষ-
নিঃসৃত একতান গান শুনিতে পাওয়া
যাইতেছে।

ইহারা বরষাঋতুর দল;—বট ও তাল
পাছের নীচে দিয়া মহাসমারোহে চলিয়াছে।
ইহাদের মধ্যে একজন, রাজা কিংবা দেবতার
জায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে: সোনালি
জরির লম্বা জামাজোড়া, মাথায় সোনার
দুটুপ।

ইহা একটি বিবাহের উৎসব; বর যীর
আত্মীয়বর্গকে লটরা, ধুমুবিধি অম্বলারে,
রাত্রী দিয়া যাত্রা করিতেছে।

এখন এগারটা। আমার শকটের মধ্যেই
আমি নিত্রা গেলাম। আমার কৃত্য শকটের
একটা স্ত্রজ জান্না-পুলিয়া, হাত-লষ্ঠদের
আলোর একখানা পত্র আমার সম্মুখে আনিয়া
থরিল। সেই পত্রে ত্রিবিধরাজকিত্তি মুক্তা
দ্রিত:—দুইটি হস্তী ও একটি সামুদ্রিক লম্ব।
একণে আমরা 'নৈলতাবরে'-গ্রামে আছি।
এই পত্রখানি মেওয়ানের নিকট হইতে আসি-
য়াছে। তিনি এই পত্রযোগে, মহারাজের
শুক হইতে, আমাকে বাগতসম্ভাষণ করিয়া-
ছেন, আর গাড়ি প্রস্তুত আছে, এই কথা
জানাইয়াছেন। দেগীর শকট হইতে হারির
হইয়া, এই শোভন-স্বন্দর ঝাঁকুনিহীন
গাড়িতে উঠিলাম। অংলাবের বিবর।
দুইটি উৎকৃষ্ট অথ আমাকে লইয়া দীর্ঘপদ-
বিক্ষেপে দুলুকি-চালে চলিতেছে, ইহাতেই
আমার আনন্দ। মহারাজের চিত্রিত পরি-
চ্ছদ পরিধান করিয়া 'কোচোয়ান' বকীর
আসনে বসিয়া আছে;—তাঁহার দীর্ঘ চাপু-
কান, জরির পাগড়ি, অন্ধকারে স্বকৃন্দক
করিতেছে। পিছনের পারদানে দুইজন
চট্টল সহস্; উহারা গাড়ির আগে-আগে
এইরূপ ভাবে দৌড়িয়া চলে, যেন উহাদের
উড়িবার একজোড়া ডানা আছে। তা ছাড়া,
পথের অগণ্য গরুর গাড়ি লগাইয়া দিবার
অস্ত্র উহারা কি ভয়ানক চীংকার করে!
একটা ছোট সিন্মুকের তিতরে জয়গত
ঝাঁকানি বাইয়া, তাঁহার পর খোলা গাড়িতে
তাঁরা দেখিতে দেখিতে সারি-সারি তাল-

নারিকেলের মধ্য দিয়া সহজভাবে ও দ্রুতগতি চলিতে কি উদ্ভাষণ আনন্দ ! রক্তমৌর স্বনধুর বায়ুরাশি ভেব করিয়া, সমগ্রকণ পুষ্পমৌরভ আশ্রয় করিতে করিতে আমরা যেন অস্বস্তি কোন একটি পটী-উদ্ভানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

আবার নাত্যধনি ; আবার মশালের রক্তিম অলম্বিকা । এত অধিক রাত্রি, আর এই বোর নিস্তব্ধ সময়, তবু এখনো আর একদল বরষাত্রী এই পথ দিয়া চলিয়াছে । এবার বরটি অধারত । উহার ভবির জামাজোড়া অর্ধের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত । বেশভূষার বরটিকে রাজার মত দেখিতে হইয়াছে । এখন রাত্রি প্রায় একটা । যে সকল ভাল-বুকের পরম্পরবিজড়িত শাণাপকপুঞ্জ আমাদের মাথাব উপর দিয়া ছুটয়া চলিয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ যেন তাহাদের গতিবোধ হইল । এটি অরণ্যের মধ্যস্থিত একটি ফাঁকা জমি । আমরা ক্রমে একটা পাকা-রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িলাম ।

মনে হইতেছে, যেন এই রাস্তাপথটি গভীর নিস্তার মধ্য । চন্দ্রহীন রাত্রে, গ্রীষ্মপ্রধান মেনে, তারকারাজি যে নীতল-শান্ত ভাষায় আলোক বিকীর্ণ করে, সেইরূপ আলোকে এই রাস্তাটি আলোকিত । যে সকল বাড়ী দিবসে ধ্বংসে শাল দেখাইবার কথা, এই রাত্রিকালে তাহারা একই যেন নীলাভ বলিয়া মনে হইতেছে । বাসাত্তর উর্ধ্বে আর একটি তলা আছে, তাহাতে মিশ্রধরণের ছোট-ছোট থাম ; এবং কোণিক খিলানের আকারে, ত্রিশরের আকারে, খালোয়ের আকারে পূর্ব ছোট-ছোট বন্ধ-গাছ । নীচে,

কল্লবারের দুই পল্লব, বেগানের কল্লিতে, ভূত-প্রভের প্রবেশনিবারার্থ সলিতা-বিশিষ্ট ছোট-ছোট প্রাচীর জোনাকির মত মিটমিট করিয়া আলিতেছে ।

কতকগুলি পরিচিত জীবজন্তু নিশ্চয়-ভাবে নির্দিষ্ট ধাপের উপর শুইয়া আছে । উহাদের প্রতি কে-বেন-কি অনিষ্টচরণ করিবে, এইরূপ কোন অনিষ্টই আশঙ্ক্য, উহারা যেন মনবি-আশাসের বতপূর-সম্ভব নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় লইয়াছে ।—গরু, ভাড়া, ছাগল, ঘোড়া, এই সকল জীবজন্তু । আমাদের গমনকালে উহারা জাগিয়া উঠিল না । বালুকাময় রাস্তা দিয়া আমাদের গাড়ি চলিয়াছে । গাড়ির ঢাকার মুহু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা বাইতেছে না । এই সকল বাড়ী, নিস্ত্রিত পশুর পাল, নিশ্চয় পদার্থসমূহ, যেন কোন দূরবর্তী বংশ-মশাল-আলোকের আভার ছায়, একপ্রকার অস্পষ্ট নীল আলোকে পরিঘাট ।

আমাদের সমুখে একটা প্রকাণ্ড ঘের, একটা উত্তর তোরণ, শ্রেণীবদ্ধ গাঠনের আলোকে দেখা বাইতেছে । এই তোরণের মধ্য দিয়া একটা বিস্তৃত জনমুখ তরবীধি দিয়া চলিয়া গিয়াছে । প্রাচীরের উর্ধ্বে ভাল-বুকাদি ও প্রাঙ্গণের ছায়া, এবং দূরপ্রান্তে, তরবীধির কেন্দ্রস্থলে ও পশ্চাদ্ভাগে, ব্রাহ্মণিক মন্দিরের চূড়াসকল দেখা বাইতেছে । স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে, এইবার আমরা ত্রিভঙ্গুর-মহারাজের রাজধানী—প্রকৃত ‘ত্রিভঙ্গুর’-নগরে প্রবেশ করিতেছি । পূর্বে যেখানে নিস্ত্রিত-জীবজন্তু-সমাক্ষর নীলাভ রাস্তাপথ দেখিয়া-ছিলাম, উহা ইদৃশই সংলগ্ন উপনগরমাত্রী ।...

আমি জানিতাম না, এই পুণ্য ঘেবের মধ্যে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগেরই বাসাদিকার আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, বুদ্ধি আমার গাড়ি পূর্বেকত বৃহৎ ভোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া, হঠাৎ জানদিকে ফিরিল; আবার আমরা তরু-অঙ্ককারে নিমজ্জিত হইলাম। আরো দূরে গিয়া-গিয়া, নানা রাস্তা অগ্রসরণ করিয়া, উপবনের অলিগলির মধ্য দিয়া, অবশেষে উদ্ভানমধ্যস্থিত একটা সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে আমাকে আনিয়া উপস্থিত

করিল। কিন্তু হায়! অট্টালিকার মুখশ্রুটি ভারতীয়-ধরণের নহে।

এইখানেই আমার গন্তব্যের নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইখানেই, মহারাজার পক্ষ হইতে আমার প্রতি বার-বার-নাই সাংসর অজ্ঞার্থনা ও আতিথ্য বিতরিত হইবে। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, উহার বাহ্য 'কাঠাম'টি—আতিথ্যের স্থানটি সুস্বাদু-ধরণের। বরাবর ইহাই আমার নিকট অসঙ্গত ও বিপদূষণ বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয়, এই পরমাদর্শ্য প্রাচীন হিন্দুস্থানের উদার জনদের ইহাই একটি মার্কিনীয় ক্রটি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেডিয়াম্ ।

রন্ডেন্-(Rontgen)-রশ্মির সম্বন্ধে ধর্মের কথা প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে হেন্রি বেকেরেল্ (Becquerel) ইউরেনিয়াম্ ও থোরিয়াম্ নামক দুইটি মৌলিক ধাতবপদার্থের আয়ো বিশ্লেষণের কার্যে আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে চমকিত করিয়াছিলেন। সে আজ চারপাঁচবৎসর পূর্বেকার কথা। ঐ দু'টি ধাতুমিশ্র পদার্থ, কাঠ বা ধাতুর কোন বস্তুর ভিতর আবদ্ধ করিয়া বেকেরেল্-সাহেব রেখাইয়াছিলেন,—রন্ডেন্-রশ্মি যেমন কতকগুলি অস্বচ্ছ পদার্থের বাধা ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, থোরিয়াম্ ও ইউরেনিয়াম্ও সেই-প্রকার একজাতীয় রশ্মি বিকিরণ করিতে পারে। বাক্সের নতিবুল কাঠ বা ধাতুকলক দ্বারা ঐ রশ্মি মোটেই অবরুদ্ধ হয় না।

রসায়নশাস্ত্রসম্বন্ধে ৭৫টি ভূতপদার্থের মধ্যে কেবল উপরোক্ত দু'টি-ধাতুমিশ্রিত পদার্থে ঐ বিশেষ ধর্মের লক্ষণ দেখিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিলেন,—এই সর্বসাধারণ্যে অদ্ভুত রশ্মিবিকিরণশক্তি কেবল ঐ দু'টি ধাতুরই বিশেষ ধর্ম। অবিশিষ্ট থোরিয়াম্ ও ইউরেনিয়াম্ বড়ই ভুলভ সামগ্রী। আবিষ্কারী বেকেরেল্-সাহেব অনেক গবেষণার পর বলিলেন,— যদি কোন উপায়ে আমরা উক্ত ধাতুদ্বয়কে বিগুহ অবস্থায় সংগ্রহ করিতে পারি, তবে তাহাতে আমরা রন্ডেন্-রশ্মিরই পূর্ণবিকাশ দেখিব। রশ্মিবিকিরণশক্তি থোরিয়াম্ ও ইউরেনিয়াম্-দ্বয়েরই বিশেষ ধর্ম বটে।

এই আলোচনার কিছুদিন পরে লিচ-

ব্রুইটি (Pitch-blende)-নামক ইউরেনিয়ামমিশ্রিত এক প্রকার আকরিক পদার্থের রশ্মিবিকিরণশক্তির আধিক্য আবিষ্কৃত হওয়ার অধ্যাপক বেকেরেলের পুরস্কার সিদ্ধান্তের উপর কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিশেষ করিলে পিচব্রুইটিতে ইউরেনিয়াম্ তো অতি অল্পই পাওয়া যায়;—তবে পিচব্রুইটি হইতে কি প্রকারে বিকিরণ প্রায় ইউরেনিয়াম্-বিচ্ছুরিত রশ্মি অপেক্ষাও প্রচুর রশ্মি বহির্গত হয়? রশ্মিনির্গমনকার্য্যে বিকিরণ প্রায় ইউরেনিয়াম্ ও তাহারই যৌগিক পিচব্রুইটির এই সামঞ্জস্য দেখিয়া, অধ্যাপক কারি (Curie) ও তাহার বিধবা পত্নী পদার্থটি লইয়া কিছুদিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন; এবং শেষে ইউরেনিয়াম্ ব্যতীত আর কোন যৌগিকধাতুর মিশ্রণথার উহার রশ্মিবিকিরণশক্তির আধিক্য জন্মায় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। পিচব্রুইটি-হিত ইউরেনিয়ামে কারিনম্পতি এই প্রকারে যে নূতন ধাতুর লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহাই রেডিয়ম্ (Radium)-নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ইহার পর এই নূতন ধাতুর বিষয় অধিক কিছু জানা যায় নাই। পদার্থটির গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, এবং তাহা হইতে রনুজেন-রশ্মির অনুরূপ কোন একপ্রকার রশ্মি বিকিরিত হয়, কেবল ইহাই জানা ছিল। কিন্তু রসায়ন-বিদগণ নিশ্চিত ছিলেন না, পদার্থটির রশ্মি-বিকিরণশক্তির মূলকারণ আবিষ্কারের জন্য অনেক পরীক্ষাদি চলিতেছিল। সম্ভ্রুতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ক্রুক্স (Crookes)

আরো কতকগুলি বিষয়কর ধর্মের পরিচয় পাইয়াছেন। এই সকল অদৃষ্টশক্তির মূল-কারণ-আবিষ্কার দূরের কথা, পদার্থটির প্রত্যেক কার্য্যে পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধ দেখিয়া বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অবাক হইয়া পড়িয়াছেন।

ক্রুক্সসাহেব ব্যতীত অধ্যাপক রুদার্ফোর্ড (Rutherford) ও রুশসিদ্ধ রসায়ন-বিদ মার্ উইলিয়াম্ রাম্মে প্রমুখ আরো কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আশকাল রেডিয়াম্ লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। ইহাদের সমবেত পরীক্ষার জানা গিয়াছে, —এই অদৃষ্ট পদার্থটি হইতে এত তাপ অধিশ্রান্ত নির্গত হইতে থাকে যে, তদ্বারা তাহার সমান ওজননের বরফ অতি অল্পকালমধ্যে গলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই অবিরাম তাপক্ষরের জন্য তাহার শক্তিতাণ্ডারের অণুমাত্র ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায় না। তা ছাড়া, কোন একটি বস্তুকে ক্ষণকালের জন্য রেডিয়ামের সংস্পর্শে রাখিলে, সেটিকেও রেডিয়ামের জায় রশ্মি-বিকিরণক্ষম হইতে দেয়া গিয়াছে। অবশ্য এই রশ্মিবিকিরণক্ষমতা তাহার স্থায়ী ধর্ম হয় না। এই রশ্মি ব্যতীত, রেডিয়ামের আরো কয়েকটি রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিরই কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। কোনটি সেকেন্ডে ১২০,০০০ মাইল বেগে এবং কেহ ঐ সময়ে ১৬০০০ হাজার মাইল দূরিত্ব পদার্থটি হইতে বাহির হইয়া পড়ে, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ কোন বস্তুই রশ্মিপথ অবরুদ্ধ করিতে পারে না। ক্রুক্সসাহেব অনুগ্রহণ এককণা রেডিয়াম্ কিরণকালের জন্য পকেটে রাখিয়াছিলেন, তাহার কোন একপ্রকার

দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে রেডিয়ামের

ৱশ্মি জ্বায্যর মূলকাপড়ের বাধা ভেদ করিয়া গায়ে কত উৎপন্ন করিয়াছিল। রেডিয়ম-ৱশ্মি ব্যাকটেরিয়া (Bacilli) একটি প্রধান নক্স। ছুটকতে রশ্মিপাত করিলে যে রোগী শীঘ্র আরোগ্যপাভ করে, কয়েকজন চিকিৎসক ইতোমধ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। বস্ত্রারোগোৎপাদক জীবাণু রেডিয়ম-ৱশ্মি দ্বারা অতি সহজে বিনষ্ট হয় বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন এবং বিষয়টি লইয়া নাকি আজও পরীক্ষা চলিতেছে।

যাহা হউক, রেডিয়মের এই সকল বিশেষ-গুণ আলোচনার এখনও সময় আসে নাই বলিয়া মনে হয়; এখন ইহাদের সাধারণ ধর্ম কি, দেখা যাউক। অধ্যাপক বদারকোর্ড ও সদির (Soddy) গবেষণায় এসবকে অনেক নূতন জ্ঞাতবা তথ্য জানা গেছে। বদারকোর্ড বলেন, রেডিয়ম হইতে আমরা নোটামুটি যে তাপ ও বিদ্যুৎয়ের রশ্মির নির্গ-মন দেখি, সেটি প্রকৃতপক্ষে একজাতীয় রশ্মি নয়, উহা স্পষ্ট তিনজাতীয় রশ্মির সংমিশ্রণ-কল। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় রশ্মি রেডিয়মেরই মুক্কাভয় অংশের প্রক্ষেপ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। বদারকোর্ডনায়েব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পদার্থটির অতিক্রম অণুকল কোন অজ্ঞাত কারণে বিভ্রান্ত হইয়া বহাবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে, এবং অণুর এই অবিকল্পিত প্রবাহই আমাদের নিকট একপ্রকার রশ্মি-আকারে প্রতিভাত হয়। রেডিয়মের এই আণবিক রশ্মির বেগ অত্যন্ত অধিক বটে, কিন্তু ইহা কোন বাধা ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে না; যে-কোন পদার্থ দ্বারা ইহার পথ বন্ধ করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়জাতীয় রশ্মিগুলিও প্রথমেই ছায় রেডিয়ম-কণাযর হইয়া বহির্গত হয়। পার্থ-ক্যের মধ্যে এই যে, দ্বিতীয়ের কণাগুলি প্রথম-রশ্মি অণু অপেক্ষা অনেক ছোট। এইজন্য কোন জিনিষই এই দ্বিতীয় রশ্মিপথে বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। এক-ইকি মূল সৌহ বা গীসকণক দ্বারা রশ্মিপথ অব-রুদ্ধ কর, রেডিয়মের অতিদ্রুত ক্ষতগামী কণাসকল সৌহের মধ্য দিয়া অনায়াসে বাতির হইয়া চলিতে থাকিবে। গণনাদ্বারা জানা গিয়াছে, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুকে হাজারভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ লইলে হাইড্রোজেন-কণার আকার যত ক্ষুদ্র হয়, রেডিয়মের দ্বিতীয়রশ্মিহিত অণুগুলির আকার তাহা অপেক্ষা কোনক্রমে বৃহত্তর নয়।

তৃতীয়জাতীয় রেডিয়ম-রশ্মির বাধা-অস্তি-ক্রম-শক্তি আশা অত্যুত। প্রায় সাড়ে-তিন-ইকি মূল আণুবিন্যাস-মধ্যস্থকলকের বাধা ভেদ করিয়া ইহারা অনায়াসে বহির্গত হইতে পারে। এই রশ্মিতে সম্ভবত রেডিয়ম-কণা নাই। সাধারণ আলোক-রশ্মি যেমন ঈশরের কম্পনবিশেষদ্বারা উৎপন্ন হয়, এগুলিও সেইপ্রকার কোন ঈশরকম্পনের ফল বলিয়া অল্পমিত হইয়াছে। রঞ্জন-রশ্মির সহিত ইহাদেরই কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

এই ত মেল তিনজাতীয় রেডিয়ম-রশ্মি। এতদ্ব্যতীত পদার্থটি হইতে সর্বদাই একপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থ ও তাপের বিকিরণ হইয়া থাকে। এই অক্ষর তাপ এবং পূর্বেকৃত রশ্মিগুলির মূল কোষায়, আজও কোন পণ্ডিত নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। রেডিয়মের সকল কাণাই বৈজ্ঞানিকগণের

নিকট একটা বৃহৎ প্রাচলিকা হইয়া
বাড়াইয়াছে ।

পাঠক অবশ্যই জানেন, রাসায়নবিদগণ
পরমাণুকে (Atom) অড়পদার্থের ক্ষুদ্রতম
অংশ বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন ।
কিন্তু এখন রেডিয়ামের এক এক পরমাণু সহস্র
সহস্র অংশে বিভক্ত হইয়া হুইজাতীয় অদৃশ্য
রশ্মি উৎপন্ন করিতেছে দেখিয়া বৈজ্ঞানিক-
গণ মহা-গোলযোগে পড়িয়াছেন । অনেক
বলিতেছেন, আমরা অগতীয়া সামগ্রীমাত্রকে
যে কয়েকটি মৌলিক পদার্থে বিভাগ করিয়া
নিশ্চিত হইয়া আসিতেছিলাম, এখন আর
সে বিভাগ চলিবে না । মূলজিনিষ লগতে
একটি । সেই এক মৌলিক পদার্থ হইতেই
হাইড্রোজেন-অক্সিজেন এবং লৌহবর্ণ প্রভৃতি
তথাকথিত মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি
হইয়াছে এবং এই সকল পদার্থমাত্রেরই
বিনষ্ট হইয়া আবার সেই প্রাথমিক মৌলিক
অবস্থায় উপনীত হইতেছে । রেডিয়াম
রশ্মি সেই অতি ক্ষুদ্র অণু, পদার্থটির বিয়ো-
(Disintegration) দ্বারা উক্ত প্রাথমিক
অড়োপাদান । সৃষ্টিকালীন যে এক
মৌলিক উপাদান হইতে রেডিয়াম ও অপরা-
পর ভৌতিকপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল,
এখন রেডিয়াম ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া সেই
মৌলিক অড়পদার্থ পাইতেছে ।

অধ্যাপক রদারফোর্ড ও সনির একটি
আন্তর্জাতিক পদার্থের ফলে, অড়ের উৎপত্তি
ও বিয়োগ সবকীর্ণ উপরোক্ত অল্পমানটির
উপর আশ্রয় অনেকের আস্থা দেখা
যাইতেছে । পূর্ব নবেম্বরমাসে অধ্যাপক সনি
একটি ক্যামেরার ভিতর কিঞ্চিৎ রেডিয়াম

আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন ; পদার্থটির স্বল্প ভ-
কনাময় রশ্মিগুলি জমাট বাধিয়া কিপ্রকার-
শব্দসম্পন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা এই পদা-
র্থের উদ্দেশ্য ছিল । রশ্মির পদার্থগুলি নলে
জমিলে পর, সদিগাহেব রশ্মিনির্গমনের
দ্বারা সেগুলিকে পদার্থীক করিয়া তাহাতে
অণুপ্রায় রেডিয়ামের চিত্র দেখিতে পান নাই,
তৎপরে হেলিয়াম (Helium)-নামক এক
ভূতপদার্থের বর্ণজঙ্ঘ (Spectrum) দেখা
গিয়াছিল । বর্ণজঙ্ঘপদার্থীক পদার্থের গঠনো-
পাদান দ্বারা পরিবার একটি অতি ক্ষুদ্র
উপায় । সুপীড়িত কোন এক পদার্থে অপর
পদার্থের অণুপ্রমাণ মিশ্রণ হইলে, ঐ বস্তুদ্বারা
তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট ধরা যায় । আধুনিক
রাসায়নিক গবেষণার প্রধান অবলম্বন সেই
রশ্মিনির্গমনের দ্বারা রেডিয়ামকে
অকস্মাৎ হেলিয়ামে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া
আর সকলেই প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন ।
পূর্কোক্ত পদার্থের বিশ্বাস করিলে, ভূতপদা-
র্থমাত্রেরই বিয়োগ যে অবশ্যজ্ঞাবী, তাহা আর
অস্বীকার করিবার উপায় নাই ।

পূর্কোক্ত পদার্থের ফল প্রচারিত হওয়ার
পর, বৈজ্ঞানিকমহলে আর একটা কথা
উঠিয়াছে । অনেকে অল্পমান করিতেছেন,
বিয়োগপ্রাপ্তিকালে কোন বিশেষ পদার্থের
সকল অংশ একবারে সেই মৌলিক অড়-
কণার পরিণত হয় না । প্রাথমিক অড়কণাও
তদগতিতে বিশেষ বিশেষ পদার্থের মধ্যে
অনেকগুলি ক্রম আছে । তাই রেডিয়াম
একবারে সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিবর্তিত
না হইয়া, প্রথমে লঘুতর পদার্থ হেলিয়ামে
পরিণত হয় । তার পর ক্রমে সেই হেলিয়ামই

আমরা লঘুতর পদার্থগুলিকে প্রাথমিক জড়কণার চরমবিয়োগ লাভ করে। তৃত-
পদার্থের এই ক্রমিক পরিবর্তনের কথা বড়ই
অদ্ভুত। এখন মনে হইতেছে, অতিপ্রাচীন
রসায়নবিৎ ও বাচকরণ (alchemists)
নৌহকে স্বর্ণে পরিবর্তিত করিবার জন্ত লভ
লভ বৎসর যথা ব্যয় করেন নাই। স্পর্শ-
মণির আন্তিব এ জগতে অসম্ভব নয়।

এখন পাঠক হিজাদা করিতে পারেন,—
পূর্বে যে সকল পরীক্ষার কথা বলা হই-
য়াছে, সে ত কেবল রেডিয়াম লইয়া কিন্তু
তৃতপদার্থমাত্রই যে রেডিয়ামের স্তার রূপা-
ন্তরগ্রহণক্ষম ও বিয়োগদক্ষী, তাহার প্রমাণ
কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে কুক্সপ্রমুখ
রসায়নবিদগণ বলিতেছেন, বিয়োগ (Disin-
tegration) কেবল রেডিয়ামেরই একমাত্র
ধর্ম নয়। ইহার বিয়োগ খুব প্রত্যক্ষ, তাই
ধরা পড়িয়া গেছে। অপর পদার্থের বিয়োগ
অতি ধীরে ও নানা প্রাকৃতিক কার্যের
জটিলতার ভিতর দিয়া হইতেছে, তাই আমরা
সেগুলিকে হঠাৎ ধরিতে পারি না। কাচ-
ঘণ্ডে যখন ত্রেশদী বস্ত্র বধিয়া আমরা বিদ্যুৎ
উৎপাদন করি, তখন সেই কাচের উপাদানের
ঠিক রেডিয়ামের মতই বিয়োগ হয়, কিন্তু এই
বিয়োগ খুব প্রত্যক্ষ নয়, তাই সেটা এ পর্যন্ত
আমরা বুঝিতে পারি নাই। জলে-স্থলে,
অগ্নিবিদ্যুতে, মেঘে-বৃষ্টিতে এই বিয়োগ নিরন্তর
চলিতেছে। তবে পরীক্ষাধারা রেডিয়ামের
যে সকল অদ্ভুতধর্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া
গাইতেছে, তদ্বারা পদার্থের উৎপত্তি ও পঠন
সংজ্ঞার প্রচলিত দিচ্চাস্থের ভিত্তি যে কম্পিত
হইলছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে

পারে। যুগযুগান্তর সমবেত প্রেম বৈজ্ঞা-
নিকগণ যে ৭৮টি মূলপদার্থের উপর আধুনিক
বিশাল রসায়নশাস্ত্রকে দাঁড় করাইয়াছিলেন,
বর্তমান আবিষ্কার সেগুলিকে চূর্ণীভূত
করিয়া, শাস্ত্রটিকে শিথলই একটি প্রশস্ততর ও
দৃঢ়তর ভিত্তির উপর তলাইবে বলিয়া আশা
হইতেছে।

আজকাল বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সাম-
য়িকলক্ষ্যমাজেই অবৈজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক
প্রণায় রেডিয়ামের অনেক আভ্যন্তরীণ কথা
আগেচনা দেখা যাইতেছে। যানপরিচালন-
কার্যে রেডিয়ামকে কেহ করণার স্থানে
বসাইতেছেন এবং কেহ বা আগোক-উৎপাদন-
ব্যাপারে ইহাকে বিদ্যুতের স্থানে প্রতিষ্ঠা
করিবার আয়োজন করিতেছেন। ইহাদের
এই সকল কর্মনার শাক্যতা যে অসম্ভব, তাহা
বলা আমাদের উদ্বেগ নয়, তবে সেগুলি যে
সুসাধ্য নয়, তাহা আমরা মৃতকণ্ঠে বলিতে
পারি। প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ আমরা
যেপ্রকার প্রতিদিনই সংশ্লিষ্ট দেখিতে
পাইতেছি, রেডিয়ামের তাপ ও রশ্মি-বিকিরণ
সেইপ্রকার একটা শক্তির বিকাশ ব্যতীত
তো আর কিছুই নয়। শৌর্যকিরণের বিপুল
তাপ, বায়ুর প্রবল গতি প্রভৃতি প্রকৃতির
মূলত ও উচ্চ শক্তিকে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান
অতি কমই বণীভূত করিতে পারিয়াছেন।
কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ রেডিয়ামের শক্তিকে
অশূন্যলিভ করিয়া যে অনায়াসে ঘরের কাজ
চালাইয়া লইবেন, তাহা হঠাৎ বিশ্বাস হয়
না।

অধ্যাপক রবার্টফোর্ড ও কুক্সদ্বারাও
গণনার রেডিয়ামের শক্তির পরিমাণ সম্প্রতি

জানা গিয়াছে। উক্ত অস্বাভাবিক দেখাইয়াছেন, কেবল একপ্রকার রেডিয়ম-নিহিত শক্তিকে এক সঙ্গে কাজে লাগাইবার উপায় থাকিলে আমরা তদ্বারা চৌকম্বাভারমণ্ডিতাবিশিষ্ট কোন পদার্থকে অনায়াসে একমাইল উর্ধ্বে উঠাইতে পারিতাম। কণাপ্রমাণ রেডিয়মে এই বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে সত্য, কিন্তু উহাকে নিঃশেষে এককালীন কাজে লাগাইবার উপায় কই? পণনার জানা গিয়াছে, রেডিয়মের বিয়োগ এত দীরে হয় যে, উহার রতিপ্রমাণ-কণাদ্রুত শক্তির বিকিরণ শেষ হইতে প্রায় ২০ লক্ষ বৎসর লাগে। এই অতি দীর শক্তিবিকিরণধর্মকে কোন উপায়ে দ্রুত করিলেও পদার্থটির দ্রুততা ইহার কার্যোপযোগিতার বিশেষ অস্বস্ত্য

হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। রেডিয়মের অপ্রতিদ্বন্দ্ব এপরাঙ্ক যে পিচ-ব্লেন্ড-নামক আকরিক পদার্থে দেখা গিয়াছে, সেটা পৃথিবীতে পূর্ব হ্রদত নয়; বোহেমিয়া, ক্রন-ওয়াগ ও সাক্সনি প্রদেশের কেবল দুই একটি স্থানে ইহার সন্ধান্ত সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। সুতরাং এই দ্রুতত সাময়িক হইতে ততোধিক দ্রুতত রেডিয়মের উদ্ধার করিয়া তদ্বারা আনন্দের গৃহকার্য্য সাধন করা কতদূর সম্ভবসাধ্য হইবে, এখন পাঠক তাহা বিবেচনা করুন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রায় দেড়লক্ষণ পিচ-ব্লেন্ড হইতে কেবল অর্ধ-সেরমাত্র রেডিয়মের উদ্ধার হয়, এবং প্রায় ত করিতেও প্রায় এককোটি পাউন্ড টাকার ব্যয় পড়ে।

শ্রীভগদানন্দ রায় ।

ব্রাহ্মণ ।

—

ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণাচিত চলিত্রগৌরবে লোকসমাজের সমুখে উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজশিক্ষকরূপে দণ্ডারমান হইতে পারেন, তবে সেকালের জ্ঞান একাংশেও তাহাকে ভারতবর্ষের লোকে বিনা বাক্যব্যয়ে আন্তরিক ভক্তিপ্রদাতরে সমাজপতি বলিয়া বরণ করিয়া লইবে। তখন আর সত্য করিয়া অনুসমাজকে কর্তব্যপালনের জন্য ডাড়া করিতে হইবে না।

সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যে দিন

দারিদ্র্য নিরন্তর লজ্জার বাপার হইয়া

ব্রাহ্মণকে অনসমাজে স্থগিত করিত না, সে দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, একালের ব্রাহ্মণকেও অর্থোপার্জনহই অধিনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া উর্দ্ধ্বাশ্রমে সংসারসংগ্রামে ছুটাহুটি করিতে হইতেছে। এখন আর মহাদেব ব্রাহ্মণকেও উপত্যক্য মায়াবী কীর্তন করিয়া প্রবুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা নাই। এখন বিদ্যা তাহার পুরাতন লক্ষ্য বিস্তু হইয়াছে; সংঘম তাহার পুণ্ডন বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; আত্মত্যাগ তাহার নীচ অনমনকে নির্বাসিত করিয়া, সমাজের সম্মুখ

করিবার জন্ত লালারিত হইয়া উঠিয়াছে! এখনও বিজ্ঞান অজ্ঞতা হই নাই কিন্তু সে কেবল অশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান অস্বঃসারশূন্য অলৌকিক আড়ম্বর। এখনও সংঘম সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই; কিন্তু সে কেবল পূর্বসংস্কার-মূলক সম্বন্ধনিচয়কে কারণরূপে হুসংঘত করিয়া, আধুনিক আয়ত্ত্ববিশিষ্ট অতিনব-শিক্ষার চক্ষু-জ্বালাকে পরাহিত করিবার জন্ত ব্যতিব্যস্ততা। এখনও আত্মত্যাগ একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই কিন্তু সে কেবল ইহুপরিমোচকের সম্প্রতি পরিবর্তে ইহুলোকের আত্মপ্রশংসালোভের জন্ত মহু-বাত বিসর্জন বিবাহ ঘৃণীলতা। এখন আর সে দিন নাই। সে দিন নিজে বড় হইয়া, অপরকে বড় করিবার জন্ত, রাজ্য জ্ঞানালোচনার নিরত ব্যাপ্ত ছিলেন; স্বয়ং সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, অপরকে সমুন্নত করিবার জন্ত উদ্যোগ হইয়াছিলেন সে দিন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। বজ্রাশ্রিত দূরে সরিয়া গেলে পল্লীপথ ঘেমন পৃথিবীকক্ষমণ্ড ও কর্দমাক্ত হইয়া লোচনের উপায় তিরোহিত করে, পূর্বশিক্ষা বিভাঙিত হইয়া ভারতবর্ষের অবস্থাও তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে! এ সময়ে বিনি স্বদেশের কল্যাণকামনার ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুরাতন অধিকার পুনর্গ্রহণ করিবার জন্ত দাবীতরে আত্মদান করিতেছেন, তিনি ভারতভূমির সুযোগ্য হুসন্তান। তাঁহার “বদেবী সমাধের” প্রবন্ধ তাঁহার পরিণত পুরাণীবনের পরিপূর্ণ অন্তফল। চিটার-বিতণ্ডার তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বার্থ না করিয়া, জুনসমাজ বাহ্যতে কর্তব্যানির্ণয়ে অগ্রসর হয়, তাহার জন্মট আয়োজন করা

আবশ্যক। আলোচনায় সকল কথা সরস হয় না; সকল কথা সহসা বোধগম্য হয় না; বুদ্ধিবার দোষে এবং বুদ্ধাইলার দোষে অনেক কথাই অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল প্রতীকমান জনসমিতির রূপরূপে জনগণ প্রকৃত বক্তব্যের যে স্থাপিত আভাস মেঘচ্ছন্ন চক্র-প্রভার জ্বালা অদৃষ্ট হইয়াও আলৌকিক সৌন্দর্য্যে লোকচিত্ত মুগ্ধ করিয়া দেয়, তাহা ধরিয়াই গুণব্যাপণে অগ্রসর হইবার উপায় হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণগণই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূলকারণ। তাঁহারা যে বহুদূর হইয়া স্বদেশের অধঃপতন সাধন করিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই ভারতবর্ষের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। ইংরাজের মুখের এই হুমিট উপদেশ ভারতবর্ষের অধিকাংশ নরনারীকে প্রেরিত্তরে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী করিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে পুনরায় সমাজপতি হইবার পথে সবলে কণ্টকরোপণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন বদেবী-সমাজ সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উন্নতিকামনার ঘৃণীল হইলেও, ব্রাহ্মণকে বিনা বিচারে সমাজপতি বলিয়া বরণ করিতে সম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের এই কলঙ্ক কতদূর সত্য, তাহার আলোচনা করা আব-
শ্যক।

ব্রাহ্মণ মানবজীবনের ক্রমোন্নতিলাভের যে সকল পথ নির্দেশ করিয়া পুরাতন ভারত-বর্ষের শিক্ষাশূন্য চইয়া ইতিহাসে আপন

নাম ত্রিষ্মবদীর কংগো রাধিধাভেন, তাহার
 প্রথম হুত্র—“কুখাতোহধিকারঃ ।” অণ—
 অতঃপর, অতঃ—এইজন্য, অধিকারবিচার।
 অধিকারবিচার না করিয়া, সকল শ্রেণীর
 নরনারীকে একইপ্রকার উপদেশে শিক্ষাদান
 করা অসম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানভেদেও অধিকার-
 ভেদে শ্রেণীবিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে।
 অধিকার ভেদন বর্জিত হইতে থাকে, অধি-
 কারীও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে
 উচ্চতর শ্রেণীতে সমুন্নত হইতে পারেন।
 ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। শুণ এবং
 কর্ণ বিচার করিয়াই অধিকার নির্ণীত হইত।
 ইহার ভিত্তিই জনসমাজ বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত
 হইয়া পড়িয়াছিল। একালের ভার সে-
 কালেও, দুর্জল অধিকারীর পক্ষে ক্রমোন্নতি-
 লাভের চেষ্টা না করিয়া, একেবারেই সর্বোচ্চ
 পদবী আক্রমণ করিবার চুরাকাক্ষা। তাহাকে
 অনিষ্ট আশঙ্কানেনে কিছুনাও উত্তেজিত করিত
 না বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাস না থাকি-
 লেও, ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে, অধি-
 কারীর মহোচ্চপদবীলাভের অশান্ত আগ্রহের
 প্রমাণপরম্পরার অভাব নাই। ব্রাহ্মণোচিত
 চিন্তাসংঘম লাভ না করিয়াই, ব্রাহ্মণোচিত
 সামাজিক পদগৌরব লাভের দ্রষ্ট্র অনেকই
 আগ্রহপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একালের
 ভার দেখালেও অনুধিকারস্রোতা নিত্যই দুর্জল
 ছিল না। তাহার কণা সংস্কৃতসাহিত্যে
 মনো আখ্যায়িকার আধরণে প্রজ্জ্বল হইয়া
 রহিয়াছে। এই চেষ্টা সকলদেশেই সমাজ-
 মন্দিরের ভিত্তিমূল নিখিল করিয়া থাকে ;
 তৎকর্ত্ত আচাৰ্য্যগণকে অপরাধী করা যায় না।
 ওঁহাদের চক্ষে বাচন ও কৃত থাকিলে,

ওঁহারা সমাজের কংগোকাগনায় অপরাধীকে
 সমুচিত বওদান করিয়া শাসন করিতে পারি-
 তেন। ওঁহাদের হস্তে স্তম্ব ছিল—শিক্ষার
 সহপাশে। ওঁহারা কেবল উপদেশদানেই
 জনসমাজকে বুকাইতেন, —উন্নতিলাভের
 প্রথম হুত্র—“কুখাতোহধিকারঃ ।”

এই মূলহুত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও, অসম্ভিষ্ট
 ব্রাহ্মকরনিবন্ধ বহুমুখ্য উপদেশের আধার।
 যখন এই মূলহুত্র প্রণীত হইয়াছিল, তখন
 জ্ঞানমাত্রাই ‘বেদ’ নামে অভিহিত হইত।
 তাহাতে সর্বশ্রেণীর নরনারীর অধিকার ছিল ;
 কেবল গুণকর্ম্মবিচারে এক এক শ্রেণীকে এক
 এক শ্রেণীর জ্ঞানার্জ্জুন্যের উপদেশ প্রদত্ত
 হইত। ধর্ম্মের, আশুর্কের প্রভৃতি তাহারই
 নির্দশন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বেদ
 অপৌকষের বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহা
 অনাদি-অনন্ত-কাল হইতে বিশ্বসাধারণের প্রকাশ
 হইয়া মানবের দর্শনগোচর হইবার ভ্রষ্ট্র অত্যা-
 কাশ প্রতীক্ষা করিতেছে। যখন যে বেদ
 মানবের দর্শনগোচর হইয়াছে, তখনই তাহা
 ‘দৃষ্ট’ বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। যিনি
 দর্শন করিয়াছেন, তিনি অবিপদবাচ্য হইয়া-
 ছেন। গ্রীপুরুষ উভয়েই এইরূপে অবি-
 পদবী লাভ করিয়া, সমাজশিক্ষক হইয়া-
 ছিলেন। বেদ ঘাঁহারা প্রচার করিতেন,
 ওঁহারা ‘প্রোক্তা’ নামে পরিচিত। ওঁহারাও
 অবিপদবাচ্য। ‘দৃষ্ট’ বেদ সর্বত্র ‘প্রোক্তা’
 হইয়া, জনসমাজের শিক্ষাদানের কার্য্যে
 ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ
 সেই পুণ্যভূত গ্রহণ ও শালন করিবার ভ্রষ্ট্র
 সর্গাপেক্ষা অধিক আনুত্যাগ স্বীকার করিতে
 বাধ্য হইতেন বলিয়াই, ব্রাহ্মণের পদগৌরব

প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর একে অধিকারশাসিত না করিয়া, ব্রাহ্মণ হইবার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ব্রাহ্মণের আদর্শ হ্রাস হইতে পারিত না। একালের জায়গাধানেও, জনসমাজ উচ্ছ্বল হইয়াই ব্রাহ্মণকে অধঃপাতিত করিয়াছে; ব্রাহ্মণ জনসমাজকে অধঃপাতিত করেন নাই। বুদ্ধি-বান্ধব দোষে এবং বৃথাইবার দোষে ব্রাহ্মণের স্বকীয় সকল অপরাধ ভুল করিয়া, ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের বে সকল কঠিনব গ্রন্থ রচিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক-কল্পনাগ্রস্ত অলৌকিক ভয়নাট্যের সমাজের হইয়া পড়িতেছে !

ব্রাহ্মণের ব্যক্তিগত অধিকার বলিয়াই পরিচিত ছিল। অতঃপর ব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্তাবলে ব্রাহ্মণত্বলাভের সম্ভাবনা থাকিত না। কাণে ব্রাহ্মণের জন্মগত অধিকারে পর্যাপ্ত হইবার জন্যই ব্রাহ্মণ পূর্বগৌরববিচ্যুত পতিতভাবিত্তে পরিণত হইয়াছেন। জনসমাজের উচ্ছ্বলতাই তাহার প্রধান কারণ। জনসমাজ এখনই একত্রে ব্রাহ্মণ চাহিয়াছে, তখনই একত্রে ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। জনসমাজ এখন একত্রে ব্রাহ্মণ পাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কেবল প্রধারক্ষার্থ বহুত্বের মাত্রাকেই ব্রাহ্মণের পরিচায়ক করিয়া তুলিয়াছে, তখন হইতেই ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া, অস্বপ্নের পূর্বসৌভাগ্য বিলুপ্ত করিয়া বিধাছেন ! জনসমাজ যদি আবার ব্রাহ্মণকে তাহার পুরাতন অধিকার দান করিবার জন্য বধ্যার্থী নাগারিত হয়, ব্রাহ্মণ আবার ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিতে, সমর্থ হইবেন। জনসমাজ কি

বধ্যার্থী ব্রাহ্মণকে সকাঠরে আত্মন করিতেছে ?

পৃথিবীর সকল পন্থাই প্রয়োজনবোধে বিকল্পিত হইতে পারে। বাহার প্রয়োজন নাই, সে কেবল প্রধারক্ষার জন্য অধিকদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। বাহার প্রয়োজন আছে, তাহাকে বাধ্য হইয়াই জনসমাজের সম্মুখে উপনীত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন অস্বপ্ন হইবামাত্র ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব হইবে। কিন্তু বধ্যার্থী প্রয়োজন অস্বপ্ন হওয়া আবশ্যিক। জনসমাজ আয়োজিতসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উদারচিত্তে আত্মনকর্তে আত্মন না করিলে, সে প্রয়োজন কখনই অস্বপ্ন হইবে না। মৌখিক আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ আদিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার জন্য তপস্তার প্রয়োজন।

বর্তমান জনসমাজ সকল কার্যেই ইতঃক্ষেপ করিতে সমর্থ; কিন্তু তপস্তা—সর্গ-নাশ!—তাহা নিত্য পুরাতন অনাবশ্যক আশ্রয়বন্ধনার বাধ্যত্বের। তাহা লইয়া কি হইবে? তপস্তাই যে ভারতবর্ষের সমুন্নতির মূল, তাহা নুতন করিয়া বৃথাইবার প্রয়োজন আছে। আমরা এখন তপস্তা বলিতে তপস্তার বাধ্যত্বকেই একত্রে বধ্যার্থী বলিয়া বুঝিয়া আসিতেছি। সুতরাং তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা স্বাভাবিক। তপস্তা যে মানবপ্রকৃতির ক্রমোন্নতিসাধনের একমাত্র উপায়, সে কথা এখন আবার নুতন করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অভাবে ভারতবর্ষ কর্তব্যরহীন উড়ুপের জায়গায় পড়িয়া অস্বপ্ন সাগরে বিপর্যস্ত হইতেছে !

এই পতিতরাতির সমুন্নতিসাধন করিবার
যোগাযাত্র কে? জনসমাজের ভিন্ন ব্যক্তি-
বিশেষকে সমুন্নতিসাধন করিবার যোগাযাত্র
বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। ব্যক্তি-
বিশেষ কেবল জনসমাজের মুখপাত্র; ব্যক্তি-
বিশেষ জনসমাজকে পরিচালিত করিতে
পারে,—গঠন করিতে পারে না। জন-
সমাজের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পরিফুট হইবার
পথ না পাইয়া ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া
যখন অকস্মৎ পরিফুট হয়, তখনই তাঁহাকে
মহাপুরুষ বলিয়া গৃহীত করিবার আড়ম্বর প্রবৃত্ত
হইয়া উঠে। তাহা যে জনসমাজেরই জ্বর-
নিহিত অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার পরিফুট আর্তনাদ,
সে কথা কেহ বিচার করিয়া দেখে না।
বর্তমান জনসমাজের জ্বরনিহিত কোনরূপ
অব্যক্ত আর্তনাদ ফুটনোদ্বুৎ হইয়া থাকিলে,
তাহা অবশ্যই একমিচ্ছা-একবিক্ দিয়া
অচিরে ফুটিয়া বাহির হইবে।

আধুনিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে
অব্যক্তি আর্তনাদ ফুটনোদ্বুৎ হইয়া উঠিতেছে,
তাহাই জনসমাজের প্রধানত্বের আন্তরিক
আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করে। এই-
শ্রেণীর সামাজিকগণের সাধারণ নাম শিক্ত-
সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় কি চায়? বঙ্গদেশ
ভারতবর্ষা অল্পসারে এই সম্প্রদায় তিন
শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমশ্রেণীর বয়স হই-
তাহে;—প্রথম দৃষ্টিশক্তি ক্রীণ হইয়া আসি-
রাছে। বিচারক, ব্যবহার্যাদী, চিকিৎসক
ইত্যাদি বিবিধ পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত
থাকিয়া, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীরমন
একবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইহারা কি
চান, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহাদের

পলিতকেশ অতিরিক্ত গাত্রোগো ইহাদের
জন্মত প্রাথমিক চাপিয়া রাখিয়াছে;
তথাপি মনে হয়, ইহারা সকলেই অস্বাভিক-
মাত্রার নিশ্চেত-নিশ্চল হইয়া বিশ্রামলাভার্থেই
সবিশেষ লালসিত। দেশের কথা এবং দেশের
কথা ভাবিবার সময় থাকিলেও, দেশের অজ্ঞ
এবং দেশের দ্রুত বাতিবার উত্তম অতর্কিত হই-
য়াছে। এই শ্রেণীর শিক্তসম্প্রদায় একজন
উদাঙ্গীনের মতই অভ্যাসবশত দেশের কথার
আগোচনা করিয়া থাকেন; প্রাণের সঙ্গে
দেশের জন্ত পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। ইহারা
সংসারে যে অহিততা লাভ করিয়াছেন,
তাহাও বরেন্দ্রসমাজের সংসারসাধনে প্রয়োগ
করিতে অসমর্থ।

দ্বিতীয়শ্রেণীর শিক্তসম্প্রদায় সম্প্রতি
কার্যক্ষেত্রে ছুটীছুটি করিয়া নানারূপে পদ-
দখ্যাদা বৃদ্ধি করিতে ব্যতিব্যস্ত। রাঙ-
সাথেই হইতে রাজ্য-বাহাদুর পর্য্যন্ত, নিতান্ত-
পক্ষে বাহা-কিছু-একটা না হইলে আর শাস্তি
নাই। ইহারা প্রগল্ভ; না চান এমন
বস্ত্র ভূভারতে দর্শনী স্তরায় ইহারা যে
প্রকৃতপ্রস্তাবে কি চান, তাহার আবিষ্কার-
সাধন বিলম্বণ আশাসমূহা বাপার।

তৃতীয়শ্রেণী সবেমাত্র সংসারধারে
দণ্ডায়মান; এখনও একপদ বিভ্রান্তে, এক-
পদ সংসারে। কখন আশা, কখন বা
নিরাশার বোহাগামান এই সকল শিক্ত
যুবক কেবল বর্ষায়ান্ শিক্ত ব্যক্তিবর্গের
ভার ধনমান উপার্জননের স্বপ্নপ্রেমি বিভোর
হইয়া রহিয়াছেন।

দেশের শিক্তসম্প্রদায় কি চায়, তাহা
বর্ণনায় নির্ভর করা সহজ নহে। ইহাদের

বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ নাই ।
শিক্ষিতসম্প্রদায় 'কি চাও ?' অর্থ—অর্থ—
অর্থ । তাহার মত সমগ্রভাবন্যাপী উচ্চ-
শিক্ষাকেও প্রতিপদে বাধ করিতে প্রস্তুত !
স্বদেশীয়দের পুরাতন আদর্শ এতই পরি-
বর্তিত হইয়া গিয়াছে !

এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসংখ্যক
ব্যক্তি সাহিত্যসেবার নিম্নত্ব হইয়াছেন,
তাঁহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশের কার্য ও
বাক্যের সামঞ্জস্য আবিকারে করা অসম্ভব ।
যে সংগ্রাহক হাতুড়কে প্রকৃতপথের চিহ্নের
উৎসাহযুক্ত করিয়া, সৃষ্টিস্থিত সতপন্থ
নিষ্ঠের লোকসমাজে প্রচার করিবার চক্ৰবর্তন
করে, সেই সংগ্রাহকের অভাবে সাহিত্যসেবক
শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশ রচনাপ্রস
নিত্য বাধ হইয়া পড়িতেছে । অধিকাংশ
রচনা কেবল বাক্যভঙ্গাল পূর্ণীকৃত করিতেছে ।
কাব্যে, নাটকে, উপভাসে, উক্তিহাসে, ধর্মতরে
বা বক্তৃতায় কেবল কথার বাহন ; সার কথা
হুণত । এই সকল কারণে দেশের শিক্ষিত-
সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আশা-
ভরলালুপ হইয়া যায় ; অনিচ্ছাসেবেও আশ-
নাকে 'আশাবাদী' বলতুল করিতে হয় ।

তথাপি উবাণলোকের মত আশার তরুণ-
কিরণ ছুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা একেবারে
তিরোহিত হয় নাই । এখনও তাহার
আশা দীর্ঘরঙ্গমীর অবমানপ্রতীকার প্রভাতী
গাহিয়া, নিদ্রাতুরকে পার্শ্বপরিবর্তনের সমা-
য়তা করিতেছে । সেই আশাই আশা ।
তাঁহাই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের জগত ও প্র-
বেশনার ক্ষর বঙ্গসাম্রাজ্যের তিতর দিয়া
দীপের ফিরা দৃষ্টিয়া উঠিতেছে ।

সকলেরই মূল্য আছে । দাক্ষর্য হইতে
উত্তোলিত ধাতুপিণ্ডের সঙ্গে কত মূল্যহীন
অবজ্ঞনা চিরসংযুক্ত থাকিলেও, তাহা যেমন
মূল্যবান মূলধাতুকে মূল্যহীন করে না ; সংযুক্ত
হইয়াবাক্স সকল শ্রম সফল করিয়া দেয়,—
বর্তমান শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অবজ্ঞা সেই-
রূপ । তাঁহার সকলেই আকরোত্তোলিত
ধাতুপিণ্ড ; সংস্কারের অভাবে ভাসমানের
সংশ্লিষ্টে আপাতত অকর্ণ্য হইয়া পড়িয়া
থাকিলেও, সংযুক্ত হইয়াবাক্স মূল্যবান হইবার
আশা আছে । ছাপরে না পোড়াইলে
সংস্কারসাধনের উপায় নাই । বিশেষের যে
সকল মূল্যহীন অবজ্ঞা সর্বদা অজিত
হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সময়ে দৃঢ় করা
আবশ্যক । বাহিরের অবজ্ঞা দৃঢ় হইবার
সুজাত হইয়াছে । ভিতরের অবজ্ঞার
এখনও অরি সংযুক্ত হইতে বিলম্ব আছে ।
শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চিত্তক্ষেত্র হইতে ভার-
তীয় ভাবগ্রন্থন পদবিদলিত করিয়া, তাহার
স্থলে বিদেশীয় কণ্টকবন সমীকৃত হইয়া
উঠিয়াছে । প্রাচ্য ও 'প্রতীচ্য সভ্যতার
পার্থক্য কোথায়, তাহা এখন বিস্মৃতপ্রায় ।
এখন প্রতীচ্যসভ্যতাই সভ্যতা বলিয়া বীজিত,
—তাঁহার তুলনার প্রাচ্যসভ্যতা পুরাতন
অসভ্যসমাজের সভ্যতাগোত্রের প্রথম চেষ্টার
অপরিস্কৃত ফল বলিয়া উপেক্ষিত । তাহা যে
সমস্তপ্রেরণার পরিপক সভ্যতা, সে কথা কেহ
স্বীকার করিতে সম্মত হইবার পূর্বে, বিচার-
বিতণ্ডার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, দীর্ঘস তর্কে পরি-
শ্রান্ত হইয়া থাকেন ।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আদর্শ একরূপ হইতে
পারে না । বাঙালী সাধেই নহে বলিয়া

যেমন বাঙালীরা বিকল ভাবিয়া উৎকর্ষে
মুক্তিলাভের চেষ্টা করা মস্তিকবিকারের
অসম্ভবত্ব উপস্থিত হইতে পারে, প্রাচ্য
প্রভাচ্য নহে বলিয়া হাহাকার করাও
সেইরূপ। প্রাচ্য ও প্রভাচ্য সভ্যতার
মূলতত্ত্বই প্রবল পার্থক্য। প্রাচ্যসভ্যতা
সাংঘবকেই মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ
বলিয়া "ঘোষণা" করিয়া আসিয়াছে;
প্রভাচ্যসভ্যতা সন্তোষকে তাহার উর্ধ্বে
আনয়ন করিয়া থাকে। প্রভাচ্য
কাড়িয়া যায়; প্রাচ্য বিলাইয়া দিয়াই আপ-
নাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করে। আমাদের
প্রভাচ্যশিক্ষা আমাদেরকে কাড়িয়া খাইবার
লালসা ধান করিয়া অশান্ত করিতেছে;
কাড়িয়া খাইবার মত বাহবল ও স্বাধীনতা
দিলে, আমরাও এতদিনে দানক হইয়া
উঠিতাম।

আমাদের ধর্ম মানবধর্ম, মানবের
ক্রমোন্নতিলাভেই তাহা আঘাত্ত হইয়া
সংকীর্ণাভ করে। সে ধর্মের অমূল্যলন
করিতে হইলে, প্রথমে আপন করিতে হয়;
ভেদবুদ্ধি বিপর্যয় দিতে হয়; নরনারীর
কল্যাণকামনার আপনায় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্তৃত
হইতে হয়। বাহবলে প্রাচ্যসভ্যতা বিস্তৃত
হইতে পারে না। তাহা পাশবধর্ম বলিয়াই
পরিচিত। ব্রাহ্মসানবধর্ম বিস্তার করিবার
জন্ত সর্বভূতের কল্যাণকামনার দীর্ঘতপস্তায়
নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ
যখন উদারনীতির উপদেশ বিতরণ করি-
তেন, তখন জনসমাজ তাহার মর্যাদারক্ষা
করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস অকু-
তাধে লিখিত হইতে পারিত। এখনও

ব্রাহ্মণকে সমাজপতি করিলে, তাহার শাসন
জনসমাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।
তাহার পূর্বে জনসমাজকে প্রাচ্যসভ্যতার
মূলতত্ত্ব নুতন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া
আবশ্যক।

ব্রাহ্মণকে আত্মান করিলেই সকল বর্জ-
ব্যর্থ শেষ হইল না। ব্রাহ্মণের বাক্যপালনের
জন্ত জনসমাজকে হুশি কৃত করাও আবশ্যক।
ব্রাহ্মণ পান্য-মর্ধ্য গ্রহণ করিয়া আসনে
মুগোপবিষ্ট হইয়া যাত্রাই তারারবে ত্রিপিঠ
করিয়া কহিবেন—“তপসা ব্রহ্ম বিমুক্তাসম”;
জনসমাজ তাহাতে কিছুমাত্র উপকার লাভ
করিবে না। কোহুৎসবগত একবার ব্রাহ্ম-
ণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে, পরকণ্ঠেই
তাহার উপদেশবাক্য নিত্য অর্থহীন বলিয়া
সমাগোচর্য করিতে করিতে গৃহকেটিরে
প্রত্যাবর্তন করিবে। সাধুজীবন লাভ
করিবার লালসা স্বাভাবিক হইলেও,
সাধুজীবন লাভ করা আদ্যসাধ্য ব্যাপার।
তাহারই নাম তপস্তা। তাহার আরম্ভেই
বিধিনিষেধের ভীতভাঁড়না, তাহাটাই নাম
সংযম। জনসমাজ কি সে ভাঁড়না সহ্য
করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে? ভারত-
বর্ষের বর্তমান জনসমাজ নিত্য অচেতন
অবস্থায় দিনপাত করিতেছে। চেতনা
থাকিলে, বিচ্কারেই তাহাকে স্বদেশের
দিকে আকর্ষণ করিতে পারিত। স্বদেশ-
শ্রেমিক হওয়া দূরে থাকুক, আমরা সকলেই
অস্বাভাবিকভাবে স্বদেশপ্রোহীণ বাহাতে
ভারতবর্ষের কল্যাণ, তাহা আমাদের দ্বারা
অসম্ভব হয় না; বাহাতে তাহার সমূহ
অকল্যাণ, তাহাই সম্ভব অসম্ভব হইতেছে।

কখন জাতদ্বারে, কখন বা অজাতদ্বারে, আমরা সকলেই তাহার সহায়তাপ্রদান করিতেছি।

ছাত্রজীবন ক্রমশঃ ব্রহ্মচর্য্য হইতে খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে। গার্হস্থ্যজীবন গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ আশ্রম-স্তরী হইয়া উঠিতেছে; এই চই আশ্রম ভিন্ন অস্ত্র আশ্রম একে অপরিত হইয়া না। জননমাত্র আশ্রমচতুষ্টয়ের পিচ্ছায় সমুদ্র হইবে বলিয়াই ব্রাহ্মণ তাহার বাধ্যতা করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়াছে, প্রথম এবং দ্বিতীয় আশ্রম সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ এখন প্রথম আশ্রমে বর্তমান, একবার তাঁহাদের সংস্কারসাধনের চেষ্টার হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেই দেশের দুর্দশা যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বক্ষেত্র দণ্ডায়মান হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের হাব ভাব বিলাস ছাড়িয়া, নগ্নপদে গৈরিকবসনে ব্রহ্মচর্য্যের আনুসংগমলাভার্থ সিংগারেট্ ছাড়িয়া, হস্তীতকী গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না।

তথাপি “নান্যঃ পথো বিনাভেদ্যনামঃ,” —সমুখে অগ্রসর হইবার অস্ত্র পথো বিদ্যমান নাই। নিশিত স্ক্রুধাতের জাতি দুর্গম হই-

লেও, তাহার উপর দিয়াই গমন করিতে হইবে। গাছারা সেই পথের পরিচালক হইয়া, শিককনাদি গ্রহণ করিয়া, ছাত্র-জীবনের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র হৃৎসংকুত না হইলে, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করা বিড়ম্বনা-মাত্র। ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্য হৃৎসংকুত না হইলে, গার্হস্থ্যজীবন কর্তব্যনিষ্ঠ হইবে না। জন-সমাজ এইরূপে সংকুত হইয়া না উঠিলে, ব্রাহ্মণ কদাপি বদেহীসমাজকে সমুদ্রত করিতে সমর্থ হইবেন না। সময় আসিয়াছে কি না, এ বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করা অনাবশ্যক। সময় আসে না; তাহাকে আশ্রয়ণ করিয়া আনিতে হয়। তাহার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। আর কত নিম্নে নিপতিত হইব? এখনও সময় না আসিয়া থাকিলে, তাহা কখনও আসিবে বলিয়া বোধ হয় না। সময় আসিয়াছে। না আসিলে, ব্রাহ্মণের কান্তর-কণ্ঠে একরূপ করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিত না! ব্রাহ্মণ নিম্নিত বদেহীসমাজকে প্রবুদ্ধ হইবার জন্য শঙ্কু-নির্দেশে জল-জল-অন্তরীক কল্পিত করিয়া ডাকিয়াছেন। এখন জনসমাজের সাড়া দিবার সময়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সার সত্যের আলোচনা ।

বিগত ঐশ্বরের শেষভাগে একটি কথা বলা হইয়াছিল “এই যে, “সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধু-কেবল চিন্তাধারা সম্ভাবনীয় নহে। চিন্তাকে নিরোধ করিয়া হনকে প্রশান্ত করিলে কেবলমাত্র ঐশ্বরপ্রদানেই তাহা সম্ভাবনীয়।” সংক্ষেপে এ বাহা বলা হইয়াছিল, ইহার ভিতরে দুইএকটি কথা আছে একপ, বাহার

- তাহারের একটু এদিক্-ওদিক্ হইলে ভ্রম অনিবার্য। এই যে একটি কথা বলা হইয়াছিল যে, “সাক্ষাৎ-উপলব্ধি” শুধু-কেবল চিন্তাধারা সম্ভাবনীয় নহে”, ইহার অর্থ এ নহে যে, সাক্ষাৎ-উপলব্ধির সঙ্গে চিন্তা’র কোনো সম্পর্কই নাই; সম্পর্ক বুঝি “আছে—শব্দরকমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; তাহা যদি না থাকিবে, তবে চিন্তা-যেচারা সাক্ষাৎ-উপলব্ধির আঁচল ধরিয়া রাখিদিন ঘুরিয়া বেড়াইবেই বা কেন, আর, সাক্ষাৎ-উপলব্ধি হইতে দূরে পড়িলে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন করিবার অস্ত
- ব্যত হইবেই বা কেন? চিন্তা কিহু-আর সাক্ষাৎ-উপলব্ধির পর নহে; ঠিক তাহার
- বিপরীত। চিন্তা সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ঘেহের গলনা। তুমি হয় তো বলিবে—“তবে কেন চিন্তাকে নিরোধ করিতে বলিতেছ?” নিরোধ করিতে বলিতেছি এইজন্য—যেহেতু চিন্তা নিত্যস্থই চকলপ্রকৃতি বালিকা। একটি

কটি মেঘে যদি মাতার হস্তের অবলম্বন ছাড়িয়া-দিয়া পক্ষত আরোহণ করিতে যার, তবে পার্শ্ববর্তী হিটৈনী ব্যক্তির কণ্ঠব্য যে, তিনি তুমিতে মেঘটিকে বলপূর্বক টানিয়া-আনিয়া মাতৃক্রোড়ে সমর্পণ করেন। আমি তাই বলিতেছি যে, এণোমেলো পাগলী চিন্তাকে বিপণের কণ্টকবন হইতে বল-পূর্বক টানিয়া-আনিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে সমর্পণ করা শুভাশেষী ব্যক্তির কণ্ঠব্য। টহারট নাম চিত্তকে নিরোধ করা। চিন্তাকে রোধ করিলে চিন্তাকে বধ করা হয় না;—হয় কেবল চিন্তাকে বিপথ হইতে স্থপনে কিরাইয়া আনা; অমূলক কল্পনা এবং অসম্বন্ধ ভ্রমনা’র পথ হইতে বাস্তবিক-সত্যতার পথে কিরাইয়া আনা। এই গেল চিত্ত-নিরোধ। এত-দ্ব্যতীত, বিগত প্রবন্ধে ঐ কথাটির লেজুড় টানিয়া আর-একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, “সুদ-ব্রহ্মাণ্ডের তথ্যালোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; যেহেতু উভয়ে উভয়ের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত।” তুমি হয় তো বলিবে যে, হইতেছে চিন্তা-নিরোধের কথা—নাহে হইতে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আনিয়া তাহার গুরুভার ঐ সুদ ইচ্ছাশ্রিটির স্বর্কে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে কেন?

তাহা যদি বলো—তবে নিঃসঙ্গ পরিধান
কর :—

ছয়টি মন্তব্য কথা।

(১) সত্য আপনাকে প্রকাশ করিবার
জন্ত পাত্র তৈয়ারি করিতেছেন অনবরত।

(২) সে পাত্র মণ্ডব্য, বা কুপ্ত-ব্রহ্মাণ্ড।

(৩) সত্য আপনাকে আপনি থেকে
প্রকাশ করেন, তাহাই সত্য।

(৪) সত্যের হস্ত হইতে টাটকা-টাটকি
সত্য গ্রহণ করা কর্তব্য;—ইহারি নাম
সাক্ষ্য-উপলব্ধি (intuition)।

(৫) তাহা না করিয়া (সত্যের হস্ত
হইতে সাক্ষ্যসম্বন্ধে সত্যগ্রহণ না করিয়া)
চিন্তা খাটাইয়া আপনার বলে সত্য গড়িয়া
ভুলিতে যাওয়া নিতান্তই পাণ্ডুরামি। দেহপে-
গড়িয়া-তোলা সত্য এক প্রকার বাসের কাণী
অথবা ত্রিশছুর স্বর্ণ।

(৬) অতএব চিন্তাকে খামাও-কর-
নাকে খামাও—যাহা কিছু পড়িয়াছ-ভুলি-
য়াছ, সব ভুলিয়া যাও—মনের সমস্ত সংস্কার
ধূইয়া-পুছিয়া মনকে ধ্বংসে পরিণত কর
—মনকে নিঃসঙ্গ সাগরের জাহা প্রাশস্ত
কর—নিবাত-নিষ্কম্প দীপসিখার জ্বালা
একাগ্র এবং দ্বিবিভূত কর—সত্য আপনাকে
আপনি কিরূপে প্রকাশ করেন, তাহারই
প্রতি চাতকের জয়ি চাহিয়া থাক। যাবৎ
পর্যন্ত সত্য আপনার বলে এবং আপনার
রক্ষণে প্রকাশিত না হ'ন—তাবৎপর্যন্ত
তুমি কোনো কথা যুখে উচ্চারণ করিও না;
বলিও না যে, সত্য নিরাকার বা সত্য সাকার
বা সত্য জ্যোতি বা সত্য অন্ধকার, ইত্যাদি।

আপনার একটা পূর্বাঙ্কিত সংস্কার মইয়া
সত্যের সম্মুখে আড়াল হইয়া পড়িয়াও না।
সত্যকে আগে প্রকাশ পাইতে দাও; বরং
প্রকাশ পাইতে দাও; তাহার পরে তৎসম্বন্ধে
তোমার দোহা বিনিময়, তাহা বলিও;
তাহার পূর্বে কোনো প্রকার পুথিপত বিজ্ঞা
ধরয় করিতে যাইও না—কোনো প্রকার
শেখা-কথা তোতাপাখীর মতো আঙড়াইতে
ধাকিও না।

বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অবতারণা।

উপরি-উক্ত-রূপে চিন্তাকে নিরোপ করিলে,
করা হয় এক প্রকার অতলম্পর্শ মহাসাগরে
নিমজ্জন—অনাকাশ এবং অকালের মহা-
সাগরে নিমজ্জন। যেখানে পূর্ণগণ্ডিম,
উত্তরদক্ষিণ, উপরনীচে নাই তৃত্তবিদ্যাৎ-
বর্তমান নাই সেই অকূল মহাসাগরে নিম-
জ্জন। সেই অতলম্পর্শ গভীর অন্ধকারের
মধ্য হইতে—প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে
—যে-এক বিধ-বিধরণী মহতী শক্তি—যে-এক
অটল প্রতিষ্ঠা—যে-এক জ্ঞান—যে-এক
জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তাহাই তুমি
সত্য বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করিবে।
তুমি হয়তো বলিবে—“বেজার কল্পনা!
ভূতগত কল্পনা! এক-তো দেখিতে পাওয়া
যাইতেছে এই যে, আত্ম্যন এবং কালের
অতীত প্রদেশে কল্পনারই কেবল দোড় চলে,
তা তির, কোনো মর্ত্য জীবেরই সেখানে
গতিবিধি নাই; তাহাতে আবার, যদি-বা
কল্পনার কুংকর ভুলিয়া সমস্ত ভাবনা-চিন্তার
পুরপারে অগার শান্তির গন্ধর্ব্বনগর পত্তন
করিবার আশা আমার মনোমধ্যে সন্তোকে

অধুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বাড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই ছপ্ত করিয়া লগাও অন্ধকারের মধ্য হইতে জ্যোতি আগাইয়া-
তুলিয়া আশা স্বেচারিত্রির মস্তকে নির্দাফণ
বস্ত্র নিক্ষেপ করিল। রক্ষা এই যে, সে
আশাও যেমন, আর সে বস্ত্রও তেমনি, দুইই
বাতাস। বাতাসের অস্ত্রের চোট বাতাসের
উপর নিয়মই কপিত হইয়া গিয়াছে ভালই
হইয়াছে; এখন তবে আদি বিদ্যার হই।
ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, “অত বাস্ত
হইও না—একটু হির হও! স্বীকার করিলাম
যে, বাহা-কিছু আমি বলিলাম, সমস্তই আগা-
গোড়া নিছক করিয়া। কিন্তু স্থিতি এবং
আগরণ প্রত্যাহা হা তোমার বসিতেছে, তাহা
কি? তাহাও কি করিয়া? প্রতি রজনীতে
তুমি যে অগাধ প্রশান্তির সাগরগর্ভে, তলাইয়া
বাইতেছ, তাহাও কি করিয়া? আবার,
প্রাতঃকালে যে, সেই অন্ধকারের গভ্র হইতে
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া
পড়িতেছে, তাহাও কি করিয়া? দুয়ের
কোনোটাই যদি করিয়া না হয়, তবে বাহার
অন্ত এত সাধাসাধনা—সাগরে ডুব-দেওয়া-
দ্বিবি—তাহা হাতের কাছে অনাহূত আসিয়া
উপস্থিত; কি? না, পরমাত্মার প্রকাশ—
আশ্রিত-জীবন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এই তো চিন্তা-নিরোধের কথা হইতে
বাজারস্থ করিয়া নিরবচ্ছন্দে সোখা চলিয়া বৃহৎ-
ব্রহ্মাণ্ডের দারোপান্তে আসিয়া পড়িলাম।
এইখানে বাসিয়া-দাঁড়াইয়া নিরলিখিত
সাতটি বিষয় ক্রমশঃ প্রকট হইবে :—

(১) অব্যক্তের অন্ধকারগর্ভ হইতে
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া পড়ে

—এটা কবির করনা নহে, পঞ্চ প্রাত্যহিক
ঘটনা।

(২) যদি কোনো কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
সৃষ্টিবৃত্তান্ত মনে ভাবিতে বা'ন, তবে তিনি
ঐ প্রাত্যহিক ঘটনাটিকেই অনির্দেশ্য অতীত-
কালে চালাইয়া-দিয়া তাহার প্রতি করনার
দূরবীক্ষণ প্রেরণ করেন; এবং তাহাকেই
কাব্যালঙ্কার দিয়া রাজ্যভীত মহানু এবং
হৃদয় করিয়া সাজান—তাহার অধিক
কিছুই করেন না। প্রকৃত কথা এই যে,
প্রণয়ের অন্ধকার অস্থিতির অন্ধকার হইতে
কোনো অংশে বেদীও নহে, কমও নহে।
অস্থিতির অন্ধকারের মধ্য হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
এই যে আশ্রয়ময় প্রকাশ, এ প্রকাশ স্বাভা-
বিক অমলেও যেমন ছিল এখনো তেমনি
রহিয়াছে। পরিমাণবদ্ধ ছোটো-বড় এবং
নাড়াঘটিত কম বেগের কথা এখানে হইতেছে
না। প্রকাশ চিনিস্টা কি এবং অপ্রকাশই
বা চিনিস্টা কি, তাহাই এখানে একমাত্র
প্রষ্টব্য এবং একমাত্র বিষয়।

(৩) বহুপূর্বে বলিয়াছি এবং এখনো
বলিতেছি যে, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ
পরস্পরের প্রতিযোগিতা গুণেই প্রকাশ এবং
অপ্রকাশ। ছবিতোলা যন্ত্রের প্রথম উদ্ভা-
বের আদ্যপাত অন্ধকারের ঘোঁড়া'র মধ্যে
কেমন পরিকাররূপে প্রকাশ পায়! ফটু'টে
আলোকের সমুদ্রে ধরিলে তাহা একেবারেই
অপ্রকাশ হইয়া যায়। প্রকাশের কারণ তবে
কি অন্ধকার বা অপ্রকাশ? ইহার উত্তর এই
যে, আলোকও প্রকাশের ঘোলা-আনা
কারণ নহে, অন্ধকারও প্রকাশের ঘোলা-
আনা কারণ নহে। প্রকাশের ঘোলা-

আনা কারণ হ'লে আলোক এবং অন্ধ-
কারের প্রতিযোগিতা। আলোক কেবল
প্রকাশের আট-আনা কারণ ; অন্ধকারও
তাই।

(৪) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে পাত্ৰো-
পান করিবার প্রথম মুহূর্তে দর্শকের চক্ষু
বাহ্য আবির্ভূত হয়, তাহাতে (১) এপিটে
প্রকাশ, (২) ওপিটে অপ্রকাশ, এবং (৩)
দ্বয়ের মাঝখানে শক্তির সঙ্কোচ-বিস্কোচ
বা স্পন্দন, এই তিনটি ব্যাপার প্র-ব্যাখ্যার্যেসি
করিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হয়। ওপিটের
ঐ যে অপ্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয়নাম তমোগুণ,
এপিটের এই যে প্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয়নাম
সবুগুণ ; মাঝের সেই যে স্পন্দনক্রিয়া,
তাহার শাস্ত্রীয়নাম রজোগুণ। তিন গুণের
সবটী একসঙ্গে ধরিয়া ব্যক্তিবাক্ত প্রকৃতি।

(৫) সমগ্র প্রকৃতিকে আমরা বলিতেছি—
বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড (অর্থাৎ আমরা
প্রতিপন্ন) সেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত ;
এবং পরমাত্মা সেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সার-
সর্ব্বব্যাপী।

(৬) হংসশাবক যেমন অণু হইতে
বাহির হইয়াই নিকটস্থ পুকুরিগীর জলে ঝাঁপ
দিয়া পড়ে, তেমনি, ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড অচেতন-
অন্ধকারের বনিকা ভেদ করিয়া বাহির
হইবামাত্র বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি
উদ্বিগ্ন হয়। এক্ষণ-বে হয়, তাহার কারণ
কি ? কারণ অতীব স্পষ্ট। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড
ক্ষুদ্র—তাহা জ্ঞাতবের আলয় ; বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড
বৃহৎ—তাহাতে কিছুই অভাব নাই। ক্ষুদ্র-
ব্রহ্মাণ্ডের তেজ কিছু অভাব আছে—সমস্তেরই
পূরণ হইতে পারে—পূরণ হওয়া চাই—এবং

পূরণ হইতেছে অনবরত—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের
অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে। কটিছেলের অভাব-
মোচনের জন্য মাতৃকোক্ষে যেমন সমস্ত ভোগ-
সামগ্রী পূর্ণ হইতেই সাজানো রহিয়াছে—
শরনের শর্মা, ক্রীড়ার পোশা, দপনের ঘেহ,
জানের উষ্মঘণী মাড়ুভাষা, সমস্তই পূর্ণ
হইতে সাজানো রহিয়াছে ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের
অভাবমোচনের জন্য বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডেও অবিকল
সেইরূপ। কাজেই স্বর্ঘ্যসূর্যমূলের ভাষা
ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি
সত্যবতই উদ্বিগ্ন।

(৭) আমাদের স্মৃতিশ্রুতিকালে বৃহৎ-ব্রহ্মা-
ণ্ডের সত্তা একচুলও বিলুপ্ত হয় না—পরজ
বোলো-আনা মজুত থাকে। কিন্তু তৎকালে
—না আমাদের সম্মুখে তাহা প্রতিভাত হয়,
না আমাদের অন্তরে তাহা প্রতিভাত হয়।
স্মৃতিশ্রুতিকালে আমাদের আয়তনতাও অন্তরে
প্রতিভাত হয় না এবং বহির্দৃশ্যের সত্তাও সম্মুখে
প্রতিভাত হয় না। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
প্রকাশ যে-মাত্র আমাদের চক্ষুর সন্মুখীন
হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের বাহিরে এবং ভিতরে

উভয়ত্র এপিট-ওপিট ভাবে—সমগ্র বিশ্বের
ব্যাপ্তিক সত্তা প্রকাশমান হইয়া উঠে। এই
যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ইহাকে বধন
এক প্রকাশ, বা এক শক্তি, বা এক সত্তা
বলিয়া সর্বাদীপভাবে গ্রহণ কর। বার, তখন
বুঝিতে পারা যায় স্পষ্ট যে, সে-যে বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ, তাহা চেতনের নিকটে
চেতনের প্রকাশ, আত্মার নিকটে আত্মার
প্রকাশ, জীবাত্মার নিকটে পরমাত্মার
প্রকাশ। যেহেতু প্রকৃতি এবং পরমাত্মার
মধ্যে প্রাচীরের ব্যবধান নাই।

উপরি উক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে, অনেক-
গুলি প্রয়োজনীয় কথা এখনো বলিবার
আছে ;—তাহা ক্রমশ প্রকাশ্য ।

প্রথমে আমি বলিয়াছিলাম “মন হইতে
সত্য সংস্কার এবং ভাবনা-চিন্তা দ্বারা সরাইয়া-
বিয়া সত্যের হস্ত হইতে সত্য গ্রহণ কর—
সত্যের সমুখে আপনি আড়াল হইয়া দাঁড়াইও
না।” এটা আমি বলিয়াছিলাম শুদ্ধকেবল
অমি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি
লক্ষ্য করিয়া । ঐ সোজা কথাটির অর্থ কেহ
যেন এক্ষণ না বোঝেন যে, মনের ঐরূপ
সংস্কারমূলক অবস্থার নামই সত্যের উপলব্ধি ।
তখনই বলিব সত্যের সাক্ষাৎ-উপলব্ধি
হইল, যখন দেখিব যে, সেই তৈয়ারি-করা
অমিতে—পরিকার-পরিচ্ছন্ন, নির্মল এবং
প্রশান্ত অন্তঃকরণে—বাস্তবিকই সত্যের
সাক্ষাৎকার ঘটিল । তুমি হয় তো বলিবে
এই যে, সাধকের নির্মল অন্তঃকরণে পর-
মাত্মার প্রকাশ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার
করেন না ;—পরমাত্মার প্রকাশের সঙ্গে তুমি
যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ জড়িয়া দিতেছ,
সেইটিই হচ্ছে গোলাঘোষণার মূল । এ তো
যেহিঁতেই পাওয়া যাইতেছে যে, পরমাত্মা
স্বয়ং যখন নির্মলচিত্ত সাধকের অন্তঃকরণে
প্রকাশিত হ’ন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঋকৃক
বা না ঋকৃক—সাধকের তাহাতে কিছুই বাহ-
্যে নাই । তা যদি বলো, তবে তাহার
উত্তরে আমি বলি এই যে, পরমাত্মা আপনার
প্রকাশকে দূরে সরাইয়া-রাখিয়া শুধুই কি
আপনার সত্যমাত্র সাধকের অন্তঃকরণে উপো-
দিত করেন, অথবা সত্য, শক্তি এবং প্রকাশ,
তিনই একযোগে উপোদিত করেন ? অবশ্য

বলিতে হইবে যে, পরমাত্মা সাধকের তৈয়ারি-
করা অমিতে—নির্মল অন্তঃকরণে—আপনার
সত্য, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্বাত্মক-
রূপে আবিস্কৃত হ’ন ; কেন না, পরমাত্মার
সত্যমাত্র বিনা-সাধনেই গোচর মনে (মহাব্য-
মাত্রেয়ই মনে) পূর্ণ হইতেই প্রকাশিত রহি-
য়াছে ; তাহার অস্ত নিষ্কারও প্রত্যক্ষ নাই
—শুদ্ধপদেশেরও প্রয়োজন নাই—বুজি-
তর্কেরও প্রয়োজন নাই—সাধনেরও প্রয়ো-
জন নাই—চিত্তুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই ।
কাজেই বলিতে হইবে যে, সমস্ত তৈয়ারি করা
সাধকের নির্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মা আপ-
নার সত্য, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্বাত্ম-
করূপে আবিস্কৃত হ’ন । তবেই হই-
তেছে যে, সাধকের নির্মল অন্তঃকরণে পর-
মাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া আবিস্কৃত হ’ন ;
যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নামই পরমাত্মার প্রকাশ
এবং পরমাত্মার প্রকাশের নামই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ।
অতঃপর বিজ্ঞাত এই যে, পরমাত্মা কি
সাধকের অন্তঃকরণে নূতন কোনো-একটা
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত হ’ন—অথবা
আবহমান-কালের এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—
যাহা আমরা চক্ষের সমুখে দেখিতেছি—
এই চিরন্তন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত
হ’ন ? ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক সাধ-
কের অন্ত নূতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এক-তো
বাড়া’র ভাগ, তা ছাড়া, একই ভাবিয়া দেখি-
লেই প্রতীতমান হইবে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
এক বই দুই হইতে পারে না । বেদের এ
কথা পুঁইই সত্য যে, “বাতাবিকী জ্ঞানবল-
ক্রিয়া চ” —পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া এবং বল-
ক্রিয়া স্বতাবিক ।

বিষয়বস্তুভেদে এই যে প্রকাশ—যাহা
আমরা চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখিতেছি ইহাই
পরমাস্থার “বাস্তবিক জ্ঞানবলক্রিয়ঃ”—ইহা
বাস্তবিক আর একটা নূতন বিষয়বস্তুভেদে কল্পনা
—যেমন বাগের কানী বা ত্রিশছুর স্বর্ণ—
নিভাত্তই অস্বাভাবিক । ইহার বিকল্পে তুমি
হয়তো বলিবে যে, “এ বিষয়বস্তুও অতি ছায়া
পদার্থ;—ইহা পরমাস্থার প্রকাশ নহে—
ইহা পরমাস্থার আবরণ।” তাহা যদি বলা,
তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, “আব-
রণ কাহার নিকটে? বাহ্যিক অস্ত্রকরণ যোহ-
কৃষ্ণাটিকার ঘন আবরণে আবৃত, তাহার
নিকটে সবই আবরণ। পক্ষান্তরে, ইহার
অস্ত্রকরণ কৃষ্ণাটিকানুসৃত, নির্মল, দূর এবং
প্রশান্ত, তাহার নিকটে বিষয়বস্তুভেদে সর্বস্বীয়
প্রকাশ পরমাস্থারই প্রকাশ। এইজন্য বলি-

তেছি যে, অস্ত্রকরণ হইতে সমস্ত পূর্বাভিজিত
সংস্কার এবং ভাবনা-চিত্তা দূর সরাইয়া-দিয়া
অস্ত্রকরণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রশান্ত
কর, এবং এই অস্ত্রাবপূর্ণ কৃষ্ণ-ব্রহ্মাণ্ড আপ-
নার অভ্যন্তরে পূরণকামনায় স্বভাবতই যে
মাতৃমুখের প্রতি উন্মুগ্ন হয়—সেই মাতৃমুখের
দিকে—বিষয়বস্তুভেদে দিকে—অবিদলমনো-
বর্ণণ বাগাইয়া ধর, তাহা হইলেই সেই
এক প্রকাশেই—বিষয়বস্তুভেদে প্রকাশেই
—পরমাস্থার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনেরই
সুগম প্রকাশ হইবে।

এই যে কথাগুলি বলিলাম, ইহার ভিতরে
অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা চাপাচুপি
দেওয়া রহিয়াছে; সেগুলি ভাঙিয়া বলা
আবশ্যক। বারান্তরে তাহার চেষ্টা দেখা
যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড়োদারাজ গায়কবাড়ী ।*

রাগিণী ভূপালি—তাল তেওরা ।†

বঙ্গজননী-মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোচ্ছল আন হে!

অন্ন বড়োদারাজ হে!

শম্ভু, বাজহ বাজ হে

অন্ন নৃপোত্তম পুরুষসত্তম

অন্ন বড়োদারাজ হে!

ভাবিছে শুন বঙ্গবাসী

রাজদর্শন পূণ্য মানি

এসহে নৃপ, এস হে,

ধৃত কর এ দেশ হে!

এস মঙ্গল, এস গৌরব,

এস অক্ষয়কীর্তিসৌরভ,

এস তেজঃস্বৰ্ণা উজ্জল,

নাশ ভারতলাজ হে!

রাজধর্মে পূণ্যকর্মে

লোকহৃদয়ে রাব' হে!

শম্ভু, বাজহ, বাজ হে—

অন্ন নৃপোত্তম, পুরুষসত্তম

অন্ন বড়োদারাজ হে!

* বঙ্গল মাতাওতালবাসী আসোসিদ্ধিশনে বড়োদারাজ গায়কবাড়ীর অভ্যন্তরে রচিত।

† সর্বদা শীর্ণরূপে রক্ষা করিয়া পড়িতে চাইবে।

বহুদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৫১

চন্দ্রমৌহনের কাছে রমেশের খবর পাইয়া অক্ষয়ের মনে অনেকগুলি চিন্তার উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল, “ব্যাপারখানা কি ? রমেশ গাঙ্গিপুরে প্রাক্টিস্ করিতেছিল—এতদিন নিম্নে বখেটে গোপনেই রাখিয়াছিল—ইতিমধ্যে এমন কি ঘটিল, যাহাতে সে সেখানকার প্রাক্টিস্ ছাড়িয়া দিয়া আবার সাহসপূর্ণক কলুটোলার গলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অগ্রদাবাবু যে কাশীতে আছেন, কোন্দিন রমেশ কোথা হইতে সে খবর পাইবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হাজির হইবে।” অক্ষয় স্থির করিল, ইতিমধ্যে গাঙ্গিপুরে গিয়া সে সমস্ত সংবাদ জানিবে এবং তাহার পর একবার কাশীতে অগ্রদাবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসিবে।

একদিন অগ্রদাবাবুর অপরাহ্নে অক্ষয় তাহার ব্যাগ হাতে করিয়া গাঙ্গিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে বাজারে জিজ্ঞাসা করিল, “রমেশবাবু বলিয়া একটি

বাঙালি উকিলের বাসা কোন্‌দিকে ?”—অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাজারে রমেশবাবুমানক কোনো ব্যক্তির উকিল বলিয়া কোনো ব্যক্তি নাই। তখন সে আদালতে গেল। আদালত তখন ভাঙিয়াছে। শাম্‌লা-পত্রা একটি বাঙালি উকিল পাড়িতে উঠিতে বাইতেছেন, তাঁহাকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল—“মশায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরী বলিয়া একটি নূতন বাঙালি উকিল গাঙ্গিপুরে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসা কোথায় জানেন ?” অক্ষয় ইহার কাঁছ হইতে খবর পাইল যে, ‘রমেশ ত এতদিন গুড়ামশাবের বাড়ীতেই ছিল, এখন সে সেখানে আছে, কি কোথাও গেছে, তাহা বলা যায় না। তাহার স্ত্রীকে পাওয়া বাইতেছে না, সম্ভবত তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।’

অক্ষয় গুড়ার বাড়ীতে যাত্রা করিল। পথে বাইতে বাইতে ভাবিতে লাগিল, “এইবার রমেশের চালটা বুঝা বাইতেছে।” স্ত্রী মারা গিয়াছে, এখন সে অসকোচে হেমন্তলিনীর কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার স্ত্রী কোনোকালেই ছিল না। হেমন্তলিনীর

অবস্থা বেকশ, তাহাতে রমেশের কথা অধি-
 যাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে।”
 —তাহার ধর্মমোতি নইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি
 করিয়া বেড়ায়, গোপনে তাহা যা যে কি ভা-
 নক লোক, অক্ষর তাহা মনে মনে আলোচনা
 করিয়া নিজের প্রতি প্রভা অহুভব করিতে
 লাগিল।

খুড়ার কাছে গিয়া তাঁহাকে রমেশের
 ও কমলার কথা দ্বিভাষা করিবারামাত্র তিনি
 লোক সংবরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার
 চোখ দিয়া অল পড়িতে লাগিল। তিনি কহি-
 লেন, “আপনি এখন রমেশবাবুর বিশেষ বন্ধু,
 তখন আমার বা কমলাকে নিশ্চয় আপনি
 আত্মীয়ের মতই জানেন: কিন্তু আমি এ কথা
 বলিতেছি, কয়েকদিনমাত্র তাঁহাকে দেখিয়া
 আমি আমার নিজের কস্তার সহিত তাঁহার
 প্রভেদ কুলিয়া গেছি। হুবিনের জন্ত যারা
 বাড়িইয়া মানসম্মী যে আমাকে এমন বস্তা-
 বাত করিয়া তাগ করিয়া বাইবেন, এ কি
 আমি জানিতাম!”

অক্ষর মুখ র্ত্তান করিয়া কহিল, “এমন
 ঘটনাটা যে কি করিয়া ঘটিল, আমি ত কিছুই
 বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই রমেশ কমলার
 সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নাই।”

খুড়া। আপনি রাগ করিবেন না,—
 আপনাদের রমেশটিকে আমি আর পর্যন্ত
 চিনিতে পারিলাম না। এদিকে বাহিরে ত
 দিয়া লোকটি, কিন্তু মনের মধ্যে কি ভাবেন,
 —কি করেন, বুঝিবার জো নাই। নহিলে
 কমলার মত অমন স্ত্রীকে কি মনে করিয়া
 যে অনাধিক করিতেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া
 যবে না। কমলা এমন সত্য-লক্ষী, আমার

মেরে সঙ্গে তার আপন বোনের মত ভাব
 হইয়াছিল—তবু কখনো একদিনের জন্তও
 নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও কহে
 নাই। আমার মেরে মাঝে মাঝে বুঝিতে
 পারিত যে, সে মনের মধ্যে খুবই কষ্ট পাই-
 তেছে, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত একটি কথা
 বলাইতে পারে নাই। এমন স্ত্রী যে কি
 অসহ্য কষ্ট পাইলে এমন কার করিতে পারে,
 তাহা ত আপনি বুঝিতেই পারেন, সে কথা
 মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। আমার
 আমার এমনি কণাল, আমি তখন এলাহাবাদে
 চলিয়া গিয়াছিলাম, নহিলে কি যা কখনো
 আমাকে ছাড়িয়া বাইতে পারিতেন!

পরদিন প্রাতে খুড়াকে নইয়া অক্ষর
 রমেশের বাংলা ও গঙ্গার তীর ঘুরিয়া
 আসিল। ঘরে ফিরিয়া-আসিয়া কহিল,
 “দেখুন মশায়, কমলা যে গঙ্গার ছবিয়া আক-
 হত্যা করিয়াছে, এ সবকিছু আপনি বস্তটা
 নিঃসংশয় হইয়াছেন, আমি ততটা হইতে
 পারি নাই।”

খুড়া। আপনি কিরূপ মনে করেন?
 অক্ষর। আমার মনে হয়, তিনি গৃহ
 ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন—তাঁহাকে ভালরূপ
 খোঁজ করা উচিত।

খুড়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহি-
 লেন, “আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কথাটা
 নিতান্তই অসম্ভব নহে।”

অক্ষর। নিকটেই কাশীতীর্থ। সেখানে
 আমাদের একটি গরম বন্ধু আছেন—এমনো
 হইতে পারে, কমলা তাঁহাদের কাছে গিয়া
 স্ত্রাস্ত্র লইয়াছে।

খুড়া আশাবিত হইয়া কহিলেন, “কই,

উাহাদের কথা শুনি রমেশবাবু আসাদের
কখনো বলেন নাই । যদি জানিতাম, তবে
কি বোঝ করিতে বাকি রাখিতাম ?”

অক্ষর । তবে একবার চানুন না, আমরা
ছাইলনেই কাশী যাই—পশ্চিম-অঞ্চল আপনায়
সমস্তই জানা শোনা আছে, আপনি ভাল
করিয়া বোঝ করিতে পারিবেন ।

খুড়া এ প্রস্তাবে উৎসাহের সহিত সম্মত
হইলেন । অক্ষর জানিত, তাহার কথা
হেমনলিনী সহজে বিশ্বাস করিবে না, এইজন্য
প্রমাণ্য-সাক্ষীর স্বরূপে খুড়াকে সঙ্গে করিয়া
কাশীতে গেল ।

৫২

সহরের বাহিরে ক্যান্টনমেন্টের অধিকারের
সম্মে কাঁকা আরগার অন্নদাবাবুরা একটি
বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন ।

অন্নদাবাবুরা কাশীতে পৌছিয়াই খবর
পাইলেন, নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমকরীর সামান্য
অরুণাঙ্গী ক্রমে হামোনিয়াতে পীড়াইয়াছে ।
অরুণের উপরেও এই দীর্ঘতে তিনি নিদ্রামিত
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলাইয়া তাহার
অবস্থা এক্ষণ সন্ধ্যায় হইয়া উঠিয়াছে ।

হেমনলিনী তাহার সেবার প্রবৃত্ত হইল ।
তখন তাহার অরুণাঙ্গী বেশি, বৃক্কে বেদনা,
এবং মাকে মাঝে বুদ্ধির ভুল হইতেছে ।

হেয়কে দেখিয়া কহিলেন, “কে ও, বোঁসা
বুড়ি, নলিনের খাওয়া হইয়াছে ? যাও যাও,
ভাড়া কর !”

কয়েকদিন অশ্রান্তভাবে হেম তাহার
সেবা করার পর ক্ষেমকরীর সন্ধ্যায় অবস্থা
কাটিয়া গেল । কিন্তু তখনো তাহার অতি-
শয় দুর্বল অবস্থা । শুচিতা লইয়া অত্যন্ত

বিচার করিতে পথ্যজনপ্রভৃতিসবকে হেম-
নলিনীর সাহায্যে তাহার কোনো কাজে
লাগিল না । ইতিপূর্বে তিনি স্বপাক আহার
করিতেন, এখন নলিনাক্ষের স্বরূপ তাহার পথ্য
প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল এবং আহার
সবকে মাতার সমস্ত সেবা নলিনাক্ষকে বহন
করিতে হইত । ইহাতে ক্ষেমকরী সর্বদা
আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমি
ত মেয়েই হ’ত, কেবল ভোদের কষ্ট দিবার
জন্যই আমার নিষেধের আমাকে বাঁচাইলেন।”

ক্ষেমকরী নিজের সবকে কঠোরতা অব-
লম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চারিদিকে
পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যবিন্যাসের প্রতি
তাঁহার অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল । হেমনলিনী সে
কথা নলিনাক্ষের কাছে হইতে শুনিয়া-
ছিল । এইজন্য সে বিশেষ যত্ন চারিদিক্
পরিপাটি করিয়া এবং ঘরদ্বার সাফাইয়া
রাখিত এবং নিজেও যত্ন করিয়া সাজিয়া
ক্ষেমকরীর কাছে আসিত । অন্নদা ক্যান্টন-
মেন্টে বেবগান ভাড়া করিয়াছিলেন, সেখান
হইতে প্রত্যহ ভুল ভুলিয়া আনিয়া দিতেন,
হেমনলিনী ক্ষেমকরীর রোগশয্যার কাছে
সেই ভুলগুলি নানারকম করিয়া সাজাইয়া
রাখিত ।

নলিনাক্ষ মাতার সেবার জন্য নানী
রাখিতে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু
তাঁহাদের হস্ত হইতে সেবাগ্রহণ করিতে
কোনোমতেই তাহার অভিপ্রায় হইত না ।
অবশ্য, জলতোলা প্রভৃতির জন্য চাকর
রাখিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার একান্ত
নিষেধ কাৰ্য্যকলিতে যেতনভুক্ত কোনো
চাকরের হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারি-

ভেন না। যে হরির মা ছেলেবেলার
তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সে যারা গিয়া
অবধি অতিবড় রোগের সময়েও কোনো
শাসীকে তিনি পাখা করিতে বা গায়ে হাত
বুলাইতে যেন নাই।

সুন্দর ছেলে, সুন্দর যুগ তিনি বড়
ভালবাসিতেন। দশাশ্বেদধাটে প্রাতিঃশ্রান
সারিয়া গথে প্রত্যেক শিবলিকে হুল ও গলা-
লগিয়া বাড়ী দিবার সময় একএকদিন
কোথা হইতে হর ত একটি সুন্দর খোটার
ছেলেকে অথবা কোনো কুটুম্বটে হিন্দুয়ানী
শাস্ত্রকণ্ঠকে বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করি-
তেন। পাড়ার চুটি একটি সুন্দর ছেলেকে
তিনি খেলনা দিয়া, পরশা দিয়া, খাবার দিয়া
বশ করিয়াছিলেন তাহার যখন-তখন
তাহার বাড়ীর সেখানে সেখানে উপস্থব
করিয়া খেলিয়া বেড়াইত ইহাতে তিনি বড়
আনন্দ পাইতেন। তাহার আর একটি
বাস্তিক ছিল; ছোটোখাটো কোনো একটি
সুন্দর জিনিষ দেখিলেই তিনি না কিনিয়া
থাকিতে পারিতেন না। এ সমস্ত তাহার
নিজের কোনো কাগজে লাগিত না;—কিন্তু
কোন জিনিষটিকে পাইলে খুসি হইবে, তাহা
মনে করিয়া উপহার পাঠাইতে তাহার
বিশেষ আনন্দ ছিল। অনেকসময় তাহার
দূর আত্মীয়গণচিত্তেও এইরূপ একটা-
কোনো জিনিষ ডাকবোগে পাইয়া আশ্চর্য
হইয়া বাইত। তাহার একটি বড় আবলু-
কাঠের কালো সিঁদুরের মধ্যে এইরূপ অনা-
বশ্যক সুন্দর সৌরীন জিনিষপত্র, রেশমের
কাপড়চোপড় অনেক সঞ্চিত ছিল। তিনি
মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, নলিনের

যৌ যখন আনিবে, তখন এগুলি সমস্ত
তাহারই হইবে। নলিনের একটি পরশা
সুন্দরী বালিকাও তিনি মনে মনে কল্পনা
করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে তাহার বর উদ্ভল
করিয়া খেলিয়া বেড়াইয়েছে—তাহাকে তিনি
সাম্রাইতেছেন-পরাইতেছেন, এই স্বপ্নচিন্তায়
তাহার অনেক দিনের অনেক অবসর
কাটিয়াছে।

তিনি নিজে তপস্বিনীর মত ছিলেন,—
মানসিকপূজার আর দিন কাটিয়া গেলে
একবেলা ফলহুমিষ্ট বাইগা থাকিতেন,
কিন্তু নিয়মসংঘে নলিনাকের এতটা নিষ্ঠা
তাহার ঠিক মনের মধ্যে ভাল লাগিত না।
তিনি বলিতেন, “পুরুষমানুষের আবার অত
আচারবিচারের বাড়াবাড়ি কেন?” পুরুষ-
মানুষদিগকে তিনি বৃহৎখালকদের মত মনে
করিতেন;—যাওয়াগাওয়া-চালচলনে উহা-
দের পরিমাপবোধ বা কর্তব্যবোধ না
থাকিলে সেটা যেন তিনি সবেহ প্রশ্রয়বৃত্তির
সহিত সঙ্গত মনে করিতেন—অমার সহিত
বলিতেন, “পুরুষমানুষ কঠোরতা করিতে
পারিবে কেন!” অবশ্য, ধর্ম সকলকেই রক্ষা
করিতে হইবে, কিন্তু আচার পুরুষমানুষের
অঙ্গ নহে, ইহাই তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া-
ছিলেন। নলিনাক যদি অস্ত্রান্ত সাধারণ-
পুরুষের মত কিঞ্চিপরিমাণে অবিবেচক
ও বেজাচারী হইত, সতর্কতার মধ্যে কেবল-
মাত্র তাহার পূজার ধরে প্রবেশ এবং অসময়ে
তাঁহাকে স্পর্শকরাটুকু বাচাইয়া চলিত, তাহা
হইলে তিনি খুসি হইতেন।

যামো হইতে যখন সারিয়া উঠিলেন,
কেমতরী দেখিলেন, হেমনলিনী নলিনাকের

উপদেশ অহুসারে নানাপ্রকার নিধন-পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন কি, বৃদ্ধ অন্নদা-বাণুও নলিনাকের সকল কথা গ্রহণ ও অনু-বাক্যের মত বিশেষ প্রজ্ঞা ও উক্তির সহিত অবধান করিয়া শুনিতেছেন ।

ইহাতে ক্ষেমকরীর অত্যন্ত কৌতুক-বোধ হইল । তিনি একদিন হেমনলিনীকে ডাকিয়া দুসিরা কহিলেন, “মা, তোমরা দেখিতেছি, নলিনকে আরো ক্যাপাইয়া তুলিবে । ওর ও সমস্ত পাগলামির কথা তোমরা শোনো কেন ? তোমরা সাধারণ করিয়া হাসিয়া-বেলিয়া আনন্দ-আজ্ঞাদে বেড়াইবে,—তোমাদের কি এখন সাধন করিবার যত্ন ? যদি বল, তুমি কেন বরাবর এই সব লইয়া আছে ? তার একটু কথা আছে । আমার বাপ-মা বড় মিষ্টাবান্ ছিলেন । ছেলেবেলা হইতে আমরা তাই-বোনেরা এই সকল শিক্ষার মধ্যেই মগ্ন হইয়া উঠিয়াছি । এ যদি আমরা ছাড়ি ত আমরাই যেমন কোনো আশ্রয় থাকে না । কিন্তু তোমরা ত সেরকম নয়—তোমা-দের শিক্ষাদীক্ষা ত সমস্তই আমি জানি । তোমরা এ যা-কিছু করিতেছ, এ কেবল জোর করিয়া করিতেছ—তাহাতে লাভ কি মা ! যে বাহা পাইয়াছে, সে তাহাই ভাল করিয়া রক্ষা করিয়া চলুক, আমি ও এই বলি । না না, ও সব কিছু নয়—ও সমস্ত ছাড় । তোমাদের আবার নিরামিষ-বাণ্য কি, বাগ-তপই বা কিসের ! আর নলিনই বা এক-বড় গুরু হইয়া উঠিল কবে ? ও এ সকলের কি জানে ? ও ত সেদিন পর্যন্ত বা-খুসি-তাই করিয়া বেড়াইয়াছে, শাস্ত্রের কথা শুনিবে

একেবারে মারমুগ্ধি ধরিত । আনাকেই খুসি করিবার জন্য এই সীমন্ত আচর্য্য করিল, শেষ-কালে দেখিতেছি, কোন্‌দিন পূরা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইবে । আমি ওকে বরাবর করিয়া বলি, ‘ছেলেবেলা হইতে তোর যা বিশ্বাস ছিল, তুই তাই লইয়াই থাক,—সে ত মন্দ কিছু নয় আমি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অন্তত হইব না ।’ তুমিরা নলিন হাসে—ঐ ওর একটি ঘটাব—সকল কথাই চুপ করিয়া শুনিয়া যার—গাল দিগেও উত্তর করে না ।”

অপরূপে পাঁচটার পর হেমনলিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে এই সমস্ত আলোচনা চলিত । হেমের বোঁপা-বাঁধা ক্ষেমকরীর পছন্দ হইত না । তিনি বলিতেন, “তুমি বৃষ্টি মনে কর মা, আমি নিতাইই সেকেলে, এখনকার কালের ফেশন্‌ কিছুই জানি না । কিন্তু আমি যত্নরকম চুলবাঁধা জানি, এত তোমরাও জান না বাছা । একটি বেশ ভাল স্বেদ পাইয়াছিলাম, সে আমাকে সেলাই শেখাইতে আসিত, সেই সঙ্গে কতরকম চুল-বাঁধাও শিখিয়াছিলাম । সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে রান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত । কি করিব মা, সংস্কার, উহার ভাল-মন্দ জানি না—না করিয়া থাকিতে পারি না । তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁই-ছুঁই করি, কিছু মনে করিও না মা । ওটা মনের দৃগা নয়—ও কেবল একটা অভ্যাস । নলিনদের বাড়ীতে যখন অস্ত্ররূপ মত হইল, হিন্দুগণি ঘুচিয়া গেল, তখন ত আমি অনেক সঙ্গ করিয়াছি, কোনো কথাই বলি নাই—আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি যে, বাহা ভাল বোধ কর—আমি সুখ-মেরেমাছুষ, এত-

কাল বাহা করিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়িতে পারিব না।” বলিতে “বলিতে ক্ষেমকরী চোখের একফোঁটা জল তাড়াতাড়ি ঝাঁপল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

এমনি করিয়া, হেমনলিনীর বোঁপা খুলিয়া-ফেলিয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ লইয়া প্রত্যহ নূতন-নূতন-রকম বিনানি করিতে ক্ষেমকরীর ভারি ভাল লাগিত। এমনো হইয়াছে, তিনি তাহার সেই আব-নুৎকাঠের দিক্‌ক হইতে নিজের পছন্দসই-রঙের কাপড় বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছেন। মনের মত করিয়া সাপ্লাইতে তাহার বড় আনন্দ। প্রায়ই প্রতিদিন হেম-নলিনী তাহার সেলাই আনিয়া ক্ষেমকরীর কাছে দেখাইয়া-লইয়া যাইত—ক্ষেমকরী তাহাকে নূতন-নূতন রকমের সেলাইসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ সমস্তই তাহার স্কাফর সময়কার কাজ ছিল। বাংলা মাসিকপত্র এবং গল্পের বই পড়িতেও উৎসাহ অল্প ছিল না। হেমনলিনীর কাছে বাহা-কিছু বই এবং কাগজ ছিল, সমস্তই সে ক্ষেমকরীর কাছে আনিয়া দিয়াছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধ ও বই সম্বন্ধে ক্ষেমকরীর আলোচনা শুনিয়া হেম আশ্চর্য্য হইয়া যাইত—ইংরাজি না শিখিয়া যে এমন বুড়িবিচারের সহিত চিন্তা করা যায়, হেমের তাহা ধারণাই ছিল না। নলিনাকের মাতার কথা-বার্তা এবং সংস্কার-আচরণ সমস্তটা লইয়া হেমনলিনীকে তাহাকে বড়ই আশ্চর্য্য ব্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। সে বাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই নয়, সমস্তই অপ্রত্যাশিত।

৫৩

ক্ষেমকরী পুনর্বার মত্রে পড়িলেন। এবার-কার জর অমের উপর দিয়া কাটিয়া গেল। সর্কালবেলার নলিনাক প্রণাম করিয়া তাহার পায়ে ধুলা লইবার সময় বলিল, “মা, তোমাকে কিছুকাল রোগীর নিরমে থাকিতে হইবে। চুর্কল শরীরের উপর কঠোরতা সহ্য হয় না।”

ক্ষেমকরী কহিলেন, “আমি রোগীর নিরমে থাকিব, আর তুমিই রোগীর নিরমে থাকিবে। নলিন, তোমার ও সমস্ত আর বেশিদিন চলিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে এবার বিবাহ করিতেই হইবে।”

নলিনাক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমকরী কহিলেন, “দেখ বাছা, আমার এ শরীর আর গড়িবে না—এখন তোমাকে আমি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে মনের স্থখে মরিতে পারিব। আগে মনে করি-তাম, একটি ছোট্ট ছুটু ছুটে বৌ আমার ঘরে আসিবে, আমি তাহাকে নিজের হাতে শিখাইয়া-পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিব, তাহাকে সাপ্লাইয়া-গুলাইয়া মনের স্থখে থাকিব। কিন্তু এবার বামোহর সময় তপবানু আমাকে চৈতন্ত দিয়াছেন। নিজের আত্মর উপরে এতটা বিশ্বাস রাখা চলে না, আমি কবে আছি কবে নাই, তার ঠিকানা কি। একটি ছোটো মেয়েকে তোমার বাড়ির উপর ফেলিয়া গেলে সে আরো বেশি দুর্ভাগ হইবে। তার চেয়ে তোমাদের নিজেদের মতে বড়-বয়সের মেয়েই বিবাহ কর। জরের সময় এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার মাত্রে ঘুম হইত না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, এই

আমার শেষ কাল বাকি আছে—এটট সম্পন্ন করিবার, অপেক্ষাতেই আমাকে বাঁচিতে হইবে, নহিলে আমি শাস্তি পাইব না।”

নলিনাক । আমাদের সঙ্গে মিশ খাইবে, এমন পাজী পাইব কোথায় ?

ক্ষেমকরী কহিলেন,—“জাচ্ছা, সে আমি ঠিক করিয়া তোমাকে বলিব এখন—সেজন্য তোমাকে জাবিতে হইবে না।”

আজ পর্য্যন্ত ক্ষেমকরী অন্নদাবাবুর সমুখে বাহির হন নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রাত্যহিক নিয়মামুসারে বেড়াইতে বেড়াইতে অন্নদাবাবু যখন নলিনাকের বাসার আদিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ক্ষেমকরী অন্নদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন—“আপনার মেয়েটি বড় লম্বী—তাহার পরে আমার বড়ই মেহ পড়িয়াছে। আমার নলিনকে ত আপনারা জানেন, সে ছেলের কোনো দোষ কেহ দিতে পারিবে না—ডাক্তারিতেও তাহার বেশ নাম আছে। আপনার মেয়ের জন্য এমনতর সৰ্ব্ব কি নিম্ন খুঁজিয়া পাইবেন ?”

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“বলেন কি ! এমনতর কথা আশা করিতেও আমার সাহস হয় নাই। নলিনাকের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিবাহ হয়, তবে তার অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে। কিন্তু তিনি কি—”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“নলিন আপত্তি করিবে না। সে এখনকার ছেলের মত নয়, সে আমার কথা মানে। আর, এর মধ্যে পীড়াপীড়ির কথাই বা কি আছে ! আপনার মেয়েটিকে পছন্দ না করিবে কে ?

কিন্তু এই কাজটি আমি অতি শীঘ্রই সারিতে চাই। আমার শরীরের প্রতিজ্ঞ আমি ভাল বুঝিতেছি না।”

সে রাজ্যে অন্নদাবাবু উৎফুল্ল হইয়া বাড়ীতে গেলেন। সেই রাজ্যেই তিনি হেম-নলিনীকে ডাকিয়া কহিলেন—“মা, আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, আমার শরীরও ইদানীং ভাল চলিতেছে না। তোমার একটা স্থিতি না করিয়া বাইতে পারিলে আমার মনে স্থখ নাই। হেম, আমার কাছে লজ্জা করিলে চলিবে না ; তোমার মা নাট, এখন তোমার সমস্ত ভার আমারই উপরে।”

হেমনলিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার শিত্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “মা, তোমার জন্য এমন একটি সৰ্ব্ব অসম্মত আছে যে, মনের আনন্দ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না। আমার কেবলি ভয় হইতেছে, পাছে কোনো বিয় ঘটে। আজ নলিনাকের মা নিজে আমাকে ডাকিয়া তাহার পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।”

হেমনলিনী মুখ লাল করিয়া অত্যন্ত সঙ্কটিত হইয়া কহিল—“বাবা, তুমি কি বল ! না না, এ কখনো হইতেই পারে না।”

নলিনাককে যে কখনো বিবাহ করা বাইতে পারে, এ সম্ভাবনার সন্দেহহীন হেম-নলিনীর মাঝার আসে নাই—হঠাৎ শিত্তার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে লজ্জার-সঙ্কটে অস্থির করিয়া ডুলিল।

অন্নদাবাবু প্রশ্ন করিলেন, “কেন হইতে পারে না ?”

হেমনলিনী কহিল, “নলিনাকবাবু ! এও

কি কখনো হয়।"—একপ উত্তরকে ঠিক বুলি বলা চলে না। কিন্তু কৃত্রিম অপেক্ষা ইহা অনেকগুণে প্রবল।

হেম আর থাকিতে পারিল না—সে বারান্দায় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি একপ বাধার কথা করনাও করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার ধারণা ছিল, নলিনাক্ষের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে হেম মনে মনে খুসিই হইবে। হতবুদ্ধি বৃদ্ধ বিব্র-মুখে কেরোসিনের আলোর দিকে চাহিয়া ক্রীপ্রকৃতির অচিন্তনীয় রহস্য ও হেমনলিনীর অননীর অভাব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেম অনেকক্ষণ বারান্দার অন্ধকারে বসিয়া রহিল। তাহার পরে ঘরের দিকে চাহিয়া তাহার পিতার নিত্য হতাশমুখের ভাব চোখে পড়িতেই তাহার মনে বাঞ্জিল। তাড়াতাড়ি তাহার পিতার চোকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাধার অনুলিপিকালন করিতে করিতে কহিল—“বাবা চল, অনেকক্ষণ বাবার দিরাছে, বাবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল।”

অন্নদাবাবু হতচালিতবৎ উঠিয়া খাবারের আয়গার গেলেন—কিন্তু তাল করিয়া বাইতেই পারিলেন না। হেমনলিনীসবকে সমস্ত দ্ব্যর্থোগ কাটিয়া গেল মনে করিয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হেমনলিনীর দিক হইতেই যে এত-বড় ব্যাঘাত আসিল, ইহাতে তিনি অত্যন্ত দমিয়া গেছেন। আবার তিনি ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে ভাবিলেন, “হেম তবে এখনো রমেশকে ভুলিতে পারে নাই।”

অত্রদিন আহােরের পরেই অন্নদাবাবু শুইতে বাইতেন, আন বারান্দার কাছিসের কেদারার উপরে বসিয়া বাড়ীর বাগানের সমুখবর্তী ক্যান্টনমেন্টের নির্জন রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হেম-নলিনী আদিয়া ত্রিঘরে কহিল, “বাবা, এখানে বড় ঠাণ্ডা, শুইতে চল।”

অন্নদা কহিলেন, “তুমি শুইতে যাও, আমি একটু পরেই বাইতেছি।”

হেমনলিনী চুপ করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার আনিক বাবেই কহিল, “বাবা, তোমার ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না হয় বসিবার ঘরেই চল।”

তখন অন্নদাবাবু চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কিছু না বলিয়া শুইতে গেলেন।

পাছে তাহার কর্তব্যের কতি হয় বলিয়া হেমনলিনী রমেশের কথা মনে মনে আন্দো-লন করিয়া নিদ্রেকে পীড়িত হইতে দেয় না। এজন্য এপর্যন্ত সে নিদ্রের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু শাহির হইতে যখন টান পড়ে, তখন ক্ষতস্থানের সমস্ত বেদনা জাগিয়া উঠে। হেমনলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনটা যে কিভাবে চলিবে, তাহা এপর্যন্ত সে পরিষ্কার কিছুই ভাবিয়া পাইতে-ছিল না—এই কারণেই একটা স্মৃদুৎ কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া অবশেষে নলিনাক্ষকে শুধু মানিয়া তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখন বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার জনের গভীরতম দেশের আশ্রয়স্থল হইতে টানিয়া আনিতে চাহে, তখন সে বৃষ্টিতে পারে, সে বন্ধন কি কঠিন! তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে

আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দিগ্‌গবলে অঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে ।

এই

এবিকে ক্ষেমকরী নলিনাককে ডাকিয়া কহিলেন, “আমি তোমার পাত্রী ঠিক করিয়াছি ।”

নলিনাক একটু হাসিয়া কহিল, “একে-বারে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ ?”

ক্ষেমকরী । তানর ত কি ? আমি কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব ? তা শোন, আমি হেমনলিনীকেই পছন্দ করিয়াছি—অমন মেরে আর পাইব না । রংটা তেমন কর্ণা নয় বটে, কিন্তু—

নলিনাক । মোহাই মা, আমি রং-কর্সার কথা ভাবিতেছি না । কিন্তু হেম-নলিনীর সঙ্গে কেমন করিয়া হইবে ? সে কি কখনো হয় ?

ক্ষেমকরী । ও আবার কি কথা ! না হইব ত কোনো কারণ দেখি না !

নলিনাকের পক্ষে ইহার জবাব বেওয়া বড় সুকল । কিন্তু হেমনলিনী—এতদিন বাহ্যকে কাছে লইয়া অগোচ্রে গুপ্ত মত উপদেশ দিয়া আসিয়াছে—হঠাৎ তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে নলিনাককে খেন লজ্জা আঘাত করিল ।

নলিনাককে চূপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষেমকরী কহিলেন, “এবারে আমি তোমার কোনো আপত্তি শুনিব না । আমার লজ্জা তুমি যে এই বরলে সমস্ত ছাড়িয়া-দিয়া কানি-বাসী হইয়া তপস্কা করিতে থাকিবে, সে আমি আর কিছুতেই সহ্য করিব না । এইবারে

যে দিন শুভদিন আসিবে, সেদিন ফাঁক হাইবে না, এ আমি বলিয়া রাখিতেছি ।”

নলিনাক কিছুক্ষণ শুক থাকিয়া কহিল—“তবে একটা কথা তোমাকে বলি মা । কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি অস্থির হইয়া পড়িবে না । যে ঘটনার কথা বলিতেছি, সে আর নদনশবাস হইয়া গেল, এখন তাহা লইয়া উতলা হইবার কোনো প্রয়োজন নাই । কিন্তু তোমার ঘেরকম যতাব মা, একটা অমরল কাটিয়া গেলেও তাহার ভয়-ভোনা কে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না । এইজন্যই কতদিন তোমাকে বলিব-বলিব করিয়াও বলিতে পারি নাই । আমার গ্রহশাস্তির জন্য বত-খুনি স্বস্তায়ন করাহতে চাও করাইয়ো, কিন্তু অন্যবস্তক মনকে পীড়িত করিবে না ।”

ক্ষেমকরী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, “কি আনি বাছা, কি বলিবে, কিন্তু তোমার তুমিকা শুনিয়া আমার মন আরো অস্থির হয় । যত-দিন পৃথিবীতে আছি, নিজে কে অত করিয়া ঢাকিয়া রাখা চলে না । আমি ত দূরে থাকিতে চাই, কিন্তু মনকে ত খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না ; সে আপনাই বাড়ির উপর আসিয়া পড়ে । তা ভাল হোক মন্দ হোক, বল, তোমার কথাটা শুনি !”

নলিনাক কহিল, “এই মাঝখানে আমি রংপুরে আমার সমস্ত ত্রিনিবন্ধ বিক্রি করিয়া, আমার বাগানবাড়ীটা ভাঙার বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতছিলাম । মাঁড়ার আসিয়া আমার কি বাস্তবিক গেল, মনে করিলাম, যেনে না চড়িয়া নোকা করিয়া কলিকাতা পহাণ্ড আসিব । মাঁড়ার

একখানা বড় দিলী নৌকা ডাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। দুদিনের পথ আসিয়া একটা চরের কাছে নৌকা বাধিয়া স্থান করিতেছি। এমন-সময় হঠাৎ দেখি, আমাদের ভূপেন এক বালুক হাতে করিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই ত সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, 'শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড় শিকারটাই মিলিয়াছে।' সে ঐ দিকেই কোথায় ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট করিতেছিল—তাঁহুতে মকরগল্লমণে বাহির হইয়াছে। অনেক-দিন পরে দেখা, আমাকে ত কোনো-মতেই ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ধোবাপুকুর বশিয়া একটা লাবণ্য একদিন স্নানার্থ তাঁহু পড়িল। বৈকালে আমরা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি—নিতান্তই গওগ্রাম—একটি বৃহৎ ক্ষেত্রের ধারে একটা প্রাচীরদেওয়া চালা-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরের কর্তা উঠানে আমাদের বসিবার জন্য ছুটি মোড়া আনিয়া দিলেন। তখন দাওয়ার উপরে ইকুল চলিতেছে। প্রাইমারি ইকুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ঘরের একটা খুঁটির পারে হই পা তুলিয়া দিয়াছে। নীচে মাটিতে বসিয়া স্টেটহাতে ছেলেরা মহা কোলাহল করিতে করিতে বিভ্রালাভ করিতেছে। বাড়ীর কর্তাটির নাম তারিণী চাটুঘো। ভূপেনের কাছে তিনি তত্ত্ব করিয়া আমার পরিচয় লইলেন। তাঁহুতে কিরিয়া অমসিতে আসিতে ভূপেন বলিল, 'ওহে, তোমার কপাল ভাল—তোমার একটা বিবাহের সুখক আসিতেছে।' আমি বলিলাম, 'সে কিরকম?' ভূপেন কহিল, 'ঐ তারিণী

চাটুঘো লোকটি মহাজনী করে, এত-বড় কপল জগতে নাই। ঐ যে ইকুলটি বাড়ীতে স্থান দিয়াছে, সেজন্য নতুন মাটিতেই আসিলেই নিজেই লোকহিতবিত্তা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করে। কিন্তু ইকুলের পণ্ডিতটাকে কেবলমাত্র বাড়ীতে খাইতে দিয়া রাত দশটা পর্যন্ত জ্বদের হিসাব কসাইয়া লয়, মাইনেটা গবর্ন-মেন্টের সাহায্য এবং ইকুলের বেতন হইতে উঠিয়া যায়। উহার একটি বোনের স্বামি-বিদ্রোহ হইলে পর সে যেখানে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইহারই কাছে আসে। সে তখন গতিহী ছিল। এখানে আসিয়া একটা কস্তা গ্রহণ করিয়া নিতান্ত অচিকিৎসাতেই সে মারা যায়। আর একটি বিধবা বোন ঘর-কমার সমস্ত কাজ করিয়া ঐ রাধিবার খরচ বাঁচাইত, সে এই মেয়েটিকে মারের মত মারুণ করে। মেয়েটি কিছু বড় হইতেই তাহারো মৃত্যু হইল। সেই অবধি যাত্রা ও মানীর দাসত্ব করিয়া অহরহ তৎসনা সহিয়া মেয়েটি বাড়িয়া উঠিতেছে। বিবাহের বয়স যখন হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাখার পাত্র জুটিবে কোথায়? বিশেষত উহার মাথাপকে এখনকার কেহ মানিত না, পিতৃহীন অবস্থায় উহার অন্ন, ইহা লইয়া পাড়ার বোটকর্তার যথেষ্ট সংস্কারকণ করিয়া থাকেন। তারিণী চাটুঘোর অগাধ টাকা আছে লক-লেই জানে, লোকের ইচ্ছা, এই মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে কস্তাসংকে বোটা দিয়া উহাকে বেশ একটু দোহন করিয়া লয়। ও ত আর চারবছর ধরিয়া এই মেয়েটির বয়স দশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। অন্তএব, হিসাবমত তার বয়স এখন অস্তুত

একবার না বড় দিলী নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। দুদিনের পরে আসিয়া একটা চরের কাছে নৌকা বাধিয়া মান করিতেছি। এমন-সময় হঠাৎ দেখি, আমাদের ভূপেন এক বন্ধু হাতে করিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই ত সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, 'শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড় শিকারটাই মিলিয়াছে।' সে ঐ দিকেই কোথায় ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট করিতেছিল—তাঁরূতে মফস্বলভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অনেক-দিন পরে দেখা, আমাকে ত কোনো-মতেই ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে গুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। খোবাপুকুর বলিয়া একটা জায়গায় একদিন স্নানার্থে তাঁর পড়িল। বৈকালে আমরা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি—নিতান্তই গণ্ডগ্রাম—একটি বৃহৎ ক্ষেত্রের ধারে একটা প্রাচীর দেওয়া চালা-ঘরের মধ্যে চুকিয়া পড়িলাম। ঘরের কর্তা উঠানে আমাদের বসিবার জন্য দুটি মোড়া আসিয়া দিলেন। তখন দাওয়ার উপরে ইকুল চলিতেছে। প্রাইমারি ইকুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ঘরের একটা খুঁটির গারে গুই পা তুলিয়া দিয়াছে। নীচে মাটিতে বসিয়া স্টেটহাউসে ছেলেরা মধ্য কোলাহল করিতে করিতে বিভ্রালাভ করিতেছে। বাড়ীর কর্তাদের নাম তারিণী চাট্টো। ভূপেনের কাছে তিনি তর তর করিয়া আমার পরিচয় লইলেন। তাঁরূতে কিরিয়া অঙ্গিতে আসিতে ভূপেন বলিল, 'ওহে, তোমার কপাল ভাল—তোমার একটা বিবাহের সুবন্ধ আসিতেছে।' আমি বলিলাম, 'সে কিরকম?' ভূপেন কহিল, 'ঐ তারিণী

চাট্টো লোকটি মহাত্মী করে, এত-বড় কপাল অঙ্গতে নাই। ঐ যে ইকুলটি বাড়ীতে স্থান দিয়াছে, সেজন্য নতুন ম্যাট্রিষ্টেই আসিলেই নিজের লোক হিঁটখিতা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করে। কিন্তু ইকুলের পণ্ডিতটাকে কেবলমাত্র বাড়ীতে খাইতে দিয়া রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের হিসাব কসাইয়া লয়, মাইনেটা গবর্মেণ্টের সাহায্য এবং ইকুলের বেতন হইতে উত্তীরা যায়। উহার একটি বোনের স্বামি-বিবাহ হইলে পর সে যেচোরা কোথাও আগ্রহ না পাইয়া ইহারই কাছে আসে। সে তখন প্রতিষ্ঠা ছিল। এখানে আসিয়া একটা কল্যাণ প্রদান করিয়া নিতান্ত অচিরকালেই সে মারা যায়। আর একটি বিধবা বোন ঘর-কল্যাণ সমস্ত কাজ করিয়া ঐ রাখিবার খরচ বাঁচাইত, সে এই মেয়েটিকে মায়ের মত মাতুষ করে। মেয়েটি কিছু বড় হইতেই তাহারো মৃত্যু হইল। সেই অবধি মাঝা ও মামীর দাসত্ব করিয়া অহরহ ভৎসনা সহিয়া যেহেতু বাড়িয়া উঠিতেছে। বিবাহের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাথার পাঁচ ছুটিবে কোথায়? বিশেষতঃ উহার মাঝাকাকে এখনকার কেহ মানিত না, পিতৃহীন অবস্থায় উহার অন্ন, ইহা লইয়া পাড়ার বোটকর্তার যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তারিণী চাট্টোর অগাধ টাকা আছে নক-সেই জানে, লোকের ইচ্ছা, এই মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে কল্যাণবন্ধে বোটা দিয়া উহাকে বেশ একটু দোহন করিয়া লয়। ও ত আদ্য চারবছর ধরিয়া এই মেয়েটির বয়স দশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। স্ত্রীত্ব, হিসাবমত তার বয়স এখন অন্তত

চৌক হইবে। কিন্তু যাঁট বল, মেয়েটি নামেও কমলা,—সকল বিষয়েই একেবারে লক্ষীর প্রতিমা। এমন লক্ষীর মেয়ে আমি ত দেখি নাই। এ গ্রামে বিদেশের কোনো ব্রাহ্মণের উপস্থিত হইলেই তাক্ষণিক হাক বিবাহের জন্ত হাতে-পায়ে ধরে। যদি-বা কেহ রাজি হয়, গ্রামের লোকে ভাংচিৎ বিদ্যা ত্যাগ। অতএব এখানে নিশ্চয় তোমার পালা।’ জান ত না, আমার মনের অবস্থাটা তখন একরকম ‘মরিয়া’ গোছের ছিল—আমি কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, ‘এ মেয়েটিকে আমিই বিবাহ করিব।’ ইহার পূর্বেই আমি স্থির করিয়াছিলাম, একটি হিন্দুঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া আমি তোমাকে চমৎকৃত করিয়া দিব। আমি জানিতাম, বড়-বয়সের ব্রাহ্মণেরে আমাদের এ ঘরে আনিলে তাহাতে সকল পক্ষই অসুখী হইবে। ভূপেন ত একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে বলিল, ‘কি বল!’ আমি বলিলাম, ‘বলা-বলি নয়, আমি একেবারেই মন স্থির করিয়াছি।’—ভূপেন কঠিল, ‘পাকা!’ আমি কহিলাম, ‘পাকা!’ সেই সন্ধ্যাবেলাতেই স্বয়ং তারিণী চাটুযো আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হাতে পৈতা জড়াইয়া ঘোড়হাত করিয়া কহিলেন, ‘আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। ত্রুণেটি বচকে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় ত অস্ত্র কথা—কিন্তু শত্রুপক্ষের কথা গুনিবেন না।’ আমি বলিলাম, ‘দেখিবার দরকার নাই, দিন স্থির করুন।’ তারিণী কহিলেন, ‘পত্নী দিন ভাল আছে, পত্নী হইয়া থাক!’ তাড়াতাড়ির ঘোড়াই দিয়া বিবাহে যথাসাধ্য খরচ বাচাইবার

ইচ্ছা তাঁহার ছিল। বিবাহ ত হইয়া গেল।’

ক্ষেমকরী চম্ভিয়া-উঠিয়া কহিলেন—
“বিবাহ হইয়া গেল—বল কি, নলিন!”

নলিনাক। হাঁ, হইয়া গেল। বধু লইয়া নৌকাতেও উঠিলাম। যেদিন বৈকালে উঠিলাম, সেইদিনই ঘট-দ্বয়ের দ্বাধে সূর্যাস্তের একদণ্ড পরে হঠাৎ সেই অকালে ফাটনমাসে কোথা হইতে অত্যন্ত গরম একটা দৃশ্যবাতাস আসিয়া এক মুহূর্তে আমাদের নৌকা উল্টাইয়া কি করিয়া বিল, কিছু গেল বোকা গেল না।

ক্ষেমকরী বলিলেন, “বধুবন!” তাঁহার সর্পলগ্নীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নলিনাক। ক্ষণকাল পরে বধন বৃদ্ধি করিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি নদীতে একদ্বারগার সাতার দিতেছি, কিন্তু নিকটে কোনো নৌকা বা দ্বারোহীর কোনো চিহ্ন নাই। পুলিসে বর দিয়া পৌর অনেক করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না।

ক্ষেমকরী পাণ্ডুবর্ণ মুখ করিয়া কহিলেন, “বাকু, বা হইয়া গেছে তা গেছে, ও কথা আমার কাছে আর কখনো বলিস্ নে—হেন করিতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে।”

নলিনাক। এ কথা আমি কোনো-দিনই তোমার কাছে বলিতাম না, কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া তুমি নিতান্তই ভেদ করিতেছ বলিয়াই বলিতে হইল।

ক্ষেমকরী কহিলেন, “একবার একটা চর্যটনা ঘটয়াছিল বলিয়া তুই ইহজীবনে কখনো বিবাহই করিবি না?”

নলিনাক কহিল, “গেজ্ঞ নর মা, যদি সে মেয়ে বাঁচিয়া থাকে !”*

ক্ষেমকরী। পাগল হইয়াছিস্ ? বাঁচিয়া থাকিলে তোকে খবর দিত না ?

নলিনাক। আমার খবর সে কি জানে !

আমার চেয়ে অপরিচিত তাহার কাছে কে আছে ! বোধ হয় সে আমার খুঁও দেখে নাই। কাশীতে আসিয়া তারিণী চাটুয্যোকে আমার ঠিকানা জানাইয়াছি—তিনিও কমলার কোনো বোত পান নাই বলিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন।

ক্ষেমকরী। তবে আবার কি !

নলিনাক। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি, পুরা একটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে তাহার মৃত্যু স্থির করিব।

ক্ষেমকরী। তোমার সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি ! আবার একবৎসর অপেক্ষা করা কিসের ভক্ত ?

নলিনাক। মা, একবৎসরের আর দেরিই বা কিসের ! এখন জ্ঞান ; পৌষে বিবাহ হইতে পারিবে না—তাহার পরে মাঘটা কাটাইয়া ফাঙ্কন।

ক্ষেমকরী। আজ্ঞা বেশ ! কিন্তু পাণ্ডী ঠিক রহিল। হেমনলিনীর বাপকে আমি কথা দিয়াছি।

নলিনাক কহিল “মা, মাহু ত কেবল কথাটুকুমান্নই দিতে পারবে, সে কথার সকলতা দেওয়া তাহার হাতে, তাহারই প্রতি নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিব।”*

ক্ষেমকরী। বাই হোক বাহা, তোমার এই ব্যাপারটা শুনিয়া এখনো আমার পা কাঁপিতেছে।

নলিনাক। সে ত আমি জানি না, তোমার এই মন স্থির হইতে অনেকদিন লাগিবে। তোমার মনটা একবার একটু নড়ি পাইলেই তাহার আশোজন কিছুতেই আর ধামিতে চার না। সেইজন্যই ত মা, তোমাকে এরকম সব খবর দিচ্ছেই চাই না।

ক্ষেমকরী। ভালই কর বাহা—আজ-কাল আমার কি হইয়াছে আমি না,—একটা মন-কিছু শুনিলেই তার ভয় কিছুতেই ঘোচে না। আমার একটা ডাকের চিঠি খুলিতে ভয় করে,—পাছে তাহাতে কোনো কুসংবাদ থাকে। আমিও ত তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি, আমাকে কোনো খবর দিবার কোনো দরকার নাই ;—আমি ত মনে করি, এ সংসারে আমি মরিয়াই গেছি, এখানকার আশাত আমার উপরে আর কেন।

রামায়ণের রচনাকাল ।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ।

“যেন যোতা গিরঃ পুংসঃ বিমলৈঃ শবদাভিঃ ।

তমচ্চান্দ্রাবনঃ তিরঃ তপৈঃ পানিনে নমঃ ॥”

গঙ্গারদেবের পালাতুরা-গ্রামে পাণিনির জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী। তিনি “অষ্টাধ্যায়ী” নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিক অল্প কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিওন্-ৎসান ভারতভ্রমণে নিযুক্ত হইবার সময় পর্য্যন্তও পালাতুরায় পাণিনির প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।* এখন তাঁহার চিরস্মরণীয় নাম ও জীবনবিখ্যাত ব্যাকরণ তির অল্প কোন পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। পাণিনি কোন্ সময়ে প্রোদ্বর্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও, পুং-পুন্।* পাণিনির আবির্ভাবকালনির্ণয়ের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া, নানা মতভেদের স্রষ্টা করিয়াছে। প্রকৃতপ্রত্যয়ে পাণিনি কোন্ পুরাকালের ধ্বি, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়াই, অসুমানমূলক

আবির্ভাবকালনির্ণয়ের আড়ম্বর অধিক হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে পারিলে, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-সকলনের সুবিধা হইতে পারে; অল্পখা সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস সকলন করা অসম্ভব বলিলেও অত্যাশঙ্কিত হয় না। পাণিনি-স্বত্রে পুরাতন সাহিত্যের নানা প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; পরবর্ত্তী সংস্কৃত-সাহিত্যের সকল যুগেই পাণিনীর প্রভাব অস্বাভাবিকমাত্রার দেদীপমান। সুতরাং সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসরচনার হতক্ষেপ করিয়া, সকলেই পাণিনির আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বোক্ষমূল্য, ওয়েবের প্রতিষ্ঠা স্বনামগ্যাত পশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গ পাণিনির যে আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন, পাণিনি তাহা অপেক্ষাও পুরাকালের ধ্বি। অধ্যাপক বোল্ডউইকর সে কথা স্মৃষ্টাকরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

পাণিনি কোন্ সময়ে প্রোদ্বর্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও,

* Beal's Buddhist Records of the Western World.

† That Sanskrita philology should not yet possess the means of ascertaining the date of Panini's life, is, no doubt, a serious impediment to any research concerning the chronology of ancient Hindu works. For Panini's grammar is the centre of a vast and important branch of the ancient literature. No work has struck deeper roots than his in the soil of the scientific development of India. It is the standard of accuracy of speech,—the grammatical basis of the Vaidik commentaries. It is appealed to by every scientific writer whenever he meets with a linguistic

তিনি কোন্ সময়ের পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা মোটামুটি নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এই ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, পানিনিকে শাক্যসিংহের আবির্ভাবের বহুপূর্বকালবর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সে কোন্ পুরাকালের কথা, তাহা কে বলিতে পারে? অতুমানমূলে তাহার সীমানির্দেশ করিবার উপায় নাই।

পানিনির সময় পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্য ও ব্যাকরণ সংকৃতভাষাকে অনুল্লভ করিত, তাহা অবলম্বন করিয়াই পানিনিহুত্র সকলিত হইয়াছিল। উত্তরকালে অস্ত্রাজ পুরাতন ব্যাকরণ বিলুপ্ত হইয়া পানিনি-ব্যাকরণের প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গুণ না থাকিলে, একপ্র ঘটনা সংঘটিত হইত না। কোন্ গুণে পানিনিহুত্র দেশকাল ভিন্ন করিয়া অস্ত্রাপি বর্তমান রহিয়াছে? কোন্ গুণে পুনঃপুন পরীক্ষিত ও সমালোচিত হইয়াও, পানিনিহুত্র আশ্রয়গোচর রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে তাহার শব্দানুশাসনপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করাই প্রধান গুণ। ইহারই নাম প্রকৃত ব্যাকরণ—এইভাবেই শব্দের ‘ব্যাকার’ বা ব্যুৎপত্তি

নির্দেশ করিতে হয়। এই গুণে পানিনি-হুত্র নানা ঐতিহাসিক ভূপের আধার হইয়া, ভারতীয় অর্থাঃসভ্যতার অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পুরাকাল হইতেই পানিনিহুত্রের বিবিধ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ করে। তন্মধ্যে কোন্ গ্রন্থ প্রথম, তাহা নির্ণয় করিবার প্রমাণ বা পাইয়া অনেক কাতারনের ‘মহাবার্ভিক’ নামক সমালোচনাকেই প্রথম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। কাতারনের ‘মহাবার্ভিক’ পানিনিহুত্রের বৃত্তি বা ব্যাখ্যাপুস্তক নহে। ঐ গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও, বার্ভিকহুত্র-গুলি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বৃত্তিতে পাণ্ডা যায়,—যে সকল হুত্রে ‘বার্ভিক’ সংযোগের প্রয়োজন অগ্রহৃত হইয়াছিল, কাতারন কেবল তাহারই সমালোচনা করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি আবার সেই সকল ‘বার্ভিকের’ সমালোচনা উপলক্ষে ‘ভাবা’ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ‘মহাভাব্যো’ আভ্যন্ত সমগ্র পানিনিহুত্রের ভাবা বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ হইয়া নাই। এই কথা স্বরণ না করিয়া অধ্যাপক-ওয়েবের গ্রন্থ

difficulty. Besides the inspired seers of the works which are the root of Hindu belief, Panini is the only one, among those authors of scientific works who may be looked upon as real personages, who is a *Rishi* in the proper sense of the word,—an author supposed to have had the foundation of his work revealed to him by a divinity. Yet, however we may regret the necessity of leaving this important personage in the chaos which envelopes the historical existence of all ancient Hindu celebrities, it is better to acknowledge this necessity than attach faith to a date devoid of real substance and resting on no trustworthy testimony.—Goldstucker's PANINI, p. 87—89.

কতিপয় পান্ধাতাপণ্ডিত 'বাহ্লিক' ও 'ভাষ্য'-
হীন পানিনিহৃত্তকে প্রসিদ্ধ বলিতেও ইত-
তত করেন নাই । তাঁহারা আবার কাত্যা-
য়ন ও পতঞ্জলির কোন কোন উক্তি-কে
পানিনির উক্তি বলিয়াও ভ্রমে পতিত
হইয়াছেন । তিনজন, তিন সময়ের বৈদ্যা-
করণ ; তিনজন ভাষার তিন অবস্থা বর্ণন
করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনজনের লেখার
তিনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই কথা
স্মরণ রাখিয়া, 'ত্রিভুনি-ব্যাকরণের' আলো-
চনা করিলে, সংস্কৃতদাহিত্যের ইতিহাস-
সভলনের এক্ষত পণ আবিষ্কৃত হইতে পারে ।
সে পথ বহনই আবিষ্কৃত হউক, অধ্যাপক
গোল্ডষ্ট্রুকেরকেই তাহার নেতা বলিয়া সাধু-
বাদ প্রদান করিতে হইবে । পান্ধাত্য
পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তাঁহারই পানিনিদেবা
সার্থক হইয়াছে । মোক্ষমূলর পদে পদে
ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন ; অধ্যাপক
ওয়েবর মহাভাষা অধ্যয়ন না করিয়াই,
পানিনির আবির্ভাবকালনির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া-
ছিলেন ।* ঐর্জগাক্ষমে তাঁহাদের বতামত
নইয়াই আমরা বতাক হইয়া উঠিতেছি ।

কাত্যায়নের 'মহাবাহ্লিক' ব্যাক্ট্রী নামক
একজন পূর্ববর্তী বৈদ্যাকরণের নাম প্রাপ্ত
হওয়া যায় । তাঁহার গ্রন্থের নাম 'সংগ্রহ',
তাঁহা লক্ষনোক্তনিবৃত্ত ব্যাকরণ । পানিনির
পরে ও কাত্যায়নের পূর্বে ব্যাক্ট্রীর 'সংগ্রহ'

রচিত হইয়াছিল । ব্যাক্ট্রী কে, পতঞ্জলি তাহার
পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন । তিনি
ব্যাক্ট্রীকে 'দাক্ষায়ণ' বলার, পানিনির সহিত
ব্যাক্ট্রীর সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ; ব্যাক্ট্রী যে
পানিনির পরবর্তী, তাহাও বৃষ্টিত পারা
বাইতেছে ।

ব্যাক্ট্রীর নাম সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রে অপরি-
চিত নহে । 'লুকপ্রাতিশাখো' ব্যাক্ট্রীর
নাম পুনঃপুন উল্লিখিত আছে । পতঞ্জলিও
ব্যাক্ট্রীর নাম অনেকবার উল্লেখ করিয়া
গিয়াছেন ।

উভপ্রাগৌ কর্ণনি ২।৩।৩৩।

এই বৃহের বিচারে, পতঞ্জলি উদাহরণ-
প্রযোগে 'সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া
তাঁহার রচয়িতাকে 'দাক্ষায়ণ' বলিয়া পরি-
চয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন । যথা :—

"শেতনা যৎ দাক্ষায়ণন্ত সংগ্রহত কৃতিঃ ।"

"শেতনা যৎ দাক্ষায়ণে নংগ্রহত কৃতিবিত্তি ।"

দাক্ট্রীর অধস্তন তৃতীয়পুরুষ দাক্ষায়ণ-
নামে কথিত হইতে পারেন ;—পানিনি-
হুত্রামুসারে তাহাই দাক্ষায়ণশব্দের ব্যুৎপত্তি ।
তৃতীয় হইতে অধস্তন অন্তান্ত ব্যক্তিগণও
দাক্ষায়ণনামে পরিচিত হইতে পারেন ;
প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষের পক্ষে এই নাম
ব্যবহৃত হইতে পারে না । সুতরাং সংগ্রহ-
কার দাক্ষায়ণ পানিনির বংশে তাঁহার পৌত্র
বা তাঁহার অধস্তন পুরুষ । দাক্ষায়ণ বংশা-

* অধ্যাপক মোক্ষমূলর অনেকস্থলে পানিনিহৃত্ত উদ্ধৃত করিতে গিয়া সংখ্যাগতও ভুল করিয়াছেন ; অনেক-
স্থলে বাখ্যা করিতে গিয়া, পূর্বার্থ ভুলবশত করিতে না পারিয়া, বিকৃত বাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন । অধ্যাপক ওয়েবর
শ্রষ্টাই বীদার করিয়া গিয়াছেন,—তিনি আদ্যন্ত মহাভাষা অধ্যয়ন করেন নাই । এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া,
অধ্যাপক গোল্ডষ্ট্রুকের তাহার 'পানিনি' গ্রন্থকে উভয়কেই ত্রিভুত্ব করিয়া গিয়াছেন । কোন গ্রন্থের আদ্যন্ত
অধ্যয়ন না করিয়া সমস্তোক্তোক্ত প্রাপ্ত হওয়া দুইত। ত্রিভুত্বও, অধুনিক সাহিত্যের অনেক দুইত।র ক্ষমতা দেখিতে
পাওয়া যায় না । তাঁহা পরবর্ত্তী আধুনিকশাস্ত্র প্রদান যোগ্য ভাষ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে ।

মুখারী নাম ; বাটিকগত নাম ব্যাটী । হুতরং
পাণিনির পর ব্যাটী এবং ব্যাটীর পর
কাত্যায়ন ;—এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় ।
পাণিনির কত পুরে ব্যাটী এবং ব্যাটীর কত
পরে কাত্যায়ন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায়
না থাকায়, অনুমানমূলে কোনরূপ কাল-
নির্দেশ করা নিতান্ত অসম্ভব । এই প্রমাণে
কাত্যায়ন পাণিনির পরকালবর্তী বৈয়াকরণ
বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা গেল,—ইহাই
পরম সত্য । পাণিনির কতকাল পরে কাত্যা-
য়ন প্রাক্কৃত হইরাছিলেন, তাহা নির্ণয়ের
অল্প অল্প প্রমাণের আলোচনা করা আব-
শ্যক । বাটিকহুত্রে সেরূপ প্রমাণের অভাব
নাই ।

পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্বে
অনেক অভিনব সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল ;
ভাষার অবগত ও নানাক্রমে পরিবর্তিত হইতে
আরম্ভ করিয়াছিল । তৎকাল কাত্যায়ন পাণিনি-
হুত্রে নানাব্যবহারে বাটিক সংযোগ করিয়া,
পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব ভাষার শব্দা-
শাসনের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়া
গিয়াছেন । দৃষ্টান্ত লইয়া বিচার করিলে,
এই সিদ্ধান্ত অধিকাংশস্থলে বাটিকসংযোগের
প্রয়োজন প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে ।

অরগ্যমহুত্রে । ৪।২।১২৮.

এই হুত্রে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, নানা
তথ্য প্রকাশিত হইবে । অরগ্যশব্দ হইতে
আরগ্য ও আরগ্যক—এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন
হইয়াছে । ‘বৃক্’প্রত্যয়ে ‘আরগ্যক’-
শব্দের উৎপত্তি । একটি বিশেষ-অর্থ-জ্ঞাপ-
নার্থ অরগ্যশব্দে ‘বৃক্’প্রত্যয় হইত বলিয়া
পাণিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । সে অর্থ

কি, তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য হুত্রে
‘মহুবা’শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার
অর্থ এই যে,—অরগ্যবাণী ‘মহুবা’ বুঝাইতে
হইলে, ‘আরগ্য মহুবা’ বলিলে চলিবে না,
‘আরগ্যক-মহুবা’ বলিতে হইবে ; অর্থাৎ
‘আরগ্যক’ বলিলে, মহুবা বুঝাইবে :—
আর কিছু বুঝাইবে না । পাণিনির সময়ে
যে সাহিত্য বর্তমান ছিল, তাহাতে
‘আরগ্যক’ বলিতে মহুবা ভিন্ন আর কিছু
বুঝাইত কি না, তাহার প্রমাণাভাব । কাত্যা-
য়নের সময়ে ‘আরগ্যক’ বলিতে, মহুবা ভিন্ন
আরও নানা অর্থ প্রতিপাত হইত । ...তাহার
সময়ে আরগ্য পপ, আরগ্য অধ্যায়, আরগ্য
ক্রম, আরগ্য বিহার ও আরগ্য হস্তী বলিবার
নিয়ম ছিল না । ঐ সকল হলেও ‘আরগ্যক’-
শব্দ ব্যবহার করিতে হইত । ‘গোমহু’-অর্থে
আরগ্য ও আরগ্যক শব্দ তুল্যভাবে প্রযুক্ত
হইতে পারিত । এতদ্ব্যতীত অল্প অল্প অর্থে
আরগ্যশব্দই প্রযুক্ত হইত । এই পার্থক্য-
সূচনার্থ কাত্যায়ন বাটিকহুত্রে অবতারণা
করিতে বাধ্য হইরাছিলেন । যথা :—

“পথাধ্যায়ভারবিচারমহুবাভিধিতি বক্তব্যম্ ।” ১ ।

“বা গোমহুত্বে” ২ ।

‘আরগ্যক’শব্দ পাণিনির সময়ে এতগুলি
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইবার নিয়ম থাকিলে,
তিনি কেবল মহুবা-অর্থেই ‘আরগ্যক’শব্দের
প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিতেন না । পাণিনির
জ্ঞান স্বস্বাভিমান-বিচারনিপুণ বিশেষজ্ঞ
বৈয়াকরণের পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা বা অনব-
ধানতা স্বীকার করা অসম্ভব । অধ্যাপক
গোলুড়ট্টকর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া,
এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন ।

হুয়ারী নাম ; বাটিকগত নাম ব্যাটী । সুতরাং পাণিনির পর ব্যাটী এবং ব্যাটীর পর কাত্যায়ন ; এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় । পাণিনির কত পুরে ব্যাটী এবং ব্যাটীর কত পরে কাত্যায়ন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকায়, অনুমানমূলে কোনরূপ কাল-নির্দেশ করা নিতান্ত অসম্ভব । এই প্রমাণে কাত্যায়ন পাণিনির পরকালবর্তী বৈয়াকরণ বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা গেল,—ইহাই পরম লাভ । পাণিনির কতকাল পরে কাত্যায়ন প্রাচুর্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয়ের অল্প অল্পতঃ প্রমাণের আলোচনা করা আবশ্যিক । বাটিকহুত্রে সেক্ষণ প্রমাণের অভাব নাই ।

পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্বে অনেক অভিনব সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল ; তাহার অবশ্য ও নানাক্রমে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । তৎকাল কাত্যায়ন পাণিনি-হুত্রে নানাত্বানে বাটিক সংযোগ করিয়া, পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব ভাষার শব্দাঙ্ক-শাসনের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন । দৃষ্টান্ত লইয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত অধিকাংশস্থলে বাটিকসংযোগের প্রয়োজন প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে ।

অর্য্যাক্ষহুত্রে । ৪২:১২২.

এই হুত্রে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, নানা তথ্য প্রকাশিত হইবে । অর্য্যাক্ষ হইতে আরণ্য ও আরণ্যক—এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । ‘বৃক্’প্রত্যয়ে ‘আরণ্যক’-শব্দের উৎপত্তি । একটি বিশেষ-অর্থ-জ্ঞাপনার্থ অর্য্যাক্ষসে ‘বৃক্’প্রত্যয় হইত বলিয়া পাণিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । সে অর্থ

কি, তাহাই ব্যক্ত করিবার ‘অল্প হুত্রে ‘মহুযা’শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার অর্থ এই যে,—অর্য্যাক্ষগণ ‘মহুযা’ বুঝাইতে হইলে, ‘আরণ্য মহুযা’ বলিলে চলিবে না, ‘আরণ্যক+মহুযা’ বলিতে হইবে ; অর্থাৎ ‘আরণ্যক’ বলিলে, মহুযা বুঝাইবে :—আর কিছু বুঝাইবে না । পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য বর্তমান ছিল, তাহাতে ‘আরণ্যক’ বলিতে মহুযা ভিন্ন আর কিছু বুঝাইত কি না, তাহার প্রমাণাভাব । কাত্যায়নের সময়ে ‘আরণ্যক’ বলিতে, মহুযা ভিন্ন আরও নানা অর্থ প্রতিপাত হইত । তাহার সময়ে আরণ্য পপ, আরণ্য অধ্যায়, আরণ্য ভাষ্য, আরণ্য বিহার ও আরণ্য হস্তী বলিবার নিয়ম ছিল না । ঐ সকল স্থলেও ‘আরণ্যক’-শব্দ ব্যবহার করিতে হইত । ‘গোবর’-অর্থে আরণ্য ও আরণ্যক ‘শব্দ তুল্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত । এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত অর্থে আরণ্যশব্দই প্রযুক্ত হইত । এই পার্থক্য-সূচনার্থ কাত্যায়ন বাটিকহুত্রে অবশ্যোক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । যথা :—

“পথাখ্যারজারিগিরবহুযাঃপিত্তি বক্তব্যম্ ।” ১ ।

“বা গোবরেষু ।” ২ ।

‘আরণ্যক’শব্দ পাণিনির সময়ে এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইবার নিয়ম থাকিলে, তিনি কেবল মহুযা-অর্থেই ‘আরণ্যক’শব্দের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিতেন না । পাণিনির ভাষ্য হুত্রে অতিশয়-বিচারনিপুণ বিশেষজ্ঞ বৈয়াকরণের পক্ষে একরূপ অজ্ঞতা বা অনবধানতা স্বীকার করা অসম্ভব । অধ্যাপক গোলাড়হুত্বকর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন ।

তাঁহারা যেন বিধানী ভারতবর্ষকে কুসংস্কারা-
জর বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশে' ক্রটি করেন না ।
ঐতিহাসিকের পক্ষে এরূপ অবজ্ঞাপ্রকাশ
তথ্যসুস্থস্থানের সাধা প্রদান করে । পুরা-
কালের ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যের গৃহস্থগণ কি ভাবে ও
কি অর্থে বৈদকে 'অপৌরুষেয়' বলিয়া ঘোষণা
করিয়া গিয়াছেন, তাহার অস্থলস্থান করা
আবশ্যক । বৈদকের পুরাতন অর্থ 'জ্ঞান' ।
জ্ঞান মনুষ্যকৃত, না অপৌরুষেয়? নিউটন
যে মাধ্যাকর্ষণজ্ঞানের জন্ম জগদ্বিশ্বাতি,
তিনি কি তাহার স্রষ্টা, না স্রষ্টা?
কোনও জ্ঞানের পক্ষেই মানবকে স্রষ্টা বলা
যায় না; মানব স্রষ্টা, মানব প্রোক্তা;—
তাঁহার অধিক নহে । জ্ঞান অনাদিকাল
হইতে স্রষ্টা ও প্রোক্তার প্রভাবের বর্তমান
অছে;—কত জ্ঞান দৃষ্ট ও প্রোক্ত হইয়াছে;
তথাপি কত জ্ঞান এখনও মানবসমাজে
অপরিজ্ঞাত! যিনি যে জ্ঞান দর্শন করেন,
তিনি তাহার 'স্রষ্টা' বা ঐতিহ্য; যিনি তাহা
প্রচার করেন, তিনি তাহার 'প্রোক্তা' ।
পাণিনি এইভাবেই 'হ্রস্বচেনা' করিয়া,
মন্ত্রভাগকে 'দৃষ্ট' এবং ব্রাহ্মণ ও কল্পাদিকে
'প্রোক্ত' বলিয়া গিয়াছেন । পাণিনির মতে
বৈদিকসমাজেই 'প্রোক্ত' । বাহা 'দৃষ্ট' বা
'প্রোক্ত' নহে, মনুষ্যকৃত—পশুপক্ষময় ইতি-
হাস-উপাখ্যানাদি—তাঁহারই নাম 'কৃত' ।
এইভাবে পাণিনি, প্রথমত কৃত ও অকৃত
নামক দুই শ্রেণীর সাহিত্যের পরিচয় প্রদান
করিয়া, অকৃত সাহিত্যকে আবার দৃষ্ট ও
প্রোক্ত নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া
গিয়াছেন, কৃতাকৃত সমস্ত সাহিত্যই মনুষ্যের
নামে পরিচিত; পার্থক্য এই যে,— কৃতগ্রন্থ

কর্তার নামে, অকৃতগ্রন্থ স্রষ্টা ও প্রোক্তার
নামে পরিচিত । অকৃতগ্রন্থেরও লক্ষ্যবসী
মনুষ্যকৃত; তাহা অপৌরুষেয় নহে; লক্ষ্য-
প্রতিপাদ্য জ্ঞানই 'অপৌরুষেয়' । ইহাকে
কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞাপ্রকাশ করিবার
উপায় নাই ।

বাহা 'দৃষ্ট', তাহা ক্রমে ক্রমে 'দৃষ্ট' হইয়া-
ছিল । তজ্জন বাহা 'প্রোক্ত' সাহিত্যের
অন্তর্গত, তাহাও ক্রমে ক্রমেই প্রচারিত
হইয়াছিল । তজ্জন তাহা পুরাতন ও আনু-
নিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইবার যোগ্য ।
পাণিনিহুত্রে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায় ।

ভেন প্রোক্তঃ (৪.৩.১-১)

'প্রোক্তঃ' শব্দের অর্থ কালিকা বৃত্তিতে
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই হ্রস্বের পূর্ববর্তী
৮৭ সংখ্যক হ্রস্ব মনুষ্যকৃত গ্রন্থের পরিচয়
প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার সহিত পার্থক্যকার্য্য,
এই হ্রস্বদ্বারা 'প্রোক্ত' সাহিত্যের অবিকার
আবদ্ধ হইয়াছে । এই অবিকারভুক্ত শিষ্ট
হ্রস্ব একত্র বিচার করা আবশ্যক ।

ভেন প্রোক্তঃ (৪.৩.১-১)

কাত্তপকৌলিকাভ্যাং কবিভ্যাং দিবিঃ (৪.৩.১-৩)

পূর্ণাংভোক্তে ব্রাহ্মণকমে (৪.৩.১-৪)

নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া, এই
তিনটি হ্রস্ব ইউরোপীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর
বিচারে নানাক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অধ্যা-
পক গোল্ডষ্ট্রুকের দে সকল কাল্পনিক
ব্যাখ্যার ভ্রমপ্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই ।
এহলে তাহার পুনরুদ্বোধ অনাবশ্যক । এই
তিনটি হ্রস্বের সরল ব্যাখ্যা কি, তাহার
আলোচনা করিলেই বোধেই হইবে ।

পাণিনি প্রথমে ‘মহাভারত’ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া, পরে ‘মহাভাগ্যোক্তিত’ গ্রন্থের উল্লেখ করিবার জন্য নূতন অধিকার-স্থলের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন, “ভেন প্রোক্তম্”। অতঃপর ‘প্রোক্ত’গ্রন্থের কথা বলিব। তাহার সাধারণ নিয়ম এই যে,— ‘প্রোক্ত’গ্রন্থ প্রোক্তার নামানুসারে কথিত হইয়া থাকে। তজ্জন্ত ‘প্রোক্তার’ নামে প্রত্যয় সংযোগ করা আবশ্যিক। কাশ্যপ ও কৌশিক এই দুই ঋষির নামে ‘গিনি’-প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাদের ‘প্রোক্ত’গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাশ্যপ বলিতে ঋষি-কাশ্যপ ও গোত্রকাশ্যপ বুঝায়। ঋষিকাশ্যপ পুরাতন; গোত্রকাশ্যপ আধুনিক ব্যক্তি। সেই পার্থক্যার্থার্থই স্থলে ‘ঋষি’শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও কল্প-স্থলের পুরাতন প্রচারকগণের নামে ‘গিনি’-প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পরিচিত হইয়া থাকে। দাঁহারা ‘পুরাণ-প্রোক্তা’ বলিয়া পরিগণিত হইবার অযোগ্য,—দাঁহারা আধুনিক—তাঁহাদের নামে ‘গিনি’-প্রত্যয় হয় না।

এই সরল ব্যাখ্যার বৃত্তিতে পারা যায়,— পাণিনির মহাভাগ্যে বাক্যব্যয়-ঋষি পুরাণ-প্রোক্তা বলিয়া পরিগণিত হইবার অযোগ্য। কারণ তাঁহার ব্রাহ্মণাদির নাম—“বাক্যব্যয়ানি ব্রাহ্মণানি”। বাক্যব্যয়ের নামে ‘অনু’-প্রত্যয় হইয়া ‘বাক্যব্যয়ানি’শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ‘গিনি’-প্রত্যয় হয় নাই। পাণিনি-স্থলের যে ইহাই সরলার্থ, তাহাতে সংশয়

নাই। কিন্তু ইহাতে ‘বাক্যব্যয়প্রোক্ত’ শুদ্ধবাক্যের দ্বারা ‘গীতপথব্রাহ্মণ’ আধুনিক হইয়া পড়ে! কাশ্যারন তাহার মতাদানার্থ বার্তিক সংযোগ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—পাণিনির বলা উচিত ছিল যে, বাক্য-ব্যয়াদির পক্ষে তাঁহার স্থল খাটিবে না; তাঁহারাও তুল্যকালবর্তী পুরাণ-প্রোক্তা; কিন্তু তাঁহাদের নামে ‘গিনি’-প্রত্যয় হয় নাই। কাশ্যারন এখানে স্পষ্টাক্ষরেই পাণিনির বোধপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।*

উত্তরকালে ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, এই বার্তিকের দুই প্রকার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এক দল হিন্দু; অপর দল বৌদ্ধ। বৌদ্ধ কালিকাবৃত্তিকার কাশ্যারনের বার্তিক স্বীকার না করিয়া, স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন,— “বাক্যব্যয়াদি আধুনিক ব্যক্তি”।† উত্তর-কালে সিদ্ধান্তকৌমুদীর হিন্দু গ্রন্থকারও কালিকার মতই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন; কাশ্যারনের মত পরবর্তী বৈয়াকরণসমাজে সর্বত্র সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং বাক্যব্যয়াদিকে পাণিনির পরকালবর্তী ও কাশ্যারনের পূর্বকালবর্তী বলিতে হইতেছে। বাক্যব্যয়াদি কাশ্যারনের এত পূর্বকালবর্তী যে, কাশ্যারন তাঁহাদিগকে পাদিনিরও পূর্বকালবর্তী বলিয়া বোধনা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বৃত্তিতে পারা যায়,—পাণিনির বহুকাল পরে কাশ্যারন প্রাক্কৃত হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান ছিল বলি-

* “পুরাণপ্রোক্তেন ব্রাহ্মণকল্পেন বাক্যব্যয়াদিভ্যঃ প্রতিবেদন্যকালভাৎ ।”

৪.৩.১.৪। বার্তিকস্থল ৮

† বাক্যব্যয়ানিভেদিককাল ইত্যর্থানেন্ বার্তী ।

রাই, পানিনির সময়েই তাহার সহিত কাত্যায়নের সময়েই তাহার নাম পাঠ্য উপস্থিত হইয়াছিল।* এই পাঠ্য রামায়ণেও বর্ণিত।

কাত্যায়ন কেবল ব্যাক্তিকন্য রচনা করিয়াই নিরন্ত হন নাই। তাহার নাম বৈদিক-সাহিত্যেও স্থাপিত। কৃতকৃত উভয় শ্রেণীর সাহিত্যেই কাত্যায়নের নাম চির-সংস্কৃত হইয়া রহিয়াছে। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং আখ্য-সাহিত্যে 'মুনি'নামেই স্থাপিত। যে সকল বৈদিকসাহিত্যের সহিত কাত্যায়নের নামের সংস্রব থাকা জানিতে পারা যায়, তন্মধ্যে (১) অথুক্রমণী, (২) প্রাতিশাখ্য, (৩) কল্পজ্ঞ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সকল লৌকিকসাহিত্যের সহিত কাত্যায়নের নামের সংস্রব থাকা জানিতে পারা যায়, তন্মধ্যে (১) ভাটপ্লোক ও (২) মহা-ব্যাক্তিক সংস্কৃতসাহিত্যে স্থাপিত। কাত্যায়ন প্রোক্তা এবং কৰ্ত্তা,—প্রচারক এবং প্রেক্ষার। তাহার টীকাকার বড়গুপ্তশিষ্য প্রসঙ্গক্রমে কাত্যায়নের সাহিত্যসেবার ইতিহাস সকল করিয়া গিয়াছেন। বড়গুপ্তশিষ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক টীকাকার হইলেও, তাহার উক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। তিনি বলেন,—পুরাকালে শৌনকনামক

কবি নানা হজ্ঞগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার শিষ্য আশ্বলায়নও হজ্ঞগ্রন্থের লক্ষ্য প্রসিদ্ধ। শৌনক ও আশ্বলায়নের হজ্ঞগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াই, কাত্যায়ন গ্রন্থলখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে কাত্যায়ন এইরূপে বৈদিকসাহিত্যে স্থাপিত, তিনিই পানিনি-হজ্ঞের ব্যাক্তিকার;—

“মহাব্যাক্তিকন্যকার: পানিনীয়মহাশিষ্যে”

পতঞ্জলি তাহারই সমালোচনাঙ্কলে ‘মহাভাষ্য’ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বড়গুপ্তশিষ্যের এই সংক্ষিপ্ত উক্তি, কাত্যায়নের কাণনির্ণয়ের লক্ষ্য অধ্যাপক যোক্ষমূলরকর্ষক প্রোক্তন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। কোট্যকের বিষয় এই যে, বড়গুপ্তশিষ্য কোনরূপে কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ না করিলেও, অধ্যাপক যোক্ষমূলর আশ্বলায়ন ও কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।† এক্ষণে অসঙ্গত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিবার কারণ কি? যোক্ষমূলর “কথাসরিংসাগরের” আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া, পানিনি ও কাত্যায়নকে সম-সাময়িক ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পানিনিহজ্ঞে শৌনকের নাম যেভাবে উল্লিখিত, তাহাতে শৌনক ও পানিনি কুলাকাল-বর্তী বলিয়া তর্ক করা যাইতে পারে। অন্যথা

* This explanation, I hold, can only be derived from the circumstance that Panini and Katyayana belonged to different periods of Hindu antiquity.—Goldstucker's PANINI, p. 122.

† Several of the works mentioned before were ascribed to Saunaka and his two pupils, Katyaiana and Asvalayana.—Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature.—p. 215.

কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য না বলিলে, পাণিনির সহিত কাত্যায়নের তুল্যকাল-বর্ধিষ্ণু রক্ষা করা যায় না। বলা বাহুল্য, এক্ষণ বিচারপদ্ধতি ঐতিহাসিক তথ্যসূ-সঙ্কলনের প্রবল অন্তরায়। কাত্যায়ন যে শৌনকের শিষ্য, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; প্রমাণ কেবল মোক্ষমূলরের অসুমান;—তাহাও জ্ঞানসূত্রোক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না! অথচ তাহার উপর নির্ভর করিয়াই “সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস” সঙ্কলিত হইয়াছে! সে ইতিহাস নিপিতাক্ষেণে বিবরণিত হইলেও, বিশেষজ্ঞগণের নিকট নিরতিশয় কৌতূহলের আকর। অধ্যাপক গোলাড়ট্টকর সে কথা ব্যক্ত করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তাহার গ্রন্থ এক্ষণ দ্বর্ণত ও দুঃস্থ হইয়াছে, তাহার কথা অনুলোকেই অবগত; তদন্তই মোক্ষমূলরের “সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস” প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া সমাদরলাভ করিতেছে!

বৈদিকসাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় বেদাঙ্গের প্রয়োজন থাকায়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও চ্যোতিষ নামক ছয়টি বেদাঙ্গ প্রচলিত হইয়াছিল। বড়ল ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নাম; ছয়খানি গ্রন্থের নাম নহে। এক এক বিষয়ে বহু-লোকের বহুগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে বেদবাক্যের উচ্চারণ, বেদ-মন্ত্রের প্রয়োগ, বৈদিকশব্দের শাসন, পদ-পদার্থের নিরূপণ ইত্যাদি কার্য সাধিত হইত। সেকালে বৈদিকসাহিত্যের আণোচনার লিপ্ত হইয়া সমগ্র বেদবাক্যের রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিবার চক্রে আবগণ সময়ে সময়ে

‘অমুক্তমণী’ নামক সূত্রাপুস্তক সঙ্কলিত করিতেন। শৌনক গ্রন্থের নানাপ্রকার অমুক্তমণী সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাত্যায়নকৃত অমুক্তমণীই এক্ষণে অগরিষ্ঠাভ্যাস;—তাহার নাম ‘সর্গাধিক্রমণী’। বড়ল-শিষ্য তাহারই “বেদাধীনীপিকা” নামক টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন। শৌনকের সময়ে গ্রন্থের মণ্ডল, অম্বাক ও হুজর নামক বিবিধ বিভাগে বিভক্ত থাকায়, তাহার অমুক্তমণীতে তাহারই উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৌনকের পরে এবং কাত্যায়নের পূর্বে অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গাঙ্গসারে গ্রন্থের বিভক্ত হইয়াছিল। তদন্ত কাত্যায়নের “সর্গাধিক্রমণীতে” আমরা অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গাঙ্গসারে গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হই। শৌনকের বহুপত্রকালবর্তী না হইলে, কাত্যায়নের “সর্গাধিক্রমণীতে” শৌনকের “অমুক্তমণী” তার মণ্ডল, অম্বাক ও হুজর নামই প্রাপ্ত হওয়া যাইত। মোক্ষমূলরের মতানুসারে কাত্যায়ন শৌনকের শিষ্য ও সমসাময়িক হইলে, তাহাই দেখিতে পাই-তাম। সর্গাধিক্রমণীর জার “প্রাতিশাখ্য”-নামক এক গ্রন্থও কাত্যায়নের লেখনী-প্রসূত। তাহা “বাসনেন্নিপ্রাতিশাখ্য” নামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাতিশাখ্য ও মহাব্যাক্তিকে কাত্যায়নের অসাধারণ ব্যা-করণজ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ওয়েবর প্রভৃতি পাক্ষাত্য পণ্ডিতবর্গ ‘প্রাতিশাখ্য’গুলিকে পাণিনির পূর্বকালবর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পাণিনির পরে ব্যাক্তি, ব্যাক্তির পরে প্রাতিশাখ্য। কাত্যায়ন

গুরুজ্ঞানের কল্পিত করিয়া-
ছিলেন। তাহা হইলে গুরুজ্ঞানের শিক্ষা
ও অগ্রগতি এইরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।
পাণিনির সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল
না। এই সকল বৈদিকগ্রন্থ ত্রিষ
কাত্যায়ন 'ব্রাহ্মা' নামক শ্লোকগ্রন্থেও রচনা
করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'
তাহার উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের পূর্বে
ব্যাক্তির 'সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে শ্লোকনামক
রচনাশ্রমণীর প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছে। শ্লোক বলিতে সেকালে কেবল
অষ্টষ্টুভুদ্বয়কেই বুঝাইত। বৈদিকসাহিত্যে
কদাচিৎ অষ্টষ্টুপের ব্যবহার থাকিলেও,
আজ্ঞাত অষ্টষ্টুপ ব্যবহৃত হয় নাই।
ওষেদের দশসহস্রাধিক মন্ত্রের মধ্যে ০৫৫
মন্ত্র অষ্টষ্টুপ। পাণিনির সময়ে আগন্তু অষ্ট-
ষ্টুভুদ্বয়ে রচিত কোন গ্রন্থ প্রচলিত থাকার
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধ্যাপক
মোকশ্মলর এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া
কোন কোন পাণিনিহস্তের উদাহরণে
'শ্লোক' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, পাণিনির
সময়ে শ্লোকগ্রন্থ প্রচলিত থাকা সিদ্ধান্ত
করিয়া বসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল
উদাহরণ পাণিনির লেখনীগ্রহীত নহে।
পাণিনির পরে এবং কাত্যায়নের পূর্বে
সংস্কৃতসাহিত্যের এই সকল বিবিধ অবস্থার
পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি ও
কাত্যায়নের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান না
থাকিলে, এই সকল পরিবর্তনের সামঞ্জস্য
রক্ষিত হইতে পারে না। এই সকল বিষয়
দ্রষ্টব্য রাখিয়া পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল-
নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে, সমালোচ্য গ্রন্থের

উপর পাণিনি বা কাত্যায়নের প্রভাব আবি-
ষ্কার করা কঠিন হয় না। রামায়ণের ভাষ্য
পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করিতে
হইলে, এই পথের অগ্রসর হওয়া আবশ্যিক।
তন্ত্রপতঞ্জলিরও সাহায্য গ্রহণ করিতে
হইবে।

কাত্যায়নের কতকাল পরে পতঞ্জলি
গ্রন্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে
নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি
কোন সময়ে গ্রন্থিত হইয়াছিলেন, তাহার
কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পত-
ঞ্জলির মাতার নাম গোপিকা; তাহার বাস-
স্থান গোনন্দ। তিনি কিছুকাল কশ্মীরে বাস
করিয়াছিলেন, এবং অভিন্নমতানামক কশ্মীর-
ধিপতির শাসনসময়ে তৎকালে মহাভাষ্যের
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই
সকল প্রমাণ অনুসারে পতঞ্জলিকে বিসম্ব-
বৎসর পূর্বের বৈয়াকরণ বলিয়া স্বীকার
করিতে হয়। তাহার প্রমাণপরম্পরার
বিভূত আলোচনা করা অনাবশ্যক।

পুরাতন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে
পাণিনিবৃৎ, কাত্যায়নবৃৎ ও পতঞ্জলিবৃৎ নামক
তিনটি সাহিত্যবৃৎ কল্পনা করিলে দেখিতে
পাওয়া যায়,—পাণিনিবৃৎ 'রামায়ণ' পরি-
চিত না থাকিলেও, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিবৃৎ
'রামায়ণ' পরিচিত ছিল। পাণিনির পরে ও
কাত্যায়নের পূর্বে কোনও সময়ে রামায়ণ
রচিত হইয়া থাকিবে। রামায়ণের সমা-
লোচনার প্রবৃত্ত হইলে, এই সিদ্ধান্তের
অনুকূলেই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
পাণিনিবৃৎ গুরুজ্ঞানের, বাঙ্গলেনেদ্রি-
সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নকল্পতরু

বা মোকনিবন্ধ ভাষাসাহিত্য বর্তমান থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; কাভ্য-
নমূল হইতে এই ত্রৈলোক্যের সাহিত্যের বিবিধ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । এই কথা-

গুলি স্মরণ রাখিয়া রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে, তাহার রচনাকালনির্ণয়ের প্রকৃত পথের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । তৎপূর্বে রামায়ণের ভাষাবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

• মুক্তিবিষয়ে রামানুজস্বামীর উপদেশ ।

- ছেলে ছুঁলে বার, ক্লাসেও বেশ পড়া হয়, বাটারও ভাল, অগচ্ ছেলে কিছু শিখিতে পারে না, ক্লাস প্রমোশন্ও পায় না ।
- ছেলের কোঁক ঘুটনামীর দিকে, পড়ার দিকে নহে । সে সুযোগ পাইলেই পেন্সিল দিয়া ছবি আঁকে, কেতাবের গচ্চর ফুল কাটে, দেয়ালের গারে ঘরবাড়ী আঁকে । তাহার পড়াশুনা ভাল লাগে না, ভাল লাগে—ঐরূপ ঐরূপ কারুকার্য ! সেই অশিক্ষিত অবস্থার সে বাছা আঁকে, তাহা নিতান্ত মন্দও হয় না । ঐরূপ দেখিলে কে না বলে—তুমিও বল, আমিও বলি—ছেলেটিকে আঁটস্থলে ধাও । হয় ত তাহাতেই কিছু হইবে, নচেৎ লেখাপড়ার কিছু হইবে না । আমরা যেমন আমাদের ছেলের কোঁক ও পারকতা দেখিয়া শিক্ষাদিকারে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করি, করি বা না করি, অন্তত মুখেও বলি,
- ছেলেটিকে অধিক বিষয়ে দিলে ভাল হইত, এইরূপ আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরাও কোঁক ও পারকতা অহুসারে শাস্ত্রাদিকার নির্বাহন করিয়া থাকেন । কোঁক ও পারকতা, এই দুই বিষয়ের শাস্ত্রীয় নাম অর্থিও

সামর্থ্যবব । অর্থি অর্থ্যং উৎকটতর ইচ্ছা । সামর্থ্যবব অর্থ্যং ঐঙ্গিত বিষয় নির্বাহ করিবার ক্ষমতা থাকা । এই সামর্থ্য লৌকিক-বৈদিকভেদে নানাপ্রকার, এবং তৎসংক্রান্ত নানা বিচার থাকিলেও সে সকল এ প্রবন্ধের বর্ণনীয় নহে । এখানে মূলত এইমাত্র বুলিতে হইবে যে, ঐঙ্গিত বিষয় আরম্ভ করিবার শক্তি থাকাই উল্লিখিত সামর্থ্যববকথার অর্থ । ইচ্ছা আছে সামর্থ্য নাই, অথবা সামর্থ্য আছে ইচ্ছা নাই, সেরূপ লোক অনধিকারী । ‘অর্থ্য’ ও সমর্থ, একরূপ ব্যক্তিই অধিকারী, তদ্বিত্ত ব্যক্তি অনধিকারী । যে অধিকারী, সে-ই অধিকর্তব্য বিষয়ে নিষ্কলিত করিতে পারে এবং যে যে-বিষয়ে অনধিকারী, সে শতচেষ্টা করিলেও সে-বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারে না । আমরা এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, বাহারা জন্মাবধি গান করিয়া বেড়ায়, অগচ্ ভাল-বোধ-সুখবোধ-বহিত । অনেক সুশিক্ষিত লোক দেখিয়াছি, পরন্তু তাহারা গণিতবিষয়ে মূর্খ । ব্যাকরণ-সাহিত্য-অলঙ্কারাদি নানা-শাস্ত্রে সুৎপন্ন,—কেবল জ্ঞানশাস্ত্রের নামে

ভীত, এক্ষণ লোক ও অনেক আছেন। আবার
জাহাঙ্গীরে ব্যাপ্ত, অথচ বিাকরণ বুঝেন না,
এক্স লোকও দেখা গিয়াছে। অতএব,
মহুয়া যে সামর্থ্যযোগে বাতীত কেবল
অধিকার দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইতে
পারে, তাহা পারে না। না পারার পক্ষে
ঐ সকল পুঙ্কল নিদর্শন। আমাদের শাস্ত্রে
যে সধর-অধর-বাদের কথা আছে,—কর্ম,
জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি প্রভৃতির পন্থা উপদিষ্ট
আছে, সে সমস্তই অধিকারবিশেষের জন্ত,
সাধারণের জন্ত নহে। পাত্র বা অধিকারী
অনুসারে সুপথ-কুপথ হয়, আবার কুপথ সুপথ
হয়। তাই শাস্ত্রকারদিগের আদেশ—যে
যে-পথের অধিকারী, সে সেই পথে গমনাগমন
করুক। প্রামী মধুহননসরবতী ব্রহ্মত
ভক্তিরশ্ময়নপ্রদে জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই
পথের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

“অন্ততঃচিত্তসা নির্বৈশ্বপূর্বকঃ শুদ্ধজ্ঞানম্। কৃত-
চিন্তা হু তগবৎকথাশ্রবণাভিগাণনতৎপরঃপ্রজ্ঞাপূর্ণিক
ভক্তিরিত্যাদিকারভেদেন বচমণ্যুশাস্তম্।”

অর্থাৎ বাহ্যের চিঠি অত্যন্ত ভীত,—
অত্যন্ত নীরস, কিছুতেই কৃত হয় না,
—গলে না; তাহারাই ঐহিক সম্পদে
নির্ভর হওয়ার পর তবজ্ঞানের পথ বা
অধরবাদের পথ গ্রহণ করুক; কিন্তু বাহ্য-
দের চিত্ত সেক্ষণ শক্তিশালী নহে,—সেক্ষণ
ভীত নহে, বাহ্যদের চিত্ত ক্রটিপ্রবণ,—
মহলে গলিয়া যায়, তাহারাই ঐহিক সম্পদে
নির্ভর হওয়ার পর সধরবাদের উপদিষ্ট
ভক্তির পথ গ্রহণ করুক। অধরবাদের তব-
জ্ঞান ও সধরবাদের ভক্তিনামক জ্ঞান,
উভয়ই অধিকারিত্বে প্রাপ্ত।

কথায় কথা উঠে, “ঐহিকসম্পদে নির্ভর”
এই কথায় অপর এক কথা উঠিতেছে।
কথাটা এই—

অন্ত জীবের প্রকৃতিতে কি আছে,—কি
নাই, অস্ত জীবের প্রকৃতি কি চাহে,—কি চায়
না, তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু মহুয়া-
জীবের প্রকৃতিতে বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ
অত্যন্ত বলবৎ। মহুয়ার প্রকৃতিতে ভবি-
ষ্যতের আশা অত্যধিক প্রবল বলিয়াই
মহুয়াজগতের এত পরিবর্তন ও এত উন্নতি।
ভবিষ্যতের সীমা দৈবাৎ কাহাজ প্রকৃতিতে
মরণাকারে অতিবাহিত হয়;—দাবৎ না
মরণ হয়, তাবৎ তাহারাই সুখদুঃখপ্রাপ্তি-
পরিহারের চেষ্টা করে, তদুর্ক্ট নহে। কেন
না, তাহারাই বুঝে, মরণেই শেখ, মরণেই
বিয়াম। অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কতক-
লোকের প্রকৃতি ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া
পরলোক ও বর্গনরকাদি কল্পনা করে এবং
তদবশিষ্ট লোক বর্গনরকাদির অতীত মুক্তি-
নামক দুঃখান্ত পদের অস্তিত্ব মাত্র করে।
বাহ্যদের ভবিষ্যৎ মরণ, তাহাদের জন্ত শাস্ত্র-
—নীতি। বাহ্যদের ভবিষ্যৎ বর্গনরকাদি,
তাহাদের জন্ত তৎপ্রাপ্তিপরিহারের উপায়ী-
ভূত কর্মকাণ্ড এবং বাহ্যদের ভবিষ্যদ্বাশা
মুক্তি, তাহাদের জন্ত কর্মযোগ, অষ্টাধযোগ,
ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগে। এই চার পন্থা
আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে যে-পথের
অধিকারী, সে সেই পথ অবলম্বন করুক,
ইহাই শাস্ত্রকারদিগের ঘোষণা বা ডিঙিয়া।
শব্দ জ্ঞানপদের পদিকদিগের জন্ত অধর-
বাদের দর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন এবং রামাঙ্ক-
প্রামী ভক্তিপদের অধিকারাদিগের জন্ত

ভক্তিবাণের দর্শন প্রচারিত করিয়াছেন।
 প্রমাণপ্রমাণ প্রবর্ধন করি বা না করি,
 কপাটা বলিয়া দ্রাবি, শব্দর অধরবাণের
 প্রথমোপদেষ্টা নহেন এবং রামানুজস্বামীও
 ভক্তিবাণের দ্রাবিভক্ত নহেন। রামানুজের
 পূর্বেও অনেক মূনি-ঋষি ও আচার্য্য ভক্তির
 পন্থা বর্ণন করিয়াছিলেন, রামানুজ তাঁহাদের
 সেই বর্ণিত পথের স্বপ্নমতাবিধানমাত্র
 করিয়াছেন।

রামানুজ ভক্ত ও ভক্তিপথের উপদেষ্টা।
 ভক্তিপথের উপদেষ্টা হইলেও সকলকে ভক্তি-
 পথে বাইতে বলেন না। বাহ্যরা প্রকৃত
 অধিকারী, বাহ্যদের চিত্ত দ্রুত হয়, — ভক্তিরূপে
 বিগলিত হয়, তাহাদিগকেই বলেন, তোমা-
 দের মুক্তির পথ এই। তিনি শব্দরের ব্রহ্মা-
 ঈশত স্তনিয়া, — মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়, এই
 উপদেশ স্তনিয়া, কিছুমাত্র কোলাহল করেন
 না, কার্য্যহাটিও করেন না, লাঠি বাহিরও
 করেন না, খজাধারণও করেন না, উপ-
 হাস্য হাসিও হাসেন না, বাতুলের প্রলাপ
 বলিয়া অধরবাণের * উপেক্ষাও করেন না,
 এবং জীব ব্রহ্ম হইবে তাহিয়া সাবেক তারা-
 শব্দরী ভাবার “হা হতোহস্মি, হা বড়োহস্মি,”
 বলিয়া রোদনও করেন না। তিনি উপযুক্ত
 অধিকারীদিগকে ডাকিয়া অতি ধীরভাবে
 * বিনয়নব্রহ্মচেন বলেন, “তোমরা আপনাকে
 ব্রহ্ম ভাবিতে পারিবে না, তাহিলেও ব্রহ্ম
 হইতে পারিবে না, তোমরা ভাব—আমরা
 ব্রহ্মপন্থক ব্রহ্মাংশ, এবং চিত্তকে তাঁহার
 ভক্তিরূপে গণাইয়া সেই বাঃশি একরূপ হাঁচে
 ঢালিয়া দাও, দিয়া তৎস্বরূপ হইয়া ভবী
 * অসীম আনন্দে আপনাতঃ সসীম আনন্দ লুপ্ত

করিয়া দাও। তাহাই তোমাদের মুক্তি,
 তাহাই তোমাদের * ব্রহ্ম হওয়া এবং তাহাই
 তোমাদের সর্বোচ্চ দুঃখাস্তান—পরম পদ।”

মোকদ্দামে বাইবার প্রথম সোপান
 নির্বেদ, এ বিষয়ে শব্দর ও রামানুজ উভয়ে
 একমত। শব্দরও বলেন,— স্বীকার করেন—

“ভাবৎ কর্ণাণি কুলীত ন নিবিন্যত ধ্যত।”

রামানুজও মোক্তের অপরার্থে দিয়া বলেন—

“সংকথাশ্রবণানো বা ব্রহ্মা বাবর ভাবতে।”

উভয়েরই অতিপ্রায়—মাতৃস্ব কামনা
 ছাড়িয়া কর্ম করিতে থাকুক, ক্রমে তাহার
 কামনাত্যাগ অভ্যন্ত হইয়া পড়িবে,
 কামনাত্যাগ অভ্যন্ত হইলে নির্বেদ বা
 ঐহিকবাহাপরিহার আপনা হইতেই
 সম্পন্ন হইবে। কামনাত্যাগ না হইলে চিত্ত
 পরিমার্জিত হয় না,—ক্রোধবেবাদিবোবশুত
 হয় না, সুতরাং নির্বেদও হয় না। নির্বেদ
 না হইলেও, কি জ্ঞান কি ভক্তি, দু-এর
 কোনটিই দেখা দেয় না।

কর্ম যেমন নির্বেদপ্রাপ্তির উপায়,
 তেমনি স্বর্গনয়কপ্রাপ্তিপরিহারেরও উপায়।
 কামনাত্যাগযুক্ত কর্মের দ্বারা নির্বেদলাভ
 ও কামনাযুক্ত কর্মের দ্বারা স্বর্গাদিপ্রাপ্তি
 হইয়া থাকে। ইহা উভয় আগাধেরই
 অঙ্গমত। জীব বিশেষ বিশেষ কর্মের দ্বারা
 স্বর্গনামক দুঃখাস্তির স্বপ্ন প্রাপ্ত হইতে
 পারে, আবার কর্মবিশেষ অহুতান করিয়া
 নরকনামক ভাতনাবিশেষ ভোগ করিতে
 বাধ্য হয়। এই হানে কর্মবাহী আচার্য্যগণ
 বলেন, শব্দর ও রামানুজ ইহারাও বলেন,
 কামনাপূর্ব্বক বৈধকর্মের অহুতানে পুণ্য অন্মে,
 পরে তাহারই সানখে স্বর্গলাভ হয়। আর

স্বাভাবিকী প্রকৃতির বশে যে সকল কৰ্ম কৃত হয়, সে সকল বিধিবিহীন বলিয়া পুণ্যের জনক হয় না, অধিকতর পাপেরই জনক হয়। অতএব, মানুষ যদি বিধির অধীন হইয়া চলিতে না পারে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পাপী—জন্মাবধি পাপী। শাস্ত্রীর বিধিনিষেধের বশে চলিতে শেখা অনেক বয়সে ঘটে, কাহার বা না-ও ঘটে। কাজেই মনুষ্য সাধারণত জন্মপাপী। এই সকল আৰম্ভত যেন অনেকটা খুটানিমত্তের মত। খুটানেন্না বলে, মনুষ্য জন্মাবধি পাপী। প্রকারান্তরে ঐশ্বর্য্য ও বলিহা পিয়াছেন, মনুষ্য জন্মাবধি পাপী।

“বিহিতজ্ঞানমুঠাননিশ্চিতত চ সেননাং।

এসম্মক্ষেত্রিয়ার্থে নরঃ পতনবজ্জিঃ।”

খুটানেন্না বলে, মানুষ পাপের ফলভোগ করিতে বাধ্য। ঐশ্বর্য্য ও বলেন—

“অবজ্ঞেবে তোক্কাং কৃতঃ কৰ্ম ওভাওতম্।”

খুটানেন্না বলে, মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিচারক গভ্ৰু পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য। ঐশ্বর্য্য ও বলেন—

“ইযজ্ঞপ্রজিতো ক্ষেৎৎ কর্ণঃ বা যময়েব বা।”

খুটান বলে, যে তাঁহার শরণাগত, সে পাপ-মুক্ত হইবে। ঐশ্বর্য্য ও বলেন—

“অহঃ স্ব্যঃ সৰ্গপাপেভ্যো। যোক্কাবিয়ামি বা ওভঃ।”

ইত্যাদি।

এই কুলনা স্মৃতিয়া হয় ত আদ্যকাল-কার ঔপনিষিতিক তাবাতবজ্ঞেন্না বলিয়া উঠিবেন, “কি আশ্চর্য্য। কি করিয়া ঐশ্বর্য্য খুটানি জালভেন্ন (salvation) শিখিলেন?” যাহাই হউক, মনুষ্য স্বকৃত কৰ্মের

ফলভোগ করিতে বাধ্য ঘটে; পরন্তু মুক্তিতে নহে। মুক্তিতে অর্থাৎ জীবমুক্তির অবস্থার—বেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রায়শ্চক্কের ফল উপস্থিত হইয়া থাকে, মুক্তপুরুষ তাহা সাক্ষীর স্মার কেবল দেখিয়া থাকেন, ভোগ করেন না। আর সজিতকৰ্ম্ম বাহা থাকে, তাহার ফলভোগ হওয়া চূরে থাকুক, মূলে ফলই হয় না। ফল ত হয়-ই না, তাহার অম্মুর পর্য্যন্তও হয় না। দণ্ডবীজের অম্মুরজননসামর্থ্য্য নষ্ট হওয়ার স্মার তদীয় সজিতকৰ্ম্মসকল, জ্ঞানারিষৎ হইয়া যায়। আদ্যকাল অনেকে আপনা-আপনি বেদান্ত দেখিয়াছেন, তাই তাঁহার বণেন ও অম্মুতোভরে লেখেন—“মুক্তির পর অর্থাৎ জীবমুক্তির পর সুবদন্ত কেন থাকিবে না? থাকিবে বৈ কি? বেদান্ত বলেন, প্রোক্ত ও সজিত কৰ্ম্মের ফল ভূগিতেই হইবে।” আমরা জানি ও লিখিয়া থাকি—সজিতকৰ্ম্মের ফল ভূগিতে হয় না, তাহা তবজ্ঞানরূপ অধিতে দণ্ড হইয়া যায়, ভূষ্ট বীজের স্মারে জননশক্তিহিত হইয়া যায়। কাজেই তাহা ফলপ্রসবও করে না, ভূগিতেও হয় না। আদ্যকাল ঔরূপ বেদান্তব্যাখ্যা অনেক। আরও ছাত্রটী ব্যাখ্যার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। “তাহা আমার অবিজ্ঞা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব।”

আমরা জানি, বেদান্তপরিভাষিত অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে; পরন্তু ভাব।

অর্থাৎ তাহাও একপ্রকারের জ্ঞান এবং উহা—

“লবঙ্গদ্যানবিকটম্ভঃ ভাবরূপঃ সংকিতঃ ।”

২। “যে আক্ৰিয়ার দ্বারা আত্মা আপনায় জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয়পদার্থে পরিণত করে, তদ্বারা ব্যক্ত-লগনের নির্মাণ করে, অর্থাৎ আত্মা হইতে যেক্ষণে যুগস্থস্বভূতসমষ্টি বিদ্যেয়র আবির্ভাব হয়—তাহার নাম সৃষ্টি ।”

সৃষ্টির পূর্বে অথবা সৃষ্টিকালে ভিতর-বাহির ছিল, আত্মার জ্ঞানরাশি আত্মা হইতে চতুর্দিকে চলিয়া যায়, গিয়া জ্ঞেয়পদার্থে বিবর্তিত হইয়া জ্ঞেয়পদার্থে পরিণত করে, আত্মা আত্মার জ্ঞানরাশি নিষ্ক্ষেপ করে, এরূপ ব্যাখ্যা আমরা বেদান্তদ্বিগণের নিকট কখনও শুনি নাই। বেদান্তদ্বিগণ জ্ঞান-শব্দটিকে ছই অর্থে ব্যবহার করেন। এক মনোবৃত্তি অর্থে, অপর চৈতন্ত্য অর্থে। আত্মা যে, জ্ঞানকে যুগস্থস্বভূতসমষ্টিসৃষ্টির অন্ত ভিতর হইতে বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করেন, সে জ্ঞান কোন্ জ্ঞান? আমরা জানি, হইটির একটিকেও আত্মা ভিতর হইতে বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করেন না।

৩। “মোট কথাই এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্ জ্ঞানের উদয়? লগনের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়।”

মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়, এ কথা বেদান্তীর কথা নহে। লগনের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এ কথাও বেদান্তীর কথা নহে। ঐ কথা বলিলে লোকে হয় ত

বুঝিবে, তবে মুক্তি আমাকে লইয়া স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। যদি সে আমাকেই লইল, তবে তাহার সে স্বাধীন অস্তিত্ব কিরূপ স্বাধীন অস্তিত্ব? বেদান্তদ্বিগণ জ্ঞানোদয়কে মুক্তি বলেন না; বলেন, জ্ঞানোদয় মুক্তির কারণ। মুক্তির পূর্বে তাহার উদয় হইয়া থাকে।

৪। বেদান্তব্যবখ্যাাতা শব্দর শারীরক-তাব্যের আরম্ভে বিধকে ছই ভাগে বিভক্ত করেন সত্য, এক ভাগ বিঘর ও এক ভাগ বিঘরী, এ কথাও বলেন সত্য; পরন্তু বেদান্তদ্বিগণ তদর্থে “বিঘর-আমি ও বিঘর-আমি,” এরূপ ভাব বুঝেন না এবং “আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্তাও আমি, কণ্ঠও আমি,” এরূপ নিদর্শনও দেখান না। ইহারা কণ্ঠকর্তৃবিরোধকে বড়ই অগ্রাহ ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। বেদান্তদ্বিগণের শাস্ত্রে “বিঘর-আমার অর্থাৎ জ্ঞানগম্য-আমার পারিত্যাবিক নাম জীবাত্মা, আর বিঘর-আমার বা জ্ঞাতা-আমার পারিত্যাবিক নাম পরমাত্মা,” এরূপ কথিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মা বুঝান নাই। ইহারা জ্ঞানেন বা বুঝেন, পরমাত্মা জ্ঞাতাও নহেন, বিঘরীও নহেন। শারীরকতাব্যের যে অংশে বিঘরবিঘরীর কথা আছে, সে অংশ এই—

“যুগস্থস্বভূতসমষ্টিসৃষ্টিবিঘরবিঘরীণোদয়ঃ প্রকালবদ্বিগলভবত্যস্তিত্বেরতরতাব্যুপগতো সিদ্ধান্তঃ তদ্ব্যঙ্গ্য-নামপি হতমাবিতরেতরতাব্যুপগতিরিজ্যোতিঃস্ব-প্রত্যয়গোচরে বিঘরিনি চিদ্রাক্ষে যুগস্থস্বভূতসমষ্টিসৃষ্টিবিঘরো তদ্ব্যঙ্গ্যাক বিঘরোদয়গো সিদ্ধান্তি তবিত্ত্ব-মুক্তং।”

ইত্যাদি।

ইহারই কিরূদূরে পূর্ণপক্ষ—

“কথা পুনঃ প্রত্যয়ভবতবিঘরোদয়গো বিঘরভবত্যা-

পাশ্বে ? নক্ষত্রা হি পুরোঃসংহাতঃ বিদগ্ধে বিদগ্ধাঃ সমধাশ্রিতাঃ ।
মুখং প্রত্যাহাশ্রিতাঃ চ প্রত্যাহাঃ হাঃ বিদগ্ধাঃ । ত্রিবিধি ।”

এই পূর্বপক্ষের প্রত্যাহারের আছে—

“ম ত্যাবদনেকান্তেনাবিধঃ, সমং প্রত্যাহাবিধঃ-
বাৎ অপরোকবাচ্চ প্রত্যাহাঃ প্রতিধঃ ।”

এই অংশের স্থল সংস্কৃত ব্যাখ্যা—

“অথ আত্মা একান্তেন নিয়মেন অবিসমো ন ভবতি ।
অত্র হেতুর্নাসি, অস্বপিতি । অসংপ্রত্যাহঃ অসমিতাখ্যানঃ,
তত্র ভাসমানবাদিতার্থঃ । অথবা অস্বপিত্যাদ্বা প্রতি-
ধিবিভক্তয়েন বহু প্রত্যাহাতে সঃ অসংপ্রত্যাহঃ অস্বপিত্যত্র
ভাসমানবাদিতার্থঃ ।”

পূর্বপক্ষের তাৎপর্য—আত্মা অবিসর, সে-
জন অখ্যান অসম্ভব । উত্তরপক্ষের তাৎপর্য—
ঐকান্তিক অবিসর নহে, বুদ্ধিভাবে তদীয়
প্রতিবিম্ব পড়ে, সেভাবে তদীয় প্রতিবিম্ব
অসংবৃতির বিষয় । অপরোকবাৎ কথার অর্থ
—বপ্রকাশবাৎ । অতএব, “বিবর্তী অর্থাৎ
আত্মা সম্পূর্ণ অবিসর নহে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাহ
নহে—অর্থাৎ আমি একাধারে বিবর্তী ও বিবর,”
এ কথা ভাব্যকারীর কথা নহে । একজন
উকিল বলিয়াছিলেন, বলিলেই ছিত্র বদ্ধ
করিবার অন্ত্র যিনি অধিক কথা লিখিবেন,
তাঁহার বলিলে তত অধিক ছিত্র হইবে ।
এবং ফলে একরাও বহি এক কথা ঘুরাইয়া-
কিরাইয়া বারবার বহবার না লেখেন, বৃথা
এবং দশরীর বিবৃত না করেন, তাহা হইলে
বোধ হয় ভাল হইতে পারে ।

বহুবিকৃত করিলে প্রাসঙ্গিক কথাও
অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায়, সেজন্য এই স্থানেই
এসম্বোধাদিত কথার বিরত হইলাম । এক্ষণে
প্রকৃতের অনুসরণ করা বাড়ুক ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রামাহুজবানীর
উপদেশ—মোক্ষার্থী সমুদ্রা আপনায় অবি-

কার বুদ্ধিমা অর্থাৎ অবিদ্যামায়াবাক বুদ্ধিমা
হয় ভক্তির পথে বাড়ুক, না হয় জ্ঞানের পথ
অবলম্বন করুক । বাহার ছিত্র এবং হয়—রসে
বিগলিত হয়, সে ভক্তিপথে বাড়ুক । বাহার
চিত্র পক্ষে না,—কিছুতেই গুলে না, সে
জ্ঞানের পথে বাড়ুক । বিপর্যায় করিলে
অনধিকারচর্চা হইবে, অনধিকারচর্চার ফল
হয় না । বাহার অধিকারের অঙ্গুগামী হইয়া
চলে,—কার্য্য করে, তাহারাই প্রার্থয়া প্রাপ্ত
হয়,—কৃতকার্য্য হয়, অন্তে অকৃতার্থ হইয়া
কিরিয়া আইসে ।

শব্দ বলেন, যোক্তের একমাত্র পদ্য
জ্ঞান, রামাহুজ বলেন, তাহা ভক্তিমুখিত
হওয়া আবশ্যক । বাহাই হউক, জ্ঞান অথবা
ভক্তি, দুইটির একটিও সহমলভ্য নহে ।
শব্দের তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ও রামাহু-
জের পরাভক্তি কিরূপ প্রভেদযুক্ত, তাহা
সংক্ষেপে বলিতেছি । শব্দ ব্রহ্মাকারা অথ-
চিত্তবৃত্তিকে তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান বলেন,
রামাহুজও যোক্তব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তিকে । পরা
ভক্তি বলেন । সুতরাং তাহাও জ্ঞানবিশেষ ।
রামাহুজ ব্রহ্মপক্ষের অর্থে সম্পূর্ণ বড়-গুণবোদ্ধী
পরমেশ্বরের গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই
পুরাণাদিবিবর্তিত নাম বাহুদেব ও বিষ্ণু প্রকৃতি ।
অতএব, শব্দের তত্ত্বজ্ঞান ও রামাহুজের
পরাভক্তি, দুইটির একটিও সহমলভ্য নহে ।
দুইটিই হঃসম্পাদ ও ধ্যানসাধ্য । এই ধ্যান-
সাধ্যতাবিষয়ে জ্ঞানবাদী শব্দ ও ভক্তিবাদী
রামাহুজ উভয়েই একমত এবং উভয়েই—

“জ্যোতস্বাঃ ক্রতিবাক্যোক্ত্যাঃ বহুবাক্যোপপত্তিভিঃ ।

বহা চ সত্যতঃ শোষ এতে বর্ণনহেতবঃ ।”

এই স্বতিবাক্য মাত্র করেন ।

“মুক্তি:তাহাপি ন বাধ্যত নিঃশেষবনপরোক্ষাদুঃখা”
 যেমন প্রণিধানরূপ সাক্ষাৎকার বাস্তব উপ-
 দেশ ও মুক্তি দ্বারা নিঃসৃত হইয়া না,—নিবৃত্ত
 হয় না, তেমনি ভাবনাময়ধ্যানজ্ঞাত কিংবা
 প্রণিধানময়ধ্যানপ্ৰভব জ্ঞানবিশেষক বাস্তব
 কেবল উপদেশে মুক্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞান
 অর্জন করা যায় না। ধ্যান দুইপ্রকার—
 এক ভাবনাময়, অপর প্রণিধানময়। সম্বন্ধবাদী
 ও অব্যবহাদী উভয়েই উক্ত বিবিধ ধ্যানের
 এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করেন—

“ভাবনাময়ঃ নাম নৈবনিহানিবলপরিহিতবিষয়ঃ
 পূৰ্বব্যাপ্যতত্ত্বঃ । প্রণিধানময়ঃ বস্তুতত্ত্ববিষয়ঃ ।”

বেদান্তীরা এই বিবিধ ধ্যান বর্ণনা করিয়া
 বলেন—

“বিবিধমপি ধ্যানঃ শুদ্ধঃ বস্তু প্রতিপিন্দোয়াব-
 ত্তকম্ ।”

বাহ্যে বা বিতৃত্ত বস্তু জানিবার জন্ত—ব্রহ্ম
 জানিবার জন্ত প্রস্তুত হইবেন, তাহাদের পক্ষে
 উক্ত বিবিধ ধ্যান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রামানুজস্বামী এইস্থলে বলেন, প্রণিধানময়
 ধ্যান অপেক্ষা ভাবনাময় ধ্যান ভাল। সাক-
 স্নেহের পক্ষে না হউক, অন্তর্য তত্ত্বজ্ঞান অধি-
 কারীর পক্ষে ভাল। বেদান্তীরা বলেন—

“ভাবনাময়ধ্যানেন বন্দিত্বতঃ চিত্তঃ ক্রমশো মূর্ত্যা-
 কারতঃ প্রচায়া অব্যক্তসাক্ষ্যাবলম্বনো ভূতা বিরাড়ানৌ
 কারণে ব্রহ্মনি চিত্তঃ প্রণিধানাৎ । তত্কাহরতথ্যতত্ত্ব
 বিরাডাদিত্যতত্ত্ব ব্রহ্মদর্শনস্য চিত্তবিরহীকরণেন অবিষ্টান-
 ত্ততত্ত্বতত্ত্ববর্ণনেন এবিলাপনকরণম্ । তত্কাহরতত্ত্ব
 দক্ষেরানলবৎ বহুদুঃখাভ্যঃ সং বহুদিসরূপা কাচি-
 দানন্দাবস্থা আবির্ভবতি সা মুক্তি: ।”

প্রচলিত বস্তুভাব্য কথাসুগির ব্যাখ্যা
 বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়। সেজন্য
 ব্যাখ্যা না বলিয়া, মাত্র দুই তাত্পর্য্যটুকু

বলিতেছি। প্রথমত চিত্তকে ভাবনাময় ধ্যান
 দ্বারা বন্দীভূত করিতে হয়। চিত্ত বন্দীভূত
 হইলে অগ্নে অগ্নে ও ধীরে ধীরে সে মূর্ত্যাবলম্বন
 ভাগ্য করিয়া অব্যক্তাবলম্বী হইয়া থাকে। এই
 অব্যক্তার বিধিকারণ বিরাট, হিরণ্য ও ঈশ্বর
 তবে প্রণিধানতৎপর হইতে হয়। প্রণিধান-
 ধ্যান চিত্তপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে এক-
 প্রকার সাক্ষাৎকারকারী জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া
 থাকে। তাহাতেই, যেমন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার
 হইলে তিরিমেথে ব্রহ্মবিষ্টানের সর্বাভ্যাস
 লুকাইয়া যায়, তেমনি, আত্মাধিষ্ঠানস্থ বিরাট,
 হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, এই তিন অবভাসও লুকাইয়া
 যায় এবং তৎসঙ্গে ব্যটিনিয়মের বিশ্ব, তৈজস,
 প্রাজ, এ সকল অবভাসও (মিথ্যা জ্ঞান বা
 মিথ্যা জ্ঞানপ্রভব কল্পনাদিমূহ) বাধিত হইয়া
 যায়। তখন অবশিষ্ট থাকে প্রণিধান
 বা ধ্যানপ্রবাহ, তাহাও কাঠতাম্বকারী বলিয়া
 তার আপনা-আপনি উপশমপ্রাপ্ত হয়।
 এই উপশমের পর একপ্রকার অশুশ্রুতল্য
 অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা তন্ন-
 তমাবলম্বিত, পূর্বাগরবিভাগমুক্ত ও আত্মস-
 মধারহিত আনন্দাবস্থা এবং এই অবস্থাই
 বেদান্তীদিগের অভিমত মুক্তি। এই স্থানে
 রামানুজ বলেন, আদর, নৈরন্তর্য্য, ও সংকার
 সহকারে ও বিবিধে দীর্ঘকালব্যাপী ভাবনা-
 ময় ধ্যান করিতে করিতে অগ্নে অগ্নে জীব
 তত্ত্ব হইয়া যায়,—কটুবিশেষের পতন
 হওয়ার অল্পরূপে ধোয়সারূপ্য অর্থাৎ তপস্ব-
 সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সেই তপস্বসারূপ্য-
 প্রাপ্তিই তাহার মুক্তি,—জীবমুক্তি, অত
 কোনরূপ মুক্তি নাই। সূক্ষ্মপ্রাপ্তি
 হইলে জীব দেহপাতের পর সম্পূর্ণ

যজ্ঞ-গুণ ভগবানের অগংকৃত্য গুণ বাতীত
অত্যন্ত সমুদয় গুণ প্রাপ্তি হয় ও ভগবৎ-
বাধ্যতা ও নিত্যনিরতিশয় নির্বল আনন্দ
অনুভব করিতে থাকে। মৃত্যুপুরুষকে
অস্বাস্থ্যপরিগ্রহ করিতে হয় না কেন? না,
অস্বাস্থ্যপরিগ্রহের কারণ বা বীজ কর্তৃক বা
শক্তিকর্তৃক ঔহার থাকে না, জ্ঞানান্দি-
গত হইয়া যায়। তাই ঔহার অস্বাস্থ্য হয় না।
একাস্ববাদীর মুক্তিত্ব বুঝাইতে গেলে

একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি না হয় কেন?
আমি, তুমি, তিনি, আমরা সকলেই সাধনা
বা জ্ঞানপ্রাপ্তির চেষ্টা করি কেন? হিমালয়-
শৃঙ্গার সম্যাসী জ্ঞান উপাঞ্জন করিতেছেন,
তিনি যখন মুক্ত হইবেন, আমি ও তখন মুক্ত
না হইব কেন? এইরূপ অনেকানেক
আপত্তি শুনন করিয়া সামন্তত্বকা
করিতে হয়, না করিলে অপরূপতাবোধ
থাকে।

শ্রীকালীধর বেদান্তবাগীশ।

ত্রিবন্ধুর।



৩

ত্রিবন্ধুরে এই-বে প্রথম রাত্রি আমি অতি-
বাহিত করিতেছি, এই রাত্রির শেষভাগে
আমার ছাদের উপর একটা ভীষণ কোলাহল
উপস্থিত। হুড়াহুড়ি, ধোঁড়াধোঁড়ি, তাহার
পর লড়াহুড়ি। আমার নিবাসগৃহ চারি-
দিকে খোলা, এই মনে করিয়া আমার মানস
মধ্যে সর্বদাই একটা অস্পষ্ট উদ্বেগের ভাব
ছিল। এখন যেন আমি আধো-ঘুমন্ত অব-
স্থায় ঘেঁষিতে পাইলাম, কতকগুলি বড়-বড়
বিড়াল লক্ষরূপে দিগ্বা কর্তৃকরণের চীৎকার
করিতেছে। রাত্রির নিশ্চলতাভেদে ও গৃহের
মধ্যে কাঠের কাণ্ড অধিক থাকায়, বেশি শব্দ
হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। আসলে
উহা পার্শ্ববর্তী স্থানের বনবিড়ালের পদশব্দ
তির আর কিছুই নহে। সমস্তদিন উহার
উড়ানদ্ব বৃক্ষের উপরে নিদ্রা যায়; রাত্রিকালে

শিকারে বাহির হইয়া আশ্বিনোদন করে এবং
বৃষ্টাসহকারে মহাব্যারাজ্য আক্রমণ করে।

অতি প্রত্যুষে, ত্রিবন্ধুরে আমার মনে
একটা বিবাদের ভাব আসিয়া উপস্থিত
হইল। উহার প্রথম আবেগেই, ভীষণ একটা
শোকহৃৎক কোলাহল উৎপন্ন হইল। দশটা
যেন একটু দূর হইতে আসিতেছে,—ব্রাহ্মণ্যের
সেই পূতভূমি হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে
হইল। হাজার-হাজার শোক একসঙ্গে
চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; উহা যেন সমস্ত
মানবমণ্ডলীর আর্তনাথ; সমস্ত মানব-
মণ্ডলী যেন আগ্রস্ত হইয়াই আবার সেই চির-
শুন পৃথিবীর দুঃখকষ্ট অনুভব করিতেছে—
বৃত্তান্তিভার ভারে নিপেষিত হইতেছে।
তাহার পরেই, বিহ্বলতা নব-ভাষকে অভি-
বাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু বসন্তকালে

উহার আশাযের কলবাগানে বেকশ মুক্তলম্ব-
ধরণে অমধুর প্রভাতী গাহিয়া থাকে, টহা-
দের সঙ্গীত শেক্সপারে নহে ।

এখানে, 'নকুলে' টিরাপাবীর স্থল কর্তৃ-
করে—বিশেষত কাকের শোকবিবাহবর
চীৎকারে ছোট-ছোট পাখীর কলধ্বনি
আচ্ছন্ন হইয়া যায় । এখানে, স্নেহভরূপ
পৃথকভাবে দুই একটা কা-কা-শব্দ হ্রস্ব হয়,
তাহার পর শব্দকর্ত্ত—সহস্রকর্ত্ত কা-কা-
শব্দের ভীষণ সমবেত-সঙ্গীত বাহির করিয়া,
কাকেরা পুষ্টিগন্ধি শব্দসেহের অর্থবোধনা করে ।

.....কাক, কাক, সর্বত্রই কাক, ভারত-
ভূমি কাকে আচ্ছন্ন; বরাবর দেখিতেছি,—
জিবছুরে, এই মনোমুগ্ধকর শান্তিবিষ রাজ্যে,
—উবার আরম্ভ হইতেই উহাদের চীৎকারে
তালতরঙ্গমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠে, এবা, বাহায়া
উবার অম্বর পত্রপুঞ্জের নীচে বাস করে ও
আগ্রত হয়, তাহাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সহসা
শুভ্রিত হইয়া যায় । কাকেরা যেন এই কথা
বলে—“সমস্ত মাংস কখন পচিয়া উঠিবে,
তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা এখানে আছি,
আমাদের খাদ্য নিশ্চিত মিলিবে, আমরা
সমস্তই আহাৰ করিব ।”.....

তাহার পর, তাহারা চারিদিকে উড়িয়া
যায়, আর তাহাদের সাড়াশব্দ থাকে না ।
আহার বহুব্যয় দূর-কোলাহল স্রুত হয় ;—
অতীব প্রবল, অতীব গভীর ; বেশ বুঝিতে
পারা যায়, অসংখ্য ব্রাহ্মণ কোন বৃহৎ মন্দিরে
সমবেত হইয়া স্বকীয় দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিতেছে । তাহার পরেই, 'জিবজ্রম'-
নগর যে তালকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত, তাহার
চারিদিক হইতে ঢাক-ঢোল, করতাল-শব্দের

মিশ্রিত কল্লোল এখানে আনিয়া পৌছে ।
অরণ্যের মধ্যে যে সকল ছোট-ছোট দেবালয়
ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে,—সেই সকল
মন্দিরে ইচ্ছাট দিবসের প্রথম পূজা ।

অবশেষে স্বর্গের উদয় হইল । সম্পূর্ণ-
অবারিত এই সকল গৃহে স্বর্গায়ণি প্রবেশ
করিল । অজ্ঞাত গৃহ ও নৈশপদার্থের
মধ্যে তত্ত্ব ও পাতলা 'চিক্' ভিন্ন আর কোন
অস্তরাল নাই । এই আলোকে, এই আলার
চমৎকার আলোকে, এই অমধুর সময়ে, উবার
সমস্ত বিবরতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল ।
আমি উদ্ভানে নাখিলাম ।

তালবনের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকা জায়-
গার এই উদ্ভানটি অবস্থিত । ইহার মধ্যে
কত শাণলত্ব, কত গোলাপি-রঙের ফুলের
বৃক্ষ, কত পর্ণত্র (fern) ; উত্তম আর্জ-
হানেই এই পর্ণতরুগুলি জন্মায় । এজন্য অপরূপ
পত্রপুঞ্জ ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দেখা
যায় না । এইভাবেই সর্বপ্রকার বৃক্ষই
এখানে আছে । কোন কোন পাতার
ফুলের মত রং ; কোনটা ঘোর লাল, কোনটা
বেগুনি, কোনটা নীল-বহুবর্ণ ; কোনটার
সরোবপজাতীয় জীবদিগের 'পুষ্টের স্রাব
ডোহাফাটা ; আবার কোনটার গায়ে, প্রজা-
পতির পাখার বেঙ্কণ থাকে, সেইরূপ চোখ
আঁকা ।

প্রাতে ৭টার—যে সময়ে তরুবাগিচামণ্ড-
লে নিশার শৈত্য একেবারে চলিয়া যায়
নাই—সেই সময়েই এখানকার শলাকদিগের
দেখাশুনা করিবার, নোক-লৌকিকতা করি-
বার সময় ।—অস্বপ্নের দাঁতির সম্পূর্ণ বিপ-
রীত । আমি সংবাদ পাঠ্যাম, তাল এই

সময়ে, রাজ্যের সহিত পরিচিত হইবার অল্প, আমাকে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

বধ্যাহ্নের কাছাকাছি,—এত ভালবুকে, এত ছায়া সম্বোধ, উদ্ভগমনাবলম্বী সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে জীবনপ্রবাহ যেন সহসা শুষ্কিত হইয়া গেল। সর্বদাই যুগল ভাব, সর্বদাই নিশ্চিন্ততা; সেই চিরন্তন ব্যর্থসেবাও নিশ্চয়,—পূজপুষ্পের নীচে ভূতলে উপবিষ্ট।

আমার বারতা হইতে যে রাত্ৰাট দেখিতে পাইতেছি, উহা হরিতের নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা পৰ্য্যন্ত উহা লোকপুত্র থাকিবে। এখনও দুইচারিজন পথিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে; উহার। নিজ নিজ কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; ভারতবাসী অথবা ভারতবাসিনী; পরিধানে একইরকম লাগভূতি; উজ্জলপ্রানবর্ণ তাম্রভ্রাতা—নগপদে নিঃশব্দে চলিতেছে। লোকদিগের লালচে-রঙের কাপড়; এবং উহার। লাল-বাটির উপর দিয়া চলিতেছে; এদিকে তালপুঞ্জের অত্যাশ্চর্য হরিদ্বর্ণ;—এই বৈপরীত্য-সংযোগে লালরঙের আরো যেন খোলসাই হইয়াছে। কঁধন-কখন, কোন নিঃশব্দ শুকপদক্ষেপে পথভূমি কাঁপিয়া উঠিতেছে। উহা হস্তীর পদক্ষেপ। মহারাজার হস্তিগণ, কোনো মেঠো কাজ সমাধা করিয়া, চিন্তাময় হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে; উহার। হস্তিশালায় গিয়া এইবার নিদ্রা যাইবে। ইহার পর, আর কিছুই শুনা যায় না। কেবল যে সকল জীব স্বকীয় স্বাভাবিক গতির উন্নত উজ্জ্বল সর্বদাই ফল, সেই তরুণবাসী চটুল কাঠবিড়ানীরা চারিদিক্‌র নিঃশব্দতার

সাধন পাইয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সাতাহ্নে, যখন মনুষ্যের চোটা-উত্তম আবার আরম্ভ হইল, তখন আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহারাজার পদভিত্তে আমি আরোহণ করিলাম। অধমিপের দ্রুতগতিতে আমার মনে যেন একটা শৈত্যবিশ্রম উপস্থিত হইল।

এখন, জীবন্তমনগরের আর-এক নূতন বিভাগ আমার চকুস্পর্শে প্রসারিত। এখন আর বৃক্ষের আধিপত্য নাই,—শাখলত্বমি উহারের স্থান অধিকার করিয়াছে,—কতকগুলি বাসুকাকর্ণ স্বন্দর বীধি প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিক-ধরণের রামধানীতে যে সকল দ্রষ্টব্য বস্তু থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই উত্তমানসুহৃৎ অভ্যন্তরে বিকর্ণ রহিয়াছে :—মহাপ্রভবন, আহারালয়, কর্জ-কুঠী, বিজ্ঞালয়। এ সব জিনিস তত বেহুয়ো-বেধাঙ্গা বলিয়া মনে হইত না,—যদি একটু ভারতীয়-ধরণে গঠিত হইত; কিন্তু, আত্মা-দের এই বর্তমান যুগে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই একই প্রকারের কচিনোব দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া, এখানে প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাটলিক ও সিরিয়া সম্প্রদায়ের বিবিধ বৃষ্টান গির্জাদিও আছে। এই সিরিয়া-সম্প্রদায়ের গির্জাগুলি সর্বাঙ্গোৎকর্ষ পুরাতন এবং উহারের সমুখ-ভাগের আকৃতিটি নিত্যন্ত সাদাসিধা-ধরণের। কিন্তু সে বাহাই হোক, এ সমস্ত দেখিতে আমি জীবন্তুরে আসি নাই। এখন আমি বৃত্তি-তেছি, ব্রাহ্মণভারতের—বহুভাগীয় ভারতের সংস্পর্শে আসা কতটা কঠিন,—যদিও সেই জীবন্ত ভারত, সেই অপরিবর্তনীয় ভারত

আমার খুব নিকটেই রহিরাছে বলিয়া আমি অস্বস্ত্য করিতেছি এবং উহার মহারহস্য আমার চিত্তকে সততই বিকল করিতেছে ।

নগরের এই নব অঞ্চলটির বাহিরে, যে সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে সমস্ত নীচজাতীয় হিন্দুরা বাস করে, জাহার উপর ভাল-ভর্য হরিৎ বিলান প্রসারিত । বাশের ছোট-ছোট মাড়ী, পাথর ও খড়-পাতার ছোট-ছোট পুরাতন বেলাঘর, সেই চিরন্তন নারিকেলপত্রের মধ্যে অর্ধপ্রচ্ছন্ন; এই স্থানটি ছায়ায় ঢাকা এবং ইহার বীথিগুলি তমসাক্ষর উদ্ভিদের ঢাকা-বারিঙা-পথ বলিয়া মনে হয় ।

কেবল একটিনাত্র রীতিমত রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া, নক্ষত্র-পরিদৃষ্টমান একটা মুক্তস্থানে আসিয়া পড়িলাম এবং এই রাস্তা দিয়াই ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র গণ্ডির বারমেশে উপনীত হওয়া যায় । এই রাস্তাটি বর্ণি-বীথি; নিম্নস্তম্ভ প্রায় এই যে মগর, ইহার গাছ-কিছু চোচল, বাহা-কিছু কোলাহল, সমস্তই এইখানে কেন্দ্রীভূত । সারাদিগের এই সময়ে, এই রাস্তাটি লোকাধীর্ণ; এই-খানে বোড়াদিগকে একটু আন্তে-আন্তে চালাইতে হইল । লোকদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন সব দেবমূর্তি, এমনি স্তম্ভের মূখ্য, এমনি পোতন-গঞ্জীর ঝড়াইবার ভক্তি এবং হুগতীর অন্তলম্পর্শ চোখের মৃষ্টি ।

এই লোকদিগের বাহ ও গাত্র যেন তাম্র-বাস্ততে ক্ষোদা—চূড়ান্ত গঠন-উৎকর্ষ ও মূল্যক ভঙ্গিমায পুরাতন গ্রাঁপের উৎকর্ষ ।

হৃদয়চিহ্ন ও মহাপৌরবাসিত উন্নতপথবিব্রাহণেরা সামান্যতঃ তুচ্ছ-করিয়া, নিকট-বর্ণের লোকদিগের অপেক্ষা—এমন কি, পারিগ্রামিগের অপেক্ষাও বহু-পরিচ্ছদে যাতায়াত করিতেছে । শাদা কাপড়ের ভূতি কোমরে জড়ানো এবং তাহাই নববস্ত্রের উপর, চোপ্তাদের মত বক্ষভাবে গিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে; সেই নববস্ত্রে ছোট একটা শণ-হুতার দড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই । ইহাই বর্ণভেদের বাহ্যচিহ্ন; সম্ভাব্যমাত্রই পুরোহিত উহা গলার বাধিয়া দেয়; উহা কম্বিন্কেলেও আর ভাগ করিবার জো নাই; এই পবিত্র বস্ত্র-ব্রাহ্মণের জীবন-মরণের সাথী । উহাদের লগাটদেশে, পতীর কৃষ্ণবর্ণ নেত্রবহরের মাথামানে স্বকীয় ইষ্টদেবতার সাংকেতিক নাম অঙ্কিত থাকে, ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গস্বরূপ এই চিহ্নটি প্রতিদিন প্রাতঃস্থানের পরে উহাদিগকে নূতন করিয়া সব্বত্র লগাটে অঙ্কিত করিতে হয় । একটা লাল কঁটা ও তিনটা শাদা রেখা—ইহাই শৈবদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন; বৈষ্ণবদিগের একপ্রকার শাদা ও লাল রঙের ত্রিশূলরেখা, বাহা ক্রমেরে মধ্যস্থল হইতে আশ্রিত করিয়া বেশ পর্য্যাপ্ত উদ্ভিত হয় । এই সাংকেতিক চিহ্নগুলি আমাদের পক্ষে নিতান্তই প্রােহলিকা ।

ত্রীলোক খুব অল্প কিস্থা নাই বলিলেই হয়—যদিও প্রথমদৃষ্টিতে, গ্রাহ্যবস্ত্র বা কঙ্কের উপরে বিশদিত হুচিকণ দীর্ঘ-কেশস্তম্ভ দেখিয়া পুরুষদিগকে ত্রীলোক বলিয়া সর্বত্রই ভ্রম হয় । যে সকল ত্রীলোক দেখা যায়, তাও প্রাচীন অতি নোচবর্ণের—তাহাদের

দুখী রাজ্যের মজুরবন্দীদের জায় নিত্যই
ইতরধরণের। অবশ্য ব্রাহ্মণদের পত্নী ও
কস্তাগণ এই পবিত্র গণ্ডির মধ্যে বাস করে।
সন্ধ্যার সময় উহার দলে দলে চারিদিকে
দুহিয়া বেড়ায়।

এই সময় বাড়ী,—বাহা পতরাজে,
সোলাহ-প্রশান্ত-কিরণ তলে, নিশ্রামথ ও
হুজিভনের বলিরা মনে হইয়াছিল একপে
উহা জীবন-উত্তমে পূর্ণ। এখন উহাতে
বাজার বসিয়াছে; কল, শত-বাঁনা, রঙিন
ফুলের ছায়া-দেওয়া মিহি কাপড়; সোনার
মত কক্করকে পিতলের সামগ্রী :—এই
পিতলের সামগ্রীর মধ্যে, বহুভালবিশিষ্ট
পাতলা-পটনের প্রায়শ খুব উচ্চ পারায়
উপর বসানো—(বেরূপ 'পল্লে'তে দেখিতে
পাওয়া যায়) বিবিধপ্রকার পুজার বাসন
ও পাত্র, এবং হস্তীর উপর আরুঢ় দেবদেবীর
মূর্তি।

তাহার পর, আমার প্রদর্শকমহাশয়
আমাকে কতকগুলি কুমারের কণ্ঠস্থান
দেখাইলেন। এই সকল কারখানা বর্তমান
মহারাজার স্থাপিত। এখানে হুন্সর প্রাচীন-
ধরণে মুংগািদি প্রস্তুত হয়।—আর কতক-
গুলি কারখানা দেখিলাম, যেখানে রাজ-
পুতানা ও কান্দীর প্রচলিত রঙের অমু-
করণে পশদের গালিচাদি তৈয়ারি হয়।
অবশেষে কতকগুলি শিরশালা দেখিলাম,
যেখানে বৈষ্ণাবালী কোদকেরা নিকটস্থ
অরণ্যস্থলীদের দস্ত দুহিয়া দেবদেবীর
ছোট-ছোট হুন্সর মূর্তি অথবা চামরের ও
ছাতার আঁতি নির্মাণ করিতেছে।

কিন্তু এসব দেখিবার জন্ত আমি

জিবছুরে আসি নাই। রাজপ্রাসাদপার্শ্বের
বাহিরে ও নিষিদ্ধ প্রবেশ, বৃহৎ দেবালয়ের
অভ্যন্তরে যে সকল ব্যাপার হইয়া থাকে—
বাহা নিত্যই ভারতীয়—বাহা ভারতের
একেবারে নিঃস্ব-মিসিং—কেবল তাহাই
দেখিবার জন্ত আমার মন আকৃষ্ট হয়।...

জিবছুরে একটি পণ্ড-উত্তান আছে; আমা
দের যুরোপীয় রাজধানীসমূহের পণ্ড-উত্তান-
গুলির জায় এটিও সম্ভবতঃ :—ইহাতে
হরিণদের বিচরণভূমি আছে, হুজীরের
চৌবাচ্চা আছে :—এটরূপ • স্থান অতি
বিস্ময়-বাসনোদী নিবিড় ভালপুঞ্জের দ্বারা
হইতে বাহির হইয়া এই স্থানটিতে আসিয়া
অরণ্য ও জঙ্গলের দূরদূর একটু দেখিতে
পাওয়া যায়। এখানে কতকগুলি শাবলভূমি
আছে, তাহার চারিদিকে হুন্সর গাছের চারা
ও বড় বড় বিদেশী ফুলের গাছ লাগানো
হইয়াছে। এই অংশটি এমন ভাবে নির্মিত
যে, এখানে বেশ নিরাপদে বিচরণ করা যায়;
কেন না, এখানকার ভূগাণি উদ্ভিদ সমুদ্রে
ছাঁটা, এবং যে সকল ব্যায়সপাণি হিংস্রজন্তু
এখানে হইতে হস্ত হরণাতক্রোশ দূরে জঙ্গলের
মধ্যে হুকুভাবে বিচরণ করে—এখানে
তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ। স্বর্ঘ্য এখন আর জগৎকে
দৃঢ় করিতেছে না—রাজিও আসিয়া পড়ে
নাই; এই অলম্বারী, মনোহর সময়টিতে
একদল ঐকতানবাদক, উত্তানের দারহীন
চারিদিক-খোলা একটি ক্ষুদ্র বিনোদন্যারে
বাজাইবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছে। উহার।
সকলেই ভারতবর্ষীয়; উহার। যুরোপীয় নয়
অতি বিকৃতভাবে বাজায়। বালুকাবিকীর্ণ
উত্তানের হুঁড়িপথগুলিতে অধিষ্ঠিত—হুন্সর

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে—কতকগুলি পাতলা-পাতলা
নয়গাজ ব্যক্তি অবস্থিত; যেতরাতীর দুই-
চারিটি খোকা-পুঁকি—(যেতরাতীর মধ্যে
দুইচারিজনমাত্র এখানে আছে) রং খুব
কঁকাসে—জ্বরতর খাতীর ফ্রেণ্ডে অব-
স্থিত। তা ছাড়া, দৈন্য শিশুও কতকগুলি
ছিল—রাধাশের ছেলে; কিন্তু কি দুঃখের
বিষয়, এখন তাহারা আর নিজেদের জাতীয়
পরিচ্ছন্ন পরিধান করে না, পরন্তু উত্ত-অস্থিত
পাশ্চাত্যপুত্রদের ছদ্মবেশ ধারণ করে;
তাম্রবর্ণবর্ণের। এই নরপুত্রিকাগুলি অতি
সুন্দর, আর চোখগুলিও খুব বড়-বড় ও
কালো মধ্যমলের মত। এই পশু-উভানটি
একটু উচ্চত্বের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার,
দূরত্ব তারতম্যের অন্ন অন্ন দেখিতে পাওয়া
যায়; কিন্তু এ সমুদ্রে জাহাজ নাই; অস্ত্র-
দেশে সমুদ্র বাহনগতের সহিত গতিবিধির
পথ বলিরাই পরিচিত; কিন্তু এ সকলের
সমুদ্রটি একেবারেই অবাবহাৰ্য্য ও মহাঘোর
প্রতিকূল্যাত্মক; যোগনিবদ্ধ করা দূরে
থাকুক, বাহনগতের সহিত উহা যেন আরও
বেশি পৃথক্ করিয়া দেয়। কেন না, এই
উপকূলের কোথাও একটি বন্দর নাই;
এমন কি, একখানি নৌকাও নাই, বীঘরও
নাই, কেবল চারিদিকে হলুদা বীচিমালা।

• জিব্রল্টরের এই 'সৌখীন' দিবাবসানসময়ে
যখন কেবলমাত্র দুইচারিটি বেচারি খোকা-

পুত্রের মস্ত একতানবাত্ত বাদিত হয়,
তখন ঐ দূরত্ব সমুদ্রের উপলক্ষ্যে শ্রবণীয়
মনে কষ্ট ও বিধানের ভাব আরো যেন
বাড়াইয়া তুলে।

একদা সূর্য্যোদয়ের অন্ত গেলেন—বড়
শীতল অন্ত গেলেন: কণেকের অগস্ত্য মহিমা;
দেখিলে মনে হয়, যেন রক্তবর্ণ ভূমির উপর
গোলাপি রংমশালের আলো, এবং তৃণপুঞ্জের
উপর—দিগন্তব্যাপী হুর্ভেদ বনভূমির উপর—
সবুজ রংমশালের আলো পতিত হইয়াছে।
তাহার পর অতি শীত (সহসা বলিলেও হয়)
রাজির আবির্ভাব হইল। এখানে দীর্ঘ-
বিদ্রবিত গোপুণি নাই—ঠিক্ একই অপরি-
বর্তনীয় সময়ে রাজি আসিয়া পড়ে—আমাদের
দেশের স্তার এই সমরটি স্বভূর উপর কোন
প্রভাব প্রকটিত করে না। উভানে রাজিটা
যেন আরো বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে—
কেন না, ইতার সোপাঙ্কড়ের সূঁড়িপথে, তাল-
পুঞ্জের নীচে—চতুর্দিকের সকল স্থানই ইহারই
মধ্যে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সময়ে
ব্রহ্মার মন্দির হইতে একটা কোলাহল উদ্ভিত
হইল; আর সমস্ত অস্ত্র-ইত্যন্তোবিকীর্ণ
মন্দির হইতে, প্রাতঃকালের ন্যায়, আবার
শব্দবণ্টা বাজিয়া উঠিল। নারিকেল-তৈল-
সিক্ত শতমহন্য শ্রাবীপ বনভূমিতে প্রজলিত
হইল এবং এই লাল আগুনের আলোকচ্ছটা
অন্ধকারাচ্ছন্ন পথসমূহে এসম্মিত হইল।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবাহযাত্রী ।

[ছবি]

দেখলাম একটা ঘাঞ্চে বিয়ে
সমারোহে রাত্তা দিবে ।
রাত্তার চুপার চণেচে ছই 'এসেটেলিন্ ল্যাম্পের' সারি ;
প্রথমত ঢোল ও কানী,
তাহার পরে দক্ষ বানী,
তাহার পরে গোয়ার বাস্ত, তাহার পরে সানাইদারি ;—
বানী, সানাই, ঢক, ঢোল,
কঙ্কে মিলে হট্টগোল ;
সবই আছে, নাটক কেবল মৃদঙ্গ ও হরিরবোল !

একটি যুবা—জুগোর, ত্রুণ,
চড়ে' একখান চতুরঘ
মঙ্গলতি 'ফেটিনাথ' ধানে, ঘাঞ্চে মগোরবে ;—
অতি হুপ্রদর মূর্তি ;
পরনে তাঁর রেশ্মি কুর্তি,
রেশ্মি ধুতি, অরির টুপি ; —বরস বছর পঁচিশ হবে ;—
অবিদ্যুতপরিসর,
যেন বিদ্যা মহীধর,
কিবা ইচ্ছা ঐরাবতে ;—তিনি হঞ্চে বিয়ের বর ।

পিছনে তাঁর, ইতস্তত,
ধুমকেতুর লেজের মত,—
আসছে নামাবিধ শকট অচ্যবিত্তর অঙ্ককারে ;
তাতে বরযাত্রিবর্গ—
(তাঁরা মাত্র উপহর্গ)
এ কার্যে প্রকৃতান্তরে মনুসাহ দিত তাঁরে ।

(দ্বিধে দত্তবিধির নাপ

বিধে যদি হ'ত পাপ,—

• তাঁদেরও এ বিধের জন্ত পেতে হ'ত মনস্তাপ ।)

—এখন এটা বড়ই ইতর

বরের আসল মনের ভিতর

কিরকমটা হচ্ছিল, তা খুঁটিয়ে দেখা বারেকারে ;

সে সময়, সে স্থানে, আনি,

সে ব্যাপারে, একটুখানি

তাহার মনে মনে গর্ক,—সে ত যতই হতেই পারে ;

'ওয়েলিংটন্' 'ওয়াটসন্'জয়

করেছিলেন যে সময়,

তখন অদ্বীপ মনের ভাবটা হওয়াও তাঁর আশ্চর্য্য নয় !

সুসজ্জিত দিবাসাগ্রে ;

নানাবিধ বাস্তব বাজে ;

তা'তে 'এস্টেটলিন' আলো ; তা'তে চতুরধ গাড়ি ;

[যদিও সে বাহকস্বকে

অবস্থিত 'ল্যান্সের' গদে

বাণ্যে কুন্ত মাতৃহৃৎ উঠে আসে অতর ছাড়ি'

যদিও সেরকম সাজ

পর্বে আমার হ'ত সাজ,—

বিংশ শতাব্দীতে একটু বেশী পৌরাণিকী ধাঁজ ;

যদিও সে গাড়িখানা

কোথাও কর্ক করে' আনা ;

• বরষাঙ্গী—দূরে থাকুক দেখা বরে সসম্মানে—

বরের সজ্জা, ধরণ দেখে,

হাসিছে মুখে কমাগ ঢেকে ;

তাকাচ্ছিলও পথিকবৃন্দ বরের চেয়ে পোষার পানে ;

যদিও সে বাস্তব—হোক

কেবলমাত্র গোলোযোগ ;—

বাদক এবং শ্রোতার পক্ষে দম্বরমত কণ্ঠভোগ ;)

তথাপি সে বরের পক্ষে,
 (অন্তত তাঁর নিজের চক্ষে)
 সে রাত্রিটি ভবিষ্যতে 'স্বর্গীয় সৃথক্' করে' ;
 দেখছিলেন সে সমায়োহে
 একটু হর্ষে, একটু মোহে,
 একটু বিচলিত বক্ষে, একটু যেন নেশার ঘোরে ;
 শুনছিলেন সে বাস্তব-
 মধ্যে যেন আশ্চর্য-
 (তাবী বহুত মলের লক্ষ শোনাও নয় ক' অসম্ভব !)

দেখছিলেন "এ কোথা থেকে,
 হু গুণে অলঙ্ক মেখে,
 পেশোয়াঝে মর্তে নেমে এসেছে অপরাধবর্ণ ?"
 ভাবছিলেন "সে—তাবী বধু
 (বাহিরে-অন্তরে মধু)
 মর্ত্যে যদি-বর্ণ থাকে—সেই বর্ণ,—সেই বর্ণ !
 পূর্ণ সর্ব মনোরথ :—
 প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ
 ব্যাপি", একটা পুণ্যকর্ণ আলোকিত ভবিষ্যৎ ।"

ভাবছিলেনও করে' হস্ত—
 "হোল অস্ত যে আরস্ত,
 ঐতিহ্যকারিত, দীপ্ত, স্নাত পূর্ণমহোৎসবে ;
 হোল সে আরস্ত যদি,
 সে আরস্ত নিব্বদি.—
 কালের মত ব্যাপ্তির মত কত না সমাপ্ত হবে ;
 [যদি বা সমাপ্ত হয়
 দর্শকবৃন্দ সমুদয়,
 পড়ে' সেলে ববনিকা, 'আকোর' কর্ণে অভিশর"]

ভাবছিলেন না তিনি "আছে
 এই আরস্তটির পাছে
 অনেক বিরাগ, অনেক বিবাদ, অনেক বিত্ৰী গুণগোলে ,

অনেক বাতাহানাহানি ;
 গর্জ্জনবর্ষণ অনেকখানি ;
 • অনেক অভিব্যক্ত ইচ্ছা—‘বাঁচি আমার মরণ হোলো’ ।
 পরে অস্তিত্বভাষাত্ত—
 আরম্ভটি অমিতান্ত ;
 তৃতীয়াঙ্ক-কাছাকাছি কিন্তু একটু অসম্ভাব ।”

তাব্দ্বিলেন না “পরিশেষে,
 পঞ্চমাঙ্কে পড়লে এসে,
 শিখন থেকে লোহহস্ত একটির এগে ধর্মে ছুঁটি
 নিচুর কঠিন কঠোর ভাবে,
 ছুঁটি ধরে’ নিরে বাবে ;
 চিরকালের মত সেদিন ভিন্ন হবে ভদ্ররহস্টি ;
 এ রহস্য হবে ভেদ ;
 বুচে বাবে সত্যল খেদ ;
 প্রেমের পদ্মপূর্ণ মাঝার পড়বে পূর্ণ পরিচ্ছেদ !”

—ভালবাসে প্রোতা, পাঠক,
 বটে, ‘মিলনাস্ত নাটক’ ;
 কিন্তু আমরা অসমাপ্ত গল্প শুধু শুনাই শুনা ;
 পূর্ণজীবন যদি লিখি,
 বেধাই সেটির সমাপ্তি কি,
 সব নাটকই ‘বিরোগান্ত’—কহি যদি সত্য কথা ;
 সব নাটকের শেষে হার
 একই মৃত্ত ;—সমুদ্র
 সেই একই চিত্তানলে ধুঁ কঠে’ পড়ে যায় ।

এই যে রাজি আঁধার অন্ধ ;
 উঠছে যে এই ঢাকের শব্দ
 নিশ্চকতার বিজ্ঞানচূর্ণ লুটে নিতে বারোবারে ;
 অন্ধকারকে ছিন্ন করে’,
 বাস করে’, জিহ্ন করে’,
 জগছে যে এই আপোকশ্রেণী সমুদ্রত অংকরে ;—

পরে তবু হবে বব,
 আলোক নিতে বাবে লব,
 —নিজের দণ্ডব্যাপী স্পষ্টা তখন, কর্ণে মনুতব ।

অনুকারের বিরাট রান্না ;—
 তাহে জ্যোতি হুচ্ছে বাহ,
 হুচ্ছে লুপ্ত,—সাগরবক্ষে বীণের মত, ইতস্তত ;
 মহাব্যাগ্ৰি পতীর তবু ;—
 তা'তে কোটি মণিশব্দ
 উঠে নামে, পরিবাণ্ড সাগরবক্ষে ঢেউয়ের মত ;
 মরণসিদ্ধি বিবমর
 ছেয়ে আছে সমুদ্র ;
 জীবন তাহে বিঘনম উদয় এবং বিলীন হয় ।

—হে কামা বিবাহবাণী !
 এই যে আলোকিত রাত্রি,
 এই যে বাক্সসমারোহ, দেখুছ অস্ত্র সঙ্গীতবে ;
 ভাবুছ কি হে—একদিন আশার
 (বটে সন্ধ্যা হ'লে যাবার)
 একদিন আবার অস্ত্ররকম সমারোহে বেতে হবে ?
 (তবে কিনা সেটা ঠিক
 নয় ক'ণ্ডরবাড়ীর দিক্—
 আলোক কিবা বাস্তব তা'তে থাক্বে নাক সমধিক ।)

সেদিন—বিনা গুণগোলে,
 (হৃদয় হরিবোলে)
 মনোগতি বাহকত্বের সোজাপথে চলে' বাবে !
 (এমন সমারোহ—আহা !—
 তুমিই দেখ্বে নাক তাহা ;
 কিন্তু পণের অস্ত্রসকল পৰিকমাজই দেখতে পাবে ;
 দেখ্বে তারা—হাচ্ছ বেশ,
 নাইক কষ্টদুঃখলেশ ;
 কিন্তু বারান্নে গুণে তা'দের কষ্টের পরিবেশ ।)

আপন বাড়ি সমর বেগে,
তোমার আপন বাড়ী থেকে
কর্কে সেদিন বহিষ্কৃত, স্নিয়ে বাধে দড়িত খাটে ;
তোমার আপন দেহ, 'বাদি'
হবার্মাজই, অবিস্বাসী ;
পুড়িয়ে তারে, নেহাইং একা রেখে আসবে স্রশানখাটে ।
(বেঈ কিয়া অন্ন হোক)
হুদিন তারা কর্কে শোক ;
পরে আবার অজ্ঞানে করে' নেবে আপন লোক ।

—হে কামা পকটাকড় !
বল্বে না আজ সে নিগূঢ়
সেই নিত্য সত্য রুচ ।—তোমার সুখের রাজি হেন :—
তোমার সুখে সবুৎসাহে
কেবা বাধা দিতে চাহে ?
তোমার পূর্ণ শরচ্ছত্র রাহুত্ত কর্কে কেন ?
যাও বিয়ে কর্তে যাও ;
—সে সব কথা ভেব না-ও —
অন্ত তোমার সুখের রাজি—যত পার হেসে নাও ।
শ্রীযুক্তেন্দ্রলাল রায় ।

দিল্লির শিল্পপ্রদর্শনী ।



দিল্লিরবাজারের বিরাট ব্যাপারের মধ্যে বাহা-
কিছু খাঁটি, বাহা-কিছু ভ্রষ্টব্য, বাহা-কিছু
শিকার জিনিষ, সমস্তই তাহার শিল্পপ্রদ-
র্শনীতে ছিল, ভারতবাসিমাজকেই এ কথা
স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইউরোপ-
আমেরিকা, জাপান-অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দূরদেশ
হইতে,—ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে যামাগত

দর্শকবৃন্দ এই শিল্পপ্রদর্শনী দেখিয়া সুবিম্বা-
ছিলেন, 'ভারতের শিল্প' আজও বাহা
বর্তমান আছে, তাহার তুলনা অন্যত্র সম্ভবে
না। প্রাচীনতার জন্য ভারত গরিমা করে
বটে—কিন্তু এ গরিমার যথেষ্ট কারণ আছে।
এ গরিমা পাথরের জোরে, সুখের তোড়ে,
কণের এল, পাগলপ্রতিদ্বন্দ্বিতার, সেদিনের

সভাতার প্রচণ্ড উত্থাপের ঝলমলানি প্রত্যাপে হয় নাই। ভারতে প্রাচীনসভাতার যে একটা সাহিত্য ছিল, আৰ্য্যদিগের যে ঐকীপ্ত প্রতিভা—যে স্বাভাবিক ও শাস্ত্রশীতল ধীরতা ছিল, তাহারই মাধ্যমে এক স্থানিগুণ শিল্প সেই পুণ্যকুমির নানা স্থানে নানা আতির মতো আবহমানকাল নিহিত হইয়া ছিল;—হিন্দু-সাম্রাজ্যপতনের পর মুসলমান তাহাকে মালা-দান করিতে কৃপণতা করে নাই,—শিক্ষা করিতে পরাশ্রয় হয় নাই,—ব্যবহার করিতে ত্রুটি করে নাই।

বিদেশী রাজাদের আমলেও ভারত-শিল্প ভূগতিবর্ণের আপাদমস্তক ভূষিত করিত,—অক্ষরমহলে মহাবীরগণের বৈষ্ণব-কান্তি বাড়াইতে ব্যস্ত থাকিত,—বিলাসিতার একমাত্র সহায় হইত;—তখন অঙ্গশোভা-বৃদ্ধির অনন্ত উপায় ছিল ভারতশিল্প। মুসলমান বাদশাহগণ শিল্পের আদর করিতে যাইয়া ভারতবর্ষকে যেন আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। ভারতলগ্না রাজ-অস্ত্র-পুরে মহাবীর হইলেন—ভারতশিল্প তাঁহাদের মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাজাইয়া দিল। কাঠখোটার হস্ত যোগল-পাঠানের স্বদেশের সাজগোজগুলি নিজের লজ্জার নিজেই সূত্র হইল,—আপন মহিমার ভারতশিল্প তাহার স্থান দখল করিয়া লইল। ভারতশিল্পই দেখাইল, ধরলাতের পর মুসলমান যেন “যেহি পদপদবস্থদারম্” বলিয়া ভারতের হীরামণিক্যখচিত চরণখানি ধরিয়া যত্নভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতের হৃদ্বিনের মধ্যে ঐ ভাবটাই বৃদ্ধি বনাককান্দে বিজলিলীলা দেখাইয়াছিল। হার সে দিন!

তাহার পর ভাগ্যলক্ষ্মী যখন যোগল-বাদশাহকে ভাগ করিয়া ইংরেজের অঙ্গ-পায়িনী হইলেন, তখন ভারতশিল্পকলা অভিত্যাকহীন। হিন্দুবিধবার ন্যায় পিতৃকুলে আশ্রয় লইয়া নিরাভরণার হীনমুষ্টি একাক্ষ করিল। ভারতীয় মুদ্রাভাষ্য ও ভগ্নপ্রাচীর ভাগ্যবশতের গৃহে ভারতশিল্পগুলি আশ্রয় পাইল বটে, কিন্তু শিল্পের আর বিস্তারলাভ হইল না। যথেষ্ট অস্ত্র,—প্রাচীনতার যশোমাধ্যম্যের পরিচায়ক বোধে,—চিত্রপ্রসিদ্ধ প্রযুক্তি নানামেলে নানা যন্ত্রে মাত্র বক্ষিত হইল। তাহাদের চিত্রমাত্র বাহ্য-কিছু এবার এই দিল্লিপ্রদর্শনীতে Loan collection বিভাগে দেখা গিয়াছিল। সম্ভ্রান্তি তাহার বিবরণ Indian Art at Delhi 1903 নামক গবেষণাকর্মক গ্রন্থে প্রকাশিত Sir George Watt সম্পাদিত গ্রন্থে সচিত্র বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপদেশ এবং শিক্ষাদায়ক। ইহারই উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ইংরেজ ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেন। ইতিপূর্বে ভারতের ভাঙার লুণ্ঠাট হইয়া গিয়াছিল। নাদিরশাহ মরুসিংহাসন লুণ্ঠন করিলেন,—ভারতসিংহাসন লুণ্ঠ হইল,—সঙ্গে সঙ্গে ভারতশিল্পও হস্তান্তরিত হইয়া পড়িল। ইংরেজ শতেন-শতেন ভারতে রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন তাঁহাদের সঙ্গে নানা দেশের নরপতিবর্গের বুদ্ধবিগ্রহাদি হইতে লাগিল—মহারাত্রী, শিব, মুসলমান, রাজ-পুতগণ ইংরেজপ্রত্যাপের সম্মুখে পরাজিত বা পক্ষিস্বরে প্রথিত হইল। সে সময়ে ভারত-ইতিহাস কেবলই ইংরেজের অগ্রকাধীনীতে,

পূর্ণ। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী সমুদ্র শান্তিগুণের অভাবের পরলোকগতা মহারাণী ত্রিভোমিয়া ভারতবর্ষী হয়েছেন। এই কালের মধ্যে কত রাজ্যে কত গোলযোগ, বুদ্ধিগ্ৰেহ, আত্মকলহ, রাজপ্রোহিতা প্রভৃতি ঘটনার ঝড়বাতের ছোট-বড় কত-কত এলর হইয়া গেল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। কত ঘরের কত মনিমানিক্যাদি শিল্পদ্রব্যী কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। কে তাহার অঙ্গসজ্জান লইয়াছে? ত্রিভোমিয়াগেই বা কত প্রেরিত হইয়াছে! সামান্য দৈনিকেরা পর্য্যন্ত কত লুণ্ঠন-সামগ্রী যথেষ্ট লইয়া-গিয়া অন্নবিস্তার সূচ্যে ধনবানদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা করা কঠিন। একমাত্র টিপুসুলতানের লুণ্ঠিত স্বতাবশেষ কোথায় গিয়াছে, তাহাও জানা হইতে তিনকোটি টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য পাওয়া দিয়াছিল। জয়ের পর ইংরেজরাজপুরুষেরা এই সকল দ্রব্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,—তাহাদের চক্ষু খলিয়া গিয়াছিল। টিপুর দরিদ্র-দৌলত-বাসের কঠিনির্মিত প্রমোদভবন দেখিয়া তাহারা চমকিত হইয়া যান। কঠের উপর এরূপ সুন্দর খোদকারী কার ইউরোপে সম্ভব নহে। অথচ টিপুসুলতানের দুই-পুরুষমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শিল্পদ্রব্যাদি এখনও অতি প্রাচীন রাজবংশে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পী আর নাই। উপরূক উৎসাহের অভাবে, পৃষ্ঠপোষকের অভাবে, অর্থসামর্থ্যের অভাবে এক ব্যবসা হইতে ব্যবসান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে শিল্পকুল লুপ্ত হইয়া

গেছে। এখন কি, কোন কোন শিল্প একে-বারেই নাই। নান্ন কত করিব?

এই ইংরেজরাজ্যে ভারতীয় শিল্প রাজ্য-হুগ্ৰহ পায় নাই; কোম্পানীর আমলে কুবিজাত দ্রব্যের ব্যবসাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিল্পদ্রব্য তাহাদের ব্যবসারের উপযুক্ত ছিল না;—ডাল, গম, পাট প্রভৃতি বস্তা গাভজনক, শিল্পদ্রব্য তাহার তুলনার কিছুই নহে। ইংরেজ সওদাগর-রাজ্য সওদাগরি করিতে লাগিলেন, সস্তা-দরে বিলাতিদ্রব্য ভারতে পৌছিতে লাগিল, শিল্প টিকে কিসে? শিল্পগণও পাট বুনিতে আরম্ভ করিল,—খানচাস করিতে লাগিল—বেনারসী, ঢাকাই, আমানাবাদী, ব্রিগওয়াল, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি শিল্পকুল জাতি নষ্ট করিয়া চাবাছুয়া হইল। তাগো হইএকজন দেশীয় রাজা ও ধনশালী লব করিয়া কোন কোন জিনিষের বস্ত্রদ্বার ছিলেন, তাই প্রাণে প্রাণে হুএকটি ঘর বাঁচিয়া গেছে—কিন্তু তাহাদের অবস্থাও পূর্বের মত রহিল না। কাশনের সঙ্গে সঙ্গে সস্তাঘরের জিনিষের দরকার হইল। বিলাতি সূতা, রং ও গিল্টি আসিয়া ভারতশিল্পকুলে যে বর্ণ-সকর সৃষ্টি করিল, তাহাতে তাহার এক নূতন মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সিগারেটবাক্স, ঘেঁশে-লারের বাক্স, দস্তানা-কমালের বাক্স, বিবিদের গাউনের মগজিতে দেশীয়শিল্পের কত রকমের অঙ্গব্যবহার, দেখিলে অবাক হইতে হয়। হিন্দুদেবদেবী চুরটের ভগ্নদ্বারীতে, জুতা লাগাইবার কণকের মূর্তিতে, চামানের টিপারের পাথর পরিপত হইয়াছেন,— ভারতীয় শিল্প ইংরেজিঘরে শোভা পাইতেছে!

ভারতে ইংরেজরাজা এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞিত
হইল, দেশীয়স্রব্য তখন ইউরোপের দৃষ্টি আক-
র্ষণ করে। শিল্পকলার আদরের স্থান এখন
ইউরোপ, তাই ইউরোপ ভারতশিল্পের আদর
করিতে অগ্রসর হইরাছে—রাবাহুগ্রহও এখন
কতকপরিমাণে এদিকে কিরিয়াছে। কতক-
পরিমাণে বলিতেছি এইজন্য যে, হিন্দু ও
মুসলমান রাজাদের মত ইংরেজরাজ এই
সব শিল্পস্রবোর জন্য অল্প টাকাখরচ করিতে
পারেন বটে, কিন্তু বিশেষ-কিছু সাধকতা
ইহাতে দেখিতে পান না, তাই এভাবে অর্থ-
ব্যয়কে অর্থের অপব্যবহার বলিয়া ধরিয়া লন
এবং patronisena মক ইংরেজীপক্ষে দড়টা
ব্যয়, কেবল সেইটুকুই করিতে প্রস্তুত হন।
অন্তত লর্ড কার্জন এ অগ্রহটুকু করিয়াছেন।
এই অগ্রহহবিতরণে তিনি বেরূপ মুক্ত-
কর্ত্ত হইরাছিলেন, সেধু মুক্তহস্ত হইতে
পারিলে প্রদর্শনীর প্রবাসি অধিকাংশ ভারত-
সম্রাটের তোবাখানার জন্য খরিদ হইত।
তবুও লর্ড কার্জন ভারতশিল্পের উন্নতি ও
পুনরাবির্ভাবের জন্য বাঁধা করিয়াছেন, তজ্জন্ত
সর্বোক্তকরণে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিই।
ভারতের 'হারী' রাজপ্রতিনিধি হইবার
আশা যদি তাঁহার থাকে, ভারতশিল্পদেবতা
তাঁহার সে আশা পূর্ণ করুন।

লর্ড কার্জনের ভারতে পদার্পণের পূর্বে
হইতেই ভারতীয় শিল্পস্রবোর উপর ইংরেজ-
দিগের একটা দৃষ্টি আছে। ক্রমে তাঁহাদের
ঐ সব স্রবোর প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত হয়
—তাঁহার উহার খরিদদার হইতে
থাকেন।। দেখিতে দেখিতে ভারতের
প্রধান প্রধান নগরগুলিতে এই সকল সামগ্রীর

পণ্যবাণিজ্য খুলিতে আরম্ভ করিল—দিল্লির
চাঁদনীচৌকে, লাহোরবাগানে, বারাণসী, বম্বে,
মাদ্রাজ প্রভৃতিতে এই সকল দ্রব্য বৈদেশিক
ভবনুয়েদের নিকট বহুতণ মূল্যে বিক্রী হইতে
লাগিল। "India Curio" আ দেখাইলে
কোন ভ্রমণকারীর ভ্রমণ দেশের দশজনের
কাছে কলকে পার না। এই কলিকাতা-
নগরীতে এখন রাতার রাতার দেশীয় স্রবোর
দোকান খোলা হইরাছে, বেশ বিক্রীও হই-
তেছে। কিন্তু ক্ষোভ ও আশ্রয়ের বিষয়,
দেশীয় লোকের মতিগতি বিলাতি বিনিবের
দিকেই হুঁকিয়া পড়িয়াছে। এ সকল
কথা লইয়া সম্প্রতি আলোচনা বহু অল্প হয়
নাই—তাঁহার কলে দেখা যায়, আমাদের
মধ্যেও এখন অর্থশালিগণ দেশীয় স্রবোর
আদর করিতেছেন। ইহা সুখের কথা,
অশার কথাও বটে।

লর্ড কার্জন ও তাঁহার পত্নী ভারত-
শিল্পস্রবোর উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোনিবেশ
করিয়াছেন। স্বয়ং ভারতেশ্বরীর রাজকুশ
ভারতবর্ষের কারুকার্যে প্রস্তুত হইরাছিল—
লাটপত্নী দিল্লির দরবারঘটিত নানা উৎসবে
সুন্দর ভারতজাত বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত
হইরাছিলেন। ভারতীয় বৃশতিবৃক্ষের
নিকট--দেশের লোকের নিকট ভারতবর্ষের
স্রব্যগুলির বাহ্যপ্রচারণার জন্য তিনি
গত ১৯০২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর দিল্লিতে
ভারতশিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার সম্বন্ধ দেশীয়
ভ্রমণজনীকে, বিশেষত ভারতের রাজ-
বৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া যে কথাগুলি বলিয়া-
ছিলেন, আমরা আশা করি, পুঙ্খানুপুঙ্খ
তাঁহার সেগুলি স্মরণ রাখিবেন এবং কাচমনে

পালন করিবেন। Tottenham Court
নিবাসী গৃহসজ্জানিগ্রাতাদের কার্যকর্মে
তুলনায় তিনি এ দেশের অব্যাবস্থার সম্বন্ধে
সম্মান দিয়াছিলেন—ঐ সব অব্যবস্থার ফলস্বরূপে
বহুলবিচার হইত, সেজন্য অসুবিধাও করিয়া
ছিলেন। ইহাতে Tottenham Court হইতে
তাহাকে গালি পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছিল।
Tottenham Court চটিলেন—ভারতের বড়
বড় রাজস্বাধিকারী তাহাদের খরিদদার, পাছে
সিটিমাহেবের বৃত্তিতে খরিদদার ছুটিয়া যায়।
কিন্তু সিটি স্ট্রাকচারের ঐরূপ ভাবাভ্রমণের
কারণ বণেই ছিল। তিনি অনেকানেক দেশীয়
রাজ্যে ঘুরিয়াছেন;—মাশা করিয়াছিলেন,
প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজত্ববনে প্রাচীন
ভারতশিল্পের সমাধর ও শোভা দেখিতে
পাইবেন। কিন্তু তাহা দেখিধেন, তাহাতে
তৃপ্তিলাভ দূরের কথা, তাহার বিরক্তি ও
ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি দেখি-
লেন, কৃত্তরশ্রেণীর বিলাতি গৃহসজ্জার
স্বাভাব্য সজ্জিত,—অতি কদম্বি বিলাতি
টুম্‌টাস্‌ অব্যাদিতে কলঙ্কিত,--নকলের
নাকাল গ্লাসের জিনিষে ব্রিড্‌ট এবং নিত্য
ঐহীন বিলাতি গালিচায় গৃহপ্রাঙ্গণ মণ্ডিত।
সোনা ফেলিয়া রাংতার আদর—মণিমাণি-
কোর স্থানে স্ফুটিত নকল সাজ। সর্বো-
পরি অতীব আদরের দেশীয় বস্ত্রাদির—
কিংখাব, শাল, ঢাকাই বস্ত্রের—পরিবর্তে
ভারতের নমুনায় সঙ্গে অসংখ্য জর্জনির্মিত
বস্ত্রাদিতে ইংরেজবস্ত্রের নির্মিত রাজবেশ;
—রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিলাতি নমুনায় গঠিত।
আবার কোন রাজ-অস্ত্রপুরে বিলাতি
সিটিন-মখমল রাজস্বাধিকারের পরিধেয় পর্য্যন্ত

নকল করিয়া বসিয়াছে। এই সব দেখিয়া
তিনি অবাক হইয়াছিলেন—ভারতশিল্পের
জন্ম মন্ত্রে-অন্ত্রের ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাই
প্রদর্শনী উপলক্ষে তাহার আত্মনিবেদন
বিদেশীয় শিল্পীদের নিকট কঠোর চেকিলেও,
ভারতবাসীদের নিকট মন্থব্যর্থ সেই
কথাগুলি বড় মর্শ্শপণী হইয়াছিল। তাহার
পর যখন প্রদর্শনীগৃহের দারমোচন হইল,
মর্শ্শকৃষ্য বর্থাই বৃত্তিতে পারিলেন,
কার্জনের কথা সত্য, সাধু এবং সমভিপ্রায়-
পূর্ণ। এই প্রদর্শনীতে না ছিল কি? শিল্প-
জগতে উত্তমশ্রেণীর মধ্যে যাহা সর্বোচ্চস্থান
অধিকার করিতে পারে, নানাদেশের নানা-
জাতীয় সেইরূপ জিনিষ এই শিল্পাগারের
প্রত্যেক শ্রেণীতে ছিল। ভারতের শিল্পকে
এভাবে একত্র সমাবেশ ও সাধারণের দৃষ্টি-
পথে আনয়ন করার ব্যবস্থা এই সর্বপ্রথম।
কাজেই দিল্লির দরবার উপলক্ষে এই মহৎ
কার্যটি বর্থাই ভারতের একটি মঙ্গল-
ব্যাপ্য হইয়াছিল এবং দরবারের মহিমাও
ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রদর্শনীমণ্ডপটিও
আবার একটি এদেশীয় মন্দিরের অনুকরণে
প্রস্তুত হইয়াছিল। গৃহের অভ্যন্তরভাগ ভার-
তীয় রাজত্ববর্ণের রাজচিহ্ন-বংশচিহ্ন-বিশিষ্ট
পতাকাবিশিষ্ট সজ্জিত এবং প্রত্যেক প্রকার
নানা দেশীয়অব্যাদিতে অতিরিক্তমাত্রায় পূর্ণ
ছিল। যেহেতু দেখ, কেবলই বিভিন্ন সামগ্রীর
বাহার। কাঠের, ধাতুর, পশমের, হস্তার,
ধাতের, হাড়ের, পশুশৃঙ্গের, কদম্বের শত-
সহস্রাধিক অব্যাব্যাস্তে গৃহটি পূর্ণ হইয়াছিল।
যিনি তাহা দেখিয়াছেন, তাহার চক্ষু সার্থক
হইয়াছে। কি দেশীয়, কি বিদেশীয়,

সকলকেই এই সব সামগ্রী দেখিয়া একবাক্যে বোকার করিতে হইয়াছিল—ভারতবর্ষে যে একরূপ বিজ্ঞতা, জ্ঞান-সম্পদ, জ্ঞান-শক্তি, ইহা পূর্বে তাহাদের ধারণা ছিল না। দেশের রাজস্ববর্গ অশেষভাবে প্রবোধ মূল্য জানিতে যাইয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। এত সত্তার একরূপ জ্ঞান যথেষ্ট পাওয়া যায়, ইহা তাহাদের মনেও হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি, একজন রাজা আর মূল্য বিজ্ঞান করিতে লজ্জা পাইয়া কেবলমাত্র জিনিষ পসন্দ করিয়া লইতেছিলেন—আর মূল্য জানাইতে গেলে চুপাটে নিবেদন করিয়া বলিতে ছিলেন, আর বেন মূল্যের উল্লেখ করিয়া তাহাকে লজ্জা দেওয়া না হয়। রাজার

কথা শুনিয়া একজন ইংরেজমহলা পরিবীরা প্রতি ইঙ্গিত করিতে করিতে বলিলেন—“Now the native chiefs seem to be getting wise।” সঙ্গিনী উত্তর করিলেন—“They ought to be”—আর হতভিত্ত লোকের চিকণে-কমালধানার প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে ভারতবৃত্তিবৃত্ত একে অস্ত্রের দেশের শিরকলার বাহায়া বৃত্তিতেছেন, পছন্দসই জিনিষ কিনিতেছেন, করমাইল দিতেছেন, কারিকরের খোঁজ নিতেছেন, এ দৃষ্ট কি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সত্যসত্যই শিরশ্রমর্শনীতে তাহা দেখা গিয়াছিল।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

সার সত্যের আলোচনা।

ভিতরে-ভিতরে মনুষ্যসমূহই সত্যের অন্বেষী। কিন্তু লোকসমাজে বসন্তমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে সুখে এইরূপ ভাগ করেন যে, “সত্য আমার কাজ নাই—সত্যের বদলে একমুঠা অন্ন পাইলে বড়িয়া বাই; কেন না, সত্য পেট ভরে না—অন্ন পেট ভরে।” লোকের এ কথা নিত্যকাল অযৌক্তিক নহে। যদি জল তুলিতে হয়, তবে তাহার পূর্বে ফলপ তৈয়ারি করা চাই। সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সত্যের ধারণাকর্ম পাঠ তৈয়ারি করা চাই। অসত্যভাবে বাহ্যিক শরীর ধৌর্গ, সে ব্যক্তি সত্যগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র

নহে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। আগের সঙ্গে জ্ঞানের বোগ রহিয়াছে। এক-তালায় আগ, হোতালার মন, তৈতালার জ্ঞান। মনুষ্যের আগের উপরে মন, মনের উপরে জ্ঞান উপযুক্ত পাত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে মনুষ্য সত্যের উপযুক্ত বাসস্থান হয়। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যশরীরে উত্তরের উপরে জন্ম, জন্মের উপরে মৃত্যু উপযুক্ত পাত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সত্য আপনাবাসস্থান আপনাই তৈয়ারি করিতেছেন—সে বাসস্থান মনুষ্য। পণ্ডপকীর্তা অন্ন পাইলেই পরিভূত হয়; মনুষ্য রাজ-

ভোগেও পরিতৃপ্ত হয় না—মহুবা চায় সত্য ।
মহুবোর চক্ষু ফুটিয়াছে । মহুবা জানিতে
পারিয়াছে যে, • রাজ্য-ভোগও যেমন, দেব-
ভোগও তেমনি—সবই ক্ষণস্থায়ী । কাজেই,
চিরস্থায়ী পদার্থের আবেষণ মহুবোর একটা
বৈদিক কার্য হইয়া ধাড়াইয়াছে । কিন্তু
এখনো পর্যন্ত মহুবোর প্রাণ, মন এবং
জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য যেমনটি হওয়া চাই,
তাহা কার্যে ঘটিল। ওঠে নাই । পৃথিবীতে
সত্যের বাসভান সর্বত্র প্রকৃতিররূপে পরিগঠিত
হইয়া ধাড়ার নাই । এক কথায়—মাতৃস্ব
এখনো মাহুস হইয়া ওঠে নাই । প্রকৃতি-
মাতা মাহুসকে মাহুস করিতেছেন নিমিত্ত-
নয়নে । তথাপি মাহুসের মাহুস হইতে
এখনো একটু বিলম্ব আছে । মাহুস এখনো
ব্যস্ত-ভ্রমকের মূগ্ধ ছাড়াইয়া, মাহুসের
মূগ্ধকে পৌছে নাই । পৌছে নাই বটে,
কিন্তু অচিরে পৌছিব, তাহার কোপাড়
হইতেছে পৃথিবীর সর্বত্র ; কেন না, প্রকৃতি-
মুতার বেহেচক্ষু মহুবোর উপরে ক্রমাগতই
লাগিয়া রাখিয়াছে ।

ভিতরে-ভিতরে কিন্তু মহুবা ভূমিষ্ট হইয়া
অবধিই মাহুস । কোড়শ শিশুও জানের
জন্ত আঁকুপাকু করে । স্তম্ভস্থদের সঙ্গে-
সঙ্গেই মহুবা জ্ঞানাত্মক পান করিতে থাকে ।
নবায়ত মহুবোর চোখনিই স্বতন্ত্র । শিশুর
চোখনি কিছুতেই পেট ভরে না । কোড়শ
শিশু মাতার দুধের দিকে তাকাইয়া সকল
বিষয়েরই সমাচার জানিতে চায় । শিশুর
ভিতরে-ভিতরে জ্ঞান অরে-অরে উদ্বোধিত
হইয়া সত্যের প্রতি দ্যাত বাড়াইতে থাকে—
বদিও সত্য আকাশের চাঁদ ।

প্রকৃতিমাতার চক্ষে লোকশিরস মহা-
জ্ঞানী এবং মাতৃকোড়শ শিশুর মধ্যে অসম
প্রভেদ । শিশুর জ্ঞানোপার্জনপ্রণালী
কিমন ? মাতার স্তন হইতে চুষ পান করিয়া
শিশুর যেমন শ্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, মাতার দুধ-
চক্ষু হইতে বেহতরা সত্য পান করিয়া
শিশুর তেমনি জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় । শিশুর
নিকটে মাতার দুধচক্ষুটি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ;
সে জানে—মাতার দুধচক্ষুতে সব সত্য এক-
ঠাই ভরা রাখিয়াছে । ইহাই জ্ঞানোপার্জনের
আদিম প্রণালী । আদিম গহিরা একুতি-
মাতার দুধচক্ষু হইতে সত্য পান করিতেন—
তাহাতেই তাঁহাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইত ;
তাঁহাদিগকে পুঁথিপাতির দ্বারস্থ হইতে
হইত না । স্তম্ভস্থর যেমন সাক্ষাৎ প্রাণ,
তেমনি আদিম গহিরা প্রকৃতিমাতার দুধ-
চক্ষু হইতে বেরকমের সত্যাত্মক পান করি-
তেন, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান । এই যে
সাক্ষাৎ-জ্ঞান বা সাক্ষাৎ-উপলব্ধি—ইহা পরম
পরিপূর্ণ জ্ঞান—খাঁটি জ্ঞান । এক্ষণে সাক্ষাৎ-
উপলব্ধি যে পদার্থটা কি, তাহা একবার
পর্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক ।

সাক্ষাৎ-উপলব্ধি ।

ধ্বনির স্রোত আমাদের এক কান দিয়া প্রবেশ
করিয়া আরেক কান দিয়া বাহির হইয়া যায়-
তেছে ; আলোকের স্রোত আমাদের চক্ষুর
মধ্য দিয়া বহিয়া চলিতেছে । তড়িৎবেগে
বহিয়া চলিতেছে বলিলে কিছুই বলা হয় না
—সত্য এই যে, তড়িৎ অপেক্ষা-শতগুনশতগুণ
অধিক বেগে বহিয়া চলিতেছে । সাক্ষাৎ-
উপলব্ধি ইহার কোন্‌স্থানটার দ্বারা তোমার
সম্মুখ দিয়া নদী এখন স্রোতবেগে বহিয়া চলি-

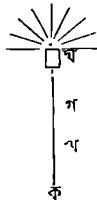
তেছে, তখন তুমি তাহার প্রতি অঙ্গুলি-
নির্দেশ করিয়া বলিতেছ—“এই নদী” ।
যাহাকে বলিতেছ “এই নদী”, সে নদী
কোথার ? বেই বলিতেছ “এই”, অরি তাহা
নেই । তুমি যাহাকে বলিতেছ “এই নদী”,
সে তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া নেই-নদী হইয়া
সরিয়া পালাইয়াছে । নদীর প্রোতও ঘেমন,
ধরনির প্রবাহও তেমনি, আলোকের রশ্মিও
তেমনি—সবই ছুই-নৌকায় ভর দিয়া ঠাড়া-
ইয়া রহিয়াছে ;—এক নৌকা হ’লে বর্তমান-
মূর্ত্ত, আর-এক নৌকা হ’লে অতীত-
মূর্ত্ত । তাহার মধ্যে বর্তমান-মূর্ত্তই
জীবন্ত মূর্ত্ত, অতীত-মূর্ত্ত মৃত মূর্ত্ত । যাহা
বড়িয়া থাকিতেছে, তাহা এই নাম বর্তমান ।
বর্তমান কাল বড়িয়া থাকিবার কাল—
বাঁচিয়া থাকিবার কাল । বর্তমান কাল
সজীব কাল—তাই বর্তমান কাল আমাদের
জীবনের উপরে—প্রাণের উপরে—কার্য্য
করে । পক্ষান্তরে, মৃতবাক্তিকে যেমন চক্ষে
দেখিতে পাওয়া যায় না—কেবল মনে স্মরণ
হয় মাত্র, অতীত কাণ্ড সেইরূপ আমাদের
মনের স্মরণেতেই বাওয়া-আসা করে, তা বই,
বর্তমানের ভাঁই তাহা আমাদের প্রাণের
হস্তে ধরা ভার না । বর্তমান কালের দর্শন
হ’লে প্রাণের ব্যাপার, অতীত কালের স্মরণ
হ’লে মনের ব্যাপার ; এই দুই ব্যাপারের
উপরে ভর দিয়া বুদ্ধি-ব্যাপার মাথা তুলিয়া
ধাক্কার । বুদ্ধি-ব্যাপার কি ? না, “এটা এই”
এইরূপ নিষ্করজিয়া । আমরা প্রথমে বলি
“এটা,” তাহার পরমূর্ত্তে সেই এটা’র পরি-
বর্ত্তে যখন তাহার যমক-সহোদর আর-একটা
আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন

সেই বিতীর্ণ-এটাকে আমরা বলি “এই” ;
আর, তাহা যখন বলি—বিতীর্ণ-এটাকে অর্থাৎ
আত্ম-একটাকে যখন আমরা বলি “এই”,—
তখন প্রথমে-“এটা” আমাদের স্মরণে টাটকা
রহিয়াছে যেন সাক্ষাৎ বর্তমান ; সেই প্রথম-
এটা বাহা আমাদের স্মরণে জাগিতেছে এক
তাহার জুড়ি এই বিতীর্ণ-এটা যাহাকে আমরা
একপে বলিতেছি “এই”—এই দুই এটাকে
এক বন্ধনে বাঁধিয়া আমরা বলি “এটা এই” ।
ইহারি নাম বুদ্ধির নিষ্করজিয়া । (১)
প্রাণ বর্তমানকে ধরে, (২) মন অতীতকে
ধরে, এবং বুদ্ধি বর্তমান এবং অতীত উভয়কে
একীভূত করিয়া ত্রৈকালিক প্রবন্ধকে উপলব্ধি
করে । ইহারই নাম বাস্তবিক-সত্তা’র উপলব্ধি ।
বাস্তবিক-সত্তা’র উপলব্ধিতে প্রাণ, মন এবং
বুদ্ধি, তিনই একযোগে কাণ্ড করে । প্রাণ
করে—দর্শন, মন করে—স্মরণ, এবং বুদ্ধি
করে—তত্ত্ব-অবধারণ । এই যে তিনটি
ব্যাপার—দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ,
তিনই সমান আশ্রয়্য । যদি মনে কর’ যে,
দর্শন তো অষ্টগ্রহরই “করিতেছি—স্মরণও
তাই ; তত্ত্বনিরূপণটাই কেবল সব সময়ে
সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না—অতএব তত্ত্ব-
নিরূপণই সর্বাধিক । বেশী আশ্রয়্য, তবে
সেটা তোমার বড়ই তুল ; বর্তমান-মূর্ত্তে
তোমাকে আমি বলিতেছি যে, গতকল্যাণ
আমি কান্ধিতে ছিলাম । গতকল্যাণ সত্যসত্যই
যে আমি কান্ধিতে ছিলাম, তাহার প্রমাণ
কি ? তোমার নিকটে তাহার প্রমাণ আবশ্যক
হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে তাহার
প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক । কেন না, আমার
স্মরণে স্পষ্টাকরে লিখিত রহিয়াছে যে, গত-

ক'ল্যা আমি কানীতে ছিলাম। যদি বলা যে, তোমার এই যে স্বপ্ন- এ তো তোমার বর্তমান কালের মনোবৃত্তি; বর্তমান কালের মনোবৃত্তিকে অতীত ঘটনা'র সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ কোন বৃত্তিতে? “ঐখানটিতে ঐ বেগালটা রহিয়াছে” এটা যেমন তুমি তোমার চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছ; গতকল্যা “তুমি কানীতে ছিলে” এটাও কি তুমি সেই-রূপে তোমার মনশ্চক্ষে দেখিতেছ? তাহা তুমি বলিতে পার না—কেন না, বাহ্যকে তুমি বলিতেছ “ঐখানটি”, তাহা তোমার চক্ষের সম্মুখে বাস্তবিকই উপস্থিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে, বাহ্যকে তুমি বলিতেছ “গতকল্যা”, তাহা কোনোকালেই তোমার চক্ষের সম্মুখে জীবিতমান ভাবে—অর্থাৎ সত্যপদ্যই— উপস্থিত হইতে পারে না। তবে যে বলিতেছ যে, তোমার মনশ্চক্ষে তাহা উপস্থিত— সে কেবল কল্পনাতে। কিন্তু কল্পনাকে বিধায় কি? আমি যদি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিতাম যে, “গতকল্যা আমি কানীতে ছিলাম”, তবে কি তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম? স্পষ্ট আমার স্বপ্ন হইতেছে যে, আমি গতকল্যা কানীতে ছিলাম, তাই তাহা আমার নিকটে প্রযুক্ত। স্বপ্ন এবং কল্পনা দুইই আমার আপনাতর, অথচ স্বপ্নের কথার বাধ্যর্থো আমার বিশ্বাস ঠাঁড়াইতেছে ভরপুর—কল্পনার কথার বাধ্যর্থের মূল্য আমার নিকটে কিছুই নহে। এক ব্যক্তির এই যে পৃথক্কল—ইহা কি কম আশ্চর্য্য! স্বপ্ন এই তো এক আশ্চর্য্য-ব্যাপার—দর্শন আবার আর-একভরো আশ্চর্য্য-ব্যাপার। এ বলে আমার

স্বাভা—ও বলে আমার ভাণ্ড। এমন কি, দর্শন এবং স্বপ্নের মধ্যে যে প্রভেদ কোন-খানটার, তাহার ঠিকানা পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী :-

মনে কর, একটা অসুখিগরিমান আয়ের-নলিকা (যেমন হাউইবাজির চোঙা)



ক-স্থান হইতে ছুটিরা ঘ-স্থানে পৌছিল। তাহা ঘ-স্থানে পৌছিলামাত্র দর্শকের চক্ষে একটি আঘেবিন্দু ঘ প্রকাশ পাওয়াই উচিত; কিন্তু প্রকাশ পাইতেছে—তথু- কেবল সেই আঘেবিন্দুটি না, পরন্তু ক হইতে ঘ পর্যন্ত সমস্ত ক-ঘ-গ-ঘ-পথ জুড়িয়া একটা সুদীর্ঘ আঘের রেখা। হই-তেছে একটি আশ্চর্য্য-ব্যাপার—দুজন্মান ঘ-বিন্দুর সঙ্গে প্রতিপথের ক, ঘ, গ, বিন্দুভল্য সংস্কারের আটার জোড়া লাগিয়া-গিয়া ক-ঘ-গ-ঘ-পথের আগাগোড়া সমস্তটা দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানের দর্শন, অতীতের স্বপ্ন এবং ভবিষ্য-তের কল্পনা, এই তিন ভাঙাত্ কাঁধ-ধরাধরি করিয়া একসঙ্গে ঘোড়িয়া চলিতেছে। দৃষ্টির হাঁপায় পড়িয়া স্থিতিও দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে

—কল্পনাও দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে । এহলে

(১) সম্মুখে-বর্তমান আয়েরবিন্দু দৃষ্টির বিষয়, (২) অবাধিত পূর্বমুহূর্তের আয়ের-বিন্দু দৃষ্টির বিষয়, এবং (৩) অবাধিত ভবিষ্যৎ মুহূর্তের আয়েরবিন্দু কল্পনার গতিয়া-তোলা—এই তিন আয়েরবিন্দু, আর সেই সঙ্গে দর্শন, শ্রবণ এবং কল্পনা, এই তিন মনোবৃত্তি, একেবারেই এক । দর্শনের গারে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত, শ্রবণ এবং কল্পনা মাথা রহিয়াছে—বর্তমান-মুহূর্তের গারে অতীত-মুহূর্ত এবং ভবিষ্যৎ-মুহূর্ত মাথা রহিয়াছে । বর্তমানকে যেমন অতীত এবং ভবিষ্যতের সংজ্ঞা হইতে ছাড়ানো কঠিন, দর্শনকে তেমনি শ্রবণ এবং কল্পনার সংজ্ঞা হইতে ছাড়ানো কঠিন ।

উপরে বাহা দেখানো হইল, তাহাতে স্পষ্ট বৃত্তিতে পায়। যাইতেছে যে, বাহাকে আমরা বলি সাক্ষাৎ-উপলব্ধি, তাহা দর্শন, শ্রবণ এবং কল্পনা, তিনের মিলিতাঙ্গ । তাহা শুধুই কেবল দর্শনের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল শ্রবণের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল কল্পনার ব্যাপার নহে;—তাহা দর্শন-এবং-শ্রবণ সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার । অথবা, বাহা একই কথা—আগ-এবং-মন-সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার । আগের সহিত দর্শনের এবং মনের সহিত শ্রবণের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা যদি-চ পূর্বে বলিয়া চুকি-রাছি—তথাপি তাহা আরেকবার বলি :—

(১) বর্তমানের বিষয়ই দর্শনের বিষয় ।

(২) যুগ্ম বৃত্তিমা থাকে বা বাঁচিয়া থাকে, তাহাই বর্তমান । বাহা জীবিতমান, তাহাই বর্তমান ; আগই বর্তমান । দর্শনের ব্যাপার আগেরই ব্যাপার ।

(৩) বাহা অতীত, তাহা মৃত । অতীতেরই শ্রবণ হয়—মৃতেরই শ্রবণ হয় । দর্শন হয় চক্ষে বা চাক্ষুষ প্রাণে, শ্রবণ হয় মনে । অতঃপর ত্রুটী এই যে, দর্শন এবং শ্রবণ দুয়ের যোগে—আগ এবং মন দুয়ের যোগে—বুদ্ধিতে লক্ষ্যবস্তুর সাক্ষাৎ-উপলব্ধি সম্ভবিত হয় । সম্মুখস্থিত বস্তুকেই প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া আমি যখন বলি যে, “এটা বটবৃক্ষ,” তখন আমার বুদ্ধি করে কি ? না, পূর্বদৃষ্ট বটবৃক্ষ বাহা আমার শ্রবণে জাগিতেছে, তাহার সহিত পুত্রমান বটবৃক্ষকে একীভূত করিয়া বটবৃক্ষরূপী বস্তুতে অবগাহন করে । আমার সম্মুখ দিয়া যখন নদীর প্রবাহ বহিয়া চলিতেছে, তখন যে জলরাশি সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, তাহা চক্ষুর মধ্য দিয়া আমার আগের উপরে কার্য্য করিতেছে, এবং যে জলরাশি চলিয়া যাইতেছে, তাহা দৃষ্টির মধ্য দিয়া আমার মনের উপরে কার্য্য করিতেছে । বুদ্ধি করিতেছে কি ? না, বাহা উপস্থিত হইতেছে এবং বাহা চলিয়া যাইতেছে, দুইকে একদৃষ্টিতে দেখিয়া নদীরূপী বস্তুতে অবগাহন করিতেছে । বুদ্ধি বেনদীকে উপলব্ধি করিতেছে, তাহা শুধু-কেবল বর্তমানের পুত্র নদী নহে—অতীত-কালের স্তূত নদীও নহে, পরন্তু পুত্র এবং স্তূত এই দুই নদীকে লইয়া যে এক নদী, সেই-নদীরূপী বস্তু । দর্শনের ব্যাপার এবং শ্রবণের ব্যাপার কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি ; কিন্তু বুদ্ধি বৈকল্যে বস্তুসকলের বাস্তবিক-সত্তা উপলব্ধি করে, তাহার জ্ঞান আশ্চর্য্য জগতে আর কিছুই নাই । বিশেষ আশ্চর্য্য যে কোন্‌ধানটায়, তাহা বলিতেছি, আগধান করুন :—

এই বটগাছটিকে দেখিয়া আমি বলিতেছি “এটা বটগাছ”। এ-বাহা আমি বলিতেছি, এ কথাটি সত্য। কেন না, বটগাছের ভাব বাহ্য আমার মনে বর্তমান আছে, তাহার সহিত লক্ষ্যবস্তুটির সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এই যে মিল, ইহার নাম সত্য। আর, মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এইরূপ মিল ঘটাইবার যিনি কর্তা, তাহারই নাম বুদ্ধি। পুনশ্চ, অস্বাভাবিক-এরূপ মিলের যে উপলক্ষ (সত্যের যে উপলক্ষ), তাহারই নাম জ্ঞান। “এটা বটবৃক্ষ” এই জ্ঞানটি জন্মিবার পূর্বে পূর্বদৃষ্ট অনেকাধিক বটবৃক্ষের একটা সাধারণ আদর্শ বা নকশা জ্ঞাতার মনে বর্তমান থাকা চাই; সেই সাধারণ আদর্শটি নৃগুণান বটবৃক্ষের সহিত যত বটবৃক্ষের মিল ঘটাইয়া দায়। পূর্বে আমি বটবৃক্ষ দেখিয়াছি, তাই আমি এক্ষণে বলিতে পারিতেছি যে, “এটা বটবৃক্ষ”। পূর্বে যদি আমি বটবৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে আমি “বটবৃক্ষ” না বলিয়া শুককে বল বলি যে, “এটা বৃক্ষ”। পূর্বে যদি আমি বৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে বৃক্ষ না বলিয়া বলি যে, “এটা একটা বস্তু”। এখন বিজ্ঞান এই যে, পূর্বে যদি আমি বস্তুও না দেখিয়া থাকি, তবে আমি সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষটাকে কি বলিব? নবপ্রস্তুত বালকের মনে যখন সবে-মাত্র প্রথমজ্ঞানের উদ্বোধন হইয়াছে, তখন সেই প্রথমজ্ঞানের অবলম্বন শুধুই কীকে বল সম্মুখের বস্তুবিষয়, না, তা ছাড়া আরো-কিছু? এটা দেখা চাই যে, সেই জ্ঞানটিই

শক্তির প্রথম জ্ঞান, তাহার পূর্বে তাহার কোনো জ্ঞানই ছিল না; এরূপ স্থলে একথা যাতে না যে, পূর্বদৃষ্ট বস্তুসকলের একটা সাধারণ নকশা শক্তির মনে বর্তমান আছে, আর, সেই নকশার সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুর ঐক্য-উপলক্ষ-হওয়া-গতিকে জ্ঞানের উদ্বোধন হইল। কালেই বলিতে হয় যে, সেই প্রথম-জ্ঞানের পূর্বস্থলে একপ্রকার অব্যক্ত সংস্কার, তা বই, তাহা কোনোপ্রকার আঁকিয়া-ছঁকিয়া প্রস্তুত-করা নকশা নহে। সর্বাধিক প্রথমজ্ঞানে দর্শন, শ্রবণ এবং তত্বনিরূপণ, এই তিন মনোবৃত্তির মধ্যে ব্যবধান থাকিতে পারে না একচূণও। আদিম-উদ্ভিদ-সম্বন্ধে (protoplasm সম্বন্ধে) যেমন আমরা অগত্য বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা বীজ, বৃক্ষ এবং ক্ষেত্র, তিনই একাধারে; আদিমজ্ঞান-সম্বন্ধেও তেমনি আমরা অগত্য বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা দর্শন, শ্রবণ এবং তত্বনিরূপণ, তিনই একাধারে। অর্থাৎ আদিমজ্ঞানে দর্শনই শ্রবণ, শ্রবণই দর্শন এবং তাহাই তত্ব-নিরূপণ। আদিম জ্ঞানের সম্মুখে বিষয়ের উপস্থিতি এবং পশ্চাতে সংস্কারের গোড়া-বন্ধন, দুইই শুককে বল ঐশী শক্তি দ্বারা সম্ভাবিত হয়; তা বই, দুয়ের কোনোটিতেই জ্ঞাতার নিজের কোনো হস্ত নাই। ঐশী শক্তির কার্যকারিতা শুধুই কি কেবল আদিম-জ্ঞানে, নবাত্ম পরিণত জ্ঞানে কি ঐশী শক্তির কার্যকারিতা তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে কম? এই কথাটি বারম্বার জ্ঞানোন্মত্তের মস্ত হৃদয় তাৎপরিয়া দেওয়া হইল।

ত্রিবিজ্ঞানাপু ঠাকুর।

প্রকৃতির প্রতি ।

কোন দূরদেশ হ'তে আঁধার অগতে
তুমি এসেছ
হ'রে শবী মূৰ্ত্তির মম অন্তর
আগো করেছ ।

সেই আলোকমুখার হরিয়া আঁধার
ঘর স্থপিল
তব প্রীতির অঙ্গে সেই গৃহতলে
শোভা তুলিল ।

কর লহর বহিরা নাচিয়া নাচিয়া
হৃদে প্রয়াণ
তব বদনকমলে আমি কুতূহলে
লইছ ত্রাণ ।

পরে তুলি মৃৎবর অতি মনোহর
কহিলে কথা
রহি সে কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া
তুলিয়া ব্যথা ।

ক্রমে আরো কাছে আসি মৃৎবর হাসি
হাত ধরিলে
তব চন্দনরসে পুঙ্খিত পরশে
মোরে মোহিলে ।

আমি এতকাল ধরে' অগত-ভিতরে
জড় আছি
তুমি জ্ঞানময়ী হ'রে আসিলে হৃদয়ে
তাই বাঁচিছ ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

বঙ্গদর্শন ।

সংস্কৃতসাহিত্যে সামাজিক চিত্র ।

আমি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাঝেরই সুপরিচিত মুচ্ছকটিকনামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাটক অবলম্বন করিয়া কথ্য উপস্থিত করিব । মুচ্ছকটিক শূদ্রকনৃপতিবিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । এই শূদ্রকনৃপতি কোথায় বিরাজিত ছিলেন এবং তিনি বাস্তবিক নিজে মুচ্ছকটিককার কি না, তাহা নিঃসংশয়রূপে নির্দেশ করা যায় না । স্বল্পপুরাণের কুমারিকাখণ্ডের উল্লেখ অনুসারে শূদ্রকের কালকে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিতে হয় । এখন দেখা যাউক, মুচ্ছকটিকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সকলের আলোচনা দ্বারা ইহার রচনাকালসম্বন্ধে কতদূর নির্ণীত হইতে পারে ।

যেথা বাক্য, মুচ্ছকটিকে কি আছে ।
প্রথমত ইহাতে দুইটি রাজধানীর উল্লেখ দেখিতেছি—প্রথম উজ্জয়িনী, দ্বিতীয় পাটলিপুত্র । ইহার মধ্যে উজ্জয়িনী নবাবৌদ্ধবান এবং পাটলিপুত্র প্রাচীন ও পতনোন্মুখ; উজ্জয়িনীতে শৈবধর্মের নবাব্লাবদ, পাটলিপুত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্যব । ইহার অসামান্য দ্বিতীয় অঙ্কে দ্রুতকরদিগের সহিত সংবাহকের বিবাদের উল্লেখ দেখানে আছে, দেখানে

পাওয়া যায় । সংবাহক বসন্তসেনাকে বলিতেছে :

“আর্য্যো গুহন, পাটলিপুত্র আমার অন্ধ-
ভূমি, আমি গৃহস্থের সন্তান, সংবাহকের কার্য্য
করিয়া জীবিকানির্ভাহ করি । *
পর্য্যটকদিগের মূখে শুনিয়া অপূর্ব্বদেখ-
দর্শনকৃতহলবশত এখানে আসিয়াছি ।
উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করিয়া এক ভদ্রলোকের
সেবা করিয়াছি,” ইত্যাদি ।

এ ব্যক্তি সংবাহকের অর্থাৎ পাটলিপা-
ধানসামার কাজ করে । বিতর ও বিলাস
পূর্ণ মহানগরেই একপ জুতোর প্রয়োজন হয় ।
পাটলিপুত্র ত এক মহানগর, তবে কেন সে
পাটলিপুত্র ছাড়িয়া উজ্জয়িনীতে আসিল ?
বিহু, বাহু, মন্তপুরাণ প্রভৃতির আলোচনার
দ্বারা জানা যায় যে, পু্যামিজনাশক এক
রাজা চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের ১৩৭ বৎসর
পরে পাটলিপুত্রকে অক্রমণ করিয়া চন্দ্র-
গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশের উজ্জয়নাশন
এবং মগধে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন ।
ইতিবৃত্তের গণনা অনুসারে খ্রীঃ পূঃ
৩১৫ সালে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রনগর
মৌর্য্যবংশ স্থাপন করেন । সুতরাং মৌর্য্য-
বংশের পতন হইতে পারে ।

বংশের বিশেষণ দ্বিতীয় ১৭-শালে ঘটনা থাকিবে। ইহা মুক্তকটিকরচনার কিকিং পূর্বেই ঘটনা থাকিবে। মোঘাবংশের বিনাশের এবং পাটলিপুত্রে বিপ্লবঘটনার পর ইহা স্বাভাবিক যে, সংবাহকের দ্বারা ব্যক্তিগণ কর্তৃপ্রাপ্ত হইয়া পতনোদ্ভূত পাটলিপুত্রকে ভ্রাণ করিয়া নবোদীয়মান উজ্জয়িনী-নগরীতে আসিবে।

তখন পাটলিপুত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্য, ইহা অনুমান করিবার কারণ এই—যেই সংবাহক দ্রুতকর্মিগের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা সহ করিয়া অশমানিত হইল, অমনি তাহার মনে নির্বেশের উদয় হইল এবং তাহার কলহরূপ সে বৌদ্ধপ্রবণ হইয়া গেল। নির্বেশের অবস্থাতে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন তখন দৈনিক ঘটনা না হইলে কবি এত শীঘ্র ও এত সহজে একজন পাটলিপুত্রাগত ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী করিয়া দিতে পারিতেন না।

উজ্জয়িনীতে নবরাজ্যের অভ্যুদয় ও শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠার অনুমান করিবার কারণ এই—কবি বর্ণন করিতেছেন যে, তখনও উজ্জয়িনীতে মধ্যে মধ্যে প্রজ্ঞাদের বিজ্ঞান হস্তিতেছে। তাহার নাট্যাঙ্গিভিত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ আর্থক; এই ব্যক্তি গোপকুলোদ্ভব। এ ব্যক্তি গোপনে বিজ্ঞানের বড় ব্রত করিতেছে, একরূপ সংবাহ পাইয়া উজ্জয়িনীপতি ইহাকে কারাবদ্ধ করেন। কিন্তু সে খীর বন্ধুগণের সাহায্যে আপনায় বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া উজ্জয়িনীপত্রিকে বিনাশপূর্ব্বক উক্ত নগরে

সম্মা প্রতিষ্ঠিত করে।

ইহাতে এপ্রকার অনুমান করা কিছুই অযৌক্তিক নয় যে, কবি যে সময়ে মুক্তকটিক রচনা করিয়াছিলেন, তখনও উজ্জয়িনী-নগরে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে আদিম অধিবাসিগণ অভ্যাবিত হইয়া বিজ্ঞানপ্রভাভা উজ্জয়িনী করিতেছিল।

আর একরূপ অনুমান ইতিবৃত্তের ঘটনার অনুসরণেও বটে। এতদ্রূপক্ষে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের একটি বিষয় আলোচ্য বোধ হইতেছে। ভারতে জাতিজাতির সমাগমসময়ে লোকের সাধারণত এই ধারণা আছে যে, আর্ধ্যগণ প্রাচীনতম কালে মধ্য-আশিয়ার কোন এক নীতপ্রধান স্থানে বাস করিতেন। তৎপরে সেখানে জাতি-বিবাদবশত পৃথক হইয়া এই ভারতে তাহার দক্ষিণগামী হন। পরে ইহাদের এক ধারা হিন্দুকূলের দ্বার দিয়া পকনদে প্রবেশ-পূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। অপর ধারা ইরাণে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। পকনদ ও ব্রহ্মবিদেশবাণী আর্ধ্যগণের বংশধরগণ ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারাই বর্তমান ভারতীয় হিন্দুজাতি। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভারতে আর্ধ্যসমাগম প্রাচীনতম কালের একমাত্র বিজয়প্রবাহে ঘটে নাই; পর-বর্ত্তী ও অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও ইহানু প্রভৃতি দেশ হইতে নব নব বিজয়-প্রবাহ ভারতক্ষেত্রে প্রাণিত করিয়াছে। এমন কি, মহাভারতাদি গ্রন্থে যে সংবাহগণ ও

চন্দ্রবংশীয় রাজগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইহার। এই সকল পরবর্তী বিজয়প্রবাহের অর্জিত হইয়া প্রতীচাদেশ হইতে এই প্রাচ্যভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রতীচাদেশ হইতে পক, জাঠ, হুন প্রভৃতি আরও অনেক জাতি আসিয়া ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়াছে; এবং কালে হিন্দুধর্মে পরিণত হইয়াছে।

কোন জাতি কোন কালে আসিয়াছিলেন ও কোথায় কতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা এখন এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিলে হয়। মোটের উপরে এই বলা যায় যে, স্বর্ঘ্য ও অগ্নির উপাসক কোন কোন সাম-
 • রিক জাতিকে খ্রীষ্ট অব্দের বহুশতাব্দী পূর্বেই সিন্ধুনদের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। অগ্রসিদ্ধ মাসিডোনিয়াধিপতি * সিকান্দর শাহ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সিদ্ধুর উত্তর কূলে যজুবংশীয় রাজগণকে এবং পূর্বকূলে শকবংশীয় রাজগণকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরিয়ান নামক একজন গ্রীক ইতিবৃত্তলেখক দেখা দেন। ইনি বাণিজ্যকার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন বর্তমান ত্রোচন্দ্রনামক নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আরিয়ান সিদ্ধুর পশ্চিম উপকূলে মীনপরনামক এক মহাসমুদ্রতটালী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ অজয়মান করেন যে, উহা বর্তমান সেওয়ান নামক নগরের সমীকটে অবস্থিত ছিল এবং তাহার প্রকৃত নাম ছিল বাসি-
 • মগর। মুদলমানগণ প্রাচীন নাম লুপ্ত করিয়া তাহার সেওয়ান নাম রাখিয়াছে। টড্ আরও

অজয়মান করেন যে, ঐ রাজনগর সাইথিয়ান ও পার্থিয়ান রাজগণের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে এক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সিদ্ধুর উপকূলবাসী রাজগণ দুই দ্বারাতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এক দ্বারা পূর্বদিকে প্রাবিষ্ট করিয়া কান্তকূজ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হয়। অপর দ্বারা সিদ্ধু-
 • দেশের দক্ষিণভাগ হইতে সৌরাষ্ট্রদেশে ব্যাপ্ত হয়। এই সৌরাষ্ট্রবাসী শকবংশীয় রাজগণ উত্তরকালে মিবায় ও মালব প্রভৃতি দেশেও য য রাজ্য বিস্তার করেন। ইহার। আবার উত্তরকালে হুনদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

সৌরাষ্ট্রদেশ হইতে নিম্নোক্তক রাজগণ মিবায় ও মালবে রাজ্যবিস্তার করেন। শাসনলিপি প্রভৃতির পর্যালোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ১২৬ অব্দে এক সৌরাষ্ট্র-
 • সমাগত রাজা মালব অধিকারপূর্বক উজ্জয়িনীকে স্বীয় রাজধানী করেন। মিবায়ের প্রাচীন কাহিনী অজয়মানদের দ্বারা এবং ইতিবৃত্তের আলোচনা দ্বারাও জানা গিয়াছে যে, স্বর্ঘ্যোপাসক ও শিবোপাসক শকবংশীয় রাজগণ যখন মালব প্রভৃতি আক্রমণ করেন, তখন ঐ সকল প্রদেশ ভীলজাতির আদিম নিবাসীদিগের হস্তে ছিল। তাহাদেরই সহিত নবগত ক্ষেতাদের বিয়োগ উপস্থিত হয়। অতএব মুহুরটিকে উজ্জয়িনীপতির গোপাল-
 • দারকেই সহিত যে বিবাদের বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা এই আদিম অধিবাসীদিগের বংশধরদিগের অজ্ঞান মনে করা যাইতে পারে; অথবা তৎপূর্ব প্রস্থত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই মনে করা যাইতে পারে।

শেখোক অহুমান করিবার আর একটু যুক্তি এই, এই মুচ্ছকটিকেরই একস্থানে দুইজন শব্দ রাজকর্ণচোরী পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া একজন অপরকে বলিতেছে—“জানি, জানি, তুই ও চানারের ছেলে, রাজপ্রসাদে সেনাপতি হইয়াছিল।”—কত্রিরের কার্য চানারে করিতেছে, হইও বোধ হয় বৌদ্ধ প্রভাবের ফল। বতসুর বৃত্তিতে পারা যায়, এই বৌদ্ধপ্রভাব খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতকের পূর্বেই মালব প্রভৃতি দেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীপতি শকবংশীয় রাজগণ এই বৌদ্ধ-ধর্মকে দমন করিয়া শিবোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভে দিকুর উপকূল হইতে এক প্রবল জাতি আসিয়া সৌরাষ্ট্রদেশকে অধিকার এবং তাহার রাজধানী বরভীপুরকে ধ্বংস ও ধ্বংস করে। ধ্বংস করিলে তাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে হইতে বহুসংখ্য লোক উত্তরাভিমন্থে গিয়া এক বস্ত্র নগর স্থাপন করিয়া বাস করে। ইহারাই জৈনমতাবলম্বী বলিয়া এবং যেতারাই সূর্য ও শিবের উপাসক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা বাইতেছে, বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সকল প্রদেশে বৌদ্ধ, জৈন ও শিবোপাসকদিগের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে। এই বিবাদের ফলস্বরূপ আত্মাবর্তে কাক্তকুজ, ইন্দ্রপ্রস্থ ও উজ্জয়িনী, এই তিনটি স্থান পুনঃস্থিত হিন্দুধর্মের প্রধানকেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠে। মুচ্ছকটিকে এই বৌদ্ধপ্রভাবের দ্বারা ও উদীয়মান শৈবধর্মের অভ্যাসের উত্তরই প্রমাণ প্রাপ্তি হওয়া বাইতেছে।

উজ্জয়িনীতে শৈবধর্মের, অষ্টমশতক অহু-

মানের আর এক কারণ এই যে, কবি বারবার ‘নানক’ নামক একপ্রকার মূর্ত্তার উল্লেখ করিতেছেন। প্রথম অর্ধ শতাব্দীর বসন্ত-সেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :—

“এবা নানকমোহি-কাম-কপিকা।”

অর্থ—নানককে যে হরণ করে অর্থাৎ চোর, তার কামকে যে চরিতার্থ করে, অর্থাৎ গণিকা।

এতদ্বির এই নাটকের অপরাপর স্থানেও ‘নানক’ নামক মূর্ত্তার উল্লেখ দেখা যায়। পুরাতত্ত্ববিদগণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টের জন্মের এক শতাব্দী পূর্বে ও এক বা দুই শতাব্দী পরে সিদ্ধেশ্বরের তীর্থে যে রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাহারা ‘নানক’ নামে শিবনামাঙ্কিত একপ্রকার মূর্ত্তা ব্যবহার করিতেন। এই ‘নানক’ মূর্ত্তা সেই মূর্ত্তা। একজন অহুমান করা যায়, শকবংশীয় রাজগণই মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বীর অধিকারবিতারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ব্যবহৃত নানকমূর্ত্তা ঐ সকল স্থানে প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। এই নানকমূর্ত্তা এক সময়ে অনেক প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার প্রমাণ, মুচ্ছকটিকের ‘দরিত্র’ শব্দের পরিবর্তে ‘নির্দানক’ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। উজ্জয়িনীর প্রতিষ্ঠাতা শকবংশীয় রাজগণ বেদধর্মেই গিয়াছিলেন, শৈবধর্ম স্থাপনপূর্ব্বক হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মুচ্ছকটিকে আমরা সেই লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিতেছি।

দ্বিতীয় অর্ধে দেখিতেছি, সংবাহক দ্রাক্ষকরদিগের দ্বারা অহুস্ত হইয়া তাহাদের

ভয়ে এক পরিত্যক্ত সেবনমিত্রের প্রবেশপূর্বক সেবায় স্থান অধিকার করিয়া রহিল; এবং নৃত্যিক, দ্যূতকর প্রভৃতি সেই মন্দিরে প্রবেশ-পূর্বক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল । ইহাতেই প্রমাণ, জীঠের পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে অশোক প্রভৃতি যৌদ্ধনরপতিগণের প্রভাবে আৰ্য্যাবর্তের অনেক স্থানেই হিন্দুধর্ম একরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, অনেক সেবনমিত্র মন্দির পুণ্ডারীর অভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কেবল তাহাও নহে, ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণোচিত বাগবর্ত, ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করিয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল । নাটকের প্রধান পুরুষ চারুদত্ত একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠিচর্য্যে বাস করেন; তিনি শ্রেষ্ঠী-দিগের অর্থাৎ কুলীদব্যবসায়ী ধনীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, নিজের দানধ্যানের জন্যই দরিদ্র হইয়াছেন । চারুদত্ত প্রাতঃসন্ধ্যা ও সারংসন্ধ্যা করিতেছেন বটে, এবং তাঁহার পত্নী দূতী উপবাস ও ব্রাহ্মণকে স্বর্ণনানাদি করিতেছেন বটে, কিন্তু আসল ব্রাহ্মণের কাজ তখন বিলুপ্ত হইয়াছে । চারুদত্ত একটি গণিকার প্রণয়ে আসক্ত হওয়ারূপে অত্রাহ্মণোচিত কার্য্য মনে করিতেছেন না ।

অধিক কি, তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, শবিলক একজন ব্রাহ্মণের সন্তান, সে মুদ্রিয়ারাচিত ও গণিকাসক্ত হইয়া চৌধ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে । সে চারুদত্তের গৃহে সিংহ কাটিবার সময় আপনার বস্ত্রোপ-বীতটিকে পরিমাণহ্রদের দ্বারা ব্যবহার করিতেছে; আর বলিতেছে :—

“বস্ত্রোপবীতং হি নান ব্রাহ্মণস্য মহত্বকরণং
বিশেষতোহমুদিতম । কৃতঃ—

এতেন বাপশ্চিতি ত্রিভিঃ কৰ্ম্মবার্গঃ
এতেন মোচশ্চিতি কৃৎসনশ্চর্য্যোদয়ঃ ।
উদ্বাটকোত্তরোত্তরঃ কণাট
মটো কটীভূষণৈঃ পরিবেষনকঃ”

অর্থ—“বা হোক, পৈতৃকটা ব্রাহ্মণের, বিশেষত আমার মত ব্রাহ্মণের, অনেক কাজে লাগে । কেন না, এতদ্বারা সিংহ কাটিবার সময় ত্রিভিঃ বাপা যায়, অল্প হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া লওয়া যায়, দ্বারে অর্গল দিয়া রাখিলে খোলা যায়, এবং সর্ব্বশেষে সাপ-খোপে কামড়াইলে-তাগা বাঁধা যায় ।”

পূর্ব্বোক্ত উক্তির ভিত্তিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলে একরূপ মনে লাগে যে, সে সময়কার আচারব্রত ও ব্রাহ্মণাত্মক ব্রাহ্মণগণকে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যেই কবি শবিলকের দ্বারা এক পুরুষকে স্বীয় নাট্যাঙ্গীকৃত ব্যক্তি-গণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছেন । এই অশ্রুমানের আর এক প্রমাণ এই, কবি এই সময়েই শবিলকের মুখে আর একটি উক্তি দিয়াছেন । শবিলক বলিতেছেন :—

“অহং হি চতুর্ধেববিনোদপ্রতিগ্রাহকঃ পুত্রঃ
শবিলকো নাম ব্রাহ্মণো গণিকানবিকার্য্যমকাধা-
মহুতীকামিঃ”

অর্থ—“আমি শবিলক, আভিতে ব্রাহ্মণ, চতুর্ধেববিনোদ অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের পুত্র, আমি মনিকা গণিকার নিমিত্ত অপকার্য্য করিতেছি।”

কবি বেন বলিতে চাহিতেছেন—“কালে কালে এই হ’ল যে, দার বাপ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, তার ছেলে বেতাসক্ত চোর ।” ইহাতেই জানা যাইতেছে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম সে সময়ে অত্যন্ত দুর্বল ও শিথিল হইয়াছিল ।

বৌদ্ধধর্মের প্রচারের আরও কিছু কিছু পরিচয় এই নাটকে প্রাপ্য হওয়া যায়। বৌদ্ধনীতির দুইটি প্রধান অঙ্গ—অহিংসা ও দান। দরিদ্রদিগকে দান বৌদ্ধ আচার্য্য গণ সকল স্তরের উপরে প্রেষ্ঠগণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অপেক্ষের ভয় বৌদ্ধ উপাসকগণও দানধর্মের জন্য প্রসিদ্ধ। এমন কি, চৈন পরিব্রাজক হিউএন্সঙ্গ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন খানেনখরাধিপতি হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের রাজসভাতে উপস্থিত হন, তখন তিনি প্রোগারের “সন্তোষকেন্দ্রে” অদ্বুত মেলা ও অদ্বুত দানের ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। ঐ দান অভেদে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় শ্রেণীর সাধকদিগকে করা হইরাছিল। ঐ দানের ব্যাপার দেখিয়াই বোধ হয় হিউএন্সঙ্গ শিলাদিত্যকে বৌদ্ধ উপাসক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু ঐহিকারগণ তাঁহাকে শৈবধর্মাবলম্বী বলিয়া বোঝা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা বোধ হয় এই,—সে সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় শ্রেণীর রাজগণই অভেদে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান করিতেন। তখন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম অবিবাদে পাশাপাশি বাস করিতেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যেও বৌদ্ধনীতি সঞ্চারিত হইরাছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে-কোন কাব্যপুরাণাদি রচিত হইরাছে, তাহাতে অহিংসা ও দানধর্মের মহিমা উদ্ভাবিত হইরাছে।

হরিশ্চন্দ্রের সর্গসদান, দাতাকর্ণের পুত্রশিরচ্ছেদন, বলির পাতালগমন, নাগানন্দে স্খলিতবাহনের পক্ষিমুখে আশ্রয়-সমর্পণ, এই দানমহিমাযোষণা সাজ। এই

মুজ্জকটিকনাটকের গ্রন্থকার যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবনতির অন্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিজ্ঞপ করিতেছেন, তথাপি নিজে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান পুরুষ চাকদত্তের সর্গপ্রধান প্রশংসার কিয় এই, তিনি সর্গসদান করিয়া ফকীর হইয়াছেন। নতুবা পুণিকাসদ করিতে, মিথ্যা বলিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে তাঁহার বাধিতেছে না। বসন্ত-সেনার ন্যস্তসম্পত্তি চোরের দ্বারা অপহৃত হইলে, তিনি নিজ পত্নীর রত্নমালা বিদূষকের হস্তে প্রেরণ করিয়া এই কথা বলিতে বলিতেছেন যে, “সে রত্নসম্পত্তি আমি নিজের মনে করিয়া মূতে হারিয়াছি, তাহার পরিবর্তে এই রত্নাবলী প্রেরণ করিতেছি।” বিচারস্থলে তিনি হত্যার ও নিজ প্রাণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অবশেষে বলিতেছেন—“আমি বসন্তসেনাকে মারিয়াছি,” বাহা সত্য নহে। কিন্তু তাঁহার সর্গপ্রেষ্ঠ প্রশংসার বিষয় এই, ইনি আপনার সমুদয় বিভব অধিগণের উদ্বর্জনন করিয়াছেন। এমন কি, “বীর পুত্রকে একটি মাটির শকটের অধিক দিবার সাধ্য নাই।

আমাদের ত পড়িতে পড়িতে চাকদত্তের ভ্রাতৃ হর্ষণচিহ্ন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ বিরাগ উৎপন্ন হয়। দারিদ্র্যের অস্ত্র কাতরোক্তি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে দৈর্ঘ্যচ্যুতি হয় এবং বলিতে ইচ্ছা করে—“বাবা, শেষে যদি কাঁদবে, তবে দান করতে গেলে কেন?” কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহাকে আদর্শচরিত্র বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। নিশ্চয় এই দানশক্তি তাঁহার চক্রে মানবচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইরাছে।

তৎপরে বানশক্তি র স্ত্রীর অহিংসাপন্থের প্রতিও দৃষ্টি দেখা যায়। কবি শকারের মুখ দিয়া বসন্তসেনাকে বধন গালাগালি দিতেছেন, তখন অপরায়ণ অবজ্ঞাপূৰ্ণক সর্বোপনয়নের মধ্যে “বংশাশিকা” বা মংস্তোত্রাঙ্গিনী বলিয়া সর্বোপনয়ন করিতেছেন। ইহাতে এমন, সেই প্রাচীন সময়েও মংস্ত-মাংস-আহার নিষিদ্ধব্রাহ্মণের মধ্যে বদ্ধ ও স্থগিত কার্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। ইহাও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবজাত বলিতে হইবে।

এ সময়ে আর একটি অসুস্থান দেখিতেছি, বাহা দেখিলে বর্তমান জৈনধর্মকে মরণ হয়। তাহা পণ্ড, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে আহার দেওয়ার কথার জ্ঞান করা। এই তাহ বৌদ্ধধর্ম হইতে সেই প্রাচীনকালেও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশিত হইয়াছিল। মার্কিক-এবং চাকবন্ত নিত্য হরবস্ত্রের মধ্যে পড়িয়াও সন্ধ্যাবন্দনায় হৃদয়গকে বলি অর্পণ করিতে তুলিতেছেন না। বিদ্যুৎকে বলি অর্পণ করিতে বাধ্য করিতেছেন। বর্তমান সময়েও দেখা যায় যে, জৈন-সম্প্রদায়বৃত্ত ব্যক্তিগণের চক্ষে ইহা নিত্য আচরণীয় মহা ধর্মগ্রন্থ। শুদ্ধরাতের অন্তর্গত আমবাধার প্রকৃতি জৈনপ্রধান স্থানে, এমন-কি, কলিকাতার বড়বাড়ারের মাড়ওয়ারীপটীর স্ত্রীর হানে পদাৰ্পণ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, এই সম্প্রদায়বৃত্ত সাধকগণ রাজপথে পক্ষিদের মৃত্ত নানাজাতীয় শত্রুবিজ, অথবা, পিপীলিকাদের মৃত্ত চিনি প্রকৃতি অর্পণ করিতেছেন। এই ধর্মবুদ্ধি এতদূর গিয়াছে যে, একপণ্ড ও নিরাশ্রিত, পরদা দিয়া মাংস ভাড়া করিয়া

তাহাকে সমস্তরাত্রি খাটের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া ছারপোকাদিগকে খাওয়ানকেও তাঁহাদের অনেকে ধর্ম বলিয়া মনে করেন। এই অহিংসা ও হৃদয়বলির ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশিত হইয়াছে। এই অহিংসা হিন্দুতাব নহে, কারণ বাগবন্ত ও পণ্ডবলি এদেশের প্রাচীন ভাব। তাত্ত্বিক বামাচারকে এই অতিরিক্ত অহিংসাপন্থতার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তৎপরে এই নাটকের মধ্যে সামাজিক নীতিনীতির যে নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমত তখনদাসদাসীদিগকে ক্রয়বিক্রয় করা নিত্য-কর্মের মধ্যে ছিল। মদনিকা বসন্তসেনার দাসী; শবিলক তাহার প্রতি অতুরক্ত; তাহাকে একেবারে চাম,—বসন্তসেনা তাহাকে যে মূল্যে কিনিয়াছিলেন, তাহা না পাইলে দিবেন না, এই আশঙ্কা করিয়া শবিলক চুরি করিতে গেল; এবং চাকবন্তের গৃহ হইতে বসন্তসেনার স্ত্রী অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়া আনিয়া। দ্বিতীয়ত সংবাহক সন্তিক, দ্যুতকর প্রভৃতির নিকট দ্যুতে পরাজিত হইয়া পরাজয় করিতেছিল, বধন তাহাদের হস্তে ধরা পড়িল এবং বাজির টাকা দিতে অসমর্থ হইল, তখন আপনাকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দিবার চেষ্টা করিল; এবং একান্ত রাজপথে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “মহাশয়রা কে চাকর চান? আমাকে ক্রয় করুন, আমি সংবাহনবিজ্ঞানে পারদর্শী, ইত্যাদি।—এই ক্রীতদাসপ্রথা ও দাসীক্রয়-প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে

চলিয়া আসিয়াছে। ইংরাজরাও ইহা অপরোধের মধ্যে গণ্য হইয়া নিবাসিত হইয়াছে।

তৎপরে আর একটা এই দেখিতেছি—
বারাণসাবিধের মহাসম্মেলন। পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে হতোম পাঁচা বধন তাঁহার সরস ভাষাতে কলিকাতাসহরের নক্সা অঙ্কিত করেন, তখন বলিয়াছিলেন—

“আজব নগর কলকাতা।

বাড়ী-বাড়ীর খাসা বাড়ী ভহুগাণে গোলপাড়া।”

এ সম্বন্ধে এই প্রীতীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পতাকায় সমকালের মহানগরীসকলের কিছু প্রেভেন দেখিতেছি না। ভদ্রতম চাক-দস্তের ভবনে একটি প্রবীণ জগে কি না, সম্বন্ধ! কিন্তু গণিকা বসন্তসেনার ভবনে সাত একোষ্ঠ, এক একটি একোষ্ঠ এক একটি রাজ-ভবনের স্তর; বসন্তসেনার মদমত্ত হস্তী রাধপথে সকলের জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে; বসন্তসেনার দাসদাসী, পরিচারক-পরিচারিকার অন্ত নাই; কি ঐশ্বর্য! কি বিভব!

এই বারাদানবৃত্তির বিষয়ে আবার এই দেখিতেছি যে, ইহা ভদ্রজনসম্মত একটি সামাজিক ব্যবহার মধ্যে। ভদ্রলোকে ইহা-য়ের গৃহে বাইতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। ইহারাও অবাধে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসিতেছে। এ বিষয়ে ইহারা গ্রীক্ হেটেরিসিগের ভায় ছিল, বাহাদুরের ভবনে জানিস্প্রেট-সফ্রেটিঙ্গ বাইতে লজ্জাবোধ করিতেন না।

বসন্তসেনার অতিসারক্রিয়া কি নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা। ইহাতেই প্রমাণ, এ-জাতীয়

গণিকাগণ তখন কিরূপ অবারিতগতি ছিল। কিন্তু এ কথা বলিবার সময় মনে হইতেছে, এখনও ত ভায়তবর্ষে একটা একশ্রেণীর বারাদানা রহিয়াছে। পত্রাবে ও দাকিণাত্যে এখনও ছই শ্রেণীর বারাদানা দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীকে বলা বাউক “রাহী”, আর এক শ্রেণীকে বলা বাউক “গেহী”। “রাহী” তাহার, বাহার পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে ও উল্লসিত হাস্যাধীনধারণ করে। গেহীরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত বাস করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নৃত্যাগীতে পরিপক। বিবাহবিহি উৎসবে ইহারাই গৃহস্থের গৃহে নৃত্যাদি করিতে আসে। দাকিণাত্যে এই শ্রেণীর বারাদানাগণ সচরাচর দেবমন্দিরের দেবদাসী বলিয়া পরিচিত। ইহারা নামত মুন্সিফের দেবগণের সহিত বিবাহিত হয়, কিন্তু কলত বিলাসী পুরুষগণের অন্তই থাকে। ইহাদের সহিত মেশা বা ইহা-দিগকে বাড়ীতে আনা তত্তৎপ্রদেশের সামাজিকদিগের পক্ষে লজ্জাজনক কার্য নহে। ইহারা dancing girl নামে পরিচিত। এজন্য সে সকল প্রদেশের বহুসংখ্যক পুরুষের নীতি অতি কলুষিত। সে নীতি সংশোধিত হইতে যে কতদিন লাগিবে, তাহা বলা যায় না। এই দেবদাসী বা dancing girl শ্রেণী বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। চৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দ রায়ের চরিত্রবর্ণন-স্থলে গোদাবরীপ্রদেশে এই দেবদাসীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মুছকটিকে বসন্তসেনার দেখণ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকে এট “গেহী” শ্রেণী-গণ্য বারাদানা বলা বাউতে পারে। বসন্ত-

সেনার মাতা ও ভ্রাতার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। মাতা ও ভ্রাতা তাহার আয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। এখনও পত্রাবে ও অপরপূর স্থানে গিয়া দেখুন, এই ব্যাপার চলিতেছে। কেবল তাহাও নহে, বিনুষ্ক বসন্তসেনার মাতাকে দেখিয়া বলিতেছে— “জীলোকটা সুরাপান করিয়া করিয়া দুগ্ধোদরা হইয়াছে।” ইহাতে প্রমাণ, তখনও এই শ্রেণীর শ্রাণোক ও ইহাদের সংসর্গী পুত্রবধন পানাসক্তির দ্রুত প্রদিক্ত ছিল।

তৎপরে এম সময়কার বিচারপ্রণালী। ইহা বেন কতকটা এখনকার বিচারপ্রণালীর অনুরূপ, তবে উকীল নাই। অধিকরণিক-শব্দবাচ্য একজন রাজনিযুক্ত বিচারক অধিকরণে আসিয়া বিচারাসনে বসিলেন, সঙ্গে শ্রেণী ও কারদ। কারদ্বয়াকীর অবানবশী লেখেন; শ্রেণীকি কাজ, তাহা নাটকে প্রকাশ পাইতেছে না; হয় তিনি জুরির কাজ করেন,—বিচারকের বিচার-কার্য্যের সহায়, না হয় জরিমানার টাকা প্রভৃতি বাহ্য-কিছু রমা হয়, তাহা লইয়া রাজ-কোষে রমা দিবার ভার গ্রহণ করেন। অনু-মানে বোধ হয়, শ্রেণীদিগের প্রতি বিতীর্ণ-প্রকার কার্য্যের ভার থাকিত। কারণ

প্রাচীন হিন্দু-বিচারপ্রণালীতে প্রাচ্য-বিবাক-গণই অনেকপরিমাণে জুরির কার্য্য করিতেন। মুচ্ছকটিকের বিচারে কিন্তু প্রাচ্য-বিবাক দেখা যাইতেছে না।

এই নাটকে তদানীন্তন লৌকিক প্রচলিত ধর্ম্মের যে ছবি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও কতকটা বর্তমান প্রচলিত লৌকিকধর্ম্মের অনুরূপ। দেখিতেছি, সেই প্রাচীনকালেও লৌকিকধর্ম্ম প্রধানত শ্রাণোকদিগের এক-উপবাসাদিতে বাড়াইয়াছে। শ্রাণোকেরা স্থান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিয়া বসিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ আসিয়া বস্ত্র পরিয়া কথা শুনাইয়া যান; এবং ব্রহ্ম-উপবাসাদি করিলে অস্ত্রত একটি ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়।

ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতকে সেই প্রাচীনকালেও সর্গসংস্কারের মধ্যে খুব পরিচিত দেখা যাইতেছে। নাট্যোন্নিখিত ব্যক্তিগণ পদে পদে রামায়ণ-মহাভারতের বর্ণিত আখ্যায়িকাসকলের উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু অপর কোন পুরাণোন্নিখিত আখ্যায়িকাদির উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাও মুচ্ছকটিকের দ্বিতীয় বিতীর্ণ বা তৃতীয় পতাকাবীর মধ্যে রচিত হইবার অপর প্রমাণ; কারণ অধিকাংশ পুরাণ তৎপরে রচিত হইয়াছে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বাচ্ছা-চর ।



[অনুবাদ]

ভাহার নাম ঠেনের পো, খালি ঠেনের পো ।

সে পারী-নগরের একটি সহরে ছেলে, কাহিল, ফ্যাকাশে । তাহার বয়স বনও হইতে পারে, পনের বলিগেও চলে, এ-রকম হোঁড়াদের বয়স ঠিক করা মুকিল । তার বা মারা গিয়াছিল । বাপ আগে সিপাহী ছিল, এখন সহরের একটা পাড়ার চকের হেফাজতের কাজে নিযুক্ত ।

শিশুর বল, চাকরাণী, নিড়বিড়ে বুড়ী, ছেলে-কোলে পঞ্চলতি স্ত্রীলোক, যে কেহ গাড়িখোড়ার তিক্ত হইতে চার-দিক্-রাস্তার-ঘেরা সেই চকের বাগানের মধ্যে আশ্রয় লইত, সকলেই বাবা ঠেনকে চিনিত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ।

তাহারা জানিত যে, সেই ঝাঁটার মত গৌক-জোড়া, বা দেখির। পাড়ার বদমাইস ও রাত্তার কুহুরগুলো ডরে অস্থির হইত, তার মধ্যে বড় নরম, মিঠে, প্রার-বায়ের-মত-বেহমাখা একটি হাসি লুকান ছিল । সেই হাসিটুকু দেখিতে হইলে ভদ্রলোককে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেই হইত—“তোমার ছেলেটি কেমন ?”

বাবা ঠেন ছেলেতে কি ভালটাই বাসিত । ছোকরা বখন শেরবেলার ইন্সুল থেকে কিরিয়া তাহাকে ডাকিত, তখন সে খুলী কত ! তার পর বাপে-বেটার মিলিয়া চকের চারদিকের রাস্তায়-চক্ৰ দিত,

বেকিতে বাহা বসিণা আছে তাহাদিগকে অভিবাধন করিত, তাদের কুশলপ্রশ্নের উত্তর দিত ।

দুঃখের মধ্যে পারী-অবরোধের সঙ্গে সঙ্গে সবই উলটপালট হইয়া গেল । এই চকের ভিতর একরূপ কেরোসিন্‌তেল আনিয়া জ্বালা করা হইল, তাই পাহারা দিতে দিতে বেচারী বাবা ঠেনকে সমস্তদিন সেই লোকশূন্ত জঙ্গলপড়া বাগানে একনাটি কাটাইতে হইত । তামাকটুকু পর্য্যন্ত খাইবার জো ছিল না ; সেই কত রাতে বাড়ী-কেরার আগে ছেলেরও দেখা পাইত না । দুর্ভিক্ষ প্রশিয়ানুদের নাম করিলে তার গৌক-ফোলানটা একটা দেখবার জিনিষ ছিল ।

ঠেনের পোর কিন্তু এ নূতন ব্যবস্থাতে আপত্তির বিশেষ কারণ ছিল না । অবরোধ । হোঁড়াদের পক্ষে এমন মজার জিনিষ কি আর আছে ? ইন্সুল নাই, পড়া নাই, রোকেই ছুটি, রাত্তার বেন সমস্তকণ মেলা লাগিয়া রহিয়াছে ।

বালক সারাদিন বাইরে-বাইরে টোটো করিয়া রাখে বাড়ী কিরিত । পন্টনের দলগুলো যে সময়ে পাড়ার ব্যারাক্ হইতে গড়ে বাইত, সে একটা-না-একটার দল ধরিত, বেটার বাজনা ভাল, সেইটাই পছন্দ করিয়া লইত । এ সবকে ঠেনের পোর বেশ জানা-পোনা ছিল । সে দন্ করিয়া

বলিয়া দিতে পারিত যে, ২৬ নং পন্টনের
খাণ্ড ভেদন কাজের নয়, কিন্তু হেবটার
বড় ভয়। আবার কখনো বা সে দাঁড়াইয়া
কৌলের কাওয়াজ দেখিত।

এর উপর দোকানের দরজার লোকের
সার ছিল। শ্রুতকালের এই অরুকার
ভোর হইতে মাসওয়ালা-কটওয়ারার
দোকানের সামনে সারবন্দী লোক জমিয়া
থাকিত, সেই বরফ-গলা জলে পা দিয়া অপেক্ষা
করিতে করিতে সেখানে সকলের পরস্পরের
সহিতআলাপ হইত, গল্প চলিত, রাজনীতির
তর্কবিতর্ক বাধিত। টেনের পো চুপড়ী-হাতে
সেই সারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত, টেন-
মহাপ্রবোধে ছেলে বলিয়া সকলে ওরও
মতামত জিজ্ঞাসা করিত।

কিন্তু সব চেয়ে ভারি 'আমোদ' ছিল
জুয়াখেলা। টেনের পোকে সৈতনলের সঙ্গে
বা দোকানের সামনে না দেখা গেলে, বড়
চকের ভিতরে, যেখানে বড় অরু হওয়া
অবাধি একটি মত্ত জুয়ার আড্ডা বসিয়া
গিয়াছিল, সেখানে তাকে নির্বাক পাওয়া
বাইত। সে বে নিজে খেলিত না, তা
আর বলিতে হইবে কেন, সে ত ঢের
পরসার কাছ। কিন্তু খেলওয়াড়দের দিকে
কি প্যাটুপ্যাটু করিয়া চাহিয়া থাকিত!

এক চোটে পাচুড়ার কম বাড়ি
ফেলিতই না, এমন একটি নীল-আব-পরা
চ্যাঙা ছোকরা তাহাকে বিশেষ মূগু করিয়া-
ছিল। সে একটু জোরে চলিলেই তার
পকেট সর্বদা অমুগু করিত।

একদিন তাহার একটি মুদ্রা টেনের
পোর পায়ের কাছে পড়াইয়া আসিলে,

কুড়াইয়া লইবার সময়ে চ্যাঙা ছোকরাটি
চাপা আওয়াজে 'তাহাকে' বলিল—“টাকা
দেখে’ যে টায়া হয়ে গেলি, অ্যা ? আচ্ছা,
চাসু ত এসব কোথা পাওয়া যায়, তোকে
বলে’ দিতে পারি।”

খেলা শেষ হইলে সে তাকে চকের এক
কোণে লইয়া গিয়া প্রশিহান্দুগিকে কতাসী
খবরের কাগজ বেচিতে, সঙ্গে করিয়া লইয়া
বাইবার প্রস্তাব করিল। ইহাতে সে
এতদূর খেপে ত্রিশমুদ্রা করিয়া পাইত।

টেনের পো প্রথমটা মহা রেগেমেগে
অস্বীকার করিল; এমন কি, তিনদিন সে
খেলার ধারেই গেল নক। তিনটি বড়
সাম্যাতিক দিন! ঘুমাতেও পারে না,
খাইতেও পারে না। তাকে সে কেবলি
দেখিতে থাকে, খাটের গোড়ায় একরাশ
খেলার খুঁটি, আর চারদিকে রূপার মুদ্রা চেন্টা
হইয়া পড়িয়া চক্চক্ করিতেছে। লোভের
মাত্রা কিছু বেশী হইয়া পড়িল।

চতুর্থ দিনে সে আবার বড় চকে হাজির,
কেন সেই চ্যাঙা ছোকরার পায়ের পড়িল,
এবার তন্নিয়োগ গেল।

একদিন সকালে বরফের মধ্য দিয়া হু’লনে
বাহির হইল, কাঁধের উপর একটি করিয়া
চটের খলে, কাপড়ের মধ্যে খবরের কাগজ
সুকান। তাহার বখন সহরের কটকে
উপস্থিত, তখন সব 'আলো' হইয়াছে।
চ্যাঙা ছোকরাটি টেনের পোর হাত ধরিয়া
সাত্তী নিকট এগিয়ে গেল—“লাল-নেকো
সিপাহী, মুখে ভালমাহুবি ভাব—এক তিন-
কের নাকে-কাগজি স্নরে তাহাকে বলিল—
“আমাদের ছুড়ে দাও গো, দরদার সেপাই-

বাবা! আমাদের বাপ মাঝা গেছে, যা ব্যারামে পড়ে, আমার ছোট ভাইকে নিয়ে আমি মাঠে আলু ফুড়তে যাব।”

বলিয়া সে কাছা ছুড়িয়া দিল। ঠেনের পো লক্ষ্য করি ছোট করিয়া রহিল। সাত্তা একবার উছাদিগকে দেখিয়া লইল, একনজর চারিদিক চাহিল, কেউ কোথাও নাই, তার পরে চট করিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া কহিল—“ভূক্তি কর!”

বাঁহাতক্ বলা, আর তাহারও সদর-রাস্তার বাহির। তখন ঢাঙা ছোড়াটার হাসি দেখে কে!

ঠেনের পো বগের মত আপ্লাভাবে হৃদয়ের বৃত্ত দেখিতে লাগিল। কারখানা-গুলোকে সব ব্যারাক করিয়া ফেলা হইয়াছে, লম্বা-লম্বা ধোঁরাশূক চোং-লো কোয়াশা ছুড়িয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে। এখানে-ওখানে পাহারা; কোথাও ঝাঞ্জা-ঝোঞ্জা-ঝাঁটা সেনা-নারক ঘুরবীণ দিয়া ঘুরে কি দেখিতেছে; মাঝে মাঝে গলা-বরকে-ভেজা তাঁবু, সাম্নে রাজে-আলা আঙনের ছাই পড়িয়া।

ঢাঙা ছোড়ার পথঘাট সব চেনা ছিল, সে সাত্তা-বসান স্থানগুলি বাঁচাইয়া মাঠে মাঠে চলিতে লাগিল; শেষে কিছু একরল গোলন্দাজের সাম্নে পড়িয়া গেল, তাহাদিগকে আর এড়াইতে পারিল না। তাহার বরাবর রেলের রাস্তার অপর ধারে সাত-বাঁধা ছোট ছোট ঢালার মধ্যে ঢৌক দিতেছিল।

এবার ঢাঙা ছোড়ার তার গাংটি নুখা আঙড়াইল, তাতা কিছুতেই ছাড়িবে না। কাগজাটি শুনিয়া কীচকান-মুখ চুপে-পাক-

ধরা কতকটা বাবা ঠেনের ধরনের এক বুড়ো জমাদার পাহারা-ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তার আসিয়া বলিল—“কিরে বেচারী! এমন করে কি কাঁদতে আছে? আলু ফুড়তে বাবি এখন, আগে ঘরে এসে একটু গরম হয়ে নে, ছোট ছোড়াটা বেঁজার অনেক পেছে।”

হার রে! ঠেনের পো বে কীপিতেছিল, সে ত শীতে নয়, ভরে ও লক্ষ্য করি পাহারা-ঘরে ঢুকিয়া তাহার দেখে, সাত্তা-বসান-রকমের অম একটুখানি মাগনের চার-দিকে জনকতক দিপাহী জড়সড় হইয়া সতীনের উপর বরক-জমা বিকুটগুলি বিধিয়া ভাতাইয়া লইতেছে।

ছেলেদের মত জারগা করিয়া তাহার আর-একটু ঘেঁষাঘেঁষি বলিল। তাহা-দিগকে একটু কাফি খাইতে দিল। তাহার সেটা বাইতেছে, এমন সময়ে এক নারক দরজার পোড়ার আসিল, জমাদারকে ডাকিল, কিছুক্ষি করিয়া কি বলিল, আবাক ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। জমাদার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া-আসিয়া উৎফুল্লমুখে কহিল—“ওহে বাপসকল, আজ রাতে একটা কাগজাও কিছু হবে! প্রিন্সারান্দের সন্তেত ঘরে নেওয়া গেছে, এবার বোধ হয় সরতানদের বুর্জে-গড়টা আবার আর্মারের হাতে পড়বে।”

তখন হাসি ও ব্রহ্মধ্বনির চোটে বর ডাঙিয়া পড়িবার লোপাঙ! সকলে নাচিয়া-গাহিয়া সতীল আফাশন করিতে লাগিল। এই মাতামাতির সুযোগে ছোড়ারাই মুটকাইয়া পড়িল।

রেলের রাস্তা পার হইলে সাম্নে কীকা-

মাঠ ছাড়া আর কিছু রহিল না । দূরে একটি টানা দেওয়াল, খনখন গুলগুলি কাটা । এই দেওয়ালের দিকে ইহার। আলু কুড়াইবার ভকীতে মাঝে মাঝে হুইতে হুইতে চলিল । ঠেনের পো বারের-বারে বলিতে লাগিল—“চল ফিরে যাই, আর সিরে কাজ নেই ।”

কিন্তু অপরটি শুধু ক্র কোচকার, আর চলিতে থাকে । হঠাৎ বন্দকের ঘোড়াভোলায় কটান্দ-বধ পোনা গেল । ঢাঙা ছোঁড়া মাটিতে গুটাইরা-পড়িয়া বলিল—“ওরে পড়ু !”

হুই জনেই এমির উপর লম্বা হইলে সে শিল্প দিল । বরকের উপর দিরা পাণ্টা শিল্প আসিল । তাহার। শুড়ি মারিয়া অগ্নিরে চলিল । দেওয়ালের ঠিক সামনে মাটির সঙ্গে সমান হইয়া এক ময়লা টুপি ও তাহার নীচে কটা গোক-ছোড়া দেখা দিল । ঢাঙা ছোকরা সেই প্রশিদ্দান্টার পায়ে নাগার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া সন্ন্যাসীর কিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—“এটি আমার ভাই ।”

ঠেনের পো এমন ছোটটি ছিল যে, প্রশিদ্দান্টা তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির । তাহাকে আড়কোলা করিয়া তবে দেওয়ালের কাটা'ভারগাটা পার করা গেল ।

দেওয়ালের ঠ-পাশে মত মত মাটির চিবি, কাটা গাছের শুড়ি, বরকের মধ্যে কোলো কালো পর্ক, প্রত্যেক পর্কের ভিতর সেইরকম ময়লা টুপি, তার নীচে সেইরকম কটা গোক, ছেলেদিগকে যাইতে দেখিয়া সবগুলোতে মুচ্-কি-হাসি ।

এক কোণে বাগান-ওয়ালার বাড়ী,

তাহা গাছের শুড়ি দিরা আগাগোড়া মোড়া হইয়াছে । নীচের ঘরে দিপাহী পোরা, তাহার। তাল বেগিতে বাস্ত । সম্মুখে আঙনটার উপর হাড়ি চড়ান, দিব্য রান্নার গন্ধে ভুবুভু করিতেছে । সেই করানী গোলাবালকের আড্ডা হইতে কত তফাৎ ।

উপরের ভলার সেনানারকরা । তাহার। মদ খাইতেছে, গানবাননা করিতেছে । ফরাসী ছোকরা-হুটা চুকিতে খুব আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল । তাহার। উপরে গিয়া খবরের কাগজগুলি বাহির করিয়া দিল । তাহাদের নিকট আরো কথা আদার করিবার আশার মদ দেওয়া হইল ।

নাথকদের খুব বাড়-ভোলা নাক-সিঁটকন ভাব, কিন্তু ঢাঙা ছোঁড়াটার নানারকম সহরে রসিকতা ও গলিচ্ বোলচালের চোটে তাহার। নম্রমে আসিল । প্রথমটা হাসিল, ক্রমে সেই সব চোখা-চোখা বুলি তার সঙ্গে সঙ্গে মাওড়াহতে লাগিল, এক কথাই পান্নী-নগরের এই কাদার ওদ্বারের মত আনন্দে লুটাপুটি করিতে থাকিল ।

ঠেনের পোর ইচ্ছা হইল, সেও হুটা দিরা বাহির করিয়া এমন করে যে, সে নেহাৎ অজ-নয়, কিন্তু কি-একটা দেন তাহাকে দমাইয়া রাখিল । তার ঠিক সামনে, দল হইতে একটু তফাতে, একটি অখীণ গভীর প্রশিদ্দান্ট বসিয়া পড়িতেছিল, অর্থাৎ প্রথমটা পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আসলৈ তাহার চোখ একবারও ঠেনের পোর মূখ থেকে নামে নাই । তাহার চাহনীতে ভিন্নভার-দেখান দেখা ছিল—দেন বাড়ীতে তাহার

এই বয়সের ছেলে আছে, তাহার সম্বন্ধ তাবিতেছে “ছেলেকে এমন কাজে দেওয়াই চেষ্টা নয়গ ভাল !”

সেই মুহূর্ত্ত পেকে টেনের পোর মনে হইল, যেন তার বুকের মধ্যে কাহার হাত ঢুকিয়া দম চাপিয়া বন্ধ করিতেছে। এই বয়সে এড়াইবার ক্ষমতা সে মদ খাইতে লাগিয়া গেল। ক্রমে চারদিক্‌টা পাক দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে সে অস্পষ্টভাবে হাসির গন্ধটা শুনিল, দেখিল যে, তাহার সম্মুখিটী নানাপ্রকার অলঙ্কার করিয়া কতাসী-সৈন্তদের ব্রহ্মসমকম নকল করিতেছে।

পরে ঢাঙা ছোকরাটি গলা নামাইল, নাহকগুলো তাহাকে ঘিরিয়া পাড়াইল, তাহাদের মুখ গজীর। হস্তগাটা বুঝি গোল-দাঁড়বের রাজের আক্রমণসম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। তখন টেনের পোর নেণা ছুটিয়া গেল, সে রাগিয়া উঃ হইয়া লাকাইয়া উঠিল—“ও হবে না, ও সব চলে না !”

অপরটি খালি একটু হাসিয়া বলিয়া চলিল। তাহার শব্দ হইতে না হইতেই নারকরা সর্বথাড়া হইয়া উঠিল। একজন বয়স্কর দিকে দেখাইয়া ছেলেদিগকে বলিল—“বেরো !”

তাহার পর তাহার নিষেধের মধ্যে কর্ণে কি বিড়বিড় করিতে লাগিল।

ঢাঙা ছোকরাটা পকেট বাজাইতে বাজাইতে রাজার মত বুক ফুলাইয়া বাধির হইল। টেনের পো মাথা লটুকাইয়া তাহার পিছনে-পিছনে চলিল; যে প্রশ্রয়ান্টির চাহনি তাহাকে এত উত্তলা করিয়াছিল, তাহার

পাশ দিয়া বাইবার সময়ে সে চুপের স্বরে এইকথাটি কথা শুনিল—“একজ বড় ভাল নয়, মোটেই ভাল নয় !”

তাহার চোখে জল আসিল।

একবার মাঠে পড়িলে পর বালকরা দৌড় মারিয়া শীঘ্রই কতাসী লীমান্ন উপস্থিত হইল। প্রশ্রয়ান্ণ আনু দিয়া তাহাদের খেলগুলো পুরিয়া দিয়াছিল, “তাই নিয়া” গোলন্দাজদের সার পর্য্যন্ত তারা নির্ঝিঁরে পৌঁছিল।

সেখানে রাজের আক্রমণের আয়োজন চলিতেছিল। কোন্‌ চুপিচুপি আসিয়া দেওয়ালের আড়ালে সমাবেশ হইতেছে। সেই ডুঃ জমাণার বন্দোবস্ত করিতে মহা-ব্যস্ত, সুখে কি প্রসন্নতাব! ছেলেরা বাইতেছে “দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া একটু স্নেহহাসি হাসিল।

উঃ! সে হাসি টেনের পোকে কি বেঁধাই বিঁধিল! একবার তাহার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া বলে—“ওগো, তোমরা ওখানে বেরো না গো, আমরা ‘তোমাদের সর্বনাশ করে’ এলছি !”

কিন্তু অপরটি উহাকে বলিয়া রাখিয়াছিল—“খবরদার, মুখ খুলিস্‌ নে, তা হ’লে আমাদের জলি করবে !”

সেই ভয়ে সে চাপিয়া গেল।

সহরের দেওয়ালের বাইরে তাহার এক পোড়ো বাড়ীতে ঢুকিয়া টাকা ভাগ করিয়া গইল। সত্য কথা বলিতেই হইবে যে, ভাগ কড়ার-গড়ার মিলাইয়া লওয়া হইল, এবং টেনের পো যখন তার কাপড়ের মধ্যে টাকার ভক্ষমানি শুনিল, তা’ দিয়া কত খেলা

বাইতে পারিবে করনা করিল, তখন তার দুকণ্ঠী আর তত-ভরতর বলিয়া বোধ হইল না।

কিছু বেচারী ছেলেমাহুষ! সে বধন একলা পড়িল, তখন? কটক পার করিয়া-দিয়া বধন চ্যাঙা ছোঁড়াটা চলিয়া গেল, তখন তাহার পকেটের তার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তার বকের মধোর সেই হাতটা আরও কসিয়া ধরিল। এ পারী-সহর আর সে পারী নয়। রাত্তার লোকজন যেন সকলেই তাহার বিভ্রাটের শইয়াছে, সকলেই তাহার পানে কটমট করিয়া তাকাইতেছে। গাড়ির ঢাকার বড়-বড়ানীতে, খালধারে যে বুকটাক বাজিতেছে তাহার বোলে, সবটাতেই ক্রমাগত বলিতেছে—“বুঝোয়!”

শেষে কোনরকমে বাড়ী পৌছিলে, বাপ শুধনো আসেন নাই দেখিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া পাচিল, তাতাতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তার নিষের বাগিশের নীচে সেই ঢাকার বোকাটা নামাইয়া-বাঁধিয়া তবু কতক হাল্কা বোধ করিল।

সে রাতে বাবা টেন্স লেন্স খোস-মেজাজে বাড়ী ফিরিল, আগে এমন তার কখনো দেখা যায় নাই। মকবল হইতে বুকসংবার পৌছিয়াছে, লড়াইয়ের অবস্থা যেন একটু ভালর নিকট। বাইতে খাইতে বড় দিপাহী তাহার সেওয়ালে-টাঙান বন্ধকের নিকট তাকাইয়া, তাহার সেই শাদা খোলা হাসি হাসিয়া ছেলেকে বলিল—“বড় হ’লে জুই প্রিশিয়ানদের খুব চুকতিস, কেমন?”

আটটা-আনাড় সময় তোপের আওয়াজ শোনা গেল।

—“ঐ শোন! সদরবাজার দিক্ থেকে আওয়াজ আসছে—বুর্জ-পড়ে খুব লেগে গেছে!”—ভত্রলোক বুকের সমস্ত অক্ষিসন্ধি জ্ঞানিত।

ঠেনের গো ক্যাকাসে মারিয়া গেল; প্রাতিবোধ হইতেছে ছুত্রা করিয়া সে জুইতে গেল, কিন্তু ঘুম আসিল না। কানানের বড়-বড়ানি চলিতে থাকিল। তাহার মনে খালি সেই পোলকাভদের ছবি আসে; তারা প্রিশিয়ান্সিগকে রায়ে আচম্কা বহিতে গিয়া নিজে কাঁধে পড়িয়া বাইতেছে। সেই বৃদ্ধা জমানারের হাসি যেন পড়িল, অল্প অনেকের সঙ্গে সে এককণ বরফের উপর পড়িয়া।

এই সব রক্তের দূলা তাহার বাগিশের নীচে লুকান—আর কারো নয়, বৃদ্ধ বোকা টেন্সহাশদের ছেলের বাগিশের—

—চোখের জগে তার চিত্তার প্রোত কড় হইয়া গেল।

পানের ঘরে শুনিল, বাবা আনালা খুলিয়া খুব বাড়াইতেছেন। নীচের চকে তেঁপু বাজিতেছে, কোর সব বাহিরে বাইবে বলিয়া তৈয়ারী হইতেছে। তবে ত সত্য-সত্যই রীতিমত লড়াই বাধিয়াছে। ব্যাকুল বালক সশব্দে কোঁপাইয়া উঠিল।

—“তোমার কি হয়েছে রে?”—বাবা টেন্স ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ছেলে আর থাকিতে পারিল না, এক লাফে খাট হইতে নামিয়া-পড়িয়া বাপের পা ভড়াইয়া ধরিল। সেই ঢাকার ম-মুখাগুলি ঘরময় গড়াগড়ি বাইতে লাগিল।

—“এ সব কি? তুই কি চুই করে তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া-নিয়া মুক্তাগুলি ছিন্ মা কি?”—বুড়া কাঁপিতে কাঁপিতে কুড়াইয়া লইল।

সতরে বিজ্ঞাসা করিল।
তখন বম পর্যন্ত না লইয়া ঠেলের পো একটানে প্রাণহানির দীমানার বাওরার ও সেখানকার কাণ্ডকারখানার বৃত্তান্ত বলিয়া গেল।

বলিতে বলিতে যেন তার বুকের ঢাপ একটু কমিয়া গেল, নিজের দোষবীকার করা হইলে একটু খোলসা বোধ করিল। বাবা ঠেন্দ শোকবিহীন মুখে সব শুনিয়া গেল, শেষ হইলে হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিল।

—“বাবা, বাবা!” ছেলে কি বলিতে গেল, কিন্তু বুড়া কোন উত্তর না করিয়া

করিল।

ঠেনের পো ইজিতে জানাইল যে, আর নাই। বৃদ্ধ নেওরাল হইতে বন্ধু ও চোটোর বাক্স নামাইয়া লইল এবং মুক্তাকরটা পকেটে পুরিয়া বলিল “আজ্ঞা বেশ, আমি তাদের এগুলো ফিরিয়ে দিই দে বাই।”

আর একটি কথাও না বলিয়া, একবার ফিরিয়াও না তাকাইয়া সে নামিয়া বাহির হইল, এবং পণ্টনের দলের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া গেল।

তাহাকে আর দেখা যায় নাই।

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদিম ধর্মভাব ও যোগের অঙ্কুর।

১

আদিম বা অহরিত মহাদানমাজে প্রেতপুঞ্জা খুব প্রচলিত। বলপতির আশ্রয় পুঞ্জা, দ্বৈ শকর আশ্রয় তুণ্ডিবিধান, পুঞ্জার ইতিহাসে প্রথম কথা। প্রেতান্দার বৃক্ষ এবং জীবশরীরে সাক্ষরপরিবরণে সকল অসত্য-জাতির মধ্যেই নৃদ্বিবিধান দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষের যখন নিভৃত গুহা বা কুটারে নিশ্চিন্ত থাকিয়া রাখে পক্ষ দেখিত সে, সে পক্ষিচিত অরণ্যে ও পাচাতে মুগ্ধা করিয়া

বেড়াইতেছে এবং হিংস্রজন্তু তাহাকে ভাড়া করিলে আগিরা-উঠিয়া দেখিত যে, সে আপনার শব্দার নিভৃত গুহা আছে, তখন তাহার মনে ভিন্নরূপ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ছায়া, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি হইতে যখন আপনার মধ্যে আর একটা আদিম জ্ঞান তাল করিয়া আগিরা উঠিয়াছিল, তখন সেই লুক্কায়িত আদিমটাই যে রাখে ঘুরিয়া-দুড়িয়া বেড়ায়, তাহাতে তাহার সম্মুখে থাকিত না। এট বিধান ভাবিবার পর যখন

কোন গোত্রের মুচ্ছা, আবার অনেক বস্ত্রের পর বুদ্ধিতের চেতনাশ্রান্তি হইতে দেখিত, তখন অতি সহজেই তাহাদের প্রভাবিত হইত যে, লুকান মাহুঘটা কোথাও ছল করিয়া নগ্নোইয়া দিয়াছিল এবং অনেক সাধাসাধনার কিরিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুকেও যখন প্রথম মুচ্ছা বলিয়া ভাবিয়াছিল, তখন নানা চেষ্টায় তাহাকে আশ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,--আহার্য্যাসামগ্রী পর্য্যন্ত উপহার দিয়াছিল। প্রাচ্যের পিওন্সলের ইহাতেই উৎপত্তি।*

যখন কেহ কোন শত্রু তাড়াইবার জন্য মৃত দলপতির আশ্রয় উল্লেখন করিত এবং পাহাড়ে-বনে প্রত্যাহার পরিহাল-উত্তর মনে করিয়া প্রতিধ্বনি গুলিয়া চমকিয়া উঠিত, তখন পুন্নাটা সহজ ছিল। তাহার পর যখন বনে মৃতজনের দর্শনলাভ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিল যে, কোন কোন শুভ-মুহূর্ত্তেই অচেতন অবস্থার প্রত্যাহার দর্শন পাওনা যায়, তখন ধীরে ধীরে কৃত্রিম স্বপ্ন ও মন্ত্রতন্ত্রের অনেক সৃষ্টি হইয়াছিল। Tylor এর Primitive Culture প্রকৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ তত্ত্ব অনেকেই শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু বহি এদেশের অনাধ্যাপ্ত হান পরিদর্শন করা যায়, তাহা হইলো ইতিহাসটা।

সহজেই ধর্মার্থ বলিয়া ধারণা হইতে পারিবে। আমাদের সমাজের নিরন্তরের লোকেরা

৭. অসত্যবাস্তির সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে যে, তাহাদের সমাজেও এগুলি পূর্ণ-

মাত্রার লক্ষ্য করা বাইতে পারে। একালের ভূতবাদী এবং ধর্মসম্বন্ধে রাষ্ট্র বশতঃ যে ব্যাড়াবাড়ি করেন, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাসের মূলও যে ঐ একই কথা, তাহা লম্বা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

প্রথমে যখন কেহ কৃত্রিম স্বপ্নের জোরে স্বীয় শরীরে মৃত আত্মার আবির্ভাব করাইয়া লইয়াছিল, তখন যে একটা চালাকি করিয়াছিল, তাহা নহ। প্রান্তবিশ্বাসের ফলে অসত্য সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। সহজে যে ব্যক্তি কৃত্রিম স্বপ্নের দ্বারা পরাক্রান্ত হইতে পারিত, সে বেশ প্রতিপত্তিও লাভ করিত। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমানবিগণ তখন চালাকি করিয়া সম্মান লাভ করিতেও কুণ্ঠিত হইত নাই। মৃত দলপতির আশ্রীকাবে বললাভ করা বাইতে পারে, ইহা সাধারণত সকলেই বিশ্বাস করিত; বিশ্বাস করিত বলিয়াই তাহাকে ডাকিত। উহা হইতেই অমাহুঘিক ও অমাত্যবিক শক্তিলাভের বিশ্বাসও জন্মিয়া যায়। উপবাস করিয়া, একাসনে বসিয়া-বসিয়া হাতে-পায়ে ঝিঁঝি ধরাইয়া, একমুঠে একদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া মাথা ঘুরাটগা এবং আরো নানা প্রকার উপায়ে কৃত্রিম স্বপ্নের সৃষ্টি করিতে হইত। একটু সকলে সহ করিতে পারিত না; কাজেই সাধকের দল গোড়াগুড়িই জন্ম ছিল। অল্পসংখ্যক লোক বহি একবার একটা কিছু হাতে লয় এবং তাহা হইতে যদি সম্মানাদি লাভ করিতে পারে, তবে

* মানবতত্ত্ববিজ্ঞানের (Anthropology) অতি পরিচিত দুই সূত্রগুলির উল্লেখ করিতে হইল; বিজ্ঞাপটকের ক্রম: কবিবন মোগের চতুর্থাংশ চিহ্নহাদের মত কপাটের প্রয়োজন আছে বলিয়াই একবার তাহাদের আশ্রিত করিয়া লইতেছি।

তাহা সময়ে নিজস্ব করিয়া তোলে। শুধু
শাস্ত্রীয়িক পরিপ্রভে হুঃ না, আরো কিছু
চাই প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়া একটা
স্বকর দল অনুগ্রহণ করে। ভিনিষটার
শিকারীকার তার তখন ঐ দলের এক-
চেটিয়া হয়; এবং অহুতের বিষয়টি যে ভারি
উপকারী, তাহা প্রচারিত হইতে থাকে।
সাধারণ লোকের কাছে শক্তিশাস্ত্রের কথা
পর্যাপ্ত ভিনিষ না হইলেও, উহার সর্বাস্ব-
করণে উহাতে বিশ্বাসস্থাপন করে। প্রকারা-
ন্তরে সকল অসত্য সমাজের মধ্যেই এই
শ্রেণীর দেবদর্শনবাদে বিশ্বাস আছে।

এ পর্য্যন্ত বাহা বলিলাম, তাহা মানব-
তত্ত্বশাস্ত্রের কয়েকটি স্থল মীমাংসা। এই-
প্রকার দেবদর্শনবাদট যে এদেশের চির-
পুজিত মহামাত্র যোগের মূলে, তাহা সহজে
অস্বীকার হইতেও পারে। তথাপি প্রাচীন
সমাজের অবস্থার ইতিহাস হইতে তাহা
দেখাইতে চেষ্টা করিব।

২

যেখানে প্রাচীন আর্থীদের সামাজিক অবস্থা
এবং ধর্মভাবের যে মনোভূমি চিত্র দেখিতে
পাওয়া যায়; তাহা সর্বত্রই আনন্দের স্রষ্টা
উজ্জল বর্ণে চিত্রিত। দেবতার চিত্রে ভূত-
প্রেরণবিভীষিকার ধূসর নাই; মানবের
আশা আকাঙ্ক্ষার অন্তর্য্যবাসীদের বিবাদ-
কালিমার ভাগ নাই। জীবন আনন্দময়,
দেবতারও মঙ্গলময়। এখন এক্ষণের
কতকাল পূর্বে যে প্রোতায়পুত্রের যুগ
অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা
করা যায় না। প্রোতায়ার পূজা যে এক
সময়ে ছিল, তাহা পিতৃদিগের পূজা হইতেই

হুত হইয়া; এবং ঐ পূজা যে ধর্মের জন্ম-
বিকাশে দেবতাপূজার পূর্ববর্তী ছিল,
তাহাও সেথলোকের উচ্চ পিতৃলোকের অব-
স্থান হইতে বৃদ্ধিতে পারা যায়। একমাত্র
বেদান্ত হইতে যদি আর্থধর্মের পরবর্তী
বিকাশ বৃদ্ধি লইতে হয়, তাহা হইলে কি-
রূপে যে ভূতপ্রেতীর (গণ ও মাতৃকার) পূজা
এবং অন্তর্য্যবাস উপস্থিত হইয়া, তাহার-
মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠে। অতি প্রাচীন
বেদে অন্তর্য্যবাসের নামগন্ধ নাই, অথচ
মহলা যখন প্রাচীন উপনিষদে উহা সত্য
বলিয়া গৃহীত দেখিতে পাই, তখন কোন
শাস্ত্রেই উহা লইয়া বাদবিবাদ পর্য্যন্ত নাই।
নূতন করিয়া যদি কোন পণ্ডিতের মাথার
অন্তর্য্যবাসের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে উহা
প্রমাণ করিবার জন্য তর্কবিতর্ক উঠিত। যে
কোন দর্শনশাস্ত্র দেখ, ধর্মশাস্ত্র দেখ, সর্বত্রই
উহা স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বেদ-
ান্তরে প্রোতায়ার অন্ত জীবনীরে সংক্রমণের
আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, অথচ বৌদ্ধা-
নন্দের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে আছে যে, পিতৃগণ
পক্ষিপ্রেতে গৃহের নিকটে উড়িয়া আসেন
বলিয়া উহাদের জন্য বলি বিতরণ করা
কর্তব্য। মহুর ধর্মশাস্ত্রে গণ বা ভূতপ্রেতের
পূজকেরা হের বলিয়া গণ্য হইয়াছেন বটে,
কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই উহার প্রাচীন
দেববর্ণ অপেক্ষা অধিক পূজ্য হইয়া উঠিয়া-
ছিল।

সমাজের মধ্যে বাহার সতেজ জীবন্তবীজ
না থাকে, তাহা নিষ্কিবাদে অস্বীকৃত হইয়া
শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে পারে না।
অন্তদিকে আবার প্রাচীন বৈদিকসমাজে

ঐ বীজের প্রতিটি পর্যায় প্রমাণিত হয় না ।
 এই সমস্তটি যৌনগো কবিবার লজ পত্তি-
 তেজা নানা কথা বলিয়াছেন । আমার
 ক্ষুদ্র বিবেচনাও উহার মধ্যে যে মতটি
 অধিকতর সম্ভাবনীয় মনে হইয়াছে, তাহার
 উল্লেখ করিতেছি । 'বৈদিকযুগ হইতেই
 বহুশ্রেণীর অনার্যোরা আৰ্য্যসমাজভুক্ত
 হইয়াছিল ।' অনার্যোরা যেমন আৰ্য্যধর্ম
 দ্বারা আপনাদের সংস্কারসাধন করিয়াছিল,
 আৰ্যোরাও সেইরূপ নিত্য অলক্ষ্যে অনার্য-
 দের অনেক* জিনিষ আদ্যময়ীরূপে করিয়া
 লইয়াছিলেন । অতি পূর্বকাল হইতে যে
 আৰ্য্য-অনার্য্য-মিশ্রণ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে
 কিছু বলিতেছি ।

৩

অতি প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে ত্রিবিধবর্ষের
 যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে
 বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়েরও কয়েক শতাব্দী পূর্বের
 অনেক ভৌগোলিক এবং সামাজিক বিবরণ
 সংগৃহীত হইয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ ব্রিস্ ডেবিড্‌স্
 প্রণীত Buddhist India গ্রন্থে ঐ সকল
 বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । দেখিতে
 পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন সময় হইতেই
 অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি পূর্বপ্রদেশে এবং
 অবন্তী প্রভৃতি প্রাচীন আৰ্য্যাবর্তের দক্ষিণ-
 পশ্চিমপ্রদেশে আৰ্যোরা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য
 স্থাপন করিয়াছিলেন । অঙ্গ, মগধ, অবন্তী
 প্রভৃতি নাম উক্তপ্রদেশবাসী জাতিসমূহের
 নাম ছিল ; এবং জাতির নাম হইতেই
 দেশের নামকরণ হইয়াছিল । ঐ প্রাচীন
 সময়ের রাজবংশের নামের তালিকার শাখা
 বংশব্যতিক্রম বৃদ্ধি, বৃদ্ধিজাতিভুক্ত শিঙ্খবি,

ভগগ, কালান প্রভৃতি অনার্য্য নাম পাওয়া
 যায় । সুপ্রাচীন বৈদিকসাহিত্যে উহাদের
 কাহারও নাম পাওয়া যায় না, এবং পরবর্তী
 ধর্মগ্রন্থে অঙ্গ, মগধ, অবন্তী প্রভৃতি দেশ
 অতি অপরিস্রব বলিয়া বর্ণিত আছে । যৌবা-
 রনের অল্পশাসনে ঐ সকল দেশে গমন
 করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ; অথচ দূর-
 কর্তার পূর্ব হইতেই ঐ দেশসমূহে আৰ্য্য
 ভাষা, আৰ্য্য ধর্ম এবং আৰ্য্য জীতনীতি
 প্রতিষ্ঠিত ।

কথা এই যে, প্রাচীন আৰ্যোরা যে
 কেবল একটি পত্রিপুট দল লইয়া গঙ্গা এবং
 যমুনার প্রবাহপথে দ্বারে দ্বারে অগ্রসর
 হইয়াছিলেন, তাহা নহে । কাহারও ঐ পথে
 আসিয়া ব্রাহ্মবর্ষে ক্ষমতাপালী হইয়াছিলেন,
 নিশ্চয়ই তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ব অধিক ছিল,
 এবং তাঁহাদের সমাজে বহুকাল পর্যন্ত
 অনার্যোরা স্থানলাভ করিতে পারে নাই ।
 অক্ষ হইতে সামান্য ইহাদেরই হস্তে
 বিকশিত এবং বৃহৎ ব্রাহ্মণনামক
 সাহিত্য ইহাদেরই সৃষ্টি । আৰ্য্যদের আর
 একটি দল কচ্ছ-উপসাগরের দিক দিয়া
 অবন্তীপ্রদেশে, এবং অন্য একটি দল
 হিমাচলের পাদপ্রদেশ দিয়া শাক্যরাজ্যের
 মধ্যে এবং তৎপরে হইতে মগধ ও অঙ্গ পর্যন্ত
 বিস্তারলাভ করিয়াছিল । রয়াল এশিয়াটিক্
 সোসাইটির ১৯০১ সালের পত্রিকা এবং
 গত আশ্বরাষীমাসের এশিয়াটিক্ কোয়ার্টারলি
 রিভিউ কাগজে ডাক্তার গ্রিয়ার্সন্‌ দ্বারা
 লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এ বিষয়ের অনেক
 তথ্য অবগত হইতে পারা যাইবে ।*

প্রবৃত্তবিশিষ্ট পণ্ডিতদের অনুমান যে,

ত্রিবি, শাক্য প্রভৃতি স্রাতি মঙ্গোলীয় এবং মল্ল, কোণীয় প্রভৃতি স্রাতি ড্রাবিড়ী। রাজপ্রভাব মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি স্থানেই বেশি বিকশিত হইয়াছিল। রাজ-বর্গই ক্ষত্রিয়নাম পাইয়াছিলেন; এবং ক্ষত্রিয়কূলে মগধরাজগণই চিরকাল শ্রেষ্ঠ। বর্ণবিভাগে ক্ষত্রিয়ের পীতবর্ণ কথাটার, উল্লিখিত মঙ্গোলীয় উৎপত্তির মত সমর্থিত হইতে পারে। মঙ্গোলীয় হউন বা ভারতের আদিম অধিবাসী হউন, উহারা যখন অতি প্রাচীন সময় হইতেই আৰ্য্যধর্ম এবং আৰ্য্য-তাবা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন আৰ্য্য-প্রভাব এবং আৰ্য্যমিশ্রণ স্বীকার করিয়া উঠিতে পারা যায় না। দেশগুলি আৰ্য্য-সভ্যতার সংস্কৃত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ; তথাপি যখন বর্ষসংস্কারের উদ্যোগকে অপবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং সহসা আবার অল্প সময়ের মধ্যেই যখন নিরলস আৰ্য্যের উদ্যোগের সহিত মিশিয়া গেলেন, তখন আৰ্য্য এবং অনার্য্য মিশ্রণের মতযাত্রাই অবস্থাটির একটা সুবোধ্য ব্যাখ্যা হইতে পারে। আৰ্য্যগণ না থাকিলে ব্রাহ্মণ্যগৌরবে গৌরবান্বিতেরা ঐ জাতির সহিত মিশিতেন না। পরওয়ারনের পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিবার প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, হয় ত বহুদিন পর্যন্ত উদ্যোগের সহিত বুদ্ধিবিগ্রহাদিও চলিয়াছিল।

মহামান্য বেদজ্ঞের মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব-অঙ্গলের দেশের নাম নাই। যে অধর্কবেদ আৰ্য্যের নিকট বহুকাল পর্যন্ত অপবিত্র ছিল, এখনও বাহ্য ব্রাহ্মণদের নিকট সম্পূর্ণ সম্মানিত নহে, উহার স্মৃতি যে বৈদিক-

যুগে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। ঐ অধর্কবেদে কিন্তু মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের কথা আছে। এইজন্য ঐ সভ্যতার অপকর্মে পূর্বপ্রদেশের কথকি আচার-ব্রত সম্বন্ধ আৰ্য্যমতগ্রন্থ বলিষ্ঠ বলমান হয়। এই মীমাংসা গ্রহণ করিলে উল্লিখিত সকল অবস্থার সহিত বেশ মিল হয়।

৪

ঠিক যে সময়ের বৈদিকসাহিত্যে ভূক্ত-প্রত্যেকপুঙ্খের নামগন্ধ পাওয়া যায় না, সেই সময়ের অধর্কবেদে উদ্যোগের বিস্তৃত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যাহুয়গ্রন্থ এবং ভূক্ত-প্রত্যেকের কথাই অধর্কবেদে বিস্তারিত। পণ্ডিতেরা এই বেদ পাঠ করিয়া স্বীকার করেন যে, যে আনন্দমূল্য এবং উন্নত ধর্ম সাময়িক ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অধর্কবেদের শিক্ষা তাহা হইতে বহুদূরে। বিভিন্নসংস্কারের জাতির হাতে সৃষ্ট না হইলে কদাচ একপ হইতে পারিত না। প্রস্তুত মেজাজে অধর্কবেদের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—
Taken as a whole, it is a heterogeneous collection of spells. Its salient teaching is sorcery, for it is mainly directed against hostile agencies, such as diseases, noxious animals, demons, wizards, foes, oppressors of Brahmans ইত্যাদি।

প্রাচীন ও আদিম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি মগধাদি পূর্বপ্রদেশের সাহিত্য। ঐ সাহিত্যে ভূক্ত-প্রত্যেকের কথা এবং অস্বাভাবের কথা অতি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজের নিরন্তর হইতে যে সকল ভাব ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে উক্ত সমাজগণের সংক্রান্তি হইয়া, তাহা সাধারণের বিশ্বাসের সাধারণী বলিয়া কোন পণ্ডিতকে একটা মতস্থাপনের অল্প দার্শনিক তর্কজাল বিস্তার করিতে হয় না। সম্ভবতঃ এইমতই জন্মান্তরবাদ সর্বত্র স্বীকৃত দেখিতে পাই।

প্রাচীন উপনিষৎগুলি যে মগধ, বিদেহ * প্রভৃতি দেশে ক্ষত্রিয়দের প্রভাবে আবির্ভূত, তাহা এখন আর সর্বত্রই স্বীকৃত বলিয়া কোন প্রশ্ন বিস্তে অগ্রসর হইল্য না। ঐ উপনিষদে বাগবজ্রের বিরুদ্ধে এবং ব্রাহ্মণের বৃথা জ্ঞানাত্মানের দৃষ্টান্ত দিয়া অনেক কথা লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ আদিয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট শিষ্য স্বীকার করিলেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা মূলতঃ আৰ্য্য না হইলেও, ইহারা যে সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। আৰ্য্য সংশ্লিষ্ট যে পূর্বাঞ্চলের ঐ সকল জাতির প্রতিভা অধিক বিকশিত হইয়াছিল, তাহা উপনিষদের ব্রহ্মত্ব এবং বুদ্ধদেবের অসামান্য কীর্তি হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষৎগুলি পূর্বাঞ্চলে উৎপন্ন, এবং সর্বপ্রথম ঐ সাহিত্যেই জন্মান্তরবাদ পাওয়া যায়। ব্রহ্মত্ববাদি উহাতে সবচেয়ে আলোচিত; কিন্তু জন্মান্তরবাদ কেবল সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত।

শ্রোতপুত্রার যুগ ধর্মভাববিকাশের প্রথম স্তরে। যেন হইতে উপনিষদাদি পর্য্যন্ত আলোচিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

আৰ্য্যসমাজ নিক্রা উন্নতিশীল, ধীরে ধীরে উন্নততর তবে। তাঁহাদের সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতেছিল। কাজেই শ্রোতপুত্রার যুগ একবার অতিবাহিত করিবার পর, উন্নতিশীল আৰ্য্যসমাজে আবার উহা বিকশিত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আজ পর্য্যন্তও যখন সকল অনাৰ্য্যজাতির মধ্যেই মানবান্ধার বৃদ্ধ এবং জীবনশ্রীরে প্রতিটি হইবার বিশ্বাস প্রচলিত দেখিতে পাই, তখন সমাজের নিরন্তর হইতেই ঐ বিশ্বাস সংক্রান্তি হইয়াছিল বলিয়া দৃঢ় অহুমান হয়। পূর্বাঞ্চলেই যখন উহার মূলটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে, তখন এই মীমাংসাটি স্থায়ীত্বের বিচারার্থীনা করা যাইতে পারে। এই বিশ্বাসটির আলোচনা করিতে গিয়া সুপণ্ডিত গার্ব লিখিয়াছেন—It is natural enough to suspect foreign influence in this sudden revolution of thought.

অনার্য্যের বিশ্বাসের সহিত জন্মান্তরবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও আৰ্য্যদের এই জন্মান্তরবাদ ও “সংসারচক্র”বাদে একটু বিশেষত্ব আছে। ঠিক সংসারচক্রবাদ বা metempsychosis অনার্য্যের বিশ্বাসের সামগ্রী নহে। দোষগুণের হিসাবে কোন শ্রোতাত্মা বা এ জীবনশ্রীরে এবং কোনটা বা অন্ত জীবনশ্রীরে প্রতিটি হয়; অনার্য্যের এই বিশ্বাসটি যে কর্তৃকলে আত্মার জীবজীবান্তরশ্রীরে পরিভ্রমণ করিবার বিশ্বাসের মূলে, তাহা যেন সুস্পষ্ট। কিন্তু শ্রীর হইতে শ্রীরান্তরে যুক্তিহীন-কিরিয়া

* বিদেহে বৈদ্যদের বংশপুত্র হইতেই বক্ষি বা বুদ্ধিজাতির বিশ্বাসভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বেড়ানটা একটা নূতন কথা । কেহই নির-
বচ্ছিন্ন ধোঁবে দোবী নহে ; হুঃখীও সুখী
হইবে, মন্দও ভাল হইবে, এই ভাব হইতেই
পরিষ্করণবাদের উৎপত্তি । যাঁহারা মঙ্গলময়
দেবতার বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের হাতে
অনার্যের বিশ্বাসটার ঐ প্রকার সংস্কার
বা পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক ।

জানকীওর গ্রন্থে যাহা সত্য বলিয়া
গৃহীত এবং দেশবাসী প্রচলিত বিশ্বাস দ্বারা
অনুকূলে, সে ভিন্‌নিবটা বৈদিক নহে বলিয়া
কর্ণকাণ্ডে বা ক্রিষ্ণাকাণ্ডে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত
হইতে দেখা যায় । বৈদিক ক্রিষ্ণাকলাপ
যজুর্বেদে বিধিবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণযজুর্বেদে বিশেষ
প্রসার লাভ করিয়াছিল । উহারই নাম
বেদের কর্ণকাণ্ড । পৌরাণিক ক্রিষ্ণাকলাপ-
গুলি সম্পূর্ণরূপে ঐ কর্ণকাণ্ড হইতে উৎপন্ন ।
সূতর পর মানবায়্য পিতৃলোকে গমন
করেন ; পুত্রহীন বলিয়া তাঁহারা পিতৃলোকে
গমন করিতে পারেন না, তাঁহারাও অনুভ-
লোকে মহাকাণ্ডে সমরক্ষেপ করেন ; পাপিগণ
দললোকে বাইরা বহুকষ্টে প্রাপ্ত হয় ; ইত্যাদি
কথার সহিত জন্মান্তরবাদের বিরোধ হয় ।
এইজন্যই পৌরাণিক (মূলত বৈদিক) ব্রাহ্মের
মন্ত্র ও অনুষ্ঠান কোনপ্রকারে জন্মান্তরবাদের
সহিত মিলাইতে পারা যায় না । যদি বহু-
ব্যয় আত্মা জীবনশরীর হইতে জীবনশরীরে
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অলক্ষ্য কৰ্ম্মফলে ব্রহ্মে গীন
হইবে বা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়া-
কেলিয়া মুক্ত হইবে, তাহা হইলে পিতৃলোক
এবং পিতৃতর্পণ অর্থশূন্য হয় । সূতর পর
যদি কোন আত্মা অত্র জীবদেহে চলিয়া
গিয়াছে, এবং সেখানে মায়াময় দেহ ধারণ

করিয়া আহারপানাদি করিতেছে, তাহা
হইলে পিতৃলোকে তৃপ্ত করিবার জন্য
ক্রিষ্ণাকলাপের প্রয়োজন থাকি না । পিতৃ-
গণ পিতৃ এবং উৎকের আশায় বলিয়া
আছেন বলিয়াই উহা প্রযুক্ত হয় । তাহা
দিলোশ বলিতেছেন যে, “ভিনি মরিয়া গেলে
পূর্ষপুরুষেরা আর পিতৃ পাইবেন না বলিয়া,
তাঁহারা হুঃখে ভাল করিয়া পিতৃ ধুইতেছেন
না এবং লীর্ঘনিবাস ফেলিয়া তর্পণের
জন্যই কৃষ্ণাকাণ্ডে পান করিতেছেন ।
জন্মান্তরবাদ যে বৈদিক নহে, কর্ণকাণ্ড-
যাত্রী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও তাহার একটি প্রমাণ ।

অত্ৰদিকে আবার দেখুন, যে ভূতের
রূপায়, অথবা ভূত নামাইয়া, অথবা ভূতের
মত অদ্বৈত শক্তি লাভ করিয়া কোন অনুষ্ঠান
করিতে হইবে, তাহা বেদজ্ঞের এবং
বেদজ্ঞের সাহিত্যে কুত্রাপি নাই । বাহুময়
এবং মন্ত্রবল অধর্মবেদের বিশেষত্ব । মন্ত্র-
বলে ক্রমশঃ উন্নত করিয়া দেওয়া বাইতে
পারে, একটা অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে
পারা যায়, ইত্যাদি বিশ্বা অধর্মবেদ হইতে
উৎপন্ন । অধর্মবেদের উপাধ্যায়েরাই উহাতে
পারদর্শী ছিলেন ; এবং উঁহারা পপপূজক
এবং গ্রাম্যবাক্য পুরোহিত হইয়াছিলেন
বলিয়া, মানবধর্মশাস্ত্রে উঁহাদের ঐতি
বিষেব । Hopkins প্রকৃতি পণ্ডিতেরা
এতদূর পর্যন্তও বলিতে চাহেন যে, অধর্ম-
বেদের ‘উপাধ্যায়’কথার অর্থশূন্যই ওক।
অধর্মবেদ যে পুরীকালে পরিবর্তিত বলিয়া
অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহা
বলিয়াছি । আর্ধ্যদের ধর্মবিশ্বাসের সহিত
উহার ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয় না বলিয়া,

ঐ হত্যার বেদের অনেক কথা যে সমাজ-
স্তর হইতে সমাপ্ত, এইরূপ মীমাংসাই
উপযুক্ত বোধ হয় । এখনও যখন এ দেশের
সমগ্র অনাৰ্থাভাবের মধ্যে এবং নিরন্তরের
হিংস্রদের মধ্যে কয়েক তৃত চাপাইয়া অলৌকিক
জ্ঞানলাভের অশুভানে রহিয়াছে, তখন
ঐ শ্রেণীর বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ যে নির-

ন্তর হইতে উন্নতিশীল আর্গামেন্টে সংক্রমিত,
তাহাতে সন্দেহ করিব কেন ?

অস্বাভাববাদ, ভূত নামাইবার শক্তি এবং
যাক্ষমন্ত্রাদির বলের উপর যে বোপভাব প্রতি-
ষ্ঠিত, তাহা বোপপ্রক্রিয়ার বিশেষ বর্ণনা হইতে
লক্ষিত হইতে পারিবে । সমস্তান্তরে সে কথা
লইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইব ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

উৎসবের দিন ।

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া কেলিয়া
আলোক বেদনি কুটিয়া বাহির হয়, অমনি
বনে-উপবনে পাখীদের উৎসব শব্দুয়া যায় ।
সে উৎসব কিসের উৎসব ? কেন এই
সমস্ত বিশ্বের দল নাচিরা-কুঁদিয়া গান
গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে ? তাহার
কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের
স্পর্শে পাখীরা নৃতন করিয়া আপনার প্রাণ-
শক্তি অশ্রুতব করে । দেবিধার শক্তি,
উড়িবার শক্তি, বাতাসকান করিবার শক্তি
তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবা-
বিত্ত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত
এই বিভিন্ন বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণ-
বান্, পতিবান্, চৈতন্যবান্ পক্ষিজন্য সম্পূর্ণ-
ভাবে উপলব্ধি করিয়া জন্তরের আনন্দকে
সকীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয় ।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর
প্রকাশ, সেইখানেই যেন মুহূর্তমান উৎসব ।
সেইজন্য হেমস্পের সূর্য্যাকরণে অগ্রহাষণের

পক্ষপত্তমসূত্রে মেনার উৎসব হিম্মোলিত
হইতে থাকে—সেইজন্য আনন্দজরীর নিবিড়
গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুন্তবনে
উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে । প্রকৃ-
তির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাভাবে
নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই ।

মাহুকের উৎসব কবে ? মাহুকের বেদিন
আপনার মহুঘাঘের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ
করে,—বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন ।
বেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক
প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—
বেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক
অধঃস্থের দ্বারা কুহু করি, সেদিন না—বেদিন
প্রাকৃতিক নিরমণরম্পদ্যর হতে আপনা-
দিগকে ক্রীড়াপূর্ব্বলীর মত ক্ষুদ্র ও অড়ভাবে
অশ্রুতব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন
নহে ;—সেদিন ত আমরা জড়ের মত,
উদ্ভিদের মত, সাধারণ জন্তর মত—সেদিন ত
আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজন্য

মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিদের ? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কণ্ঠে ক্রিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আল্লান করি না—সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের বর্ষরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সন্ধ্যা শোনা যায় না ।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, গীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যের শক্তি অহুত্ব করিয়া মন্থে ।

হে ব্রাহ্মণ্য, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—আজ, আলোক জলিয়াছে, সন্ধ্যা ধ্বনিতোছে, ঘর খুলিয়াছে—আজ মনুষ্যের গৌরব আমাদের পূর্ণ করিয়াছে—আজ আমরা কেহ একাকী নহি আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক—আজ অতীত সংস্রবৎসরের অন্তিমাব্দী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—আজ অনাগত সংস্রবৎসর আমাদের কণ্ঠব্যবকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে ।

আজ আমাদের কিদের উৎসব ? শক্তির উৎসব । মানুষের মধ্যে কি আশ্চর্যশক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে ! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ উর্কে গিয়া ঠাড়াইয়াছে ! জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ চূর্ণকায় চূর্ণমতায় মধ্যে থাকমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আশ্ববিন্দনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ

হইয়াছে, কর্মী কর্মের কোন্ অপ্রাপ্ত চুম্বাণ্ড সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে শ্রবেণ করিয়াছে ? জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা দেই শক্তির গৌরব মরণ করিয়া উৎসব করিব । আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব ।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে চূর্ণ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন । পশুর জন্য মাঠ তরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অরের জন্য প্রাণণ করিয়া মর্জিতে ছর ! প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুকি, মানুষের উত্তম, মানুষের উন্মেষ রহিয়াছে—আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব । পশুর গাভীরের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া অন্নগ্রহণ করে । শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অন্ন আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে—গাভীর মনুষ্যের গৌরব । আয়রবার ষ্টপার সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ট হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অন্ন নির্মাণ করিতে হইয়াছে—কোমল বৃক্ষ এবং চূর্ণল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয় করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব । মানুষকে হুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণ শক্তি অহুত্ব করিবার অধিকারী করিয়াছেন ।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজনসাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট

হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার প্রেত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন মহানুভব হইতে একি জোরার আনিয়াছে—সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া, সমস্ত প্রয়োজনকে রূপন করিয়া অহিনিশি অক্লান্ত উদ্ভবের সহিত এ কোন্ অসীমের স্বাক্ষর, কোন্ অনির্বচনীয় আনন্দের অস্তিত্বে বাবধান হইয়াছে। বাহ্যকে জানিবার জন্তে সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কি প্রয়োজন! বাহ্যিক নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়? বাহ্যিক কর্তৃক রিবার জন্য এ আপনার আশ্রয়, স্বার্থ, এমন কি, প্রাপ্যকে পর্যাপ্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সপ্নে ইহার বেনাপাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই? আশ্চর্য! ইহাই আশ্চর্য! আনন্দ! টহাই আনন্দ! যেমনিটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম, সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উবাণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো ভুলশ দেখি না। মহাব্যক্তির এই প্রয়োজনাতীত প্রথম গৌরব-অন্তকার উৎসবে আনন্দ-সঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে অরী, ভয়শোকের উপরে অরী, মৃত্যুর উপরে অরী। আজ অতীত-তবিষাতের অমহান মানবলোকের দিকে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অজ্ঞেয় চিরস্থায়ী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সাক্ষ্য করিব।

একদা কত-সহস্র-বৎসর পূর্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—বৈদ্যাহমেতঃ পুরুষঃ মহাত্মন্ আদিত্যাবর্ণং তমসঃ পরতাং—আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ধর, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী। এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোণার আমাদের বাস্তব, কোণার আমাদের স্বাধিক, কোণার আমাদের আশ্রয়, কোণার আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই সমস্ত জানাটিকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিরস্থায়ী অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্গোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে! মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভাবেরও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ধর মহান পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য জ্ঞানের গৌরব গইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সীমার্তা, কোনো নিতানৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র যুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনতার মধ্যে প্রথম সাহসের সহিত আপন লক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়—যে ভেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, প্রথম চরমশক্তিরূপেই অহুভব করিবার জন্য অগ্রসর—মানুষের মধ্যে অত্র আমরা সেই জ্ঞান, সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহস্র-বৎসর পূর্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে—আনন্দং ব্রহ্মণো বিধান্ ন বিতেতি কৃত্তচন।—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়

পান না। এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্লভকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-
বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ
বেধানে অন্তর থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমা-
দের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায়
বেধানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আরত্যাধীন
নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের
উর্দ্ধে মত্তক তুলিয়া একি কথা বলিয়াছে যে,
আনন্দ্য ব্রহ্মণো বিধান্ ন বিচেতি কৃতচন !
আজ আমরা দুর্লভ মানুষের মুখের এই প্রবল
অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি।
সংসারীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে
নাড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে
পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, তব নাই—অন্ত
আপনাকে সেই মানুষের অগ্রগত জানিয়া
গৌরব লাভ করিব।

বহুসংস্রবৎসর পূর্বের উচ্চারিত এই
বাণী আজও ধ্বনিত হইতেছে—

ভসন্তঃ প্রেয়ঃ পুরাণ্ড প্রেয়া বিতান্ড প্রেয়াভ্যুত্থান্ড
সংস্রবৎ অস্তরতর বদনোচ্চা।—

অস্তরতর এই যে আত্মা, ইনি এই পুত্র হইতে
প্রিয়, বিত হইতে প্রিয়, অস্ত সমস্ত হইতেই
প্রিয়। সংসারের সমস্ত বেহাগ্রেমের সাম-
গ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়
নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে
তাহার অস্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত
আত্মীয়পরের অস্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-
নিকটের অস্তরতর, তাহার প্রতি যে প্রেম
এমন প্রবল আবেগে, এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট
হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম
প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে এক-
মুহূর্তে বিসর্জন দিতে উক্ত হই, মানুষের

সেই পরমাত্মা প্রেমশক্তিও গৌরব অস্ত
আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমা-
প্ত হইয়াছি।

সন্তানের অস্ত আমরা মানুষকে হৃৎসাধ্য-
কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক লক্ষ-
কেও সেরূপ দেখিয়াছি—বংশীয়-বংশের
অস্তও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ
করিতে দেখিয়াছি—পিপীলিকাচেষ্টাও, মধু-
ক্ষিকাক্ষেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানু-
ষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনায়
সন্তানকে এবং আপনায় দশকুণ্ডেও অতিক্রম
করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যব্রতের
পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করি-
য়াছি। বৃদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য
নহে, দেশাহরণও নহে—বৎস যেমন গাভী-
মাতার পূর্ণগত হইতে হৃৎ আকর্ষণ করিয়া
লয়, সেইরূপ স্ত্রী অথবা মহৎ কোনোশ্রেণীর
স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া
লইতেছে না। তাহা অলভ্যাক্রান্ত নিবিড়
মেঘের ভ্রার আপনায় প্রবৃত্ত প্রাচুর্য্যে জ্ঞান-
নাকে নির্জিন্দেবে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ
করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিহ্ন, ইহাই
ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির
অপরিসীমপ্রাচুর্য্যবশতই আপনাকে নির্জি-
নেবে নিরন্তরই বিখরুণে দান করিতেছেন।
মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির
প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎ-
সর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে
ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অহুভব করি।
বৃদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

মাতা যথা নিত্যঃ পুত্রঃ

আত্মা একপুত্রমহুভবঃ।

এবলি সপস্তুঃ ৬২

মানসস্থাপন অপরিমাণঃ ।

মেষক সপস্তুলাকসিঃ

মানসস্থাপন অপরিমাণঃ ।

উচ্চঃ অথো ৫ তিরিযক

মলমাণঃ অবৈদ্যমসপ্তঃ ।

তিষ্ঠকঃ নিদিষ্টঃ বা

সরানো বা বাবতস্বন বিসতমিত্তো ।

এতঃ সতিঃ অদিষ্টঃ

অসমতঃ বিহারমিহমাঃ ।

মাতা যেমন গ্রাম দিগাও নিজেব পূজকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। উর্দ্ধনিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাপূত্র, হিংসাপূত্র, শত্রুতাপূত্র মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি ঠাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুটেতে, ঘামৎ নিশ্চিত না হইবে, এই মৈত্র্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যন্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা গইয়া অন্য আমরা পৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরআশ্রিত করণা, এই ব্রহ্মবিহার—এই সমস্ত-আবশ্রুতের অতীত অহেতুক অপরিমেয় সৈদ্ব্যনক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই নক্তিকে আর আমরা অবিবাস করিতে পারি না—এই নক্তি মহুঘাতকের ভাঙারে চিরদিনের মত সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে

ঐবরের অপগ্যাণ দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিতা উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তার-কার্য্যে, মঙ্গলসাধনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি স্মৃতির, তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই নক্তি কথিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার তত্ত্ব বাঞ্ছ। সেট বিধগুণ রাজ-শক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা বৃহৎসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপগ্যাণ প্রাচুর্য্য—ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাভ্যবসকে একমুহূর্ত্তে হীনশ্রুত করিয়া-দিয়া সমস্ত মহুঘাতকে সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাজার বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিনষ্ট, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গল-শক্তির মহান্ আবির্ভাব, ইহা আমাদের পৌর-বের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে নক্তি-সঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-পাখিজয়ী এই অদ্বুত মঙ্গলশক্তির মহিমা

দ্রবণ করিয়া আমরা পরিষ্কৃত-অপরিষ্কৃত সকলে মিলিয়া উৎসব করতে প্রস্তুত হই-
রাছি। মানুষের এই সকল মহত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের
সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করি-
রাছে। আজ আমরা মানুষের এই সকল
অব্যাহত সাধারণসম্পদের সমান অধি-
কারের স্বয়ে ভাই হইরাছি—আজ মানুষকে
মানুষাণার আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভা-
তের জ্যোতির্কন্ডের মধ্যে দেখিরাছি—
কান্ডনের পুষ্পপর্ণাশ্রির মধ্যে দেখিরাছি—
মহাদুগ্ধের নীলানুভূতের মধ্যে দেখিরাছি—
কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার
বিশাট্ট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন
আমাদের মহানবোৎসব। মানুষের মধ্যে
ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অস্ত্রভেদী শিখর-
মালায় আশ্রিত-বিস্তারিত, সেখানে সেই
উত্তম শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের
ঈশ্বরকে মানবসম্বন্ধের মধ্যে বসিয়া পূজা
করিতে আসিরাছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই
এই মহানু ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা
আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিরাছি।
আমাদের জীবনের যে সমস্ত ঘটনাকে
উৎসবের ঘটনা করিরাছি, তাহার প্রত্যেকটা-
তেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ
করিতে চেষ্টা করিরাছি। অন্মোৎসব হইতে
ব্রাহ্মচর্য্য পর্যন্ত কোননাটাকেই আমরা
ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া
রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা
সর্গাঙ্গতা বিদর্জন দিই—সেদিন আমাদের

গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়,
কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্ত নহে, কেবল
বহুভাষ্যের জন্ত নহে, ব্রাহ্মত-অনাহুতের
জন্ত। পূত্র যে অনুগ্রহণ করে, সে
আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের
ঘরে। সমস্ত মানুষের-গৌরবের অধিকারী
হইয়া সে অনুগ্রহণ করে। তাহার অশ্র-
মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে-আব্বান
করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে
ভূমিষ্ট হইত, তবে তাহার মত দীনদীন
জগতে আর কে থাকিত! স্তম্ভ মানুষ
যে তাহার জন্ত অন্ন, বস্ত্র, আবাস, ভাষা,
জ্ঞান, ধর্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিরাছে। মানুষের
অন্তরহিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির
কোড়ে অনুগ্রহণ করিয়া সে যে একমুহূর্তে
ধন্য হইয়াছে! তাহার জন্য উপলক্ষে
একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া-দিয়া যদি
সমস্ত মানুষকে দ্রবণ না করি, তবে কবে
করিব! অল্প সমাজ বাহ্যকে গৃহের ঘটনা
করিরাছে, ভারতসমাজ তাহাকে অগভীর
ঘটনা করিরাছে; এবং এই অগভীর ঘটনাই
জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ
করিবার বর্ধাৎ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও
ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দ-
মিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক
মঙ্গলবিনাহকে মানবসমাজের এক-একটি
তত্ত্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত
মানবের ব্যাপার করিয়া ভুলিরাছে—
এই উৎসবেও ভারতের গৃহের সমস্ত মানুষকে
অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে—তাহা
করিলেই বর্ধাৎভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন
করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ

করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনার আনুগত্য এক একদিন গৃহকে জ্বলিয়া সমস্ত মনবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন। *

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সজীব করিয়া আনিতেছি।
• এককালে, বাহা বিনয়রপাপ্রাপ্ত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোক্ত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের ক্ষমতা সুসুচিত, আমাদের দার ক্রম। এখন কেবল বহুবাক্য এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারো স্থান হয় না। আজ আমরা মানব-সাধারণকে দূর করিয়া, নিজে কে বিচ্ছিন্ন-কৃত্ত করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্র প্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড় হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর, শাস্ত প্রচুরতর, আয়োজন বিচিত্রতর। হইয়াছে—কিন্তু মঙ্গলময় অস্ত্রধারী দেখিতেছেন আমাদের গুরুতা, আমাদের দীনতা, আমাদের নিরক্ষর কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে বড়ই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে, এই গৃহসজ্জায়, এই রসলেশশূন্য কৃত্তিমতার মধ্যে সেই শাস্তমঙ্গলবস্ত্রপের প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখধরি আমাদের মঙ্গল দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া গাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকটিকা দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদের আশাধিককে আশ্বাস কর—গৃহস্থ মঙ্গলবস্ত্রের মধ্যে

আশ্বাস কর! আজ উৎসবের দিন শুভমাত্র ভাবসমগ্ৰোধের * দিন নহে, শুভমাত্র মধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বহুৎ সন্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রাহের দিন। আজ তুমি আমাদের গকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব, প্রাত্যহিক ঔদাসীক্য হইতে উদ্ধাখিত কর, প্রতিদিনের নিবীৰ্য্য নিশ্চেষ্টতা হইতে,—আশ্রম-আবেশ হইতে উদ্ধার কর! যে কঠোরতার, যে উত্তম, যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সাধকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদের গকে প্রতিষ্ঠিত কর! আমরা এত-গুলি মধুর্য একত্র হইয়াছি আজ যদি, যুগে-যুগে তোমার মধুর্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গোরব, যে প্রেমের গোরব, যে মঙ্গলের গোরব, যে কঠিনবীৰ্য্য নিভীক মহাবীর গোরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, ভুল ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—যুগে যুগে মহাপুরুষের কঠ হইতে যে সকল অভয়বাহী-অমৃতবাহী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকাশের মঙ্গলশ্রবণবোধের মত আজ না শুনিতে পাই—তুমি কেবল শৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগবিভাস—তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুস্মটিকরাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃষ্টির মধ্যে লইয়া যাও—যেখানে খুলিশব্দ্যের নবদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন—যেখানে তোমার সঙ্গীতাঙ্গী সেবক, কর্তব্যোহর কঠিনপথে রিক্তহৃৎ ধাবমান হইয়াছেন—

যেখানে তোমার বরণবর্ণের দাঁড়িয়ে দ্বারা
নিশিষ্ট, বিধবাদের দ্বারা পট্টভাঙ, মদ্যকবের
দ্বারা অপমানিত। হাহ দেব, যেখানে
কোথায় দীপজ্বালা, কোথায় বাস্তোভ্রম,
কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমালা !
কিন্তু সেইখানে ভেদ, সেইখানে শক্তি,
সেইখানে দিব্যাবস্থা, সেইখানেই ভূমি !
দূর কর—দূর কর এই সমস্ত আবরণ-আচ্ছাদন,
এই সমস্ত সূত্র দস্ত, এই সমস্ত মিথ্যা
কোলাহল, এই সমস্ত অগ্নি-আয়োজন—
মহাব্যবহের সেই অস্ত্রভেদিতচূড়ামণিষ্ট নিরা-
ভরণ নিপুণ রাজনিকৈতনের দ্বারের সম্মুখে
অস্ত্র আমাকে গাঁড় করাইয়া দাও ! সেখানে,

সেই কঠিন কোঠে, সেই রক্ত নিষ্ঠুরতার
মধ্যে, সেই বহুদুঃখের অনিমেষ দুষ্টিপাতের
সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব
অত !

দাও হস্তে তুমি

নিম্নহাতে তোমার অমোঘ পরশুদি,
তোমার অক্ষয় তুণ। অস্ত্র দীক্ষা দেহ
রণওক ! তোমার অবল পিতৃহেতু
দানিয়া উঠুক আমি কঠিন আবেশে।
কর যেরে সম্মানিত নববীরকে,
দুঃসহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অস্ত্রে "যোর
কতচিহ্ন-অলঙ্কার ! ধস্ত কর দাদে
সকল চোঁটের আর নিকল এলাসে।

ত্রিবন্ধুর ।

৪

প্রাতঃকাল, সাতটা ; রাজাদিগের সহিত
দস্তরবস্ত দেখাদক্ষা করিবার ও তাঁহাদের
অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবার ইহাই নির্দিষ্ট সময়।
যে সময়ে, চিরনিদ্রাষ ত্রিবন্ধুরের দীপ্যমান
প্রথর-স্বর্ঘ্যরশ্মি দিগন্ত হইতে স্বদীর্ঘ সরল-
রেখার প্রসারিত হইয়া, পত্রাবরণ ভেদ করিয়া
তালজুকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং
নারিকেল ও স্থপারি তরুর শিখরদেশ স্বর্ণাভ
গোলাপি-রঙে রঞ্জিত করিল,—সেই সময়ে,
আমি মহাদ্বারের অতিথিবস্ত্রপে, তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গাড়িতে উঠি-
লাম। এখানে, তালজাতীয় তরুমণ্ডপের
নীচে দিয়া আমাদের গাড়ি চলিতে লাগিল ;

একটু পরেই, একটা প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের
সম্মুখে আদিয়া উপস্থিত হইল। এখানে
দৌছিবার প্রথম স্তানেই, যে তোরণটি পার
হইয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম,—ইহা
সেই তোরণ। ইহার তিতর দিরা একটা
চতুর্কোণ প্রাচীরের মধ্যে আদিয়া পড়িয়া।
ইহা যেন একটা নগরের মধ্যে নগর। ইহার
মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরা প্রবেশ করিতে
পার না।

এইবার আমার গাড়ি তোরণের মধ্যে
দিয়া একেবারে সিধা চলিয়া গেল। সেই-
খানে কতকগুলি অস্থায়ী দৈনিক তোরণ
রক্ষা করিতেছিল। প্রবেশ করিবার

পুণ্যস্থানের বিবিধ নিদর্শন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমরা একটা বিস্তীর্ণ সরোবরের ধার দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই সরোবরজলে আ-কর্ষিত-মজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা আতঃপান করিতেছে; প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পূজার মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; উহাদের লবিত কেন্দ্রগুহ্য বাহিয়া জলবিপ্লু খরিতেছে; উহাদের আর্দ্র পাত্র সূর্য্যাকিরণে, অভিনব পিতলসামগ্রীর দ্বার্য্য জ্বলিত করিতেছে;—মনে হইতেছে, যেন উহার কতকগুলি জলসেবতা। উহার বকীর ধ্যানে এমন নিমগ্ন,—আমাদের পাড়ি উহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে, সৈনিকগণ আমাদের সম্মানার্থ তুর্দীনাব করিতেছে, জরতাক পিটাইতেছে, তথাপি সেধিকে উহাদের দৃকপাত নাই।

ইতরসাধারণের অপ্রবেশ এই ঘেরটির মধ্যে রাজপরিবারবর্গের নিবাসগৃহ, পাঠ-শালাসমূহ, আর সেই সর্ব্ব প্রধান মন্দিরটি অধিষ্ঠিত—বাহ্য আর চারিটি বিরাট অট্টালিকার উপর—সেই দেবমন্দিরের গগনভেদি-চূড়চতুর্দয়ের উপর অধিষ্ঠিত করিতেছে। এই প্রাসাদের সমুখভাগের আকৃতি ও প্রাসাদপ্রাচীরের বহির্ভাগটি যেন একটু বিবাহ-ময়। প্রাসাদঘরের উপর চুইটি বৃগল কাল-নিক শৃঙ্গি অধিষ্ঠিত; এই শৃঙ্গি-দুটি ভারতীয় ধরণের। আরো কিছু দূরে, পূর্ব্বদিকের শেব প্রান্তে, কতকগুলি ‘ব্রাগন’ শৃঙ্গি অধিষ্ঠিত—উহা স্পষ্ট চীনদেশীয় বলিয়া মনে হয়।

সমস্তই অতি উজ্জল বর্ণে রঞ্জিত; এবং বহুবর্ণাবধি ধুলিরাশি সঞ্চিত হইয়া উহাদিগকে ‘পোড়া-পোড়া’ ও আরক্তিম করিয়া তুলি-

রাছে। কেন না, পঞ্চগুলির দ্বার, এদেশে ধুলিও লাগে।

মহারাজের প্রাসাদঘরের সমুখে, অর্ধচন্দ্রাকৃতির বন্ধিগণ আবার আমাদের সম্মানার্থ করু হইতে অস্ত্রাদি নাড়াইয়া নইল। সৈনিকগুলিকে দেখিতে খুব ভীতালো, বেশ কাহনা-দোরস্ত, লাল-পাগড়ি-পরা; এবং উহার আধুনিক নিরমাহসারে, ‘পুনঃ-পুনঃ-আওগাঅকারী’ নবপ্রচলিত বস্তুকের বধাযথ প্রয়োগ ও চালনা করিতে পারে।

মহারাজা স্বয়ং অভ্যর্থনার জন্য দ্বার-দেশে আদিয়া উপস্থিত। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার সমুখে যুরোপীয়-বৃহৎ-কোর্তী-ধারী কোন রাজমুস্তির আধিষ্ঠান হয়। কিন্তু না—মহারাজা সূর্য্যচির পরিচয় দিয়া গাটি ভারতীয় বেশেই আদিয়াছিলেন।—শাদা রেশমের পাগড়ি, মণ্মলের পরিচ্ছদ—বোদামগুলি বহু হীরকের।

যে দরবারশালায় প্রথমে আমার অভ্যর্থনা হইল, উহার কুটিমতল চীন-বাগনের ত্রয়োমণ্ডিত; চাঁদোরা হইতে কতকগুলি বেশোয়াবি ঝাড়-লঠন ঝুগিতেছে; মধ্যস্থলে খোদাই-কাজ-করা একটা রৌপ্যসিংহাসন; উহার চারিধারে কালো-রঙের আসবাব;—গুরু আরু সূ-কাঠে খোদাই-কাজ-করা ভারতীয়-ধাঁচার কালো আরাধ-কেদারা; এ কেবল আশিরাখণ্ডের লোকেয়াই জানে, কি করিয়া একতপ মূল্যবান কঠিন কাঠে খোদাই-কাজ করা বাইতে পারে।

ফরাসী-সরকারের একটি সম্মানভূষণ মহারাজকে প্রদান করিবার জুর আমার উপর অপিত হইয়াছিল;—এই মহাজ কাচটি

সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত যুরোপের বিদগ্ধ লইয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। এই যুরোপদর্শন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কেন না, বর্ণাশ্রমপ্রথাও দুর্লভ্য। শাসনে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তাঁহার কোথাও বাঁধবার জো নাই। এখানত সাহিত্যের বিষয় লইয়াই তাঁহার সহিত কথাবার্তা চলিল; কেন না, মহারাজা সাক্ষিতকচি ও স্নানিকিত। পরে, তিনি হস্তিযন্ত্রের বিচিত্র আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রযো-
সামগ্রী দেখাইবার নিমিত্ত, আমাকে একটি উচ্চ শিল্পাগারে লইয়া গেলেন। এই শিল্প-
সান্ন্যাস্ত্রা তিনি সব্বেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন। এইবার বিদায়কাল উপস্থিত হইল; আমি মহারাজের নিকট বিনায় লইলাম।

আবার সেই ভাগভাতীর তরুণের হস্তিৎ আধারের মধ্য দিয়া আমার গাড়ি চলিতে লাগিল। এই অমারিক রাজার সহিত, আর-একটু গভীরভাবে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিয়া গেল। কেন না, আমাদের মনের গঠন ও তাঁহার মনের গঠন ভিন্ন হইবারই কথা।

যে কয়েকদিন আমি এখানে থাকিব, তাহার মধ্যে অবশ্যই আমার আমাদের দেখা-
সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাৎ-
কারেই আমি বুঝিয়াছি, এখানকার বৃহৎ
মন্দিরটির ভাষা, তাঁহার মনের অন্তরতম
প্রবেশটিও আমার নিকট দূর্ভেদ্যবহনরূপেই
থাকিয়া থাকিবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে,
কি আতি, কি কুল, কি ধর্ম,--সকল বিষ-
য়েই মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। তা ছাড়া,
আমাদের ভাষা এক নহে। বাধা হইয়া

একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে
রাখিতে হয়;—ইচ্ছাই ত, একটা বিষয় বাধা;
যেভাবেই হোক, মতই কেন সাহায্য হউক
না, তবুও আমাদের মধ্যে একটা পক্ষের
ব্যবধান পাকিয়া যায়; এইজন্য আমাদের
কথাবার্তা বেশিদূর অন্তর হইতে পায় না,
—একজনে সহ্যা থাকিয়া যায়।

দুইদিনদিনের মধ্যে, আমি ‘মহারাজি’
গহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। ‘মহারাজি’
পূণক প্রাঙ্গণে থাকেন। ইনি মহারাজের পত্নী
নহেন,—ইনি তাঁহার মাতুলানী। ত্রিষ্মুরের
প্রধান গোষ্ঠিবর্গ যে জাতির অন্তর্গত, সে
জাতিটি বহু প্রাচীন; উহা এক্ষণে ভারত-
বর্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ হইতে একেবারে
অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে,
কেবল পুত্রীর দিক দিয়াই লোকের নাম,
উপাধি ও সম্পত্তি উত্তরবংশে সংক্রামিত
হয়। তা ছাড়া, পত্নীর বৈজ্ঞানিক নামি-
পরিভাষার অধিকার আছে।

রাজপরিবারের মধ্যে, অভিজাতা প্রাণী
মহিলার ঘোষ্ঠকল্পা—‘মহারাজি’ এবং ঘোষ্ঠ-
পুত্র—‘মহারাজা’ হইয়া থাকেন। কিন্তু
বর্তমান মহারাজি কিংবা তাঁহার ভগিনীপুত্র—
ইহাদের সেক্ষপ কোন বংশবৃত্ত না থাকায়;
বর্তমান রাজবংশ নীচই বিলুপ্ত হইবার কথা।

এই রাজঘে, মহারাজার সন্তানদিগের
কোন উত্তরাধিকারবৎ নাই; শুধু অধি-
কার নাই, তাহা নহে—‘রাজকুমার’ কিংবা
‘রাজকুমারী’ এই উপাধিলাভেও তাহার
ব্যক্তি।

এই ‘নারের’জাতীয় মহিলাদিগের
দুর্নীতি অত্যন্ত মন্দর। আমাদেরই কুমারী-

দিশের দ্বার উদ্বার। কেন্দ্রের কিরদংশ দিতা
দিয়া বাঁধিয়া রাখে, এবং অবশিষ্ট অংশ এক-
প্রকার গোলাকৃতি “গোলাটির” আকারে
রচনা করিয়া তাহাই মস্তকের চূড়াস্থানে
ধারণ করে; তাহার কতকটা সমুখভাগে
ও কতকটা পার্শ্বদেশে কপালের দিকে
জুলিয়া পড়ে;—বেধিলে মনে হয়,—

কৌটুকানো-কিনারা: একপ্রকার টুপি যেন
বেশ একটু ঢং করিয়া মাথার পুরিয়াছে।
কিন্তু-উৎপদের কেন্দ্রবিন্দুর বেরগ বিলাস-
লীলা প্রকাশ পায়, উদ্বাদের দেহের
সমস্ত সাজসজ্জার তেজনি আবার
তাপমহুলত একটা কঠোর গাভীরা
বেদীপায়মান।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার সত্যের আলোচনা ।

পূর্বপ্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, নবপ্রসূত
বালকের মনে জ্ঞান বধন সবে-মাত্র নূতন
উন্মেষিত হয়, তখনকার সেই আদিমজ্ঞান
কেবলমাত্র এই শক্তিরই ব্যাপার, তা বই
তাহাতে জ্ঞাতার নিজের কর্তৃত্ব বিন্দুমাত্রও
থাকিতে পারে না। জ্ঞান কি? না, “এটা
এই” এইরূপ নিষ্করিয়াজ্ঞা; কিন্তু বাহ্যকে
বলা হইতেছে “এটা”, তাহার দ্বার আর দশ-
পাঁচটা যদি পূর্বে কোনোসময়ে জ্ঞাতার
জ্ঞানগোচর হইয়া না থাকে, তাহা হইলে
“এটা” যে কি বস্তু, তাহা জ্ঞানে প্রতিভাত
হইতে পারে না, কাজেই “এটা এই” এরূপ
নিষ্করিয়াজ্ঞা সৃষ্টি পাইতে পারে না। নব-
প্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানে বধন প্রথম
আলোক উদ্ভাসিত হইল, তখন পূর্বে
কোনোসময়ে সেরূপ কোনো আলোক
তাহার জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় নাই; তাহা বধন
হয় নাই, তখন সেই নূতন আলোকের
উদ্ভাসনকালে অভিনব জ্ঞাতা কেমন করিয়া

বলিবে যে, “এটা আলোক” বা “এটা এই”।
জ্ঞানের রূপই য’তে “এটা এই”; তা বই
তককেবল “এটা” জ্ঞানশব্দের বাচ্য হইতে
পারে না। কাগরের যেমন দুই পিট—একপিট
এবং ও-পিট, জ্ঞানেরও তেমনি দুই পিট—
এটা এবং এই, অর্থাৎ বিশেষ্য এবং বিশেষণ।
একপিঠিয়া কাগরও যেমন—একপিঠিয়া
জ্ঞানও তেমনি, দুইই বক্ষ্যাপুত্র অর্থাৎ একান্ত-
গন্ধেই অসম্ভব। কাজেই বলিতে হয় যে,
নবপ্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানের “এটা”র
ভিতরে অবশ্যই কোনো-না-কোনো-প্রকার
“এটা এই” লুকানো রহিয়াছে। সে “এটা
এই” যে ব্যাপারটা কি, তাহা অল্পসজ্জান
করিয়া বাহির করা আবশ্যক;—তাহারই
একপে চোঁটা দেখা বাইতেছে।

অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আদিম জ্ঞানা-
লোক ছুটিয়া বাহির হইল। বিশেষ একটা
ব্যাপার ছুটিয়া বাহির হইল। তখন বলি-
তেছি “বিশেষ একটা ব্যাপার”, তখন

তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, আদিম জ্ঞানালোক কোনো-না-কোনো-প্রকার বিশেষণদ্বারা বিশেষিত। কিন্তু একটা বিষয় আর-একটা বিষয় হইতেই বিশেষিত হইতে পারে; তা বই, একাকী একটা বিষয় বিশেষিত হইতে পারে না। আদিম জ্ঞানালোক তো এক, তাহার প্রতি-বোধী আর-এক কে? আদিমজ্ঞান তো এ-পিট, তাহার প্রতিবোধী ও-পিট কে? ও-পিট হ'চ্ছে অজ্ঞান-অন্ধকার। আদিম জ্ঞানালোক অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে বিশেষিত। আদিম জ্ঞান অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত—অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুদিত। পূর্বে বাহ্য অব্যক্ত ছিল—একণে তাহাই ব্যক্ত হইল। এ নহে যে, পূর্বে তাহা নাস্তি ছিল, একণে তাহা অস্তি হইল। শাল এবং তাল দুইই যেমন বৃক্ষ, ব্যক্ত-বস্ত এবং অব্যক্ত-বস্ত দুইই তেমনি বস্ত। তালগাছ দেখিয়া যখন আমরা বলি যে, “এটা বৃক্ষ”, তখন সে কথার ভাবার্থ এই যে, পূর্বেদৃষ্ট শালগাছও যেমন বৃক্ষ, দৃষ্টমান তালগাছটিও তেমনি বৃক্ষ। তবেই হইতেছে যে, দৃষ্টমান তালগাছকে বৃক্ষ বলিলে পূর্বেদৃষ্ট শালগাছকেও প্রকারান্তরে বৃক্ষ বলা হয়। তেমনি ব্যক্তবস্তকে বস্ত বলিলে, পূর্বে যখন তাহা অব্যক্ত ছিল, সেই অব্যক্ত-বস্তকেও প্রকারান্তরে বস্ত বলা হয়। শালগাছও বৃক্ষ, তালগাছও বৃক্ষ। শাল এবং তাল দুয়ের উত্তরসাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্ছে বৃক্ষ-প্রত্যয়, আর, সেই উত্তরসাধারণ ঐক্যভূমি শাল এবং তাল দুয়েরই বিশেষণ। তেমনি “ব্যক্ত এই” এবং “অব্যক্ত এই” এ-দুয়ের উত্তর-সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্ছে বস্ত-প্রত্যয়, আর

সেই বস্ত-প্রত্যয়ই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুয়েরই বিশেষণ। তালগাছের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবারাই যেমন শাল-তালের উত্তরসাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তেমনি আদিম প্রকাশের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবারাই ব্যক্তাব্যক্তের উত্তরসাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শাল-তালের উত্তরসাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্ছে বৃক্ষ-প্রত্যয়; ব্যক্তাব্যক্তের উত্তরসাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্ছে বস্ত-প্রত্যয়। আদিম জ্ঞানালোক পূর্বে অব্যক্ত ছিল, একণে ব্যক্ত হইল; সুতরাং ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে একটা ঐক্যভূমি রহিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ নাই কখনো না, অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হইল, তখন। আদিমজ্ঞানে “ব্যক্ত ইতি” এই বিশেষ্যের সহিত ব্যক্তাব্যক্তের উত্তরসাধারণ বস্ত-প্রত্যয় আপনা হইতেই আসিয়া ছোটে। আর সেই বস্ত-প্রত্যয়ই আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ। “বস্ত-প্রত্যয়ের রূপ কি, যদি চিত্তজ্ঞাপা কর, তবে তাহা এই :—

প্রকাশ-নূতন, কিন্তু বস্ত নূতন নহে—বস্ত পূর্বে হইতেই বর্তমান;—এইটি হ'চ্ছে বস্ত-প্রত্যয়ের রূপ। আদিমজ্ঞানে “যখন “এটা” বলিয়া প্রথম বিশেষ্য বা প্রথম লক্ষ্য-বস্ত উপস্থিত হয়, তখন “এটা অব্যক্ত ছিল, একণে ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং পূর্বে হইতেই বর্তমান” এই বিশেষণটিও সেই সঙ্গে উপস্থিত হয়, তবে কিনা—অতীত অপরিস্ফুট নিগূঢ়ভাবে।

বিগত প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে বলা

হইয়াছিল যে, নবপ্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানে জ্ঞাতার নিজেই কোনো কর্তৃক পাকিতে পারে না; কর্তৃক থাকিবে কেমন করিয়া? জ্ঞাতা নিজে এঃ সেই সঙ্গে তাহার জ্ঞান যখন অব্যক্ত ছিল, তখন জ্ঞানকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত করিয়া তোলা কেমন করিয়া তাহার নিজের ইচ্ছার বা নিজের শক্তিতে বা নিজের কর্তৃত্বে সম্ভবসাধ্য হইবে? তা ছাড়া, আর-একটি কথা আছে, তাহা এই :-

বৃক্ষের বিশেষণ এক নহে—বৃক্ষের বিশেষণ অনেক; বৃক্ষ গাছ, সজীব, বৃক্ষ উদ্ভিদ, বৃক্ষ নবর—এইরূপ নানা বিশেষণ। নানা বিশেষণের যোগে এক বৃক্ষকে আমরা নানাভাবে দেখিতে পারি। বৃক্ষকে চাই আমরা স্থাবর বলিয়া অবধারণ করি, চাই সজীব বলিয়া অবধারণ করি, চাই উদ্ভিদ বলিয়া অবধারণ করি—সে আমাদের ইচ্ছা; সুতরাং তাহার উপরে আমাদের কর্তৃত্ব চলে। লক্ষ্য-স্বত্রে, আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ একটি মাত্র—কি? না, অস্তিত্বপ্রত্যয় বা বস্তুপ্রত্যয়। কীভাবে আদিমজ্ঞানের লক্ষ্য বস্তুতে অভিনব জ্ঞাতা সেই অধিকারিত একই-ধাঁচের বিশেষণটি আরোপ করিতে অগত্যা বাধ্য। সুতরাং শেবোক্তরূপে জ্ঞাতা একরূপ বলিতে পারে না যে, “উপস্থিত বিষয়টাকে—চাই আমি বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—চাই আমি আর-কিছু বলিয়া অবধারণ করি—সে আমার ইচ্ছা”। লক্ষ্য বিষয়টাকে বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেই হইবে। কেন না—লক্ষ্য বিষয়কে তুমি যে, বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেছ, করিতেছ তাহা ঐশী শক্তির বলে—তোমার নিজের ইচ্ছার বলে নহে।

আদিমজ্ঞান যখন বস্তুপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হইতে প্রকাশে পদানবেশ করিতে করিতে অলক্ষিতভাবে বিকাশের মতো আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার ভিতর হইতে নিজের কর্তৃত্ববোধ ফুটিয়া বাহির হয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞাতার সেই যে নিজের কর্তৃত্ব, তাহা ঐশী শক্তিরই প্রতিধ্বনি। বৃক্ষের পুষ্প যদি বলে যে, “আমি বৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আমার মধু আমারই মধু—তাহা বৃক্ষের নির্ধাস নহে; আমার পাপড়ি আমারই পাপড়ি—তাহা বৃক্ষের পলব নহে; আমার সর্বজাত ফল আমারই ফল তাহা বৃক্ষের ফল নহে”; তবে পুষ্পটাকে বৃক্ষ হইতে উন্মূলিত করিয়া দুইদিন পরে তাহাকে যদি বলি যে, “তোমার পাপড়ি কোথায়—তোমার মধু কোথায়—তোমা হইতে ফলোৎপত্তিরই বা সম্ভাবনা কি?” তবে পুষ্প বলিবে যে, “মড়া উপর খাড়ার বা দিও না”। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, পুষ্পের যে মধু তাহা বৃক্ষের নির্ধাসেরই মূর্তিভেদ, পুষ্পের যে পাপড়ি তাহা বৃক্ষের পলবেরই মূর্তিভেদ, পুষ্পের যে সর্বপুষ্ট বীজ তাহা বৃক্ষবীজেরই মূর্তিভেদ। তেমনি, মহাব্যোম জ্ঞানবিকাশের মধ্যে তাহার নিজের কর্তৃত্বশক্তি বাহ্য-কিছু দেখিতে “পাওয়া যায়, তাহা ঐশী শক্তিরই মূর্তিভেদ। বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে যেমন করিয়া মহাব্য বৃত্তরাজ্য, উদ্ভিদরাজ্য এবং দ্রাব্যরাজ্য মাড়াইয়া সর্ব-সমভিব্যাহারে মানবরাজ্যে উপনীত হইরাছে, ব্রহ্মব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি মহাব্যোম আত্মা প্রাণরাজ্য এবং মনোরাজ্য মাড়াইয়া প্রাণমন-সমভিব্যাহারে জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইরাছে। হুই ঘটনাই

একই ঐশী শক্তির প্রভাবে ঘটনাচ্ছে এবং ঘটতেছে—তাহার উপরে কোনো জীবেরই কোনো কর্তৃত্ব চলে না। মহুঘোর জ্ঞানের প্রকাশ এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্ব-শক্তির প্রকাশ এবং বিকাশ হয়, ইহা সকলেরই যেথা কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও যেথা চাই যে, পরমেশ্বরের মহতী শক্তি বাহ্য সর্বত্রগতে কার্য্য করিতেছে, সেই ঐশী শক্তিই

মহুঘোর কর্তৃত্বশক্তির সারসর্গহ। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, একদিকে আকাশ, প্রকাশ, এবং বিকাশ, ও আর-একদিকে কারণ, করণ এবং উপকরণ, 'এই দুই জিনিস, অদ্বিদ্বি বিধিমতে পর্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অতঃপর তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বাইবে।

শ্রীযিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌকাডুবি।

৫৫

কমলা যখন গঙ্গাতীরে গিয়া পৌছিল, নীতের দূর্য্য তখন রশ্মিচ্ছটাইন স্নান পশ্চিমাকাশের প্রান্তে নামিয়াছেন। কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অন্তর্যামী দূর্য্যকে কি মনে করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথার গঙ্গাজলের দিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং ছোড়করপুটে গঙ্গার জলগত্ব অঙ্গলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুরুজনদের উদ্দেশ্য করিয়া সেইখানে জুটিত হইয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিতেই আর একটি প্রণয় ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনোদিন যুগ জুগিয়া তাহার মুখের দিকে সে চাহে নাই—এমনি তাহার হৃৎপা, যখন একদিন রাত্রে সে তাহার পাশে বসিয়াছিল, তখন তাহার পায়ের দিকে ও তাহার চোখ পড়ে নাই—বাসন্তবরে অস্ত্র মেঘেদের সঙ্গে তিনি যে ছই-

চারিটা কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও সে যেন ঘোমটার দ্বারা দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া ভেদন সুপেট করিয়া শুনিতে পার নাই। তাহার সেই কঠোর স্বরূপে আনিবার লজ্জা আত্ম এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই মনে আসিল না।

অনেক রাত্রে তাহার বিবাহের লগ ছিল; নিত্য প্রাতঃসময়ে সে যে কখন কোথায় ঘুমানিয়া পড়িয়াছিল, তাহাও মনে নাই—সকালে আশ্রিয়া দেখিল, তাহারের প্রতিবেশীর বাড়ীর একটি বৃদ্ধ তালকে টেলিয়া আগুটয়া বিলম্বিত করিয়া হাসিতেছে—বিছানার আর কেহই নাই। জীবনের এই শেষমুহুর্তে জীবনেরশরকে একটিবার স্বরণ করিবার সমল তাহার কিছু নাই। তাহাকে ধ্যানমুগ্ধির সম্মুখে রাখিয়া যে কেবল এই ক'টি কথা বলিবে, "নাথ, এবারকার একদয়ের মত তব আমি

আসি", তাহাও হইল না ;—সেদিকে একে-
বারে অন্ধকার—কোনো মূর্তি নাই, কোনো
বাক্য নাই, কোনো চিত্র নাই! যে মূল
চৌকীটির সঙ্গে তাহার চাশরের এস্থি বাধা
হইয়াছিল—জাগ্রিতচরণের এদিক সেই
নিভান্ত অন্ধকারের ছেলীর মৃণা ও কমলা
আনিত না—সে চৌকীখানিও সে বন্ধ করিয়া
• রাখে নাই!

অপ্তের মধ্যে তাহার সেই সর্বাঙ্গের
অপরিসীম আত্মীয়ত্বের উদ্দেশে কমলা ছই
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, “তুমি কোথায়
আছ, আমি কিছুই জানি না, তোমার কাছে
আমার শরীরমন—আমার জন্মজন্মান্তর উৎ-
সর্গ করিতেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর!”—
কমলা চোখ ঘুণন খুলিল, সূর্য্যমণ্ডলের শেষ
অগ্নিরেখা তখন দিগন্তের অন্তর্য্যাপ্তে ডুবিয়া
গেছে। কমলা মনে মনে কহিল, “এই ত শেষ
আলোক নির্গমন হইল, আমার স্বামীর মূর্তি
ইহজীবনে দেখিতে পাইলাম না!” রমেশ
হেমলিনীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, সেখানি
কমলার অঁচলের আন্তে বাধা ছিল—সেই
চিঠি খুলিয়া বালুতটে বলিয়া তাহার একটি
অংশ পোখুলির আলোকে পড়িতে লাগিল।
সেই অংশে তাহার স্বামীর পরিচয় ছিল,—
বেলিঙ্কধা নর, কেবল তাহার নাম নলিনাক্ষ
চট্টোপাধ্যায়, আর তিনি যে রংপুরে ডাক্তারি
করিতেন ও এখন সেখানে তাহার পৌত্র
পাওরা বাস না—এইটুকু মাত্র। চিঠির
বাকি অংশ সে অনেক সন্ধান করিয়াও পায়
নাই। “নলিনাক্ষ” এই নামটি তাহার
মনের মধ্যে স্থাবরবর্ণ করিতে লাগিল,—এই
নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন

ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্ত্রহীন
দেহ লইয়া তাহাকে আনিষ্ট করিয়া ধরিল—
তাহার চোখ দিয়া অবিভ্রাম দ্বারা বারিয়া
অল পড়িয়া তাহার জন্মকে সিদ্ধ করিয়া
ছিল—মনে হইল, তাহার অসহৃৎ হৃৎস্পর্শ
যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্ধকরণ
বলিতে লাগিল, “এ ত সত্যতা নর, এত অন্ধ-
কার নর—আমি দেখিতেছি, সে যে আছে,
সে আমারই আছে!” তখন কমলা প্রাণপণ-
বলে বলিয়া উঠিল, “আমি যদি সত্য হই, তবে
এই জীবনেই আমি তাহার পায়ে ধুলা লইব,
বিধাতা আমাকে কখনোই বাধা দিতে পারি-
বেন না। আমি যখন আছি, তখন তিনি
কখনই যান নাই, তাহারই সেবা করিবার
অন্ত ভগবান আমাকে বাচাইয়া রাখিয়াছেন।”

এই বলিয়া সে তাহার ক্রমালে বাধা
চাবির গোছা সেইখানেই ফেলিল এবং
হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, রমেশের বেগুনা
একটা ব্রোচ, তাহার কাপড়ে বেঁধানো
আছে। সেটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া জলের
মধ্যে ফেলিয়া দিল। “তাহার পরে পশ্চিমে
স্থ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল—
কোথায় বাইবে, কি করিবে, তাহা তাহার
মনে স্পষ্ট ছিল না—কেবল সে আনিরাছিল,
তাঁহাকে চলিতেই হইবে, এখানে তাহার এক-
মুহূর্ত বাড়াইবার স্থান নাই।

শৈতের দিনান্তের আলোকটুকু নিশেষ
হইয়া বাইতে বিলম্ব হইল না। অন্ধকারের
মধ্যে শাধা বালুতট অস্পষ্টভাবে ধু ধু করিতে
লাগিল, হঠাৎ এক জারগার কে যেন বিচিহ্ন
রচনাবলীর মাঝখান হইতে সৃষ্টির ধানিকটা
চিহ্নলেখা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

কৃষ্ণপক্ষের অকৃত্যবর্ণিত তাহার সমস্ত
নিমিষের তারা লুপ্ত। এই জনশ্রুত মনীষীদের
উপর অতি দীর্ঘে নিবাস ফোলেতে লাগিল ।

কমলা সম্মুখে গৃহস্থের অনন্ত অকৃত্য
ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কিন্তু
সে জানিল, তাহাকে চলিতেই হইবে
কোথাও পৌঁছিতে কি না, তাহা ভাবিবার
সামর্থ্যও তাহার নাই ।

বরাবর নদীর ধার দিয়া সে চলিলে, এই
সে স্থির করিয়াছে—তাহা হইলে কাহাকেও
পথ দ্বিভাষ্য করিতে হইবে না এবং যদি
বিপদ তাহাকে আক্রমণ করে, তবে মুহূর্ত্তের
মধ্যেই বা গর। তাহাকে আশ্রয় দিবে না ।

আকাশে কুহেলিকার লেশমাত্র ছিল না ।
অনাঘিল অকৃত্যের নিম্নাহীন জননীর
সতর্কতার মত কমলাকে আবৃত করিয়া
রাখিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিকে বাধা দিল না ।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল । যবের ক্ষেতের
প্রান্ত হইতে শৃগাল ডাকিয়া গেল । কমলা
বহুদূর চলিতে চলিতে বালুর চর শেষ হইয়া
যাটির ডাঙা আরম্ভ হইল । নদীর ধারেই
একটা গ্রাম দেখা গেল । কমলা ক্লান্ত-
বকে গ্রামের কাছে আসিয়া দেখিল, গ্রামটি
স্বপুত্র । তবে তবে গ্রামটি পার হইয়া চলিতে
চলিতে তাহার শরীরে আর শক্তি রহিল না ।
অবশেষে একজায়গায় এমন একটা ডাঙা-
তটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে
সম্মুখে আর কোনো পথ পাইল না । নিভাঙ্ক
অশ্রু হইয়া একটা বটগাছের তলার শুইয়া
পড়িল, শুইয়ামাত্রই কখন নিদ্রা আসিল,
জানিতেও পারিল না ।

প্রত্যুষেই চোখ মেলিয়া দেখিল, কৃষ্ণ-

পক্ষের চাঁদের আলোকে অকৃত্যের অশ্রু হইয়া
আসিয়াছে এবং একটি শ্রোতা শ্রীলোক
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—“তুমি কে গো ?
শীতের রাতে এই গাছের তলার কে শুইয়া ?”

কমলা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল ।
দেখিল, তাহার সম্মুখে ঘাটে চখানা বজ্রা
বাধা রহিয়াছে—এই শ্রোতাটি লোক উঠি-
বার পূর্বেই মান সারিয়া লইবার লজ্জা প্রকট
হইয়া আসিয়াছেন ।

শ্রোতা কহিলেন—“হাঁ গো, তোমাকে
যে বাঙালির মত দেখিতেছি ।”

কমলা কহিল—“আমি বাঙালি ।”

শ্রোতা । এখানে পড়িয়া আছ বে ?

কমলা । আমি কানীতে ঘাইব বলিয়া
বাহির হইয়াছি । রাত অনেক হইল, ঘুম
আসিল, এইখানেই শুইয়া পড়িয়াম ।

শ্রোতা । ওমা সে কি কথা ! হাঁটিয়া
কানী ঘাইতেছ ? আচ্ছা চল, ঐ বজ্রার
চল, আমি মান সারিয়া আসিতেছি ।

মানের পর এই শ্রীলোকটির সহিত
কমলার পরিচয় হইল ।

গাভিগুরে যে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ীতে
খুব ঘটী করিয়া বিবাহ হইতেছিল, তাহার
ইহাদের আশ্রয় । এই শ্রোতাটির নাম
নবীনকালী এবং ইহার বামীর নাম মুকুন্দ-
লাল দত্ত—কিছুকাল কানীতেই বাস করি-
তেন । ইহার আশ্রয়ের বাড়ী বিষয়
উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, অথচ পাছে
তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে বা ঘাইতে হয়,
এইজন্য ঘাটে করিয়া গিয়াছিলেন । বিবাহ-
বাড়ীর কর্ত্তা কোতপ্রকাশ করিতে নবীন-
কালী বলিয়াছিলেন, “জানই ত তাই, কর্ত্তার

পর্যন্ত ভাল নয়। আর ছেলেবেলা হইতে উঁহাদের অভ্যাসই একরকম। বাড়ীতে গোক রাখিয়া ঘুঘু হইতে মাখন তুলিয়া দেই মাখনমাত্রা দ্বিগুণে উঁহার সূচি তৈরি হয়,—আবার সেই সোকেকে ঘা'-জা' খাওয়ারইলে চলিবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীনকালী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?”

কমলা কহিল, “আমার নাম অমলা।”

নবীনকালী। তোমার হাতে লোহা দেখিতেছি, স্বামী আছে বুঝি।

কমলা কহিল, “বিবাহের পরদিন হইতেই স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেছেন।”

নবীনকালী। ওমা, সে কি কথা। তোমার বয়স ত বড় বেশি বোধ হয় না।

তাহাকে আপাধমন্তক নিষ্ঠীর্ণ করিয়া কহিলেন, “পনেরোর বেশি হইবে না।”

কমলা কহিল, “বয়স ঠিক জানি না, বোধ করি, পনেরোই হইবে।”

• নবীনকালী। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে?

কমলা কহিল—“হাঁ।”

নবীনকালী কহিলেন, “তোমাদের বাড়ী কোথায়?”

কমলা। কখনো শত্রুবাড়ী ঘাই নাই, আমার বাপের বাড়ী বিত্তখালি।

কমলার পিতামহ বিত্তখালিতেই ছিল, তাহা সে জানিত।

নবীনকালী। তোমার বাপ-মা—

কমলা। আমার বাপ-মা কেহই নাই!

নবীনকালী। হরি বল! তবে তুমি কি করিবে?

কমলা। কান্নিতে যদি কোনো তত্ত্ব-গৃহস্থ আনাকে বাড়ীতে রাখিয়া ছুঁবেলা ছুটি বাইতে দেন, তবে আমি কাজ করিব। আমি রাঁধিতে পারি।

নবীনকালী বিনা-বেতনে পাটিকা ব্রাহ্মণী লাভ কারয়া মনে মনে ভারি খুসি হইলেন। কহিলেন, “আমাদের ত দরকার নাই—বামুন-চাকর সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের আবার বে-সে বামুন হইবার জো নাই—কর্তার খাবারের একটু এমিক্-ওমিক্ হইলে আর কি রক্ষা আছে! বামুনকে মাইনে দিতে হয় গোদটাকা, তার উপরে ভাত-কাপড় আছে। তা হোক, এক্ষণের মেরে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ, তা চল, আমাদের ওখানেই চল। কত লোক থাকে-দাকে, কত ফেলা-ছড়া ঘর, আর, একজন বাড়িলে কেহ জানিতেও পারিবে না। আমাদের কাজও ভেতন বেশি নয়। এখানে কেবল কর্তা আর আমি আছি। মেয়েগুলির সব বিবাহ দিয়াছি; তা তাহারা বেশ বড়বয়েই পড়িয়াছে। আমার একটীমাত্র ছেলে, সে হাকিম, এখন দেওয়াজগত্রে আছে, লাট-সাহেবের ওখান হইতে হুমাণ-অস্তর তাহার নামে চিঠি আসে, আমি কর্তাকে বলি, আমাদের নোটের ত অজায কিছুই নাই, কেন তাহার এই পেরো! এত-বড় হাকিম সকলের ভাগ্যে ঘোটে না, তা জানি, কিন্তু বাছাকে তবু ত সেই বিশেষে পড়িয়া থাকিতে হয়! কেন! দরকার কি! কর্তা বলেন, ‘ওগো সেজ্ঞ নয়, সেজ্ঞ নয়’ তুমি মেয়েমানুষ, বোঝ না! আমি কি ধোজন্যারের তত্ত্ব নোটোকে চাকুরিতে দিয়াছি! আমার অভাব কিসের!

তবে কি না, হাতে একটা কাণ থাকা চাই, নহিলে অন্ন বরস, কি জার্নি কখন কি মতি হয়।”

পালে বাতাসের ঝোর ছিল, কান্না পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিল না। সহরের ঠিক বাহিরেই অন্ন-একটু বাগানওয়ালা একটি ঘোড়লা বাড়ীতে সকলে গিয়া উঠিলেন।

সেখানে চোদ্দটা-বেতনের বাবুনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না—একটা উড়ে-বাবুন ছিল, অনতিকাল পরেই নবীন-কালী তাহার উপরে একদিন হঠাৎ অত্যন্ত আশ্রয় হইয়া উঠিয়া বিনা বেতনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দ-টা-বেতনের অতি দুর্লভ দ্বিতীয় একটি পাচক ছুটিবার অবকাশে কমলাকেই সমস্ত রাধাবাড়ার ভার লইতে হইল।

নবীনকালী কমলাকে বারবার সতর্ক করিয়া কহিলেন, “দেখ বাছা, কান্না সহর ভাল জায়গা নয়। তোমার অন্ন বরস। বাড়ীর বাহিরে কখনো বাহির হইয়ো না। গঙ্গারান-বিবেকদর্শনে আমি এখন বাইব, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব।”

কমলা পাছে দৈবাৎ হাতছাড়া হইয়া যায়, নবীনকালী একন্ত তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিলেন। বাড়ালী বেরেবের সঙ্গেও তাহাকে বড়-একটা আলাপের অবসর দিতেন না। দিনের বেলা ত কাজের অভাব ছিল না, সন্ধ্যার পরে একবার কিছুকণ নবীন-কালী তাহার যে ঐশ্বর্য্য, ‘যে গহনাপত্র, যে সোনারপার বাগন, যে সম্মল-কিংখাবের গৃহসম্বল! জ্ঞানের ভয়ে কান্নাতে আনিতে পারেন নাই, তাহারই আলোচনা করিতেন।

‘কাসার থালায় খাওয়া ত কঠোর কোনো-কালে অভ্যাস নাই, তাই, প্রথম-প্রথম এ লইও। তিনি অনেক বকাবকি করিতেন। তিনি বলিতেন, ‘না হয় হাজারখানা চুরি যায়, সেও ভাল, আমার গড়াইতে কতকণ!’ কিন্তু টাকা আছে বলিয়াই যে শোকসান করিতে হইবে, সে আমি কোনোমতে সহ্য করিতে পারি না। তার চেয়ে বরক কিছুকাল কষ্ট করিয়া থাকও ভাল! এই দেখ না, দেশে আমাদের মত বাড়ী, সেখানে শোকসান করতই থাক আসে-যায় না, তাই বলিয়া এখানে কি সাতগুণা চাকর আনা চলে? কতী বলেন, ‘কাছাকাছি না হয় আরো একটা বাড়ী ভাড়া করা যাইবে।’ আমি বলিয়ায়, ‘না, সে আমি পারিব না। কোথায় এখানে একটু আশ্রয় করিব, না, কতকগুলো শোক-জন-বাড়ীঘর লইয়া দিনরাত্রি ভাবনার অন্ত থাকিবে না!’ ইত্যাদি।

৫৬

নবীনকালীর আশ্রয়ে কমলার প্রাপ্তি। ঐদন অন্নজল এঁধো-পুষ্কুরের মাছের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু বাহিরে গিয়া হাঁড়োঁবে কোথায়? সেদিনকার রাতে পুষ্কুরী বাহিরের পৃথিবীকে সে জানিত; সেখানে অন্ততাবে আশ্রয়দ্রব্য করিতে আর তাহার সাহস হয় না। কিন্তু তাহার জীবনটা কি শেষকালে এই বাঁচাটোর মধ্যে আশ্রয়টি চিরদিনের মত আটকা পড়িয়া গেল? এই-কন্ত কি তাহার বাঁচিবার কোনো প্রয়োজন ছিল? প্রতিদিন রাতে ‘যে প্রার্থনা করিয়া সে বিছানার শেষ, প্রতিদিন প্রাতে যে

আশা করিয়া সে আগিয়া উঠে, এখানে এমন করিয়া বড় হইয়া থাকিলে কি তাহা সিদ্ধ হইবার কোনে! সম্ভাবনা আছে? কমলার এখন অল্পবয়স, এখনো কতদিন তাহাকে বাঁচিতে হইবে কে জানে,—কিন্তু তাহার অবশিষ্ট জীবনের প্রত্যেক দিনই যদি এমনি করিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কাটিতে থাকে, তবে আর কেন? কিন্তু মরিতেও কিছুতেই ঐশ্বর্য হয় না—এতদিন সে যে এক হুঃখে বাঁচিয়া আসিয়াছে, তাহার সার্থক পরিণাম হইতে যদি সে বঞ্চিত হয়!

নবীনকালী যে কমলাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে রস ছিল না। হুই একদিন অসুখ-বিস্রুতের সময় তিনি, কমলাকে ঘরও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বস্ত্র ক্রতজতার সহিত গ্রহণ করা বড় কঠিন। বরঞ্চ সে কাজকর্মের মধ্যে থাকিত ভাল, কিন্তু যে সময়টা নবীনকালীর সখীয়ে তাহাকে বাপন করিতে হইত, সেইটেই তুর্য্যক্ষে সব চেয়ে হুঃসময়।

কর্তা মুকুন্দলালবাবু প্রত্যহ সকালে শিথিল একখানি তেলভূঁতি পরিয়া রোডে রাস্তার ধারে এক মোড়া গইয়া বসিতেন এবং প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক ধরিয়া একজন হিন্দুস্থানী চাকর তেল মাখাইতে মাখাইতে তাঁহার ঝুল-ঝুল দেহকে নানা প্রকারে স্পর্শে দলন, মর্দন, তাড়ন করিত;—সমুখে আর একটা মোড়ার উপর তাঁহার গড়গড়া থাকিত, তাহারই নশট্রা মুখে লাগাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ধুম আকর্ষণ করিতেন—এই বিরাট ভূতটি একদিন রাস্তার লোকে দেখিতে পাইল না। সেদিন সকালবেলা নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া কহিলেন,

“ওগো, ও বাবুনচাকর, আজ কর্তার শরীর বড় ভাল নাই, আজ ভাত হইবে না, আজ কটি। কিন্তু তাই বলিয়া একরাশ খি লইয়ো না! জানি ত জোয়ার রাস্তার দ্বি, উহাতে এত খি কেমন করিয়া খরচ হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। এর চেয়ে সেই যে উড়ে-বাবুনটা ছিল ভাল—সে খি লইত বটে, কিন্তু রাস্তার ধিরের খাদ একটু-আধটু পাওয়া বাইত।”

কমলা এ সমস্ত কথার কোনো জবাবই করিত না। ঘেন শুনিতে পার নাই, এমনিভাবে নিঃশব্দে সে কাজ করিয়া বাইত।

আজ অপমানের গোপনভায়ে আক্রান্ত-জন্ম হইয়া কমলা চুপ করিয়া ভরকারি কুটিতেছিল—সমস্ত পৃথিবী বিরল এবং জীবনটা হুঃসহ বোধ হইতেছিল, এমন-সময় গৃহিণীর ঘর হইতে একটা কথা তাহার কানে আসিয়া কমলাকে একেবারে চাকিত করিয়া তুলিল। নবীনকালী তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিতে-ছিলেন, “ওরে তুলসি, যা ত, সহর হইতে নলিনাক-ডাক্তারকে নীচ ডাকিয়া আন। বল, কর্তার শরীর বড় খারাপ।”

নলিনাক-ডাক্তার! কমলার চোখের উপরে সমস্ত আকাশের আলো আবর্তবীণার স্পর্শদ্বার মত কাঁপিতে লাগিল। সে ভরকারি-কোটা ফেলিয়া ঘরের কাছে আসিয়া পাড়াইল। তুলসী নীচে নামিয়া আসিতেই কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় বাইতেছিল তুলসি?” সে কহিল, “নলিনাক-ডাক্তারকে ডাকিতে বাইতেছি।”

কমলা কহিল—“সে আবহাওয়া কোন্ ডাক্তার?”

তুলসী কহিল “তিনি এখানকার একটি বড় ডাক্তার বটে।”

কমলা- তিনি থাকেন কোথায় ?

তুলসী কহিল “সহরেই থাকেন, এখান হইতে আধক্রোশটাক হইবে।”

আহারের সামগ্রী অল্পবল বাহ্যিকিছু বাঁচাইতে পারিত, কমলা তাহাই বাড়ীর চাকরবাকরদের ভাগ করিয়া দিত। একত্র সে তৎসনা অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এ অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। বিশেষতঃ গৃহিণীর কড়া আইন অনুসারে এ বাড়ীর লোকজনদের খাবার কষ্টে অভ্যস্ত বেশি। তা ছাড়া কর্তা-গৃহিণীর খাওয়াতে বেলা হইত—ভৃত্তোত্তা তাহার পরে খাইতে পাইত। তাহার বধন আদিয়া কমলাকে জানাইত, “বানুন-ঠাকরুণ, বড় সুখা পাইয়াছে,” তখন সে তাহাদিগকে কিছু-কিছু খাইতে না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারিত না। এমনি করিয়া বাড়ীর চাকরবাকর হুইদিনেই কমলার একান্ত বশ মানিয়াছে।

উপর হইতে রব. আসিল, “ব্রাহ্মণদের দরবার কাছে দাঁড়াইয়া কিসের পরামর্শ চলিতেছে যে তুলসী! আমার বৃষি চোখ নাই মনে করিস্! সহরে বাইবার পথে একবার বৃষি ব্রাহ্মণের না দাঁড়াইয়া গেলে চলে না। এমনি করিয়াই জিনিষপত্রগুলো সরাইতে হয় বটে! বলি, বানুনঠাকরুণ, ব্রাহ্মণ পড়িয়া ছিলে, দয়া করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিলাব, এমনি করিয়াই তাহার শোধ তুলিতে হয় বৃষি!”

সকলেই তাহার জিনিষপত্র ছুরি করি-তেছে, এই সময়ে নবীনকালীকে কিছুতেই

ভাগ করে না। যখন প্রমাণের লেশমাত্রও না থাকে, তখনো তিনি আশ্বাসে তৎসনা করিয়া লন। তিনি বৃষির কুরিয়াছেন যে, অল্পকাল্রে ঢেলা মারিলেও অধিকাংশ ঢেলা ঠিক কাগদের গিয়া পড়ে, আর তিনি যে সন্দেহা সতর্ক আছেন ও তাঁহাকে কীকি দিবার জো নাই, ভৃত্তোত্তা ইহা বুঝিতে পারে।

আজ নবীনকালীর তীব্রবাক্য কমলার মনেও বাজিল না। সে আত্ম কেষল কলের মত কাণ করিতেছে, তাহার মনটা যে কোনোখানে উধাও হইয়া গেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

নীচে ব্রাহ্মণদের দরবার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন-সময় তুলসী কিরিয়া আসিল, কিন্তু সে একা আসিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল—“তুলসী, কই ডাক্তারবাবু আসিলেন না?”

তুলসী কহিল “না, তিনি আসিলেন না।”

কমলা। কেন?

তুলসী। তাঁহার মূর অস্থির করিয়াছে।

কমলা। মূর অস্থির? ঘরে আর কি কেহ নাই?

তুলসী। না, তিনি শু বিবাহ করেন নাই।

কমলা। বিবাহ করেন নাই, তুই কেমন করিয়া জানিলি?

তুলসী। চাকরদের মুখে শু শুনি, তাঁহার জী নাই।

কমলা। হয় শু তাঁহার জী মারা গেছে।

তুলসী। তা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চাকর ব্রজ বলে, তিনি যখন রংপুরে

ডাকারি করিতেন, তখনো তাহার জী ছিল না ।

উপর হইতে ডাক পড়িল—“তুলসি !”—
কমলা ডাকাডাকি রাণাবরের মধ্যে ঢুকিয়া
পড়িল এবং তুলসী উপরে চলিয়া গেল ।

মলিনাক্ষ—সংগুরে ডাকারি করিতেন—
কমলায় মনে আর ত কোনো সন্দেহ নাই ।
তুলসী নামিরা আসিলে পুনরায় কমলা
তাঁহাকে বিজ্ঞাপা করিল—“দেখ তুলসি,
ডাকারাবাবু নামে আমার একটি আখ্যায়
আছেন—বল দেখি, তিনি ব্রাহ্মণ ত বটেন ?
তুলসী । হাঁ, ব্রাহ্মণ, চাটুযো ।

গৃহিণীর দৃষ্টিপাতের ভয়ে তুলসী বাবুন-
ঠাকরুণের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে
সাহল করিল না । সে চলিয়া গেল ।

কমলা নবীনকালীর নিকট গিয়া কহিল
—“কাজকর্ম সমস্ত সারিয়া আজ আমি
একবার দশাবধেখাটে স্থান করিয়া
আসিবে ।”

নবীনকালী । তোমার সকল অনাস্থি ।
কর্তার আজ অস্থখ,—আজ কখন কি দরকার
হয়, তাহা বলা যায় না—আজ তুমি গেলে
চলিবে কেন ?

কমলা কহিল—“আমার একটি আপনার
গোক কলিতে আছেন ববর পাইয়াছি,
তাঁহাকে একবার দেখিতে বাইব ।”

নবীনকালী । এ সব ভাল কথা নয় ।
আমার কথোট বরস হইয়াছে, আমি এ সব
বুঝি । ববর তোমাকে কে আনিয়া দিল ?
তুলসী বুঝি ? ও ছোঁড়াটাকে আর রাখা নয় ।
শোন বলি বাবুনঠাকরুণ, আমার কাছে
যতদিন আছে, যাতে একলা স্থান করিতে

বাওয়া, আত্মারের সন্ধানে সহরে বাহির
হওয়া, ও সমস্ত চলিবে না, তাহা বলিয়া
রাখিতেছি ।

দরোয়ানের উপর হুকুম হইয়া গেল,
তুলসীকে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেওয়া
হয়, সে যেন এ-বাড়া-ঘুরো হইতে না
পারে ।

গৃহিণীর শাসনে অত্যন্ত চাকরেরা কমলায়
সংগ্রহ বশাস্তব পরিতাপ্য করিল ।

মলিনাক্ষসবকে যতদিন কমলা নিশ্চিত
ছিল না, ততদিন তাহার ধৈর্য ছিল ;
এখন তাহার পক্ষে ধৈর্যরক্ষা করা
দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল । এহ নগরেহ তাহার
স্বামী রহিয়াছেন, অথচ সে একমুহূর্ত্তও যে
অস্ত্রের বরে আশ্রয় লইয়া থাকিবে, ইহা
তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল । কাজকর্মে
তাহার পদে পদে ত্রুটি হইতে লাগিল ।

নবীনকালী কহিলেন—“বলি বাবুন-
ঠাকরুণ, তোমার গতিক ত ভাল দেখি না ।
তোমাকে কি ভুতে পাইয়াছে ? তুমি নিজে ত
বাওয়ারাওয়া বন্ধ করিয়াছ, আমাধিগকেও
কি উপোস করাইয়া যারবে ? আজকাল
তোমার রান্না যে আর সুখে দেবার যো
নাই !”

কমলা কহিল—“আমি এখানে আর
কাজ করিতে পারিতেছি না—আমার
কোনোমতে মন টিকিতেছে না । আমাকে
বিদায় দিন !”

নবীনকালী স্বকায় বিরা উঠিয়া বলিলেন
—“বটেই ত ! কলিকালে কাহারো ভাল
করিতে নাই ! তোমাকে দয়া করিয়া
আশ্রয় দিবার ক্ষেত্রে আমার এতকালের অমন

ভাগ বাহুনাটকে ছাড়াইয়া দিলাম, এক-
বার খবরও লইলাম না—তুমি সত্যি বাহুনের
মেয়ে কি না ! আজ তুমি বলেন কিনা,
আমাকে বিদায় দিন ! যদি পালাইবার চেষ্টা
কর ত পুলিশে খবর দিব না ! আমার
ছেলে হাকিম—তার হকুমের কত লোক
ফাঁসি দেছে—আমার কাছে তোমার
চালাকি খাটিবে না ! শুনেইছ ত—গদা
কর্তার মুখের উপরে দাবাব দিতে গিয়াছিল,
সে বেটা এমনি ভয় হইয়াছে, আজো সে
ভেগ্ন খাটিতেছে ! আমাদের তুমি যেমন-
তেরমন পাও নাই !”

কথাটা মিথ্যা নহে—গদাচাকরকে
ঘড়িচুরির অপবাদ দিয়া ছেলে পাঠানো
হইয়াছে বটে !

কমলা কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না ।
তাহার চিরজীবনের সার্থকতা যখন হাত
বাড়াইল সেই পাওরা বার, তখন সেট হাতে
বঁধনপড়ার মত এমন নিষ্ঠুর আর কি হইতে
পারে ! ব্যাকুল পাখী তাহার পিঙ্করের
শলাকাকে যেমন করিয়া আঘাত করিতে
পাকে, কমলায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার
শরীরকে যেন ভেদন করিয়া আঘাত করিতে
লাগিল । কমলা আপনায় কাজের মধ্যে,
ঘরের মধ্যে কিছুতেই আর ত বদ্ধ হইয়া
থাকিতে পারে না । তাহার রাত্রেই কাজ
সেব হইয়া গেলে পর সে ঈতে একখানা
রাগার মুড়ি দিয়া বাগানে বাহির হইয়া
পড়িত । প্রাচীরের ধাক্কা পাড়াইয়া বে
পথ লহরের দিকে চলিয়া গেছে, সেই পথের
দিকে চাহিয়া থাকিত । তাহার যে ভরুণ
হৃদয়খানি সেবার অল্প ব্যাকুল, ভক্তি-

নিবেদনের অস্ত বাস্ত্র আত্মোৎসর্গের কত
উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে—সেই হৃদয়কে
কমলা এই রজনীর নির্জন পথ বাহিয়া
নগরের মধ্যে কোন্ এক অপরিচিত গৃহের
উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিত—তাহার পর অনেক-
কণ শুভ হইয়া পাড়াইয়া তুমি হইয়া এলাম
করিয়া তাহার শরনকন্দের মধ্যে কিরিয়া
আসিত ।

কিন্তু এইটুকু সুখ, এইটুকু বাঁধনতাও
কমলায় বেশিদিন গ্রহিল না । রাজির সমস্ত
কাজ শেষ হইয়া গেলেও একদিন কি কারণে
নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ।
বেহারা আসিয়া খবর দিল, “বাহুনাটকরূপকে
দেখিতে পাইলাম না !”

নবীনকালী বাস্ত্র হইয়া উঠিয়া কহিলেন,
“সে কিরে, তবে পালাইল নাকি ?”

নবীনকালী নিজে সেই রাজে আলো
ধরিয়া ঘরে ঘরে খোঁজ করিয়া আসিলেন,
কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইলেন না ।
মুহূনবাবু অন্ধনিমীলিতনেত্রে শুভ্ৰ-শুভ্ৰ
টানিতেছিলেন—তাঁহাকে গিয়া কহিলেন—
“এম্মো তনুচ, বাহুনাটকরূপ বোধ করি
পালাইল !”

ইহাতেও মুহূনবাবুর শান্তিভঙ্গ করিল
না—তিনি কেবল আলতরুড়িতকণ্ঠে কহি-
লেন—“তখন ত বারণ করিয়াছিলাম—
জানামোনা লোক নয় । কিছু সন্ধানিয়াছে
নাকি ?”

গৃহিণী কহিলেন—“সেদিন তাহাকে বে
নীতের কাপড়খানা পরিতে দিয়াছিলাম,
সেটা ত ঘরে নাই, এ ছাড়া আর কি পিয়াছে,
এখনো দেখি নাই ।”

কর্তা অবিচলিত গম্ভীরবরে কহিলেন—

“পুলিসে খবর দেওনা যাক্ !”

একজন চাকর লঠন লইয়া পাথে বাহির হইল। ইতিমধ্যে কমলা তাহার ঘরে কিরিয়া-আসিয়া দেখিল, নবীনকালী সে ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র ভর-ভর করিয়া দেখিতেছেন। কোনো জিনিষ চুরি গেছে কি না, তাহাই তিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-সময় কমলাকে হঠাৎ দেখিয়া নবীনকালী বলিয়া উঠিলেন “বলি, কি কাণ্ডটাই করিলে ? অথবা বাওরা হইয়াছিল ?”

কমলা কহিল, “কাত শেব করিয়া আমি একটুখানি বাগানে বেড়াইতেছিলাম।”

নবীনকালীর মুখে বাহা আসিল, তাহাই বলিয়া গেলেন। বাড়ীর সমস্ত চাকরবাকর দরজার কাছে আসিয়া জড় হইল।

কমলা কোনোদিন নবীনকালীর কোনো ভৎসনার তাহার সম্মুখে অশ্রবণ করি নাই। আগও সে কাঠের মূর্তির মত জড় হইয়া ধাঁড়াইয়া রহিল।

নবীনকালীর বাক্যবর্ষণ একটুখানি কাত হইবামাত্র কমলা কহিল, “আমার প্রতি আপ-নারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন—আমাকে বিদায় করিয়া দিন।”

নবীনকালী। বিদায় শু ক’বই।

তোমার মত অকৃতজ্ঞকে তিরদিন ভাতকাপড় দিয়া পুঁজিব, এমন কথা মনেও করিবে না ! কিন্তু কেমন লোকের হাতে পড়িয়াছ, সেটা আগে ভাল করিয়া জানাইয়া তবে বিদায় দিব।

ইহার পর হইতে কমলা বাহিরে যাইতে আর সাহস করিত না। সে ঘরের মধ্যে

যায় কড় করিয়া মনে মনে এই কথা বলিল—

“যে লোক এত দুঃখ সহ্য করিতেছে, তগবান্ নিশ্চয় তাহার একটা গতি করিয়া দিবেন।”

৫৭

মুকুন্দবাবু তাহার ছুইটি চাকর সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ীতে এবেশের দরজার ভিতর হইতে হড়কা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ঘরের কাছে রব উঠিল—“মুকুন্দবাবু ঘরে আছেন কি ?”

নবীনকালী চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“ঐ গো, নলিনাক-ডাক্তার আসিয়াছেন ! বুঝিয়া ! বুঝিয়া !”

বুঝিয়ানামধারিণীর কোনো লাড়া পাওয়া গেল না। তখন নবীনকালী কহিলেন—“বামুনঠাকরুণ, বাও ত, শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও গে। ডাক্তারবাবুকে বল, কর্তা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, এখন আসিবেন—একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।”

কমলা লঠন লইয়া নীচে নামিয়া গেল,— তাহার পা কাঁপিতেছে, তাহার বুকের ভিতর গুরুগুরু করিতেছে, তাহার করতল ঠান্ডা হিম হইয়া গেল। তাহার ডর হইতে লাগিল, পাছে এই বিবম ব্যাকুলতার সে চোখে ভাল করিয়া দেখিতে না পারে।

কমলা ভিতর হইতে হড়কা পুলিয়া-দিয়া ঘোমটা টানিয়া কপাটের অন্তরালে ধাঁড়াইল।

নলিনাক ভিজাসা করিল—“কর্তা ঘরে আছেন কি ?”

কমলা কোনোমতে কহিল—“না, আপনি আমুন।”

নলিনাক বাঁধবার ঘরে আসিয়া বলিল।

ইতিমধ্যে বুঝিয়া আসিয়া কহিল “কর্তব্যার্থে
বেড়াইতে গেছেন, এখন আসিবেন, আপনি
একটু বসুন।”

কমলার নিখাণ প্রবল হইয়া তাহার বকের
মধ্যে কষ্ট হইতেছিল। যেখান হইতে
নলিনাক্ষকে লষ্টে দেখা যাইবে, অককার-
বারান্দার এমন একটা জায়গা সে আগ্রহ
করিল,—কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। বিপুল
বন্ধকে লাগু করিবার জন্য তাহাকে সেই-
খানে বসিয়া পড়িতে হইল। তাহার হৃৎ-
পিণ্ডের ঢাকণের সঙ্গে ঈশ্বরের হাওয়া যোগ
দিয়া তাহাকে বসুধা করিয়া কাঁপাইয়া
তুলিল।

নলিনাক্ষ কেরোসিন-আলোর পাশে
বসিয়া ব্রহ্ম হইয়া কি ভাবিতেছিল। অককারের
ভিতর হইতে বেশভূষিতী কমলা নলিনাক্ষের
মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে
চাহিতে তাহার হৃৎ চক্রে বারবার জল
আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুচিয়া-
কেলিয়া সে তাহার একাগ্রদুষ্টির দ্বারা
নলিনাক্ষকে যেন আগুনায় অস্তঃকরণের
গভীরতম অভ্যন্তরবেশে আকর্ষণ করিয়া
লইল। এই বেঁ উন্নতলগাট শুদ্ধ মুখখানির
উপরে বীপালোক মুছিত হইয়া পড়িয়াছে,
ঐ মুখ বতই কমলার অস্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও
পরিষ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার
সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারিদিকের
আকাশের সহিত মিলিয়া যাইতে লাগিল;
—বিশ্বজগতের মধ্যে আর কিছুই রহিল না,
কেবল ঐ আলোকিত মুখখানি রহিল—
যাহার সম্মুখে রহিল, সেও ঐ মুখের সহিত
সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।

এইরূপ কিছুক্ষণ কমলা সচেতন কি
অচেতন ছিল, তাহা বলা যায় না—এমন-সময়
হঠাৎ সে চকিত হইয়া—দেখিল, নলিনাক্ষ
চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং
মুহূর্ত্তবাহু গল্গে কবা করিতেছে।

এখনি পাছে উঁহাঙ্গ বারান্দার বাহির
হইয়া আসেন এবং কমলা বরা পড়ে, এই ভয়ে
কমলা বারান্দা ছাড়িয়া নীচে তাহার রান্না-
ঘরে গিয়া বসিল। রান্নাঘরটি প্রাঙ্গণের
এক ধারে—এবং এই প্রাঙ্গণটি বাড়ীর ভিতর
হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথ।

কমলা সর্জাসমনে পুলকিত হইয়া বলিয়া-
বসিয়া ভাবিতে লাগিল, “আমার মত হত-
ভাগিনীর এমন দাবী! দেবতার মত এমন
সৌন্দর্য-নির্মল প্রাঙ্গণ-স্বপ্নের মূর্ত্তি! ওগো ঠাকুর,
আমার সকল দুঃখ লাঞ্ছ হইয়াছে!”

—বলিয়া বারবার করিয়া ভগবানকে
প্রণাম করিল।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার পরদা
শোনা গেল। কমলা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে
ঘরের পাশে দাঁড়াইল। বুঝিয়া আলো
বরিয়া আগে-আগে চলিল, তাহার অন্তরঙ্গ
করিয়া নলিনাক্ষ বাহির হইয়া গেল।

কমলা মনে মনে কহিল—“তোহার
প্রীতিরূপের সেবিকা হইয়া এইখানে পঞ্চম
ঘরে দাসবে আবদ্ধ হইয়া আছি, সমুখ দিয়া
চলিয়া গেলে, তবু জানিতেও পারিলে না।”

মুহূর্ত্তবাহু অস্তঃপুরে আহার করিতে
গেলে কমলা আত্ম-আত্মে সেই বসিবার
ঘরে গেল। যে চৌকিতে নলিনাক্ষ বসিয়া-
ছিল, তাহার সম্মুখে ভূমিতে লগাট ঠেকাইয়া
সেখানকার ধূলি চুবন করিল। সেবা

করিবার কোনো অবকাশ না পাইয়া
অবশ্য তক্তিতে কমলার দ্বয় কাতর হইয়া
উঠিয়াছিল ।

পরদিন কমলা সংবাদ পাইল, বাহু-
পরিবর্তনের, অস্ত্র ডাকারবাহু কর্তাকে
অবুঝ পশ্চিমে কান্নায় চেয়ে বাহ্যকর
স্থানে বাইতে উপদেশ করিয়াছেন । তাই
আজ হইতে বাহার আয়োজন আরম্ভ
হইয়াছে ।

কমলা নবীনকালীকে গিয়া কছিল,
“আমি ত কান্না ছাড়িয়া বাইতে পারিব
না।”

নবীনকালী। আমরা পারিব, আর
তুমি পারিবে না ! বড় তক্তি দেখিতেছি !

কমলা। আপনি বাহাই বন্দু, আমি
এখানেই থাকিব ।

নবীনকালী। আজ্ঞা, তা কেমন থাক,
মেথা বাইবে !

কমলা কহিল—“আমাকে দয়া করুন,
আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন না !”

নবীনকালী। তুমি ত বড় ভয়ানক
লোক দেখিতেছি ! ঠিক যাবার সময় বাহ্যনা
ধরিলে ! আমরা এখন তাড়াতাড়ি লোক
কোণার খুঁজিয়া পাই ! আমাদের কাজ
চলিবে কি করিয়া !

কমলার অনুনয়-বিনয় সমস্ত বার্থ হইল—

কমলা তাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া
ভগবানকে ডাকিয়া কামিতে লাগিল ।

ক্রমশ ।

পথে ।



তখন শুক্লী উঠা—বাহিরিহু পথে ;
কোট' কোট' করে আগো,
সরিছে আঁধার কালো,
পানী ডেকে উঠে, নিশি বাপি' কোনমতে ।
বাহিরিহু পথে !

২

আকাশে উথলি উঠে নব রবিছটা ;
মেঘে মেঘে দীপ্ত হাসি—
অলস অনলরাশি !
বিবল খুলিয়া মেছে বর্ষময় জটা—
কি উজ্জল ঘটা !

বাড়িছে দিনের দাহ ; আগে ভাগে পথ ;
কোথা শুক্কায়াতলে,
কোথা মক-অগ্নি জলে ;
নাহি শেষ—নাহি সীমা, চলি' অবিরত—
অক্লান্ত পথ !

৪.

আমি ত একক'নহি—আরো কতজন,
কেহ কাহে—কেহ আগের,
চলিয়াছে অসুরাগে !
নাহি জানে কোথা যাবে, কোথ'নিকেতন—
নাহি নিরুপণ !

যলিতে পার কি “পথ কোথা হ’বে, নেব ?”

টুটে আসে পারে বল,

তবু বলে “চল-চল” ;

পিপাসার শুষ্ক কণ্ঠ—নাচি সবে ক্রেশ !

কোথা পথ-নেব !

শিখিল খসিয়া, পড়ে বাহর বকুন !

• কাছে-কাছে ছিল থেই,

দেখি আর কাছে নেই !

নিঃসঙ্গ চলিতে হ’বে পথে একাকন—

সুধিয়া নকন !

কেহ গিছে প’ড়ে থাকে—কেবা তারে চায় ?

আগে-ভাগে পথ বাহি,

কে দাঁড়ায় গিছে চাহি ?

তবু পথ চলিয়াছি—না জানি কোথায় ?

বেলা বেড়ে যায় !

ক্রমে বেলা প’ড়ে আসে, পথ না জুয়ায় !

তবু পথ চলিয়াছি,

তবু আগে চেয়ে আছি ;

ছাড়া করি’ আসে সন্ধ্যা, রবি ভূঁবে যায় ;

চ’লেছি কোথায় !

এই পরিচয় পথে, দেখা নাহি আর !

তকার কণ্ঠের মালা,

থাকে কণ্ঠকের আলা,

থাকে স্মৃতি—আর থাকে অনন্ত অপার

পথ হুনিবার !

সম্মুখে স্রোতের দীর্ঘ আগর রজনী !

চিরু অমৃতীর্ণ পথ,

প’ড়ে অলগরবৎ !

“আর কতদূর ?”—হেথা হুধাই আপনি,

মনে ভর গদি !

ত্রিগিরিজানাম মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

রাজা রামমোহন রায় ।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে স্পষ্ট বিষয় ও চক্ৰিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাঁহার রচিত বাঙলা গল্প অসম্পূর্ণ ও অপ্রস্তুত। উহার অর্থ হ্রস্ব, বিস্তৃতিবিধান, সঙ্গনামপ্রয়োগ ও ক্রিয়া-সংস্থান কতকটা উদ্ভট। বিশেষতঃ বিরাট-চিহ্নবিহীন হওয়াতে রচনা নিত্যই এটল ও বিরক্তিকর এবং অর্থবোধ একান্ত দুঃখ-পূর্ণ হইয়াছে। ওপাতি সেই রচনার মত উন্নত ও মূল্যবান সামগ্রী বঙ্গভাষার অন্তর্কিছু বিদ্যমান হইয়া নাই। প্রত্যেকটি ছন্দে যে তীক্ষ্ণ ধী, যে অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তিবল গুণ হইবে, তাহা অনন্তসাধারণ-সম্পন্ন। তিনি বেদান্তসূত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন “এ ভাষার গম্ভীরে অস্ত্রাপি কোন শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে নাই, ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রসূত চাইতিন বাক্যের অর্থ করিয়া হঠাৎ অর্থবোধ করিতে পারেন না।” সুতরাং এই গল্পরচনার বোধসৌকর্য্যার্থে রামমোহন রায়কে একটা “অস্থানপ্রকরণ” লিখিতে হইয়াছিল। তদ্বাধ্য লিখিত হইয়াছে—“বাক্যের প্রাপ্ত অর্থ সমাপ্ত

এই ছত্রের বিবেচনা বিশেষতঃ করিতে উচিত হয়। বাবৎ ক্রিয়া না পাঠবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অব চেষ্টা করিবেন না।” এইরূপে বহু নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বাঙলাগম্ভীরে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। স্বয়ং কাঠ কাটিয়া ও শাউ চকাইয়া যে বাণা গঠন করিয়াছেন, তাহার বাস্তব কতকটা উদ্ভট হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা যে ব্রহ্মকীর্তন করিয়াছেন, তাহাতে দেবদেব বাণানিঃসৃত পরলংকার খানক ও পুণ্ডিত্য পাওয়া যায়। উপায়ের তুচ্ছতা পূর করিয়া, উপায়কে নবভাবে সৃষ্ট ও বলসম্পন্ন ক্রিয়া তিনি কখনোই অগ্রসর হইয়াছিলেন, অবস্থা তাহার অন্তরায় হয় নাই—শক্তিশালী মহাজনগণের পক্ষে কোনকালেই তাহা হয় না।

যে কয়েকখানি সূত্রপুস্তকে তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষার কীর্তিচিহ্ন। অধিগণের কথা নইয়া তিনি নিজে অধির স্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাহা এই বৃৎ, বিশেষতঃ বঙ্গ-দেশ হইতে আসিয়া প্রত্যাশা করি নাই।

তৎকৃত এক এক ছাত্র বাধ্য: করিতে এক-
 একখানি -পুস্তকগ্রন্থের প্রয়োজন; এত
 সাক্ষিপ্ত, অথচ পরিপূর্ণ-অর্থবাহক, একপ উন্নত
 অঙ্গুষ্ঠির পরিচায়ক কিছু এপর্যন্ত বঙ্গভাষায়
 নিবিষ্ট হইয়া নাই। তাহারা মনে করিবেন,
 রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম নিদৈনিকার
 প্রভাবান্বিত, তাহাদিগকে আমরা তাহার
 বাঙলা গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অহুরোধ করি।
 কথিবাক্যের প্রতি তাহার অগৌরব প্রকা ছিল,
 তিনি ধীর ও প্রশান্ত ভাবে কথিবাক্যের
 সার্থক করিয়াছেন, নৈদৈনিক নানা ভাষার
 প্রোক্ত হইয়াও তিনি সনাতন বৈদান্তিক
 ধর্মেরই প্রোক্ত উপলক্ষি করিয়াছিলেন, এবং
 আত্মবিশ্বাস হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম কি, তাহাই
 বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দিক
 হইতে তাহার প্রতি দ্বেষ, বিক্রম, বিরোধ
 ও মৎস্যভার বান নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—কিন্তু
 তাহার অপূর্ণ ধৈর্য ও শাস্ত-সমাহিত
 সহিত্বতা কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। শত্রুর
 চাৎকার ও আত্মদমনে কিছুনার বিচলিত
 না হইয়া পিতা বেক্রম তাহাকে বিপদ হইতে
 রক্ষা করিয়া-অতি সম্ভরণে সংপথে আনিতে
 বস্ত্র করেন,—বিষেবিগলের প্রতি তিনিও
 সেইরূপ ঐকান্তিক কক্কাগর সহিত অগ্রসর
 হইয়াছেন। কোলাহলের উত্তর দিতে
 বাইরা নিজে কোলাহল করেন নাই,
 তাই তাহার প্রোক্তত্তরগুলিতে উন্নতত্তর
 নৈতিকরাম্যের ক্ষমা অক্ষরিত হইয়া
 রহিয়াছে।

যিনি নিজে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া-
 ছেন, তিনি কেনই বা নিজে উদ্ভাস্ত
 হইবেন? তাহা হইলে অসামান্য মনোবৃত্তি

স্বয়ং পরের ভ্রমপ্রদর্শন তাহার পক্ষে
 সম্ভবপর হইত না। যে যুগ-গর্জন,
 আত্মদমন, এমন কি, মনঃ সংগে অদ্বিতীয়
 বাহ্যিক ভিত্তি কোন তর্কেই চূড়ান্ত নিশ্চিতি
 হইত না, সেই যুগে রামমোহনের এক
 অসামান্য সৌম্যভাব! অতি তুচ্ছ কথা লইয়া
 বিরোধী লোকেরা তাহাকে গালি দিয়াছে,
 তিনি সেই সকল তুচ্ছ কথা এমন গম্ভীরভাবে
 উত্তর দিয়াছেন যে, আপনারা আত্মবিশ্বাসিত
 হইবেন, তিনি সে সকল কথার কর্পণ
 করিলেন কেন? তাহার বৈদান্ত্যের
 ভূমিকা হইতে পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি—
 “তিনিতে পাই যে, কোনো কোনো ব্যক্তি
 কহিয়া থাকেন, তোমরা ব্রহ্মোপাসক,
 তবে শাস্ত্রপ্রমাণে সকল বস্তুকে ব্রহ্মবোধ
 করিয়া পদ-চন্দন, শীত-উষ্ণ, চোর-সাপ, এ
 সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর—ইহার
 উত্তর বেদান্ত্যের ভাষাবিবরণের ২২
 পৃষ্ঠার লেখা গিয়াছে যে, বশিষ্ঠ, পরাশর,
 সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ
 হইয়াও নৌকিকজ্ঞানে তৎপর ছিলেন,
 আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়া-
 ছিলেন, তাহা যোগবিশিষ্ট-মহাত্ম্যতাবি
 গ্রহে স্পষ্টই আছে। তদবস্থানুসারে, অর্জুন যে
 গৃহস্থ, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা
 আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং-অর্জুনও ব্রহ্মজ্ঞান
 প্রাপ্ত হইয়া নৌকিকজ্ঞানশূন্য না হইয়া
 ব্রহ্ম তাহাতে বেশী পটু হইয়া কার্যাদি
 সম্পন্ন করিয়াছিলেন।” আর এক স্থলে—

“মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর
 সকল লোকের মত যাহা হয়, তাহা তাগ
 করিয়া হইএক ব্যক্তির কথা গ্রহণ কে

করে, আর পূর্বে কেহ কি পণ্ডিত ছিলেন না এবং অতঃপূর্বে কি সংসারে পণ্ডিত নাই যে, তাঁহারাই এই মতকে জানিলেন না।" অপর কেহ হইলে এ সকল কথা উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু রামমোহন সহিষ্ণুতাধর্ম্যাদার সহিত ইহুরও এই উক্তির দ্বিগুণেছেন, "এই সকল প্রশ্ন প্রবণে কেবল মানস ভ্রমের মধ্যে, তত্রাপি কার্য্যাত্মকভাবে উত্তরদিয়া বাইতেছি। প্রথমতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নিদারণ করিয়াছি এবং ঐতর্য্যাক্ত করিতেছি, তাহার বিস্তৃতি অংগের এক অংশ এই হিন্দোস্থান, না হই, হিন্দুই যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন, তাহাকে হিন্দোস্থান কথা বার এই হিন্দোস্থান অর্থেই হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরন্তর পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন— এই হিন্দোস্থানেও শাস্ত্রোক্ত নির্বাণসম্প্রদায়, নানকসম্প্রদায়, দাহনসম্প্রদায় এবং শিবমতাদির উপাসনা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তবে ক্রিয়াক্রমে কহেন যে, তাহাও পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়।" এই বিনয় ও সহিষ্ণুতা এবং লোকশিক্ষার অতি চক্ষুণ আভিযোগকেও বুঝাইবার জন্য একজন আভিগণ্য পণ্ডিত, তাহার বিবাহতেজ্ঞা সপ্রমাণ করিতেছে। অথচ যে স্থানে তর্ক-নিপুণ শাস্ত্রনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিবৃতি পাড়াইয়াছেন, সে স্থানে রামমোহনের লেখনী হইতে লোকপাবনী পদার্থাদির দ্বারা শাস্ত্রের যে সুনির্মল বাখ্যা ও অকৃত পাণ্ডিত্যপ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে সন্দেহে প্রত্যাহতই সপ্রমাণ নমস্তারপ্রসূতি

জাগিয়া উঠে। কোন অটল গিরিশিখর হইতে যেজন "নির্মল" প্রোত পতনুপ্রোত প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে সজীবিত করিয়া তুলে, তাহার "লোকসমুদয়কে জীবিত" বিত্তে শাস্ত্রবাখ্যার হিন্দুসমাজ যেন সেই-জন নবপ্রাণ লাভ করিয়াছিল।

আর একটি কথা এই, তাহার অসাধারণ বুদ্ধিবল সমুদায় শাস্ত্রের অঙ্গমণী হইয়া চলিয়াছে। যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা কোন আভিবিবেচকের উন্নতিকল্পে গ্রন্থ লিখেন নাই,—বিবাহতেজ্ঞার প্রেরণায় অক্ষয় সত্য-গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন সমর্থনে প্রোত লক্ষ্য রাখেন নাই—সর্বকালে যে কথা বিবাহিত,—যে সুধাময় বাক্য আত্ম ও আত্মের চিরকাল চতুর্বাঙ্গ পুনরাবর্তন করিবে, সেই সকল সনাতন বাণী বাহাদুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি বাস্তবিক হইয়া এই হিন্দু-স্থানের কোন্ বাক্য সাধু বলিয়া গণ্য হই-বেন ? রামমোহন অসাম প্রকার সহিত অঙ্গদগুণ স্বভিগণের বাক্যের অঙ্গদগুণ করিয়াছেন। যে স্থানে তিনি স্ববিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাও প্রাচীনতর ও যোগ্যতর স্ববিবাক্যের বলে; বহা অক্ষিরা, হারীত প্রভৃতির বাক্য তিনি মন্থর বাক্যদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ বেদে আছে—
যৎকিঞ্চিৎ মন্থরবদন্তি তেবমহ—
এবং বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

মহর্ষিবিপরিভাঙ্গা না বৃতির্ভিঃ প্রস্তুতঃ।

এই মহোদয়ের অসামান্য পাণ্ডিত্য, বিনয় ও শাস্ত্রপ্রমাণ সহ ব্যাখ্যাতে অকটো-যুক্তির 'মোহিনী' বিবেচনাও দীর্ঘকাল

অতিক্রম করিতে পারেন না। তাহার সহমরণসম্বন্ধে প্রস্তোত্তর ও প্রবচনাবলী পাঠ করুন। সহমরণ এক ভীষণ নিৰ্ঘম অথবা একজন সহমরণ অশাস্ত্রীয়, ইহাই প্রমাণ করিতে তিনি অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু যুক্তির প্রাধান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অনাস্থা প্রদর্শন করিলে এই কবিশাসিত ভারতীয় সমাজে কে তাঁহার কথা শুনিতে দাঁড়াইত ? বাহ্যিক শত শত শ্লোক লইয়া প্রতিপক্ষতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গ সহস্র শ্লোকের দ্বারা পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। সহমরণ এবং অশাস্ত্রীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তোত্তর ও সন্দর্ভগুলি পর্যালোচনা করিলে আর একটি বিষয়ের প্রতি স্বতই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। রামমোহন, প্রতিপক্ষের স্বতন্ত্রকার যুক্তি, তাহার সমস্তগুলি উল্লিখিত করিয়াই শাস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। সচরাচর এক্ষণে দৃষ্ট হয় যে, কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা প্রতিপক্ষের অপেক্ষাকৃত দুর্বল যুক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে আড়ম্বরের সহিত সমাজে আঘাত করিয়া সমস্তস্থাপনের চেষ্টা পাই—অনেক সময়েই অপেক্ষাকৃত প্রবল যুক্তিগুলির পাশ কাটাইয়া যাই। কিন্তু রামমোহনের আলোচনার পরিদৃষ্ট হয় যে, প্রতিপক্ষের সুস্বতন্ত্র যুক্তিগুলিকেই তিনি বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন।—স্বতন্ত্রকারে তাঁহার সমস্ত-সমর্থনের চেষ্টা পাইতে পারেন, তত-প্রকারেই তিনি তাঁহাদের যুক্তিগুলিকে খুঁটি ধরিয়া আলোর সম্মুখে আনিয়াছেন এবং

যে শাস্ত্রভিত্তিক উপর তাঁহার দাঁড়াইবার স্পষ্টা করিয়াছেন, শাস্ত্রের অমূল্যসমুদায়ই তাহাদিগকে সে-আশ্রয়-বিচ্যুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে একমিকে তাঁহার প্রতিভার উদার ও নিতীক প্রেক্ষ, অপর দিকে তাঁহার উদ্বেগ ও কার্যপ্রণালীর সাধুতা সপ্রমাণ করিতেছে।

যে অমৃতময়, তেমোময় পুরুষের পরণ লইয়া তিনি ভক্তিসহকারে বেদান্তের অমূল্যলন করিয়াছেন, সেই নির্মলকায় পুরুষের পরম সৌম্যভাবের আভাস তাঁহার চরিত্রে পড়িয়াছিল, এইজন্য তিনি জগতের শিক্ষকরূপে পূজা পাইবার যোগ্য। তিনি কবিগণের যোগ্য বংশধর এবং প্রকৃতভাষ্যরূপে সমাজের বরপুত্র। সত্যকথা বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল, সত্য প্রমাণ করিবার যোগ্য পাণ্ডিত্য তাঁহার ছিল, সত্য চরণে মুগ্ধিত করিয়া দিবার যোগ্য বিশ্ববিস্তার প্রীতি ও বিনয় তাঁহার ছিল। তিনি একশটি ভাবা জানিতেন, ইহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার অঙ্গ-মাত্র অধিকার লম্বিয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই বিশ্বয়, সত্য ও উজ্জ্বল পূর্ণ অমৃতবাদের কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িতেন। কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজপণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—“যদি প্লেটো বা সফোক্লিস, মিন্টন্ বা নিউটন্ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে বেদন মনের ভাব হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া আমি রাজা রামমোহন দ্বারের অভ্যর্থনার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেছি।” এই অসামান্য লোকটিকে দেখিয়া ইংরেজপণ্ডিত জাতীয় স্পষ্টা ও বৈদ্যম্য, সকলই কুলিয়া

আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন । বিবাহে তিনি যে সকল তরুণ যোগদান করেন, তাহাতেও তাঁহার শাস্ত্র-সমাহিত জীব, বুদ্ধির তীক্ষ্ণ-বৈশিষ্ট্য সর্বত্র বিশ্বাসের উত্তরক করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ Robert Owen সাহেব *তর্কে পরাক্রম হইয়া ফুট ও উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । তৎসময়ে যেহি কনুপেন্টার লিখিয়াছেন—“Robert Owen রাজাকে তাঁহার সামাজিক ও রাজ-নৈতিক সাদ্বাস্যে দাক্ষিণ-প্রবর্তিত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার যুক্তির অসামান্য প্রখরতা ও আমাদের তাহার তাঁহার বিশ্বাসের অধিকার Robert Owen-এর সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করিয়া দিল, Robert Owen পরাক্রম হইয়া রাগিয়া উঠিলেন । তাঁহার স্রাব ধীর ও শান্ত ব্যক্তির এমন অধারতা আমি আর কখনও দেখি নাই, কিন্তু রাজা রামমোহন তাঁহার প্রতি কোন অশ্রদ্ধাযুক্ত কিংবা অধীর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই ।”

এই প্রশ্ন “ও অনির্কটনীর গাভীরা কোথা হইতে আসিল ? তাঁহার বিরুদ্ধে কতপ্রকার বিজ্ঞপ, তাচ্ছল্য ও রক্তবাক্য প্রযুক্ত হইত, তাহা তাঁহার সাধুত্বের বর্ণে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া বাইত,—তীক্ষ্ণতা হারা হইয়া কেদিত, কিছুতেই তিনি বিচলিত হইতেন না । তিনি যে সমাজে গিয়াছেন, সেইখানে অপরাধের সকল শিক্তির মত হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার প্রবীণ বুদ্ধি, পাতিভা ও হিতসকল, সকলের নিকট হইতে নিজের প্রাপ্য মর্যাদা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যেন সবলে আদায় করিয়া লইয়াছে । যে দেশে কশিল, শকর ও বুড়দেবের আবি-

র্ভাব হইয়াছিল, সেই দেশই যেন রামমোহনের জন্মভার প্রকৃত স্থান বলিয়া মনে হয় ।

এতদেবীষপণের সঙ্গে তর্কের সমর তিনি সর্বদা শাস্ত্রোক্ত মতের-বারা বীর যুক্তির গোষকতা করিতেন, কিন্তু স্রীলোকটির প্রতি সমুচিত সম্মানের অভাব দেখাইয়া বাহারা সম্মরণপ্রথা সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তাহাদের জন্য তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করা ততটা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই । তাঁহার যুক্তিগুলি কেমন পত্তীর্ণভাবে ও অমলকথার ব্যস্ত হইত এবং নাস্ত্রীলোকটির প্রতি তাঁহার কি অপূর্ণ তক্তি ছিল, তাহা নিয়ে উক্ত উত্তরপ্রস্থান্তরে পাঠক বিমিত হইবেন —

“প্রতিদেবী।—স্রীলোককে বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার মতাব্য কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাং করিবারে আগ্রহের কারণ যে, স্রীলোক স্বভাবত অমবৃত্তি, অবিবাহিত, বিবাহের অপার, সাহুবাগা এবং ধর্মজান-পূজা হয় । বামীর পরলোক হইলে পর শাস্ত্রানুসারে পুনরায় বিবাহের বিবাহ হইতে পারে না—এককালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাপ হই, অতএব এপ্রকার ওর্ভাগা যে বিবাহ, তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ । যেহেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্যের অগ্রধানপূর্বক শুভভাবে কালব্যাপন করা অত্যন্ত দৃষ্টি, সুত্তরাং সৌমর্য না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা—বাহাতে কুলজন্মের কলঙ্ক জন্মে ।

রামমোহন ।—স্রীলোকেরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় নান-ইয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে ওর্কল

কানিয়া যে যে উত্তম পদবার প্রাপ্তিতে তাহার স্বভাবতঃ যোগ্য। ছিদি, তাহা হইতে উদ্বাসিতকৈ পূর্ণাপের বঞ্চিত করিয়া আসিতে-
ছেন—পরে কছেন যে, স্বভাবতঃ তাহার। সেই পদপ্রাপ্তির যোগ্য। নহে—কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক ।
প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়—স্রীলোকের বুদ্ধির পত্রীকা কোন্‌কালে লইয়াছেন যে, অনা-
য়াসেই তাহারদিগকে অন্নবৃদ্ধি কছেন ? কারণ
বিজ্ঞাপিকা এবং জ্ঞানপিকা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অশুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে,
তখন তাহাকে অন্নবৃদ্ধি কথা সম্ভব হয়, আপ-
নার। বিজ্ঞাপিকা, জ্ঞানোপদেশ স্রীলোককে
প্রায় যেন নাই, তবে তাহার। বুদ্ধিহীন।
হয়, ইহা কিরূপে নিষ্কর করেন । বরঞ্চ
পালাবতী, তাহমতী, কর্ণাটিকাচার পত্নী,
কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি বাহাকে বাহাকে
বিজ্ঞান্য করাইয়াছিলেন, তাহার। সর্ক-
শাস্ত্রের পারদগুণে বিখ্যাত আছে । বিশেষতঃ
বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাক্তই সমান আছে
যে, অত্যন্ত দুঃস্থ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য
আপনি স্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন,
মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হইলেন ।
বিত্তীয়তঃ তাহারদিগকে অধিরাস্তঃকরণ
কহিয়া থাকেন । কারণ যে দেশের পুরুষ
মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার
স্রীলোক অন্তঃকরণের বৈরাগ্যবারা স্বামীর
উদ্দেশ্যে অধিগ্রবেশ করিতে উদ্বত হয়,
ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কছেন যে, তাহা-
দের অন্তঃকরণের বৈরাগ্য নাই । তৃতীয়তঃ
বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় । এ দোষ পুরুষে

অধিক, কি স্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্রে
দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক । প্রতি নগরে,
প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর যে, কত স্রী পুরুষ
হইতে প্রতারিত। হইয়াছে, আর কত পুরুষ
স্রী হইতে প্রতারিত। হইয়াছে । আশ্রয়
অশুভব করি যে, প্রতারিত স্রী য় সংখ্যা
দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা
প্রায় লেখাপড়াতে পারদ এবং নানা
রাজকর্মে অধিকার রাখেন, বাহার দ্বারা
স্রীলোকের কোনরূপ অপরাধ কবাচিত
হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন,
অথচ পুরুষ স্রীলোককে প্রতারিত করিলে
তাহা ঘোষের মধ্যে গণনা করেন না ।
স্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার
করি যে, আপনাদিগের দ্বার অল্পকে সরল
জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, বাহার দ্বারা
অনেকেই ত্রুণ পায়, এ পর্য্যন্ত যে, কেহ
কেহ প্রতারিত হইয়া অধিতে দগ্ধ হয় ।
চতুর্থ যে দাহুরাগ। কহিলেন, তাহা উভয়ের
বিবাহগণনাতেই ব্যক্ত আছে অর্থাৎ এক
পুরুষের প্রায় দুই, তিন, পশ, বরঞ্চ অধিক
পত্নী দেখিতেছি, আর স্রীলোকের এক পতি,
সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ
করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা
যাযাত্যবন অতি কষ্টে যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহার
অশুষ্ঠান করে । পঞ্চম তাহার ধর্ম্মভর অন্ন,
এ অতি অধ্যক্ষের কথা । দেখ, কি পর্য্যন্ত
দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহার।
কেবল ধর্ম্মভরে সহিষ্ণুতা করে । অনেক
কুলীন ব্রাহ্মণ, বাহার। দশপনেরো বিবাহ
অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহাদের প্রায়
বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না

—অথবা ব্যবস্জীবনের মধ্যে কাহার সহিত
দুইটামাত্র সাক্ষাৎ করেন, তাহাপি ঐ সকল
ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধর্মভয়ে স্বামীর
সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা
কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃ-
গৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখসহিত
পূর্বক থাকিয়াও ব্যবস্জীবন ধর্মনির্বাহ করেন,
আর ত্রীলোকের অথবা অল্প বর্ণের মধ্যে
বাহার্য আপন আপন ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য
করেন, তাহারদিগের বাটীতে আর ত্রীলোক
কি কি কর্তৃপতি না পায় । বিবাহের সময় ত্রীকে
অঙ্গ-অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যব-
হারের সময় পুত্র হইতে নাচ জানিয়া ব্যবহার
করেন, বেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের
পরী দাত্তবৃত্তি করে অর্থাৎ অতি প্রাতে
কি দ্বিতকালে, কি বর্ষাতে স্থানদার্কন,
ভোজনাদিপাত্তদার্কন, গৃহপন্যাদি তাবৎ
কর্ম করিয়া থাকে এবং স্থপকারের কর্ম বিনা
বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে অর্থাৎ স্বামী,
পুত্রপাত্তদার্কন ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, সমাত্যবর্গ,
সকলের রক্ষণপরিবেশনাদি আপন আপন
নিরমিতকালে করে । রক্ষণ ও পরিবেশনে
যদি কোনো অংশে ত্রী হয়, তবে তাহারদের
স্বামী, শাওড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি ভিন্নভায়ে
না করেন । এ সকলকে ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে
সহ করে, আর সকলের ভোজন হইলে
ব্রাহ্মনাদি উদরপুরণের যোগ্য অথবা
অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা
সন্তোষপূর্বক আহাৰ করিয়া কালযাপন
করে । যন্ত্রণা কদাচিত্ ঐ স্বামীর ধনবত্তা
হইল, তবে ঐ স্বামী সর্বপ্রকার জ্ঞাতদ্বারা
এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় বাস্তিচারদ্বারা যথ

হয়, এবং মানুষমণ্ডে একদিবসও তাহার
সহিত আলাপ নাই । স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত
থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কারক্রেম পায়,
আর বৈবাহিক ধনবান হইলে মানসভয়ে
কাতর হয় । এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল
ধর্মভয়েই তাহার সহ করে । আর বাহার
স্বামী দুইতিন ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে,
তাহার দিব্যরাজি মনস্তাপ ও কলহের
ভাজন হয়, অল্প অনেকে ধর্মভয়ে এ সকল
ক্রেম সহ করে । কখন এমন উপস্থিত হয়
যে, এক স্বামী পক্ষ হইয়া অল্প ত্রীকে সর্বদা
তাড়ন করে এবং কিকিঞ্চিৎ পাইলে অথবা
নিকারণ কোন সম্বন্ধ হইলে চোতের
তাড়না তাহারদিগকে করে । অনেকে ধর্ম-
ভয়ে ক্ষমাশয় থাকে, যদি কেহ তাদৃশ বস্ত্রপায়
অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকি-
বার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে
পুরুষের প্রাবল্যনিমিত্ত পুনরায় তাহা-
দিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয় ।
পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা
ছলে অত্যন্ত ক্রেম দেয়, কখনও বা ছলে
প্রাণবধ করে । এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্তত্রাঃ
অপলাপ করিতে পারিবেন না । দুঃখ এই
যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখের দুঃখিনী
তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিকিঞ্চিৎ
দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, বাহাতে
বন্ধনপূর্বক বাহ করা হইতে রক্ষা পায় ।”

এই বিষয়টি পাঠ করিয়া সত্যই বলিতে ইচ্ছা
হয়—“হে যাক্তপা রমণি, তুমি রামমোহনকে
দার্কক পালন করিয়াছিলে, রামমোহন
তোমার দুঃখদ্বারার পবিত্র সন্ধান রক্ষা
করিয়াছেন ।” উক্ত অংশটিতে কোন উচ্চাস

নাই, কিন্তু উহাতে হুঃখের যে বীৰ্য্য চিত্র
প্রদর্শিত হইয়াছে, কোন্ কবীর কোন্
অংশ তবলেকা অধিক সঙ্গত ?

অনেকের বিবরণ, রামমোহন রায়
হিন্দুধর্মবোধবীর্ষবোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি
ঠিক পাঞ্জীদের মত এদেশের প্রতিমা-
পূজাকে হের বলিয়া কখনই প্রচার করেন
নাই। পৌরাণিক দেবদেবীসমূহ অল্পস্ব
সাধারণ লোকের ধর্মধারণার সহায়তার
বস্ত্র কল্পিত এবং সমাজে তাঁহাদের
প্রয়োজন ছিল, এ কথা তিনি পাঞ্জীদের সঙ্গে
বিচারের সময় পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়াছেন ;
চিহ্ন ও রূপ যে উদ্দেশ্যে কল্পিত, সেই উদ্দেশ্য-
ভেদে হইয়া তাহারাই উদ্দেশ্যহীন হইয়া
পড়িয়াছে, সুতরাং জাতীয়জীবনে ব্রহ্ম-
বুদ্ধির পুনঃসংকার করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।
কিন্তু পাঞ্জীরা পৌত্তলিক বলিয়া যখন হিন্দু-
দিগকে প্রাণি দিতেছিলেন, তখন তাহা তিনি
সহ করেন নাই, পুরাণের প্রকৃত মর্ম
প্রতিপন্ন করিয়া দেবদেবীকল্পনার আবৃত্ত-
কতা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং
যে ঈশ্টানের পবিত্রতাকে কপোতরূপে
কল্পনা ও বিত্তকে ঈশ্বর বলিয়া মান্ত
করেন, তাঁহাদের হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক
বলিবার কোন অধিকার নাই, নির্ভীক-
ভাবে এ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি কখনই
ব্যাতির দ্বারা আর্টার প্রমাণ করিয়া বিদেশীর
সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ
করেন নাই। প্রকৃত রক্ষিপ্রদাতার ভায়
ভক্ত, বাহ্যিক সাক্ষ্যবাদী হইয়া উক্ত ধর্ম-
তত্ত্বের সঙ্গীত পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের
কথা তিনি সর্বদা বিশিষ্ট প্রকার সহিত

উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যৌবনের বিবেচনা
নন্দনাগ ঠাকুর তাঁহাকে ‘রাম-কৃষ্ণ-মুহুর্ত-
বিবেচী’ বলিয়া কোন ‘প্রতিবাদপুস্তকে
উল্লেখ করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন—‘হরি-
হরের ধর্ম করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে,
‘বেহেহু’ যে স্থানে আমাধের প্রকাশিত পুস্তকে
তাঁহাদের নামগ্রহণ হইয়াছে, তাহার ‘ভগবান’-
শব্দ কিংবা ‘পরমাত্মা’ শব্দ পূর্বক তাঁহাদের
নামসকলকে দেখিতে পাইবেন।’ এই
কথা প্রমাণের জন্য তিনি ঐর বহুবিধ
গ্রন্থের পত্রিক নির্দেশপূর্বক হরিহরের প্রতি
তাঁহার সঙ্গ উল্লেখ প্রতিপন্ন করিতেছেন।
নন্দনাগ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—‘রামমোহন
এদেশীয় ভ্রাতৃসকলকে বৈবাহিক বলিয়া নিন্দা
করেন।’ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ
করিয়া রামমোহন রায় লিখিয়াছিলেন—
‘তাঁহার উচিত ছিল, ‘কোন্ পুস্তকে কোন্
স্থানে লিখিয়াছি, তাঁহার ধ্বনি দিয়া লিখি-
তেন।’ উক্ত ঠাকুর তাঁহার উপর বৈবাহিককে
নিখাবাদী বলার অভিযোগ দেওয়ায় তীক্ষ্ণ
হুঃখিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—‘বৈবাহিকের
নাম লইয়া উপনিষদের ভূমিকার মঙ্গলাচরণ
করি, বাহ্যকে এক স্থানে বিষ্ণুকৃত্যংশসম্ভব
বলিয়া লিখিয়াছি, বাহ্যিক স্ত্রীকে বৈব
বলিয়া জানিয়াছি।’ সুতরাং তাঁহার পক্ষে
কোন অসম্মানহৃৎ উল্লেখ অসম্ভব। স্মার্ত
ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিযোগের
উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—‘স্মার্ত ভট্টা-
চার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া
তাঁহার মত বচনসকলের ও তাঁহার কৃত
ব্যাখ্যাকে পুনঃপুনঃ গৌরবপূর্বক লিখিয়াছি।’
সুতরাং জাহ্নবী বৈবাহিক বলিয়াছিলেন,

রামমোহনও তেমনই বলিতে পারিতেন
“আমি ভাঙিতে আসি নাই, গড়িতে
আসিয়াছি ।”

বর্তমান যুগের প্রথমাধিকার সঙ্গে তাঁহার
আন্তোষ্যচিত্তি আশ্রয়ের মনে অবস্থিতভাবে
গড়িত । রামমোহনকে ছবি যেমনই প্রতিভা-
বান্বিত, তেমনই অসামান্যবীর্যপূর্ণ ।
“তীক্ষ্ণ সক্রিয় উচ্ছল চক্ষু, বাগ্মিতার
পরিচায়ক বুল হু, দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং
বহু স্বার্থযুক্তিতে যেন কটি দাঁড়িয়া তিনি
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহার
বহুতরে বিভক্ত শিখিল লামার আভরণ
হইতে গম্ভীর দক্ষিণ হস্ত যেন সত্যপ্রতি-
পাদনের অস্ত্র উত্তত হইয়া আছে, বিশাল
পাণ্ডুলীট ঘনসংজ্ঞার বক্রকেশান্তের উপায়ে
কুটিলভাবে সত্তত । এই আবেশে
যৌবনবর্ষকাল কলিকাতামহানগরীর বক্ষে
রামমোহন তরুণকাল চালাইয়াছিলেন ।
কোনদিন নাস্তিক বুদ্ধকে ঈশ্বরতত্ত্ব
বুঝাইবার অস্ত্র তিনি সমস্তদিন উপন্যাসী
পাকিয়া ক্রমাগত তর্ক করিতেছেন, মিঃ
আর্নট এতদবস্থায় তাঁহাকে সন্ধ্যা সাতটার
সময় দেখিয়া আশ্চর্য্যবিত্ত হইয়া গিয়া-
ছিলেন । মৌলতি গোলাম আব্বাস তাঁহার
সঙ্গে তর্কে হারিয়া তৎপ্রবর্তিত ধর্মের
এমনই গোড়া হইয়াছিলেন যে, তিনি
আত্মীয়সভার উৎসবের সময় পাথোয়া
বাহাইতেন । এদিকে Mr. Adams-এর
স্তায় কত পাত্রী তাঁহার সঙ্গে তর্কপরাজয়
স্বীকার করিয়া ইউনিটেরিয়ান মত অবলম্বন
করিয়াছিলেন ।

দেশের সমাবধারণক উন্নতির প্রতি তাঁহার

দৃষ্টি পড়িয়াছিল । হিন্দুর সাম্রাজ্যসম্বন্ধে
তাঁহার প্রশ্ন ও যত্ন বিদ্বৎসম্মত, সহমরণপ্রথা
উঠাইয়া দিয়া তিনি হিন্দুসমাজের অনেকের
প্রকাণ্ডিত আকর্ষণ করিয়াছেন, সুপ্রাচ্যের
স্বাধীনতার অস্ত্র তাঁহার চোটা আশ্রয়ে
চিত্তকৃতজ্ঞতার উল্লেখ করিবে । সংস্কৃতশিক্ষার
পরিবর্তে ইংরাঙ্গিশিক্ষাপ্রবর্তনের চোটার
অস্ত্র তিনি তুল্যরূপে প্রসিদ্ধ । পাশ্চাত্যগণকে
অকুণ্ঠিতভাবে প্রতিরোধ করিয়া এবং
বিশ্বতে বাইরা বোম্বারের মহিমা কীর্তন-
পূর্বক তিনি আশ্রয়গণকে গৌরবান্বিত
করিয়াছেন । খ্রীষ্টানগণকে তিনি বুঝাইয়া-
ছেন, তাঁহার ধর্ম যতদূর, তাঁহার ধর্ম উন্নত-
তর । কোনদানেই তিনি স্বীয় সম্মান ও স্বীয়
ধর্মকে লঘু করিয়া পরের পূরণোৎসাহের প্রার্থী
হন নাই । তিনি বাঙালী গম্ভীরচিত্তের এক-
রূপ সৃষ্টিকর্তা বলিলেও মতান্তর হয় না ।
বঙ্গভাষার তিনি যে ক্ষুদ্র ব্যাকরণখানি
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া
দেখিবেন, বঙ্গভাষার প্রতিভার তিনি
তখন যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, এখন
পর্যন্ত অস্ত্র কেহ সে পরিচয় পান নাই । সেই
ব্যাকরণখানি আদর্শ করিয়া পরবর্তী
ব্যাকরণগুলি সেই চোটার বিকাশে বঙ্গের
হইলে ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে আশ্রয়ের অশেষ
উন্নতি হইত । তাহা না করিয়া আবুদিক
ব্যাকরণগুলি উদ্বারগামী হইয়া পড়িতেছে ।
আর তাঁহার সর্বপ্রধান কার্য—হিন্দুর বে-
নির্মল প্রাচীন ধর্ম “খণ্ডিত ভিত্তিরগর্ভে
দীপক যেমতি” সেইরূপ স্ফুটনিত ছিল,
তিনি তাহাই পুনরুজ্জীবিত করিয়া চোটার
দ্বায়ে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । হিন্দুর

চিরন্তন ও স্বাভাবিক সত্যের অন্বেষণে তিনিই আমাদের প্রকৃত শিক্ষক, কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। ধর্ম্মিরা সাধুপুণ্ডিত, সর্গপ্রকার-বৈষম্য-বর্জিত পূণ্য তপোবনে বসিয়া যে আনন্দ ও শান্তির অমরকাব্য বেদবেদান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেই আনন্দ ও শান্তির আধার-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিয়া তিনি সমাজে নবজীবনের উৎস সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন—প্রকৃত গুরুজ্ঞান তিনি জ্ঞান-জননলাকাধারা আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। আজ যাহা-কিছু দৈত্য, বাহ্য-কিছু হুংখ, তাহা আমাদের নিভ্রম,—কিন্তু সর্গবিধের আশার যে একটি ক্ষীণ-কিরণ সঞ্চারিত হইয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জলতা প্রদান করিতেছে, তাহা

রামমোহনের দ্বিবাপ্রতিভা নিঃসৃত। তিনি প্রাচীন জীর্ণসমাজকে ধর্ম্ম-ভুলিয়া চিরন্তন সত্যার্থের দিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছিলেন,—অগ্রাধি সেই লক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ কলকোলাহল করিয়া ছুটিতে চাহিতেছে। শাহ আলিখ বাদশাহ তাঁহাকে ‘হাকীম’ উপাধি দিয়াছিলেন,—বাহার লগাটে প্রকৃতি বহুতে রাজতীকা আঁকিয়া দিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের প্রতি অপিত হইয়া মৌকিক উপাধিটি ধন্ত হইয়া গিয়াছে। যিশু ও ‘King of Jews’ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুগে যুগে শাসনের পরিবর্তন, সম্রাটের অভ্যুদয় ও পতন অব্যক্ত্যবী, কিন্তু ভারতবর্ষের যে কর্তব্য-জন চিরন্তন সম্রাট আছেন, রামমোহন তাঁহাদেরই পার্শ্বে দাঁড়াইবেন,—এ রাজ্য তাঁহাদেরই আছে—ঐং চিরকাল তাঁহাদেরই হউক।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

নৌকাডুবি ।



৫৮

বেদিন সন্ধ্যার সময় নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ লইয়া হেমললিনীর সঙ্গে অন্নদাবাবুর আলোচনা হইয়াছিল, সেইদিন রাজ্যেই অন্নদাবাবুর আবার সেই মূলবেদনা দেখা দিল।

রাত্রিটা কটে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে তাঁহার বেদনার উপশম হইলে তিনি তাঁহার বড়ীর বাগানে রাস্তার নিকটে শীত-প্রভাতের তরুণ সূর্যালোকে সম্মুখে একটি

টিপাই লইয়া বসিয়াছেন—হেমললিনী সেই-খানেই তাঁহাকে চা বাগড়াইবার বীষবা করিতেছে। গতরাত্রে কটে অন্নদাবাবুর মূখ বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গেছে, তাঁহার চোখের নীচে কালী পড়িয়াছে, মনে হইতেছে, বেন এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার বয়স অনেক বাড়িয়া গেছে।

যখন অন্নদাবাবুর এই ক্লিষ্টমুখের প্রতি হেমললিনীর চোখ পড়িতেছে, তখন তাহার

বৃক্ষের মধ্যে ঘেন ছুরি বিধিতহে । নলিনাকের সহিত বিবাহে হেমনলিনীর অসম্মতি-
তেই যে বৃদ্ধ ব্যক্তি হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই মনোবেশনাই যে তাঁহার পীড়ার অব্যব-
হিত কারণ; ইহা হেমনলিনীর পক্ষে একান্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে ; সে যে কি করিবে, কি করিলে বৃদ্ধ পিতাকে সাবস্থা
দিতেন পারিবে, তাহা বিচার করিয়া ভাবিয়া কোনোমতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না ।

এমন-সুখের হঠাৎ খুড়াকে লইয়া অক্ষর দেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । হেমনলিনী ভাড়াবাড়ি চলিয়া বাইবার উপক্রম করিতেই অক্ষর কহিল—“আপনি ঘাইবেন না, ইনি গাজিপুরের চক্রবর্তিমহাশয়, ইহাকে পশ্চিম-অঞ্চলের সুকলেই জানে—আপনাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ কথা আছে ।”

সেই আরগাটাতে বাঁধানো চাতালের মত ছিল—সেইখানে খুড়া আর অক্ষর বসিলেন ।

“খুড়া কহিলেন, “গুনিলাম, রমেশবাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে—আমি তাই ত্রিভাঙ্গা করিতে আসিয়াছি তাঁহার জীবন খবর কি আপনারা কিছু পাইয়াছেন ?”

অন্নদাবাবু অলপকাল অবাক হইয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন, “রমেশবাবুর জী !”

হেমনলিনী চম্ নত করিয়া রহিল । চক্রবর্তী কহিলেন, “হা, তোমরা আমাকে বোধ করি নিভাত্ত সেকলে অসভ্য মনে করিতেছ । একটু ধৈর্য ধরিয়া সমস্ত কথা গুনিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি খামকা গারে পড়িয়া পনের কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে

আলোচনা করিতে আসি নাই । রমেশবাবু পুড়ার সময় তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া জীমারে করিয়া বধন পশ্চিমে বাত্মা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই জীমারেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় । আপনারা ত জানেন, কমলাকে যে একবার দেখিয়াছে, সে তাহাকে কখনো পর বলিয়া মনে করিতে পারে না । আমার এই বৃদ্ধাবয়সে অনেক শোকভাপ পাইয়া জনরু কঠিন হইয়া গেছে, কিন্তু আমার সেই মা-লক্ষ্মীকে ত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না । রমেশবাবু কোথায় বাইবেন, কিছুই ঠিক করেন নাই—কিন্তু এই বৃদ্ধকে দুইদিন দেখিয়াই মা কমলার এমনি ঘেহ অনিয়া গিয়াছিল যে, তিনি রমেশবাবুকে গাজিপুরে আমার বাড়ীতেই উঠিতে রাখি করেন । সেখানে কমলা আমার মেজা মেয়ে পৈলার কাছে আসন বোনের চেয়ে বসে ছিল । কিন্তু কি যে হইল, কিছুই বলিতে পারি না—মা যে কেন আমাদের সকলকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন; তাহা আজ পর্যন্ত ভাবিয়া পাইলাম না । সেই অবধি শৈলার চোখের জল আর কিছুতেই শুকাইতেছে না ।”

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল । অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন, “তাঁহার কি হইল, তিনি কোথায় গেলেন ?”

খুড়া কহিলেন—“অক্ষরবাবু, আপনি ত সকল কথা গুনিয়াছেন, আপনিই বলুন । বলিতে গেলে আমার বুক কাটিয়া যায় ।”

অক্ষর আশ্চর্যপাশ্র সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিল । নিজে

কোনোপ্রকার টকা করিয়া না, কিন্তু তাহার বর্ণনার রমেশের চিত্রিত্রিট রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল না ।

অন্নদাবাবু ব্যস্তব্যস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমরা ত এ সমস্ত কথা কিছুই শুনি নাই । রমেশ বেদিন হইতে কলিকাতার বাহির হইয়াছেন, তাহার একখানি পত্রও পাই নাই ।”

অক্ষর সেই সঙ্গে যোগ দিল—“এমন কি, তিনি যে কমলাকে বিবাহ করিয়াছেন, এ কথাও আমরা নিশ্চয় জানিতাম না । অচ্ছা চক্রবর্তিমহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কমলা রমেশের স্ত্রী ত বটেন ? ভগ্না বা আর কোনো আত্মীয়া ত নহেন ?”

চক্রবর্তী কহিলেন “আপনি বলেন কি অক্ষরবাবু ? স্ত্রী নহেন ত কি ? এমন সত্য-লক্ষী স্ত্রী কতজনের ভাগ্যে জোটে ?”

অক্ষর কহিল—“কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, স্ত্রী বত ভাল হয়, তাহার অনাদরও তত বেশি হইয়া থাকে । ভগবান্ ভাণ লোকদিগকেই বোধ করি সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন !”—এই বলিয়া অক্ষর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ।

অন্নদা তাহার বিরল কেন্দ্রাজির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন—“বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহা হইবার তা ত হইয়াই গেছে, এখন আর বুঝা শোক করিয়া কল কি ?”

অক্ষর কহিল—“আমার মনে সন্দেহ হইল, যদি এমন হয়, কমলা আত্মহত্যা না করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন । তাই চক্রবর্তিমহাশয়কে লইয়া কাণ্ডাতে একবার

সন্ধান করিতে আসিলাম । বেশ বুঝা বাই-তেছে, আপনারা কোনো-ধরনের পান নাই । বাহা হউক, দুচারদিন এখানে তন্মাস করিয়া দেখা যাক্ ।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“রমেশ এখন কোথায় আছেন ?”

• খুড়া কহিলেন, “তিনি ত আমাবিগকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন ।”

অক্ষর কহিল—“আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু লোকের মুখে শুনিলাম, তিনি কলিকাতাতেই গেলেন । বোধ-করি আলি-পুরে প্র্যাক্টিস করিবেন । মাছুষ ত আর অনন্তকাল শোক করিয়া কাটাইতে পারেন না, বিশেষত তাহার অন্নব্রহ্ম । চক্রবর্তি-মহাশয়, চলুন, সহরে একবার ফাল করিয়া খোঁজ করিয়া দেখা যাক্ ।”

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “অক্ষর, ভূমি ত এইখানেই আসিতেছ ?”

অক্ষর কহিল—“ঠিক বলিতে পারি না । আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া আছে অন্নদাবাবু । বর্তমান কাণ্ডাতে আছি, আমাকে এই খোঁজেই থাকিতে হইবে । বলেন কি, ভক্তলোকের ঘরে, যদিই তিনি মনের দুঃখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন, তবে আজ কি বিপদেই পড়িয়াছেন বলুন দেখি ! রমেশবাবু মিথ্যা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি ত পারি না ।”

খুড়াকে সঙ্গে লইয়া অক্ষর চলিয়া গেল ।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া একবার হেমললিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন । হেমললিতা প্রাণপণে নিভেতে সংবৃত করিয়া

বসিয়াছিল। সে ভাবিত, তাহার পিতা মনে মনে তাহার ভ্রম অংশকা অমৃতত্ব করিতেছেন।

হেমলিনী কহিল—“বাবা, আজ একবার ডাক্তারকে দিয়া তোমার শরীরটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করাও। একটুতেই তোমার বাবা নষ্ট হইয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার করা উচিত।”

অন্নদাবাবু মনে মনে অত্যন্ত আশ্রয় অমৃতত্ব করিলেন। রমেশকে লইয়া এক-বড় আলোচনটার পর হেমলিনী যে ঔষধ পীড়া লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিল, ইহাতে ঔষধ মনের মধ্য হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। অল্পসময় হইলে তিনি নিজের পীড়ার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন—আজ করিলেন, “সে ত বেশ কথা। শরীরটা না হয় পরীক্ষা করানোই থাক্। তাহা হইলে আজ না হয় একবার নলিনাক্ষকে ডাকিতে পাঠাই। কি বল?”

“নলিনাক্ষকে হেমলিনী একটুখানি সঙ্কোচে পড়িয়া গেছে। পিতার সম্মুখে তাহার সহিত পূর্বের ভ্রম সম্বন্ধভাবে মেলা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে, তবু সে বলিল, “সেই ভাল, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিই।”

অন্নদাবাবু হেমের অবিচলিত ভাব দেখিয়া ক্রমে সাহস পাইয়া কহিলেন—
“হেম, রমেশের এই সব কথা ভাও—”

হেমলিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, “বাবা, রৌদ্রের ঝাঁজ বাড়িয়া উঠিয়াছে—চল, এখন ঘরে চল।”—বলিয়া তাঁহাকে আপত্তি কারবার অবসর না দিয়া

হাত ধরিয়া ঘরে গিয়া লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে আরামকেন্দ্রার বসাইয়া তাঁহার গায়ে বেশ করিয়া গরম কাপড় জড়াইয়া-দিয়া তাঁহার হাতে একখানি খবরের কাগজ দিল এবং চসমার খাপ হইতে চসমাটি বাহির করিয়া নিজে তাঁহার চোখে পরাইয়া-দিয়া কহিল—“কাগজ পড়, আমি আসিতেছি।”

অন্নদাবাবু সুবোধ বালকের মত হেমলিনীর আদেশপালন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। হেমলিনীর রক্ত ঔষধ মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একসময় কাগজ রাখিয়া হেমের খোঁজ করিতে গেলেন—দেখিলেন, সেই প্রাতে অসময়ে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছু না বলিয়া অন্নদাবাবু বাহ্যদ্বার পারচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার একবার হেমলিনীকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, তখনো তাহার দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তখন শ্রান্ত অন্নদাবাবু থপ্ করিয়া তাঁহার চৌকিটার উপর বসিয়া-পড়িয়া মুহূর্ত্ত মাথার চুল-গুলাকে করণকালনদ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

নলিনাক্ষ আসিয়া অন্নদাবাবুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং বথাকর্তব্য বলিয়া দিল এবং হেমকে জিজ্ঞাসা করিল, “অন্নদাবাবু মনে কি বিশেষ কেমনো উদ্বেগ আছে?” হেম কহিল, “তা থাকিতে পারে।”

নলিনাক্ষ কহিল, “যদি সম্ভব হয়, ঔষধ মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। আমার

দার সপক্ষেও এই এক মুকলিল পত্র—“তান একটুতেই এমনি বাত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার শরীর স্বাভাবিক শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য ক্রি-একটা চিন্তা লইয়া কাল বোধ হয় সমস্তরাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। আমি চেষ্টা করি বাহ্যেতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হন, কিন্তু সংসারে থাকিতে গেলে তাহা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না।”

হেমলিনী কহিল, “আপনাকেও আজ তেমন ভাল দেখাইতেছে না।”

নলিনাক্ষ না, আমি বেশ ভালই আছি। মন্য থাকা আমার অভ্যাস নয়। তবে কাল বোধ হয় কিছু রাত আগিতে হইয়াছিল বলিয়া আজ আমাকে তেমন তাকাত দেখাইতেছে না।

হেমলিনী। আপনার নাকে সেবা করিবার জন্য সর্বদা যদি একটি ছোলোক তাঁহার কাছে থাকিত, তবে বোধ হয় ভাল হইত। আপনি একলা, আপনার কাজ-কর্ম আছে, কি করিয়া আপনি উহার শুশ্রূষা করিয়া উঠিবেন ?

এ কথাটা হেমলিনী সহজভাবেই বলিয়াছিল, কথাটা সঙ্গত, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু বলার পরেই হঠাৎ তাহাকে লজ্জা আক্রমণ করিল, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল—তাহার সহসা মনে হইল, নলিনাক্ষাবু যদি কিছু মনে করেন, অকস্মাৎ হেমলিনীর এই লজ্জার আবির্ভাব দেখিয়া নলিনাক্ষও তাহার মার প্রত্যক্ষস্বরূপ কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না।

হেমলিনী তাড়াতাড়ি সারিধা-গইয়া কহিল—“উহার কাছে একজন কি রাখিলে ভাল হয় না ?”

নলিনাক্ষ কহিল, “অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, মা কিছুতেই রাজি হন না। তিনি শুদ্ধাচারসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বলিয়া অহিনা-করা লোকের কাছে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় না। তা হাঁড়া, তাঁহার স্বভাব এমন যে, কেহ যে দ্বারে পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না।”

ইহার পরে এসম্বন্ধে হেমলিনীর আর কোনো কথা চলিল না। সে একটুখনি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—“আপনার উপদেশমতে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক-একবার বধূ আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার বেন কোনো আশা নাই। আমার কি কোনোদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না—আমাকে কি কেবলি বাহিরের আশায়ে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে ?”

হেমলিনীর এই কাতর আবেগনে নলিনাক্ষ একটু চিন্তিত হইয়া কহিল—“দেখুন, বিষ যদি না আসে, তবে আমরা জানিতেই পারি না, আমরা কতদূর অগ্রসর হইলাম। বিষ আমাদের ছন্দের সমস্ত শক্তিকে লোপ্ত করিয়া দিবার জন্যই উপস্থিত হয়। আপনি হতাশ হইবেন না।”

হেমলিনী কহিল, “কাল সকালে আপনি একবার আসিতে পারিবেন ? আপনার সহায়তা পাইলে আমি অনেকটা বলপূর্বক করি।”

নলিনাকের মুখে এবং কণ্ঠস্থের যে একটি অবিচলিত শাস্তির ভাব আছে, তাহাতে হেম-নলিনী যেন একটা আশ্রয় পায় । নলিনাক চলিয়া গেল, কিন্তু হেমনলিনীর মনের মধ্যে একটা সাধনার স্পর্শ রাখিয়া গেল । “সে তাহার শয়নগৃহের সমুখের বায়ান্নার পাঁড়াইয়া একবার সীতরোজী-লোকিত্বাহিরের দিকে চাহিল । তাহার চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই রমণীর মধ্যাহ্নে কর্ণের সহিত বিরাট, শক্তির সহিত শান্তি, উদ্দেশ্যের সহিত বৈরাগ্য একসঙ্গে বিরাজ করিতেছিল, সেই বৃহৎ জীবের জৌহুত্রে সে আপনার বাণিত জনহীন সমর্পণ করিয়া দিল—তখন সূর্যালোক এবং উদ্ভুক্ত উজ্জ্বল নীলবর্ণ তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে জগতের নিত্য-উচ্চারিত স্তব্ধতার “অনির্জনন প্রেরণ করিবার অবকাশ পাত করিল ।

হেমনলিনী ভাবিতে লাগিল, “এই আলোক ত প্রতিদিন আমার সমুখে উদ্ভিত হয়, এই জগৎ অহরহ আমাকে যেটন করিয়া থাকে—কিন্তু বতর্কণ না একটি মাহুৎ আদিয়া মাঝখানে দাঁড়ায়, ততক্ষণ কেন ইহাদের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয় না !”

তাহার পর নলিনাকের মার কথা ভাবিতে লাগিল । কি চিন্তা! লইয়া তিনি ব্যাপৃত আছেন, তিনি কেন যে রাজ্যে বুনাইতে পারিতেছেন না, তাহা হেমনলিনী বুঝিতে পারিল । নলিনাকের সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাবের প্রথম আঘাত, প্রথম সফটিক কাটিয়া গেছে । নলিনাকের প্রতি, হেম-নলিনীর একান্ত নিভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হাজার মধ্যে ভাল-

বাসার বিচ্ছিন্নস্বপ্নাশ্রমী বেদনা নাই—তা নাই থাকিল ! এই মাহুৎ প্রতিষ্ঠা নলিনাক যে কোনো স্থানোক্তের ভালবাসার অপেক্ষা রাখে, তাহা ত মনেই হয় না । তবু সেবার প্রয়োজন ত সকলেরই আছে । নলিনাকের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন—নলিনাককে কে দেখিবে ! এ সংসারে নলিনাকের জীবন ত অনাহারের সাহসী নহে—এমন লোকের সেবা ভক্তির সেবাই হওয়া চাই ।

আজ প্রভাতে হেমনলিনী রমেশের জীবন-ইতিবৃত্তের যে একাংশ শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার মস্তিষ্কের মাঝখানে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে যে, এই নিদারুণ আঘাত হইতে আশ্চর্য্য করিবার মত তাহার সমস্ত মনের সমস্ত শক্তি আজ উদ্ভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, রবেন্দ্রে মৃত্ত বেদনা বোধ করা তাহার শব্দে লজ্জাকর । সে রবেন্দকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না । পৃথিবীতে কত শতসংখ্য লোক ভালমন্দ কত-কি কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, সংসারজ্ঞ চলিতেছে—হেমনলিনী তাহার বিচারভার লয় নাই । রমেশের কথা হেমনলিনী মনেও আনিতে ইচ্ছা করে না । মাঝে মাঝে আত্মবাস্তবী কল্পনার কথা কল্পনা করিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে—তাহার মনে হইতে থাকে, এই হতভাগিনীর আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কি কোনো সংশ্লেশ আছে ? তখন লজ্জার, দুঃখের, কষ্টের তাহার সমস্ত জগৎ লুপ্ত হইতে থাকে । সে ক্রোড়হাত করিয়া বলে, “হে প্রিয়, আমি ত অপরাধ

করি নাই, তবে আমি কেন এমন করিয়া
জড়িত হইলাম ? আমার এ বকন নোচন
কর, একেবারে ছিন্ন করিয়া দাও আমি
আর কিছুই চাই না, আমাকে তোমার
এই অগতে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে
দাও ।”

রমেশ ও কমলার ঘটনা শুনিয়া হেম-
ললিনী কি মনে করিতেছে, তাহা আনিবার
লজ অন্নদাবাবু উৎসুক হইয়া আছেন—
অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া পাড়িতে তাঁহার
সাহস হইতেছে না । হেমললিনী বারান্দার
চূপ করিয়া বসিয়া দেখাই করিতেছিল,
সেখানে একএকবার গিয়া হেমললিনীর
চিন্তারত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ফিরিয়া
আসিয়াছেন ।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের উপদেশমত
অন্নদাবাবুকে ভারতচূর্ণমিশ্রিত দুধ পান
করাইয়া হেমললিনী তাঁহার কাছে বসিল ।
অন্নদাবাবু কহিলেন, “আলোট। চোখের
সামনে হইতে সরাইয়া দাও ।”

যদি একটু অসুস্থ হইলে অন্নদাবাবু
কহিলেন, “সন্ধ্যাবেলার যে বৃকট আসিয়া-
ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বেশ সরল বোধ
হইল ।”

হেমললিনী এই প্রসঙ্গ লইয়া কোনো
কথা কহিল না—চূপ করিয়া রহিল । অন্নদা-
বাবু আর অধিক ভূমিকা বানাইতে পারি-
লেন না । তিনি কহিলেন, “রমেশের
ব্যাপার শুনিয়া আমি কিষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া
গেছি—শোকে তাহার সবকে অনেক কথা
বলিয়াছে, আমি আর পর্য্যন্ত তাহা বিবাস
করি নাই কিন্তু আরও—”

হেমললিনী কাতরকণ্ঠে কহিল—“বাবা,
ও সকল কথার আলোচনা থাক ।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“মা, আলোচনা
করিতে ত ইচ্ছা করেই না । কিন্তু বিধির
বিপাকে অকস্মাৎ একএকজন লোকের সঙ্গে
আমাদের স্মৃতিঃসং জড়িত হইয়া যায়, তখন
তাঁহার কোনো আচরণকে আর উপেক্ষা
করিবার জো থাকে না ।”

হেমললিনী সবেগে বলিয়া উঠিল—“না
না—স্মৃতিঃসংের গ্রহি এমন করিয়া সেখানে-
সেখানে কেন জড়িত হইতে দিক! বাবা,
আমি বেশ আছি—আমার লজ ভূমি বুঝা
উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে লজা দিয়ে না ।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “মা হেম, আমার
বয়স হইরাছে, এখন তোমার একটা স্থিতি
না করিয়া ত আমার মন বিব হইতে পারে
না । তোমাকে এমন তপস্বিনীর মত
কি আমি রাখিয়া যাইতে পারি ?”

হেমললিনী চূপ করিয়া রহিল । অন্নদা-
বাবু কহিলেন, “দেখ মা, পৃথিবীতে একটা
আশা চূর্ণ হইল বলিয়াই” যে আর সমস্ত
দুর্দুলা জিনিষকে অগ্রাহ করিতে হইবে,
এমন কোনো কথা নাই । তোমার জীবন
কিসে সুখী হইবে, সার্থক হইবে, আলস্য হইবে
মনের ক্ষোভে তাহা ভূমি না রাখিতেও পার
—কিন্তু আমি নিয়ত তোমার মঙ্গলচিন্তা
করি—আমি জানি তোমার কিসে সুখ,
কিসে মঙ্গল, আমার প্রণীতটাকে একেবারে
উপেক্ষা করিয়া না ।”

হেমললিনী দুই চোপ ছলছল করিয়া
বলিয়া উঠিল, “অমন কথা বলিয়া না, আমি
তোমার কোনো কথাই উপেক্ষা করি না ।

তুমি ত জান বাবা, জীবনে এমন একএকটা সময় আসে, যখন সমস্ত কথাও, অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। আমাকে মনের সমস্ত চিন্তা একটু শুদ্ধাইয়া লইবার সময় দিবে না? তুমি বাহা আবেশ করিবে, আমি নিশ্চয় তাহা শাশন করিব, কেবল একবার অন্তঃকরণটা পরিষ্কার করিয়া একবার ভালরকমে করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে চাই।”

অন্নদাবাবু সেই অন্ধকারে একবার হেমললিনীর অঙ্গশিত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। আর কোনো কথা কহিলেন না।

পূরদিন সকালে যখন অন্নদাবাবু হেমললিনীকে লইয়া বাহিরে গাড়ের তলায় চা খাইতে বসিয়াছেন, তখন অক্ষর আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু নীরব প্রশ্নের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অক্ষর কহিল, “এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।” এই বলিয়া এক পেরাণা চা লইয়া সে সেখানে বসিয়া গেল।

আগ্রে আগে কথা তুলিল—“রমেশবাবু ও কমলার বিনিবপত্র কিছুকিছু চক্রবর্তী-মহাশয়ের ওখানে রহিয়া গেছে, সেগুলি তিনি কোথায় তাহার কাছে পাঠাইবেন, তাই ভাবিতেছেন। রমেশবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের ঠিকানা বাহির করিয়া দিয়াই এখানে আসিবেন, তাই আপনাদের এখানে বসি—”

অন্নদাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া কহিলেন—“অক্ষর, তোমার কাণ্ড-

জান কিছুনার মুঠ রমেশ আমাব এখানেই বা কেন আসিবে, আর তাহার বিনিবপত্র আমিই বা কেন রাখিতে যাইব?”

অক্ষর কহিল, “দা চৌক, অস্তায় কখন আর জুল করুন, রমেশবাবু এখন নিশ্চয়ই অহতপ্ত হইয়াছেন, এ সময়ে কি তাহাকে সাহায্য দেওয়া তাহার পুণ্যজন বন্ধুদের কর্তব্য নহ? তাহাকে কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষর তুমি কেবল আমাদের পীড়ন করিবার জন্য এই কথাটা লইয়া বারবার আন্দোলন করিতেছ। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, এ প্রশ্নে তুমি আমাদের কাছে কখনোই তুলিয়া না।”

হেমললিনী বিস্ময়ের বলিল “বাবা, তুমি রাগ করিতে না, তোমার স্বস্থ করিবে— অক্ষরবাবু বাহা বলিতে চান, বলুন না, তাহাতে দোষ কি।”

অক্ষর কহিল—“না না, আমাকে মাগ করিবেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।”

৫৯

রুক্মবাবু সপরিজনে কানী ত্যাগ করিয়া মিরাটে যাইবেন, স্থির হইয়া গেছে। বিনিবপত্র পাখা হইয়াছে, কাল প্রভাতেই ছাড়িতে হইবে। কমলা নিত্যন্ত আশা করিয়াছিল, ঠিকমধ্যে এমন একটা-কিছু ঘটনা ঘটবে, বাহাতে তাহাদের বাওয়া বন্ধ হইবে। ইহাও সে একান্তমনে আশা করিয়াছিল যে, নলিনাকড়াকার হস্ত আর দুইএকবার তাহার বোকে দেখিতে আসিবেন। কিন্তু ভয়ের কোনোটাই ঘটিল না।

পাছে বাসুনঠাকরুণ যুজ্যাব খেলাগের গোলেমাল্লে পানাহীরা বাতবার অবকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নবীনকালী তাহাকে কওদিন সঙ্গদারী কঁচো-কাছে রাখিয়াছেন তাহাকে দিরাই। জিনিষপত্র-বাখার্দানায় অনেক কাজে করাইয়া গইয়াছেন।

কমলা একাত্তমনে কমনা করিতে লাগিল, আজ রাত্রির মধ্যে তাহার এমন একটা কতিন পীড়া হয় যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাওয়া নবীনকালীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা-ভার কোন্ ডাক্তারের উপর পড়িবে, তাহাও সে মনে মনে ভাবে নাও, এমন নহে। এই পীড়ার বদী অবশেষে তাহাঃ মুড়া ঘটে তবে আশ্রয় মুক্তাকালে সেই চিকিৎসকের পারের ধূনা লইয়া সে মন্ত্রিতে পারিবে, ইহাও সে চোখে বুজিয়া কমনা করিতেছিল।

রাত্রে নবীনকালী কমলাকে আপনায় ধরে লইয়া গইলেন। পরদিন টেশনে বাইবার সময়-নিজের, গাড়ির মধ্যে তুলিয়া লইলেন। কর্তা মুকুন্দবাবু রেলগাড়িতে সেকেন্ডক্লাসে উঠিলেন—নবীনকালী বাসুন-ঠাকরুণকে লইয়া ইন্টারমিডিয়েটে ক্রীকে আশ্রয়লাভ করিলেন।

অবশেষে গাড়ি কালীটেশন্ হাড়িল—মত হস্তী যেমন করিয়া লতা ছিড়িয়া লয়, তেমনি করিয়া রেলগাড়ি গরুদ করিতে করিতে কমলাকে ছিড়িয়া-লইয়া চলিয়া গেল। কমলা ক্রুদ্ধিতরুকে জান্ণা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নবীন-কালী কহিলেন, “বাসুনঠাকরুণ, পানের ডিপেটা কোথায় রাখিলে?”

কমলা পানের ডিপেটা বাঁধ করিয়া দিল। ডিপে পূর্ণিয়া নবীনকালী কহিলেন, “এই দেখ, যা ভাবিয়াছিলান, তাই হইয়াছে! চুনের কোটোটা কেনিয়া আদিয়াছ? এখন আমি করি কি যেটি আমি নিজে না দেখিব, সেটিতে একটা-না-একটা গুল-ইইয়া আছেহ! এ কিহ বাসুনঠাকরুণ তুমি সরতানী করিয়া করিয়াছ কেবল আমাকে লজ করিবার মন্তবে! ইচ্ছা করিয়া আমাদের হাড় আগাইতেছ! আজ তরকারিতে হুন্ নাও, কাল পারসে ধরা-গরু—মনে করিতেছ, এ সমস্ত চালাকি আমরা বুজি না! আচ্ছা, চল যিরাটে, তার পরে দেখা যাউবে তুমিই থাকে, আর আমিই থাকে!”

গাড়ি এখন পুলের উপর দিয়া চলিল, কমলা জান্ণা হইতে মুখ বাড়াইয়া গদা-ভীরবস্ত্রী কালীগহরটা একবার দেখিয়া লইল—ঐ সহরের মধ্যে কোন্ দিকে যে নলিনাকের বাড়ী, তাহা সে কিছুই জানে না। এইরূপ রেলগাড়ির দ্রুতগমনের মধ্যে বাট, বাড়ী, মনিরচূড়া, বাহা-কিছু তাহার চক্ষে পড়িল, সবতই নলিনাকের আবির্ভাবের দ্বারা মত্তিত হইয়া তাহার জন্মকে ল্পর্শ করিল।

নবীনকালী কহিলেন, “ওগো, অত করিয়া সুকিয়া দেখিতেছ কি! তুমি শু পানী নও—তোমার ডানা নাই যে উড়িয়া বাইবে!”

কালীগহরী ‘চেত কোথায় আচ্ছ হইয়া গেল। কমলা দ্বির নীরব হইয়া বলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে গাড়ি বেগুনসরাইতে পৌঁছল।
কমলার কাছে টেননের গোলমাল, লোক-
জনের ভিড়, সমস্তই ছাড়ার মত, যন্ত্রের মত
বোধ হইতে লাগিল। সে কলের পুতলার
মত এক গাড়ি হইতে খড় গাড়িতে উঠিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া আসিতেছে,
এমন-সময় কমলা হঠাৎ চম্‌কিয়া-উঠিল
জনিত পাইল, তাহাকে কে পরিচিতকণ্ঠে
“মা” বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে! কমলা
প্রাটেকশ্বের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল,
উমেশ।

কমলার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—
কহিল, “কিরে উমেশ!”

উমেশ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং
মুহূর্তের মধ্যে কমলা নামিয়া পড়িল।
উমেশ তৎক্ষণাৎ ছুঁচিৎ হইয়া প্রশ্ন করিয়া
কমলার পায়ের ধূলা মাখায় তুলিয়া লইল।
তাহার সমস্ত মুখ আকর্ষণস্বরিত হাসিতে
ভরিয়া গেল।

• পরকণ্ঠেই গার্ড কান্ডার দরজা বন্ধ
করিয়া দিল। নগ্নকালী চোচামোচি করিতে
লাগিলেন, “বামুনঠাকরুন, করিতেছে কি!
গাড়ি ছাড়িয়া দেয় যে! ওঠ, ওঠ!”

কমলার কানে সে কথা পৌঁছিলই না।
গাড়িও বাধী চম্‌কিয়া-বিয়া গঙ্গসুন্দকে
টেনন হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, তুই
কোথা হইতে আসিতেছিল?”

উমেশ কহিল, “গাজিপুর হইতে।”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—“সেখানে সকলে
ভাল আছেন ত? খুঁড়ামশায়ের কি খবর?”

উমেশ কহিল—“তিনি ভাল আছেন।”

কমলা। আমার ‘মদ’ কেমন আছেন?

উমেশ। মা, “তিনি” তোমার ভ্রাতৃ

কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া
গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেমন
আছে রে? সে তার মালাকে কি মাঝে
মাঝে মনে করে?”

উমেশ কহিল, “তুমি তাহাকে যে একজোড়া
পছন্দা দিয়া আসিয়াছিলে, সেইটে না পরা-
ইলে তাহাকে কোনোমতে দুখ খাওয়ানো
যায় না। সেইটে পরিচা সে দুই হাত

ঘুরাইয়া বলিতে থাকে, ‘মাসি গঙ্গ পেছে’,
আর তারমার চোখ দিয়ে জল পাকতে থাকে।”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল “তুই এখানে
কি করিতে আসিল?”

উমেশ কহিল, “আমার গাজিপুরে ভাল
লাগিতেছিল না, তাই আমি চলিয়া
আসিয়াছি।”

কমলা। বাব কোথায়?

উমেশ কহিল, “মা, তোমার সঙ্গে বাইব।”

কমলা কহিল, “আমার কাছে একটি
পরশাও নাই।”

উমেশ কহিল—“আমার কাছে আছে।”

কমলা। তুই কোথায় পেলি?

উমেশ। সেই যে তুমি আমাকে পাঁচটা
টাকা দিয়াছিলে, সে ত আমার খরচ হয়
নাই।

—বলিয়া গাঁট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির
করিয়া দেখাইল।

কমলা। তবে চল উমেশ, আমরা কান্দি
বাই, কি বলিস? তুই ও টিউট করিতে
পারিবি?

উমেন কহিল, “পারিবা!”—বলিয়া তখন টিকিট কিনিয়া আনিল। গাড়ি প্রস্তুত ছিল, গাড়িতে কমলাকে উঠাইয়া দিল—কহিল, “মা, আমি পানের কামরাতেই রহিলাম।”

কান্ট্রেশনে নামিয়া কমলা উমেনকে বিজ্ঞাপা করিল, “উমেন, এখন কোথায় বাই বন্ দেখি?”

উমেন কহিল, “মা, তুমি কিছুই ভাবিও না—আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় লইয়া বাইতেছি।”

কমলা। ঠিক জায়গা কিরে! তুই এখানকার কি জানিস্ বন্ দেখি?

উমেন কহিল, “সব জানি। দেখ ত কোথায় লইয়া বাই।”

—বলিয়া কমলাকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলিয়া-দিয়া সে কোহ্বায়ে চড়িয়া বসিল। একটা বাড়ীর সামনে গাড়ি দাঁড়াইলে উমেন কহিল—“মা, এইখানে নাম।”

কমলা গাড়ি হইতে নামিয়া উমেনের অতুলন করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই উমেন ডাকিয়া উঠিল—“দাদামশায়, বাড়ী আইত?”

পানের একটা ঘর হইতে লাড়া আসিল—“কে ও, উমেনে না কি! তুই কোথা থেকে এলি?”

পরক্ষণেই হাঁকহাতে স্বয়ং চক্রবর্তী-পুড়া আসিয়া উপস্থিত। উমেন সমস্ত মুখ পরিপূর্ণ করিয়া নীরবে ধীরে লাগিল। বিমিত কমলা ভূমিষ্ট হইয়া চক্রবর্তীকে প্রণাম করিল। পুড়ার খানিকক্ষণ সুখে আর কথা সরিল না;—তিনি কি বে বলি-

বেন, হাঁকাটা কোন্‌খানে রাখিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে কমলার চিবুকে ধরিয়া তাহার লজ্জিত নতমুখ একটুখানি উঠাইয়া কহিলেন—“মা আমার কিরে এল! চল চল, উপরে চল!”

“ও শৈল, শৈল! দেখে যা, কে এসেছে।”

শৈলজা ভাড়াভাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বায়ামার সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা তাহার পানের ঘুলা লইয়া প্রণাম করিল। শৈল ভাড়াভাড়ি তাহাকে বুকে চাপিয়া-ধরিয়া তাহার ললাট-চুষন করিল। চোখের জলে দুই কপোল ভাসাইয়া-দিয়া কহিল, “মা গো মা! অর্ঘ্যদেব এমন করিয়াও কাদাইয়া বাইতে হয়!”

পুড়া কহিলেন—“ও সব কথা থাক শৈল, এখন উঁহার নাওয়া-বাওয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দাও।”

এমন-সময় উমা ‘মাসি মাসি’ করিয়া দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহারে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া-ধরিয়া চুমা খাইয়া-খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

শৈলজা কমলার কক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্র দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারে টানিয়া লইয়া-গিয়া বস্ত্র পরিয়া ধান করাইল—নিজের ভাল কাপড় একখানি বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। কহিল, “কাল রাত্রে বস্ত্র ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই! চোখ বসিয়া গেছে যে! ততক্ষণ তুই বিছানাঘর একটু গড়াইয়া নে! আমি রান্না সারিয়া আসিতেছি।”

কমলা কহিল—“না দিগ্ধ, তোমার সঙ্গে,
চল, আমিও রাত্রাধরে যাই।”

হই সখীতে একত্রে রাখিতে গেল।

চক্রবর্ত্তিগুড়া অক্ষয়ের পরামর্শে যখন
কালীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন,
শৈলজাও ধরিয়া গড়িল—“বাবা, আমিও
তোমাদের সঙ্গে কালী যাইব।”

গুড়া কহিলেন—“বিপিনের ত এখন ছুটি
নাই।”

শৈল কহিল—“তা হোক, আমি একলাই
যাইব। ঐ আছেন, উঁহার অজ্ঞবিধা
হইবে না।”

স্বামীর সহিত একজন বিজ্ঞেদের প্রস্তাব
শৈল পূর্বে কোনোদিন করে নাই।

গুড়াকে রাজি হইতে হইল। গাজিপুর
হইতে বাজা করিলেন। কালীঠে গেলেন নাথিয়া

দেখেন, উমেশও গাড়ি হইতে নামিতেছে।

—“ঘায়ে, তুই এলি কেন রে!” সকলে যে
কারণে আসিয়াছেন, তাহাও সেই একই
কারণ। কিন্তু উমেশ আজকাল গুড়ার গৃহ-
কাণ্ডে নিমগ্ন হইয়াছে—সে একজন অকস্মাৎ
চলিয়া আসিলে গৃহিণী অত্যন্ত রাগ করিবেন
জানিয়া সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া
উমেশকে গাজিপুরে কিরাইয়া পাঠান। তাহার
পরে কি ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।
সে গাজিপুরে কোনোমতেই টিকিতে পারিল
না। গৃহিণী তাহাকে বাজার করিতে
পাঠাইয়াছিলেন, সেই বাজারের পয়সা গইয়া
সে একেবারে গঙ্গা পার হইয়া টেননে
আসিয়া উপস্থিত। চক্রবর্ত্তিগৃহিণী সেদিন
এই ছোকরাটির জন্য বৃণা অপেক্ষা করিয়া
ছিলেন।

ক্রমশঃ ।

রামায়ণের রচনাকাল ।

ভাষাবিচার ।

“বস্তু প্রযুক্ত কুশলো বিশেষে
পদ্যান্ ব্ধানং ব্যবহারকালে ।
সোহনন্তমাপ্রোচি ভগ্নঃ পরম
ব্যবহোপাযং দ্রুঘাতি চাপসংঘেঃ ।”

মানবসমাজে মনের ভাব প্রকাশ করিবার
জন্ত বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহা
প্রধানতঃ তিনবিধ;—নীরব ও সরব। ইন্দ্রিত,
চিত্ত ও লিপি ভাবপ্রকাশের নীরব উপায়।

সরব উপায়ের সাধারণ নাম ধ্বনি। তাহা
ব্যক্তাব্যক্তভেদে দ্বিবিধ। তাহাই সাধারণতঃ
ভাবানামে পরিচিত। প্রায়োপভোগে ভাব
হই শ্রেণীতে বিভক্ত;—সাহিত্যের ভাষা এবং
কথোপকথনের ভাষা।

কথোপকথনের ভাষাই প্রথমে উদ্ভাবিত
হইয়াছিল। তাহার তুলনায় সাহিত্যের ভাষা

অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উৎকৃষ্টতার উৎপত্তি-
তান এক হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের
অভাব নাই । সাহিত্যের ভাষা সুসংযত ;
কথোপকথনের ভাষা অসংযত । সাহিত্যের
ভাষায় পরিবর্তনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প ;
কথোপকথনের ভাষা নিম্নতর পরিবর্তনশীল ।
সাহিত্যের ভাষা দেশকালপাত্রের প্রভাব
অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পূর্ণাঙ্গ
বচনেষে বহুলোকের মধ্যে একভাবে বর্তমান
 থাকিতে পারে । কিন্তু কথোপকথনের ভাষা
 তাহার পূর্বেই দেশকালপাত্রভেদে নানা মূর্ত্তি
ধারণ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া যায় ।
ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের ভাষা অত্মপি
বর্তমান আছে ; পুরাতন কথোপকথনের
ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে ।

ভাষা প্রথমে সাংসারশূন্য উচ্ছ্বল অবস্থায়
কোনরূপ সাংসারিক কথোপকথনের প্রয়োজন
সাধন করিত । সে ঠিক কতদিনের কথা,
মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তাহার
কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই ।
তাহার পর ধীরে ধীরে সাংসার সাধিত হইয়া,
সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া, মানবভাষা ক্রমশঃ
উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়াছে । মানব-
সমাজের সর্বপুণ্যতম সাহিত্য ভারতবর্ষের
সংস্কৃতসাহিত্য । তাহা কত পুরাতন, সভা-
সমাজের সুধীশ্বর তাহা নির্ণয় করিবার অল্প
লাভাঙ্কিত । তথাপি এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই
ঐতিহাসিক তথ্যরূপে স্বীকৃত হইবার উপযুক্ত
হয় নাই । এখনও তাহার অসুসন্ধানকার্য্য
পরিচালিত হইতেছে ।

সংস্কৃতভাষা কত পুরাতন, কে তাহার
কালনির্ণয় করিবে ? সেবারে কোন

সাহিত্য ইতিহাস বর্তমান নাই । কতকালে
ভাষা ধীরে ধীরে সাংসারমন্স্বর হইয়াছিল,
তাহাই বা কে বলিবে ? তাহারও কোন
ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না । বহু ব্যাকরণ
প্রচলিত ও বিস্মৃত হইবার পর, যে পানিনিয়
ব্যাকরণ অবশেষে ঐতিহাসিক করিয়াছে,
তাহা যে কত পুরাতন, তাহারও মীমাংসা
করিবার উপায় নাই ।

যে ভাষা মানবজাতির সর্বপ্রাচীন
সাহিত্যরচনার পরিচয় প্রদান করিয়া, সভা-
সমাজে ভারতবর্ষের নাম চিরগৌরবান্বিত
করিয়াছে, তাহা কি কেবল সাহিত্যের
ভাষা ? তাহা কি কখনও কথোপকথনে
ব্যবহৃত হইত না ? এতপ্রকার মীমাংসা
করিবার জন্য কোতুলক প্রবল হইলেও, ইহার
মীমাংসা করা সহজ বলিয়া বোধ হয় না ।
পূর্বের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয়
করিবার উপায় নাই । পানিনিয় সময়ে
কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত,
তাহারই কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

পানিনিয়হে যে সকল শব্দের অস্থানাসন
সাধিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে
দেখিতে পাওয়া যায়,—পানিনি ধ্বনি-
মাত্রকেই “শব্দ”-শব্দের অন্তর্গত করেন নাই ।
তাবাকার তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার
জন্য ধ্বনিকে “শব্দ” ও “অশব্দ” নামক দুই
ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন । অশব্দ
অনিবা ; তাহার জন্য পানিনিয়হে রচিত হয়
নাই । শব্দাশ্বশাসনের জন্যই পানিনিয়হে
রচিত হইয়াছিল । সুতরাং “শব্দ”-শব্দের
অর্থ,—সংস্কৃত বা সাধু শব্দ ।

অশব্দ ব্যাকরণ হইতে নির্দ্বন্দ্বিত

হইলেও, জনসমাজের কথোপকথন হইতে নির্মালিত হইতে পারে নাই । বরং শব্দ অপেক্ষা অপশব্দের সংখ্যাই যে অধিক ছিল, ভাষাকার তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।^{*} লোকের কথোপকথনে অপশব্দের ব্যবহার করিত ; তথাপি তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা ছিল । প্রধান চেষ্টা অপশব্দ ব্যবহারের নিষা । তাঁহা রেজাচার বলিয়া নিষিদ্ধ !

একালের সভা ও অসভা শব্দের ভ্রাস্য সেকালের আর্গা ও অনার্গা শব্দ লোকসমাজের বিবিধ অবস্থার পরিচয় প্রদান করিত । আর্গা-অনার্গার ভেদে অস্ত্রাশি পুণ্ডরীক হইতে দ্বীকৃত হয় নাই । এখনও সভা-সমাজ অবস্থানাম গ্রহণ করিতে অসম্মত । সেকালের আর্গাগণ আর্গাধারকার্য ইহা অপেক্ষাও লাগানিত ছিলেন । সুতরাং ভীহাদিগকে নানা বিষয়ে অনার্গার সহিত পার্থক্যকার্য করিতে হইত ।

• প্রধান পার্থক্য ভাষায় । কে শিক্ষিত হুগত্য, কে অশিক্ষিত অসভা, কথোপকথনেই তাহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । সুতরাং আর্গাগণ যে কথোপকথনেও পার্থক্য সার্থক বরদীল ছিলেন, তাহা অসম্মত কহিত বাধ্য নাই । পানিনিহিত এই অসম্মতের পক্ষসমর্থন করে ।

পানিনি সমগ্র সংস্কৃতশব্দকে “দ্রব্ধ” ও “ভাষা” নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন । “দ্রব্ধ” যে সাহিত্যের ভাষা, কথোপকথনের নহে তাহা বৃত্তিতে কোনও

ইতস্ততঃ হয় না । পানিনি ভাষাকে “ভাষা” নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও কি কেবল সাহিত্যের ভাষা ? পানিনি ভাষা-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া দান নাই । উত্তর-কালের অনেক টীাকাকার তাহাকে লোক-সমাজের “কথোপকথনের ভাষা” বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন ।[†] এই ব্যাখ্যা হুগত্য হইলে, পানিনির সময়ে কথোপকথনে আর্গাসমাজে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত থাকাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় । কিন্তু উত্তরকালের টীাকাকারের ব্যাখ্যা ধরিয়া এক্ষণ সিদ্ধান্ত করা সকলে সম্মত বলিয়া স্বীকার করিবেন না । অল্প প্রমাণের আবশ্যক । কারণ, অনেকেই বলিয়া থাকেন,—“সংস্কৃতভাষার গঠন-প্রণালীই এক্ষণ সিদ্ধান্তের প্রধান অন্তরায় । সমুচিত শিক্ষা ভিন্ন যে ভাষা অধিগত হয় না, সে ভাষার কথোপকথন সম্পাদন করা সম্ভব নহে ।” এ বিষয়ে একালের অভিজ্ঞতা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না । আমরা একালের লোক ; ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া বহুক্রমে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করি । আমাদের পক্ষে সে ভাষার কথোপকথন সম্পাদন করা সম্ভব হয় না । কিন্তু সংস্কৃতভাষাই যখন আর্গাসমাজের ত্রিগুণিত ভাষা ছিল, তখন আর্গাসমাজের পক্ষে সে ভাষা শিক্ষা করা বা তাহাতে কথোপকথন সম্পাদন করা এক্ষণ কঠিন ছিল না । শিক্ষিতসমাজের পক্ষে সংস্কৃতে কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার করিবার প্রথা রূপেকান্তত আধুনিক সময়েও প্রচলিত ছিল । এদেশে এখনই পুনরায়

* ভূয়াসংলপনাদি অসম্মতঃ স্মৃতাঃ । এইকল্পং হি শব্দস্ত বহুবচনভাষাঃ ।

† ভাষ্যে লোকোপনয়নং পরিপাতিত ইতি দৃষ্টব্যতায়াঃ ।

আর্য্যগৌরবসংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, তখনই সংস্কৃতভাষার কথোপকথন করিবার হীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। “সরস্বতীকর্ণা-
তরঙ্গ” নামক মূল্যবান গ্রন্থে ইহার একটি
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিক্রমাদিত্যের
সময়ে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষাই ব্যবহৃত
হইত। শিক্ষিত ব্যক্তিমাঝেই সংস্কৃত
কথোপকথন করিতেন, এই কথা বারু কবি-
বার জন্ত বলা হইয়াছে—“কে না সংস্কৃতে
কথোপকথন করিত ?” ইহা অতিশয়োক্তি
হইলেও, কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহার
করাই যে সুব্যবস্থা হইয়াছিল, এতদ্বারা
স্বাভাবিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

অন্তর্দেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের
ইতিহাসের নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে।
ভারতীয় পুরাতত্ত্বশাস্ত্রের সময়ে সেই
পার্থক্য অল্প রাখা আবশ্যিক। অন্তর্দেশের
ইতিহাস ক্রমোন্নতির ইতিহাস; ভারতবর্ষে
‘কলংকাল পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত
হইবার পর, অবনতির সূত্রপাত হইবার
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি পুরাকাল
হইতেই তাহার আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।
একদা ভারতবর্ষ অধায়ন-অধাপনার নিবৃত্ত
থাকিয়া, জ্ঞানগৌরবের সমুদ্র-শিখরে আরো-
হণ করিয়াছিল। তখন আর্য্যনায়েই
সুশিক্ষার সমুদ্রত হইয়াছিলেন। তাহার
শ্রেষ্ঠ হইতে চাহিতেন না; প্রাণপণে আর্য্য-
চার রক্ষা করিতেন; কথোপকথনেও অনা-
র্য্যের সহিত পুণ্ডরীকাক্ষর বন্ধন হইতেন।
তৎকালে তাহাদের পক্ষে সংস্কৃতভাষার

কথোপকথন করিবার চেষ্টা করা বিচিত্র
নহে; তাহাই বরং স্বাভাবিক। শাস্ত্রেও
তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।†

সেকালের ভারতবর্ষের শিক্ষিতসম্প্র-
দায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের আচারব্যব-
হারের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা
যায়,—জ্ঞানানুশীলনই ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষ্য
বলিয়া পরিচিত ছিল।† তদন্ত শাস্ত্র বলি-
তেন—

“ব্রাহ্মণে নিকারুণ্য ধর্মঃ বড়নো য়েসোহযোগ্যো
জ্যেষ্ঠঃ।”

ব্রাহ্মণকে বিনা কারণেই বড়ন বেম অধ্য-
য়ন করিতে ও ধর্ম জ্ঞানিতে হইবে। এই
শাস্ত্রশাসনের মর্ম এই যে, ব্রাহ্মণকে তাহার
পদমর্যাদারক্ষার্থই সুশিক্ষিত হইতে হইবে।
একদা এই শাস্ত্রশাসন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-
সমাজে শিক্ষার প্রভাব একদা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছিল যে, বহুশতাব্দীর অধঃপতনের
পরেও, অত্যাধিক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সংখ্যা
নিকান্ত বিরল। সেকালে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ
শলবিধানের জ্ঞান অপরিচিতি ছিল।

ব্রাহ্মণকে যে মহোচ্চপদবী প্রদান
করিয়া পুরাতন ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের চরণে
আত্মবিক্রয় করিতে লজ্জিত হইত না, ব্রাহ্ম-
ণের পক্ষে সে পদমর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব
হইত না,—তাহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা
করিয়া মানবজীবনে ভূদেবরূপে অনন্দমাজে
বিচরণ করিতে হইত। কালে ব্রাহ্মণের
অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার
গতিরোধের জন্ত শাস্ত্র নানা চেষ্টার প্রবৃত্ত হইয়া-

ছিলেন। উত্তরকালের ব্রাহ্মণ সর্গনা সংকৃত-
তা বা ব্যবহার করিতেন বলিয়া বোধ হয়
না; অত্যাশংক্যে যজ্ঞকর্মে নিবৃত্ত
হইয়াও অশ্লথ ব্যবহার করিয়া বসিতেন।
তাহার জ্ঞান প্রাপ্তিস্থের ব্যবহার প্রচলিত
হইয়াছিল।^{১০} ব্রাহ্মণকে তাঁহার পবিত্র
পদমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত উত্তরকালের
মনোবিগ্নস্বানাক্ষেপে-চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।
পতঞ্জলির মহাত্ম্যবোধ আরম্ভেই তাহার প্রমাণ
প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ভারতবর্ষের অধ্যা-
সমাজ বিনা প্রয়োচনার ব্যাকরণ অধ্যয়ন
করিত, সেই ভারতবর্ষে বসিয়া পতঞ্জলি
ব্যাকরণ-অধ্যয়নের প্রয়োজনসংস্থাপনার্থ গ্রহা-
রম্ভেই দীর্ঘবক্তৃতার অবতারণা করিতে বাধ্য
হইয়াছেন।^{১১} ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিব কেন ?
এই প্রশ্নের অবতারণাই অদ্যপও অস্মর স্মৃনা
করিতেছে। পতঞ্জলি প্রাপণে ব্যাকরণ-
অধ্যয়নের বিবিধ-প্রয়োজন-সংস্থাপনের জন্ত
বাক্যগুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার
একটি তর্ক এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ-
যোগ্য। তাহা তর্ক নহে; তাহার নাম
উক্তননা। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,
আর কোন কারণে না হউক, আমরা
শ্রেষ্ঠ না হইয়া পড়ি, এইজন্যই ামাদিগকে
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইবে!†

আর্যাসমাজের শব্দে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়া
নিয়তির নিদ্বার বিষয় বলিয়া পরিচিত
না থাকিলে, ব্যাকরণ-অধ্যয়নের জন্ত এইরূপ
তর্কে উক্তননা করিবার চেষ্টা হইত না।

পানিনির সময়ে আর্যসমাজে কথোপ-

কথনেও সংকৃতভাষা ব্যবহৃত হইত; কাষ্ঠা-
য়নের সময়ে কীথোপকথনে সংকৃতভাষার
ব্যবহার না করিলে কি কিত হইত, তাহার
আলোচনার সুজগত হইয়াছিল; পতঞ্জলির
সময়ে বিশেষ বিশেষ কার্যে কথোপকথনেও
সংকৃতভাষা ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত
রাখিবার জন্ত বর্ণনামা চেষ্টা করা হইয়া-
ছিল। পানিনি, ক.তায়্যয়ন ও পতঞ্জলির যুগে
কথোপকথনের ভাষার এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত
হওয়া যায়। রামায়ণ রচিত হইবার সময়ে
কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত,
তাহার সীমাংসা করিতে পারিলে, রামায়ণে
কোনু সাহিত্যযুগের প্রাপ্ত—তাঁহা নির্ণয় করা
সম্ভব হইবে। রামায়ণে এই বিষয়ে কিরূপ
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

রামায়ণে এই বিষয়ের এমনোয় আধিক্য
না থাকিলেও, অভাবধাক্য দীকার করা যায়
না। প্রসঙ্গক্রমে যে দুই একটি প্রমাণ
প্রকৃত হইয়াছে, তাহাষ্ট বর্ণিত। তাহাতে
রামায়ণরচনাকালে শিক্ষিতসমাজের কথোপ-
কথনে সংকৃতভাষা ব্যবহৃত হইবারই পরিচয়
প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইবলনামক রাক্ষস ব্রাহ্মণ সাজিয়া প্রাচ্যে
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আহার করিত। সে
যখন নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইত, তখন
সংকৃতভাষা ব্যবহার করিত। বর্ণা—
“বারয় ব্রাহ্মণঃ ক্রমং ইবলঃ সংকৃতং বন্দু।
আময়তি বিপ্রান্ স প্রাজ্ঞান্দিব নিবর্ণঃ।” (৩.১১.১০০)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাঃ টীকাকার
বলিয়া গিয়াছেন, ইবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-

১০. আতিথ্যবিধানকঃ গ্রন্থাঃ প্রীতিভীয়াঃ শারবতীমিষ্টঃ নির্বপেৎ ।

১১. প্রাক্তা না সংকৃতঃ কথোপকথনঃ ।

কণের মনে বিশ্বাস-উৎপাদনার্থেই ত্রাণদায়ক সংকল্পভাষা ব্যবহার করিত। • ইহা ধারা রামায়ণরচনাকালে গ্রাণদায়কতার নিমন্ত্রণ-রীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পরিচয় কথোপকথনে সংকল্পভাষা ব্যবহৃত হওয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। ত্রাণদায়কতায় হইলে বেশত্বের পরিবর্তন করিলেই যথেষ্ট হইত না; তাহাকেও ত্রাণদায়ক উপ-বোধী করিয়া লইতে হইত। এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট। তথাপি রামায়ণে আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বোধো রাম-লক্ষ্মণের সহিত হনুমানের প্রথম কথোপ-কথন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৌতাবিরহিত রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ-সমতিবাহারে ধনামুকপর্জতসম্রিক্তপুং পম্পা-সরোবরের নিসর্গসুন্দর তটাত্মদেশে উপনীত হইলেন, তখন বালিতরসস্বত গৃহনিপ্লাসিত চতুর্দশী স্ত্রীধা ধনামুকে লুকারিত ছিলেন। তিনি রামলক্ষ্মণকে বালিপ্রেরিত গুপ্তচর মনে করিয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাহার 'বাকুলতা দেখিয়া বানরসেনাপাণ্ডা বাকুল হইয়া উঠিল; প্রাণ-ভরে ইতস্ততঃ খাবিত হইতে লাগিল; যে দেখানে ছিল, সকলেই স্ত্রীধারের সম্মুখে করজোড়ে সমবেত হইয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিল! কেবল এক বীর অচল-অটল-ভাবে আশ্রমবর্ষাদা রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি মহাবীর আশ্রমের। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

‘বন্যবিষমতাব্যঃ বিকতো চরিতুসব।

তঃ কল্পনং ক্রূঃ বেগ গভাশি বালিনম্ ॥ ৪২:১৫ ॥
 বাহার ভয়ে তুমি একদণ্ড উদ্বিগ্ন হইয়াছ,

সেই ক্রুরদর্শন বালিকে ত এখানে দেখি-তেছি না; তবে এত সমস্ত হইয়াছে কেন? হনুমানের এই উক্তিতে ফল হইল না দেখিয়া, তিনি পুনরায় বিকৃতভাবে স্ত্রীধারের আশ্রমবর্ষাদা প্রবৃত্ত করিয়াও আশ্রম বলিতে লাগিলেন—

‘মহো! লাক্ষ্মণস্বয়ং তে ব্যক্তমেব স্রবসব।

লঘুচিত্ততয়াস্মানং হাপরসি যো মতো ৪ ৥ ৪২:১৬ ॥

হায়! তুমি যে লাক্ষ্মণ, তাহাঁই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে! লঘুচিত্তের বশবর্তী হইয়া সঙ্কল্পাত্মক বুদ্ধিতে স্থির হইতে পারিতেছ না। ইহাতেও ফল হইল না। তখন হনুমান পুনরায় বলিলেন—

‘বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্রিভে: সর্বব্যচর।’

যাহা করিবে, বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন কোণে তাহা সাধন কর। এই শেষ কথা স্ত্রীধারের মনঃপূত হইল। তিনি হনুমানকেই তলা-নির্ধারণ মৌতাকার্যে বরণ করিলেন। তখনও প্রাণের ভয় দূর হয় নাই; তাই তিনি হনুমানকে চতুর্দশী গমন করিবার পরামর্শ দিয়া বলিলেন

‘ভো বরা প্রাকৃতেনেব দয়া জ্যেষ্ঠো স্রবসব।’

তুমি বাও, এই মানবযুগল কে, তাহার সন্ধান লও; কিন্তু ‘প্রাকৃতজনের’ জ্ঞান গমন কর। প্রাণের ভয়েই স্ত্রীধার এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে ‘প্রাকৃতেনেব’ শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন,—‘উদাসীনেনেব।’ তাহাতে ভাবার্থ পরিষ্কৃত হয় না। ‘উদাসীনের জ্ঞান গমন কর’ বলিলে, ওইপ্রকার অর্থবোধ হইতে পারে;—(১) প্রাণের আশা বিস-

ক্ষণ করিয়া যাও; (২) পরাসার ভার ছদ্মবেশে গমন কর। উত্তর অর্থাৎ ভাব-প্রকাশে অসমর্থ। এখানে দূতের প্রাণরক্ষার কৌশল-উদ্ভাবনাখাই সুগ্রীব ছদ্মবেশের উপ-দেশ দিয়াছিলেন; রামচন্দ্রও জানিতে পারিবেন না, অর্থাৎ কৌশলে কার্য সিদ্ধ হইবে। তাই সুগ্রীব হুহমানকে অশিক্ষিত পলিবাণীর ভার ছদ্মবেশে গমন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সুগ্রীবের আশঙ্কা ছিল, —ওরের বুদ্ধিমত্তার পরিত্যগ পাইলেই, চর বলিয়া মনেই করিয়া তাহাকে নিশ্চর নিহত করিবে। তিনি তৎক্ষণে ‘বোক; গাখিরা’ গমন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এখানেও প্রাণের তত্ত্ব সুগ্রীবের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ‘হুহমান’ ইহা বুদ্ধিহীন ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাণের ভয় না থাকিলেও সত্যসংবাদসংগ্রহের প্রয়োজন আছে। প্রাকৃতজনের ছদ্মবেশে গমন করিলে, রামচন্দ্র অবজ্ঞাবশত সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন; তাহার পক্ষেও সকল প্রশ্ন বিজ্ঞাসার অবসর উপস্থিত হইবে না। তাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও, সুগ্রীবোপনিষিৎ প্রাকৃতবেশ ধারণ করিলেন না; ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের সন্নিপত্ত হইলেন। যথা—

“কপিঙ্গা পরিভাষা হুহমান যকতায়নঃ ।

ভিক্ষুরূপং ততো জেহে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ ।” ৩৩২৪

এখানে “ভিক্ষুরূপের” বাখ্যায় টীকাকার “প্রাকৃততাপসরূপং” লিখিয়া সুগ্রীবের উপ-দেশের সহিত হুহমানের কার্যের সামঞ্জস্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়া ভাবার্থ পরিষ্কৃত হইবার বাধা প্রদান করিয়াছেন। আধুনিক

“ভিলকটীকার” এই বাখ্যায় মহাত্মা হুলসী-দাসের ভাষ্যরামায়ণের অনূত্পন্ন। সেখানে সুগ্রীব যাহা বলিয়াছেন, হুহমান যন্ত্রের ভার তাহাই করিয়া গিয়াছেন। যথা—

“অতি সজাত কং হন হুহমান ।

পুরুষ-দুগল বল-রূপ-নিধানা ।

যদি বহুতপ বৈশিষ্ট্যে ভাষি ।

কহি হুহমান! মিথ্য সেন দুখাই ।

বিগ্রহণ ধরি কপি উহ দহতি ।

মাথ নার পুঁহত বল ভাটতি ।”

ব্যর্থকিবাণত হুহমান একরূপ প্রকৃতির পাত্র ছিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ভিক্ষুর ভাষা—সংস্কৃতভাষা—ব্যবহার করিয়া, রামচন্দ্রের এত অকম্পে কাব্যসিদ্ধির আশায়, হুহমান সুগ্রীবের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, বোদ্ধাভূমারে ভিক্ষুরূপ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। উত্তরকালে “ভিক্ষু” বলিতে বোদ্ধা-ধরাবলম্বী “প্রাকৃত তাপস” বুঝাইত; তাহার প্রাকৃততঃবাই ব্যবহার করিতেন। এখানে সেই আধুনিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, পুরাতন গ্রন্থের বাখ্যা কারবার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে। ভিলকটীকার একরূপ বাখ্যাবিজ্ঞাটের অভাব নাই।

ভিক্ষুগণ পানিনিহ্রের নানা স্থানে উল্লিখিত। বোদ্ধগণ ঐ শব্দের সৃষ্টি করেন নাই; প্রচলিত সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পানিনিহ্রে যে ভিক্ষুগণ দেবিতে পাওয়া যায়, এমতক্রমে সেই ভিক্ষু-গণের শিক্ষাদাক্ষারও কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সন্যাসসভিক উঃ ৩৩২১০০১

এই স্তোত্রদ্বারা “ভিক্ষু” শব্দের ব্যুৎপত্তি

নির্দিষ্ট হইয়াছে। সন্মুখোক্তাধিকার উত্তর এবং আশংস ও তৎকালে এই উইটি থাকার উত্তর “তাক্কীনাথের” উ-প্রভার হয়। তদ-মুসারে চিকীর্ষু আশংস ও তিক্কু শব্দের উৎপত্তি। হুজাহুসারের তিক্কুশব্দের অর্থ— তিক্কীনাথ। হুজাহুসারের যে-কোন তিক্কীনাথকেই “তিক্কু” বলা যাইতে পারে। অতীত হুজ না থাকিলে, এই সিদ্ধান্তই প্রবল হইতে। কিন্তু অতীত হুজের তিক্কুর পরিচয় থাকার, তিক্কুমজাহুকেই “তিক্কু” বলা যায় না।

পাশ্চাত্যশিল্পালিঙ্গাঃ তিক্কুনটহুজাহুঃ ১৮৩১১১।
পাশ্চাত্যশিল্পালিঙ্গাঃ তিক্কুনটহুজাহুঃ এবং শিল্পালি-
প্রোক্ত নটহুজ অধ্যয়ন করিয়া বীহারী;
হুজপার হইতে, এই হুজের উদ্দেশ্যের কথাই
উক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যশিল্পালিঙ্গাঃ তিক্কুনটহুজাহুঃ প্রোক্ত “তিক্কু-
হুজ” এবং শিল্পালিঙ্গাঃ তিক্কুনটহুজাহুঃ প্রোক্ত “নট-
হুজ” প্রোক্ত থাকার কথা পরহুজাহুই বাক্ত
হইয়াছে। * এই সকল প্রমাণে জানিতে
পারি। বাক্ত,—সেকালের “তিক্কু” একশ্রেণীর
অধ্যয়নশীল সন্তান; তাহার তিক্কুরে কীবন-
ধারণ করিতে ন বলিয়া, “তিক্কু” নামে
কথিত। তাহার অর্থ—বিলাতী “ভ্যাগাথও”
নহে! হুজাহুসারের মনস্তত্ত্বের নিকট তিক্কুর
হুজাহুসারের উপনীত হইয়া, হুজাহুসারের মনস্তত্ত্ব-
রক্ষা সন্তত্ত্বভাবার কথোপকথন করিয়া,
তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।
তিক্কুশব্দের বক্ত হুজাহুসার, সাধারণত
তিক্কুশব্দের পক্ষে তাহার অধিক অধ্যয়নের
প্রয়োজন হইতে না। হুজাহুসারের কথোপকথনে
তাহার অধিক শাস্ত্রাধ্যয়নের পরিচয় প্রাপ্ত
হইয়া, রামজ্ঞে লক্ষণকে বক্তে লাগিলেন—

“নানুবেনবিনীতত নানুবেনবিনীততঃ।

নানুবেনবিনীতত নানুবেনবিনীততঃ ১৮৩১১১।

বিনীত হুজাহুসারের বিনীত হুজ নাহি, হুজাহুসার
ধারণ করেন নাহি, সাহবেদ জাত হুজ নাহি,
তাহার পক্ষে একপভাবে বাঃক্যাক্তিধারণ করা
সম্ভব নহে। এই প্রোক্ত “বিনীত”শব্দের
ব্যখ্যায় তিক্কীনাথের “প্রাতিশাখ্যের”
উল্লেখ করিয়াছেন।

“নুন ব্যাকরণ কৃত্তমেন বহু প্রভৃৎ।

বহু ব্যাকরণতেন ন কিঞ্চিপশ্চিতকঃ ১৮৩১১১।

রাম আরও বলিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই
বহুপ্রকারে সমগ্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছে;
অনেক কথোপকথনের মধ্যেও কিছুকিছু
অপলব্ধ ব্যবহার করে নাহি। এই বর্ণনার
সেকালের কথোপকথনে অপলব্ধ পরিহার
করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষা ব্যবহার
করিতে পারি। যে জনসমাজের প্রাক্ত-আক-
র্ষণের উপায় বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারই
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামজ্ঞে সেই
সমুদ্রত লিঙ্কাহুসারের মহাকাব্য। এ বিষয়ে
অধিক উদ্দেশ্য উদ্ভূত করা অনাবশ্যক।

সেকালে কোন্ শ্রেণীর নরনারী কথোপ-
কথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার
প্রধান প্রমাণ—ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র।
অধ্যাপক ওয়েবস্টারের পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ
ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব স্বীকার
করিতে অসম্মত হইলেও, তাহাকে সিন্ধু
বংশের পরকালবর্তী বলিতে সাহস করেন
নাহি। প্রকৃতপ্রস্তাবে নটহুজাহুসারের
পুরাতন, পাণিনিহুজাহুসারের তাহার পরিচয়
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তথাপি তাহাকে
নটশাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার

কটি চর নাহি। নট ও নাট্যাশালা যে নর্তক ও নৃত্যাগার নহে, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ-মাজ্জেই স্বীকার করিবেন। নাট্যাশালার নৃত্য হইত, নট নৃত্য করিত; তথাপি নটের নাম “নর্তক” এবং নাট্যাশালার নাম “নৃত্যাগার” বলা যায় না। নৃত্য অভিনয়ের অঙ্গীভূত ছিল। ভারতীয় নাট্যসাহিত্য কত পুরাতন, এখানে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। তাহা পুরাতন হউক বা আধুনিক হউক, তাহাতে সমাজচিহ্ন স্পষ্টে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। স্তত্রাং প্রবাক্যব্য অপেক্ষা দৃষ্টকাব্য ঐতিহাসিকের নিকট অধিক আগ্রহের পানপ্রী। ভারতীয় দৃষ্টকাব্যের অধিকাংশ গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল গ্রন্থের নাম সুপরিচিত, তাহারও সকল গ্রন্থ বর্তমান নাই। একদা ভারতীয় নাট্যসাহিত্য যে কিরূপ বিপুলতার ধারণ করিয়াছিল, অজ্ঞাপি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র নাট্যসাহিত্য “রূপক” ও “উপরূপক” নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত ছিল। “আগে রূপক, তাহার পর উপরূপক।” ভরতশ্রীতি “নাট্যাগ্রে” রূপকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, উপরূপকের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রূপক বর্ণ শ্রেণীতে ও উপরূপক অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতে যে বহুগ্রন্থ বর্তমান ছিল, তাহা অভিনয়োক্তি নহে। বহু গ্রন্থ না থাকিলে, শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। এই সকল রূপক ও উপরূপকের নামা গ্রন্থ বক্তৃতাব্যয় অনুদিত করিয়া, নাট্যকোষিৎ খননমথ্যাত ত্রিষ্মোতিরিব্রন্থনাথ বঙ্গসাহিত্যের মধ্যমাতৃভি

করিয়াছেন। তাহাতে লোকের লোক-ব্যবহারের নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ সন্নিধারণের গোচর হইতাত্রে। কিন্তু লোকালে কোন্ শ্রেণীর লোকে কথোপ-কথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিত, অনুদিত গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্ব্যতীত মূলগ্রন্থের পরোক্ষ হওয়া আবশ্যক। তাহাতে কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

প্রবাক্যব্য অর্থাৎ হইত; দৃষ্টকাব্য অধ্যয়ন্যথ বিব্রতিত হইত না। তাহা নট-নারীর সমুখে অভিনীত হইত। প্রত্যেকব্য লোকব্যবহারের অভিনয় করিয়া, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদান করাই নাট্যসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। স্তত্রাং যে সকল ব্যবহার লোকসমাজে অপরিচিত ছিল, নাট্যাভিনয়ে পাত্রপাত্রীগণ সেসকল ব্যবহার করিলে, অভিনয়ের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবার কথা। নাট্যসাহিত্যের পাত্রপাত্রীগণ উত্তম ও অধম নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তম পাত্রের সংস্কৃতে, অধম পাত্রের প্রাকৃতভাষায় কথোপ-কথন করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাত্রীগণ সাধারণত প্রাকৃতভাষাই ব্যবহার করিতেন; বিশেষ প্রয়োজনে সংস্কৃতভাষা-ব্যবহারেরও নিয়ম ছিল। তাপসীগণ উত্তম পাত্রের স্তায় সংস্কৃতভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। নাট্যসাহিত্যের এই রচনাত্মক লোকব্যবহারের বিশিষ্ট প্রমাণ। রূপকে সংস্কৃতের বাহ্য; উপরূপকে প্রাকৃতের আবহা। দুই শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য, দুইটি সাহিত্যধর্মের রচনাত্মকতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহাতে পুরাকালের কথোপ-

কখনে সংস্কৃতভাষার প্রাধান্ত এবং উত্তরকালের
কথোপকথনে প্রাকৃতভাষার প্রাধান্ত একটি
হইতেছে। সংস্কৃতভাষা কথোপকথনে কদাপি
ব্যবহৃত হইবার দ্ব্যাত না থাকিলে, নাট্য-
সাহিত্যে এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতাম না।

লোকব্যবহার নানা ভাষাে বিভক্ত।
রাজধানী, সজ্জনসমাজে, ক্রমবিক্রমব্যাপারে,
গৃহকাৰ্য্যে, নানা স্থানে নানা কাৰ্য্যে নানা
ভাবে নরনারীকে কথোপকথন সম্পাদন
করিতে হয়। সকল স্থানে ও সকল কাৰ্য্যেই
এক প্রকারের ভাষা ব্যবহার করিলে কাৰ্য্য
সিদ্ধ হয় না।

শ্রামণ্য নিরক্ষর ভূতা বা পল্লিবাসী কৃষক
ও শ্রমজীবীর সহিত বৈষ্ণব ভাষার কথোপ-
কথন করিয়া থাকি, গৃহে, সজ্জনসমাজে
বা বিচারালয়ে দেরূপ ভাষার কথোপকথন
করিতে পারি না। প্রব্রাজনের অমু-রাথেই
ভাষার পার্থক্য রক্ষা করিতে হয়। সেকালে
এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়া-
ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। এরূপ
সিদ্ধান্তের অমুকুল কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত
হওয়া যায় না। রাজধানী সংস্কৃতভাষাই
প্রযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল। অত্ৰাপি বে
সকল পুরাতন ভাষাশাসন আবিস্কৃত হইয়া,
সামান্যগণকে সেকালের রাজ্যভার মর্ঘ্যোৎপা
করিয়া, পুরাতন্যের সন্ধান প্রদান করিতেছে,
তাহাতে সংস্কৃতভাষাই ব্যবহার দেখিতে
গওয়া যায়।^{১০} সুতরাং রাজকাৰ্য্যে ও বিচার-
ালয়ে বে সংস্কৃতভাষাই ব্যবহৃত হইত,
গৃহাতে সংস্কৃত নাই। শাস্ত্রীরবিচারে

সজ্জনসমাজে অত্ৰাপি সংস্কৃতভাষাব্যবহারের
রীতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। এই রীতি
পুরাত্নাণে প্রবল ছিল। এই সকল কারণে,
সেকালের লিখিতদস্তাবেজের ব্যাবহারিক
কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত থাকাই
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ভারতবর্ষের পুরাতন
কথোপকথনের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার
তথ্যগ্রন্থসকলের মত সন্নিতি ইংলণ্ডের "রয়াল
এশিয়াটিক সোসাইটি" নামক স্থানসমিতিতে
নানা আলোচনার ফলপাত হইয়াছে। তাঁহা-
দের তর্কবিতর্ক এক্ষণে অবস্কারে^{১১} সন্নিতি
পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। পুরাত্নালে
ভারতবর্ষে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্য-
হৃত হইবার রীতি তাঁহারাও স্বীকার
করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কথোপকথনের ভাষা নিরন্ত পরিবর্তন-
শীল। সুতরাং কোনকালে ভারতবর্ষে
সংস্কৃতভাষা নিরন্ত কথোপকথনে ব্যবহৃত
হইবার রীতি থাকিলেও, তাহা ক্রমে পরি-
বর্তিত হইয়া প্রাকৃতভাষার মর্যাদাবৃদ্ধি
করিয়া দিয়াছে। কোন সময়ে এই পরি-
বর্তনের ফলপাত হয়, তাহার ঐতিহাসিক
তথ্য নির্ণয় করিতে পারিলে, পুরাতন সংস্কৃত-
সাহিত্যের ইতিহাসসঙ্কলনের অনেক সুযোগ
প্রাপ্ত হওয়া বাইতে পারে।

কাত্যায়নের বে "ব্রাহ্ম-শ্লোক" রচনা
করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার
একটি শ্লোক "মহাভাবো" উদ্ধৃত হইয়াছে।
"মহাভাবোর" টীকাকার মহামহোপাধ্যায়
জৈরটাস্বয়ং কৈরট তাহাকে "কাত্যায়ন-

^{১০} পালিতা ধানিবদ্ধ আলোকশাসনকে রাজশাসন বলা যায় না; তাহা ধর্মশাসনমিলি।

বিরচিত" বলিয়া বাক্য করিয়া গিয়াছেন। • তাহা এই প্রবন্ধের শিরোভাগ অঙ্গভূত করিতেছে। এই লোকে কাত্যায়নের সময়ে কথোপকথনের রীতি কিরূপ ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে অশ্বপক্ষস্বার্থের নিন্দা এবং বলাবৎ ব্যবহারকালে সাধুশব্দ প্রয়োগের শুভকল্য কোষ্ঠিত হইয়াছে। • কাত্যায়নের সময়ে ভারতবর্ষ শিক্ষাদীক্ষা ও লোকব্যবহারে পূর্বাভাস হইতে কিয়ৎপরিনামে খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন বৌদ্ধধর্মের প্রবল-প্রভাব ভারতবর্ষের সকল সীমা অতিক্রম করিয়া বিগ্নবিগ্নে প্রধাবিত হইয়াছে। বে প্রাকৃতভাষা পুরাকালে সজ্জনসমাজের কথোপকথনেও ব্যবহৃত হইত না, তাহাই বর্ণ প্রচারে, শাস্ত্রবিচারে ও সাহিত্যরচনায় প্রচলিত হইতেছিল। এই বিপ্লববুগে অর্থা-সমাজ বেনরক্ষার্থ, অর্থ্যাচাররক্ষার্থ, পূর্ণ-গৌরবরক্ষার্থ নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। "ভাষা"লোকের অশ্বপক্ষনিন্দার ও সাধুশব্দ প্রয়োগের তাহারই ক্রীণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথাপি সজ্জনসমাজের কথোপকথনেও ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া, কালে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনেও তাহা স্থানলাভ করিয়াছিল। সে পরিবর্তন-বুগে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা যুগপৎ ব্যবহৃত হইবার কথা। কারণ, পরিবর্তনবেগ বতই প্রবল হউক, তাহা পূর্বরীতিকে সচরা ভাষাইয়া-লইয়া বাইতে পারে না। নূতন আদিয়া পুরাতনের

সঙ্গে মিলিত হইলে, কিছুদিন একদমে অবস্থানের পর, নূতনের উচ্ছলণাকে পুরাতনের ক্রীণপ্রভা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। নোভাপাক্ষে সংস্কৃতসাহিত্যে এই পরিবর্তনবুগের কথোপকথনের ভাষার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ সম্ভাষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে প্রমাণ "নিক্ক-পরিশিষ্টের" ভাষাকারের লেখনীগ্রহণ। তাহার সময়ে সংস্কৃত "সেবভাষা" এবং প্রাকৃত "মাগধী ভাষা" নামে কথিত হইত। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ কথোপকথনে কিরূপ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া, "নিক্ক-পরিশিষ্ট" ভাষাকার লিখিয়া গিয়াছেন, "—তৎকালে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনে উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত—

"যাচ সেবামা যাচ মাগধাম।"

কথোপকথনের ভাষার এইরূপ পরিবর্তনের জায় সাহিত্যের ভাষারও নানা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। • সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, দার্শনিকগণের ব্যবস্থানের পর, নানা পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। রচনারীতি চিরকাল একরূপ থাকে না; ভাষার পরিবর্তন ঘটবার পূর্বে রচনারীতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। রচনারীতি দেশকালপাক্ষভেদে পূর্ণক না হইয়া পারে না। একই দেশে একই কালে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনারীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাহা ব্যক্তিগত পার্থক্য। শুদ্ধারা কোন, ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত পার্থক্যের জায়, কালগত পার্থক্য দেখিতে

পাওয়া যায়। তদ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা সম্ভব।

এক যুগে সরল স্থগলিত বাকাবিভক্ত্যঙ্গের প্রভাব; অল্প স্থল আবার নিরতিশয় দুঃস্থ আভ্যন্তরীণ বচনাবলীর প্রাভুত্ব; তার-তীর সংকুতসাহিত্যে একপ্রাণ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এক যুগে রূপক অপেক্ষা সহজ বর্ণনার আধিক্য; অল্প যুগে সকল বর্ণনার যথোই রূপকের আতিশয্য;—ইহার প্রমাণও নিত্যস্থূল্য নহে। এক যুগে এক শব্দের একরূপ অর্থ; অল্প যুগে সেই শব্দের অল্পরূপ অর্থ;—তাহারও নানারূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল পার্থক্য বাতীত, সংকুতসাহিত্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এক যুগে যে শব্দ কেবল বৈদিক সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভাষাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না; অল্প যুগে তাহাই ভাষা-সাহিত্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক যুগে বাহ্য ভাষাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, অল্প যুগে তাহার ব্যবহার বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত হইবারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণে এই সকল রচনারীতির পার্থক্যের অভাব নাই। পানিনিয়ন্ত্রের সহিত পরবর্তী বাস্তবিক ও ভাষার সমালোচনা করিলে, বিভিন্ন সাহিত্য-যুগের রচনারীতির বিবিধ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; রামায়ণের সঙ্গে বাস্তবিক, ভাষা ও পানিনিয়ন্ত্রের সমালোচনা করিলেও, সেইরূপ নানা পার্থক্য দৃষ্টপথে পতিত হয়। সেই • সকল পার্থক্য বিচার করিতে পারিলে, রামায়ণ কোন সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভাষাবিচার নিরতিশয় প্রমাণ

দুঃস্থ ব্যাপার। ভাষাতে চতুষ্কোণ করিয়া সম্পূর্ণ ভূতকার্য্য হইবার আশা-করিতে পারি না। যে-পরিমাণ অধ্যয়নলব্ধ অভিজ্ঞতা থাকিলে এই কার্য্য স্থগম্য হইতে পারে, তাহার অভাবে ইহাতে হতক্ষেপ করিলে, অনধিকারচর্য্যের অন্তর অত্যাচারে স্থল উদ্বেগ বিনষ্ট হইবারই আশা উপস্থিত হয়!

রামায়ণের ভাষার বিশেষত্ব কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, বহুবার রামায়ণের আন্তর অধ্যয়ন করা আবশ্যিক। প্রথম অধ্যয়নে তাহা প্রতিভাত না হইতে পারে; ক্রমে তাহা স্থগষ্ট প্রতিভাত হয়। বাহ্য সর্ল্যাগ্রে দৃষ্টপথে পতিত হয়, তাহা সচরাচর “আর্ষপ্রয়োগ” নামে স্থপরিচিত। • রামায়ণে এই শ্রেণীর প্রয়োগের বাহন্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্ষপ্রয়োগের প্রচলিত অর্থ—ঋষির প্রয়োগ। বাস্তবিক ভারতবর্ষের শেষ কবি হইলে, আর্ষপ্রয়োগ-অবলম্বনে রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা করা সহজ হইত। কিন্তু বাস্তবিকর পক্ষেও ঋষিনিষিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

“আর্ষপ্রয়োগ” নামে বাহ্য সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা ঋষিমাণ্ডেয় পদ-মর্যাদাপ্রাপ্ত রচনারীতি হইলে, তদ্বারা রচনাকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। তদ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে,—এই গ্রন্থ সাধারণ লেখকের লেখনীগ্রন্থ নহে; ইহা ঋষিগ্রন্থিত। কিন্তু বাহ্য সচরাচর “আর্ষ-প্রয়োগ” বলিয়া পরিচিত, তাহা কি কেবল ব্যক্তিগত রচনারীতি? রামায়ণের যে সকল প্রয়োগ “আর্ষপ্রয়োগ” বলিয়া পরিচিত, তাহার আলোচনার পন্থা হইলে, এই সিদ্ধান্ত

স্বীকার করা যায় না। “আর্থপ্রয়োগ” হইতে কাগজত রচনারোক্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। “আর্থপ্রয়োগ” টীকাকারদের সহজ ব্যাখ্যা। কোন প্রয়োগকে “আর্থ-প্রয়োগ” বলিয়া দিলে, পাঠক আর কিছু বিজ্ঞান করেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক সে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাহাকে “আর্থপ্রয়োগের” প্রয়োজন, আবশ্যক।

নিয়ম ও মূলকারণের অমূল্যদানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রীমারণের যে সকল প্রয়োগ “আর্থপ্রয়োগ” বলিয়া পরিচিত, তাহার আলোচনা না করিয়া, কোন সিদ্ধান্তে উপ-নীত হওয়া অসম্ভব। রীমারণের ভাষা-বিচারের প্রথম বিষয়—“আর্থপ্রয়োগ”। অতঃপর সর্বত্র তাহাতেই ইচ্ছাশ্রম করা আবশ্যক।

ঐ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

প্রার্থনা ।



হে পরমপিতাঃ, হে পিতৃভয় পিতৃগাম, এ সংসারে বাহার পিতৃভয়ের মধ্য দিয়া তোমাকে - পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অন্ত দশদিন হইল, তিনি ইহলোক হটতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমহত্যার জন্য উর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার স্তায় তোমার অভি-মুখে নিরত উপিত হইয়াছে। অস্ত্র তাহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাহাকে কি শাস্তিতে, কি অমৃত সতিধিক করিয়াছ—বিনি স্বর্ণ কামনা করেন নাট, কেবল ছয়াতপসোরিষ ব্রহ্মণেকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার অস্ত্র বাণের চরমাকাজ্ঞা ছিল, অস্ত্র তাহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থ-তার মধ্যে বেটন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার

নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্তকলাপ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দময়, তোমারই মধ্যে সুন্দর-ভাবে ধরত হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীব-নের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হই-য়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতৃত্বভীষণ করজোড়ে তোমার ধোয়াচারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতি-দানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত। তাহা গাপ, অপ-রাধ, কর্মঘাতা, কৃতঘাতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা দান নহে, তাহা দান। তাহা আনন্দের স্রোত,

সমীপের জাতি-ভাষা পিতৃশ্রম হইতে আশাশ্রিত্যে নিরন্তর রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতি কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃশ্রমের সেই অশ্রুচিহ্ন, সেই অপর্যাপ্ত যত্নের স্মৃতি, যে বিধগিতঃ, আর তোমাকে প্রণাম করি।

আজ আর পঞ্চাবৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে মহা অপর্যাপ্তভাষ্যক্রমে কি হৃদয় উপরিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃশ্রম একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দৃঢ় অপর্যাপ্ত সন্তরণপূর্বক কেমন করিয়া যে কুলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—আমাদের অতীত অসমর্থের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধর্মের মুখ হইতে বাঁচিয়াছেন। আমাদের অতীত রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্যাণ করাও কঠিন। সেই কল্যাণ ইতিহাস আমরা কি জানি! কতকাল ধরিয়া তাহাকে কি দুঃখ, কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্ষ্যয়ের মধ্যে দিয়া প্রতিদিন, প্রতি রাত্রি বাশন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অকূল ঐক্যের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকল্যাণ ভাগ্যপরিবর্তনের সমুদ্রে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্ষের সহিত দত্তারমান হইলেন! বাহ্যিক অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ ও আধ্যাত্মিক ভোগস্বাদের মধ্যে দাড়াইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাসলালিত্যের সংবেদনে বাস্তবিক হইতে বাহ্যিকের শক্তির চর্চা অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের মত অসহায় কে আছে! বাহ্যিকের বিপদের অপেক্ষা নিজের

অপরিণত চারিদিক ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অসহায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিত্তাভ্যাসকে পরীক্ষা করিয়া, ধনসম্পদের প্রকৃত প্রতিপত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্তসংযত শৌর্যের সহিত এই অসহায় পরিবারকে রক্ষা লইয়া দুঃখের সংসারের বিকল বাক্য করিয়াছেন ও রক্ষা হইয়াছেন, তাহার সেই অপর্যাপ্ত বীর্ষ, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিদ্বন্দ্ব্বের ভাগ্যস্বীকার আমরা মনে মনে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কি করিয়া এবং তদনুসরণ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অতীত সমস্ত অগ্র-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাহার সেই বিশুদ্ধ অকল্যাণ বসিষ্ট দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল-আশীর্বাদ আমরা যেন নিরন্তর নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অর্থের সহায়তার দৃষ্টিতে, তবে অগ্র-বস্ত্র-আশ্রয় সমুদ্রে সেই পিতার নিকটে প্রভা-নিবেদন করিতে আমাদের পক্ষে কঠিন হইতে হইত। সর্বপ্রকারে তিনি ধর্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অগ্র-বস্ত্র-আশ্রয় বাহ্যিক রক্ষা করিয়া, তাহার সহিত তিনি অসত্যের মানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা বাহ্যিক ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদবরূপ নির্গলগতিতে নিঃসঙ্কেতে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাহার বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয়ত

কৌশলপূর্বক তাঁহার পুণ্যসম্পত্তির বহুতর
অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন
যে, ধনগৌরবে বন্দী ধনীত্বের ইর্ষাভাজন
হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই
বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে
বিশ্বপতঙ্কৃত হইতে পারি।

যেহ সপ্তকের সময় একদিন তাঁহার
সম্মুখে একইকালে প্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের
পথ উন্মোচিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্ব
হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—
তাঁহার স্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসস্তম্ব ছিল
—তৎসবে যেদিন তিনি প্রেয়ের পথ নির্বাচন
করিয়া লইলেন, সেই মহাদিনের কথা আজ
যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা
করি, তাহা হইলে আমাদের বিশ্ববাস্যসার
ভীতভা শান্ত হইয়া আশ্রমে এবং সমস্তোৎসব
অনুষ্ঠানে আমাদের হৃদয় অভিভূত হইবে।
অর্জনের দ্বারা তিনি বাহ্য আমাদিগকে
বিদ্যাছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি;
বৃদ্ধনের দ্বারা তিনি বাহ্য আমাদিগকে
বিদ্যাছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত
গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু
তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিদ্বান হইতেন, তবে
তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিগণকে উত্তরোত্তর
সকলের দ্বারা বহুলরূপে বিকৃত করিতে পারি-
তেন। কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বর্জিত করেন নাই।
তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্মপ্রচারের অস্ত্র মুক্ত ছিল—
কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয়
ছিলেন, কত ধরিজ গৃহীকে তিনি অভাবের
পেদন হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের

কত হিতকর্যে তিনি বিনা আড়ম্বরে
গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এইদিকে
কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার
সন্তানদিগকে বিলাসভোগ্য বা ধনভিমান-
চর্চ্চার জন্তর্য যেন নাই;—ধর্ম্মপরাধ গৃহস্থ
যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহ্বানশেষে
নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ
তাঁহার ভাণ্ডারঘারের সমস্ত অতিথিবর্গের
পরিবেষণশেষে লইয়া নিজের পরিবারকে
প্রতিশালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি
আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও
আড়ম্বর ও ভোগোন্নততার হস্ত হইতে মুক্ত
করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার
সন্তানগণের সমুখ হইতে লক্ষ্যের ধর্ম্মপরিচয়ের
অবরোধকার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে,
যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত আকাশে
অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া
থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা শিতার পূর্ণা-
গ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা
দোষাগ্র্যবান হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের
কাছে সৌরব করিতে পারি যে, এককাল আমা-
দের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে
মুক্ত করিয়াছিলেন, তেমনি ধনের সজীৱ
মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন
নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল—
ধনিদরিজ সকলেরই। গৃহে আমাদের
যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল।
সমাজে বাহ্যের স্নেহ আমরা অপেক্ষা
হীন ছিল, তাঁহারা সুস্থভাবেই আমাদের
পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিবার-
ভাবে নহে—তবিধাতে আমরা ব্রত হইতে

পারি, কিন্তু আমরা দাড়াগান দাঁড়িয়ে
অসম্মানে একে এই পরবাসীর ধর্ম বলিয়া
জানিতে পারি নাই। পনের সন্ধ্যাকাল ভেদ
করিয়া মহাশয়গুরুগণের অকুণ্ঠিত সংশ্রব-
লাভ বাহার প্রসাধে আমাদের ঘটনাছে,
তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদেরকে যে কি পরিমাণে স্বাধীনতা
দিয়াছেন, তাহা আমরা ছাড়া আর কে
জানিবে! যে ধর্মকে তিনি বাহুল্য সন্ধানের
দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট
বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে
ধর্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎ-
সর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার
গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্ত্র করেন নাই।
তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার
উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই,
কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমা-
দের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন
নাই। তিনি কোনো বিশেষ মন্ত্রকে অভ্যাস
বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে
স্থাপন করিতে চান নহি—ঈশ্বরকে, ধর্মকে
স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি
আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।
এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদেরকে
পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত
সেই সম্মানের ভোগ্য হইয়া, সভ্য হইতে যেন
খলিত না হই, ধর্ম এইতে যেন খলিত না
হই, কুশল হইতে যেন খলিত না হই! পৃথিবীতে
কোনো পরিবার কখনই চিরদিন একভাবে
থাকিতে পারে না,—ধন ও ধাতিকে কোনো
বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে
পারে না—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ত্রাঘ

এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন বিগতহালে
বিলীন হইয়া পাইবে, ক্রমে ন্যূন চিত্ত্রযোগে
বিক্রেয়-বিশেষের বাক্য প্রবেশ করিয়া কোন
একদিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতাব্দী
বিধৌর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবা-
রের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন ভ্রমকে
ধ্বংসিলাসার সন্ধান করিয়া দিয়াছেন, যিনি
নূতন ইংরাজীশিক্ষার উদ্ভবের দিনে শিশু
বঙ্গভাষাকে বহুতর কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া
দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন
ঐশ্বর্যের ভাঙার উল্লাটিত করিতে প্রবৃত্ত
করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ
একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিশ্বব্রহ্ম
সমাজে ব্রহ্মানন্দের গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত
করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে
সমস্ত মহাপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া-
দিয়া, ইহার সন্মোহ লাভকে সমস্ত মহাপরি-
বার লাভ করিয়া-দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত
মহাপরিবার ক্ষতি করিয়া-দিয়া আমাদেরকে যে
গৌরব দান করিয়াছেন, অস্ত সমস্ত ক্ষুদ্র মান
মধ্যাধ্য বিস্তৃত হইয়া অস্ত আমরা তাহাই স্মরণ
করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার
নিকটে আপনারকে প্রণত করিয়া দিব ও
বাহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন,
সমস্ত ধনমানের উর্দ্ধে, ধাতিক্রান্তিপতির উর্দ্ধে
তাঁহাকেই দর্শন করিব!

হে বিশ্ববিধাতা, আজ আমাদের সমস্ত
বিবাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা
যে বনিক। অপসারণ করিয়াছে, তাহার
মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস
আমাদেরকে দেখিতে দাও! সংসারের
নিরন্ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের

আধিভাবিত্তিরোজারের মধ্যে তোমার "আনন্দরূপময়ূহঃ" প্রকাশ কর। কত বৃহৎ সাত্রাজা ধূলিসাৎ হইতেছে, কত শ্রীষল প্রজাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোক-বিক্রীত খণ্ডিতি বিষ্মতিময় হইতেছে, কত কুবেদের ভাঙার ভগ্নশৃঙ্গের বিভীষিকা রাখিয়া অস্তিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দ-ময়, এই সমস্ত পরিবর্তনশরম্পন্নতার মধ্যে "মধু বাতা ভজ্যতে" বায়ু মধুবহন করিতেছে, "মধু ক্রান্তি সিকবঃ" সমুদ্রসকল মধুকরণ করিতেছে তোমার অনন্ত মধুধোর কোনে কর নাট—তোমার সেই বিশ্ববাপিনী মধুরী সমস্ত নোকতাপ-

বিকোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অন্ত আনন্দের চিত্তকে অধিকার করুক !

মাক্ষীর্নঃ সর্বোদারীঃ, মধু নক্তম্ উজ্জ্বলম্, মধুৎ পানিবঃ রজঃ, মধু যোক্তব নঃ পিতা, মধুযাত্রো বনশক্তিঃ, মধুযান্ অত্র যুগাঃ, মাক্ষীর্গো ভবত নঃ ।

ওষধীরা আমাদের পক্ষে মাক্ষী হউক, রাজি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুযান্ হউক, এই যে আকাশ শিতার ভার সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক, স্বর্গ মধুযান্ হউক এবং পাতীরা আমাদের অন্ত মাক্ষী হউক ।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ।

আমরা বাহার বরণীয় স্তুতির উপাণমার অন্ত অঙ্গ এত সভ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত ও ব্রাহ্মধর্মের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া একান্ত কঠিন । কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যপরি-বহের সর্বপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জ্ঞানাদিগকে সেই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে । কিন্তু পারিত্যাবিক হিন্দু-ধর্ম বা পারিত্যাবিক ব্রাহ্মধর্ম অপেক্ষা যে সনাতন ধর্মের ভিত্তি প্রশস্ততর, সেই ভিত্তির আশ্রয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূণ্যসমুজ্জল

মুষ্টির প্রতি অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারি । এবং পরম আশ্রয়ের বিবরণে, সেই সনাতন ধর্মের একোটি হইতে সাহিত্যকে নির্ধারিত করিয়া,—সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,—দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । অল্প দৈর্ঘ্যে ধর্মের পারিত্যাবিক সংজ্ঞা বাহাই হউক, আমাদের এই ভারত-বর্ষে ধর্মের সংজ্ঞা আরও ও প্রশস্ত । বাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম ; বাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, বাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও উর্দ্ধে উঠিয়া বাহা বিশ্বব্রহ্মকে ধরিয়া আছে,

আমাদের শাস্ত্রের নিম্নোক্তরূপে তাঁহারই নাম ধর্ম। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্মরূপ সনাতন অর্থের মূল রহিয়াছে উর্দ্ধে দেবলোকে; ইচ্ছার, শাখা প্রাণা অবাধ্যুখে প্রদানিত হইয়া মানবসমাজে কর্ত্তব্যরূপ ফল-ফলে ও পরপল্লবে ক্ষুতি পাইতেছে। মানব-জীবনের বাহ্যতে ক্ষুতি ধর্মের তথ্য অধিকার; সাহিত্যে মানবজীবনের ক্ষুতি, অতএব সাহিত্য ধর্মের অধিকারমহিভূত নহে। লোকহিত ধর্মের অধিগ্রাহ্য সাহিত্য লোকহিতের সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বেধিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সন্ধ হৃদয়ন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সন্ধ হৃদয়ন করিয়া, মানুষকে মানুষের সহিত করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকহিতের আশ্রয় করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়,—অতএব সাহিত্যকে ধর্মের সহিত, বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চকুটী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্ভু হইতে সমীক্ষিত হইয়া আমাদের পূর্ণ-পিভামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের প্রতিপ্রতি হইয়াছিল, তাহাই ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শসাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ব্যবহার-সম্পাদনার্থ বেকিছু দৌকিকসাহিত্য বর্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অগৌরবের বাণীর স্মৃতি ও অনু-স্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগ ব্যাপিরা গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাণ্যাদিনীর বাণীর তত্ত্বোতে তাহাই

বিবিধ মুচ্ছনার যুগ ব্যাপিরা ভুক্ত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার কর্ত্তব্য-পূর্ণক-মধ্যে তাহাই মণীলোকে আভিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। এলম্বকালে মহাব্যায়ের প্রস্তার উপর যখন বহুদর অবস্থান করেন, ধর্ম তখন মূর্ত্তিমান হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। এই পুরাতন সমাজতত্ত্বীয় যখন বহুদেশের অজ্ঞান ও বিদেশের অনাচারে বিপ্লু হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকহিতের আশ্রয়লোকে লব্ধ সেই প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইয়া ছিলেন; সেই পুরাতনী বাণীর বৈদেশিক বিকৃত প্রতিধ্বনিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

যাহার নাম ধর্ম, তাহাই যুগাব এবং যুগাবের স্মরণীয় বাহ্য। যুগাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি, এবং আমার বিবেচনার আমাদের বর্তমান অবস্থার বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদের গকে যে অস্বাভাবিকতার উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদের গকে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাঠিতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লক্ষ্যবোধ করি না, আমরা বহুদেশীয় বিদেশীর ভাষার বিকৃত উচ্চারণে আত্মন করিতে লক্ষিত হই না। এই এই অস্বাভাবিক আচরণ আমাদের গকে অশোভন ও অসমরক করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজজীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনই প্রমত্ত বেন নাই। যাহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জাত আছেন, তাঁহারা

জানেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে ঠাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ভাগ্যবীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সেদিন ‘সঞ্জীবনী’-পত্রিকার পড়িতেছিলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষপ্রচারকালে ইংরেজি বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না ; এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধিতা দেখিতে পাই। অল্প উদাহরণের উল্লেখের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সাক্ষাৎপক্ষে তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের লেখকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাকে সর্বাঙ্গীণতার মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে ভাবে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এককালে ক্ষুদ্র ও তরঙ্গিত ও ঢেঁকল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে বর্তমান থাকিবে। সেই বর্ষকালের কটিকা-দুর্গোপ এখন প্রশান্তভাবে ধারণ করিয়াছে ; কিন্তু তখন যে সকল তরঙ্গের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোত-বর্তীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্য-ভূমিকে গ্রহণা অফণা শতভ্রামণা করিয়া সুগিয়াছে।

বাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্যকভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বাতস্ত্রের সহকারে সংঘমই ভারতসমাজের

প্রধান লক্ষণ। আমরা বাঁহারা তিরোভাবে শোক প্রকাশের ক্ষমতা অল্প এই সভ্যত্বের সমবেত হইয়াছি, তিনি সেই ভারতসমাজের বেতা মহর্ষিগণেরই সম্মান ছিলেন, ও বাতস্ত্রের সহিত সংঘমই তাঁহার মনোর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। ভগীরথের জ্ঞান লক্ষ্যধনিপূরক তিনি যে অতিনব সাহিত্যের ভাগীরথী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, বাতস্ত্রের সহিত সংঘমকেই তাহার প্রধান লক্ষণরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার অসামান্যকমতাপালী পূজণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পূজণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথের ‘বঙ্গপ্রবাহে’ যে উদ্ভার বাতস্ত্রের পরিচয় পাই, ‘সার সত্যের আলোচনা’র তাহা সংঘমদ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ; রবীন্দ্রনাথের ‘সেনার তরী’ ও ‘মানস’র বাতস্ত্র ‘বদেব সমাজ’ এর কল্যাণপ্রদ সংঘমে পরিণত হইয়াছে। তিনি একাধারে যে বাতস্ত্র ও সংঘমের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, আর্থনা করি, সেই মহাদর্শ বঙ্গীয় সমাজকে ও বঙ্গীয় সাহিত্যকে কর্তব্যাপণ প্রদর্শন করুক। তিনি যে মনসী পূজণে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট অরণ-চিহ্ন আনাদিগকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিরজীবী হইয়া বঙ্গভারতীয় ক্রোড়-দেশ অলঙ্কৃত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নবজীবনের আদর্শ ।

তত্ত্ববিজ্ঞানসত্তার বাদশবাবিক উৎসব উপলক্ষে সভার নামে সভা ও হৃদযগের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সন্নিহিত ও সাধারণে অতিবাহিত করিতেছি। আপনাদিগের আন্তরিক শুভ-ইচ্ছা দ্বারা এই সভাকে সংবদ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া আমাদিগকে সত্যার্থ করুন।

বর্তমানযুগের ধর্মের আদর্শকে, তত্ত্বক্ষে ও সাধনক্ষে, উত্তর দিকেই, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদিগের এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক যুগের ধর্মই সেই যুগের বিজ্ঞান ও দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু কোন প্রাচীনযুগের অস্তিত্ব ও নব্যযুগের অস্তিত্বকালে, যুগসন্ধি ও যুগান্তর উপস্থিত হইলে, সর্বপ্রকার প্রাচীনধর্মের সঙ্গে নূতন বিজ্ঞান ও দর্শনের ধর্ম উপস্থিত হইয়া থাকে। এইভাবেই যুগে যুগে ধর্মসমগ্রতা উৎপন্ন হয়, এবং এই সমগ্রতা ভেদ করিয়া ধর্মকে নব্যযুগের উন্নত বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত পরিবারে এক নূতন আবেশন ও আবৃত্তি হইয়া উঠে। তত্ত্ব-বিজ্ঞানসত্তা এই প্রকৃতি প্রকৃতি হইয়া, এই বাদশবাবিকাল নিষ্ঠাসহক্যে এই উপলক্ষেই অঙ্গুলার করিয়া চলিয়াছে। বাহ্যিক এই

চেষ্টাকে হানচকে দর্শন করেন,—যুক্তিচর্চের শুদ্ধ-কর্ত্তরচরণ জানে ইহার বিচার ও আলোচনার প্রতি প্রাচীনা উপেক্ষা-প্রদর্শন করেন,—তত্ত্বের ক্ষুদ্র ও অধ্যাত্মজীবনের পরিপূর্ণসম্পাদনের এক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বধ্যবধ আলোচনাকে বাহ্যিক অনাবৃত্তি মনে করেন,—প্রাচীনা অধ্যাত্মজীবনের এক অতিমানে পূর্ণ হইলেও যে বর্তমান যুগধর্মের সমগ্র উপাসনামন্দিরের বহিঃ-রক্ষণের বহিঃপ্রাচীরের বহিঃভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এ বিষয়ে অস্বীকার ও সন্দেহ নাই।

বর্তমান যুগে তত্ত্ববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও কলাবিজ্ঞান প্রভৃতি যেত্রণ একদিকে অতীতপূর্ব উৎকর্ষলাভ করিতেছে, সেইত্রণ এই সকল আলোচনা ও আবিষ্কারের শুভেই, সকল বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান বাহ্যিক, সেই দর্শন বা তত্ত্ববিজ্ঞানও একদিকে অজ্ঞাত-পূর্ব গভীরতা প্রাপ্ত হইতেছে। এইজন্য, বর্তমান সময়ে ধর্মতত্ত্বের অধেষণে ও সূচনে বিজ্ঞান ও দর্শনকে উপেক্ষা বা বর্জন করিলে চলিবে না। স্মৃতিতত্ত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যেখানেই প্রস্তার ধ্যানধারণা করিতে বাইবে, সেখানেই পদে পদে কলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অগত্য হানসী প্রতিমার পূজা

করিতেই হইবে। প্রজ্ঞাকর সাহায্য পাই-
 ত্যাগ করিয়া পশ্চাদ সাহায্য গ্রহণ করিলেই
 যে সত্য উপাশনা হয়, তাহা নহে। নগ্ন
 বখন বক্ষ্যাপুত্রবৎ বা অকোণকূহবৎ কলনা-
 মাত্রকে নির্দেশ করে না, কিন্তু প্রকৃতবস্তুর
 নির্দেশ করে, নগ্ন-উচ্চারণে বখন বস্তুর জ্ঞান
 উদ্ভূত হইয়া উঠে,—তখনই নগ্ন সত্য ও সেই-
 সত্য-শব্দ-সীমাহারা সত্য উপাশনা সম্ভব হয়।
 কিন্তু স্রষ্টৃস্বকিনী ধারণাকে সত্যোপেত ও
 বস্তুর কল্পিত গুণে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূতায়-
 সকল আপনীর জ্ঞান ও বুদ্ধির আশ্রিত্যধীন
 করা আবশ্যক হয় এবং তখন স্রষ্টৃবিজ্ঞানের
 আলোচনা ধর্মসাধনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।
 সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা ব্যতিরেকে স্রষ্টার
 সত্যজ্ঞান লাভ করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ
 জনসমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তনের সূত্রাত-
 সকলের কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ না করিলে,
 ঈশ্বরের নিরঙ্কুশ রূপে—Moral Governor
 রূপে—সত্যভাবে ধ্যান করা সম্ভব হয় না।
 ঈশ্বর হে মণ্ডকারী ধর্মরাজ হইয়া জনসমাজের
 পরিবর্তনশীল বিধিবাচকতার মধ্য দিয়াই
 আপনায় সনাতন অহুশাসনসকল যুগে
 যুগে প্রবর্তিত করিয়া ধর্মকে সংবর্তিত ও
 অধর্মকে নিরস্ত করিতেছেন, সমাজতত্ত্বের
 সম্যক আলোচনা ব্যতিরেকে এই জ্ঞান
 কদাপি পরিফুট, কদাপি সত্য, কদাপি
 বস্তুর হইতে পারে না। এইজন্য সমাজ-
 বিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের আলোচনা
 ধর্মসাধনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। সেইরূপ
 সৌন্দর্য্যবাক্ত কলাবিজ্ঞানের সম্যক আলো-
 চনা ব্যতিরেকে, কিম্বদন্তীপ্রকৃতিতে, কিমানব-
 সমাজে, দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্ব, কল্যাণ, রোদ্র প্রভৃতি

রসের মধ্যে,—নিখিলরসায়নরূপে যিনি
 নিরস্ত আপনায় অরূপ রূপনাধুরী বিচিত্র
 অগংগরসমূহে প্রকট করিয়া, জীবের
 সঙ্গে অপরূপ-নিখুঁত মিলনোপায় নিখুঁত
 রাখিয়াছেন,—সেই সূক্ষ্মরসের সত্যধ্যান এবং
 বস্তুর সন্তোষ কদাপি সম্ভব নহে। এইজন্য
 রসতত্ত্বমাত্রই তত্ত্বতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়া
 পড়ে। এবং এই সকল কারণেই বর্তমানের
 যুগধর্ম প্রাচীনযুগের সাধনচক্রের স্তম্ভ
 নৈমিরেখা পরিত্যাগ করিয়া, নিখিল জ্ঞান,
 নিখিল তত্ত্ব, নিখিল কর্ম, নিখিল রসকে
 অধিকার করিয়া, 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে
 সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ, সকলের মধ্যে
 প্রতিষ্ঠা, সকলের মধ্যে সন্তোষ করিবার
 জন্য কৃতদ্রষ্ট হইয়া বিবসাদনাত্রয় গ্রহণ
 করিয়াছে।

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক
 প্রশ্নের বহলপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে
 ধর্মের অনিশ্চয়তা অনিবার্যরূপে পরিবর্তিত,
 পরিবর্তিত, ক্ষুণ্ণতর, গভীরতর, প্রশস্ততর
 ও উন্নততর হইয়া উঠিয়াছে। এই উন্নত-
 ধর্ম সাধন করিতে যাইয়া পদে পদে আত্ম-
 দ্বিপক্ষে বিজ্ঞান-দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিতে
 হয়; না করিলে, ইহার জটিল সমস্যাগুলির
 সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একেবারে
 অসম্ভব হইয়া উঠে। বর্তমান যুগের ধর্মকে
 আর কেবল কিংবদন্তির ভিত্তির উপরে
 প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব নহে। বর্তমানের ধর্মের
 আদর্শ ও সাধনে, মানবসমাজের পূর্ব-
 সঞ্চিত আধ্যাত্মিক অতিক্রমতার বিপরীতরূপে
 শাস্ত্রসকল সম্যকভাবে সম্মানিত হইবে
 সত্য, কিন্তু অত্রাণ বসিয়া আর গৃহীত

হইবে না। প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে বর্তমানের সাধনার্থে মিলাইয়া প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে পরিপুষ্ট ও পরিপুষ্ট এবং বর্তমানের অসুস্থতিকে সংশোধিত ও সমগ্রাণিত করিতে হইবে। এই যুগধর্মকে কেবল গুরুসুখীন করিয়া রাখিলেও আর চলিবে না। বর্তমানের ধর্মের আদর্শে ও সাধনে, উন্নত সাধক ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডিকরূপে গুরু নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ হইবেন, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের বহিরূপে গৃহীত হইবেন না। জ্ঞানান্বেষণলাভ দ্বারা অজ্ঞানভিত্তিকতার শিখার জ্ঞানচক্ষুস্বীকৃতি করাই যখন গুরুর ধর্ম এবং জ্ঞানমাজেই যখন জ্ঞাতার অসুস্থতীর অপেক্ষা করে, তখন গুরুদেবকেও আপনার কৃতার্থতালাভের জন্যই শিখার বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ধর্মকে আবার ব্যক্তিগত মতামতের নির্ণয় বাসুকান্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেও চলিবে না। কেন না, ধর্ম কদাপি মতের উপরে স্থাপিত হইতে পারে না, সত্যের উপরেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। মতামত এ জগতে অগণ্য, কিন্তু সত্য স্বল্পপত এক। সেই এক মহাসত্যের অব্যবহা, সেই মহাসত্যকে সাধন করা, সেই মহাসত্যকে লাভ করা, জীবনে, চরিত্রে জনসমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা সেই সত্যকে সুস্থিৎ করিয়া লোকমণ্ডলীমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্মের একমাত্র সনাতন লক্ষ্য। সকল বিজ্ঞান, সকল ধর্ম, সকল সাধনা বিভিন্ন-রূপে সেই এক সত্যেরই অব্যবহা করিতেছে। সত্যলাভ যদি ধর্মের লক্ষ্য হয়, তবে বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনা ব্যতিরেকে

যদি কদাপি আপনার লক্ষ্য লাভ করিতে পারিবে না।

কিন্তু ধর্মসাধন যুগে যুগে ভিন্ন-ভিন্নের জ্ঞানবিজ্ঞানাদিকে বহুবিধরূপে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। আচার্যিগের দেশে ভক্তিসাধন ইহার প্রকৃতি দৃষ্টান্ত ছিল। বৈকুণ্ঠসাধনার রসতত্ত্বের উপরেই ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদর্শনে, বিশেষতঃ গোড়ার বৈকুণ্ঠমণ্ডলীর ভাববিচারে, রসতত্ত্বের অতি গভীর আলোচনা দৈবিত্তে পাওয়া যায়, -এবং তাহার অধিলবাসমুখ-মুহুরূপে ভগবানের ভজন ও ভগবন্নীলা সন্তোষ করিতে বাইরা, স্বর্গের কলাচর্চাকে আপনাবিগের ভক্তিসাধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। স্বীয়সমাজে, বিশেষতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়মধ্যে, বহুল পরিমাণে সমাজতত্ত্বের উপরে ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসংহতি প্রত্যেক মানব-শিশুর জননীরূপে বিস্তারিত থাকিয়া তাহার নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট করিতেছে। যা যেমন আপনার অঙ্কে ধারণ করিয়া সত্যকে স্তনদানে জীবিত রাখেন ও পরিপুষ্ট ও পরিপুষ্ট করেন, জনসংহতি সেইরূপ আমাদের প্রত্যেককে আপনার সজ্জিত জ্ঞান, তাঁব, কল্যাণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিত রাখিতেছে এবং নিয়ত পরিপুষ্ট ও পরিপুষ্ট করিতেছে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে সংঘ, তাহার মূল প্রকৃতিই একদিকে এই উদারপ্রেম ও অবাচিত দান ও প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অসীম ব্যাকুলতা এবং অন্যদিকে এই বশতা, এই নির্ভরশীলতা, এই বিশ্বস্ততা।

এই সমাজতত্ত্ব রোমক সম্প্রদায়ের ধর্ম-সাধনের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, Catholic Church এর সঙ্গে প্রত্যেক Catholic সাধকের সম্বন্ধকে নিরস্ত্রিত করিতেছে। যাহা যেমন সমাজের প্রতি বৈশ্বিক, সেই-রূপ প্রত্যেক Catholic সাধকের প্রতি বৈশ্বিক হইয়া Catholic Church আপ-নার উদার প্রেমভণ্ডে প্রত্যেকের বন্ধনমোচন করিতেছে আর প্রত্যেক Catholic সাধক এই যাকৃদ্ধাপণী Church এর মিকট বস্ত্রতা-বীকার করিয়া, তাহার উপরে নির্ভরশীল ও তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া, এই উদার প্রেমের প্রতিদান করিতেছে। রস ভক্তি প্রাণ। ভুক্তিপ্রধান বৈষ্ণবসাধন রসভবকে এইমত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও আয়ত্ব করি-য়াছে; না করিলে, এ সাধন কদাপি পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতে পারিত না। বস্ত্রতাতে বিধি-নিষেধাত্মক নৈতিকসাধন ও সমাজধর্মের সনাতন প্রতিষ্ঠা। Catholic সাধন এই নীতিবিজ্ঞান ও এই সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত ও আয়ত্ব করিয়াছে; না করিলে, তাহা তিস্তিহীন ও শিথিলপ্রাণি হইয়া পড়িত।

আজ পর্যন্ত জগতের ঐতিহাসিক ধর্মলোক বা পরিমাণে কোথাও বা রস-ভবকে, কোথাও বা নীতিবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত ও আয়ত্ব করিয়াছে, সেই পরিমাণে স্বীকৃত বা অজ্ঞানকে কোথাও অস্বীকৃত করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আজ পর্যন্ত জগতের ধর্মলোক জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম, তিনের মধ্যে প্রকৃত একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্যজগতে, বিশেষত

ইহুদী, আরব প্রভৃতি সেমিটিক জাতি-সকলের ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মসাধনে সর্বথাই ব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছে। ইহুদার ভূমিতেই খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি। গ্রীক চিন্তাবাদী পরিপুষ্ট হইলেও, ইহুদার প্রভাবে সেমিটিক বৈতন্য খৃষ্টধর্মের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, খৃষ্টসাধনার জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের প্রকৃত একত্বপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যাধিক প্রবল অন্তরার হইয়া রহিয়াছে। গ্রীক-প্রভাবে, আলেকজেন্দ্রিয়ার তত্ত্বজ্ঞানবিদের সাধনার ও শিক্ষার, একসময়ে খৃষ্টধর্মের প্রতি উন্নত ব্রহ্মতত্ত্ব ছুটিয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু রোমক চিন্তাবাদী অতিভূত হইয়া, রোমক নেতৃবর্গের প্রভাবে, অতি মল্লকালমধ্যেই খৃষ্টসাধনার তত্ত্ব অসাড় এবং খৃষ্টধর্ম রোমক ব্যবহার-বিজ্ঞানের ভাণ্ডে জড়িত ও পরমাণুতত্ত্ব হইতে স্বল্পবস্তুর বিচ্যূত হইয়া পড়ে। তখন হইতে খৃষ্টসাধনার বিধিনিষেধাত্মক নৈতিক আদর্শই প্রবল হইয়া রহিয়াছে। বৈতন্য এই নৈতিক আদর্শের প্রাণ; অবৈতন্য, এই কঠোর বিধিনিষেধাত্মক আদর্শের সমাক্ষিপণের অসম্ভব। এই-জন্ত আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্যজগতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম, তিনের মধ্যে প্রকৃত একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

আমাদিগের দেশে এই একত্বপ্রতিষ্ঠার বিপুল চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে নাইয়া ভারতীয় তত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞান জীব ও জড়ের সত্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বহুপরিমাণে অস্বীকার করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে। ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি

উপবেশের দ্বারা সেখানে আপাতত ভীষণ
ব্রহ্মের একমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানেও
জীবকে শরীর, মন, বুদ্ধি প্রকৃতির অতীত
নিত্যতত্ত্ববুদ্ধি চৈতন্যরূপেই দেখা হইয়াছে।
আমাদিগের মধ্যে যে নিত্যবস্ত নিহত
বিভ্রমনি থাকিয়া শরীরের জ্ঞান-বৃত্তি-কর-
যোগ-দ্বারা প্রকৃতি অবস্থাবিপর্কীয় এবং
মন ও বুদ্ধির সকল-বিকল্প-সচেতন-অচেতন-
নাশি ভাবপরিবর্তনের মধ্যে আমাদিগের
একমাত্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তাহাট প্রকৃত-
পক্ষে জীবরূপে গৃহীত হইয়াছে।

জুনিয়োগিনলো বাসুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইতীঃ যে তিষ্ঠা পকৃতিঃসেই বা।

অপারোমিতবস্তাঃ প্রকৃতিঃ বিদ্ধি নে পরাং

জীববুতঃ মহাকর্ষো বহুতঃ ধ্যানতে রসং।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন,
বুদ্ধি, অহংকার, এ সকল সেই পরমপুরুষের
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হইলেও, ইহারা নিকট।
ইহাদিগের মধ্যে তাহার স্বরূপপ্রকাশ হয়
না। তাহাকে স্বরূপত জানিতে হইলে,
তাহার যে শ্রেষ্ঠ জীবপ্রকৃতি দ্বারা তিনি
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন,
তাহাকে জানিতে হইবে। সেখানেই তিনি
স্বরূপত বিভ্রমনি ও প্রকাশিত রহিয়াছেন।
এই জীবপ্রকৃতিকে জানিতে হইলে, শরীর-
মন প্রকৃতি হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া
দেখিতে হইবে। যখন হইতে ইন্দ্রিয়কে,
ইন্দ্রিয় হইতে মনকে, মন হইতে বুদ্ধিকে,
বুদ্ধি হইতে অহংকারকে প্রত্যাহত করিয়া,
অবশেষে সেই অহংকার হইতেও তাহার মূলস্থ
সাক্ষিচৈতন্যকে পৃথক করিয়া,— আপনার
অস্তিত্ব নিত্যতত্ত্বকে চৈতন্যবস্তকে দেখিতে

হইবে। এইরূপে ভীষণ ব্রহ্মন সংসার-
মুক্ত হইয়া আপনার একমাত্ররূপ বলিয়া
জানিবে—

অহং যেনো ন চাত্তোহহমি ত্রাক্ষি ন চ শোকতাক্।

সচ্চিদানন্দরূপাংহমি নিত্যদুঃখভাববান্—

যখন জীবের এই সত্যজ্ঞান আবির্ভূত হয়,
তখনই তাহার ব্রহ্মসাক্ষ্যকার লাভ হইয়া
থাকে। ইহাই তাহার ব্রহ্মবিজ্ঞান রূপমাত্র।
এই আদর্শে তত্ত্বজগৎ বা জ্ঞানসমাজ, এ দুই
কোন একটিরও বিশেষ স্থান নাই।

বৈকল্যতবে জীবব্রহ্মের আগ্নেয়াপার্বক্য-
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু মৌলিক
একমাত্র কথাপি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয় নাই।
ব্রহ্মের অখণ্ডিতকর বা একরূপ অস্বীকার
করিয়া নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বরূপ ও
অচিন্ত্য ভেদভেদ প্রতিষ্ঠা করিয়াই বৈকল্যতবে
আপনার মধ্যে তাকি ও ভক্তিসাধক নিত্য-
উপাসনার স্থান করিয়া লইয়াছে। জড়-
জগৎ ও জীবজগৎ উভয়কেই ভগবত্তীতার
আধার ও প্রকাশরূপে গ্রহণ করিয়া, বৈকল্য-
সাধন ক্রিয়ণপরিমাণে ইহাদের সত্য ও
স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।
কিন্তু বৈকল্যসাধনে ভগবানকে সম্যকভাবে
স্বষ্টারূপে ভজনা করিবার প্রয়াস অতি
অল্পই হইয়াছে। পুরুষের মধ্যে শাস্ত্রসল
ভক্তিসোপানের নিরন্তর দ্বারে অবস্থান
করিতেছে। বৈদিকধর্মে মানবীর সাধনার
সঙ্গে নিসর্গের একটা সাক্ষ্য বিনিময় স্বরূপ ও
মাধ্যমাধিভাব দৃষ্ট হয় সত্য, পৌরাণিক
ধর্মের উচ্ছৃঙ্খলিত ভাবতরঙ্গে ও পৌরাণিক
উপাসনার রূপকাদির মধ্যেও নিসর্গের সন্ধান
প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, তথাপি ইহা

শাক্য কলিত্ত ২৪৭ স্বে, উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুধর্ম-বহির অর্থে ক্রিষ্টাকর্ম-কাব্যকল্পনার মধ্যেও, ত্রিদিনই নিত্যকর্ম নিওঁপের লক্ষ্যপাঠ হইয়া রহিয়াছে ।

• এই সকল কারণে অর্গতের প্রাচীন ধর্ম-সাধনে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান আপনার বর্ধাবধি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই । ধর্ম এইজন্য প্রায় সর্বত্রই একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়া রহিয়াছে । এইজন্য এই সকল ধর্ম ও সাধনে নবজীবনের গাঢ় ও বহুলপরিমাণে এই অন্তর্মুখীনতাকে অপ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে ।

• কলিত্ত একদিকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি এবং অপরদিকে আত্মা ও ধর্ম, একত্বত্বের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ কল্পনা করিয়াই নবজীবনশক্তি ও তদপ্রবর্তী ভাবসকল পৌরাণিক ধর্মে প্রকাশিত হইয়াছে । ধর্ম আনিতে,—কি বেদে, কি ভালমুখে,—প্রায় সকলই স্বভাব ও নিসর্গকে অনলধন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ।

সুতরাং ধর্মবিবর্তনের সেই আদিম সোপানের আরাধ্য দেবতাসকল ব্রহ্মবিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছিলেন, এবং তাঁহাদের আরাধনা শরীরবাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-স্বভে অঙ্গস্বাত ছিল । যথেষ্টের অগ্নি, বরুণ, ঋত প্রভৃতি সকলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নৈসর্গিক বস্তু । বরুণ আকাশরূপে সকলকে আচ্ছাদন করিয়া সকলের মধ্যে অঙ্গ-প্রতিষ্ট হইয়াছিলেন । অবর্কবেদের সেই সর্গজনবিবর্তিত শ্লোক,—দুইজন মনুষ্য যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়, তিনজন যেখানে মিলিত হয়,

বরুণ তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থ, চারিজন যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম,—বরুণ-অর্থে জ্ঞানবরুণ সর্বব্যাপী, সর্গগত, সর্গজ ইন্দ্রিয়কে নির্দেশ করে নাই, কিন্তু এই চাক্ষুষ আকাশদেবতাকেই নির্দেশ করিয়াছিল। এই চাক্ষুষ আকাশদেবতার সর্বব্যাপ্য, সর্গগত, সর্গজ প্রভৃতি ধর্মই ক্রমে নিরাকার চৈতন্যরূপে দৈবের আরাগত হইয়াছে । এইরূপ অগ্নি প্রভৃতিও চাক্ষুষ দেবতা ছিলেন । নৈসর্গিক আকারেই অগ্নি পুঞ্জিত হইতেন । একদিকে এই সকল নিসর্গদেবতা, অপরদিকে পিতৃদেবতা, এই উভয়বিধ বৈদিক দেবতাপ্রণীই ব্রহ্ম-বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য ছিলেন । হহবার ইন্দোহি, বিহোতা প্রভৃতিও সমাজপতিরূপে ব্রহ্মবিশ্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য, ও বিদিনিষেধাত্মক সামাজিকজীবনের চাক্ষুষ ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপাদির সঙ্গে অঙ্কিত ছিলেন । বাহ্যমুখীন শারীরধর্ম ও সমাজ-ধর্মের সঙ্গে প্রাচীন ইহুদীধর্মের কোন বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই ।

কিন্তু ক্রমে দেবতা ধর্ম নিসর্গ ছাড়িয়া অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, আত্মাতে পরমায়ুরূপে একাশিত হইলেন বা হৃদয়ের অভ্যন্তরে কণ্ঠের মৌলিক অঙ্গুষ্ঠ-প্রেরণার মধ্যে আপনার অঙ্গুষ্ঠ প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বাহিরের সঙ্গে অন্তরের বিরোধের সূত্রপাত হইল । বাহিরে সংসার, অন্তরে সংসারাতীত ব্রহ্মজ্ঞান । বাহিরে কণ্ঠ, অন্তরে ভাব ও উদ্বেগ । সংসারে বা কণ্ঠে নহে, কিন্তু জ্ঞানে, ভাবে, হৃদয়ের প্রেরণার মধ্যে ধর্ম ও ইন্দ্রিয় বিরাজ

করেন। সুতরাং তখন হইতে বহির্জীবনকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া শ্বশ্রুজীবন লাভ করিতে হইবে, এই আদর্শ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। এবং তদবধি নবজীবন-শব্দ ও তদানুগামী ভাব পৌরাণিক চিন্তা ও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপাতি করিয়াছে।

নবজীবন বলিতে এখনও আমরা এই প্রাচীন, এই পৌরাণিক, এই একান্ত অস্ত-স্থবীর আদর্শই বুঝিয়া থাকি। নবজীবন লাভ করিতে হইলে, সংসারে বৃত্ত চইয়া অধ্যাত্ম-ভাবে সজীব হইতে হইবে। এই বহি-র্জীবনকে বধাসম্ভব বর্জন করিয়া অন্ত-জীবনকে আশ্রয় করিতে চইবে। বিধের বিরক্তি ও ত্রক্ষে অমুরাগ সাধন করিতে হইবে। দৃষ্টবিষয়ে অবজ্ঞা ও অনুরাগে আত্মত্যাগ করিতে হইবে। খুটীর, ইস-লামীর, বৈষ্ণবীর নবজীবনের আদর্শ স্বল্প-বিস্তর ইহাই।

এই আদর্শের মধ্যে যে মৌলিক ভাব আছে, তাহা বর্জন করিলেও চলিবে না। বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধন যেমন প্রাচীনকালে, সেইরূপ আমাদিগের মধ্যেও ধর্ম্মশাস্ত্রের উপায়রূপে অবশ্যই অবলম্বিত

চইবে। কিন্তু ধর্ম্মের ঐকান্তরূপে গৃহীত হইবে না। বপাবধ ও সূর্য্যের উৎসর্গে অস্ত্রই বৈরাগ্যের প্রয়োজন। অসীমতত যাহা অনায়াস বলিয়া মনে হয়, তাহাতে ত্রস্তের সত্য সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবার ক্ষমতা আত্মানুভবিক, কঠোর ও দুঢ়ভাবে সাধন করিতে হইবে। যতদিন না বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধিত হইয়াছে, ততদিন আত্ম-কেই আত্মরূপে দেখিবে, অন্যত্র আত্মার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করতে পারিবে না। দেখকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা বিরোচনধর্ম্ম, — আত্মরতন, — অজ্ঞানাদিকারের সৃষ্টি। আত্মাকে দেখের মধ্যে, ত্রস্তকে ত্রস্তাভে, শিবকে জীবের মধ্যে, ত্রিভাতিয়-ভাবে দর্শন করা ইত্যর্থ। ত্রস্তত্ব ত্রস্ত-প্রজ্ঞাতব্য। • এই তৎকাল, এই ধর্ম্ম-সাধন ও এই প্রকার প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা বিবেক-বৈরাগ্যাদি পৌরাণিক সাধনাও আধুনিক আদর্শে বখাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। ফলত এই সকল সাধন ব্যতিরেকে কোন-প্রকারেই নবজীবনের নবীন আদর্শ অসম্ভব হইবে না।

এই আদর্শ কি, প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

ত্রিবিপিনচক্র পাল ।

বর্ষদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৬০

দিনের মধ্যে অক্ষর একসময় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে কমলার প্রত্যাবর্তনসময়ে কোনো কপাই বলিলেন না। কমলা কেন যে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহা না জানিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে কাহারো কাছে কোনো কথা বলিতে চান না। সে যখন ইচ্ছা করিয়া তাহার আত্মীয়বন্ধুগণের অন্তরালে চলিয়া আসিয়াছে, যখন লক্ষ্যভ্রম তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তখন তিনি তাহাকে সেই বন্ধুসমাজের নিকট, সমস্ত কথা না জানিয়া, প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। তা ছাড়া, রমণের প্রতি অক্ষরের যে বিশেষ বহুভাব নাই, তাহাও খুঁড়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

কমলা কেন চলিয়া গিয়াছিল, কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এ সম্বন্ধে বাড়ীর কেহ কোনো প্রশ্নই করিল না—কমলা যেন ইহাদের সবেই কানী বেড়াইতে আসিয়াছে, এমনভাবে দিন কাটরা গেল। উমির দাই লছমনিয়া রেহমিপ্রিত তৎসনার ছলে কিছু বলিতে গিয়াছিল, খুঁড়া তৎক্ষণাৎ

তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিলেন।

রায়ে শৈশবী কমলাকে আপনার বিছানার লইয়া শুইল। তাহার গলা অড়াইয়া-ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল এবং দক্ষিণহস্ত দিয়া তাহার গারে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই কোমল হস্ত-স্পর্শ নীরব প্রেমের মত কমলাকে তাহার গোপনবেদনার কথা স্ফীত করিতে লাগিল।

কমলা কহিল—“দিদি, তোমরা কি মনে করিয়াছিলে? আমার উপরে রাগ কর নাই?”

শৈল কহিল—“আমাদের কি বুঝিওঁ কিছু নাই? আমরা কি এটা বুঝি নাই, সংসারে তোর যদি কোনো পথ থাকিত, তবে তুই এই ভয়ানক পথ লইতিস্ না! আমরা কেবল এই বলিয়া কাঁদিয়াছি, ভগবান্ তোকে কেন এমন সঙ্কটে ফেলিলেন! যে লোক কোনো অপরাধ করিতে জানে না, সেও দণ্ড পায়!”

কমলা কহিল—“দিদি, আমার সব কথা তুমি শুনিবে?”

শৈল স্নিগ্ধস্বরে কহিল—“তুমিই না ভাব কি বোন্?”

কমলা । তখন যে তোমাকে কেন বলিতে পারি নাই, তাহা জানি না । তখন আমার কোনো কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না । হঠাৎ মাথার এমন বস্ত্রাঘাত হইয়াছিল যে, লজ্জার তোমাদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না । সংলাপে আমার মা-বোন কেহ নাই, দিদি, তুমি আমার মা-বোন হই—তাঁট তোমার কাছে সব কথা বলিতেছি, নহিলে আমার যে কথা, তাহা কাহারো কাছে বলিবার নয় ।

কমলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল । শৈলও উঠিয়া তাহার সম্মুখে বসিল । সেই অন্ধকার বিছানার মধ্যে বসিয়া কমলা বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল ।

কমলা যখন বসিল, বিবাহের পূর্বে বা বিবাহের রাজ্যে সে তাহার স্বামীকে দেখে নাই, তখন শৈল কহিল—“তোমার মত বেকা মেয়ে ত আমি দেখি নাই । তোমার চেয়ে কম বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল—তুট কি মনে করিল, লজ্জার আমি আমার বরকে কোনো স্ত্রীযোগে দেখিয়া লট নাই !”

কমলা কহিল—“লজ্জা নয় দিদি । আমার বিবাহের বয়স হার পার হইয়া গিয়াছিল । এমন সময়ে হঠাৎ যখন আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, তখন আমার সমস্ত সখিনীরা আমাকে বড়ই ক্যাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল । অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে লাভবান্যর ধন লাগিক লাই নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃষ্ণাত-মাত্র করি নাই । এমন কি, তাঁহার অন্ত কিছুমাত্র আগ্রহ মনের মধ্যেও অনুভব

করা আমি নিতান্ত লজ্জার বিষয়, অপৌরুষের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম । “আজ তাহারই শোধ বিতেছি ।”

এই বলিয়া কমলা কিছুকণ চুপ করিয়া রহিল । তাহার পরে আরম্ভ করিল—“বিবাহের পর নোকাডুবি হইয়া আমরা কিছু করিয়া মুকা পাইলাম, সে কথা ত তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি । কিন্তু ইখন বলিয়াছিলাম, তখনো জানিতাম না যে, মৃত্যু হইতে মুকা পাইয়া বাহার হাতে পড়িলাম, তাঁহাকে স্থায়ী বলিয়া জানিলাম, তিনি আমার স্বামী নহেন ।”

শৈলজা চম্কিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি কমলার কাছে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল—“চারের পোড়াকপাল ও তাই বটে ! এতক্ষেপে সন্ন কণা বুঝিলাম । এমন সর্বনাশও ঘটে !”

কমলা কহিল—“বল দেখি দিদি, যখন মরিগেই চুকিয়া যাঁত, তখন বিধাতা এমন বিপদ ঘটাইলেন কেন !”

শৈলজা বিজ্ঞান কহিল—“ব্রহ্মবানুও কিছু জানিতে পারেন নাই !”

কমলা কহিল—“বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি একদিন আমাকে স্থায়ী বলিয়া ডাকিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, ‘আমার নাম কমলা, তবু তোমরা সকলেই আমাকে স্থায়ী বলিয়া ডাক কেন ?’ আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেইদিন তাঁহার জুল ভাঙিয়াছিল । কিন্তু দিদি, সে সকল যিনের কথা মনে করিতেও আমার মাথা হেঁট হইয়া যায় ।” এই বলিয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল ।

শৈলনা একটু একটু কাঁচা কথা
কথা সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া বাহির
করিয়া আইল। সমস্ত কথা শোনা হইলে
সে কহিল, “বোন, তোর চুপেধর কপাল,
কিছু আমি এই কথা ভাবিতেছি, ভাগ্যে
তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি। বাই
বলিস, বেঁচারার রমেশবাবুর কথা মনে করিলে
বড় দুঃখ হয়। আজ রাত অনেক হইল,
কমল, তুই আজ ঘুমো। কদিন রাত আগিয়া
কাঁদিয়া সুখ কালো হইয়া গেছে। এখন কি
করিতে হইবে, কাল সব ঠিক করা বাইবে।”
রমেশের নিষিদ্ধ সেই চিঠি কমলার
কাছে ছিল। পরদিন সেই চিঠিখান লইয়া
শৈলনা তাহার পিতাকে নিভৃতঘরে ডাকিয়া
পাঠাইল এবং চিঠি তাঁহার হাতে দিল। খুঁড়া
চন্দ্রা চোখে তুলিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাঠ
করিলেন; তাহার পরে চিঠি মুড়িয়া চন্দ্রা
পুলিয়া কন্ডাকে নিজ্ঞাসা করিলেন, “তাই ত,
এখন কি কর্তব্য!”

শৈল কহিল, “বাবা, উমির করতল হইতে
সদিকাপি করিয়াছে, একবার নলিনাক-
ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাও না। কানিতে
তাঁহার আর তাঁর মারত খুব নাম শোনা
যায়। একবার তাঁকে দেখিই না।”

রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিল
—এক ডাক্তারকে দেখিবার জন্য শৈল ব্যস্ত
হইয়া উঠিল। কহিল, “কমল, আর, শীঘ্র
আয়।”

নবীনকালীর বাড়ী বেকমলা নলিনাককে
দেখিবার ব্যস্ততার প্রায় আশ্বিন্ত হইয়া
উঠিয়াছিল, সেই কমলা আর লজ্জার উত্তে
চায় না।

শৈল কহিল, “দেখ শোড়ারমুখি, আমি
তোকে বেশিকণ জাখিব না, তা আমি বলিয়া
রাখিতেছি—আমার সমস্ত নাই—উমির
ব্যাঘো কেবল নামমাত্র, ডাক্তার বেশিকণ
খাঁকিবে না—তোকে সাধালাখি করিতে
গিয়া থাকে হইতে আমার দেখা হইবে না।”

এই বলিয়া কমলাকে ঘোর করিয়া
টানিয়া-লইয়া শৈলনা দ্বারের অন্তরালে
আসিয়া ধাঁড়াইল। নলিনাক উমার বুক-
পিঠ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ওষুধ
লিখিয়া-দিয়া চলিয়া গেল।

শৈল কমলাকে কহিল, “কমল, বিধাতা
তোকে বড়ই দুঃখ দিন, তোর ভাগ্য ভাল।
এখন দুই একদিন বোন তোকে একটু থৈয়া
ধরিয়া থাকিতে হইবে—অমরা একটা ব্যবস্থা
করিয়া দিতেছি। হঠাৎ মধ্যে উমির অন্তে
ঘন-ঘন ডাক্তারের শ্রোণেন হইবে, অতএব
নিভাত হোকে বসিত হইতে হইবে না।”

খুঁড়া একদিন এমন সমস্ত বাহিয়া ডাক্তার
ডাকিতে গেলেন, এখন নলিনাক বাড়ীতে
থাকে না। ডাক্তার কহিল, “ডাক্তারবাবু
নাই।” খুঁড়া কহিলেন, “মাঠাকরণ ত আছেন,
তাঁহাকে একবার খবর দাও।” বল, একটু
বুদ্ধব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে
চায়।”

উপরে ডাক পড়িল। খুঁড়া গিয়া কহি-
লেন, “মা, আপনাদের নাম কানিতে বিখ্যাত।
তাই আপনাকে দেখিবার পূণ্যসকর করিতে
আসিলাম। আমরা আর কোনো কামনা
নাই। আমাদের একটি বৌদ্ধিজীর অন্তঃ,
আপনাদের ছেলেকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম,
তিনি বাড়ী নাই—তাই মনে করিলাম

তুচ্ছ ধূম্রিহব নঃ, একবার আপনাকে
দশন করিয়া যাইব।”

ক্ষেমচরী কহিলেন—“নলিন এখন
আসিবে, আপনি ততক্ষণ একটু বহুন।
বেলা নিত্যস্ত কর্ম হই নাই—আপনার জন্ত
কিছু জলখাবার আনাইয়া দিই।”

খুড়া কহিলেন, “আমি জানিতাম, আপনি
আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না—
আমার যে ভোজননে বেশ একটুখানি সখ
আছে, তাহা আমাকে দেখিলেই লোকে
চোর পার—এবং সকলেই এ বিষয়ে আমাকে
একটু দয়াও করে।”

ক্ষেমচরী খুড়াকে জল খাওয়াইয়া বড়
খুশি হইলেন। কহিলেন, “কাল আমার
এখানে আপনার সম্বন্ধে ভাষ্যের নিমন্ত্রণ
রহিল—আজ প্রস্তুত হিলাম না, আপনাকে
ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম
না।”

খুড়া কহিলেন, “যখন প্রস্তুত হইবেন,
এই ভ্রাম্যণকে শরণ করিবেন। আপনাদের
বাড়ী হইতে আমি বেশ দূরে থাকি না।
বলেন ত আপনার চাকরটাক লইয়া
আমার বাড়ী দেখাইয়া আসিব।”

এমনি করিয়া খুড়া ছইচারিদিনের
যাত্রায়তেই নলিনাক্ষের বাড়ীতে বেশ একটু
জমাইয়া গইলেন।

ক্ষেমচরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহি-
লেন—“ও নলিন, দুই চক্রবর্তিনীপাণ্ডের কাছ
থেকে তিজিট নিস্নে নেও।”

খুড়া হাসিয়া কহিলেন—“মাতৃ-আজ্ঞা
উনি পাইবার পূর্ব হইতেই পালন করিয়া
আসিতেছেন—আমার কাছ হইতে উনি

কিছুই নেন নাট। ঐহারা মাতা, তাঁহার
শরীৰকে দেখিলেই চিনিতে পারেন।”

৬১

দিনদ্বয়ের পিতার ও কঙ্কার পরামর্শ
চলিল। তাঁহার পরে একদিন সকালে
খুড়া কমলাকে কহিল—“চল মা, আমরা
দশাশ্বমেধে দান করিতে যাই।”

কমলা শৈলকে কহিল—“দিনি, তুমিও
চল না।”

শৈল কহিল, “না ভাই, উমির শরীর
তেমন ভাল নাই।”

খুড়া যে পথ দিয়া গ্রামের ঘাটে গেলেন,
দানাস্থে সে পথ দিয়া না ফিরিয়া অত্র এক
হাস্তার চলিলেন। কিছুদূর গিয়াই বেধি-
লেন, একটি প্রবোণ্য দান সারিষ্টা গটুভ্র
পরিয়া বটিতে গগাঅল লইয়া ধীরে ধীরে
আসিতেছেন।

কমলাকে সম্মুখে আনিয়া খুড়া কহি-
লেন—“মা, ইহাকে প্রণাম কর, ইনি
ডাকার বাহুর মাতা।”

কমলা তনিতা চকিত হইয়া উঠিয়া
তৎক্ষণাৎ ক্ষেমচরীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার
পায়ের ধূলা লইল।

ক্ষেমচরী কহিলেন—“তুমি কে মা।—
দেখি দেখি, কি ছপ! যেন লক্ষ্মীটির
প্রতিমা।”—বলিয়া কমলার খোঁচা সন্নাইয়া
তাঁহার নতনৈয় মুখখানি ভাল করিয়া
দেখিলেন। কহিলেন—“তোমার নাম কি
বাহা?”

কমলা উত্তর করিবার পূর্বেই খুড়া
কহিলেন—“ইহার নাম হরিদাসী। ইনি
আমার দূরসম্পর্কের ভ্রাতৃপত্নী। ইহার

বা-বাগ কেহ নাহি—আমার উপরেই নির্ভর ।”

কেমতরী কহিলেন “আম্বন, না কেমতরী, আমার বাড়ীতেই আম্বন ।”

বাড়ীতে লইয়া-গিয়া কেমতরী একবার নলিনাক্ষকে ডাকিলেন । নলিনাক্ষ তখন বাহির হইয়া গেছেন ।

খুড়া আসন্নগ্রহণ করিলেন—কইলা মেঘের উপরে বসিল । খুড়া কহিলেন—“দেখুন, আমার এই ভাইবো ভাগ্য বড় মন্দ । বিবাহের পরদিনেই ইহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেছেন—ইহার সঙ্গে আর দেখাসাক্ষ্য নাই । হরিদাসীর চক্ষু ধ্বংস লইয়া জীবন্যাস করে—ধর্ম ছাড়া ইহার সান্তনার সামগ্রী আর ত কিছুই নাই । এখানে আমার বাড়ী নহ—আমার চাকরি আছে—উপাস্তান করিয়া আমাকে সংসার চালাইতে হয় । আমি যে এখানে আসিয়া ইহাকে লইয়া থাকিব, আমার এমন সুবিধা নাই । তাই আপনার পরগণার হইয়াছি । এটিকে আপনার মেয়ের মত যদি কাছে রাখেন, তবে আমি বড় নিশ্চিন্ত হই । যিনি অনুবিধাবোধ করিবেন, গামিপুরে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন । কিন্তু আমি বলিতেছি, দুদিন ইহাকে কাছে রাখিলেই মেয়েটি কি রকম তাহা বুঝিতে পারিবেন—তখন যুদ্ধের ভয় ছাড়িতে চাহিবেন না ।”

কেমতরী খুসি হইয়া কহিলেন—“আহা, এত ভাল কথা । এমন মেয়েটিকে আপনি যে আমার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন—এত আমার মত লাভ । আমি কতদিন স্বাস্থ্য হইতে পরের মেয়েকে বাড়ীতে আনিয়া

খাওয়াইয়া-পরাইয়া আনন্দ করি, কিন্তু তাহাদের তুরাতিতে পারি না । তা হরিদাসী আমারই হইল—আপনি ইহার ভয় কিছুমাত্র ভাবিবেন না । আমার ছেলের কথা অবশ্য আপনারা পাঁচজনের কাছে শুনিয়া থাকিবেন—নলিনাক্ষ—সে বড় ভাল ছেলে । সে ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ নাই ।”

খুড়া কহিলেন—“নলিনাক্ষবাবুর নাম সকলেই জানে । তিনি এখানে আপনার কাছে থাকেন জানিয়া আমি আরো নিশ্চিন্ত । আমি শুনিয়াছি, বিবাহের পর দুবিন্দুস তঁহার স্ত্রী ফলে দুবিন্দুস—স্বামী বাওয়াতে তিনি সেই অবধি একরকম ত্রস্তচাত্তীর মতই আছেন ।”

কেমতরী কহিলেন—“সে বাবা হইয়াছে, হইয়াছে—ও কথা আর ভুলিবেন না—মনে করিলেও আমার গারে কাটা দিয়া ওঠে ।”

খুড়া কহিলেন—“যদি অসুস্থ হইতে, তবে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখিয়া এখন বিদায় হই । মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব । ইহার একটি বড় বোন আছে—সেও আপনাকে অগাম করিতে আসিবে ।”

খুড়া চলিয়া গেলে কেমতরী কমলাকে কাছে টানিয়া-লইয়া কহিলেন, “এস ত মা, দেখি ! তোমার বয়স ত বেশি নয় । আহা, তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে, জগতে এমন পাব্যপণ্ড আছে ! আমি আশীর্বাদ করিতেছি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে । বিধাতা এত রূপ কখনো বুঝা নষ্ট করিবার ভয় গড়েন নাই ।”—বলিয়া কমলার চিবুক

পুল করিয়া অস্থির হারা যখন গ্রহণ করিলেন।

কেশবদত্তী কহিলেন—“এখানে তোমার সমবয়সী সঙ্গিনী কেই নাই—একলা আমার কাছে থাকিতে পারিবে ত?”

কমলা তাঁহার দুই বড় বড় চিত্র চক্ষে সম্পূর্ণ আশ্বিনবেদন করিয়া কহিল, “পারিব না!”

কেশবদত্তী কহিলেন—“তোমার দিন কাটিবে কি করিয়া, আমি তাই ভাবিতেছি।”

কমলা কহিল—“আমি তোমার কাজ করিব।”

কেশবদত্তী। পোড়াকপাল। আমার আবার কাল! সংসারে ঐ ত আমার একটিনাত্র ছেলে সেও সন্ত্যাসীর মত থাকে—কখনো যদি বলিত মা, ‘এইটে আমার দরকার আছে, আমি এইটে খেতে চাই, আমি এইটে ভালবাসি’, তবে আমি কত খুসি হইতাম—তাও কখনো বলে না। রোগগর ঢের করে, হাতে কিছুই রাখে না—কত সংকাজে যে, কতদিকে খরচ করে, তাহা কাহাকে জানিতেও দেয় না। দেখ বাছা, আমার স্বাছে বখন তোমাকে চক্ষি-বটী থাকিতে হইবে, তখন এ কথা আগে হইতেই বলিয়া রাখিতেছি, আমার মুখে আমার ছেলের স্তম্ভগান বাববাব শুনিয়া তোমার বিরক্ত ধরিবে—কিন্তু ঐটে তোমাকে সহ করিয়া বাইতে হইবে।

কমলা পুলকিতচিত্তে চক্ষু নত করিল।

কেশবদত্তী কহিলেন—“আমি তোমাকে কি কাজ দিই, তাই ভাবিতেছি। সেলাই করিতে জান?”

কমলা কহিল—“ভাল জানি না মা।”

কেশবদত্তী কহিলেন “আজ্ঞা, আমি তোমাকে সেলাই শিখাইয়া দিব।”

কেশবদত্তী বিজ্ঞাসা করিলেন—“পড়িতে জান ত?”

কমলা কহিল—“হাঁ, জানি।”

কেশবদত্তী কহিলেন—“সে হইল ভাল। চোখে ত আর চক্ষু নাড়িলে দেখিতে পাই না—তুমি আমাকে পড়িয়া শোনাইতে পারিবে।”

কমলা কহিল—“আমি রীখাখাড়া-বস্ত্র করার কাল সমস্ত শিখিয়াছি।”

কেশবদত্তী কহিলেন—“অমন অল্পপূরিত, মত চেঁহারা, তুমি যদি রীখাখাড়ার কাজ না জানিবে ত কে জানিবে! আজ ‘পর্বাঙ্কু নলিনকে আমি নিজে রীখিয়া খাওয়াইয়াছি—আমার অস্থির হইলে বরকৎ স্বপাক রীখিয়া খায়, তবু আর কাহারো হাতে খায় না। এবার হইতে তোমার কল্যাণে তাহার স্বপাক খাওয়া আমি খোচাইব। আর অক্ষম হইয়া পড়িলে আমাকেও যদি চারটিখানি হবিষ্যায় রীখিয়া খাওয়াও ত আমার তাহাতে অনতিকৃতি হইবে না। চল মা, তোমাকে আমার তাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর সমস্ত দেখাইয়া আনি।”

এই বলিয়া কেশবদত্তী তাঁহার স্তম্ভ ঘর-করার সমস্ত নৈশখাগুহ কমলাকে দেখাইলেন। কমলা ইতিমধ্যে একটা অবকাশ বুঝিয়া আস্তে আস্তে আপনার দরখাত আরি করিল। কহিল, “মা, আমাকে আজকে রীখিতে দাও না।”

কেশবদত্তী একটুখানি হাসিলেন। কহিলেন,

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

নই ছাড়িত না। আর বাড়ীতে এসে
করিবামাত্র রাত্রির শব্দ এবং গন্ধ
তাহাকে আক্রমণ করিল। যা এখন রাত্রির
শব্দ আছেন মনে করিয়া নলিনাক রাত্রি-
শব্দের দরকার সামনে আসিয়া উপস্থিত
হইল।

পদশব্দে চকিত কমলা পিঠন করিয়া
চাহিতেই একেবারে নলিনাকের সহিত
তাহার চোখে-চোখে সাক্ষাৎ হইয়া গেল।
তাড়াতাড়ি হাতটা রাখিয়া ঘোমটা টানিয়া
দিবার যুগা চেষ্টা করিল—কোমরে আঁচল
জড়ান ছিল—টানাটানি করিয়া ঘোমটা মখন
মাথার কিনারায় উঠিল, বিদ্যিত নলিনাক
তখন দেখান হইতে চলিয়া গেছে। তাহার
পর কমলা মখন হাতা তুলিয়া লইল, তখন
তাহার হাত কাঁপিতেছে।

পূজা সকাল-সকাল সারিয়া ক্ষেমকরী
মখন রাত্রির গেলেন, দেখিলেন, রাত্রি সারা
হইয়া গেছে। ঘর দুইটা কমলা পরিষ্কার
করিয়া রাখিয়াছে কোথাও পোড়াকাত
বা ভরকারির খোলা বা কোনোপ্রকার
অপরিস্কারতা নাই। দেখিয়া ক্ষেমকরী মনে
মনে খুঁস হইলেন, কহিলেন, “মা, তুমি
ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে।”

নলিনাক আহারে বসিলে ক্ষেমকরী
তাহার সম্মুখে বসিলেন—আর একটি লক্ষ্যিত
প্রাণী কান পাতিয়া ঘরের আড়ালে হাঁড়া-
ইয়া ছিল—তঁকি মারিতে সাহস করিতেছিল
না—ভরে মরিয়া বাইতেছিল,—পাছে তাহার
রাত্রি খারাপ হইয়া থাকে।

ক্ষেমকরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “নলিন,
আজ রাত্রিটা কেমন হইয়াছে?”

এই বলিয়া ক্ষেমকরী, কি রাখিতে
হইবে, কি করিতে হইবে, কমলাকে সমস্ত
উপদেশ দিয়া পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন।
ক্ষেমকরীর কাছে আজ কমলার বরকরার
পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কমলা তাহার দৈনন্দিক জীবনযাত্রার
সহিত রন্ধনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া,
কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় এলোচুল
কুঁটি করিয়া-লইয়া রাখিতে প্রস্তুত হইল।

নলিনাক বাহির হইতে বাড়ীতে ফিরি-
লেই প্রথমে তাহার মাকে দেখিতে বাইত।
তাহার মাতার স্বাস্থ্যদৃষ্টি চিত্তা তাহাকে

নলিনাক ভোজ্যপদার্থদ্বারা সমস্তদ্বার ছিল না—তাই ক্ষেত্রবরী এরূপ অন্যায়ক এবং কখনো তাহাকে করিতেন না—আজ বিশেষ কোতূহলবশতই বিজ্ঞাপ করিলেন ।

নলিনাক যে অন্তকার রাসায়নের নুতন রহস্যের পরিচয় পাইয়াছে, তাহা তাহার মা জানিতেন না । ইদানীং মাতার শরীর খারাপ হওয়াতে নলিনাক রাধিবার ক্ষমতা লোক নিযুক্ত করিতে মাকে অনেক পীড়া-পীড়ি করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজি করিতে পারে নাই । আজ নুতন লোককে বন্ধনে নিযুক্ত দেখিয়া সে মনে মনে খুসি হইয়াছে । রাত্রি কিস্তি হইয়াছে, তাহা সে বিশেষ মনোযোগ করে নাট—কিন্তু উৎসাহের সহিত কহিল, “রাত্রি চমৎকার হইয়াছে মা !”

আড়াল হইতে এট উৎসাহবাক্য শুনিয়া কমলা আর স্থির হইয়া পড়িয়া গেল । পাকিতে পারিল না । সে ততপদে পানের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার চকল বককে দুই বাহুর দ্বারা পীড়ন করিয়া ধরিল ।

আধারান্তে নলিনাক আপনার মনের মধ্যে কি-একটা অশ্লীলতাকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুসারে নিদ্রিত অধারনে চলিয়া গেল ।

বৈকালে ক্ষেত্রবরী কমলাকে লইয়া নিজে তাহার চুল বাধিয়া সৌম্যে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন—তাহার মুখ একবার এপাশে, একবার ওপাশে ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন—কমলা গম্ভীর চক্ষু নত করিয়া বলিয়া রহিল । ক্ষেত্রবরী মনে মনে

কহিলেন, “আহা, আমি যদি এইরকমের একটি বো পাইতাম !”

সেই রাত্রেই ক্ষেত্রবরীর আবার আর আসিল । নলিনাক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল । কহিল, “মা, তোমাকে আমি কিছুদিন কষ্ট হইতে অল্প কোথাও লইয়া যাইব । এখানে তোমার শরীর ভাল থাকিতেছে না ।”

ক্ষেত্রবরী কহিলেন—“সেটি হুঁইয়া বাছা । দুঃস্বপ্নে বাচাইয়া রাধিবার আমার আমাকে যে কানী ছাড়িয়া অল্প কোথাও লইয়া যাবি, সেটি হবে না । ওকি মা, তুমি যে দরবার পাশে পড়িয়াছ, আমি ? বাও বাও, তত বাও । সমস্ত রাত অমন জাগিয়া কাটাওলে চলিবে না । আমি যে-কদিন বামোতে আছি, তোমাকেই ত সব দেখিতে-শুনিতে হইবে । রাত জাগিলে পারিবে কেন ? মা ত নলিন, একবার ও ঘরে যাও ।”

নলিনাক পানের ঘরে বাইতেই কমলা ক্ষেত্রবরীর পদতলে বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল । ক্ষেত্রবরী কহিলেন—“আর অগ্নে নিদ্রিত তুমি আমার মা ছিলে মা । নহিলে কোথাও কিছু নাই, তোমাকে এমন করিয়া পাইব কেন ? দেখ, আমার একটা অভ্যাগ আছে, আমি বাজে কোনো লোকের সেবা গঠিতে পারি না—কিন্তু তুমি আমার পায়ে হাত দিলে আমার মা বেন জুড়াইয়া যার । আশ্চর্য্য এই যে, মনে হইতেছে, তোমাকে আমি বেন কতকাল ধরিয়াই জানি । তোমাকে ত একটুও পর মনে হয় না । তা শোন মা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে যাও । পানের ঘরে নলিন

ব্রহ্ম—মার সেবা সে আর কারো হাতে
ছাড়িয়া দিতে পারিবে না—তা হাতার
বারণ করি আর বাই করি—ওর সঙ্গে
পারিয়া উঠিবে কে বল! কিন্তু ওর একটি
শুণ আছে, রাত জাগতু আর ঘাই করুক, ওর
সুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যাইবে না—তার
কারণ? ও কখনো কিছুতে অস্থির হয় না।
আমার টিক তার টু-টা। না, তুমি বোধ
করি মনে মনে হাসিতেছ। ভাবিতেছ,
নলিনের কথা আরম্ভ হইল, এবারে আর কথা
ধামিবে না। তা না, এক ছেলে থাকিলে
ঐরকমই হয়। আর নলিনের মত ছেলেই
বা কলন মায়ের হয়। সত্য বলিতেছি,
আমি এককবার ভাবি—নলিন ত আমার
বাপ—ও আমার জন্তে যতটা করিয়াছে,
আমি কি উহার তুলে ততটা করিতে
পারি!—ঐ দেখ, আবার নলিনের কথা।
কিন্তু আর নয়—যাও না, তুমি শুইতে যাও।
না না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না—
তুমি—যাও—তুমি থাকিলে আমার ঘুম
আসিবে না। বুড়োমাহু, লোক কাছে
থাকিলেই কেবল ঘকিতে ইচ্ছা করে।”

পরদিন কমলাই ঘরকরার সমুদয় ভার
গ্রহণ করিল। নলিনাক পূর্বস্বিকের বাগা-
ন্যার এক অংশ ঘিরিয়া-লইয়া মার্কেল দিয়া
বাঁধাইয়া একটি ছোট ঘর করিয়া লইয়াছিল—
ইহাই তাহার উপাসনাগৃহ ছিল—এবং
যথাক্রমে এখানেই সে আগনের উপর বলিয়া
অধ্যয়ন করিত। সেদিন প্রাতে সে ঘরে
নলিনাক প্রবেশ করিয়াই দেখিল—ঘরটি
দোত, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন—খুশা জ্বালাইবার
জন্ত একটি পিতলের ধুতি ছিল, সেটি

আজ সোনার মত ঝল্‌ঝল্‌ করিতেছে।
শেলকের উপরে তাহার কদমকপানি বই ও
পুঁথি সজ্জিত করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে।
এই গৃহবানির গয়নার্জিত নির্মলতার উপরে
মুক্তবার দিয়া প্রভাতরোদের উজ্জলতা
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দেখিয়া নান হইতে
গম্ভঃপ্রত্যাপিত নলিনাকের মনে বিশেষ
একটি কুপ্তির স্ফূর্তি হইল।

কমলা প্রভাতে ঘটিতে গঙ্গাঙ্গল লইয়া
ক্ষেমকরীর বিছানার পাশে আসিয়া উপ-
স্থিত হইল। তিনি তাহার দ্ব্যস্তমুখি দেখিয়া
কহিলেন—“একি না, তুমি একলাই ঘাটে
গিয়াছিলে? আমি আজ তোমার হইতে
ভাবিতেছিলাম, আমার অস্থখ, তুমি কাহার
সঙ্গে নানো যাইবে। কিন্তু তোমার বল বয়স,
এমন করিয়া একলা—”

কমলা কহিল—“না, আমার বাপের বাড়ীর
একটা চাকর থাকিতে পারে নাই, আমাকে
দেখিতে কাল রাত্রেই এখানে আসিয়া
উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া-
ছিলাম।”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“আহা, তোমার
খুঁজিয়া বোধ হয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—
চাকরটাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। জা বেশ
হইয়াছে—সে তোমার কাছেই থাক না—
তোমার কাজে-কর্মে সাহায্য করিবে।
কোথায় সে, তাহাকে ডাক না।”

কমলা উদ্দেশ্যে লইয়া হাজির করিল।
উদ্দেশ্য গড় হইয়া ক্ষেমকরীকে প্রণাম করিতে
তিনি বিজ্ঞানী করিলেন—“তোমার নাম
কি?”

সে কহিল—“আমার নাম উদ্দেশ্য।”

বলিয়া অকারণ বিকশিত হাতে তাহার মুখ
ভরিয়া গেল।

কেমকরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“উমেশ, তোর এই বাহারে কাণ্ডখানা
তোকে কে দিলে রে?”

উমেশ কমলাকে দেখাইয়া কহিল—“মা
দিয়াছেন।”

কেমকরী কমলার দিকে চাহিয়া পরিহাস
করিয়া কহিলেন, “আমি বলি, উমেশ বৃষ্টি
ওর বাওড়ির কাছ হইতে জামাইবটী
পাইয়াছে।”

কেমকরীর দেহলাভ করিয়া উমেশ এই-
খানেই রহিয়া গেল।

উমেশকে সহায় করিয়া কমলা দিনের
বেলাকার সমস্ত কাজকর্ম শেষ করিয়া
কেলিল। স্বহস্তে নলিনাকের শেবার ঘর
কাঁট দিয়া, তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া
তুলিয়া, সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।
নলিনাকের মরলা ছাড়া-খুঁতি ঘরের এক-
কোণে পড়িয়া ছিল। কমলা সেখানি
ধুইয়া, শুকাইয়া, তাঁজ করিয়া আলনার উপরে
ঝুলাইয়া রাখিল। ঘরের বে-সব জিনিস
কিছুমাত্র অপরিষ্কার ছিল না, তাহাও সে
মুছিয়াছে ছলে বারবার নাড়াচাড়া করিয়া
লইল। বিছানার শিরেরেব কাছে দেয়ালে
একটা গা-আলুমারি ছিল—সেটা খুলিয়া
দেখিল, তাহার মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল
নীচের থাকে নলিনাকের একজোড়া বড়ম
আছে। তাড়াতাড়ি সেই বড়মলোড়াটি তুলিয়া-
লইয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল—এবং ছোট
নিগুটির মত বৃকের কাছে ধরিয়া অকল দিয়া
বারবার তাহার পূজা মুছাইয়া দিল।

বৈকালে কমলা কেমকরীর পারের কাছে
বলিয়া তাহার পায়ে হাত ঝুলাইয়া দিতেছে,
এমন-ক্রমের তেমনলিনী একটি কুলের পাজি
লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং কেমকরীকে
প্রণাম করিল।

কেমকরী উঠিয়া-বসিয়া কহিলেন—“এস
এস, হেম এস, বোস।” অন্নদাবাবু ভাল
আইছেন?”

হেমলিনী কহিল “তাঁহার শরীর অসুস্থ
ছিল বলিয়া কাল আসিতে পারি নাই, আজ
তিনি ভাল-আছেন।”

কমলাকে দেখাইয়া কেমকরী কহিলেন—
“এই দেখ বাছা, নিগুতালে আমার মা মারা
গেছেন; তিনি আবার অন্ন লইয়া এতদিন
পরে কাল পথের মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখা
দিয়াছেন। আমার মার নাম ছিল হরি-
ভাবিনী—এবারে হরিদাসী নাম লইয়াছেন।
কিন্তু হেম, এমন লক্ষ্যের মূর্তি আর কোথাও
দেখিরাছ? বল ত!”

কমলা লক্ষ্যের সুখ নীচু করিল। “হেম-
লিনীর সঙ্গে আত্মে আত্মে, তাঁহার পরিচয়
হইয়া গেল।

হেমলিনী কেমকরীকে জিজ্ঞাসা করিল
—“মা, আপনার শরীর কেমন আছে?”

কেমকরী কহিলেন—“দেখ, আমার তে
বয়স হইয়াছে, এখন আমাকে আর শরীরের
কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। আমি যে
এখনো আছি, এই ডের। কিন্তু তাই বলিয়া,
কালকে চিরদিন ফাঁকি দেওয়া ত চলিবে না।
তা তুমি যখন কথাটা পাড়িয়াছ, তাঁলই হই-
য়াছে—তোমাকে কিছুদিন হইতে বলিয়-
বলিব করিতেছি, স্ত্রীবিদ্যা হইতেছে না। কাল

রাগে আবার ধনন আমাকে আরে ধরিল, তখন ঠিক করিলাম, আর বিলম্ব করা ভাল হইতেছে না। দেখ বাছা, ছেলেবয়সে আমাকে যদি কেহ বিবাহের কথা বলিত ত লক্ষ্য করিয়া যাইতাম—কিন্তু তোমাদের ত পেরকম শিক্ষা নয়। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ—বয়সও হইয়াছে—তোমাদের কাছে এ সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলা চলে। সেইজন্যই কথটা পাড়িতেছি, তুমি আমার কাছে লক্ষ্য করিয়া না। আচ্ছা বল ত বাছা, দেখিন তোমার বস্তার কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি কি তোমাকে বলেন নি ?”

হেমনলিনী নতমুখে কহিল—“হাঁ, বলিয়াছিলেন।”

কেমকরী কহিলেন—“কিন্তু তুমি বাছা দেখায নিশ্চয়ই রাগি হও নাই। যদি রাগি হইতে, তবে অন্নবাবু তখন আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। তুমি ভাবিলে, আমার নলিন সন্ন্যাসিনী, দিনরাত্রি কি-সর্ব বোগবাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন? হোক আমার ছেলে, তবু কথটা উড়াইয়া দিবার নয়। উহাকে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, উহার বেন কিছুতেই কোনোদিন আপত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল;—আমি উহাকে লক্ষ্যকাল হইতে জানি, আমার কথটা বিশ্বাস করিয়া। ও এত বেশি ভালবাসিতে পারে যে, সেই ভয়েই ও আপনাকে এত করিয়া দমন করিয়া রাখে। উহার এই সন্ন্যাসের খোলা ভাঙিয়া যে উহার স্বয়ং পাইবে, সে বড় মধুর বিনিময় পাইবে, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। যা হৈম,

তুমি বলিলা; নও, তুমি নিশ্চিত, তুমি আমার নলিনের কাছে হইতেই দাঁকু লইয়াছ, তোমাকে নলিনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি যদি মরিতে পারি, তবে বড় নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব। নাইলে, আমি নিশ্চয় জানি, আমি মরিলে ও আর বিবাহই করিবে না। তখন ওর কি দশা হইবে, ভাবিয়া দেখ দেখি। একেবারে ভাসিয়া বেড়াইবে! বাই হোক, বল ত বাছা, তুমি ত নলিনকে প্রভা কর আমি জানি, তবে তোমার মনে আপত্তি উঠিতেছে কেন?”

হেমনলিনী নতনেত্রে কহিল, “মা, তুমি যদি আমাকে যোগ্য ননে কর, তবে আমার কোনো আপত্তি নাই।”

শুনিয়া কেমকরী হেমনলিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুপন কারলেন। এ সবকে আর কোনো কথা বলিলেন না।

“হরিদাসি, এই ফুলগুলো”—বলিতে বলিতে পাশে চাহিয়া দেখিলেন, হরিদাসী নাই। সে নিঃশব্দপথে কখন উঠিয়া গেছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পর কেমকরীর কাছে হেমনলিনী সন্ধ্যাবেশ করিল—কেমকরীর ও বাধে-বাধে করিতে লাগিল। তখন হেম কহিল, “মা, আজ তবে সকাল-সকাল যাই। বাবার শরীর ভাল নাই।”—বলিয়া কেমকরীকে প্রণাম করিল। কেমকরী তাহার মাথার হাত দিয়া কহিলেন—“এস মা, এস।”

হেমনলিনী চলিয়া গেলে কেমকরী নলিনাককে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কহিলেন, “নলিন, আর আমি ঘেরি করিতে পারিব না।”

নলিনাক্ষ কহিল, “বাণ্যাত্মনা কি ?”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“আমি আর হেমকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম—সে ত রাজি হইয়াছে, এখন ভোম্বর কোনো ওজর আমি জনিতে চাই না। আমার শরীর ত দেখিতে হিন্দু। ভোম্বের একটা বিত্তি না করিয়া আমি কোনোমতেই হুহির হইতে পারিতেছি না। অর্ধেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমি ঐ কথাটি ভাবি।”

নলিনাক্ষ কহিল, “আচ্ছা মা, তাবিয়ো না, তুমি ভাল করিয়া ঘুমাইয়ো, তুমি যেমন ইচ্ছা কর, তাহাই হইবে।”

নলিনাক্ষ চলিয়া গেল ক্ষেমকরী ডাকিলেন—“হরিনাসি।”

কমলা পাণের ঘর হইতে চলিয়া আসিল। তখন অপরাহ্নের আলোক স্নান হইয়া ঘর আর অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। হরিনাসীর বৃথ ভাল করিয়া দেখা গেল না। ক্ষেমকরী কহিলেন—“বাছা, এই ফুলগুলিতে অল দিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখ।” বলিয়া বাছিয়া একটি গোলাপ তুলিয়া ফুলের সাজটি কমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

কমলা তাহার মধ্যে কতকগুলি ফুল তুলিয়া একটি থালায় সাজাইয়া নলিনাক্ষের উপাসনাগৃহের আসনের সম্মুখে রাখিল। আর কতকগুলি একটি বাটিতে করিয়া নলিনাক্ষের সোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর রাখিয়া দিল। শব্দকি কয়েকটি ফুল লইয়া সেই

দেয়ালের গায়ে আলুমাটি খুলিল এবং সেই খড়মজোড়ার উপর ফুলগুলি রাখিয়া তাহার উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেই তাহার চোখ মিমা সাজ করত করিয়া অল পড়িতে লাগিল। এই খড়ম ছাড়া অর্পণে তাহার আর কিছুই নাই—শকসেবার অধিকার হারাইতে বুসিয়াছে।

এমন সময়ে ঠাণ্ডা ঘরে কে প্রবেশ করিতেই কমলা খড়মজড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি, আলুমারির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ। কৌনোদিকে কমলা পালাইবার পথ পাইল না—লজ্জায় কমলা সেই আসন্ন সারাদ্বারের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল না কেন ?

নলিনাক্ষ ঘরের মধ্যে কমলাকে দেখিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলাও আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অস্ত্র ঘরে চলিয়া গেল। তখন নলিনাক্ষ পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেয়েটি আলুমারি খুলিয়া কি করিতেছিল—তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিলই বা কেন ? কৌতুহলবশত নলিনাক্ষ আলুমারি খুলিয়া দেখিল—তাহার খড়মজোড়ার উপর কতকগুলি সন্দেশ ফুল রহিয়াছে। তখন সে আবার আলুমারির দরজা বন্ধ করিয়া শরনগৃহের আলুমারি কাছে আসিয়া পড়াইল। বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শ্রুত-সুখ্যন্তের অশকালীন আভা মিলাইয়া আসিয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

ত্রিবেঙ্কুর ।



৫

‘বনন সূর্যোর প্রথর’ ভাণ কবিত্তে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অপরাহ্ন চারঘটিকার সময় গায়ক-বাদকের দল আসিয়া পৌছিল। তাহার দলে-দলে গুরু গাড়িতে আসিয়াছে। মহারাজা, নিজ প্রাসাদের গায়ক-বাদক-দ্বিগকে কিরংকালের অন্ত আনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

উহাদের সুখাবর-বরণা হৃদয় ও হৃদয়, সমস্ত মুখের কলা-ওগিজন-হ্রস্বত। নিঃশব্দে নগরপথে উহারা প্রবেশ করিল,—মার্জারবৎ মধুমল-কোমল-পদ-সকারে প্রবেশ করিল। দস্তরমত সম্মানপ্রদর্শনাৎ একটু নতশির হইয়া, তাহার পর তৃত্তনে গালিচার উপর উপবেশন করিল। মাথায় ক্ষুদ্র ভরির পাগড়ি; উহাদের গাত্র পুরাকালীন প্রাণীর-ধরণে—রেশম বস্ত্রে আচ্ছাদিত;—উসরের একপার্শ্ব অনাবৃত রাখিয়া উহা হৃকের উপর দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুধর ধাতব বলয়ে ভূষিত। উহাদের কিন্ফিনে পাতলা পরিচ্ছদের মধ্য হইতে আন্তর-গোলাপের গন্ধ ভুব্ভব করিয়া বাহির হইতেছে।

উহারা তাম্রভট্টীয় বড় বড় বাস্তব্য সঙ্গে আনিয়াছে:—সে একপ্রকার বিরাট “ব্যাণ্ডলিন্” কিংবা “গিতার্”। বস্ত্রগুলির ডাক্তি বাকিয়া-নিধা একপ্রকার বিরাড়াকার অস্ত্রবিশেষের মস্তকে পদ্যাদিত হইয়াছে।

এই “গিতার্”—গুলি বিভিন্নপ্রকারের এবং উহা হইতে বিভিন্নপ্রকারের বস্ত্র নিঃসৃত হইবার কথা। কিন্তু সকলগুলিরই স্বরকোষ একাধ এবং স্বরের রেস্ বৃদ্ধি করিবার জন্য বস্ত্রগুলির গারে কাঁপা তুফনকল রাখিয়াছে;—মনে হয়, যেন একটি তরু-কাণ্ডের গারে বড়-বড় ফল ফলিয়া রহিয়াছে। এই বস্ত্রগুলি রং-করা, গিন্টি-করা, হাতী-পাতের কাজ-করা, বহু পুরাতন, সম্পূর্ণরূপে শুষ্কীকৃত, শব্দযোনি ও বহুমুখ্য চূর্ণিত জিনিষ। কেবলমাত্র উহাদের বিভিন্ন আকৃতি ও অলুত গঠন দেখিয়াই আমার মনে রহস্যময় ভাব—তারতম্য-জ্ঞাত রহস্যময় ভাব জাগিয়া উঠিল। বাদ্যেরা হাসিমুখে বস্ত্রগুলি আমাকে দেখাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গুলীর দ্বারা, কতকগুলি ছড়ের দ্বারা ও কতকগুলি খিলকের দ্বারা বাজাইতে হয়। আর-এক-প্রকার বস্ত্র আছে—তাহার তারের উপর কালো ডিম্বাকার একটুকরা আবলুং-কাঠ বুলাইয়া বাজাইতে হয়। বাদ্যের কি দ্বন্দ্ব ভেদ! এই সকল “স্বস্ত্র”ের আনন্দের পান্ডাত্য সঙ্গীতবিজ্ঞার অগোচর!

তা ছাড়া, “কতকগুলি” “টুন্টুন্”—বাস্তব আছে,—সেগুলি বিভিন্ন স্বরে বাধা। আবার, কতকগুলি বালক-গায়ক আসিয়াছে; উহাদের পরিচ্ছদ বিশেষরূপে ধমকালো ও

বিশাল-কৃষ্ণত। আমার কত, সঙ্গীত-কার্যের যে অমূল্যমণিকা ছীনা হইয়াছে, উহার একখণ্ড আমার হস্তে উহার অর্পণ করিল। গায়ক-বাদকদিগের ক্রতিমধুর অমৃত নাম উচ্চাতে লেখা রহিয়াছে—সকল নামগুলিই আর বাণেশ-পদ্মাকরের।

পাঁচটা বাজিল। গায়ক-বাদকের দল সব-মুহু প্রায় বহুজন। উহার গালিচার উপর আসীন। যে বৈঠকখানা-ঘরে উহার বসিয়াছে, সেই ঘরের মধ্যে এখন যেন সজ্জার দ্বারা পড়িয়াছে। দেবার দোশন-বৎ অলসভাবে “পাখা” চলিতেছে। এইবার সঙ্গীতের আলাপ শুরু হইবে; কেন না, যন্ত্রের অগপ্রান্তর পশুসুর্ভিগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকৃত যন্ত্রগুলি হইতে না-আনিকি তহানক শব্দ—এই “টমটম্”-গুলি হইতে না-আনিকি ভীষণ কোলাহলই সমুৎপন্ন হইবে। আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি—একটা তুঙ্গ শব্দ শুনিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি। গায়ক-বাদকদিগের পন্দাভ্যাসে একটা বিশাল-কৃতি দ্বার উন্মুক্ত; তাহার পরেই একটা শাব্য প্রবেশ-দালাল। সেই দালালে অগ্রমান সূর্য্যের একটি কনকরাশি প্রবেশ করিয়া মহারাষ্ট্রের একদল দৈত্যের উপর নিপতিত হইয়াছে। শোভাৰ্থ সজ্জিত এই নৈনিকসুর্ভিগুলি, মাথার লাল পাপুড়ি পরিয়া, রক্তির সূর্যালোকে গণ্ডারমান। এদিকে, গায়ক-বাদকের দল ঘোর-ঘোর অশ্লষ্ট ছাঁরার মধ্যে নিমজ্জিত।

উদ্দেশ্যে-সঙ্গীত কি আরম্ভ হইয়াছে? হাঁ, বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছে। কেন না,

দেখিতেছি, উহার গণ্ডারময় পারণ করিয়াছে। কিন্তু কৈ, কিছুই শুনা না-বাই-তেছে! না...না না ঐ যে...একটি কৃত্ত তার-গ্রামের সুর—কদাচিত্ ক্রতিগ্রাহ—“গোহেন্দ্রেন্দ্র”-গীতিনাট্যের উদযটক আলপিন-চারীর দ্বার অতি-বিসম্মিত গুরে বাজিত হইতেছে। পরে, উহা “গুন্”-গুরে বাজিতে লাগিল, তান-পন্নবে ঈটিন হইয়া উঠিল; কিন্তু শেষের মাত্রা, আদৌ বৃদ্ধি না-পাইয়া, শুধু ছন্দোময় গুণনে পরিণত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, এই সকল-শক্তিমান তন্ত্রীসমূহ হইতে নিঃশব্দ প্রায় সঙ্গীত বাহির হইতেছে!—যেন করপুট-বন্দী মক্ষিকার গুন্-গুন্-শব্দ, যেন জানুলা-শাসির গুরে পতঙ্গের বর্ষণশব্দ অথবা যেন dragon-fly মক্ষিকার ক্রতরঞ্জন বসিয়া মনে হয়। উদ্দেশ্যের মধ্যে একজন সুরের মধ্যে একটি ছোট ইম্পাতের লিখিত রাগিণী তাহার উপর গগনদেশ বর্ষণ করিয়া ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের দ্বার একপ্রকার ছন্দময় শব্দ বাহির করিতেছে। একটা বৃহৎ “গিতারের” উপর এবং অত্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রের উপর বাদক যেন অতি ভরে-ভরে ও সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া প্রায় একই সুর ক্রমাগত বাহির করিতেছে। পেচকের চাপা কষ্ট-বয়ের দ্বার, ক্রমাগত বহ!—হহ!—এই-রূপ শব্দ নির্গত হইতেছে। আবার সুরের সমুদ্রতটের উপর বীচিত্রশব্দের দ্বার একপ্রকার চাপা আওয়ার কোন-এক বস হইতে বাহির হইতেছে। একপ্রকার “টমটম্”-জাতীর বস আছে, তাহার কিনারা-উপর বাদক অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া

বাহ্যিভেদেহে ।... তাহার পর, হঠাৎ অন্তর্কিত-
পূর্ণ কতকগুলি কাঁকানি আরম্ভ হইল,
কিন্তু তাহার প্রচণ্ড প্রকোপ মুহূর্ত্তব্য-
তায়ী। সেই সময় “সিগ্না”-তন্ত্রীগুলি
ব্যর্থপ্রবাহই সন্মোহের কলিত হইতে থাকে
এবং টম্‌টম্‌গুলি হইতেও তখন গভীর
চাপা আঁওরাজ বাহির হইতে থাকে। কোন
কাঁপা মাটির উপর গুরুপদক্ষেপে হাতী
চলিয়া গেলে যেমন শব্দ হয়, উহার সেইরূপ
শব্দ; অথবা কোন গূঢ়মার্গে আস্তর্ভৌম অল-
প্রবাহিনিঃসৃত কল্লোলের স্রাব—কিন্তু
ঐহই সমস্ত প্রশমিত হইল। আবার সেই
পূর্নবৎ নিঃশব্দপ্রায় বাদনক্রিয়া ।

একজন ব্রাহ্মণযুবক—যার চোখজুটি
অতি সুন্দর—সে হুমির উপর আসনবন্দ
হইয়া বসিয়া আছে; তাহার জাহ্নব উপর
একটি জিনিষ রহিয়াছে। অস্ত্রস্ত্র প্রবাদি
যেমন মূণ্ডোভন ও মূরতিযুগল, এ জিনিষটা
ঠিক তার বিপরীত। ইহা নিত্য রক্ত
প্রান্যধরংগর। একটা সামান্য মাটির হাঁড়ি,
তাহার মধ্যে কতকগুলো হুড়ি। হাঁড়ির
বৃহৎ মুখটা তাহার নয় অক্ষর বন্ধের উপর
স্থাপিত। ঐ মুখের কিয়দংশ যে পরিমাণে
খুলিয়া রাখিতেছে কিংবা বন্ধে ঢালিয়া বন্ধ
করিতেছে, তদনুসারে তারিঃসৃত শব্দেরও
ভিন্নতয়া হইতেছে। এবং অঙ্গুলীর দ্বারা
সেই হাঁড়িটা এত তাড়াতাড়ি বাজাইতেছে
যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উহার
শব্দ কখন লঘু, কখন গভীর, কখন ষট্‌ধ্বনি।
এক-এক সময়ে যখন হুড়িগুলো নড়িয়া উঠে,
তখন শিলাবৃষ্টির স্রাব ষট্‌পট্‌শব্দ স্রুত হয়।
পূর্নোক্ত শব্দময় নিপুণতা ভেদ করিয়া যখন

কোন একটি সিগ্না হঠাৎ দত্বভাবে তান
উখিত হয়, তখন কোন দর হইতে বহুদূরে
গড়াইয়া বাইবার সময় পরিত্যক্ত আর্ন্তনাদ
করিয়া উঠে। সেই আবেগময় তানটি
সন্মোহে পূর্ণবরে বাদিত হয় এবং তীএ
যাতনার বেন একেবারে অধীর ও সংকুচিত
হইয়া উঠে। তখন টম্‌টম্‌গুলির বাজ এই
কল্পমান আর্ন্তনাদকে আবৃত না করিয়া,
একপ্রকার রহস্যময় ভূমূল শব্দ বাহির
করিতে থাকে। ইহা মানবদগ্ধের দ্বঃ-
যাতনার পরাকাষ্ঠা একমু ভীতভাবে একাশ
করে—বাহ্য আনন্দের উচ্চতম শাস্তাত্য-
সম্বীতের সাধ্যাতীত ।...

—“হস্তারা আসিগা পৌছিয়াছে”—
একজন বলিয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ হইয়া
সম্মত তনিতেলিলাম—এই বাক্যে আমার
সেই নোহ ছুটিয়া গেল।... হাতী আবার
কোথা হইতে আসিল?—ও! মনে
পড়িয়াছে; ... ভারতীয় সাম্রাজ্যের সজ্জিত
হাওদা সমেত একটি হতী দেখিবার জন্য
আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; এবং
তদনুসারে আমার জন্য প্রাচীর হস্তিশালা
হইতে হতী সজ্জিত করিয়া আনিবার
আদেশ হয়।

সম্মত থাকিয়া গেল। কেন না, হাতী
দেখিবার জন্য এখন আমাকে ঘরের বাহির
হইতে হইবে। বাড়ীর দ্বারদেশ পার হইয়াই
হঠাৎ দেখিলাম—আমার সম্মুখে তিনটা
বড়-বড় হতী দণ্ডায়মান। অন্তর্য্যাময় হৃদয়ের
আগোকে উদ্ভাসিত এই তিনটা হাতী
দ্বারদেশের সম্মুখে আমায় জুড়ি একতরফ
অপেক্ষা করিতেছিল। উভয়ের সঙ্গসঙ্গ

সামান্যর একপ নাড়ত এ, সমুখে আসিয়া
 প্রথমে আর কিছুই লক্ষ্য হইল না;—লক্ষ্য হয়
 তখন উহাদের স্বর্ণাশ্রিত আয়তাকারের অস্ত্র দস্তবস্ত্র,
 উহাদের কাশো-কুটিকি-বৃক্ গোলাপি-রঙের
 প্রকাণ্ড শুভ্র, আর উহাদের কর্ণধর—বাহা
 হাতপাখার জার ক্রমাগত আন্দোলিত
 হইতেছে। সবুজ ও লাল রঙের দীর্ঘ
 পরিচ্ছদ; শুভ্রযুক্ত হাওনা, ঘটিকার হার
 এবং জরির টুপি—বাহা উহাদের বিবৃত
 লগাট পর্যায় নাবিয়া আসিয়াছে। তিনটা
 হাতীই প্রকাণ্ড, ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম, বেশ
 বলিষ্ঠ, আর এমন বস্ত্র—এমন শাস্ত্র।
 উহাদের বুদ্ধিবান্ধব ক্ষুদ্র চক্ষু দৃষ্টি আমার
 উপর স্থত হইল। আর এমন শায়েস্তা,—
 বাহাতে আমি ধীরে-স্বরে আরোহণ করিতে
 পারি, তজ্জন্ত অনেকক্ষণ জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া
 রহিল।

আবার যখন আমি সেই মক্ষিকাকুল্লন-
 বৎ সঙ্গীতের নিকট ফিরিয়া আসিলাম,
 তখন শুভ্র গৌণী সঙ্গীতশালায় প্রবেশ
 করিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে যখন সেই শুভ্রপ্রায় সমবেত
 সঙ্গীতের বিরাম হইতেছে—সেই অবকাশ-
 কালে এতোক ঘন আবার পৃথকভাবে খুব
 উচ্চৈঃস্বরে সঙ্ঘোরে তান বহিতেছে। বাদক
 কোনটাকে ছড়ের দ্বারা, কোনটাকে হস্তের
 দ্বারা প্রণীড়িত—কোনটাকে বা মির্জাকের
 দ্বারা সজ্জাঙ্কিত করিতেছে; এবং সর্গাপেক্ষা
 বিদ্যম্বনক, কোনটাকে, তারের উপর
 ডিম্বাকৃতি কাঠখণ্ড বুলাইয়া কাঁদাইয়া
 কুলিতেছে। কিন্তু সে বাহাই হউক, এই
 বিদ্যম্বন প্রকৃতি, মঙ্গলিরা কিংবা চীন-

দেশীয় সঙ্গীতের জার, আমাদের নিকট
 নিতান্ত দূরদেশীয় কিংবা প্রকৌণ্ড বলিয়া মনে
 হয়না। আমরা উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ
 করিতে পারি। সেই একই মানবজাতির
 স্রুতীয় মর্ম্মবেদনা উহার প্রকাশ করিতেছে—
 যে জাতি কালসহকারে আমাদের হইতে
 বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু
 মূলত ভিন্ন নহে। “জিগান্”-নামক সুরো-
 পীয বেদিয়ারা আমাদের মধ্যেও এইরূপ
 অরজালাম্ব সঙ্গীত আনয়ন করিয়াছে।

শেষে কণ্ঠসঙ্গীত। একটির পর একটি
 —সেই সমস্ত সুরমার বালকগুলি (সুন্দর-
 পরিচ্ছদ-পরিহিত—বড় বড় চোখ) খুব
 তাকাতাড়ি ক্রতলয়ে কতকগুলি গান গাহিল।
 উহাদের বালকধ্বনি ইহারই মতো ভাঙিয়া
 গিয়াছে চিরিয়া গিয়াছে। জরির পাগড়ি-
 পরা একটি লোক উহাদের অধিনেতা ও
 শিক্ষক। সে মাথা নাচু করিয়া—পাখীকে
 যেমন সর্পেরা দৃষ্টির দ্বারা মুগ্ধ করে, সেইরূপ
 সমস্তকণ্ঠ উহাদের চোখের পানে “একদৃষ্টে”
 তাকাইয়া ছিল, মনে হইল, যেন সে বৈদ্যাতিক
 শক্তির দ্বারা উহাদিগকে আয়ত্ত করিবার
 চেষ্টা করিতেছে;—ইচ্ছা করিলে যেন সে
 উহাদের তনুয় ক্ষাপ কণ্ঠবস্ত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ
 করিয়া ফেলিতে পারে। “কনিষ্ঠ-প্রার্থের”
 সুরে উহার যে গান ধরিয়াছিল, সেই
 গানটিতে স্থপিত কোন দেবতাকে প্রার্থনার
 দ্বারা প্রসন্ন করা হইতেছে।

সর্বশেষে, ঐ দেশের যে প্রধান গায়ক,
 এইবার তাহার গাহিবার পালা। জিন্দাব-
 বস্ত্র বুবাপুরুষ, বেশিতে বলিষ্ঠ, সুন্দর
 মুখশ্রী। কোন সুবতী কামিনীর বস্ত্র আর

তাঁহাকে ভাববলে না বনিয়া সেই কামিনা
আক্ষেপ করিয়া। যে গান করিতেছে, সেই
গানটি এই গায়ক এইবার আমাকে শুনাইবে।

সে বরাবর ভূতলেই বসিয়া ছিল।
প্রথমে সে গানটি নবনবনে ঠিক করিয়া
লইল, পরে, তাহার দৃষ্টি একটু ঘোর-ঘোর
ভাবধারণ করিল। তাহার পরেই সে একেখুরে
সজোরে গুণা ছাড়িয়া দিল। পাচাত্মীয় শানাই
প্রতি যন্ত্রের স্রাব তাহার কণ্ঠের অতীব
তীক্ষ্ণ। তার-গ্রামের কতকগুলি ঘরের উপর
পুরুষোচিত বল-সহকারে (একটু কর্কশ)
উহার কণ্ঠের হারি হইল। খুব তীব্রভাবে
(আবার পক্ষে নুতন) কত মর্দ-
বেদনাই প্রকাশ করিল। তাহার মুখে
কত হুংখের তঙ্গী—তাহার স্ক-স্ক হস্তে
কত কঠোর সঙ্কোচন প্রকটিত হইতে
লাগিল। এই সমস্তই উচ্চারণের মধ্যে
ধর্মব্য।

ইহার মহারাজের খাম্ গায়ক-বাদক।
মহারাজ। প্রতিদিন ক্রীড়াশালায়, ঘোর
নিশ্চলতার মধ্যে, উহারে সঙ্গীত শুনিয়া
থাকেন। তাহার চরিত্রার্থে ভূতাবর্গ
মার্জারবৎ নিঃশব্দগবস্ফারে ঘুরিয়া বেড়ায়
এবং জোড়হস্তে নতশিরে ক্রমাগত প্রণাম
করে।...জীবনের হুংখগ্রণা, প্রেমের হুং-
যন্ত্রণা, মৃত্যুর হুংখগ্রণা—এই সবকে মহা-
রাজের কল্পনা ও চিন্তাপ্রবাহ আবাদিগের
হইতে না-আনি কত ভিন্ন!...আদ্য-কালবার
সহিত বিনেশ্বর ভাবার বাধ-বাধ-ভাবে আদ্য-
দের মধ্যে যে কথাবার্তা বহন করি হইয়াছে,
তাঁহাতে বচনা আমি তাহার অন্তরের মধ্যে
প্রবেশ করিতে পারিয়াছি—তাঁহা অপেক্ষা
এই উচ্চারণের দ্বারা সঙ্গীত (বাহা তাঁহার
খাম্ শুনিব) শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনো-
ভাবের একটু বেশী আভাস পাইয়াছি, সম্বোধ
নাই।

ত্রিভোতিরিন্দ্রস্বর্গ ঠাকুর।

জয়সঙ্গীত ।



(১)

শতাব্দীর দীপ্তসূর্য্য এইবার উঠিয়াছে আলি
প্রাচী-পথ আলো করি। আগিয়াছে নব বলে বলী
এশিয়ার সুপ্ত সিংহ। বহি আসে গভীর গর্জন ;
ছুটে আসে লক্ষ্যধারে নবোদিত রবির কিরণ
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে।—ভাগ্য বার চির অন্ধকার,
তার ঘারে আজ কেন সৌভাগ্যের স্তম্ভ সমাচার ?
এ কাহার পরিহাস, কার এই নিদারুণ খেলা,
অশ্রুধারা বসাতে চাহে অঁকিয়া উৎসবের মেলা ?

(২)

শ্রুত বারি, তাঁরা আজ কি বুঝিবে জীবনের বাদ ?
 তাদের ললাটে লেখা —আছে, থাক্ কলঙ্ক-সংবাদ ।
 তবু কি বুঝাবে তারা ? বুঝে কারো নাই অধিকার ;
 যেহি তপ্রাণস আঁধি দেখে নিক্ আলোক আবার ।
 হার আঁধারের কৌট, চিরদিন রহিলি এমন ;
 বুঝা তোমর আঁধে-পাশে আসিতেছে নব আগরণ !
 তাই মুছ বিষ ভরি উঠিছে বে অরকোলাহল,
 তার মাঝে ধোপ দিতে আজ তোমর বন্ধে নাহি বল ।

(৩)

তাই তোমর মুখে শুনি' জয় আর বশের ঘোষণা,
 স্বাক্ষর করে বিখবালী । রাষ্ট্র-তবে নিষ্কল বন্দনা !
 এই দৃষ্ট সমান্তোহ, উৎসবের মঙ্গল-আচার,
 মাতৃভূমি, হে বিধবা, এতে তোমর নাই অধিকার ।
 কোথা সে অধর, মুক, কোথা এই লোহার পিকর !
 পারে কি খাঁচার পাখী ফুটাইতে অভ্রবাহীশ্বর ?
 তবু আজ প্রাণভরা উবেলিত আনন্দ-বিশ্বর,
 বাহিরে বহুবিধ তোলে, জয় জয়, আপানের জয় ।

(৪)

কাহ্নের এ দেশ ? তারা কবে হ'ল জগতে প্রকাশ ?
 কি ভাব ? কি ভাষা ?—ছিল এদের কি কোন ইতিহাস,
 বাহে তাই গোরুর চিত্র-কিছু গিরেছিল দেখা ?
 কিবা এরা সন্তুষ্ট, তাগাচকে উঠে এল একা
 জলন্ত গ্রহের মত, আকস্মিকের আগনি অধীর,
 নাই ফুটি, নাই দৈন্ত ; হেরি' বিষ নোরাইল শির ?
 আজ শুধু প্রাণভরা বন্দনার আনন্দ-বিশ্বর
 উজ্জ্বল গাহিয়া উঠে,—জয় জয়, এপির জয় ।

(৫)

কাহ্নাদের বাহবল সংগঠিত জনতার বলে,
 সংঘর্ষী সাধক ভাগী কারা দীর্ঘ তপস্তার ফলে,
 ধর্ম কাহ্নাদের কর্ণে জেগে থাকে প্রবতামত,
 ধর্মে কারা নহে দীত, অবিচার-অবমানেন নত,

কারা হেন শক্তিদয় বিহ্বলভী জয় অগণন
পারে নিবিকারিতে অনায়াসে করিতে গ্রহণ,
কাহাদের বেশহিত নহে শুধু থাকায় এবাহ,
যহে যহে মানু তরে পড়ে গেছে মরণে উৎসাহ !

(৬)

বিত্ত-ভাষা, কিপ্র কৰ্ম, দোষভ, ঐবার্ষ্য অতুলন,
শাস্ত্র সঙ্ঘব গৃহে, রণে কারা অজ্ঞের ভীষণ,
বুদ্ধশেষে কারা কুলে প্রতিহিংসা ঘোর বৈরিতার,
করা-শ্রেমে করে কারা অস্বাভিবে চির আপনার,
নাই ভীকু পলায়িত অবিবাসী কাহাদের যত,
বীরপ্রপু অন্তঃপুরে ক্ষমা নাই কাপুরুষ-তরে,
ছিন্ন করি' আপনজন পতি-পুত্রে আপনার হাতে
সাজায়ে পাঠায় কারা মৃত্যুগুহ্র যশের সভ্যতে !

(৭)

কাহাদের বাসুতন্ত্র পীড়নের বহুসম নয়,
রাজভক্তি প্রজাপ্রীতি এক খাতে একসাপে বয়,
রাজার প্রাসাদ হ'তে ভূচ্ছতম ঘোনের কুটীরে
ঐকো সখো পুত্র মন্ত্র বাজিতেছে অন্তরে-বাহিরে,
কাহাদের গৃহগালী ধনবাঞ্চে বাহ্যে উদ্ভাসিত,
শিল্পসজ্জা পণ্যভার দেশে আর বিদেশে পুঞ্জিত,
কাহাদের বাণিজ্যতরী উড়াইয়া বিজয়কেতন
স্বপর্কে সর্বত্র কিরি করিতেছে দৌতাপাকীর্তন !

(৮)

কাহাদের শিকারীকা বেশান্তরে লজি নববল,
স্বজাতির স্বদেশের করিতেছে শুধু সুখোচ্ছল,
কাহাদের প্রেষ্ঠ্যপ্রেষ্ঠ নহে গণ্য ধনে আর কুলে ।
গৌরবের সিংহাসন শুণিজননে শিরে লয় তুলে !
কারা এই মহাজাতি, যন্ত কোন রত্নগর্ভা-ভূমি
কেমনে বলিব তাহা, হে ভারত, কি সুখও তুমি !
হে ঘোর দুর্জনা মাতা, তব রক্তে গঠিত বে প্রাণ,
বীরযোগা বননা কি তার কণ্ঠে পায় কঙ্ক স্থান !

(৯)

ধৃত ধস্ত ধীরত্বমি, ধস্ত ধস্ত হে বীরের জাতি,
 অর হোক, অর হোক, চিরদীপ্ত থাকি বনোভাতি ।
 অনাগার অশ্রুত শান্তি, মানিশেষে পরম মঙ্গল,
 পুন তব গৃহে গৃহে উঠুক আনন্দকোলাহল ।
 ধনধাত্তে থাকো পূর্ণ, প্রীতিপূর্ণো অক্ষয় সত্তত,
 সমস্ত বিশ্বের শিরে শোভা পাও কিরীটের মত ।
 মহোচ্ছল অতীতের অনাদৃত ভ্রংশ-ধ্বংস-প'রে
 তোমা'রে সন্মুখে করি' এশিরা ঝড়াক্ গর্জতরে ।

(১০)

পশ্চিমের গম্বী ছাড়ি' ভাণ্ডারেখা পূবে এস সরি,
 হারাহো না পশ্চিমের মিথ্যা আর বার্থ 'অহুসরি'
 ভাগোর সে অভ্রাময় । হারাহো না আপন সখল,
 ভ্যাগে ছিট, সন্তো শুভ প্রাচ্যের সে আদর্শ উচ্ছল,
 যে সাধনবলে পেলে বিধাতার অহুসম্পা হেন,
 সে আগে'ক জেলে রেখো, তব ভাতে নাহি হ'য়ো ঘেন,
 পড়ি'হো না রাজরোয়ে, কত রাজ্য চূর্ণ হ'ল ঘর,
 মহাসম্রাটের সেই দণ্ড ঘেন পড়ে না মাথার ।

(১১)

ভারতের পূণ্যভার্থ, এশিয়ার প্রজ্জলিত আগা,
 এই ভালো, এই ভালো! আর ঘেন বাড়ি না পিপাসা ।
 অতিদর্প, অতিগোভ, অতিশ্রুতি ধ্বংসের কারণ,
 এই চিরন্তন নীতি চিরদিন রাখি'হো অরণ ।
 আর তুমি জ্ঞানবুদ্ধ অতিমানি হে মোর স্বদেশ,
 নবীনের পদতলে বসি লব নব উপদেশ ।
 বল তারে,—জ্ঞাতিয় না মান যদি, ঘোরে শিষ্যবৎ
 ডাক'য়ে'হে তব কাছে, পড়ে' তোল মোর ভবিষ্যৎ ।
 ত্রিপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ।

রুবুৎশ ।

দিলীপের পুত্রলাভ ।

রুবুৎশের প্রথম আট সর্গে বর্ণিত বৃত্তান্তগুলির মূল কোথাও, এই প্রায় বতই সকল পাঠকের মনে উদয় হয়। এ সম্বন্ধে কোন নোমাংসা রুবুৎশের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে পাওয়া যায় না। অথচ বিষয়টি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। সম্ভ্রুতি 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পদ্মপুরাণ—পাতালপত্র' পাঠ করিতে করিতে একটি উপাখ্যান দেখিতে পাইলাম, সেটির সহিত রুবুৎশের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত 'দিলীপের পুত্রলাভ' প্রসঙ্গের কতকটা মিল রহিয়াছে। পাঠকগণের, বিশেষত কলেজের ছাত্রবর্গের নিকট বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত না থাকাই সম্ভব, এই বিবেচনায় রচয়িতার প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম।

রুবুৎশবর্ণিত বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে ও মূলভাবে বলিতে গেলে এইরূপ বোঝায়:—একদা রাজা দিলীপ অক্লমস্বভাববশত ইজের কামধেহুর প্রতি সমুচিত সম্মান দেখান নাই। সেই অবমাননার কামধেহু রাজাকে শাপ দেন যে, তাঁহার দুহিতার সেবা না করিয়া রাজা অপতলাত করিবেন না। পরে রাজা অনপত্যতানিবন্ধন মনস্তাপে কুলশূন্য বশিষ্ঠের শরণাগত হইলেন। সুবিধার যোগ্যে শাপবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া রাজাকে স্বীয় আশ্রমে প্রতিপালিতা কামধেহুদুহিতা নন্দিনীকে ভক্তিসহকরে

সেবা করিতে বলিলেন। রাজাও নন্দিনীর সেবা করিয়া সেই গবীর নিকট অন্তঃপিত্ত বর পাইলেন ও বধাসনয়ে পুত্রলাভ করিলেন। গোচারণকালে একটি ঘটনা হইয়াছিল, সেটিও উল্লেখযোগ্য। একদিন এক প্রকাণ্ডকার সিংহ দেখুকে গ্রাস করিতে উদ্ভূত হয়, তখন ধর্ম্মশৈল রাজা আপনীর দেহবিনিময়ে দেহুর নিজের করিতে কৃত-সম্মত হন। কিন্তু বাস্তবিক সেটি বান্দাসিংহ রাজার ভক্তিপরাক্ষাৎ নন্দিনীকর্তৃক উদ্ধারিত হইয়াছিল।

স্বল্প ঘটনাগুলি ছাড়িয়া দিলে মূখ্য-বৃত্তান্তটি এই বোঝায় যে, দেহুর সমুচিত সম্মান না করিলে শ্রেয়োহানি ঘটে ও পুত্রলাভের দ্রষ্ট গোনেবা প্রশস্ত উপায়। পদ্মপুরাণের পাতালপত্রের অন্তর্দর্শ ও উনবিংশ অধ্যায়ের ত্রিপিপাত্ত বিষয়, গোসেবার অক্ষর পুণ্যলাভ হয় ও গোছাতির প্রতি অনাদর্শে প্রত্যহার ঘটে। এই প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রর রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মূল বৃত্তান্তটি এই:—স্বতন্ত্রর রাজা পুত্রলাভের দ্রষ্ট জাবালি-কবির উপদেশে গোসেবার ব্রতী হইয়াছিলেন এবং গবীর উচ্ছিন্ন ভূগলে স্থাপিলাগা প্রশমিত করিয়াছিলেন। একদিন রাজা বনশোভা-নিরীক্ষণে অক্লমনা হইয়া আছেন, এমন সময়ে এক সিংহ আসিয়া গবীকে আক্রমণ করিল। অবাবহিত পরবর্তী ঘটনাগুলির

সহিত কালিদাসবর্ণিত ঘটনাগুলির ঐক্য নাই। কিন্তু উপাখ্যানের শৈবভাগে আবার একইপ্রকারের বৃত্তান্ত রহিয়াছে। শুভস্কর রাজাও আবার যেহু ধেনু চরাইয়া তাহার নিকট লৈপিত পুত্রবর পাইলেন। তাহা হইলেই দেখা গেল, উত্তর স্থলেই স্বয়ির উপদেশে গোসেবার কথা রহিয়াছে। উত্তর স্থলেই গোসেবার প্রণালী, সিংহের আক্রমণ ও সেবাশ্রমী ধেনুর বরদান, অনেকটা একরকমের। পাঠকগণ রঘুবংশের স্রোতগুলির সহিত পৌরাণিক উপাখ্যানের সৌম্যদৃষ্ট অস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিবেন, এই আশায় উপাখ্যানটির প্রধান প্রধান অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

কৃতজ্ঞরোহিতঃ নৃপতিরনপতাঃ পুরাতনং ।
কলত্রাণি বহুততঃ ন পুত্রঃ প্রাপ তেহু বৈ । ১৭ ।
তবা জাবালিনামানঃ সুনিং সৈবাপ্রাপত্তম্ ।
নশ্বেচ্ছ কুলদৌধরুতঃ স পুত্রোৎপত্তিকামতম্ । ১৮ ।
যামিন্ বভ্যাস বে ত্রিহি পুত্রোৎপত্তিকরঃ কঃ ।
বৎ কৃষা জাজ্ঞতেইপতাঃ সম বংশধরঃ বহুতম্ । ১৯ ।

ইতি রাজো কঃ ক্রতা অথবা সুনিসত্তমঃ ।
হতোৎপত্তিকরঃ ব্যাক্যঃ প্রপতস্য হতর্ধিনঃ । ২১ ।
অপত্যঃপ্রাপ্তিকামস্য সত্যাপ্যাহস্রাঃ প্রভো ।
বিকোঃ কল্যানো সোমশপি শিবস্তাপ্যাপবা পুনঃ । ২২ ।
তদ্রাৎ কুর বৈ পূজাঃ ধেনোর্বেবজ্ঞন্যনুপ ।
বভাঃ পুচ্ছে যুৎসে নৃকে পৃষ্ঠং দেবোঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । ২৩ ।
স তুষ্টা হ্যভ্যতি কিংসং বাহ্নিতঃ ধর্মদঃপুতম্ ।
এবং বিধিষা সোমপূজাং বিধেহি তদ্রুতম্ । ২৪ ।

১৮শ অধ্যায় ।

তদ্রাৎ নৃপতিশ্চৈব সোমপূজাং বৈ নবাচর ।
স তুষ্টা হ্যভ্যতি কিংসং পুত্রাঃ ধর্মপরায়ণতম্ । ১৪ ।

জাবালিঃ কথতামাস য়েহুপূজাঃ যথাবিধি ।
প্রত্যহ্ন বিপিনঃ গম্ভেজারণার ত্রতী তু গোঃ । ১৭ ।
পবে ববাক্ত সন্তোজা সোমসহানু সমাহরণে ।
তৎকণ্ঠগা ববাক্তেহু পুত্রতামেন হুগতে । ১৮ ।
স্যা ববা শিবতে তোঃ তবা পেত্রাঃ জলং শুচি ।
সোচ্চহানে ববা তিষ্ঠেৎ তদা নীচাসনবিতঃ । ১৯ ।
নজানু নিবারয়েচিত্যঃ ধবসঃ বরমাহরণে ।
এবঃ প্রকৃষিতঃ পুত্রঃ দামাতঃ ধর্মতৎপরতম্ । ২০ ।
ইতি ব্যাক্যঃ সমাকর্ণ্য পুত্রকাম কৃতজ্ঞতম্ ।
ব্রতককার বর্ধামা য়েহুপূজাঃ নবাচরতম্ । ২১ ।
প্রত্যহ্ন কুরতে নাক বদাম্যোন তেহিভ্যঃ ।
বংশানু ন্যবারয়তৌনানু যবতক্ষ্যাত্তবরঃ । ২২ ।
এবঃ য়েহুঃ পুত্রগতো পতাত্ত বিবদা বনাঃ ।
বনযধ্যে তুণাধীশে চরতীযকুতোভয়তম্ । ২৩ ।
একবা নৃপতিশ্চ বনত ইন্দ্রীকং ।
ভ্রতমুদ্রিঃ স পরিতো বজ্রান হুতুতুহলী । ২৪ ।
তদাপত্যাহনক্যাং বৈ পকাসাঃ কাননাভয়ং ।
ক্রোশতীঃ বহবা যোনঃ স্বরাগেবৈ হুঃখিতাম্ । ২৫ ।
তদা নৃপঃ সমাপত্য কিলোকঃ নিম্নমাতরম্ ।
সিংহেন নিহত্যঃ পতন্ কুরোপাতীব বিজলঃ । ২৬ ।

পূর্ববৎ পালয়ন্ য়েহুঃ তপাস বিপিনঃ বহৎ ।
রামনাবঃ সুররিভ্যঃ সর্গভূতহিতে ষিতঃ । ২৭ ।
ভট্টৈঃ তুষ্টা তু ব্রহ্মভিঃ শ্রোবাচ পরিতোষিতা ।
রাজন্ বরঃ সন্তো বৈ বরঃ কংহঃ যনোরমতম্ । ২৮ ।
তদা শ্রোবাচ বৈ রাজা পুত্রং বেহি যনোরমতম্ ।
রানতকঃ পিতৃভুক্তঃ স্বর্গপ্রতিপালকম্ । ২৯ ।
তুষ্টা ববা বরঃ স্যপি ভট্টৈঃ রাজো ব্রতর্ধিনে ।
অনাম্যার্পনং দেবী কামযেহুঃ কৃপারতী । ৩০ ।

১৯শ অধ্যায় ।

রঘুবংশের আরও অনেক স্থলের সহিত
পদ্মপুরাণের কোন কোন স্রোকের
ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছি। তুষ্টাশব্দবর্ণন

রঘুবংশের আরম্ভে কালিদাসের বিনয়গর্ভ
শ্লোককয়েকটির সহিত পদ্মপুরাণের শাতাল-
খণ্ডের “আরম্ভে” বর্ণিত শেখনাসের উল্লিখিত
কয়েকটি শ্লোকের সৌন্দর্য্য দেখাইতেছি :-

রাবণীরকখাবাক্তী বগলো দ্যাবুণঃ কিম্বান্ ।
যত ব্রজাদয়ো দেবা মোহিত্য ন বিনস্তাপি । ১২ ।
তথাপি জোঃস্বা তুভ্যঃ বহুভ্যাঃ পৌরুস্কিতঃ ।
পক্ষিণঃ বহুস্তিমাঃ যে গজস্তি হবিতরে । ১৩ ।

* * * * *

রঘুবংশা সংকীর্ণির্ম্মখিঃ নির্ধনীনদাং ।
করিক্তহৃদিস্পর্কীং কনকঃ বসনঃ গণা । ১৪ ।
১ম অধ্যায় ।

রঘুবংশে দিলীপের পুত্রপাতবৃত্তান্ত
ও পদ্মপুরাণে ষড়ম্বরের বৃত্তান্ত শাশাশাপি
রাখিয়া উল্লিখিত করিতে গেলে দেখা যায়,
গৌরাগিক* বৃত্তান্তটি নিত্য কীচা
(Grude) ; পক্ষান্তরে, কালিদাসের
বর্ণনায় প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া
যায়। ইহা হইতে একরূপ অহুমান বোধ হয়
অসম্ভব হইবে না যে, মহাকবি এই গৌরা-
গিক বৃত্তান্ত হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া
নিজের শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ইংরাজি-
সাহিত্যে দেখিতে পাই, কবিপ্রেরিত শেক্সপীয়ার
উহার নাটকের গদ্যংশ অপরেক নিকট
প্রাণ করিয়াও, পৌরপ্রতিভাবলে আখ্যান-
বস্তুর পরিবর্তন করিয়া ও পাত্রগণের চরিত্র
নুতন করিয়া গড়িয়া, অসাধারণ মৌলিকতা
দেখাইয়াছেন। প্রতিভাশালী কবির কতিপয়ই
এইখানে। সেইজন্যই কবির বিল্টন্ বলিয়া-
ছেন ‘To borrow and to better it
in the process is no plagiarism.’

আমাদের এই অহুমান যদি সত্য হয়,

তবে কালিদাস প্রতিভার বলে উপাখ্যানটির
কিরূপ উৎকর্ষসাধন, কুরিয়াছেন, ইহা
একটা বেধিবার জিনিষ। প্রথমত বেধি-
তেছি, কালিদাস সমস্ত বৃত্তান্তটিকে rational-
lisc করিতেছেন, অর্থাৎ অশেষাক্রান্ত সম্ভব-
পর করিয়া তুলিতেছেন। অলৌকিক
ঘটনাকেও প্রাকৃতিক নিয়মের গভীর মধ্যে
আনিবার চেষ্টা শেক্সপীয়ার উহার ‘টেম্পেষ্ট’
প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতঘটনামূলক নাটকে
করিয়াছেন। কালিদাসের প্রাণালীও এতুলে
কতকটা সেইরূপ। গৌরাগ্রাহে জ্যেষ্ঠোদ্যানি
ও গৌরাগার পুত্রপাত হয়, এই গৌরাগিক
তথ্যটি সাধারণভাবে বলিলে যেন কেমন-
কেমন ওনার। সম্ভবত কালিদাসের কালিও
বাধীনচিহ্নার স্রোত বহিতে আরম্ভ
হইয়াছিল,—পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তগুলি শিক্ষিত-
লোকে অবিচারিতভাবে লইতে ইচ্ছাত
করিত। সেইজন্য কবি যেন-যেন দেখুত
কথা বলিতেছেন না,—ইন্দের কামধেনু
ও বশিষ্ঠপ্রতিপালিতা কামধেনুদ্বয়
নন্দিনীর কথা বলিতেছেন। দেবযোনি
দেহুর কোষে ও এসময়ে কি না হইতে
পারে ? কালিদাসের বর্ণিত ব্যাপারে বেশ
একটা স্পষ্ট কাম্যাকারণসম্বন্ধ দেখিতে
পাওয়া যায়। কামধেনুর অবমাননায় যখন
অনপত্যতা ঘটাইয়াছিল, তখন কামধেনু-
দ্বয়িতার সেবার যে সেই দৈবী বাধা দ্রষ্টব্য
হইয়া পুত্রপাত ঘটবে, ইহা বেশ স্পষ্ট
মনে হয়। ঋতুসময়ের উপাখ্যানে এই দৈবী
বাধার উল্লেখ নাই। অবমানিতা কামধেনুর
সাক্ষাৎভাবে এসময় না কুরাটা পাছে
অসঙ্গত হইবে, সেইজন্য কালিদাস বশিষ্ঠের

খুব দিয়া সে কথাটাও বলাইয়াছেন যে, ঐ উপায় এখন খুব উপযুক্ত। দিনাপের অস্তময়তার কারণটা যদিও হৃৎপিণ্ডের নহে বলিয়া বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না, কিন্তু সেখানেও একটু প্রস্থান করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ওরূপ অপরাধের ঐরূপ শাস্তিই ঠিক বুদ্ধিযুক্ত। এ ঠিক সেই নৃকৃত্যের প্রতি প্রজ্ঞাসার শাসনের দ্বারা logical। এইখানেই কালিদাসের কৃত্তিব ও কাব্যকৌশল। এতক্ষণে বুঝা গেল, শাপবৃত্তান্ত সংযোজনা করিয়া পরবর্তী বৃত্তান্তটিকে অনেকটা সম্ভবপর করিয়া তোলা হইয়াছে। ইহার উপর আবার বিশেষ যোগাযোগে শাপবৃত্তান্তজ্ঞান প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার সন্নিবেশিত করিয়া ঘটনাটিকে আরও জমটা করিয়া তোলা হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক সকল ব্যাপারেই যেন একটা অলৌকিকের প্রভাব আশ্রিত পড়িতেছে।

বৃত্তান্তের উপাখ্যানে দেখুর বরেই তাঁহার পুত্রলভি ঘটিল। কালিদাস এখানেও দুইটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া ব্যাপারটিকে সম্ভবপর করিয়া (rationalise করিয়া) তুলিয়াছেন। প্রথম, যদিও নলিনীর বরেই রাজার অভীষ্টসিদ্ধি হইল, তথাপি কবি একটা স্থলকারণের নির্দেশ করিয়াছেন। রাজা সেই স্থলজগা গবীর হৃৎপান করিতে আদিষ্ট হইলেন। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, বজ্রাচর্যের দ্বারা সেই ছুড়েই পুত্রবীজ নিহিত ছিল। দ্বিতীয়, স্থলজগার আদেশে রাজা ও রাজ্ঞী ইন্দ্রিয়দমনে বদ্ধভাষ্যভুক্ত হইয়া সংযম অভ্যাস করিলেন। এখানেও আমরা সিদ্ধান্ত করিতে

পারি যে, সেই পবিত্রভাবে সংযমলেনই পুণ্যম্বা রত্নের উৎপত্তি। 'সতীকো ধর্ম-মার্গে' এই শ্লোকের অর্থস্বারা 'কবি সতীক দিলীপকে তপোবনে আনিয়াছেন, ও স্থলজগর নির্দিষ্ট সংযম পালন করাইয়াছেন। বৃত্তান্তের উপাখ্যানে এ সকল কিছুই নাই।

পরে সিংহের আক্রমণব্যাপারেও কালিদাস একটু হৃৎপিণ্ড সংযোজনা করিয়াছেন। বৃত্তান্তের উপাখ্যানে দেখা যায় যে, 'বৃত্তান্তের রাজা বনশোভার আকৃষ্টচিত্ত হইয়া গবীকে ছাড়িয়া 'এমিক্-ওমিক্ বেড়াইতেছিলেন,— 'পরিতো বজ্রাম',—ইত্যবসরে সিংহ গবীকে আক্রমণ করিল। ইহাতে রাজার অপরাধ গুরুতর ঠেকে। অপর পক্ষে কালিদাস বলিতেছেন, রাজা দিলীপ স্তম্ভ কোপে বান ভাই, দেখুর কাছে থাকিয়াই কন্যারের লজ্জা পরিতের শোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই অনর্থ ঘটিল। এখানে রাজার অপরাধ খুব কম। তাহার উপরও আবার কালিদাস 'একটা' বৃত্তির অবতারণা করিয়া, রাজার অপরাধ আরও লঘু করিয়া দিতেছেন:—'সে হৃৎপিণ্ড মনসাপি হিংস্রঃ' ইহা ভাবিয়াই রাজা অস্তমিক দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পরে আবার যখন দেখিলাম যে, সেটা মার্সাসিংহ,—নলিনীর মারার পরিকল্পিত, তখন ত বেশই বুঝিলাম; রাজার কিছুই অবধানতা ঘটে নাই; রাজা বরাবর দেখুর উপর ব্রহ্মদৃষ্টি থাকিলেও এই অনর্থ ঘটিল। রাজাকে উদ্বিগ্ন করিবার জন্যই যে নলিনী দেবমারার পরতশোভা বাড়াইয়া তোলেন নাই, অথবা দেবমারার রাজাকে

উদ্ভাষিত করেন নাই, এ কথাই বা সাহস করিয়া-কে বলিতে পারে ? অন্তঃস্থ রাজ্য আত্মতার সিংহের বধের উল্লাস না করিয়া কুপকথের জাহ পলাইলেন ও কানিতে কানিতে জাবানির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন । পক্ষান্তরে, কালিদাসের বর্ণনার দিলীপের বীর্য, কদম্বচিত্ততা, কত্রিগোষ্ঠিত আর্ন্তজ্ঞানশীলতা, মহাত্ম্যভাবতা প্রভৃতি সঙ্গুণের সমাক্ষ পরিচয় পাই । অন্তঃস্থের জীব দিলীপ সত্যসত্যই গোবধ-জনিতপাপভাক্ত হইলেন না । এই প্রসঙ্গও আবার অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে মূলভূতাত্ত্বিক আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে ।

আরও হইল একটি দুটিনাতিতে কালিদাসের প্রতিভার পরিচয় পাই । অন্তঃস্থের উপাখ্যানে জাবানি-জনি বৈবাহিক আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে । এটা নির্ভীক অকোশলীর মত নির্দেশ । কালিদাস, দিলীপকে অপূজতার কারণ ও প্রতিবেশের উপায় জানিবার জন্য কুলঙ্কসম্মিথানে যাত্রা করাইয়াছেন । তিনি যে পুণ্যস্থানে ছিলেন, ইহা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার ইচ্ছায়ের অধাৰ্ণ প্রতিবিম্ব ছিল, এ কথাও কবি কোণে আশাশ্রিত করিয়াছেন । বর্ণ হইতে অবতরণকালে তাঁহার অন্তঃমনের যে মুকতিবিগহিত কারণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানেও তিনি ধর্ম-জ্ঞানের স্বপ্নবর্তী হইয়া এইরূপ অন্তঃমনের হইয়াছিলেন,—কোন নিরুপস্থিত প্রভুর ত্যাগের ফলে, ইহাই কবির অভিপ্রেত । দুইটি স্থানে তাঁহার অন্তঃমনের উল্লেখ দেখিয়া

মনে হয় যে, তাঁহার চিত্তের একান্তর ক্রিয়াক্রান্তি ছিল । এই দুটি-সংশোধনের অন্তর্গত কুলঙ্ক তাঁহাকে সম্মান অত্যাশ ও গোপন্য করিতে নিবৃত্ত করিলেন, একত্র ও অসম্মান করা যায় । গোমহন্ত-বধ-তক্ষণ একটু বীভৎস হয় বলিয়া, কালিদাস এতটুকু পরিবর্তন করিয়াছেন । পুণ্যস্থপুণ্যরূপে আলোচনা করিলে এইরূপ অনেক কাব্যকৌশলই ধরা পড়ে ।

পদে পদে পুরাণবর্ণিত অন্তঃস্থের উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের সর্গবর্ণনের তুলনা করিতে গিয়া কবির কাব্যকে বড় আংশিক ও গুণিত ভাবে দেখিতে হইয়াছে । একজন পর্য্যন্ত দেখিলান, মূলভূতটি কবি বীর অন্তঃস্বাভাব্য প্রতিভাবলে কেমন তাড়িত-চুরিয়া নৃতন করিয়া গড়িয়াছেন । এখন যদি সমস্ত বিবরণটি একত্র করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কালিদাসের কি অতুলনীর প্রতিভা ও রচনাকৌশল । দিলীপের ধর্মশীলতা ও পরাক্রম, তাঁহার স্থানাসন ও রাজ্যসমৃদ্ধি, অপূজ্যতাবশত চিত্তকোভ ও এই অনব্রহ্মপ্রবনের জন্য কুলঙ্কর উপবেশ লইতে মন্ত্রীক তপোবন-যাত্রা ; পথের শোভাবর্ণন, তপোবনের বাহ্যিক ও তপোবনবাসিগণের ক্রিয়াকলাপ-বর্ণন ; বাসন্ত ও অরুণভীক সহিত দিলীপ ও হৃদয়গার সলাপ, বাসন্তের কুল-পরিগ্রহ, রাজার সর্বেদ নিবেদন, বাসন্ত-কর্তৃক যোগবলে অপূজ্যতার কারণনির্দেশ ও তৎপ্রবন্ধের উপায়নির্দেশ ; নন্দিনীর তৎসমকালে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন, রাজা ও রাজ্যের ত্যাগের গোপন্য, রাজ্যের

গোচারণে যাত্রা ; কাননের শোভাবর্ণন, খেজুর চোটারি বর্ণন, সিংহের সহিত রাজার কথোপকথন, নন্দিনীর প্রসন্নতা ও বরদান ; রাজার তপোবনে প্রত্যাবর্তন ও নন্দিনীর নিবেশপালন ; ইত্যাদি পর-পর ঘটনা কালিধাস সুকোশলে ও সুদৌষ্টবে সাজাইয়া একখানি সুবিস্তৃত সম্বাদস্থল্যের চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহাতে দিলীপের দেবচরিত্র জীবন্তভাবে পরিচ্ছূট হইতেছে, এবং তপোবন ও গোচারণস্থলা, গোপপল্লী ও

বৈদ্যশিখর, পরাবনী বোম্বেধ ও শুদ্ধসংঘত অবিধম্পতি, এ সমস্তই তাহার পশ্চাতে ও পার্শ্বে স্পষ্ট মানসগোচর হইতেছে। সুক-
তরোক্ত বিধান ব্রাহ্মণ যেমন মৃতসিংহের
অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া মৃতদেহীকীর্তি
প্রভাবে সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়া-
ছিলেন, মহাকবি কালিদাসও সেইরূপ
অনন্তসামান্য প্রতিভাবলে শুকনোয়
পৌরাণিক উপাখ্যানটিকে সরস ও মনোজ
করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীমলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

দেশীয় মদ্য ।

এদেশে বহুপূর্বকাল হইতে মত্তপান প্রচলিত আছে। সমাজের যে সকল লোকই মত্তপান করিত, এমন নহে ; কিংবা মত্তপান যে দৃবীর বিবেচিত হইত না, তাহাও নহে। এখানে মত্তের বা মত্তপানের দোষজন্য বিচার্য্য নহে। মত্ত যে বিদেশ হইতে এসেছে আসে নাই, উহার সাধনক্রম যে বৈদ্য, তাহাই এখানে স্রবণ করা যাইতেছে। বস্তত যে দেশে মধুপর্ক ও মধু সবিশেষ প্রচলিত ছিল, সে দেশে মধুপানের এক অর্থ মত্ত হওয়া বিচিত্র ছিল না। যে দেশে জ্বাল ও বর্জুর রস একদিন রাখিয়া দিলে, সে রসের মাদকতা জন্মে, সে দেশে মত্তপানীয়া অক্লেশে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। যে দেশে মধুপুশ (মউলফুল) ও ইক্ষুরস

মূলভা ছিল, সে দেশে নানাবিধ মত্ত প্রস্তুত করা হুইত ছিল না। বৈদিককালের সোমরস পণনার মধ্যে না আনিয়া পুলতা বাহুল্যবিধ মত্তের উল্লেখ করিয়াছেন।* বখা, পানস—পানস বা কাঠাল হইতে, ড্রাক ড্রাক হইতে, মাধুচ—মধু হইতে, খাজুর—পাকা খেজুর হইতে, তাল—পাকা তাল হইতে, ঐকব—ইক্ষুরস হইতে, মাধ্বীক—মউলফুল হইতে, টাঙ্গ—কশিখ হইতে, মার্বীক—মৃষিক বা ড্রাক্ষাখিঞ্জুর হইতে, মৈরৈয়—ধাত্রীপুল-বাউ-ফুল—মোপে পর্করা হইতে, নারিকেলজ—নারিকেলের জল বা নারিকেলপাচের রস হইতে, মত্ত জাত হইত। এই একাধিকবিধ মত্ত ব্যতীত স্ত্রানামক মত্ত ছিল। মধু

* বলেন—

ଘୋଡ଼ା ମେଣ୍ଟି ଚାଲିବା ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗତିବିଧି ହୁଏ ।

ভক্ত হইতে গোড়ী, বততুলাদি হইতে পৈতী এবং মধুপুশ্প (মউল) হইতে মাধ্বী—এই জিবিধ মত্ত সুরানামে কথিত হইত। পুলাত্না সুর্যকে সুরুল মত্তের অধন বলিয়াছেন, এবং বহু সুরাপান কেবলু পুস্ত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ করেন নাই। বোধ হয়, মত্ত চ্যাবিত করিলে (চোরাইলে) সুরা ক অর্ক (আরক) হইত। চ্যাবিত মত্ত অচ্যাবিত মত্ত অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বলিয়া সুরার অধমত্ব হইয়াছিল, কিংবা শৌভিক সুরাভাবী ছিল বলিয়া সুরা বিজগণের অপেক্ষে হইয়াছিল। সুরা বলিলে পূর্বকালে পৈতী সুরা অধিক বুঝাইত। সুরা ৮ পৈতী মুখ্যোক্ত। মহা বলেন, সুরা অমের মল।

উপরে বারম্বার মন্তব্য-প্রধান উপ-
করণের উল্লেখ করা গিয়াছে। বস্তুত
প্রাচীনকালের কোন মন্ত কেবল একটি
উপকরণে প্রস্তুত হইত না। পানস মন্ত
করিতে পাকা আম, মাংস, হৃৎ, মিষ্টি
প্রভৃতি; আক্ষমন্ত করিতে বধি মধু; মাধুক-
মন্ত করিতে বিড়ক, সালেপ মিশ্রি, লবণাদি;
বাছুরমন্ত করিতে কাঁঠাল-আদা; ইত্যাদি
প্রযুক্ত হইত। বঙ্গদেশের মধ্যে বেহারে
এসং বেহারের মধ্যে গঙ্গাভোগ্য মন্তপান
অত্যন্ত প্রচলিত আছে। দেখানে ধনবান্
মন্তপানী আম, বেল, কাঁঠাল, হৃৎ, মাংস প্রভৃতি
উপকরণ দুইতালীসের নিকট পাঠাইয়া ইচ্ছামত
দুই প্রস্তুত করিয়া আনেন।

উল্লিখিত দ্বাদশবিধ মস্ত বাতীত অস্ত
বহুবিধ মস্তের কান পাওয়া যায়। সুপ্রতাপি
আধুর্যোগে মস্ত কয়েক প্রকার, মস্তের নাম
আছে। তন্মধ্যে দুই একটির নাম
করা বাইতেছে। শীঘ্র বিবিধ;—ইন্দুর পক-
রসে নিচ, পকরসশীঘ্র; এবং ইন্দুর আরসে
নিচ, শীতরসশীঘ্র। বাকুলী—পুনর্বা (পুণ্য)-
বৃক্ষ তাল বা খরু রস জাত। চলিত কথায়
ইহাকে তালী বা তাড়ী বলা যাইতে পারে।
অরিতে—পক ঔষধের অলবুদ্ধ মস্ত,
এবং আসব—অপক ঔষধের অলবুদ্ধ মস্ত,
আধুর্যোগেক মস্তবর্ণের অন্তর্গত। মস্তের
অবগতিবিশেষ বা সন্মাত-মস্তভাবেকে আদ্য
বলে :

বর্ণ, আশ্রয়, উৎপত্তি এবং শরীরের প্রতি ক্রিয়াভেদে মজ্জা নানাবিধ। কিন্তু একটি উপাদান দাবতীর মস্তে বর্তমান থাকে। তাহারই মানকতাত্ত্বে মস্তের মানকতা, এবং পরিমাপাংশসারে মস্তের তীক্ষ্ণতা বা মূঢ়তা হয়। আধুনিক ও প্রাচীন শব্দসাহস্রকার নিমিত্ত এই উপাদানকে কোহল বলা হাইবে। সূক্ষ্মত কোহল-নামক মস্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

যে দ্রব্যে শর্করা আছে, কিংবা বাহ্যিক শর্করার পরিবর্তিত ক্রিতে পান্না বায়, তাহা হইতেই কোহল পাওয়া বাইতে পারে। শর্করার কিয়দংশ কেহুলে, অপর কিয়দংশ কার্বন দ্ব্যক্সাইড নামক গ্যাসে পরিণত হয়। এনিমিত্ত শর্করার সহিত প্রচুর জল মিশ্রিত

* मधुककुला मधुसूतनेनः कृता मा वास्यौ ।—इति कथं ।

† বৎসর। *আবেদন* in J. A. S. B. for 1873, quoted in the Report of the Bengal Excise Commission, 1883-84.

† আসবে। মনোমোহনজীবনঃ মনোমোহনজীবনঃ মনোমোহনজীবনঃ ১৮৭৫।

করা আবশ্যক । শুক শর্করা কোহলে পরিণত হইতে পারে না । তাই আমরা চিনি ও মিষ্টি বাইতে পাই । শর্করাবন অত্যন্ত বন হইলেও কোহল জমিতে পারে না । তাই আম, বেল প্রভৃতি ফলের মোরকা করা বাইতে পারে । কিন্তু জলমিশ্রিত হইলেও শর্করা মত কোহলে পরিণত হইতে পারে না । জলমিশ্রিত শর্করার সহিত প্রথা-বিশেষ যোগ করা আবশ্যক । ইহাকে মস্ত-বীজ বলা যায় । মস্তর ভাষায় ইহার নাম কিং । যেমন দুগ্ধে দধিবীজ যোগ না করিলে দুগ্ধে দধিতে পরিণত হয় না, তেমনই মজল শর্করার কোহল-কিং না পড়িলে কোহল জন্মে না । গ্রীষ্মাষ্মায়ে তাল ও খর্জুর রস দুইতিন ঘণ্টার মধ্যে পরিণত হয় । সে রসে জল ও শর্করা থাকে ; খর্জুরবৃক্ষের পত্রা-দিতে এবং বায়ুতে কোহল-কিং দুলিষৎ বিস্তারিত আছে । কালক্রমে তাহা রসে গিয়া পড়িলে রসের শর্করার কিয়দংশ কোহলে এবং অপর কিয়দংশ কার্বন-বাক্স-সাইড্‌নামক গ্যাসে পরিণত হয় । ফলে রস হইতে উক্ত গ্যাসের বৃহৎ উঠিতে থাকে, এবং রসের নাদকতাক্তন আসে । সেই কিংয়ের যোগ নিবারিত হইলে মিষ্টরসে কোহল জন্মিতে পারে না । কোহল-কিং হস্ত উদ্ভিদবিশেষ । উহা এত হস্ত যে, অণুবীক্ষণের ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না । পুঞ্জীকৃত হইলে হস্ত বস্ত ও দৃষ্ট হয় । তাড়ী দুইচারিদিন রাখিয়া দিলে তলে শাদা কাদার মত বস্ত জন্মিতে দেখা যায় ।

তাহাই পুঞ্জীকৃত হস্ত উদ্ভিদরূপ কোহল-কিং । শুকাইলে তাহা শাদা দুলিষ মত হয় । তদবস্থায় তাহার ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে । সুপ্র খেতরসে অল্পলক্ষ্যক কিংরূপ উদ্ভিদ পণ্ডিত হয় । কিন্তু তাহারা প্রচুর খাদ্য পাইয়া একদিকে পুষ্টিলাভ ও বৃশ্ণবৃদ্ধি করিতে থাকে, অন্যদিকে রসের শর্করার কোহলিক বিকার উৎপন্ন হয় । তেমনই দধিবীজে দধায় কিং থাকে । দুগ্ধে একপ্রকার শর্করা থাকে । তৎকৃত দুগ্ধের দ্রব্য মিষ্ট স্বাদ আছে । দধায়-কিংয়ের জিরাবনত দুগ্ধশর্করার কিয়দংশ দধানে পরিণত হয় । এইরূপ, খাত্তমণ্ডাদিসম্বন্ধিত কাঞ্জিক বা আমানি ও তাড়ীর অল্পের কারণবশত বিশেষ বিশেষ কিং আছে । কিন্তু যাবতীয় কিংয়ের একটি লক্ষণ এই আছে যে, তাহাদের অভ্যন্তরেই উপযুক্ত ত্রব্যের বহুপরিমাণে বিকার-উৎপন্ন হইতে পারে । এইরূপ বিকারকে সন্ধান • (fermentation) বলা যায় ।

তবে, কোহল পাইতে হইলে শর্করা, জল এবং কোহল-কিং আবশ্যক । বায়ুর উষ্ণতা-বিশেষে কিং সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । উষ্ণতা তদপেক্ষা উনাধিক হইলে বৃদ্ধি মন্দ-মন্দ হয় । অধিক উষ্ণতার এই সকল-কিংবর্জ পুষ্টি, অন্ত্র উদ্ভিদের দ্বারা, অবসর বা দৃষ্ট হয় । শীতকালে খেতররস অল্প-সময়ে মাতিয়া উঠে না, গ্রীষ্মকালে অল্পসময়ের মধ্যে মাতিয়া উঠে, এবং পরে অল্প হইয়া পড়ে । এখানে প্রথমে কোহল-

• কেহ কেহ সন্ধান-শব্দে distillation বুঝিয়াছেন । কিন্তু তাবৎপ্রকারের সন্ধানবর্ণ যেখানে তাহাদের প্রথম প্রচারিত হইবে ।

কিছু-এক পয়ে গুচ্ছ-কিছু, এই দুই বিকার উৎপাদন করে ।

শর্করা এক প্রকার নহে, নানাপ্রকার আছে। যাবতীয় শর্করা সমভাবে কোহল-কিষাক্রান্ত হয় না। ইক্ষুশর্করা সহসা কোহলকিষাক্রান্ত হয় না। কিন্তু মধু-সহজেই হয়। ঐরাবালে মধুর সহিত মূল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে একদিনেই মধু-শর্করার কিয়দংশ কোহলে পরিণত হয়। এখানে অবশ্য বায়ুর ধূলিকণে বিচ্ছিন্ন কোহলজীব মধুতে পতিত হয়। মধুতে বিবিধ শর্করা থাকে। সত্ত্ব মধু রৌদ্রে রাখিলে মধুর কিয়দংশ দানা বাধে, কিয়দংশ বাধে না, অবশ্যেই থাকে। এই দুই অংশ বিবিধ শর্করা। যে শর্করা দানা বাধে, তাহা যেতসারকে (যেমন পাটো) বিকৃত করিলে পাওয়া যায়। এমত সে শর্করাকে যেতসার-শর্করা বলা যায়। মধুর যে শর্করা দানা বাধে না, তাহা অধিকাংশ মিষ্টকণের রসের মিষ্টতার কারণ। এমত এই শর্করাকে ফল শর্করা বলা যায়। মধুতে ইক্ষুশর্করা নাই। কিন্তু ইক্ষুশর্করাকে উক্ত বিবিধ শর্করার মধুবিশেষে পরিণত করিতে পারা যায়। ইক্ষুশর্করা মধুশর্করার পরিণত হইলে তাহা কোহলকিষাক্রান্ত হয়, এবং তখন কোহলের উৎপত্তি হয়। তবে, শুষ্ক হইতে কোহল পাইতে গেলে ইক্ষুশর্করাকে প্রথমে মধুশর্করায়, এবং পরে মধুশর্করাকে কোহলে পরিণত করিতে হয়। এখানে দুইটি ক্রিয়া হয়।

তাজীতে কোহলকিষা থাকে। মূল-মিশ্রিত মধুতে অত্যন্ত তড়ী বা কোহলকিষা যোগ করিলে মধুশর্করা দ্রুতরূপে কোহলে পরিণত হইতে থাকে। কোহলকিষা জলে কোহরা ছাঁকিলে সেই কিষের একপ্রকার নির্ঘাস পাওয়া যায়। সে নির্ঘাসে কিষ থাকে না। কিন্তু ইক্ষুশর্করার সহিত সে নির্ঘাস যোগ করিলে ইক্ষুশর্করা মধুশর্করায় পরিণত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অত্যন্ত নির্ঘাস বহুপরিমিত ইক্ষুশর্করাকে মধুশর্করায় পরিণত করিতে পারে। অর্থাৎ এই নির্ঘাসের ক্রিয়া কিঞ্চিৎ। কিন্তু, কিষ জীবিতপদার্থ, কঠিন ; এই নির্ঘাস জীবিত-পদার্থ নহে, ত্রুব জৈবপদার্থ ইংরাজিতে এমত কিষপদার্থসম্পন্ন পদার্থকে 'এনজাইম' (enzyme) বলে। রূপে জাত বলিয়া বাহুল্য ইহাকে রৈদ্র বলা যাইতে পারে। তবে, ইক্ষুগুড়ে কোহলকিষা পড়িলে কোহল-কিষজাত রৈদ্রবিশেষের ক্রিয়ার ইক্ষুশর্করা প্রথমে মধুশর্করায় পরিণত হয় ; ১ তখন কোহলকিষের ক্রিয়ার সে শর্করা কোহলে পরিণত হয়।

তজুল, ধব, গোধুমায়িতে যেতসারনামক পদার্থ আছে। আরাকট সেই পদার্থ। যেতসারকে শর্করাবিশেষে (যেতসার-শর্করায়) পরিণত করিতে পারা যায়। যেতসার ও শর্করার মূল উপাদান একই,— ক্যবন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। এই যে, যেতসার জলে দ্রব হয় না, শর্করা হয়।

১. অত্যন্ত হাইড্রোজেনিক কিংবা সলজেনিক অক্সের সহিত ইক্ষুশর্করাজল চুটাইলে মধুশর্করা হয়। এখানে এমত অক্সিজেন আণবিক নহে।

ততুল হইতে কোহল পাইতে হইলে ততুলকে প্রথমে শর্করার পরিণত করা আবশ্যিক। শর্করা হইলে তাহাকে কোহলে পরিণত করা সুসাধ্য। আমরা ততুলকে শর্করার নিত্য পরিণত করিয়া থাকি। আমরা চাউল বা ভাত খাই; তাহা পাকানোর দ্রবীভূত না হইলে, রক্তের সহিত মিশিতে পারিত না। তেমনই খাদ্য হইতে বহন অম্লের বহির্গত হয়, তখন তাহা মাটি, জল, বায়ু লইয়া নিজের খাদ্য গড়িতে পারে না। তখন তাহা খাদ্যে সঞ্চিত চাউল খাইয়া বাঁচিতে ও বাড়িতে থাকে। চাউল বা চাউলের খেতসারাদি পদার্থ রসে পরিণত না হইলে সে রস চারার সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে পারিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, চাউলের খেতসার দ্রবীভূত হইতে পারে। এইরূপে বনততুলাদির খেতসার হইতে যে শর্করা জন্মে, তাহাকে বনশর্করা বলা যায়। বনশর্করা মধুর ভ্রার সহজে কোহলকিয়াক্রান্ত হয়। অতএব যব, ততুল, গোধূম, বিলাতি আলু প্রভৃতি বাহাতে খেতসার আছে, তাহাকেই মত্তের উপকরণ করা যাইতে পারে।

অলে চাউল ভিজাইয়া রাবি, চাউল জ্বব হয় না। চাউল হুটুত অলে সিদ্ধ করি, চাউলের খেতসার অলের সহিত মিশিয়া ভাতের কেন হয়। কিন্তু অলে শর্করা যেমন জ্বব হয়, খেতসার তেমন জ্বব হয় না। কিন্তু ভাত খাই, তাহা মুখের লাল। এবং উদরের পাচকশর- (pancreas)-রস-যোগে ভাতের খেতসার শর্করাবিশেষে (বনশর্করার) পরিণত হয়। মুখের লাল

ও ক্রোমরসে রৈদবিশেষ থাকে। তাহা দেবই জিহবার খেতসার শর্করার পরিণত হয়। যেমন বহাবিধ কিং আছে, তেমনই বহাবিধ রৈব আছে। আমরা যে দাইল-মস্ত-মাংস খাই, তৎসমূহের অ্যামাশবৃত্তের রসস্থিত রৈব দ্বারা আঁর্ষ হয়। ভূর ও পেপের রসে ততুল্য রৈব আছে। তাহার জিহবার মাংস জ্বব হয়। যেমন কিং পৃথক করিতে পারা যায়, রৈব তেমন পৃথক করিতে পারা যায়; কিন্তু বিত্তত পাইবার উপায় অজ্ঞাপি অজ্ঞাত। তবে, তাড়ীর সহিত যেমন কোহলকিয় চলিয়া আসে, তেমনই পেপের রসের সহিত পেপের রৈব চলিয়া আসে।

এই সকল তবে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখন দেশীয়মত্তোৎপাদন বুঝা যাইক। আজকাল বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে শুড় হইতে, বিহারে এবং পূর্ব-বাঙ্গলার কোন কোন জেলায়) মউল হইতে, এবং ওড়িশার তিনটি জেলায় চাউল হইতে হুয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। কখন কখন মউলের সহিত অন্ন শুড় মিশান হইয়া থাকে। তবে, বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার—

দৌড়ী মাঝী চ গৈড়ী চ বিজয়া ত্রিবিধা হুয়া।

ইহাযের সহিত তাড়ী আনিলে,

দৌড়ী মাঝী তথা গৈড়ী বিধাঙ্গা কথিতা পরাঃ।

পাওয়া যাইতেছে। এই সকল মত্ত প্রাচীনকালে যে ক্রমে প্রস্তুত হইত, অজ্ঞাপি সেই ক্রমই চলিতেছে। কারণ গবর্মেন্ট উৎপন্ন হুয়ার উপর শুড় লইয়াই ক্ষান্ত হন, হুয়াভীষীর অবলম্বিত ক্রমে চণ্ডক্ষেপ করেন না।

পূর্ণে দেখা গিয়াছে, যন্ত্র ও দ্রব্য লভের অর্থ এক নহে। মনহেতু জবদ্রব্যমাজেই মত, কিন্তু মতমাজেই দ্রব্য নহে। গৌড়ী, মাধবী ও পৈতী দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য পাইতে চাঁদন বা শাতন আবশ্যক। দ্রব্য-লভের প্রাচীন অর্থ কিংব বিবৃত করিয়া চাণিত মতমাজের সামান্যনাম দ্রব্য দ্বারা বাইরে পাবে। চাঁদন বা চোগান অর্থে কোন জব্যকে তাপে বাষ্পীভূত এবং সেই বাষ্পকে শীতে ঘনীভূত করা বুঝায়। জল, কোহল ও বহুবিধ সক্রিয়ব্যকে তাপে বাষ্পীভূত এবং তাহাদের বাষ্পকে শীতে ঘনীভূত করিতে পারা যায়। কোহল বলে নিশে; কিন্তু জল অপেক্ষা কোহল অধিক উদ্বেগ অর্থাৎ সহজে বাষ্পীভূত হয়। বাবতীয় মস্ত্রে কোহলের সহিত জল ও স্নায়াক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে যে সকল পদার্থ উদ্বেগ, তৎসমুদয় তাপ পাইলে কোহল ও জলের সহিত বাষ্পাকারে চলিয়া আসে, অল্পদ্বেগ পদার্থ পড়িয়া থাকে।

সুরাপাতন নিমিত্ত যে দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহার সংস্কৃত নাম মগুরদ্রব্য। কেহ কেহ তাহাকে বকদ্রব্য বলেন। মগুর বা বকের আকারের সহিত সে দ্রব্যের সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। চলিত ভাষায় ইহার নাম অন্ধা। অন্ধা অন্ধশব্দের অপভ্রংশ। এই নাম হইবার কারণ এই যে, এই দ্রব্যের পাত্রেয় সুখ বন্ধ থাকে, অথচ ভিতরে বাষ্প উৎপন্ন ও ঘনীভূত হইতে থাকে। এই দ্রব্যের তিনটি অঙ্গ :—(১) একটি স্থানী (ভাটী), যাগাতে মস্ত রাখিয়া আগুনে উত্তপ্ত করা হয়; (২) একটি

স্থানী (ধরনী), যাগাতে বাষ্প ঘনীভূত এবং করিত হয়; ইহা শীতল বলে বাষ্প থাকে; (৩) একটি কি দুইটি নল ভাটীর ও ধরনীর মধ্যে যুক্ত থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাষ্পের নল ব্যবহৃত হয়। জল ও কোহলের বাষ্প ভাটী হইতে নলপথে ধরনীতে উপস্থিত হয়। সেখানে শীতে ঘনীভূত হইয়া দ্রব্য হয়। কোন কোন স্থানে গর্ভদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এই দ্রব্যে নল থাকে না। চুল্লীর উপরে তিনটি হাঁড়ি উপরে উপরে রাখিলে যেমন দেখায়, গর্ভদ্রব্য সেইরূপ দেখায়। প্রথম, নীচের হাঁড়িটি বড়; তাহাতে মস্ত থাকে। তৃতীয়, উপরের হাঁড়িটি ছোট; তাহাতে শীতল জল থাকে। দ্বিতীয়, মধ্যের হাঁড়িটির তলে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের পাশে ইটের টুকরা রাখিয়া তাহার উপরে একটি ছোট হাঁড়ি বা তাঁড় বসান হয়। এই তাঁড়টি সুরাধার। নীচের হাঁড়ি হইতে সুরাবাষ্প উঠিয়া দ্বিতীয় হাঁড়িতে প্রবেশ করে। তাহার সুখে স্থাপিত শীতল হাঁড়ির সংস্পর্শে সে বাষ্প জমিয়া সুরাধারে করিত হয়। এইরূপে মস্তের সমস্ত কোহল পৃথক্ হয় না। কিন্তু দ্রব্য প্রস্তুত করা সুস্বাদু। বঙ্গীয় স্থান-কমিশন্ মনে করিয়াছেন যে, শুণ্ডভাবে সুরাপাতন নিমিত্ত গর্ভদ্রব্য অধিক ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিকগণের গর্ভপাতনব্রত আবশ্যক হয়। নেপালীরা এইরূপ দ্রব্যে সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

কোহলের পরিমাণদ্বারা মস্ত তীক্ষ্ণ বা মৃদু হয়। যে মস্তে বস্ত অধিক কোহল থাকে, সে মস্ত তত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মানসজ্ঞা-শক্তিসম্পন্ন। এখানে হাড, দুইয়া, কুটো

প্রভৃতির মানকতা লক্ষ্য নহে। মস্তের মস্ত বলা ঘাইতে পারে। বিলাতি বিহঙ্গ-কোহলের পরিমানজ্ঞাপন লিখিত 'প্রমাণ-হুয়া' (proof spirit) নামক সংজ্ঞার ব্যাবহার আছে। ওরূপে ঘলের প্রায় সমান কোহল থাকিলে সেই-চল-মিশ্রিত-কোহলকে 'প্রমাণ-হুয়া' বলা যায়। বিলাতি ত্রাতি ও হইকি আর 'প্রমাণ-হুয়া'। প্রমাণ-হুয়া অপেক্ষা অধিক কোহল থাকিলে তীক্ষ্ণ হুয়া, এবং অল্প থাকিলে মৃদু হুয়া হয়। দেশীয় প্রচলিত হুয়ার কোনটাই প্রমাণ-হুয়া নহে; সকলেই ঘলের ভাগ অধিক থাকে।

এখন বেশী মস্ত বর্ণিত হইতেছে।

(১) তাড়ী। ইহার নিমিত্ত কোন আয়োজন আবশ্যক হয় না। খেজুর বা তাল রস হুইতিনঘটা রাখিয়া দিগেই তাড়ী হয়। অধিক সময় রাখিলে তাড়ী ময় হইয়া পড়ে। প্রথমে রসের শকরা কোহলে, এবং পরে কোহল শুকায় প্রভৃতি অরে পরিণত হয়। বায়ু ও পাচের পাতি প্রভৃতি হইতে কোহল-কিঞ্চ ও শুক্কিকিঞ্চ রসে পতিত হয়। তাড়ীতে কোহলের ভাগ অল্প থাকে। মত ভাগে হুইতিন ভাগের অধিক প্রমাণ-হুয়া আর পাওয়া যায় না। খেজুররস হইতে মস্ত হয় বলিয়া গুড়িয়ার ত্রাশ্বণেরা খেজুরগাছ পর্য্যন্ত লম্বা করেন না।

(২) পচাই। ইহাও পচা ভাতের

মস্ত বলা ঘাইতে পারে। বিলাতি বিহঙ্গ-নামক মস্ত পচাইর জুলা। কিন্তু ঐ হুই মস্ত প্রস্তুত করিবার অগাধী এক নহে। পচাই করিতে ভাতের সহিত 'বাকর' নামক উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া হাঁড়ির সুব বন্ধ করিয়া রাখা হয়। পাঁচছয়দিনে ভাত সন্ধিত বা অতিমৃত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। সেই রসের সহিত জল মিশাইয়া কিংবা সন্ধিত ভাতের সহিত পরমজল মিশাইয়া হুঁকিয়া লইলে পচাই হয়। 'বাণিয়া' নামক মস্ত ও পচাইয়াত। চলিত কথায় পচাই 'পাতি' মন নামে খ্যাত। সাঁওতাল, কোল এবং বাউরি-বাগদি, জোম-হাড়ি প্রভৃতি জাতিরা পচাই পান করিয়া থাকে।

হুয়া।—(৩) গোড়ী, কেবল গুড় হইতে উৎপন্ন। এ নিমিত্ত খেজুরগুড় আরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ আখের গুড় অপেক্ষা খেজুরে শুণ্ড। আঁড় অপেক্ষা মাত বা চিটে বা চোরা ভাল। কারণ মাতে মধুশর্করা এবং বাঁড়ে ইন্ধু-শর্করা অধিক থাকে। জল ও গুড় বড় বড় মটকাতে চালিয়া অল্প মস্তবীজ (পুরাতন মস্ত) যোগ করা হয়। মটকার গলা পর্য্যন্ত মাটীতে পোতা থাকে। একত্র মটকা সহসা ভাঙে না, মটকার জলও প্রায় সমান উচ্চতায় থাকে। গ্রীষ্মকালে চাষিপাঁচ-

* পচাই লোকের অভ্যাস। উপরের বর্ণনা ১৮৮০ সনের বেঙ্গল এক্সনাইন্স কমিশনের রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

+ সংস্কৃত গুড়মন্ডে বাহুল্য চিটে বা মাত বুঝায়। অতএব এই হুরাকে গোড়ী বলাই সমস্ত। বঙ্গদেশের গোড়মণ্ড কি গুড়ের চিত্র অসিদ্ধ ছিল? সংস্কৃত শর্করা হইতে ইংরাজি sugar, এবং পচা (বাংলা পাঁড়, গুড়িয়া বন্ধ) হইতে ইংরাজি candy-পদ হইতাত্বে।

দিনে, এবং শীতকালে সাতআটদিনে 'ফুটা' বা কোহলিক সন্ধান পেশ হয় । তখন সেই ফল চোরাইলে গোড়ী সূরা পাওয়া যায় । নির্জল ও শুষ্ক হইতে মণকরা প্রায় ৪০ গের তাঁড় প্রমাণসূরা পাইবার কথা । * কিন্তু ফিলাতেও মণকরা ৪০-৬০ গের তাঁড়ের অধিক পাওয়া যায় নাই । এসেশে 'সুড়' (শর্করা নহে) হইতে ১৬ হইতে ২০ গের তাঁড় প্রমাণসূরা পাওয়া যায় । স্বরূপ গুড়ের ফল ও ক্রিটের পরিমাণ সমান থাকে না । তন্ত্রিণ, সন্ধান ও চাষানের দোষে সূরা কম হয় । সূরা চোরাইয়া লইবার পর যে মন্ত অবশেষে থাকে, তাহাতে শর্করা ও কোহলের ভাগ থাকে । এমনকি তাগা কেলিয়া না দিয়া নুতন মন্ত প্রস্তুত করিবার সময় গুড়ের সহিত মন্তবীজবস্ত্রণ যোগ করা হইয়া থাকে ।

(২) মাধবী সূরা :—মউলফুল হইতে উৎপন্ন । অধাভারতের অরণ্য মউলের প্রধান জন্মস্থান । কাংড়া ও অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও ছোট-নাগপুর, গুজরাট ও বোম্বাই প্রভৃতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থানে মউলের গাছ আছে । কেবল কলিকাতা ও রাজ্য-অঞ্চলে নাই । চৈত্র বা মধুমাसे মধুকের ফুল হয় । গাছ হইতে ফুল পড়িতে থাকে, দরিদ্র গ্রীলোকেরা

তাহা কুড়াইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে । মউলফুলের ঘটাকার 'কিরীট' (corolla) ফুল ও মিষ্ট । কাচাফুল শুকাইলে ওজন প্রায় অর্ধেক শুকাইয়া যায় । সেই ফুলে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মধুশর্করা এবং প্রায় ১২ ভাগ মধুশর্করার পরিণামশীল পদার্থ থাকে ।† দরিদ্রলোকেরা মউলফুল চাঁউ-লের সহিত বাটিয়া পিটে করিয়া খায় । বস্ত্রত মউলের ফুল এসেশের বহু দরিদ্র-লোকের প্রাণধারণের উপায়বস্ত্রণ হইয়া আছে । মউলের ফল, বীজের শাঁস ও তৈল, এবং মউলের কাঠ, সকলই মূল্যবান ।

বেখানে মউলগাছ জন্মে, সেখানে ফুলের মণ প্রায় এক টাকা । যতই মূল্য হউক, তাহা গুড়ের মূল্য অপেক্ষা কম । সুতরাং মউল হইতে সূরা প্রস্তুত করার লাভ আছে । গাঁহাদিগের নিকট সূরা পরিচিত, তাহার কারণে, মউলের সূরা আটগির্শ হইবার তুল্য ।

জলে মউলফুল ভিজাইয়া রাখিলেই ফুলের শর্করা কোহলে পরিণত হইতে থাকে । তবে, বায়ুর অনিচিত কোহলকিণের আশা না করিয়া মন্তবীজ যোগ করিলে কিয়া নিশ্চিত হইয়া উঠে । অতএব গুড় হইতে মন্ত প্রস্তুত করা যেমন সহজ, মউল হইতেও তেমনই সহজ । কিন্তু সূরাপায়ীরা কেবল কোহল চায় না, বিশেষ গন্ধ ও স্বাদও চায় ।

* ইংরাজি gallon ৪০ গের তাঁড় ধরা সেল ।

† সকল মউলফুলে ফল এবং শর্করার ভাগ অবশ্য সমান থাকে না । কোন ফুলে ৩৩ ভাগ + ১২ ভাগ শর্করা, কোন ফুলে ৪২ + ১০ ভাগ পাইয়াছি । সে বাহ্য হউক, যে ফুলে এত মধু থাকে, তাহার নাম মধুপুল হওয়াতে ভালই হইয়াছে । বার্ষিক মধুতে শত ভাগে প্রায় ৭২ ভাগ মধুশর্করা থাকে । মধুমাसे লাভ বলিয়া মধুপুল, না মধু আছে বলিয়া মধুপুল নাম হইয়াছে ? মধু, মধু হইতে মধল, মধরা, মউল প্রভৃতি চলিত মূঢ়ের উৎপত্তি হইয়াছে । আন্তর্যের ফিল্ড, কোলরা মউলগাছকে মধুক; বাকি বলে । তেমনই তাহার গালাগাছকে মধুরস বলে । সংকত হইতে কোল না কোল হইতে সংকত শব্দের উৎপত্তি ?

এই গন্ধ ও স্বাদ ভ্রমারিতে সকল শৌণ্ডিক বন্ধ নহে। কেহ বা অধিক লীভের আশায় মস্তের ভ্রমের পরিমাণ কম করে, কেহ বা সুরার শেষ পর্যন্ত মত্ত চ্যাবিত করিতে থাকে। উভয় দলেই সুরার এক বোধ জন্মে। রসায়নবিজ্ঞান কোহল একটি নহে, বহুবিধ আছে। সুরাপাত্রী এক প্রকার কোহল চার, কিন্তু অধিকাংশ মূলতঃ সুরার কেবল সেই কোহলটি না থাকিয়া অল্পবিধ কোহল ও উদ্বেগ পদার্থ থাকে। এই সকল পদার্থ তৈলাকারে সুরার উপরে ভাসিতে থাকে। এই তৈল বিভাজ্য, উৎকটগন্ধ ও তীব্রবাহ। সুরার পের সুরার তৈল না থাকিলেই ভাল। মত্ত বত বন হয়, পাতিত সুরার তত তৈল থাকে। মত্ত বন করিলে চ্যাবনবার কম হয়। কিন্তু বন মত্তে কোহলের পরিমাণ কম হয়। ইহার দুই কারণ আছে। সর্করার ঘনজলে কোহলকিৎ বন্ধনে বাড়িতে পারে না, এবং কোহলের ভাগ কিছু অধিক হইলেও পারে না। এইরূপ কারণে সর্করার ঘনরূপে কিংবা সুরাতে জৈবপদার্থ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে শীঘ্র পচে না। সুরার চ্যাবনবার কমাইতে গিয়া শৌণ্ডিকের অল্পদিকে ক্ষতি হয়। সুরা-উৎপাদন ব্যবসায়ের বিষয়। ক্রেতার কুচি অনুসারে সুরাঞ্জীবি সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাহারি ঘোষ মাতাল হইতে চার, তাহার সুরাতৈল আকাজ্ঞা করে। আবার, প্রতারক সুরাবিক্রেতা সতৈল সুরার মূল মিশাইয়া ভাঁড় সুরা বানিয়া বিক্রয়ের পথ দেখে। বৈদ্য সুরাকরে একমগ্ন মউলফুল হইতে গড়ে ১২১৩সের ভাঁড় প্রমাণসুরা

উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু মগ্নকরা অর্ধেক সর্করা ধরিলে প্রায় ১০সের ভাঁড় পাইবার কথা। বিলাতে এইরূপ পাওয়া বিরাহে।

অধিকাংশ দেশের সুরাকরে কেবল গুড় কিংবা কেবল মউলের মত্ত না করিয়া এই দুই সুরা মিশাইয়া করা হইয়া থাকে। এইরূপে গোড়মধুরী সুরা পাওয়া যায়। বাস্তবিক কোহলিক সজ্জার নিমিত্ত বিভিন্ন সর্করা ও কটুভুক্ত (গাঢ়ভুক্ত) সর্করা ভাল। মউলের সপ্তমাংশ কি অষ্টমাংশ গুড় মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এইরূপে মত্ত শীঘ্র সঞ্চিত হয় এবং বোধ হয় সুরাপাত্রীর নিকট গুণেও ভিন্ন হয়। দেখা যায়, মউল ও গুড় হইতে মগ্নকরা প্রায় ১১১২সের ভাঁড় প্রমাণসুরা উৎপন্ন হয়। ১০সের মউল ও ১০সের গুড় হইতে ২০সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাওয়া কঠিন নহে। আরাজেলার মগ্নকরা ২৫সের পর্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, এদেশের অধিকাংশ শৌণ্ডিকেরা যথোচিত পরিমাণে সুরা নিকাশিত করিতে পারে না।

(৩) পৈদী সুরা।—চাউল, বব, গোখুম প্রভৃতির পিঠ হইতে এই সুরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ বলেন—

পালিষ্টকপিষ্টাদিকৃতঃ মদঃ হরা নৃতা।

বহুদেশে ইহা খেনোমদ নামে খ্যাত। খেনোমদের একটা চূর্ণক থাকে। 'খেনো' নাম হইলেও খান হইতে এই মত্ত হয় না। এদেশে আতপচাউল একগুণে পৈদীর উপকরণ। চাউলের সহিত দুই একটা খাত্ত মিশ্রিত থাকে বস্ত্রিয়া পৈদীর নাম খেনো হইয়াছে।

বিলাতেও ঘব, গোদুন, ততুল প্রভৃতি হইতে
সুয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সে দেশের
অবলম্বিত ক্রম এদেশের ক্রম হইতে সম্পূর্ণ-
রূপে ভিন্ন। বস্তুত সে দেশের ক্রম ধরিয়া
এদেশের পৈঠীর উৎপত্তি বুদ্ধিতে চেষ্টা করা
যুগা।

ওড়িশার নিম্নলিখিত ক্রমে পৈঠী সুয়া
প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে আতপুচাউল
উত্তমরূপে দুইয়া ফুটন্ত জলের উষ্ণ বাষ্পে
সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ চাউল শীতল হইলে
তাহার সহিত 'বাকর' নামক উদ্ভিজ্জপদার্থ-
বিশেষ উত্তমরূপে মিশান হয়। এই চাউল
একরাত্রি একটা কুঁড়িতে ঢাণা দিয়া রাখা
হয়। এই সময় চাউল গরম, হওয়া উঠে।
পরদিন উক্ত চাউল বড় বড় পিষ্টকের আকারে
মাটির উক্ত মেলের সারি-সারি করিয়া
সাজান হয়। সেখানে চাই একদিনের মধ্যে
চাউল আবার গরম হইয়া উঠে, তাহাতে এক
ঝাড়ীর ছত্রাক (ছাতা) ধরে, এবং পিষ্টক-
সকল ('কলাইচ') কুঁসিত কুঁসবর্ণ হয়।
এ সময়ে ছত্রাকের ব্যাপ্তিবশত চাউল
পিষ্টকের আকার ধারণ করে। তিনচারি-
দিন পরে পিষ্টকসকল তুলিয়া উপরি উপরি
তুপাকার করিয়া রাখা হয়। এইভাবে
চারিপাঁচদিন গেলে বড় বড় মটুকাতে
পিষ্টক ও জল নিক্ষেপ করা হয়। পরদিন
নূতন সিদ্ধ আতপচাউল পিষ্টকের সমপরি-
মাণে সেই মটুকার ফেলা হয়। পুরাতন
সন্ধিত বড় কিংবা মধ্যবীজ বোগ করা হয় না।
চাই একদিনের মধ্যে জল ফুটিতে আরম্ভ
করে। ত্রীশকালে ৭৮ দিনের মধ্যে সমুদয়
চাউল গলিয়া জলের মত হয় এবং, ফুটা

বন্ধ হয়। শীতকালে ২৪ দিন অধিক
লাগে। এখন সেই মত, চোরাইয়া লইলে
সুয়া পাওয়া যায়। একমণ চাউল হইতে
প্রায় ২০-সের তাঁড়প্রমাণসুয়া উৎপন্ন হয়।

বিলাতে, বকে জল আর্দ্র রাখিয়া
তাহার অক্লেশোৎপাদন করা হয়। সেই বকে
ক্রৈমবিশেষ আছে। তখন তাহাকে
উত্তপ্ত ও শুষ্ক করিলে সেই ক্রৈমের ক্রিয়া
বন্ধ হয়। তদনন্তর সেই ঘব কিংবা সেই
ঘবের সহিত অল্প ঘব বা ততুলচূর্ণ মিশ্রিত
করিয়া জলে ফেলা হয়। এখানে বব-
শর্করাক্রৈমের ক্রিয়াবশত বব ও ততুলের
ষেতলার ববশর্করার পরিণত হয়। তার পর
সেই জলে কোহলকিধ বোগ করিলে শর্করা
কোহলে পরিণত হয়।

এদেশের পৈঠী সুয়ার উৎপাদনে 'বাকর'
এবং পিষ্টকে আত ছত্রাক চাউলের যেত-
লারকে ববশর্করার এবং ববশর্করাকে
কোহলে পরিণত করে। বোদ হয়, 'বাকর'
শব্দ বাকল বা বড়ল শব্দের অপভ্রংশ।
নানাজাতীয় গাছের বাকল ও শিকড় রোড়ে
তকাইয়া ও পরে ওঁড়া করিয়া আতপ-
চাউলের ওঁড়ার সহিত মিশান হয়।
তাহাতে পরমজল মাখাইয়া সমুদয় চূর্ণে
ছোট ছোট পিণ্ড পাকান হয়। এই সকল
পিণ্ড একদিন খড়ের মধ্যে রাখা হয়।
তখন পিণ্ডসকল গরম হইয়া উঠে। পরদিন
তৎসমুদয় রোড়ে তকান হয়। এই সকল
পিণ্ড 'বাকর' নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।
বন্ধদেশে বাগদি ও ওঁড়িয়া বাকর প্রস্তুত
করে, ওড়িশার করদরাজ্যের পার্বত্য-
লোকেরা করে। বন্ধদেশের বাকর শাদা,

ওড়িশার বাকর কালো। ওনা ঘাট, শতাধিক লাতীর গাছ হইতে বাকর করা হইয়া থাকে। সে সকল গাছ কি, তাহা বাকর-বিক্রেতার। বলিতে চাহ না। সে বাহা হউক, চাউল হইতে-মত্ত করিতে হইলেই বাকর বোগ করা হইয়া থাকে। পচাই ও হাণ্ডিয়া করিতে লাগে, চাউলের স্রা করিতে লাগে। বন্ধেশের কোন কোন স্থানে শুড়ের সহিত চিঁড়া কিংবা চাউল বোম করা হইয়া থাকে। সেখানেও বাকর লাগে।

বিমূল্যাহেব পচাই করিবার বাকরের কতকগুলি গাছগাছড়ার নাম সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। * তন্মধ্যে দেখা যায়, কতকগুলি গাছ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়; যথা—কণ্টকারি, পোস্তুর, অনন্তমূল, শতমূল ইত্যাদি। কতকগুলি কষায়; যথা—হরীতকী, কেশু, গমার, শোণা, সোমাল ইত্যাদি। কতকগুলি তিক্ত-দ্রব্য; যথা—ফেতগাপড়া, নিম, বাসক, কুরচি, কালমেধ ইত্যাদি। কতকগুলি ঘোর বিষ; যথা—চিটা, গুহুরাবীজ, কুচিলাবীজ, সিদ্ধি ইত্যাদি। এই সকল গাছের গুণ দ্রবণ করিলে মনে হয়, অনেকগুলি উদ্বেগসাধনের নিমিত্ত বাকরের প্রয়োজন হইরাছে। (১) ভাতের সন্ধান উৎপাদন। সকলেই জানেন, গাছ-পালায় ছাল ও শিকড় ভেঁড়া করিয়া স্রালে তিক্কাইয়া রাখিলে তাহাদের সন্ধানজ বিকার শীঘ্র আরম্ভ হয়। কি কারণে হয়, তাহা এখানে বলিবার স্থান নাই। যে কারণেই হউক, ভাত রাখিলে তাহার বিকার অন্তিতে কালবিলম্ব হয়। (২) মত্তের গুণবৃদ্ধি। ঔষধ বোম করিবার উদ্দেশ্য এই। আয়ু-

র্ষেদোক্ত মত্তে এইরূপ ঔষধ বোগ করা হইয়া থাকে। (৩) পুষ্টিনিবারণ। তিক্তদ্রব্য দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা। বিলাতি বিষ-নামক মত্তে তিক্ত ‘হপু’নামক উদ্ভিদ বোগ করার উদ্দেশ্য এই। (৪) মান-কতাবৃদ্ধি। ধূতুরা, কুচিলা প্রভৃতি বোগ করিবার অল্প উদ্দেশ্য নাই।

বাকরের এই সকল উপকরণ দেখিলে মনে হয়, পচাই মত্ত করিবার সময় ট্রাহাদের প্রয়োজন অশুভূত হইরাছিল। পচাই চোমান হয় না, কারণেই তাহা শীঘ্র পচিয়া দুগ্ধ হই-বার সম্ভাবনা থাকে। স্রার সে আশঙ্কা কম। দ্বিতীয় পচাইর তীক্ষ্ণতা বা মানকতা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রাণ্ডাবিক মনে করা বাইতে পারে। কারণ স্রাতে যত কোহল থাকিতে পারে, ‘পচাই’য়ে তত পারে না। কিন্তু ধূতুরা-কুচিলা বোগ করিয়া স্রার মানকতাবৃদ্ধির চেষ্টা ছরাশ। কারণ মানকদ্রব্য উদ্বেগ না হইলে স্রাতে গিরা পড়িতে পারে না। বস্তত মত্তে ধূতুরা-কুচিলা মিশাইয়া চোমান হইরাছিল। গবর্মেন্টের স্থাপায়নিক পরীক্ষক ওয়ার্ডেন্সাহেব সে স্রার তাহাদের অংশ পান নাই। মত্তে বোয়ান, বৌরী, মেথী, দ্বাকচিনি, চন্দন, এলাচ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য বোগ করিয়া মত্ত এবং স্রা সুগন্ধ করা হইয়া থাকে। ইহাদের সার উদ্বেগ। কিন্তু বাকরের অনেকগুলি উপকরণ আদৌ উদ্বেগে নহে।

স্রার বাকরের উপকরণ জানা নাই। কিন্তু বোগ করি, ইহার উপকরণ এত অধিক সংখ্যক নহে। বস্তদূর বুদ্ধিতে পারা গিরাছে,

* Vide appendix to the report of the excise commission 1883—84. Vol I.

ভাষাতে বোধ হয় যে, উপকরণের মধ্যে কবায় এবং তিক্ত ভ্রূষা থাকিলেই চলে। যেমন এক বিশল্যাকরণী খুঁজিতে গিয়া গন্ধ-মায়নপর্ণ্ড আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, দেশালের অনেক উপকরণে গন্ধমাদনের বহু উদ্ভিদ অনর্থক আসিয়া পড়িয়াছিল। এ কথা আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে। তবে প্রশংসার কথা এই যে, নিরর্থক উপকরণ থাকিলেও কলে আর সমান ঝাঁড়ায়। যে ক্রমে পৈঠী হুয়া প্রকৃত করা হইল থাকে, তাহার প্রত্যেক অণুক্রম আবশ্যক, সুতরাং বিজ্ঞান-সম্মত। এখানে সে বিজ্ঞানে প্রবেশ করিবার স্থান নাই, অধিকতর সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির প্রবল আশঙ্কা আছে। কলে কি ঝাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখাইয়াই নিয়ন্ত হইতেছি। শতভাগ চাউলে ৭৮ভাগ খেতসার আছে। বিজ্ঞানের হিসাবে শতভাগ খেতসার হইতে ৩৫ কি ৩৬ভাগ কোহলের অধিক আশা করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ৩২ ভাগকেই সীমা মনে করেন। তদনুসারে একমণ চাউল হইতে ২৫সের ভাঁড় প্রমাণ হুয়া পাওয়া যাইতে পারে। কটকে একমণ চাউল হইতে ২২½সের প্রমাণ হুয়া পাওয়া গিয়াছে। যত্নের সমস্ত কোহল চোরাইয়া লওয়া হয় না। আরই ১৪½সের ভাঁড় প্রমাণ হুয়া ফেলা যায়। অতএব দেশীয় পৈঠী হুয়ার উৎপাদনের ক্রম নির্দোষ বলা যাইতে পারে।

নির্দোষ না হইলেই আন্দার্যের বিবরণ হইত। কারণ যে ব্যবসায় বহুকাল ধাবং

চলিয়া আসিতেছে, তাহার দোষ দিয়া উন্নতি না হইয়া পাবে না। তবে, সকল স্থলেই সে সম্ভাব্য উন্নতি লাভ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নহে। তথাপি দুগুণ বলা যাইতে পারে যে, এ দেশে বেশকণ পণ্যভ্রূষা বহুকাল হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্বের উৎপাদনে অধিক সুবিধা দেখাইতে পারে না। ঘরে বসিয়া অব্যবসায়ী হইয়া দেশীয় কলার ছুট সমালোচনা করিতে অবস্র পারা যায়। কিন্তু দেশকাল পাশ্চ, উপকরণ-আয়োজন-বিক্রয় প্রভৃতি চিন্তা করিলে উন্নতিমার্গ প্রদর্শন নিতান্ত দুষ্কর।

হুয়া যে কেবল পানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, এমন নহে। বানিশ ও গন্ধ-বুজিতে, ঔষধকরণে, রসায়নবিজ্ঞা প্রভৃতিতে কোহল অত্যন্ত আবশ্যক। ত্রিবিধ হুয়ার উপকরণ ও কোহলপরিমাণ দেখিলে মাফী হুয়ার উৎপাদনবার অন্ন। একমণ মটুল ও একমণ চাউলের মূল্য কখন সমান হইবে না। অগচ উভয় উপকরণ হইতে প্রায় সমান-পরিমাণে কোহল উৎপন্ন হয়। খাত অপেক্ষা বহু মহার্য এবং চাউলে বহু খেতসার আছে, যবে তদপেক্ষা কম আছে। একত্র বিলাতে হুয়ার নিমিত্ত চাউনের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপত্তিতে বিলাতি হইকি আনাদের পৈঠীর তুল্য। এদেশে পৈঠীর অভাব নাই, তথাপি দেশীয় ধনবান হুয়াপায়ীর নিমিত্ত বিত্তর বিলাতি হইকি এদেশে আসিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, হুয়াব্যবসারেও শিক্ষিত উদ্দেশ্যী পুরুষ আবশ্যক হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ।

* এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতক একসাইন্স জেলুটি কলেজের ইংলিশ স্কুলের নিজ এবং সেণ্ট্রাল জিউ-নারির প্রিন্সিপালদের দ্বারা সমন্বয় মনে করিয়া লেখা করিয়াছেন।

সফলতার সঙ্গী।

তারতর্বে পাঠশালা। প্রভুতিতে দেশীভাব্য
বে শিক্ষা চলিতেছে, তাহার সংস্কারলাভের
কল্প গবর্নেন্ট বিশেষ উদ্যোগী হইয়া উঠিয়া-
ছেন। সহরে এবং ভদ্রপল্লীতে প্রাথমিক
শিক্ষার ব্বেষণ ব্যবস্থা আছে, কৃষিপল্লী-
গুলিতে ঠিক পেরুণ ব্যবস্থা অল্পপুল্ল
বদিয়া স্থির হইয়াছে। এই সকল স্থানের
প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন
করিয়া পাঠ্যবিষয় সরল করিবার প্রস্তাব
বিচার করিবার অল্প গবর্নেন্ট একটি কমিটি
বসাইয়াছিলেন। পাচজন এই কমিটির
সদস্য;—উঁহারা পাচজনই গবর্নেন্টকর্ম-
চারী; তাহার মধ্যে চারিজন ইংরেজ;
যে একজনমাত্র বাঙালী ছিলেন, তিনি
অনয়েব্ল কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ তারিখে ভারত-
শিক্ষানীতিসম্বন্ধে গবর্নেন্টের যে মন্তব্য
বাহির হইয়াছে, কমিটি তাহারই একটি
অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম
এই—বিশেষভাবে চাহবাসের উপদেশ
দেওয়াই যে গ্রাম্যস্কুলের লক্ষ্যহওয়া উচিত,
তাহা নহে; পরন্তু সেখানে ছাত্রদের এমন-
ভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে
হইবে, যাহাতে তাহারা বৃত্তিমান চাষী এবং
বীক্ষণপর, মননশীল ও পরীক্ষাপটু ("observer,
thinker and experimenter")
হইতে পারে, তা সে যতই সম্ভবভাবে
হউক না কেন। সেই সঙ্গে, যে অধিদায়কে

খাদনা দেয় ও যে মহাজনের সঙ্গে শস্তের
কারবার করে, তাহাদের হাত হইতে বাহ্যতে
আত্মরক্ষা করিতে পারে, একপভাবে তাহা-
দিগকে প্রেরিত করিতে হইবে। তাহাদের
পাঠ্যপুস্তকগুলি অপরিচিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ
রীতিতে না হইয়া শাশাভাব্য লিখিত
হওয়া উচিত এবং তাহার বিষয়ক প্রতি
জীবনযাত্রাংক্রান্ত হওয়া চাই। এই সকল
স্কুলে ব্যাকরণের প্রথম পরিচয় দাও ও শুদ্ধকরী
মতে অক্ষশিক্ষা চলিবে। ছাত্রগণ গ্রামের
মাথা ভাগ করিয়া বৃত্তিবে এবং হিলা-
নিকশের কামন্দ বৃত্তিবার উপযুক্ত এমন
কেজোরকমের শিক্ষা লাভ করিবে,
যাহাতে পাঠশালাভাগের পূর্বে গ্রাম্য-
হিসাবের সমস্ত মারপাটসম্বন্ধে ওস্তাদ হইয়া
বাহির হইতে পারে এবং তলবের খাজনায়
অল্প বৃত্তিতে তাহাদের ধোঁকা না লাগে।
চাষীদের অল্প সরল, উপযুক্ত এবং কার্যকর
ধরণের স্কুল স্থাপন এবং গ্রাম্যদের মধ্যে
এইরূপ স্কুলের আদর জন্মানো ভারত-সরকার
একটি সর্বপ্রধান ব্যাপারের মধ্যে গণ্য
করেন।—

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে
যে, গবর্নেন্টের উক্ত সাধু মন্তব্যের মধ্যে
আমাদের পক্ষে অল্পর আশঙ্কার কারণ
কিছু প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা
করা যায় না।

পুণ্ডারিকের চারিজন ইংরেজ ও তাঁহাদের

পঞ্চাতে একজন বাঙালী মিলিয়া ভারত-সরকারের এই মন্তব্য হইতে দুটি সংকল্প-সার মর্ম উদ্ধার করিলেন। তাঁহার্য বলিলেন, গবর্নমেন্টের এই সকল বাকা আলোচনা করিয়া কমিটি দেখিতেছেন যে, বর্তমানে বাংলায় গ্রামাঞ্চলগুলি প্রধানত দুই বিষয়ে দোষাক্রম : ১। শিক্ষার প্রবাহ অতিবিকৃত দীর্ঘ, অতিরিক্ত অগ্রীমাদী, এবং অতিরিক্ত বিচ্ছিন্ন; ২। পাঠ্যগ্রন্থগুলি জনসাধারণের ব্যবহৃত সরলভাষার লিখিত নহে।

এ দুটি-কথাও অত্যন্ত নিম্নোহ। সে দোষ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রতিকারও অত্যন্ত সোজা। আর কিছু নয়, চাষীকে দৌরভগতের বিষয়না মুখস্থ করাইয়া তাহার গ্রামের কুসৃত্ত, জানাইয়া দাও এবং ভ্রমপন্নীতে যেখানে সাধুভাষা তাহার “স্থানীয় সমীচণ”-এর স্ব-প্রব-বিচার লইয়া ভ্রমসন্ধানকে স্বাধীন করিতেছে, কৃষিপন্নীতে সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস গোলাইলেই ব্যাকরণের দ্রঃসহ তাপ নিবারণ হইতে পারিবে। পাঠ্যপুস্তক ত আজকাল সরকারী কারখানাতেই তৈরি হইতেছে, কলের চাপে রসকল সব বাহির হইয়া গেছে, এখন বড় কথা ভাঙিয়া ছোট কথা করাই বা শক্ত কিসের!

অতএব এ পর্য্যন্ত আমরা ভারত-সরকারের মন্তব্য এবং কমিটি-পকারতের টিপনী দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে পড়িয়া বহিতে-ছিলাম। মনে করিতেছিলাম, যে সকল খণ্ডবিলের মধ্যে বিস্তার তাহার চলিবার পথ নাই, সে সকল আয়গাতেও বিস্তার ডিক্টি-ডোতা গোলাইবার এই যে ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা বিভোৎসাহী রাজসরকারের উপযুক্ত বটু।

তাঁহার পরে এট সচিবিত গ্রামা প্রাইমারী স্কুলের চারি প্রেণীতে কি কি বিষয় পড়ানো হইবে, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলেই খুসি হইয়াছেন।

তাঁহার পরে দশম প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন—বাংলা নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ নানা-ধিক সংস্কৃতায়িত (sanskritized) ভাষার লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমন সকল পবিভাষা থাকে, যাহা পল্লিবাদীরা বোঝে না। অতএব এই সকল স্কুলের উপযুক্ত অদর্শপাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করিবার জন্য কয়েকটি বিচক্ষণ কর্মচারী লইয়া একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হউক। বইগুলি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হইবে, তাহার পরে সরকার মঞ্জুর করিলে কমিশনার সাহেব ও স্কুল-ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বইগুলিকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষার (local vernaculars) তর্জমা করিবার জন্য লোক নির্বাচন করিবেন। ডিরেক্টর যে সকল বিচক্ষণের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন বোধ করিবেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া তর্জমাগুলি মঞ্জুর করিয়া দিবেন।

এই দশম প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া মনে মনে একটু হাসিয়াছিলাম। চাষীদের জন্য সহজ বইটি তৈরি করিতে হইবে, কিন্তু প্রণালীটি একবারেই সহজ নয়। ইংরেজিতে বই লিখিয়া * সেটাকে ভাষার তর্জমা করিলে জিনিষটা যে কিরকম সরল ও স্বাভাবিক হইবে, তাহা বুঝা শক্ত নয়। হইতে পারে, স্কুলের ইন্সপেক্টরগণ একত্র

হইলে, বিশেষতঃ কমিশনারসাহেবের মত অনুযায়ী লোক যদি যেনো যোগ্য করেন, তবে এই কঠিন কাজের জন্য ক্ষমতাপালী লোককে যথেষ্টপরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে, তাহার উপর আবার এই সংকল সুযোগ্য লোকের রচনা পরীক্ষা করিবার জন্য আর কেহ নহ, বরং ডিরেক্টরসাহেব যখন নিজের বিবেচনামত খাটাইয়া যোগ্যতার যাচনাদ্বারা নিবৃত্ত করিতে প্রস্তুত, তখন যুৎ থাকিবার কোনো সম্ভাবনা না থাকাই সম্ভব ; কিন্তু তবু বিজ্ঞাপনা করি, এত কেন ?

যেখানে : সুগমতার জন্য সরকারবাহাদুর এত কাতর, সেখানে আদর্শ নৈপুণ্য-সহকারে এমন দুর্গমপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে বসে কেন ? না হয়, বইগুলি একেবারেই ভাষার লেখা হইত ! দেশী ভাষার জন্য সরকারবাহাদুরের মন্ত্রির জন্য ইংরেজিতে লেখা চাই ! এতবড় অক্ষমতার জন্য যদি সরকারের লক্ষ্য না হয়, তবে এতবড় অধিকারের জন্য তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ অনেরবল্ কে, জি, গুপ্ত মহাপণ্ডের মতও কি আর চারজনমাত্র বিদ্বান-যোগ্য বাঙালী এই হতভাগা বাংলাদেশে জুটিত না—হায়, এদেশে সরকারবাহাদুরের সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইবার কি কোনো সহজ উপায়ই নাই ?

পুরোঁই বলিয়াছি, এই দশম প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া মনে মনে কৌতুক অহুস্তব করিয়া-ছিলাম—তাহার প্রধান কারণ, মন তখনো নিশ্চিত ছিল। এই প্যারাগ্রাফটিতে, পাঠ্য-গ্রন্থগুলি “local vernacular”এ তর্জমা করিবার প্রস্তাব ছিল। কথাটি ভীতিজনক

মনে হয় নাই মনে করিয়াছিলাম, বাংলার “local vernacular” বাংলা, বেঙ্গালের বেহারী, উড়িয়ার উড়িয়া।

অবশেষে একাদশ প্যারাগ্রাফে উত্তীর্ণ হওয়া গেল। প্যারাগ্রাফটি অত্যন্ত ছোট—সমস্ত রোজোলুশনের মধ্যে ইহার প্রাপেক্ষা ছোট প্যারাগ্রাফ আর নাই। কিন্তু লক্ষ্যে মারাত্মক জিনিষের যে খুব বড় হইবার প্রয়োজন আছে, তাহা নহে—ভীরের কাটিটা যত বড়ই হোক, তাহার কলটি ছোট হইলেও জ্বলিবার পক্ষে যথেষ্ট।

এই ক্ষুদ্র একাদশ প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন :— ইংরেজি আদর্শপাঠ্যপুস্তক-গুলি যথেষ্টপরিমাণ স্থানীয় প্রচলিতভাষার তর্জমা হওয়াটাকে কমিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। বধ্য, তাহাদের বিবেচনার বেধারে অন্তত তিন উপভাষার তর্জমা হওয়া চাই, জিহতি, ভোলপুরি এবং মৈথিলি ; এবং বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে উত্তর, পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ভাষার তর্জমা হওয়া উচিত হইবে।

এ সম্বন্ধে আর কোনো উক্তবাচ্য নাই ;—এই প্যারাগ্রাফটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া পক্ষান্তে কোনো চিন্তা না রাখিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে অতর্কিত করিল। ইহার পরে আর কথাই অবতারণা করা হইয়াছে।

বাহাই হউক, দেখা গেল, চারিজন ইংরেজ এবং তাহাদের অল্পগত একজন বাঙালি বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তিপত্তনে ভাবাবিক্ষেপ ঘটানোটাকে “matter of great importance” গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।

প্রয়োজনীয়তার বিচার ভিন্নপক্ষ হইতে ভিন্নরকম আকার ধারণ করে। যে ব্যক্তি কোন রাঁধিয়া মাছ খাইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে মাছটাকে ঠারপাঁচটুকরা করিয়া কাঁড়িয়া ফেলা matter of great importance—কিন্তু বাছের পক্ষে কোনো-মতে আগাগোড়া ল্যাঙ্গামুড়া আঁত রাখিয়া চলাই matter of great importance। এইরূপ ভিন্নপক্ষের ভিন্ন লক্ষ্য থাকতেই কল্পিটির নিকট বাহা এত বেশি প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে, আমাদের তাহাতে কিছুতেই উৎসাহবোধ হইতেছে না।

কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাখীদের উপকার হইবে; কিন্তু রূপে সকলের সৰ্ব উপকার করা যায় না মঙ্গলদিক্ সাধারণত করিয়া উপকার করিতে হয়। একতলার এমন উপকার করিতে বস্য ঠিক নয়, বাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলার কাটল ঘরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভাল নয়। সরকারবাহাদুর যিনি ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাষাভিচ্ছেদ দূর করিয়া দেন, তবে কৃষিপল্লীতে তাহার স্বত্বপাত হইয়া দিনে দিনে নীচে হইতে উপর পর্যন্ত তাহার কাটল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।

এ কথা বল্য বাহল্যা, আভার একোয় প্রাধান্য অবলম্বন ভাষা—পরস্পরের মধ্যে অন্তরের গতিবিধির ইহাই রূপপ। ভারত-বর্ষে তাহার বৈচিত্র্য আমাদের পক্ষে যেমন খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, এমন ঠর পিরিমিত্ত ব্যবধানও করিতে পারে নাই। ইহার উপরেও যেখানে তাহার বধাখ বিচ্ছেদ নাই,

সেখানেও যদি বিচ্ছেদ সমস্ত তৈরি করিয়া তোলা হয়, বাহা তব তাহাকেও যদি আভার মধ্যে ফেলিয়া চূর্ণ করিবার চেষ্টা যেখানে পাই, তবে—তবে কি আর করিতে পারি, অস্বস্ত হইহাঁত তুলিয়া ব্রিটিশসরকারকে আশীর্বাদ করিব না।

শাস্ত্রপ্রকৃতি লোকেরা বলিধেন, এখনি এত ভয় পাইবার প্রয়োজন কি? কেবল প্রত্যবসায় হইয়াছে, এখনো ত পাকা হয় নাই।

কিন্তু সময় যে খাপাপ, এ যে কাল-বৈশাখ। উত্তরশান্তিমে প্রথমে অল্প একটু-খানি মেঘ উঁকি দেয় নাজ, তাহার পরে সামান্য-সামান্য করিতে করিতেই যে ঝড় আসিয়া পড়ে। এমন যে বারবার ঘটিতেছে। এই হস্তান্ত্রি দেশে মন্দ যদি একবার দেখা দেয়, সে যে আর বাইতেই চার না; মাগেরিয়ারই বল, প্রেগুই বল, আর অল্প বা-কিছুই বল, ছুটির সময় হইলেও আবার বেয়াদ বাড়াইয়া লয়। গম্বাই চকলা, কিন্তু অগম্বায় স্বভাবটা ঠিক যে তাহার উন্টা। তাই আশঙ্কা হইতেছে, কমিটির মন্তব্যের এই যে এগারো প্যারাগ্রাফটি, বুধি বা ইহাকে তৈলিয়া নাড়ানো সহজ হইবে না।

বিশেষত দেখা বাইতেছে, এটা একটা খাপছাড়। বাপার নয়—আমাদের ভাষা-গগনে ধুমকেতুর পুন্ডটা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মুণ্ডটা পর্যন্ত সমস্তটা বেল ক্রমশ পরিমুট হইয়া উঠিতেছে—হুতরাং এখন ইহাকে বগ্ন বা বাহা বা মতিব্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বোকা বাইতেছে, কতৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের

দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাটা যে আমাদের চরিত্রগত দোষ, তাহা নহই। কিছুদিন হইতে কর্তৃপক্ষ আমাদের পক্ষে তৎসনা করিতেছেন। দোষ সংশোধন করা আমাদের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমাদের পক্ষে স্বীকার করিতেই হইবে। বেদনা যেখানে, ভয় সেখানে বেশি, ছুতরাং সন্দেহ সেখানে স্বাভাবিক। রাশিয়া একটু নড়িলে-চড়িলেই অমনি ইংরেজ সন্দেহ করেন, বৃষ্টি তারতবার্ষিক দিকে সিঁধকাটি অগ্রণয় হইতেছে—এ সবকে বিজ্ঞানোক্তকরা কতদিন তাহাকে কতই আশ্বাস দিয়াছে, কত তৎসনা করিয়াছে, কিন্তু স্বভাব কিছুতেই যায় না—পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শক্তিতপ্রশোপযানঃ—তাহার কারণ, এই সাম্রাজ্যটুকুর প্রতি ইংরেজের অত্যন্ত দরদ। আমাদেরও যেখানে দরদ, সেখানে আমরা তাহাদেরই মত চর্চল, সেখানে আমরা সতর্ক না হইয়া বাঁচি না। আজ সমস্ত ইউরোপ পরস্পরের প্রতি সন্দেহে কানানে-বন্ধুকে আপাদমস্তক কটকিত হইয়া উঠিয়াছে—আর আমরা হীনগতি ভাতি, প্রবল রাজার ইচ্ছাধীন হইয়া আছি, শুধু ইচ্ছাধীন নহে সন্দেহাধীন হইয়া আছি, আমরা মাকে মাঝে জ্ঞাত হইয়া উঠিয়া কাপজে লিবি ও লতা ভাঙি, রেভোলুশন্ জারি করি ও মেমোরিয়াল পাঠাই মাজ—তাহাতে অগতে ক্ষতিও কাহারো নাই, বরং বেশি হয় না, ফলও ভাতি অল্পই পাওয়া যায়, গাছনা বখেই

যটে—তবু স্বভাব যায় না—সে স্বভাব প্রাচ্য-স্বভাব নহে, মধ্যস্বভাব।

সেহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সন্দেহ করাটা কেবল যে স্বাভাবিক, তাহা নহে, তাহা কর্তব্য। মাতা ছেলের গলায় পোনার কলি পরাইয়া বাহিরে পাঠাইতে গেলে সন্দেহ করেন। যে, যে ব্যক্তি পর, তাহার কাছে আমার ছেলের প্রাণের চেয়ে তাহার পোনের কলি বেশি মূল্যবান মনে হইতে পারে। পরের প্রতি তাহার এই সন্দেহ অজ্ঞান হইলেও, অতিমাত্র হইলেও, ছেলের রক্ষার পক্ষে ইহা তাহার কর্তব্য। পরকারের সকল মংলব বধন আমরা বুঝি না এবং বোকা সম্ভবও নহে, তখন দেশের প্রতি সম্ভবনত মনটা সন্দেহ করিয়া বস। যে অজ্ঞান হয়, তাহা নয়। মনেই কর না কেন, তিস্তাভীরা যদি তাহাদের দেশে ইংরেজের পরম বৈষ্ণবভাবে সান্নিধ্য অতি-বান peaceful mission-এর কথা একেবারেই বিশ্বাস না করিয়া পোরাদের তরফে কিছুকর মংলব ছিল, এইরূপই সন্দেহ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের প্রাচ্য পূর্ণশুদ্ধ ধর্মিয়া তাহাদিগকে কই কথা বলা কি সকলের মুখে মানাইবে? ব্যাথের নিরীহভাবে অত্যন্ত পা টিপিয়া-টিপিয়া চলা সবেও সন্নিধ্য পানী বধন উড়িয়া যায়, তখন শিকারী তাহাকে দুষ্ট বলিয়া গালি দেয় ও নিরাছি—কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বাধে না হইত, তবে এত রাগ করিয়া পানীকে গালি দিত না,—সে সক্রমচিন্তে বলিত, সন্নিধ্য সতর্কতা বেচারী পানীর পক্ষে প্রাণরক্ষার একটা উপায়। বিশেষত এও একটা ভাবিবার কথা যে, পানী যদি সন্নিধ্য ও সতর্ক না হয়, তবে আজ যে ব্যক্তি ব্যাধ

নয়, কাগল তাহারো শিকার করিবার প্রণোতন জানিয়া ওঠে ।

যাই হোক, ভাগই বল আর মতাই বল, এই অতি ক্ষুদ্র একাদশ প্যারাগ্রাফটিতে অন্মোদের, মনে বৃহৎ সন্দিগ্ধ জন্মিয়াছে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারত-সরকারের ১৯০৭ শালের রেজোলুশনের অন্ত্যন্ত, সুকোনল ভাবার মধ্য হইতে অল্প এই যে কমিটি'র ক্ষুদ্র পক্ষনধ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উদ্বেগ সাধু হইতে পারে, তবু আমরা স্মরণ করিতে পারিতেছি না ।

কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয় ত চান, কিন্তু কমিটিও যে বিত্তহীনভাবে সেই উদ্বেগ-স্থাননের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন, সে কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত, যদি-দুঃখিতাম কর্তৃ-পক্ষের স্বদেশেও তাহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে । তাহাদের শাস্ত্রে বলে, charity begins at home, বদান্ততা ঘর হইতে সুরু হয় এ স্থলে ঘরের চেয়ে পরের প্রতি বদান্ততার মাত্রাধিক্য দেখিয়া আমরা পঙ্কিত হইতেছি ।

ইংরেজের ঘেষেও চাষা বণেট আছে এবং সেখানে যে ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয়, তাহা সকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে । এ পক্ষে একজন ইংরেজের বাক্য উদ্ধৃত করিব ।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আগামের আমেরিকান মিলনক্রিয় বখন আগামের বিভাগের হইতে বাঙালা পড়ানো টাইইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, তখন সেখানকার স্কুল-ইন্সপেক্টর রবিভান্সায়েব তাহার প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন । সেই প্রতিবাদের এক স্থানে ল্যাক্স-

শিরের চাষীদের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন :-

Is there not some difference between this language and that used by Johnson? The Orthography appears different, the grammatical forms are different; the vocables themselves, as here given, it would be impossible to find in any dictionary of the English language. • • • • • Call this a distinct language, the vernacular dialect of the people, having more points of difference from, than of resemblance to, the language usually known as the English, and proceed to prepare school-books in it ?

রবিভান্সায়েব এমনিভাবে লিখিয়াছেন, যেন এ সম্বন্ধে কোনো তর্কই উঠিতে পারে না । বস্তুত আজিও ল্যাক্সাশিরের উপভাষায় ল্যাক্সাশিরের চাষীদের বিশেষ উপকারের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন হইতেছে না । স্পষ্টই দেখা বাইতেছে, ইংলণ্ডে চাষীদের শিক্ষা অগ্রম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের সর্বত্র ইংরাজিভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance । কিন্তু, সে ঘেষে চাষীদের উপকার ও ভাষার অবতরিকা উভয়ই এক বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই—সুতরাং সেখানে তাহাকে চারদুই করা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ

কেশপাশ করার করনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্ধিমানের একত্রক্ষণলিভ মাথার মধ্যে উন্নত হইতেই পারে না। আমাদের হুজুগায়েশে রাজপুরুষ ভাবিতেছেন চাষার পরিত্রাণ বাচাইবার কথা, আর শ্রামরা ভাবিতেছি সেই সঙ্গে চাষার এক বাচাইবার উপায়;—যাহা এক ভাবনার অন্তর্গত হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইখানা হইয়া গিয়া বিপদ বাড়িয়াছে। ছই পক্ষ যদি সমকক্ষ হইত, তাহা হইলেও আজ আমাদের এত উবেগ জন্মিত না। আমরা জানি, গবর্নেন্টের রেসোল্যুশন এবং আমাদের রেসোল্যুশনে বন্ধ ও ছাড়ার মত প্রভেদ গবর্নেন্টের রেসোল্যুশন আকাশের বজ্র আর আমাদের সভাগুলির রেসোল্যুশন রঙ্গমঞ্চের বজ্রের ব্যঙ্গমাত্র—তবু, বিপদের সময়, যে ব্যক্তি অসহায়, সে ব্যক্তিটা কটপট করিয়া ও বাঁচ, আমরাও তাহাই করি অতএব আগর সড়কের সময় আর কিছু না হয় ত একটা রেসোল্যুশন উত্থাপন ও একখানা মেমোরিয়াল পাঠাইবার উদ্যোগ করা বাইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা মনে হয় এই যে, আমাদের পক্ষ হইতে যিনি সভাপ্রলে রেসোল্যুশন উত্থাপন করিবেন, তিনি তদুপলক্ষে তর্কটা তুলিবেন কি? আমাদের প্রবন্ধের কোন কথাটা তিনি পরিষ্কার করিবেন?

সেদিন শটিসাছেব পূর্বদেশকে ঘেঁটা দিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্বদেশের মনের ভাব পক্ষিমূষণে বুঝিতে পারে না। ওঁহাদের বর্তমানকালের কবিত্ব কিপ্রভেদে শাস্ত্র হইতে তিনি এই গায়ত্রিক উদ্ধার করিয়াছেন। যেখানে পরম্পরের মধ্যে এমনতর

না-বুঝিবার দ্বন্দ্ব আছে, সেখানে শাসনকার্য চালানো কঠিন—এমন অবস্থায় আমাদের দ্বয়বলাহ প্রাচ্যতাবলগিকে যদি আমরা পাশ্চাত্যবুদ্ধির উপযুক্ত জুগম করিয়া না তুলি, তবে আমাদের পক্ষে বিপদ।

কিন্তু যে আপদা মনে লইয়া আজ আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হইরাছি, তাহার মধ্যে প্রাচ্য দ্ব্যর্থোক্ত্যতা ও দেশমাত্র নাই—এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের চেয়ে তাহার কদম বোঝেন। জনসাধারণের শিক্ষার উপসর্গ লইয়াই হোক অথবা উপলক্ষ্যেই হোক, দেশের উপভাষার অনৈক্যকে প্রাণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাক করিয়া তুলিলে তাহাতে যে দেশের সাধারণ মঙ্গলের মূলে কুঠারাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা কর্তৃপক্ষেরা, এমন কি, ওঁহাদের বিস্তৃত বাঙালীসমাজ, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালই বোঝেন।

কর্তৃপক্ষ এবং ওঁহাদের বাঙালি পারিষদ বলেন, তোমাদের সাহিত্যভাষা বড় বেশি Sanscritized—সংস্কৃতাস্থিত। এইজন্যই ক্রিয়ালীল পাঠশালা হইতে তাহাকে নির্মোচিত না করিলে, চাষার ছেলেদিককে observer, thinker এবং experimenter বীক্ষণপর, মননশীল ও পরীক্ষাপটু করা বাইতে পারিবে না।

পূর্বতন মূগে যুরোপে হঠাৎ এখন এক সময়ে শিল্পসাহিত্যের একটা বেন-বান আসিয়াছিল, সেই সময়কার যুরোপীয় নাম “রেনেসাঁস”—সেই রেনেসাঁসের বজ্রের মূগে বোড়শ শতাব্দীতে বিস্তার লাভিনমূলক কথা টঃরেজিভাবার টুকরা পড়িয়াছিল।

আমাদের দেশে প্রাচীনভাষার সহিত আধুনিক ঐক্য ভাষান্তরিত একত্র আকর্ষিত সম্বন্ধ নহে, বরং সংস্কৃতভাষার সহিত ইহার নাকীর যোগ রহিয়া গেছে। অল্প কল্পে হুড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যের একমাত্র প্রেরণ সংস্কৃত। পুরাণপাঠ, কীর্ত্তন, পৌরাণিক বাজা, কথকতা, তর্জা, কবির লড়াই প্রভৃতি বাহা-কিছু আমাদের সাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই সংস্কৃতভাষায়ই সংস্কৃতকথাকে দেশের সর্বত্র লক্ষ্যিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত দেশের সাধারণের এই জানসম্বন্ধের, দাবিসম্বন্ধের পথ ভিন্নবিন অবারিত আছে। বর্তমানকালেও দেশের বিধানেরা যে ভাষার মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া রাখিতেছেন, যে ভাষার দেশের সমস্ত ভক্তসম্প্রদায় তাঁহাদের বীক্ষণ শক্তি, মননা শক্তি, পরীক্ষণ শক্তির সমস্ত বলকে বিতরণ দেশ ও বিতরণ কালের অন্ত হারিষ দিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই ভাষার সহিত নিয়মাধারণের চিন্তের যোগ কৃত্রিম বাধার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এ কথা বলিলে অবশ্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে—কিন্তু চাষাদের মঙ্গলের পক্ষেও ইহা প্রয়োজনীয়, এ কথা বরং কৃপণোচিত্ত গুণ মহাশয় বলিলেও বিশ্বাস করিব না। যদিও তিনি বাঙালি, এবং বাঙালি হইয়াও বাংলাদেশের ভাবকে চারখানা করিবার অন্ত ছুরি তুলিয়াছেন, এবং যদিও তিনি Brutusএর মতই honourable man, তথাপি তাঁহার হৃদে

এই গুণ আঘাত পাঠবার কালে আত্মতাহার মত্ভাষা বলিয়া উক্তিগাছে—“Et tu Brute !” কৃষিও গুণমহাশয় ।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে মিশনরীদের সঙ্গে আসামে বাংলাভাষাপ্রচলন লইয়া তখনকার শিক্ষাবিভাগের বাবাহুবার চলিতেছিল, সেই সময়ে আসামে রাজস্ববিভাগের কমিশনার ছিলেন, ফ্রান্সিস্ জেভিঙ্গ্। ইনি এই সময়ে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই—“if in England it is now a matter of deep regret that we have so long neglected to teach our language to the Irish and Welsh, and thus made them one people with ourselves, it must be equally the policy and duty of the Government of India, by all means in its power, to assimilate the many nations and tribes under our rule into one people ; and if the early introduction of Bengali into the lately-conquered Province of Assam has been in any degree productive of binding this people closer to the people of our earlier acquired Provinces, and of putting them on the same footing of civilization, I think the Government will have cause to rejoice at the chance or the necessity which led Messrs. Scott and Robertson to

adopt that as the official language of our Courts.

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে " নিতান্ত ত প্রাচীনকাল নহ, কিন্তু সে সময়ে কি সম্ভাব্য ছিল ! ব্রেকিস্প্রাংহেবের " এই পত্রাংশের স্বর্ণ অঙ্কনস্বরে এখনকার ভারতরাষ্ট্রনীতি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইংরেজ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইরাছে । তখনকার কমিশনারসাহেব ইংরেজশাসনে ভারতের বিভিন্নজাতিকে এক করিবার সক্ষম গৌরবের সহিত যাক্ত করিয়াছেন ; আর এখন এ কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত যে সকল প্রদেশ এক, তাহাদিগকেও বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে !

ভারতবর্ষে একজাজ ইংরেজরাজত্বের প্রধান কলাপই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে । ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাঙ্ক্ষিত হইতে থাকিবে । নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাধিকা বহন করে, তাঁহে ভীয়ে হাটখাচারের সৃষ্টি করে, বাতাসাতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না । ঐক্যহীন দেশে এক বিশেষী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন । বিধাতার এই রক্ষণ অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনকে সহিয়া অর্পণ করিয়াছে ।

অগতের ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে

না । ধর্ম, সামন্তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত— সেই সামন্তত্ব নষ্ট হইলেই, ধর্ম নষ্ট হয়— এবং—

ধর্ম এব হতো হন্তি যশো বক্ষতি বক্ষিতঃ ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই একপক্ষের সুবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনায় বিপর্যয় আপনাই ঘটাইবে ; নিরস্ত, নিঃস্ব, নিরস্ত ভারতের দুর্দশতাই ইংরেজসাম্রাজ্যের বিনাশ করিবে ।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতিকে বড় করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্পলোকের আছে । বিশেষত লোভে যখন বেশি হয়, তখন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায় । ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের ভারত করিয়া রাখিব, অন্যন্ত সুস্থভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অপ্রাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়-গুলি তিনি নিশ্চয়ই তুলিতে পারেন । চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা অশুভের নিয়মবিরুদ্ধ—কলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়—চিরদিন বাধিয়া-ছাদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে, রক্ষত বস্ত্রদিন রূপা সম্ভব হইত, তাহাকেও হ্রব করিতে হয় ।

অধীন দেশকে হুর্দগ করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নিষ্কাণ্ড করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কেন্

সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে সময়ে ওয়ার্ড্‌ বার্থ, শেলি, কীটস্, টেনিসন্, ড্রাইডিং যুক্তহিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি; যে সময়ে কার্ণাট, বার্কিন্, ম্যাথু, আর্লন্ড্‌ আর নাই, একমাত্র মন্‌ বর্নি অরণ্যে রোদন করিবার তার জইয়াছেন; যে সময়ে প্রাডটোনের বস্ত্র-পতীর বাণী নীরব এবং চেম্বারলেনের সুখের চট্টপতীর সবত ইংলণ্ড উদ্ভাস্ত; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে তুবনবোহন ফুল ফোটে না,—একমাত্র পলিটিসের কাটাগাছ অসম্ভব বৈজ্ঞানিক করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের অস্ত্র, দুর্বলের অস্ত্র, দুর্বীণার অস্ত্র বেশের ককণা উজ্জ্বলিত হয় না, কুখিত ইম্পীরিয়ালিজম্‌ সার্বভৌম বিস্তার করাকেই মনোবলিয়া গণ্য করিতেছে; যে সময়ে বীর্ষের স্থান বাদিজা অধিকার করিয়াছে এবং স্বর্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি ।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও হৃৎসময় বলিব কি না বলিব, তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে । সত্যের পরিচয় হৃৎসময় দিনেই ভাল করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় বাতীত কোনো জাতির কোনোখানে উদ্ধার নাই । যাহা নিজে করিতে হয়, তাহা পরম্পর দ্বারা হয় না; যাহার অস্ত্র স্বার্থভাগ করা আবশ্যক, তাহার অস্ত্র বাকাব্যয় করিলে কোনো ফল নাই; এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার অস্ত্রই বিবাতা হৃৎ দিয়া থাকেন । যতদিন ইহা না বুঝিব, ততদিন হৃৎ হইতে হৃৎ, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে ।

প্রথমত এই কথা আমাদেরিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কর্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা মনে রাখিবে আমাদের মধ্যে ঐক্যের পবনটিকে বধাসম্ভব রোধ করিতে উদ্রত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি, সম্ভাব্যে কি এমন থাকার ইংরেজ আমরা সৃষ্টি করিব,—যাহার দ্বারা তাহার এক মুহূর্তে আশঙ্ক হইবেন? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্তকাল, আমাদেরিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়? যদি-বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্জাটন যে, এমন কথার মুহূর্তকালের ভ্রম প্রত্যাশাপন করিতে পারিবে? আমাদেরিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পর্যন্ত না আমাদের নানাকারিত্য মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি বধাধভাবে, দ্বারিতাবে উদ্ধৃত হয়, সে পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরদিনেই আর নহে ।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি সমতার সুড় হইয়া, যদি ইংরেজি কাতারস্বার্থের দিকে তাকাইয়া—সেই দ্বারকে বস্ত্রবস্ত্র নামই দাও না কেন, না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজম্‌ই বল—যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারতরাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরদারী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিব্যর নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরন্তর উচ্চ-অঙ্গের ধর্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কি অর্থ আছে? এ কথাটা যে সত্য যে, আমাদের

দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাদুর্ভাব, বলবান্ হইয়া উঠিতেছে ; এই সাহিত্য ক্রমশই অল্পে অল্পে সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে যে সকল জ্ঞান, যে সকল জীব কেবল ইংরাজি শিক্তদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, তাহা আপামরসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে ; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া, পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ; এক সময়ে যে সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালার মুখস্থকথামাত্র ছিল, এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাবায়, স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে ! আমরা কি বলিতে পারি, না, তাহা হইতেছে না, এবং বলিলেও কি তাহাতে কাহারো চোখে ধূলা দেওয়া হইবে ? অল্পত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে, না, তাহার আলো নাই ?

এমন অবস্থার ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐকান্ত্যকে অস্তিত্ব চারটে বড়-বড় বাধ দিয়া বাধিয়া নিশ্চল ও নিপেক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কি বলিতে পারি ? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাবায় উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নিষ্কর্তৃক হইয়া পড়িবে । যখন বাংলাদেশে দুই অংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব প্রথম উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে । কাঠুরিয়া যখন বঙ্গশক্তির ডাল পাটে, তখন যদি বঙ্গশক্তি বলে, আহা, কি করিতেছ, এমন করিলে যে

আমার ডালগুলো যাইবে ! তবে কাঠুরিয়ার লবাব এই যে, ডাল কাটিলে কোলাহল কাটা পড়ে, তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিত ! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই তরসী রাখিতে হইবে ?

আমরা জানি, পার্লামেন্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষের লবাব দেয় ; সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফলশ্রুতি কহিল বলিয়া খুসি হয় । আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, -- এখানেও ফলশ্রুতির উপায় সেই একই ।

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না । সেখানে দুই পক্ষই যে বাহ্যিক-ভাবনাক্রান্তের দ্বারা একই শরীরের অঙ্গ । তাহারের উত্তরের শক্তির আধার যে একই । আমরাও কি ভেঙ্গুনি একই ? গবর্নমেন্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে, আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে ? তাহার যে ডালনাড়া দিলে যে ফল পড়ে, আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব ? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়া না ; এ সম্বন্ধে মিলু কি বলিয়াছেন, স্পেন্সর কি বলিয়াছেন, লীলি কি বলিয়াছেন, তাহা জানিরা আমার শিকিপরায়ার লাভ নাই । প্রত্যক্ষসাক্ষ্য সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে । খুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই, নিজের মনের মধ্যেই একবার দৃষ্টিপাত কর না । যখন খুনিভাসিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন আমরা কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম ? আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্নমেন্ট আমাদের বিজ্ঞার

উন্নতিতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন ঐরূপ করিতেছেন? কারণ লেখাপড়া শিখিয়া আমরা শাসনসম্বন্ধে অসম্মত অবস্থায় ক্রোধিত এবং প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি। মনেই কর, আমাদের এ সম্মত ভুল, কিন্তু তবু ইহা অস্বীকার, তাহাতে ভুল নাই।

যে দেশে পার্লামেন্ট আছে, সে দেশেও এডুকেশন বিল নষ্ট হইয়া ঘোরতর বাধা-বিবাদ চলিয়াছিল—কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো গোলযোগ এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষণাত্মক একটা অনিবার্য কল এই যে, ইহার দ্বারা লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সফীর্ণতা পরিহার করে, নিজের গতিমতকে তাহার মন সন্তোষিত হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে তাহা ব্যর্থ হয়, অতএব এত-বড় বালাইকে প্রস্রব না দেওয়াই ভাল। কখনই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে পরস্পর ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবারাত্র তাহার কল হাতে-হাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কাঁপা করা একই।

আমাদের দেশে সে কথা খাটে না। কায়দা, কর্তার ইচ্ছা কর্তব্য এবং আমরা কর্তী নহি। তार्কিক বলিয়া থাকেন—“সে কি কথা! আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর, আমাদের কর্তব্য থাকিবে না কেন! আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।” গোল যে নন্দ-নন্দকে দুইবেলা দুই দের, সেই দুখ বাঁচিয়া

নন্দনন্দন যে বেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, গোল কেন শিষ্ট নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে সেই চতুর্থ দিগন্ত তলব না করে! কেন যে না করে, তাহা গোলার অন্তরায়ই জানে এবং তাহার অন্তরায়ই জানেন।

শাধা কথা এই যে, অবস্থান্তরে উপায়ের ভিন্নতা ঘটয়া থাকে। মনে কর না কেন, করাদিগারের নিকট হইতে ইয়েরক যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মতলব করে, তবে করাদি-প্রেসিডেন্টকে তর্কে নিকট করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্মোপদেশও শোনার না—তখন করাদি-কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নান্না-প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—এই-জন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা য়, একদা লরেন্স বখন ইংলণ্ডের বন্ধ ছিল, তখন ডিউক-উপাধিদারী চংরেজরাজদূত ভোজনসভার উত্তরা দাঁড়াইয়া লরেন্সের হাতে তাহার হাত সুস্থিয়ার পামছা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল, যেদিন যোগলসভার, নবাবের দরবারে ইয়েরককে বহু তোষামোদ, বহু-অর্থব্যয়, বহু-কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গানের আলা যে তাহারিগকে আশ্রয় প্রদানতর সহিত গারেই মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসার করিতে গেলে ইহা অবশ্যজারী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের যত নিকৃষ্ট জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা দেখিতে

হয়, তবে কি স্বাশ্বোপনয়নের ব্যাপারেই তাহা সফল হইবে? যে-জন্মের মনো মাখন আছে, সেই জন্মে স্বাশ্বোপনয়ন করিলে মাখন উষ্ণিরা পড়ে; কিন্তু মাখনের জন্ম রহিল গোহাল-বাড়ীতে, আর আমি আমার ঘরের ঘলে অহরহ স্বাশ্বোপনয়ন করিতে রহিলাম, ইহাতেও কি মাখন জুটবে? তাহার পুঁথিপত্র, তাহার বুক ফুলাইয়া বলিবেন—আমরা ত কোনোরূপ সুযোগ চাই না, আমরা জাতি স্বধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। মনে কর, তোমার সম্পত্তি যদি তোমাদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতিব্যবসে যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্নেন্ট বলিতে ত একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পক্ষান্তে যে রক্তমাংসের মানুষ আছে—তাঁহারা যে নানাদিকপরিমাণে যত্নবিপুল বশীকৃত। তাঁহারা রাগদ্বয়ের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্ত হইয়া এদেশে আসেন নাই। তাঁহারা অস্ত্রায় করিতে প্রস্তুত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অস্ত্রাধঃশোষণের স্বল্প উপায়, এমন কথা কেহ বলিবেন না। এমন কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতেও উকিল শুক্রমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহস করেন না, জজের মন বুঝিয়া অনেকসময় ভাল তর্কও তাঁহাকে পরিভাষ্য করিতে হয়, অনেকসময় বিচারকের কাছে বৈধিক পরামর্শ স্বীকারও করিতে হয়—তাহার কারণ, জজ ত আইনের পুঁথিমাঝ নছেন, তিনি সমীচ মনুষ্য। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন সৃষ্টি কর-

বেন, তাহার মনুষ্যবৃত্তির প্রতি কি একেবারে দৃষ্টিপাত করাও প্রয়োজন হইবে না?

কিন্তু আমাদের যে কি অবস্থা, কি উদ্দেশ্য এবং কি উপায়, তাহা আমরা লম্ভে করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন অস্ত্র-লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যভিত্তিই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদি বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমরা দিই না। মর্মে করি, আমাদের পোলিটিকাল কর্তব্যক্ষেত্র যেন ফুল-বাগানের ডিবেটিং ক্লাব্ গবর্নেন্টের আমায়ের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন লবাব দ্বিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসক অতি সূক্ষ্ম হইয়াও যন্ত্রণা রোগী মরে, আমাদের এখানেও বৃত্তান্ত অতি চমৎকার হইয়াও কার্য নষ্ট হয়, ইহাও সূচ্য প্রত্যহ দেখিতেছি।

মনে করিগাছিলাম, আমিও আজ ডিবেটিং ক্লাবে পাড়াইয়া বাহবা লইব;—ইউরোপের নানা ইতিহাস হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, জাতীয়নিষ্ঠ ও সাহিত্যের একতাবা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় দিয়া দেশের ঐক্যচৌককে সফল করিয়া তোলে। গ্রাম আপনায় সর্দার ব্যবহারের লজ্জা যেমন স্বভাবতই আপন সর্দার উপভাব্যে গড়িয়া তোলে, দেশ ভেদেই আপন বৃহৎ ব্যবহারের লজ্জা আপন সাহিত্যভাব্যে স্বভাবতই গড়িয়া তুলিতে থাকে। এক কুটীষ হইতে আর এক কুটীরে, এমন কি, এক পলি হইতে আর এক পলিতে বাইবার লজ্জা রাজপণের প্রয়োজন না হইতে পারে—সেখানে যেটো রাত্তা, পদচিহ্নিত পথই যথেষ্ট;—কিন্তু

যেখানে ব্যাপক বাণিজ্যের বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে, যেখানে দেশ হইতে দেশান্তরে, গ্রাম হইতে নগরে বাইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে, সেখানে পাকা-রাশি, বন্ধু-রাশি তৈরি না হইয়া থাকিতে পারে না। চাষাশাকার বেড়া কুলিরা-দিয়া পরিবাসাদিগকে এই পাকা-রাস্তার ব্যবহার হইতে নিরত করিলে তাহাদের হইলেবার ঘোরো কাজ, যেতো প্রয়োজন যে একপ্রকার চলিয়া না যায়, তাহা নহে ; কিন্তু দিনে দিনে চাষা বিষম চাষ এবং পরি-বোরতর কিল্লি-হইয়া উঠিতে থাকে। বিলাতে দেখিতে পাই, কারখানার মজুরদিগকে শিক্ষিত সাধারণের সহিত সমান উন্নতির অধিকার করিবার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষার আয়োজন চলিতেছে। যদি তাহাদিগকে উপভাষা ও অপভাষার সোমার মধ্যেই বন্ধ করিয়া রাখা হইত, তবে সুবিধার দোহাই দিয়া মত একটা অসুবিধাকেই খাড়া করিয়া তোলা হইত না। একটা ভাষার আয়তায় চারটে ভাষা ? কিন্তু এককেই যদি ত্যাগ করিতে হয়, তবে চারটেই বা কেন ? চলি-টাই বা নয় কেন ? কেবলমাত্র চারজন সুবিধার সন্ত না থাকিয়া চলি-সুগ সুবিধাই বা ছাড়া যায় কেন ?

ঐযুক্ত উপপ্রকিপোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রণীত "সেকালের কথা" নামক একটি গ্রন্থের সচিৎ বই বাহির হইয়াছে। পাঠকেরা সেই গ্রন্থে একটি কিছুতকিমাকার জন্তর বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিবেন, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন "টাইগো-সরাস"। একুটি তাহাকে গইয়া এক অদ্ভুত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার দেখারপেষ

হইতে প্রমাণ হইয়াছে, তাহার মাথার ঘেমন একটা মস্তিষ্ক ছিল, তেমনি তাহার কটি-দেলেও একটা মস্তিষ্ক ছিল। তাহার উত্তমানে এবং অধমানে ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্ক স্থাপন করিয়া এই জীবটির লগাতর দিকে অথবা মুড়ার দিকে বেষণেশ একটা অসাধারণ সুবিধা হইয়াছিল, তাহা মনে করি না। প্রকৃতি এই সমস্ত খেয়াল এখনকার দিনে একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন আবেলোকে এক মস্তিকেই তিনি লাগামুড়া উত্তরকেই চালনা করিয়া দিব্য সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু আমাদের কমি-টির বিখ্যাতা আমাদের নির অঙ্গের জন্ত স্বতন্ত্র মস্তিষ্ক যোগনা করিয়া আমাদিগকে আধুনিক আবশ্রেয়তার বাহিরে ফেলিবার চেষ্টার আছেন। এরূপ অনাবশ্যক অমিত্যচার আধুনিক কালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া নানা পুণ্ডিত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে ছিলাম।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কমিটিতে যে পাচজন যোগ্যলোক বসিয়াছিলেন, এমনতর ইঙ্গুলমটোরি করিয়া তাহাদের বুদ্ধি-বিশ্বাকে অপমান করিব কোন্ সাহসে ? পেড্‌লারসাৎ পক্ষাভিভারের কর্তা, তাহাকে বিশ্বালয়ের ছাত্তের মত উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হইলেও তাহা অশিষ্টা হইত। অনরেবল্ল কৃষ্ণগোবিন্দ শুণ্ড মহা-শয়কে সিতিল্পর্জিৎ প্রবেশ করিবার জন্ত যে-পরিমাণ বিজ্ঞা আরম্ভ করিতে হইয়াছে, তাহার কপের পক্ষে তাহার অবিকাশই অত্যাবশ্যক নহে- তবু গবর্মেন্ট ব্যাবসায়িক প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি বিজ্ঞা শুণ্ড মহাশয়ের নিকট জোর করিয়া বাব করিয়া-

ছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রেমসাম্রাজ্যের কত কোনো কবিটির পরামর্শ গঠিয়া কোনো সহক উপায়ের সৃষ্টি করেন নাই, তাহাকে এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে গেলে আমার পক্ষে দুইভাষা হইবে যে, চাবাক thinker, observer ও experimenter করিতে গেলে উপভাষার কেবল গ্রামের গোটাকতক বিষয়েই তাহার জ্ঞানকে বদ্ধ করিলে যথেষ্ট হয় না। এ কথা শুনিতে হতোবিরুদ্ধ, কিন্তু ইহা সত্য যে, মাহুয়ের বতটুকু আবশ্যক, তাহার চেয়ে তাহার আবশ্যক আরো অনেক বেশি এবং সে বতটুকু পাও, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার পথ তাহার নিকট নিরন্ত অব্যাহত রাখা প্রয়োজনীয়।

একটা কথা এই উল্লিখিত পারে, আনাদের দেশের চাবাকে মাহুয়ের সমস্ত সুবিধা দিবার জন্য এত বাড়াবাড়ি করিবার দরকার নাই, আগন্তক চাবাদের বতটুকু সুবিধা তাহাকে দেওয়া বাইতে পারে, তাহারি চেষ্টা করা যাক্। আচ্ছা, তার বেশি আর কাজ নাই। যেটুকু বিভ্রান্তে তাহার। কেবল জমিদার ও মহাজনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সেই পথটিই ভাল, বিজ্ঞা বত-দূর বাড়িলে তাহার। একদিন পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতেও নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারে, ততদূর নাই গেল। কিন্তু জমিদার কোন্ ভাবার কাগজপত্র রাখে? পাঠ্য-কবুলতি লেখা হয় কোন্ ভাবার? নগরবাসী জমিদারকে দরজাত লিখিবার সমর কোন্ ভাবার লিখিলে চাবার সুবিধা হইতে পারে? তা ছাড়া, চাবার কুটুমিতা যে তাহার গ্রামপণ্ডিত মধ্যমই বদ্ধ

থাকিবে, এমন কোনো কথা নাই। এক জেলার চাবা তাহার ভিন্ন জেলার জামাতাকে কি তাহার পত্র লিখিবে? যদি বল, এখনি বা করজন চাবা পত্র লেখালেখি করে? নিজে না-ও করিতে পারে, কিন্তু প্রোবাহকে দিয়া পত্র লেখার, তাহদের ভাষা, তাহার জামাতা বাহাকে দিয়া পড়াইয়া পর, সে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যেন কষ্ট, উত্তর-দেশের পরিবাসী দক্ষিণদেশের সহরে চাকরি করে, সে যেচারা দক্ষিণদেশী মুহুরির সহায়-তার যে পত্র তাহার পাড়ার লোককে লিখিবে, পাড়ার লোকে সে পত্র স্পষ্ট বুঝিবার জন্য কোথায় ছুটাছুটি করিয়া য়িবে? সাহিত্যভাষা লিখিবার যেটুকুমাত্র অভিজ্ঞত পরিশ্রম, তাহার তুলনায় এই সমস্ত দেশবাসী নানা ছোটখড়্ সখকজালের ছেদসাধন যে কতবড় গুরুতর অসুবিধা ও অনিষ্টকর, তাহা কি সত্যই কমিটির পাচজন বুদ্ধিমান বোঝেন না?

বোঝেন না বলিলে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা হইবে এবং বোঝেন বলিতে গেলে কটুতর সমস্তার মধ্যে পড়িতে হইবে, আমি ততদূর পর্যন্ত বাইতে প্রস্তুত নহি। অতএব আমি ও পথেই বাইব না। আমি আজ আমার দেশের লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি—আমার বাকিছু বক্তব্য, সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে যনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ্য ঘটয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে, এই সমস্ত বাদবিবাদে উদ্ভাসনা, এই সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যেও পাক থাইয়া ফিরিতে আমার এক-

দিনের লজ্জা উৎসাহ হয় না। জীবনের
প্রতিপত্তিতে যদি আলোক জ্বলিতে চায়,
তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ায়
বুধে চলে ? আমাদের দেশে এখন নিতৃত্তে
চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন—কণে
কণে সারিবার নিঃশব্দ শক্তির অপব্যয় এবং
চিন্তার বিবেক ঘটাইবার এখন সময় নহে।
যে অবিচলিত অবকান এবং অক্ষুণ্ণ শক্তির
মধ্যে যৌবন ধীরে ধীরে অক্ষুণ্ণ ও অক্ষুণ্ণ বিনে
হিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্ভ্রুতি আশা-
দের বেশী দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছোট
আশাত নানাদিক্ চাইতে আসিয়া পড়ে—
হাতে-হাতে প্রতিশোধ বা উপস্থিত প্রতি-
কারের লজ্জা দেশের মধ্যে বাস্তবতা জন্মে, সেই
চতুর্দিকের বাস্তবতার চাক্ষুষ হইতে নিতৃত্তে
রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যখন হঠাৎ
এখানে বেঘন, ওখানে বাহ উপস্থিত হইতে
থাকে, তখন তখন তখন সেটা নিবারণের
লজ্জা রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে
না। যদিও জানে অস্থিরতা বুঝা, জানে
এই সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক আলায়সগার
মূল্যে যে ব্যাধি আছে, তাহার ঔষধ চাই এবং
তাহার উপায় হইতে সময়ের প্রয়োজন,
তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেমনি
প্রত্যেক তাড়নার লজ্জা স্বত্ত্বভাবে অস্থির
হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনো-
বোগী হই। সেই অস্থিরতার আজ
আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই—কর্-
পকের বর্তমান প্রস্তাবকে অধৌক্তিক প্রতি-
পত্ত করিয়া আমাদের যে কণিক বৃদ্ধাভি-
তাহাই ভোগ করিবার লজ্জা আমি এখানে
উপস্থিত হই নাই, আমি দুটো-একটা সোড়ার

কথা বহুশোভাভেদে কাচে উপাশন করিবার
মুখোণ পাঠিয়া এই সঁজার আময়গ গ্রহণ
করিয়াছি। যে সঁজার কপটা গইয়া আশা-
দের সম্ভ্রুতি কোচ উপস্থিত হইয়াছে এবং
মাকে মাকে বারংবার কোচ উপস্থিত হয়,
তাহাকে তাহার পশ্চাত্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির
সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের
সামঞ্জস্যবোধ পাড়িত হইবে। প্রাথমিক-
শিক্ষাবিধিগত আক্ষেপটাকে আমি সামান্য
উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আশ্রয়-
ক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যপোচ
করিবার যথি চেষ্টা করি, তবে দয়া
করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া
উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল
করিতে চাই। কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি
কোনদিন বিরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা গইয়া
আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না।
আমি জানি, প্রত্যেকবার মেস ডাকিলেই বজ্র
পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে
কোনো লাভ নাই। প্রথমত বজ্র পড়িতেও
পারে, না-ও পড়িতে পারে; দ্বিতীয়ত বেথানে
বজ্রপড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে
আমার গতিবিধি নাই, আমার পরামর্শ,
প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না;
তৃতীয়ত বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে
রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে,
তবে সে উপায় কণিকার্থে বজ্রের পাঠা অব্যব-
হেদ্য নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার
দ্বারাই লভ্য; বেথান হইতে বজ্রপড়ে, সেই-
থান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তত্ত্ব-
দণ্ডটাও নাথিয়া আসে না, সেটা শাস্ত্রভাবে

বিচারপূর্বক নিভেকেই রচনা করিতে হয় ।

বর্ত্তমানের যে পোলিটিকাল প্রগতি লইয়া এ সভার উপস্থিত হইয়াছি, সেটা হয় ত সম্পূর্ণরূপে আওতাধীন কিছু কাল আবার আর-একটা কিছু বারাদিক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আশঙ্ক্য নহে । ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ বাটার ঘরে মাথা পুড়িয়া মরিলাম, তিনি শাড়া দিলেন না—অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম, ইহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আসিবেন,—তাঁহার যদি দয়ানাদা থাকে । তিনি, যদি-বা দয়া করেন, তবু আশঙ্ক্য হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আসিয়া দয়াময় দান কানে ধরিয়া আশা করিয়া তাহার হাত-নাগাদ হুহুত্ব কাটিয়া লইতে পারেন । এতবড় অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাতরঙ্গ স্থাপন করা যায় ?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না । “সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়” বলিয়া পতঙ্গ যদি আঙনে কাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে । সে স্থলে ধর্ম্মের কথা আওড়াইয়া সদয় নষ্ট না করিয়া আঙনকে দূর হইতে নমকায় করাই তাহার কর্তব্য হইবে । ইংরেজ আমাধিপত্যে শাসন করিবে, আমা-ধিপত্যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনমুখি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেখানেই তৎক্ষণাৎ বঙ্গপূর্বক ছোটো পেরেক চুকিয়া দিবে, ইহা বিনিত্যই স্বাভাবিক-পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে—আমরা

হৃদয় তক করিতে এবং ‘সমুৎ’ ইংরাজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইংরেজ অস্ত্রা-হইবে, তাই হইবে না । একজন স্থলে আর বাই হোক, রাগানুগিত করা চলে না ।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উত্তীর্ণ হইতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাকৃতিক হিসাবের মধ্যে আনিয়া ব্যবসা করা চলে না । হাতের কীছে একটা বুটান মনে পড়িতেছে । সেদিন কাগজে পড়িয়া-ছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র বুটানমিশনে লাখ-খানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—আইনবহিত ত্রুটি থাকতে তাহার বুটান পরে যিনি সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল । কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দু ভ্রাতা আইনের বিরূপতায়ও তাহার ভ্রাতার আভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া এই লাখটাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়া-ছেন । তিনি ভ্রাতৃত্বের রক্ষা করিয়াছেন । যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া বুটানমিশনের উন্নতির জন্য টাকা দিব কেন—আটনমতে বাহ্যে আমার, তাহা আমি ছাড়িব না । এ কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ নিম্না করিবার জো থাকিত না—অধিক সাধারণত আইন বাচাইয়া চলিলেই সমাজ-নীতির থাকে । কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম্ম আছে, সেখানে সমাজের কোনো দাবী থাকে না, সেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্বের জোরে যান, মহত্বের গৌরবই তাই ; তাহার ওখানে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না ।

ইংরেজ যদি বলিত, জিতবেশের প্রতি বিদেশী বিজ্ঞতার যে সকল সর্বসম্মত

অধিকার আছে, তাহা আমরা প্রতিপাদ্য করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভাল বাজি,— যদি বলিত, বিভিন্ন পরমেশ্বরগণের অসংখ্যক বিশেষতা স্বাভাবিক-আপত্তা-বশত যে সকল সত্ত্বকর্তার কঠোর বাস্তব্য করে, তাহা আমরা করিব না; যদি বলিত, আমরা যেরূপে বস্তুতির কাছে আমাদের গবর্নেন্ট সকল বিষয়ে বেঙ্গল খেলনা লম্বাঘিহি করিতে বাধ্য, এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যত: বীকার করি; সেখানে পরকায়ের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে বেঙ্গল একান্তে তাহা সংশোধন করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে; এদেশে কোনো অংশেই আমাদের লক্ষ্য, ইহা সম্পূর্ণই এ দেশদ্রাবী, আমরা যেন কেবলমাত্র খবর-দারি করিতে আসিয়াছি, এইজন্তই নিরাসক্ত-ভাবে কাজ করিয়া যাইব, তবে আমাদের মত লোককে ধূলার স্তুতি হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত অধম যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদধূলি পড়িবে, ততকাল আমরা ধস্ত হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়াই থাকি। বাও, আমরা নিম্না দিই, তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন খাটাই এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক, আমরা সুখি খাই, তোমরা চাহিয়া দেখ অথবা তোমরা চাহিয়া দেখ, আমরা সুখি থাকিতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। সুব্যাগী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মানুষকে মানুষের হিসাবে বিচার করিলেই

কাজে লাগে সেই হিসাবে যা পাই সেই ভাল, তাহাঁনি উপরে- বাহা জোটে সেটা নিতাই উপরি-পার্তনা, তাহার মত অধোগতে দাবী চলে না, এবং কেবলমাত্র “কাকি দিয়া” সেরূপ উপরি-পার্তনা বাহার নিম্নতই জোটে, তাহাকে হুগতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোট। সুদূর যুরোপের নিতালী নামের সুবৃহৎ পোলিটিকাল রসমকের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আনানিধাক পাগল করিতেছে— ফরাসি, জার্মান, রুশ, টোনিয়ান, মার্কিন এবং তাহার নানা ব্রানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সংকট বিচিত্র-জটিল তাহাদের সংকে সন্দেহই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়, আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল কেন্দ্রের সামান্যতঃ পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রাগ-বেদের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সংকে অনেকটা নিলিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের এসস পলার্মেন্টের এমন তত্ত্বাকর্ষক;—ইংরেজ স্রোতের জলের মত নিম্নতই এদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার কবর এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম করিও না, যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করে, সেও “বস্তুতির সঙ্গে—এখানকার ইতিবৃত্তের তার জন্মান্বয়ের উপরে, এখানকার তাহার সহিত পরিচয় সূক্ষ্মীর জ্ঞানবান্ধবজ্ঞে। এখানকার সাহিত্যের

সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্নমেন্ট অগ্রবাদের
তালিকাগাঠে—এমন অবস্থায় আমরা
ইহাদের নিকট যে কত ছোট, তাহা নিজে
প্রতি সম্বন্ধবশত আমরা ভুলিয়া বাই, সেই-
জনই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে
আমরা কণে কণে বিশ্বস্ত হই, ক্ষুদ্র হইয়া
উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে
অত্যাতিশয় কৰ্ত্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্ষুদ্র হন,
কখনো বা হাতগংবরণ করিতে পারেন না ।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অগ্রবাদের
স্বরূপ বলিতেছি না । আমি বলিতেছি,
ব্যাপারখানা এই—এবং ইহা স্বাভা-
বিক । এবং ইহাও স্বাভাবিক যে,
যে পদার্থ এক ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যস্থিত বেনা-
কেও তাহার সামাজিক ক্রিয়াকৌশল
করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপর-
ওরাগার বশেষপরিমাণে থাকিতে পারে না ।
তাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর, তাহাও তাহাদের
কাছে ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয় আমার
ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া,
আমার বাংলাদেশের কল্প ভাগবিভাগ
লইয়া, আমার একটুখানি ম্যুনিসিপালিটি
লইয়া, আমার এই সামান্য ম্যুনিভাসিটি লইয়া
আমরা ভগ্ন-ভাবনাও অগ্রি হইয়া দেশময়
চাংকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য্য
হইতেছি, এত কলরবেও মনের মত ফল
পাইতেছি—কেন ? ভুলিয়া বাই ইংরেজ
আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে
নাই । তাহার দোষেই আছে, সেখানে
যদি থাকিত পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে
পাইতাম, অতীত কতই দূরে পড়িয়াছি,
আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে ।

আমাদিগকে এত ছোট দেখাইতেছে
বলিয়াই সেদিন কঙ্গনদাহক জ্বলন অত্যন্ত
সহজকর্ম্মের মত বলিয়াছিলেন, তোমরা
আপনাদিগকে, ইম্পিরিয়ালিস্টের মধ্যে
বিশুদ্ধ দিয়া দৌরব্যবোধ করিতে পার না
কেন ? সর্ব্বনাশ, আমাদের প্রতি এ কিরূপ
ব্যবহার ! এ যে একেবারে অপরমজারের
মত তুলাইতেছে ! এই, অট্টেলিয়া বল,
ক্যান্ডো বল, বাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পিরি-
য়াল্ অলিগনের মধ্যে বহু করিতে চায়,
তাহাদের শরীরগৃহের বাতায়নতলে লাড়িয়া
অপর্য্যাপ্ত প্রেমের সঙ্গিতে সে আকাশ সুখরিত
করিয়া তুলিয়াছে, সুখাত্মক ভুলিয়া নিজে
কট পথান্ত ঘূর্ণন করিতে রাজি হইয়াছে—
তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা ! এতবড়
অত্যাতিশয়ে যদি কীর্তীর লক্ষ্য না হয়, আমরা
যে লজ্জা বোধ করি ! আমরা অট্টেলিয়ার
তাড়িত, নাটালে লাঞ্চিত, বধেণেও কৰ্ত্তব্য-
অধিকার হইতে কত নিকেই বঞ্চিত, এমন
স্থলে ইম্পিরিয়াল্ বাসরঘরে আমাদিগকে
কোন কাঁধের গুস্ত্র নিমন্ত্রণ করা হইতেছে !
কঙ্গনদাহক আমাদের গুস্ত্র হস্তের আশ্রয়
হইতে বহু উর্দ্ধে দিয়া ভাবিতেছে—ইহারা
এত নিত্যন্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন-
ইম্পিরিয়াল্য়ের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত
হইতে রাজি হয় না, নিজের এতটুকু স্বাভা-
ব, এতটুকু কতিলাভ লইয়া এত ছটফট করে
কেন ? একেমন—এমন একটা বস্তু
সেখানে বহুবাক্যবাক্যে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে,
সেখানে যদি একটা ভাগশিল্পকে সাধরে
আহ্বান করিবার গুস্ত্র মায়া সিন্দুরহস্তে
গোন্ধাসে এবং এই সাধরব্যবহারে ছাগের

একান্ত সফলত দেখিয়া তাহাকে বলা হয়—
 একি 'সাম্প্রদায়িক' এতবড় মহৎ যজ্ঞে যোগ
 দিতে তোমার আগ্রহি! হাথ, 'অজ্ঞের
 যোগ দেওয়া এবং তাহাদের যোগ দেওয়াতে
 কত 'প্রভেদ, তাহা' যে, সে একমুহূর্তও
 তুলিতে পারিতেছেন না। যজ্ঞে সাম্প্রদায়িক
 দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো
 অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগ-
 শিকার এই বেদনা যজ্ঞকর্তার পক্ষে বোকা
 কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর! ইন্দ্র-
 বিরাগতই 'নিরীহ' তিহাতে লড়াই করিতে
 চাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ-
 ভোগানো; দোমালিগায়েও পিন্নবিনিময়
 করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাপ্যদান করা;
 উচ্চ প্রাণ, উপনিবেশে ফল উপাদান
 করিবেন, আমাদের অধিকার সন্তান মজুর
 ভোগান দেওয়া! বড়-ছোটের মিলিয়া
 যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার
 কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং
 অক্ষমের হিগাক বশন এক খাতার রাবা
 হয়, তখন আমার অক এবং খরচের অকের
 ভাগ এমনিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক—
 এবং বাহ্য স্বাভাবিক, তাহার উপর চোখ
 রাখানো চলে না, চোখের জল ফেলাও
 বুঝা। স্বাভাবিক স্বীকার করিয়াই কাজ
 করিতে হইবে। তাহারা দেখ, আমরা
 বশন ইংরেজকে বলিতেছি, 'তুমি সাধারণ
 মহাব্যবস্থার চেয়ে উপরে ওঠ, তুমি
 স্বাভাবিক স্বার্থকে ভারতবর্ষের স্বার্থের
 কাছে বর্জন কর', তখন ইংরেজ যদি জবাব
 দেয়, 'আচ্ছা, তোমার মুখে যত্নোপদেশ

আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি
 আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ-মহাব্য-
 বস্থানের যে নিরতন কোঠার দ্বারা আছি,
 সেই কোঠার তুমিও এস, তাহার উপরে
 উঠিয়া কাজ আই—স্বাভাবিক স্বার্থকে তুমি
 নিজের স্বার্থ কর—স্বাভাবিক উন্নতির জন্য
 তুমি প্রাণ দিতে না পার, অস্তিত্ব আরাম বল,
 অর্থ বল, কিছু একটা দাও! তোমাদের
 দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর
 তোমরা নিজে কিছুই করিবে না।' এ কথা
 বলিলে তাহার কি উত্তর আছে? বস্তুত
 আমরা কে কি দিতেছি, কে, কি
 করিতেছি! আর কিছু না করিয়া বৃষ্টি
 দেশের বরষ লইতাম, তাহাও বৃষ্টি—আগত-
 পূর্বক তাহাও লই না দেশের ইতিহাস—
 ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি;
 তাহাও ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখ
 করিয়া লই; ঘরের পাশে কি আছে জানিতে
 হইলেও হাট্টার বই গতি নাই। তার পরে
 দেশের কৃষিসবন্ধে বল, বাণিজ্যসবন্ধে বল,
 ভূতব বল, নৃতব বল, 'নিজের চোটার দ্বারা
 আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না।
 স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতা-
 সবেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য-
 গালনসবন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম
 কর্তব্যানুষ্ঠিত উপদেশ দিতে সক্ষম হই না।
 সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে
 লাগিতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি কাজ
 করিতেছে, তাহার দায়িত্ব আছে, যে ব্যক্তি
 কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার
 দায়িত্ব নাই, এই উত্তর পক্ষের কথা কখনই
 স্বার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না।

এক পকে টাকা আছে, অল্প পকে শুধুমাত্র
 ডেকুবইখানি আছে, এমন প্রলোভন দেখা
 চাওনো চলে না। তিকার স্বরূপে এক-
 আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিদ্বারা
 বরাবর চলে না—উহাতে পেটের আশার
 মধ্যে মধ্যে তাগ হয় বটে। এক একবার যেন
 হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল
 কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারপরেই
 হোক, আর নিঃশেষে হোক, গলাধঃকরণ-
 পূর্বক সম্পূর্ণ পরিণাম করা ছাড়া আর পতি
 নাই। প্রত্য প্রতিনিয়ই দেখা দাঁড়িতেছে।
 আত্মীয় ব্রিটিশ সভাও করি। খবরের কাগজেও
 লিখি, আবার বাহা হজম করা বড় কঠিন,
 তাহা নিঃশেষে পরিণামও করিয়া থাকি।
 পূর্বের দিনে বাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া
 ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার
 অল্প বৈজ্ঞানিক ভাষিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে দৃঢ়তায় বলিবেন,
 তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ,
 নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে,
 নিজের লজ্জা নিজেকে ঘাটন করিতে
 হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন
 করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে
 উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব
 কোথায়! পুরাতন কথা বলিতেছি,—এমন
 অপবাদ আমি রাখার করিয়া লইব, আমি
 নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জিত, এ কলঙ্ক অস্ত্রের
 ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা
 বলেন যে, এ আবার তুমি পিঁক নূতন কথা
 কল্পিয়া বসিলে, তবেই আমার পক্ষে সুফল—
 সঙ্গীত কথাকে যে কেমন করিয়া
 প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হঠাৎ প্রাচীন

পাওয়া শক্তি। চঃসময়ের প্রধান লক্ষণই
 এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন
 কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয় হয়! এমন
 কি, তুমিলে লোকের ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, পলি
 গিতে থাকে। জনস্বত্ব পহার চরে অন্ধকার
 রাজ্যে পথ হারাইয়া লম্বা হইল, উত্তরকে
 দক্ষিণ বলিয়া বাহার ভ্রম হইয়াছে, সেইখানে,
 বাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কঠিন
 বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে, যেমনি আলো
 হয়, অন্ধনি সেই সুহৃৎই নিজের ভ্রমের দ্বারা
 বিশ্বের অন্ধ থাকে না। আমাদের এখন
 অন্ধকাররাশি—এখন এ দেশে যদি কেহ
 অত্যন্ত প্রামাণ্যকথাকেও বিপরীত জান
 করিয়া কট্টকি করেন, তবে তাহাও লক্ষ্য-
 চিত্তে লক্ষ্য করিতে হইবে, আমাদের সুপ্র
 ছাড়া কাহিলকও মোব দিব না। আশা
 করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই
 হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জান করিয়া চলিলে
 একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিচর জানি, সকলেরই
 যে এই বশা, তাহা নহে। আমাদের দেশে
 এমন অনেক উৎসাহী ব্যক্তি আছেন, বাহারা
 দেশের অল্প কেবল ব্যক্তাবার নহে, ত্যাগ-
 স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কি করিবেন,
 কোথায় বাইবেন, কি বিবেচন, কাহাকে
 বিবেচন, তাহার কোনো ঠিকানা পান না।
 বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা
 হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা
 পদ্ধতি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে
 থাকিত, তবে বাহারা বননশীল তাহাদের
 মন, বাহারা চেষ্টাশীল তাহাদের চেষ্টা,
 বাহারা দানশীল তাহাদের দান একটা বিপুল

লক্ষ্যপাইক—আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা, আমাদের দায়িত্ব, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা সমস্যার সমাধান, সবই বর্তমানে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেটিকে দেখে বলি। একটা ব্যাপারকে বিচার করিয়া তুলিত ।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে বস্তু বহিঃকার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই একোটা আশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া কুলিবার ক্ষমতা ; প্রার্থনা করিয়া বস্তুই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদের নিজেকে সেই একোটা আশ্রয়ের অতিশয় করিবার ক্ষমতা ; আমাদের মনে পরমুখাপেক্ষী কখনোই সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ কেন্দ্রবিন্দু নিরাক্ষর প্রতিবিম্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই একোটা আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা ;—কোনো বিশেষ আইন রক্ষা করিবার ক্ষমতা নহে, কোনো বিশেষ প্রার্থনা সফল করিবার ক্ষমতা নহে, কোনো বিশেষ প্রাথমিক নিবারণ করিবার ক্ষমতা নহে ।

এই শক্তিকে বেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে মুক্তি প্রাপ্তি করিব, তাহাকে কার্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপন্ন হইবে । ইহার নিকটে আমাদের নিজেকে বস্তু হইতে হইবে, সমস্ত দিতে হইবে, সমস্ত গ্রহণ হইবে । আমাদের মুক্তি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীৰ্য্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বাহ্য-কিছু পড়িবে, বাহ্য-কিছু নহে, তাহা সমস্ত উৎসাহিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপ্ত করিবার

এই একটি ক্ষেত্র হইবে ; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য দিব এই ইহার নিকটে হইতে আমরা ঐশ্বর্য্য লাভ করিব ।

এইবার হইতেই যদি আমরা বেশের বিজ্ঞান শিক্ষা, বাহ্যিক, বাণিজ্যিক, চৌকি করি, তবে আর একটা বিষয়, কাল একটা ব্যাপারের ক্ষমতা বস্তু-তখন তাড়াতাড়ি হইতেই বস্তু সঙ্গ্রহ করিয়া চৌকি হইতেই দৌড়াইয়া পড়ি করিয়া মরিতে হয় না । এই যে পাকিস্তান-পাকিস্তান চমকাইয়া ওঠা, পরে চৌকি করা এবং তাহার পরে নিশ্চয় হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হস্তাকর্ষ হইয়া উঠিতেছে—আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ সমস্ত গাভীরার করা আর ত সম্ভব হয় না । এই গ্রহণ-হইতেই বস্তু পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাছের দার নিজে গ্রহণ করা ।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্নমেন্টের সঙ্গে কোনো সংগ্রহই হইতে চাই না । সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেই অভিমান সমস্ত ক্ষমতার স্থলেই মানার, প্রণয়ের সম্মুখেই পোতা যায় । আমি আরো উল্টা কথাই বলিতেছি । আমি বলিতেছি, গবর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের তৎক্ষণাৎ সখ্য স্থাপনেরই সহপায় করা উচিত । তৎক্ষণাত্মকভাবেই মাঝখানে একটা বাধা নাই—যে মুহূর্ত্ত আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছা কোনো অপেক্ষাই রাখিয়া, তাহা দাঁতের মতো, তাহা ক্রমশ কর হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য । কিন্তু বাধার আদান-প্রদানের সমস্ত ক্রমশই বিনষ্ট হইয়া উঠে ।

আমরা অনেক কষ্টসাধ করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যদি কিছু চাই-তেছি, সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অস্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এক পক্ষে কেবলি চাওয়া, আর এক পক্ষে কেবলি দেওয়া, ইহার অস্ত কোথায়? যত দিয়া আন্তরিক কোনোদিন নেবানো যায় না, সে ত শাস্ত্রেই বলে—একপ দাতা-ভিক্ষকের সৎক ধরিয়া যতই পাওয়া যায়, বহুত্বতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অসঙ্গত, দাতার পক্ষেও তেমনি অস্ববিধ।

কিন্তু যেখানে বিনিময়ের সৎক, দান-প্রতিদানের সৎক, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল—সেখানে দাবির পরিমাণ স্বাভাবিকই ভাব্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপোষে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। যেখানে একপ তত্ত্ব অবস্থা ঘটবার একমাত্র উপায়, দাবী-শক্তিতে দেশের মঙ্গলসাধনের উপায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অস্ত কর্তৃপক্ষের সম্পর্কই শোভন এবং স্বাস্থ্য, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সৎক পাতাইতে গেলে নিজেকে অকপার্য করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেকেও একদানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, পদার্থের কাছ হইতে আমাদের দেশ বহুত্ব পাইবার,

তাহার শেষকড়া পর্যন্ত পাইতে পারি, যদি দেশকে আমাদের বহুত্ব পর্যন্ত দিবার, তাহার শেষকড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সৎক দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না; কিন্তু তাঁই বলিয়া সকল ঈশ্বরই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি স্বার্থই কাজ করিতে চায়, তাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বড় শক্ত। এই মনে কর, ব্যয়ত্বশাসন। আমরা মাথাম হাত দিয়া কাদিতেছি যে, রিপন্স আমাদেরকে ব্যয়ত্বশাসন দিরাছিলেন, তাহার পরের কর্তার তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু বিচ্ এই কথা! বাহা একজন দিতে পারে, তাহা আর একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে ব্যয়ত্বশাসন নাম দিলেই কি ইহা ব্যয়ত্বশাসন হইয়া উঠিবে?

অথচ ব্যয়ত্বশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে—কেহ তাহা কাজে নাই এবং কোনোদিন কাজিতে পারেও না। আমাদের প্রোমের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সড়কই আমরা নিজে করিতে পারি,—বদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই; একত্ব স্ববর্মেণ্টের চাপ্রাস কুকে বাঁধবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে

চূর্ণার দাক্ষ্য ভারতশাসন ! তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বহু আমাদের আর কেহ নাই !

পূর্বপূরার তুনিয়াক্তি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদর রাজকর্মচারী বহুতাবে বলিয়াছিলেন যে, প্রথমটিকে অহুতোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিবে—তাহাতে ভৈরবী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, বোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, বাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না, বাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন । আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না । —ভৈরবী অমরাও যেন বলিতে পারি, বোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন ভারতশাসন দিয়া কাজ নাই, বাহা দিতেও যতক্ষণ, কাড়িতেও ততক্ষণ—যে ভারতশাসন আর্মী-শের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিদ্যাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহযুক্তিতে, দুর্ভ নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অধীকার করিতে পারি—
দ্বিপদের অর হউক এবং কর্মজ্ঞ ও বাচিরা থাকুন ।

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিজ্ঞা-শিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । সংস্কৃতি বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম দিবে কে ? কর্মও আমাদিগকেই দিতে হইবে । একটি বৃহৎ বৈদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আরও গুণ না

পাকিলে আমাদেরও চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে, কোনো কোনো-লে এই নিষ্ঠার দুর্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না । যে আমাদিগকে কর্ম দিবে, সেই আমাদের প্রতি-কর্তৃত্ব করিবে, ইহার অগ্রথা হইতেই পারে না,—যে কর্তৃত্ব লাভ করিবে, সে আমাদিগকে চাণনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না, ইহাও স্বাভাবিক । অতএব সর্বপ্রথমে আমাদিগকে এমন একটি বৈদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে বৈদেশী বিজ্ঞানজ্ঞের শিক্ষাগণ শিক্ষতা, পূর্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন মঙ্গলকর্মের ব্যবহার নিযুক্ত থাকিবেন । আমরা আশ্রয় করিয়া থাকি যে, আমরা কাল শিপিবার ও কাজ দেখাই-বার অবকাশ না পাইয়া মাহু হইয়া উঠিতে পারি না । সে অবকাশ পরের ব্যাধি কখনই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই ।

আমি জানি, অনেকেরই বলিবেন, কথাটা অত্যন্ত দুর্বল শোনাইতেছে । আমিও তাহা অধীকার করিতে পারিব না । ব্যাপার-খানা সহজ নহে—সহজ যদি হইত, তবে অপ্রচেষ্ট হইত । কেহ যদি পরবাণকাসের নৌকা বানাইয়া সাতসমুদ্রপায়ে সাত-সাতবার ঘন বাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কল্যাণ-কার্য্যক্ষেত্রে তাহা তুলিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিক্যে কাহাকেও মূলধন ব্যয় করিতে পরামর্শ দিই না । বাধা বাধা করি, সে স্থলে দল বাধিয়া নদীকে স্রিয়মান দিতে অগ্ররোধ করা কনুটীচুসনায় আশিষ্টেমন

নামে গণ্য হইতে পারে। প্রায় সহস্র কাল
বটে, কিন্তু সহস্র উপাধ নহে। আমরা
মস্তার বড় কাল সারিবার চাতুরী অবলম্বন
করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সত্তা উপায় ব্যর্থব্যর্থ
বধন ভাঙিয়া ছারিবার হইয়া ধীর, তখন
পরের নামে গোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ
করি—তাহাতে কুণ্ঠি হয়, কিন্তু কাল হয় না।

নিজের বেলার সমস্ত দায়কে হাফা
করিয়া পরের বেলার তাহাকে ভারি করিয়া
তোলা কর্তব্যানীতির বিধান নহে। আমাদের
প্রতি ইংরেজের আচরণ বধন বিচার করিব,
তখন সূক্ষ্ম বাধাবিধ এবং মনুষ্যপ্রকৃতির
ব্যতিক্রমিক দুর্বলতা আলোচনা করিয়া আমা-
দের প্রত্যাশার অন্ধকে বস্তুর সম্ভব খাটো
করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু আমাদের
নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক
তাহার উদ্ভাসিকে চলিতে হইবে। নিজের
বেলা ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা
করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার
খাতিরে নিজের আদর্শকে পরীক্ষার প্রতি
আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি
আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগান্বিত
করিয়া ক্ষণিক-উত্তেজনা-মূলক উল্লোপে প্রবৃত্ত
হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ স্রোতের
পথ নহে। জবাব দিবার, এবং করিবার
প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কর্তব্য হইতে,
সফলতা হইতে নষ্ট করে। লোকে বধন
রাপ করিয়া মকদ্দমা করিতে উদ্ভত হয়, তখন
নিজের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।
আমরা যদি সেইরূপ মনোবাদের উপর
কেন্দ্রীক উৎসাহের কুঁড়ি দিয়া নিজেকে
রাগান্বিতা তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা হইলে

কলগভীর লক্ষ্য পূরে গিয়া ক্রোধের পথ
তৃপ্তিটাই বড় হইয়া উঠে। স্বার্থের
গভীরভাবে ঘেনের তাড়া মঙ্গলের দিকে
রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির
হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। দিতে
ক্ষম এবং উত্থাপন অবস্থার রাখেলে মূল
ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়—কোন
কথাকে বড় করিয়া তুলি—প্রত্যেক
তাকে অবলম্বন করিয়া অসম্ভব অসি
চারের দ্বারা নিজের প্রার্থনা নষ্ট ক
থাকি। এইরূপ চাকল্যদ্বারা হীন
বুদ্ধিই হয়—ইহাকে শক্তির চালনা বলা
না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে মু
করিয়া সেনের প্রতি প্রীতির উপরেই
মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স্বাভা
বিকতার উপরে নহে, পরের প্রতি বিদ্বে
উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভর
প্রতিও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বে
দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া
হয়, কিন্তু বস্তুর ইহারা একই পক্ষেই
পাথা। ইহার দুটাই আমাদের সম্ভা
অক্ষমতা ও জড় হইতে উদ্ধৃত। প
প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্ভল কা
রাহি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির স্বার্থ
বিধেবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি।
উত্তেজিত হওয়ারাত্রকেই আমরা
হিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। বাহ্য
দের দুর্বলতা, তাহাকে বড় নাম দিয়া কেন
বে আমরা সাবধানাভ্যাস করিতেছি, জা
নহে, সর্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার তাবিয়া দেখ, যাতাকে

তাহার সন্তানের সেবা হঠতে বৃদ্ধি দিয়া সেই কার্য্যভার যদি অল্পে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসম্ভব হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অপ্রতিম বেহাই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষ্যগণ বখার্ব লক্ষণ, দেশের হিতকর আগ্রহপূর্ব্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিশেষরূপে হাতে চাপাইবার চাতুরী বখার্ব শ্রুতির চিত্র নহে; তাহাকে বখার্ব বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনোমতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত দেশহিতৈষ্য যে আমাদে-
 যের দেশে জন্ম নীহে, এ কথা
 অস্বত্ব আমাদের পোষন অসম্ভব
 নিকট আগোচর নাই। বাস্তব নাই, তাহা
 আছে, তান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা
 আয়োজন করার ফল কি আছে? এ
 সম্বন্ধে উত্তর এই যে, দেশহিতৈষ্য আমাদের
 বখেই চরল হইলেও তাহা যে একেবারে
 নাই, তাহাও হঠতে পারে না—কারণ,
 বখার্ব অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমাদের
 এই চরল দেশহিতৈষ্যকে পুষ্ট করিয়া
 দিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টার দেশের
 পরিচর্য্য করিবার উপলক্ষ্য আমাদিগকে দেওয়া।
 সখার্ব ব্যক্তাকেই প্রেমের চর্চ্চা হইতে থাকে।
 দেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের
 সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া
 তাহাকে আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে
 প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি
 স্থান করিতে হইবে, যেখানে দেশ-ভিনিষটা
 যে কি, তাহা সুবিধামতে মুখের কথায়

বুঝাইবার যুগা চেষ্টা করিতে হইবে না,
 যেখানে দেখাযুগে দেশের ভোটো-বন্ধ, দেশের
 পণ্ডিত-মুখ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিভিন্ন শক্তিকে একস্থানে সংহত
 করিবার ভিত্ত, কর্তব্যবুদ্ধিকে একস্থানে আকর্ষিত
 করিবার ক্ষমতা যদি যে একটি স্বদেশীয়সমূহ
 গঠিত করিবার প্রয়াস করিতেছি, তাহা
 যে একদিনেই হইবে—কথাটা পাড়িবারাই
 অসম্ভব যে দেশের চারিদিক হইতে সকলে
 লম্বাঙ্গের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে,
 এমন আমি আশা করি না। স্বাভাব্য-
 বুদ্ধিকে ধর্ম্ম করা, উক্ত অভিমানকে ধমন
 করা, নির্ভর সচিব নিয়মের শাসনকে গ্রহণ
 করা, এ সমস্ত কাজের লোকের গুণ কাজ
 করিতে করিতে ঐ সকল গুণ বাড়িয়া
 উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে
 গেলে ঠিক তাহার উল্টো হয় এই সকল
 গুণের পরিচর্য্য যে আমরা প্রথম হইতেই
 দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি
 না। কিন্তু এক আরম্ভের এক হইবার চেষ্টা,
 বত ক্ষুদ্র আকারে হোক, আরম্ভ করিতে
 হইবে। আমাদের দেশের যুগের মধ্যে
 এমন সকল পাটীগণক, শতলোক বাহারা
 আছেন, বাহারা দেশের কল্যাণকর্ম্মকে লক্ষ্য
 জানিয়াই বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং
 সেই কর্ম্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও
 হতোৎসাহ হন না; তাহাদিগকে একজন
 অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি।
 দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী
 যদি স্থাপিত হয় এবং তাহার বাহি একটি
 মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের
 কার্য্যকে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিতে রাখা করিতে

পারেন, তবে একদিন এই সংসদ সমস্ত
দেশের ঐক্যকে ও সম্পদের ভাণ্ডার
হইয়া উঠিতে পারে। সুবিধীয়া আরম্ভের
অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও
সম্মারোহের প্রত্যাশা করা কেবল কর্তব্যকে
কঁাকি দেওয়া। এখন আরম্ভ করিতে
হইবে। বত পিত্ত পারি, আমরা যদি সমস্ত

দেশকে কর্তব্যে বেষ্টিত করিয়া আরম্ভ
করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে
বাহ্যের উত্তম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহার
কোথাও আমাদের ক্ষমতা হইবে না।
এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেখসবল
কৃষিক্ষেত্রেও অধিকার করিয়া লইবে,
সেইজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার।
পৃথিবীতে কোনো জায়গা কঁাকা পড়িয়া
থাকে না; আদি যাহা ব্যবহার না করিব,
অন্তে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি
যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি, অস্তে
আমার প্রভু হইয়া বসিবে; আমি যদি শক্তি
অর্জন না করি, অস্তে আমার প্রাপ্যগুলি
অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষার
কেবলি কঁাকি দিই; তবে সকলতা অস্তের
ভাগেই ছুটিবে—ইহা বিশ্বের অনিবার্য
নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দৃষ্টাঙ্গ
এই যে, তুমি আপনার সমুখে কর্তব্যের
প্রস্তুত পাও না। কিন্তু যদি তুমি ইহাকে
অপরাজিতচিত্তে নিজের দোভাগ্য বলিয়া
গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, নিজের
ক্ষেত্রে আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব,
তবেই তুমি দীপ্ত হইবে। বিজিততার মধ্যে
মুখলা আনন্দ করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবন

স্বাক্ষর করা, সঙ্গীতের মধ্যে উদ্ভাস
মহুসাত্মক আনন্দ করা, এই সমস্ত সৃষ্টি
তোমার সমুখে পড়িয়া আছে—একটি আ
নন্দিত হও! নিজের শক্তির প্রতি আ
শ্বাসন কর, নিজের দেশের প্রতি প্রভাব
কর এবং বিশ্বের প্রতি বিশ্বাস রাখাইয়ো, স
বাত্ম আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের
চিত্তের মাঝখানে একটি রেখা টানি
দিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন, কাল তাঁহার
বাংলার প্রাথমিকশিক্ষা চারখানা কুঠিয়া
সকল করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা দুঃ
বিষয়—কিন্তু শুধু কি নিরাশা দুঃখভোগ
এই দুঃখের পর্য্যবসান? ইহার পশ্চ
কি কোনো কণী নাই, আমাদের
শক্তি নাই? শুধুই অরণ্যে এরা
ম্যাপে দাগ উপনিহা মাত্র বাংলাদেশকে
টুকরা করিতে গবর্নমেন্ট পাবেন? অ
আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক ক
রাখিতে পারি না? বাংলাদেশ
গবর্নমেন্ট নিজের উজ্জ্বল চারখানা ক
তুলিতে পারেন? আর, “আমরা স
বাঙালি তাহার ঐক্যমুদ্রকে অবি
রাখিতে পারি না? এই যে আপদা, ইহা
নিজেদের প্রতি নিদাকণ মোবারোণ ন
যদি কিছুই প্রতিকার করিতে হয়, ক
কি এই মোবারে প্রতিকারই আমা
একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে স
সেই আমাদের সমুদয় চেষ্টার সম্মিলনে
আমাদের সমুদয় উদ্যোগের প্রেরণা
আমাদের সমুদয় পূজা-ইৎসর্গের সাধ
তাহার যে আমাদের নিজস্বই চ
আমাদের কর্তব্যের চেষ্টাতেই